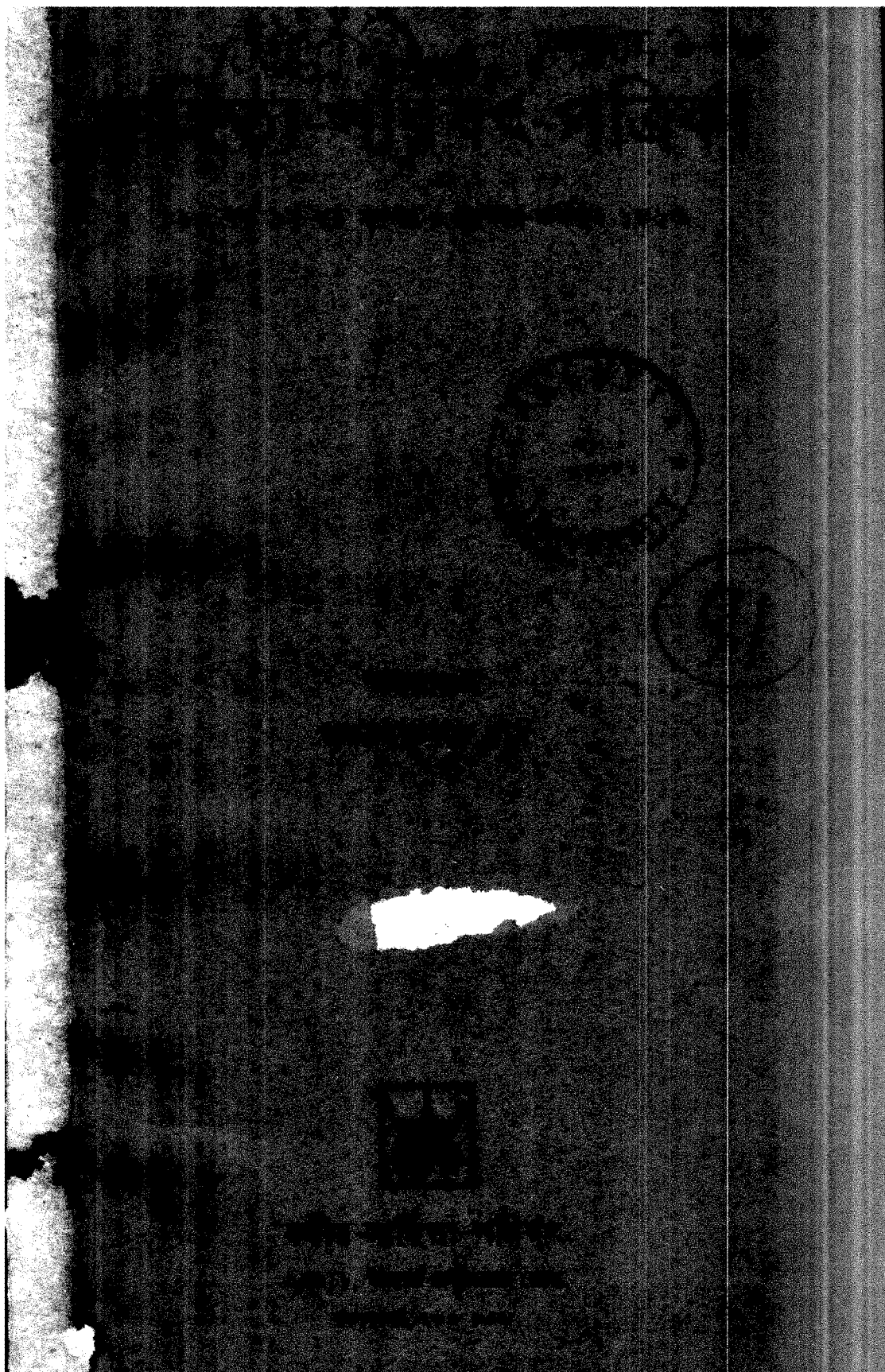




সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

১১৩ বর্ষ ১ম-২য় সংখ্যা • বৈশাখ-আশ্বিন ১৪১৩

৭১

পত্রিকাধ্যক্ষ

প্রভাতকুমার দাস



বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

২৪৩/১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা ৭০০ ০০৬

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

১১৩ বর্ষ ১ম-২য় সংখ্যা বৈশাখ-আশ্বিন ১৪১৩

Sahitya-Parisat-Patrika

Vol. 113. No. 1-2 Baishak-Asvin 1413

(Published on Asvin 1413, October 2006)

প্রকাশ : আশ্বিন ১৪১৩

P 31195

প্রকাশক :

শ্রীরমাকান্ত চক্রবর্তী

সম্পাদক, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

২৪৩/১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা ৭০০ ০০৬

বণিকিয়াস ও মুদ্রণ :

সার্ভিস প্রিন্টার্স

৫৫/৬৪ কালীচরণ ঘোষ রোড, কলকাতা-৭০০ ০৫০

দাম : ১০০.০০ টাকা

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

১১৩ বর্ষ ১ম-২য় সংখ্যা • বৈশাখ-আশ্বিন ১৪১৩



সূচিপত্র

পত্রিকা প্রসঙ্গ • প্রভাতকুমার দাস

লেখক পরিচিতি

যুগপৎ বাংলা কবিতা আর অনুবাদ • নিতাপ্রিয় ঘোষ ১

রাগী যুবক রবীন্দ্রনাথ • সুতপা ভট্টাচার্য ৪

শেলি ও রবীন্দ্রকাব্যের প্রথম পর্যায় • কল্যাণ চট্টোপাধ্যায় ১৭

‘ভাষা ও ছন্দ’ : রবীন্দ্রনাথের কবিতা • বীতশোক ভট্টাচার্য ৩৪

কখনো শুনি, কখনও শুনি না যে • অরুণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ৪২

চিরকুমার সভা-র চির-বিধবা • সুমিতা চক্রবর্তী ৫৩

রক্তকরবীর পাণ্ডুলিপি-বিবর্তন : একটি সমীক্ষা • মলয় রক্ষিত ৬২

পত্রগুচ্ছ • হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় ৯০

পত্রপরিচিতি • প্রবালকান্তি হাজরা ১০৫

সিডিবদ্ধ রবীন্দ্রনাথ • অশোক মুখোপাধ্যায় ১০৭

বাংলা কবিতার উন্মেষ ও ভবিষ্যতের ইঙ্গিত • সুভাষ ভট্টাচার্য ১১২

গান্ধী ও গান্ধী-বাদ : বাংলা কবিতায় • অনুরাধা রায় ১২১

বিকিরণ, আকরণপক্ষ আর কায়াপক্ষ • প্রবাল দাশগুপ্ত ১৪৭

বঙ্কিম-সাহিত্যে ইতর-প্রাণী • অভয়চরণ দে ১৫৮

বিশ্বায়িত রূপচেতনা ও রামকিঙ্কর চন্দ্রিশের আধুনিকতা • মৃণাল ঘোষ ১৬৫

প্রবোধকুমার সান্যাল : শতবর্ষে স্মরণ • সুজিৎ ঘোষ ১৮৬

বাংলার লোকসমাজ ও দেশীয় সংগীতকলা • সুনীল সাহা ১৯৫

ফিঙ্গাপুরী খেপুত • ত্রিপুরা বসু ২১০

গঙ্গাপুত্র : শৈলবালা ঘোষজায়ার সমাজচেতনা • অরুদ্ধতী সুর ২১৬

প্রসঙ্গ : অনুবাদ • কেতকী কুশারী ডাইসন ২২৪

পরিষৎ-সংবাদ • ২৪৩

আমাদের কয়েকটি মূল্যবান প্রকাশনা

শ্রীমৎ অনিবার্ণ : পূর্ববর্তী, অমি ও জ্যোতির্লোক ৮০, উপনিষদ-প্রসঙ্গ : প্রথম খণ্ড — ঈশ ২৫, দ্বিতীয় খণ্ড — ঐতরেয় ৫০, তৃতীয় খণ্ড — কেন ৩০, উপনিষদ-প্রসঙ্গ : চতুর্থ খণ্ড — কঠ, উপনিষদ-প্রসঙ্গ : পঞ্চম খণ্ড — কৌষীতকী ৪০, গোবিন্দলোপাল মুখোপাধ্যায় (স) : সংস্কৃত পাঠমালা ৫০, ঋতসংক্রমণ : প্রথম খণ্ড ১৫.০০, অষোধ্যনাথ সান্যাল : ঋতসংক্রমণ : দ্বিতীয় খণ্ড ৭, বৈয়াকরণ সিদ্ধান্ত কৌমুদী ৬০, গোপাল চন্দ্র তর্কতীর্থ : ভাষা পরিচ্ছেদ ১২৫, বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় বৈদিক ভাষায় সোম ১২, মিহির চৌধুরী কামিন্য : আঞ্চলিক দেবতা : লোক সংস্কৃতি ১০০, জীবেন্দ্র সিংহ বায় (স) : আধুনিক বাংলা কবিতা : বিচার ও বিশ্লেষণ ১০০, রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় : কৃষ্ণকথায় মালাধর ও মাধব ২৫, অশীশচন্দ্র সাহা : দেবেজনাথ সেন : জীবনী ও কাব্যবিচার ৬০, চিন্ময়ী ভট্টাচার্য : কথা-সাহিত্যে গ্রাম বাংলা ১১০, অরুণ মিত্র : সাহিত্যের দিক-দিক ১০০, শঙ্কুনাথ কুণ্ডু : প্রাচীন বঙ্গের পৌরাণিক ধর্ম ও সেবাব্যবস্থা ১২৫, বিপ্লব চক্রবর্তী : উনিশ শতকের বাং : সাহিত্য : ভারতীয় প্রেক্ষাপট ৮০, অশোক কুমার পালিত (সম্পাদিত) : গুপ্তবর্মী (বাড় বঙ্গের গণিত পদ্যকবী) ৪০, শৈলেন্দ্রনাথ সামন্ত, প্রবর চট্টোপাধ্যায় ও রাণীকান্তি শর্মাসিকারী : বর্ষমানের গুপ্ত মুদ্রা ৬০, গোপীনাথ কবিবাজ : তাত্ত্বিক সাধনা ও সিকান্ত প্রথম খণ্ড ৪৫.০০, দ্বিতীয় খণ্ড ৪৫, সুধীর্কুমার নন্দী : দর্শন জিজ্ঞাসা ৫০, মৃণালকান্তি ভট্ট : অস্তিত্ববাদ : জ্যা পল সাত্তের দর্শন ও সাহিত্য ৭৫, অস্তিত্ববাদ ও মানবতাবাদ ৩৫, কাস্টের গুরু প্রভাব বিচার ৮০, নীতিবিদ্যা ৬০, সৈয়দ বসিরুদ্দোজা : বাটের শিল্প ডেককা ৪০, সুধীর কুমার কবির : লোকায়তিক ১২০, জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : রামায়ণের উৎস কবি ৭৫, শিবব্রত চট্টোপাধ্যায় : নাটকের অনুবাদে ববীন্দ্রনাথ ১০০, নাট্য ঐতিহ্য ও লঘু নাটক ১০০, প্রশান্ত কুমার ঘোষ : বিদ্যাসির্গবেব প্রিয় ছাত্র— রামগতি ন্যায়বত্ত ১২০, উদয়চাঁদ দাস ও অবিন্দম চট্টোপাধ্যায় (স) দেশ বিভাগ ও বাংলা উপন্যাস ১২৫, সুরজিৎ দাশগুপ্ত : অমদাশদ্বব ও মানবিকবাদ ৩০।



The University of Burdwan

Rajbati, Burdwan-713 104, West Bengal

Ph. +91-342-2533913, 2533914, 2533917, 2533918. (PBX) (Ext 276)

Fax : +91-342-2530452, E-mail : registrar@buruniv.ac.in

website : <http://www.buruniv.ac.in>

বদলে যাচ্ছি আমরা, বদলাবে আমাদের এই শহর

“নাগরিক মনদ”

...হাওড়া পৌর নিগমের অঙ্গীকার সঠিক
পুর পরিষেবা পুরবাসীদের কাছে।

হাওড়া পৌর নিগম — মানুষের স্বার্থে, মানুষের সাথে

পত্রিকা প্রসঙ্গ

১৪১২ বঙ্গাব্দের শেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল পাঁচ মাস আগে নির্দিষ্ট সময় সীমা তিন মাস পেরিয়ে। সাময়িকপত্রের নিয়ম রক্ষা করে প্রতিটি সংখ্যা যথা সময়ে প্রকাশের গৌরব, শত চেষ্টা সত্ত্বেও যে সবসময় সম্পাদকের হাতে থাকে না — সেটা বহুপ্রমাণিত সত্য। বর্তমান পত্রিকার পাঠকদের অভিজ্ঞতাতেও এটা অনেকদিনের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে — যেজন্য অনিয়মিত প্রকাশের ত্রুটি তাঁরা উদারতায় মার্জনা করে আসছেন। অবশ্যই উল্লেখ্য লেখকরা অপরিসীম ধৈর্যে, দীর্ঘ বিলম্বকে নিছক উদাসীনতা বা অবহেলা মনে করেন না। তাঁদের অনেকেই অকৃপণ সহযোগে নিম্নস্বাক্ষরকারীকে কৃতজ্ঞ থাকবার সুযোগ করে দিয়েছেন।

পূর্ব কোনো পরিকল্পনা ছাড়াই প্রস্তুতমান অবস্থাতেই বর্তমান সংখ্যায় বিষয় হিসেবে রবীন্দ্রনাথের প্রাধান্য গড়ে উঠেছে অনেকটা আকস্মিক ভাবেই। প্রথমাংশে আটটি প্রবন্ধের সঙ্গে যে পত্রগুচ্ছ সংযুক্ত করা হল সেগুলির অনেকটাই একজন কৌতূহলী ছাত্রের রবীন্দ্র-প্রাসঙ্গিক প্রশ্নের উত্তরে লেখা, — তেমন একজন কৃতিবিদ্য প্রশাসক-শিক্ষককে তাঁর জন্মশতবর্ষ অতিক্রম করে এসে স্মরণ করার উপলক্ষ্য তৈরি হল।

উত্তরঅংশের রচনাগুলি পত্রিকার বর্তমান চরিত্র অব্যাহত রাখার চেষ্টাতেই সংগ্রহিত হয়েছে। শুধু স্থানাভাববশত পুরোনো সাময়িক পত্রের সূচি প্রস্তুত করেও প্রত্যাহার করতে হল। এ ধরনের সংখ্যানুক্রমিক সূচি পাঠক মহলে বিশেষ উপকারে লাগছে জানিয়ে অনেকেই এই প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানিয়েছেন। এ রকম সংকলন শ্রমসাপেক্ষ জেনেও, অধিকাংশ পত্র-পত্রিকা কেবলই শুল্ক সূচি মুদ্রণের জন্য পরিসর বরাদ্দ করতে চান না। আবার কোনো কোনো সম্পাদক আগ্রহ দেখালেও, অনেক সময় তাঁর অনবধানের সুযোগ নিয়ে কোনো কোনো সংকলক ভিন্ন বিন্যাসে একই পত্রিকারই বর্ণানুক্রমিক লেখক ও রচনা সূচি প্রকাশ করছেন, প্রাথমিক উৎসের স্বীকৃতি না দিয়েই। বাংলা ভাষায় এ ধরনের কাজে উৎসাহ দেবার মতো পত্রিকা খুব বেশি নেই। তাই যে-কোনো বিন্যাসেই হোক না পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনা যদি এড়িয়ে আনকোরা কাজকেই গুরুত্ব দেওয়া যায় তাহলে গবেষক-পাঠকদেরই পরিষেবার পরিধি বিস্তৃত হয়। আর, কোনো সংকলক যদি তা সত্ত্বেও এই কাজে আনন্দ পান, তাহলে আশা করা অন্যায় নয় অন্তত তাঁর সংকলনের শেষে ইতিপূর্বে মুদ্রিত সংখ্যানুক্রমিক সূচির উল্লেখ করবেন। তাতে নিশ্চয় তাঁর শ্রমের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ না হয়ে বরং প্রকৃত গুণীর পরিচয়টিই স্পষ্ট হবে। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা-য় প্রকাশিত বাণী-র সূচিসংকলনের ক্ষেত্রে একেবারে হালে পত্রান্তরে এরকম ঘটনার অনুবর্তন আমাদের কাছে কিছুটা বিস্ময়কর মনে হয়েছে।

১৯৩১-এর ১৯ ফেব্রুয়ারি তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে ইছামতী নদীর পারে বাসাইল গ্রামে জন্মেছিলেন মীজানুর রহমান। পঁচাত্তর বছর বয়সে কলকাতাতেই তাঁর প্রয়াণ হল ২০ জুন ২০০৬— এসেছিলেন চোখের চিকিৎসা করতে কিন্তু দীর্ঘকালীন হাঁপানির প্রকোপ থেকে শেষ পর্যন্ত নিজেকে উদ্ধার করতে পারেন নি। তাঁর মরদেহ বাংলাদেশে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে ঢাকাতেই সমাধিস্থ করতে হয়েছে। পিতার কর্মস্থানের কারণে মীজানুরের শৈশব কেটেছে কলকাতায়, মিত্র ইনস্টিটিউশানে-এ পড়েছেন। দেশভাগের পর পূর্ব পাকিস্তানে ফিরে গিয়ে প্রবেশিকা উত্তীর্ণ হন। পরে চারু ও কারুকলা ইনস্টিটিউশনে ফাইন আর্টসের পাঠ নেন। তিন বছরের মাথায় বর্ণাঙ্কতার অভিযোগে সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছেড়ে জগন্নাথ কলেজ থেকে স্নাতক হন। পরে বাংলাদেশ ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন কেন্দ্র থেকে ডিপ্লোমা নেন। তাঁর গ্রন্থের সংখ্যা বেশি নয়, *কমলালয়া কলকাতা বা তিরিশ ও চম্পিশের দশকের মহানগরীর শঙ্খবব* নিজের আঁকা ছবি ও স্কেচে সমৃদ্ধ; আর *কৃষ্ণ যোলোই বা কলকাতার মহাদাস্রা চাক্ষুষ বিবরণ*। মলিয়ার-এর নাটকের অনুবাদ করেছেন *কাকাতুয়া* নামে। সম্পাদক হিসেবেই তাঁর খ্যাতি সর্বজনপরিচিত। চোদ্দ বছর বয়সে হাতে লেখা পত্রিকা *মুয়াজ্জিম* দিয়ে তাঁর সম্পাদনার হাতে খড়ি হয়েছিল আর ২০০৪-এ কলকাতায় প্রকাশ করেছিলেন *ক্ষণিকা*, ১৯৮৩-তে তিনি প্রকাশ করেন *মীজানুর রহমানের ত্রৈমাসিক পত্রিকা*, সে-পত্রিকার বিশেষ সংখ্যার মধ্যে গণিত, বৃক্ষ, নদী উল্লেখ্য, এছাড়া কামরুল হাসান, বিদ্যাসাগর, আহসান হাবীব, কৃষ্ণদয়াল বসু এবং শামসুর রাহমানকে নিয়ে পরিকল্পিত সংখ্যাগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শেষোক্ত সংখ্যাটি পরিকল্পনা করেছিলেন কবির ষাট বছরের জন্মদিনে প্রকাশ কববেন, কিন্তু সেটা প্রকাশ করতে পেরেছিলেন নির্ধারিত সময় পেরিয়ে এক বছরের বেশি ব্যবধানে। কিন্তু চারশো সাত পৃষ্ঠার অনবদ্য সংখ্যাটি এখনো শামসুর-চর্চায় একটি জবুরি সংযোজন।

শামসুর রাহমান জন্মেছিলেন ঢাকায় মাতামহের বাড়ি মাহুতটুলিতে, ১৯২৯-এ, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ২৪ অক্টোবর উল্লিখিত হলেও তাঁর মা সংশোধন করে জানিয়েছিলেন ২৩ অক্টোবর। পৈতৃক ভিটে ঢাকা জেলার রায়পুরা থানার নিভৃত পাহাড়তলী গ্রামে। ঢাকার পোগোজ হাই ইংলিশ স্কুল থেকে প্রবেশিকা ১৯৪৫-এ, ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ থেকে ১৯৪৭-এ আই.এ. এবং ইংরেজিতে অনার্স সহ বি.এ. পড়া শুরু করেও পরীক্ষা যথাসময়ে দিতে পারেন নি। পরে পাশ কোর্সে বি.এ. ইংরেজিতে এম.এ.-তে ভর্তি হয়ে কৃতিত্বের সঙ্গে প্রথম ধাপ পেরিয়ে শেষ বর্ষে পরীক্ষা দেন নি। সম্পাদনার হাতেখড়ি *কবিকর্ষ* পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য হিসেবে ১৯৫৬-তে। কিন্তু পরের বছর সাংবাদিক জীবনের শুরু ইংরেজি দৈনিক *মর্নিং নিউজ*-এ সহসম্পাদক পদে যোগ দিয়ে। তবে কিছুকাল পরে সেকাজে ইন্ডিয়া দিয়ে রেডিও পাকিস্তান ঢাকা কেন্দ্রে অনুষ্ঠান প্রযোজক পদে যোগ দিয়েও আবার পুরোনো সংবাদপত্রের কর্মে ফিরে যান। পরে *দৈনিক বাংলা* ছাড়াও *বিচিত্রা*, *অধুনা* প্রভৃতি পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। সাংবাদিকতা পেশা হলেও তাঁর বড়ো পরিচয় তিনি কবি। ছাত্রাবস্থাতেই বুদ্ধদেব বসুর *কবিতা*-য় তাঁর লেখা প্রকাশিত হলে দ্রুত খ্যাতি অর্জন করেন। বিশ্বভ্রমণ করেছেন সাংবাদিকতা ও কবি পরিচিতির সূত্রে। অন্নদাশঙ্করের আমন্ত্রণে তিনি প্রথম শান্তিনিকেতন সাহিত্যমেলায় যোগ দিতে এসেছিলেন ১৯৫৩-তে এবং তারপর

অনেকবার এসেছেন ভারতবর্ষে। মুক্তিযুদ্ধের সময় সন্ত্রাস আতঙ্কে দিন কাটলেও নির্ভীক জীবনবোধ, বাংলাভাষার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, স্বদেশ ও সমকাল বিষয়ে চিরমুখর মানবিক শামসুর, উভয় বঙ্গের কাব্য-মানচিত্রে এক চিরস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। ‘কস্মিনকালেও অস্ত্রে আমার বিশ্বাস নেই’ ঘোষণা করে তিনি বলেছিলেন ‘এই আমি নিজেই আমার অস্ত্র’। ধীরে ধীরে স্বদেশে তিনি অভিভাবকত্বের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছেন। সাংবাদিকতার জন্য পেয়েছিলেন জাপানের মিতসুবিসি পুরস্কার — কিন্তু কাব্য রচনার কারণেই পেয়েছেন ১৯৬৩-তে আদমজী পুরস্কার, ১৯৬৯-এ বাংলা আকাডেমী পুরস্কার, ১৯৭৬-এ জীবনানন্দ পুরস্কার, ১৯৭৭ একুশে পদক, ১৯৮২-তে ভাসানী পুরস্কার, ১৯৮৪-তে পদাবলী পুরস্কার, ১৯৯১-তে স্বাধীনতা পুরস্কার। ভারতবর্ষে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মান জানিয়েছে সাম্মানিক ডি.লিট প্রদান করে। ১৯৬০-এ প্রকাশিত হয়েছিল *প্রথম গান, দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে*, তারপর প্রায় পঞ্চাশটির বেশি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে — *রৌদ্র করোটিতে; নিজবাসভূমে; বন্দি শিবির থেকে; দুঃসময়ের মুখোমুখি; প্রতিদিন ঘরহীন ঘরে; উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ* প্রভৃতি। অনুবাদ করেছেন, শিশু-কিশোরদের জন্য লিখেছেন। উপন্যাস ছাড়াও প্রবন্ধ ও আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বাংলা একাডেমীর সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। সাতাস্তর বছর বয়সে গত ১৭ আগস্ট ২০০৬ তিনি দুই বাংলার কাব্যানুরাগীদের শোকাশ্রু পথে বিদায় নিয়েছেন।

পরের মাসে কলকাতায় ন্যাশানাল মেডিক্যাল কলেজে ২০০৬-এর ৩ সেপ্টেম্বর প্রয়াত হলেন মাত্র ছাপান্ন বছর বয়সে (জন্ম: ৫ মে ১৯৫০) সুরজিৎ ঘোষ। অনেকদিন থেকেই ক্যানসার রোগে ভুগছিলেন। নবপর্যায় *শতভিষা* কবিতা পত্রিকার অন্যতর সম্পাদক ছিলেন, কিন্তু ১৯৭৮-এ নিজেই প্রকাশ করেন ত্রৈমাসিক *প্রমা*, পনেরো বছর পরে সেটি মাসিক হিসেবেও রূপান্তরিত হয়েছিল। সে পত্রিকার সম্পাদনার পাশাপাশি তিনি ওই নামেই একটি প্রকাশন সংস্থাও চালিয়েছেন দীর্ঘকাল। তাঁর উল্লেখ্য কবিতার বই: *আজ ভালো থাকো; নির্ভুর কাচ; চিহ্ন রেখা; ভাসান চলে জলে স্থলে; শেষ পৃষ্ঠা থেকে আবার*। ‘প্রমা’ নাট্যগোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতা। অভিনয় করেছেন বিভিন্ন মাধ্যমে, পত্র-পত্রিকায় নাট্য সমালোচনা করেছেন। মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হয়েও বই ও পত্রপত্রিকার মধ্যে কাটানোই তাঁর জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য হয়েছিল। কলকাতা বুক সেলার্স এন্ড পাবলিশার্স গিন্ডের পরিচালন সমিতিতেও ছিলেন।

বাংলা কথাসাহিত্য জগতে প্রবীণদের মধ্যে অন্যতম প্রতিভা বসু চলে গেলেন গত ১৩ অক্টোবর ২০০৬-এ। তদানীন্তন পূর্ববঙ্গের ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগনার হাঁসাড়া গ্রামে তাঁর জন্ম ১৩ মার্চ ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে। বাবা আশুতোষ ও মা সরযুবালায় কন্যা রানু সোম অল্পবয়সেই ঢাকার সংগীত জগতে খ্যাতি পেয়েছিলেন। হিজ মাস্টার্স ভয়েস তাঁর রেকর্ড প্রকাশ করেছিল, গানের জন্যেই নজরুল ইসলাম, দিলীপকুমার রায় আর রবীন্দ্রনাথের স্নেহের পাত্রী হয়ে ছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ বসুর মাধ্যমেই দিলীপকুমারের সঙ্গে পরিচয়, যিনি অবাক হয়েছিলেন ‘ঢাকার সেরা মানুষ’ বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে তাঁর তখনো আলাপ হয়নি জেনে। সেই আলাপ ক্রমে প্রণয়ের পথে পরিণয়ে পরিণতি পেয়েছিল ১৯৩৪-এর ১৯ জুলাই। *প্রগতি* পত্রিকায় ডাকযোগে তিনি কবিতা পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু সে লেখা মুদ্রিত হয়

নি কেন না ততদিনে তার প্রকাশ রহিত হয়েছিল। কিন্তু বিবাহের পরে যখন কবিতা পত্রিকা প্রকাশিত হল বুদ্ধদেব বসুর নেতৃত্বে, তখন তাতে সংগঠন পর্বে তিনি শুধু অন্যতম ভূমিকা গ্রহণ করেন নি, কবি হিসেবেও উপস্থিত হয়েছেন বেশ কয়েকবার। কিন্তু অচিরকালের মধ্যে গায়িকা রানু কিংবা কবি প্রতিভা প্রধান হয়ে উঠলেন তাঁর কথাসাহিত্যিক পরিচিতিতে। *পরিচয়* পত্রিকার থেকে ফেরত আসা গল্প ‘মাধবীর জন্য’ তাঁকে পরবর্তীকালে যথেষ্ট খ্যাতি দিয়েছিল। *মাধবীর জন্য*; *সুমিত্রার অপমৃত্যু*; *বিচিত্র হৃদয়* প্রভৃতি গল্পগ্রন্থের এবং *মনোলীনা*; *সেতুবন্ধ*; *মনের ময়ূর*; *সমুদ্র হৃদয়*; *ঘুমের পাখিরা*; *আলো আমার আলো*; *অতল জলের আহ্বান*; *বেলা অবেলার গান*; *পরশ পাখর বা সূর্যাস্তের রঙ* প্রভৃতি বহু উপন্যাস গ্রন্থের মধ্য দিয়ে তিনি পাঠক সমাজে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। কবিতাভবনের উদ্যোগে একসময় ‘ছোটোগল্প গ্রন্থমালা’ প্রকাশের যে পরিকল্পনা সংগঠিত হয়েছিল তাতে তিনিই ছিলেন প্রধান নেতৃত্বে। তিনি নাট্য বিষয়েও ঢাকা-জীবনের সময় থেকেই প্রবল উৎসাহ বোধ করেছেন। বুদ্ধদেব বসুর নাটক রচনার বিষয়ে প্রতিভা বসুর প্রেরণা অবিসংবাদিত। তাঁর স্মৃতিকথা মূলক রচনাগুলি বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে বিশেষভাবে জনপ্রিয় হয়েছিল, দু-খণ্ডে *স্মৃতি সততই সুখের*; *জীবনের জলছবি* এবং *ব্যক্তিত্ব বহুবর্ণে*। সাহিত্য জীবনের শেষ পর্বে *মহাভারতের মহারণে* শীর্ষক প্রবন্ধ গ্রন্থ তাঁর অনন্য সৃষ্টি। ছোটোদের জন্যও *যখন বেলা বারোটা*; *পুরীতে মারুতি*; এবং *সবচেয়ে যা বড়ো* প্রভৃতি গ্রন্থ লিখেছেন। তাঁর লেখা কাহিনির অনেকগুলিই চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়েছে। নিজের পালিত কুকুরের কামড়ের পর ভুল চিকিৎসায় তিনি তাঁর চলৎশক্তি হারিয়ে দীর্ঘদিন অসুস্থ ছিলেন। স্বামী বুদ্ধদেব এবং একমাত্র পুত্র শুদ্ধশীলের অকাল মৃত্যুতে তাঁর জীবনে অপারিসীম দুঃখের মধ্যেও আত্মশক্তি, মনোবল এবং যৌবনের প্রতি চির আকর্ষণের কোনো ঘাটতি হয় নি। সাহিত্য মহলে প্রবীণা হয়েও শেষ দিন পর্যন্ত নবীনের সংসর্গেই সুখ পেয়েছেন বেশি, একালের মহিলা লেখকদের সংগঠনে ‘হেড সই’ হতেও কুণ্ঠিত হন নি। লিখে উপার্জন করবার অহঙ্কারে গৌরব বোধ করতেন। আনন্দ পুরস্কারে সম্মানিত হন। গত বছর পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির সংবর্ধনা পেয়েছেন। তাঁর প্রয়াণে, বিশ শতকের বাংলা সাহিত্যের অতীত অধ্যায়ের একটি অংশে ছেদ পড়ল।



পরবর্তী সংখ্যাটির মুদ্রণ কাজ চলছে, দেখা যাক বিলম্বের অভিযোগ মুক্ত করে সেটি অন্তত যথাসময়ে প্রকাশ করতে পারা যায় কি না।

এই সংখ্যার বর্তমান শোকলিপি লেখার জন্য শ্রীঅরুণ সেন, শ্রীতারাপদ আচার্য, শ্রীশৌণক চক্রবর্তীর কাছে ঋণ স্বীকার করছি। উল্লেখ্য, একমাত্র শেষতম প্রবন্ধ লেখকের ইচ্ছানুসারেই পাণ্ডুলিপির বানান অবিকল রাখা হয়েছে।

লেখক পরিচিতি

অনুরাধা রায় (১৯৫৮-) বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রধান অধ্যাপক। প্রকাশিত গ্রন্থ :
চল্লিশের দশকের বাংলায় গণসংগীত আন্দোলন; সেকালের মার্কসীয় সংস্কৃতি আন্দোলন; গানের
মনুষ সংগ্রামের ঐতিহ্য; ন্যাশানালিজম এজ পোয়েটিক ডিসকোর্স ইন নাইন্টিছ সেঞ্চুরি।
সংকলিত সম্পাদিত : স্বাধীনতা সংগ্রামের গান ও কবিতা : বিংশ শতাব্দী।

অভয়চরণ দে (১৯২৯-) নৈহাটি মহেন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের
নৈহাটি শাখার সম্পাদক। প্রকাশিত গ্রন্থ : বঙ্কিমচন্দ্র মনীষী ও মানুষ; মনীষীদের বিচিত্র কথা;
কথায় কথায়। সম্পাদনা করেছেন প্রসঙ্গ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

আরুণগেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৫৩-) পরিবেশ বিদ, স্থপতি। প্রকাশিত গ্রন্থ : শান্তিনিকেতনের স্পাপত্য
পরিবেশ; রবীন্দ্রনাথের পরিবেশ ভাবনা; রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অরুন্ধতী সুর (১৯৬৬-) পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার দাঁতন ভট্টর কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক।
বর্তমানে বিশ শতকের প্রথমার্ধের মহিলা রচিত উপন্যাস বিষয়ে গবেষণা করছেন।

অশোক মুখোপাধ্যায় (১৯৩৮-) যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ও থ্রিষ্টিং
ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে শিক্ষকতা করেছেন। বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগের প্রাক্তন অধ্যক্ষ। অভিধান
সংকলন ও কম্পিউটারে বাংলা ভাষা ও হরফের চর্চায় বিশেষজ্ঞ। প্রকাশিত গ্রন্থ : সংসদ
সমার্থশব্দকোষ; সংসদ ব্যাকরণ অভিধান; সংসদ বানান অভিধান প্রভৃতি।

কল্যাণ চট্টোপাধ্যায় (১৯৩৭-) ইউনিভার্সিটি অব উইসকনসিন থেকে স্নাতকোত্তর, ইউরোপীয়
বেনেসাসের সাহিত্য বিষয়ে গবেষণা করে পিএইচ.ডি., ওই বিশ্ববিদ্যালয়েই শিক্ষকতার পর
বিশ্বভারতীতে এবং সবশেষে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে অধ্যাপনা করেছেন। প্রকাশিত
গ্রন্থ : জন কোলেট এজ এ হিউম্যানিস্ট এডুকেটর; ইংলিশ এডুকেশন ইন ইন্ডিয়া।

কেতকী কুশারী ডাইসন (১৯৪০-) কবি, প্রাবন্ধিক ও অনুবাদক। ইংবেজি সাহিত্যে কলকাতা ও
অক্সফোর্ড দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক; শেখোস্ত প্রতিষ্ঠান থেকে ডক্টরেট। প্রকাশিত প্রবন্ধগ্রন্থ :
রবীন্দ্রনাথ ও ডিক্টোরিয়া ওকাম্পোর সঙ্কলনে। সুশোভন অধিকারীর সঙ্গে যুগ্মভাবে লিখেছেন
রঙের রবীন্দ্রনাথ।

ত্রিপুরা বসু (১৯৪৭-) বিদ্যালয় শিক্ষক, সম্প্রতি অবসর নিয়েছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ.ডি।
প্রকাশিত গ্রন্থ : সাহিত্যসেবায় মেদিনীপুর; নথিপত্রে সেকালের সমাজ; বাংলা পাণ্ডুলিপি পরিক্রমা;
সুত্রধর শিল্প : দাসপুর।

নিত্যপ্রিয় ঘোষ (১৯৩৪-) সাহিত্য অকাদেমির ইংলিশ রাইটিংস অব রবীন্দ্রনাথ টেগোর গ্রন্থের সম্পাদনার
কাজ শেষ করেছেন, শীঘ্রই প্রকাশিত হবে। সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে রাধুর চিঠি কবির স্নেহ; স্নেহের
ভিখারি। মুখের কথা লেখার ভাষায় শীর্ষক রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা-প্রবন্ধাবলী (১ম খণ্ড) সংকলন
করেছেন।

প্রবাল দাশগুপ্ত (১৯৫৩-) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক; স্নাতকোত্তর এবং পিএইচ.ডি. নিউইয়র্ক
বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ইউনিভার্সিটি অব হায়দ্রাবাদ থেকে সম্প্রতি কলকাতায় আই এস আই

লিঙ্গুইস্টিক রিসার্চ ইউনিটে প্রফেসর পদে যোগ দিয়েছেন। প্রকাশিত গ্রন্থ : এসপেরাস্তো ভাষায় প্রিমিৎসো; ইংরেজিতে প্রজেক্টিভ সিনটাক্স; দ্য আদার নেম অব ইংলিশ এবং বাংলায় কথার ত্রিমাণকর্ম।

প্রবালকান্তি হাজরা (১৯৪৫-) 'রবীন্দ্রনাথের সমাজচিন্তা' বিষয়ে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ.ডি। আঞ্চলিক সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে স্থানীয় পত্র-পত্রিকায় অনেকদিন থেকেই প্রবন্ধ লিখছেন।

বীতশোক ভট্টাচার্য (১৯৫১-) কবি ও প্রাবন্ধিক। মেদিনীপুর কলেজের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের প্রধান অধ্যাপক। লোকনাথ ভট্টাচার্যর রচনাবলি সম্পাদনা করছেন খণ্ডে খণ্ডে। বর্তমান বছরে নতুন প্রবন্ধের বই : পূর্বাপর; গদ্যগঠন; কবিকর্ষ।

মলয় রক্ষিত (১৯৭৭-) বালুরঘাট মহিলা মহাবিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রবীন্দ্রনাথের রক্তকরবী-র পাণ্ডুলিপি বিষয়ে গবেষণা করে পিএইচ.ডি।

মৃণাল ঘোষ (১৯৪৪-) শিল্পকলা বিষয়ে লেখক ও সমালোচক। প্রকাশিত গ্রন্থ : এই সময়ের ছবি; গণেশ পাইনের ছবি; শিল্পের স্বদেশ ও বিশ্ব; সমকালীন ভাস্কর্য; বিশ শতকের ভারতের চিত্রকলা : আধুনিকতার বিবর্তন।

সুজিৎ ঘোষ (১৯৪৫-) বিধাননগর সরকারি মহাবিদ্যালয়ের বিভাগীয় প্রধান পদে কাজ করে অবসর নিয়েছেন। প্রকাশিত গ্রন্থ : শব্দের শিল্পী শঙ্খ ঘোষ; মানিকসাহিত্যে অবচেতন। সম্পাদিত গ্রন্থ : স্মৃতি ও সঞ্জয় বিষ্ণু দে; সাবিত্রী রায়ের স্বরলিপি।

সূতপা ভট্টাচার্য (১৯৪২-) বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপনা থেকে সম্প্রতি অবসর নিয়েছেন। প্রকাশিত গ্রন্থ : কবির চোখে কবি; সে নহি নহি; রূপ থেকে ভাবে; মেয়েলি পাঠ, মেয়েদের লেখালেখি; বাঙালি মেয়ের ভাবনামূলক গদ্য: উনিশ শতক; মেয়েলি সংলাপ।

সুনীল সাহা (১৯৬-) আকাশবাণীর অনুষ্ঠান প্রযোজক হিসেবে দীর্ঘকাল কাজ করে অবসর নিয়েছেন। ক্ষেত্র সমীক্ষা, অনুভব প্রতিফলন মূল লক্ষ্য হিসেবে স্থির করে লোকসংগীত, লোকনৃত্য, লোকনাটক বিষয়ে বহুদিন ধরে গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখেছেন। প্রকাশিত গ্রন্থ : মনসামঙ্গল পালা।

সুভাষ ভট্টাচার্য (১৯৩৯-) কাটোয়া কলেজের ইতিহাস বিভাগের প্রাক্তন রিডার। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির সদস্য। প্রকাশিত গ্রন্থ : ভাষা সাহিত্য রবীন্দ্রনাথ; তোমাদের রবীন্দ্রনাথ; কবিতার সহজপাঠ; বাংলা উচ্চারণ অভিধান; বাংলা ভাষার প্রয়োগ অভিধান; ভাষার গল্প; ভাষা ও শৈলী। শীঘ্রই প্রকাশিত হবে ইতিহাস অভিধান (১ম খণ্ড)।

সুমিতা চক্রবর্তী (১৯৪৬-) বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের কাজী নজরুল ইসলাম অধ্যাপক। রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত বাংলা কাব্য পরিচয় গ্রন্থের নতুন সংস্করণে তথ্য সংকলন ও ভূমিকা লিখেছেন। প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য: জীবনানন্দ সমাজ ও সমকাল; উপন্যাসের বর্ণমালা; ছোট্টো গল্পের বিষয় আশয়।

গত সংখ্যার সংযোজন :

সেরিনা জাহান (১৯৬৬-) বাজ্য সরকারের মুখপত্র পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকার সহকারী সম্পাদক। আন্তর্জাতিক সাংবাদিকতা নিয়ে মস্তোতে পড়তে গিয়েছিলেন। প্রকাশিত গ্রন্থ : ধূসর মস্তো; রোকেরা সাখাওয়াত হোসেন। বিজিতকুমার দত্ত রচিত তুসলী সাহিড়ী সম্পাদনা করেছেন।

যুগপৎ বাংলা কবিতা আর অনুবাদ

নিত্যপ্রিয় ঘোষ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'স্মুলিঙ্গ' কাব্যগ্রন্থের কথা উঠলেই মনে হয় স্বাক্ষরলিপিতে দেওয়া ছোটো ছোটো কবিতা বা ওই জাতীয় পদ্য। কবির মৃত্যুর পরে লেখন-এর পদ্য-জাতীয় কবির অগ্রস্থিত টুকরো টুকরো কবিতা বিশ্বভারতী সংকলিত করে ১৯৪৭ সালে 'স্মুলিঙ্গ' প্রকাশ করে। তবে, সংকলনের সব কবিতাই এক গোত্রের নয়। এমনই একটি স্বতন্ত্র চরিত্রের কবিতা গ্রন্থটির ১২৮-সংখ্যক কবিতা। কবিতাটি বিশ্বভারতীর রচনাবলী-২৭-এ ছাপা হয়েছে এইভাবে:

নূতন যুগের প্রভাষে কোন্
প্রবীণ বুদ্ধিমান
নিত্যই শুধু সূক্ষ্ম বিচার করে—
যাবার লগ্ন, চলার চিন্তা
নিঃশেষে করে দান
সংশয়ময় তলহীন গহ্বরে।

নির্বির যথা সংগ্রামে নামে
দুর্গম পর্বতে,
অচেনার মাঝে ঝাঁপ দিয়ে পড়
দুঃসাহসের পথে,
বিদ্রোহী তোর স্পর্ধিত প্রাণ
জাগায়ে তুলিবে যে রে—
জয় করি তবে জানিয়া লইবি
অজানা অদৃষ্টেরে।

বিশ্বভারতী সংস্করণের গ্রন্থপরিচয়ে বলা হয়েছে, এই 'কবিতাটির গীতিরূপ প্রচলিত গীতবিতানের প্রথম খণ্ড বা অখণ্ড গীতবিতান গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট।' কবিতাটির আরও একটু ইতিহাস আছে। *The Statesman* পত্রিকা ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে বাংলা নববর্ষ উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথের কাছে একটি কবিতা চায়। রবীন্দ্রনাথ এই কবিতাটি পাঠান, মূল বাংলা এবং তৎসহ ইংরেজি অনুবাদ। ১৪ এপ্রিল (১৯৩৭) পত্রিকাটি কবির হস্তলিখিত কবিতা আর অনুবাদটি ছাপে। সঙ্গে যে প্রতিলিপি ছাপা হলো, তা থেকেই বোঝা যাচ্ছে, কবির স্বহস্তে লেখা বাংলা কবিতাটির পংক্তিবিন্যাস 'স্মুলিঙ্গ'-গ্রন্থে অনুসৃত হয় নি। বিন্যাসের পরিবর্তন কবি করেছেন বলে মনে হয় না, কারণ 'স্মুলিঙ্গ' ছাপার সময় তিনি প্রয়াত।

The Statesman, Festival 2004 সংখ্যায় শুভেন্দু দাস মুন্সী 'The Poet of the Paper' নিবন্ধে অভিযোগ করেছেন, মূল বাংলা কবিতাটি এখনও কোনও রচনাবলীতে স্থান পায় নি। অভিযোগ যে সত্য নয়, বিশ্বভারতীর ২৭ খণ্ড (প্রথম প্রকাশ ২৫ বৈশাখ ১৩৭২, পুনর্মুদ্রণ আশ্বিন ১৩৮১) তার প্রমাণ। *শুফলিঙ্গ* বলেই হয়ত শুভেন্দুবাবুর নজর এড়িয়ে গেছে কবিতাটি। তাঁর অন্য অভিযোগ অবশ্য সত্য— শিশিরকুমার দাস-সম্পাদিত *The English Writings of Rabindranath Tagore*-এ ইংরেজি কবিতাটি নেই। যেমন সত্য আর একটি অভিযোগ, *রোগশয্যায়* গ্রন্থের ২২-সংখ্যক কবিতার কবি-কৃত ইংরেজি অনুবাদও *EWRT*-তে নেওয়া হয় নি। তবে, শুভেন্দুবাবু একথাটা ঠিক বলেন নি যে ২২-সংখ্যক কবিতাটি ১৫ ডিসেম্বর ১৯৪০-এ লেখা। *রোগশয্যায়* গ্রন্থের শেষ লেখা কবিতা ৫ ডিসেম্বর ১৯৪০-এ। ২২-সংখ্যক কবিতা লেখা ২৪ নভেম্বর ১৯৪০। *The Statesman* তার ক্রিসমাস সংখ্যার জন্য কবিতা চেয়েছিল, কবি ২২-সংখ্যক কবিতাটির অনুবাদ করেন ৬ ডিসেম্বর ১৯৪০ ছাপা হয় কাগজটির ২৫ ডিসেম্বর সংখ্যায়। অনুবাদটি ছাপার সময় সম্পাদক অবশ্য ভেবেছিলেন, কবি এটা তাঁদের জন্যই লিখেছেন ইংরেজিতে। কবিতাটি ছেপে সম্পাদক জানিয়েছিলেন, তাঁদের ক্রিসমাস সংখ্যায় কবিতা চাওয়ায় কবি তাঁদের জন্যই কবিতাটি লিখেছেন।

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কারণে কবি তাঁর কবিতার ইংরেজি অনুবাদ করতেন। 'নূতন যুগের প্রত্যুষে কোন্' কবিতাটির অনুবাদ করেছিলেন, ইংরেজি কাগজের জন্য। তবে এমনটাও হতে পারে, পত্রিকাটির থেকে নববর্ষের জন্য কবিতার অনুরোধ পাওয়ার পরে তাঁর মূল বাংলা কবিতাটির উৎসও ওই অনুরোধ। ইংরেজি-বাংলা কোন্ ভাষায় কবিতাটি তাঁর মনে এসেছিল, বলা মুশকিল। কবিতাটির ভাব এমন কিছু নতুন নয়, বহুদিন ধরেই এমন ভাবের কবিতা তিনি লিখে আসছেন— সেই পুরনো ভাবনাই, পুরনো কথাই, পুরনো চিত্রকল্পই একটু অদল-বদল করে পাঠালেন পত্রিকাটির জন্য।

একই দিনে বাংলা কবিতা এবং ইংরেজি অনুবাদ আবার করলেন ১২ ডিসেম্বর ১৯৪০। বাংলা কবিতাটি *জন্মদিনে*-এর ১৭-সংখ্যক কবিতা : 'সেই পুরাতন কালে ইতিহাস যবে আর তার অনুবাদ *That old day when history was not crowded with news*। এই কবিতার উৎস, ৯ ডিসেম্বর ১৯৪০-এ চীনের ব্যবস্থাপক সভা এবং পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সভাপতি তাই-চি-তাও-এর শান্তিনিকেতনে আসা। বিদেশি অতিথির বোঝার সুবিধার জন্যই সম্ভবত একই দিনে মূল বাংলা আর ইংরেজি অনুবাদ।

একই দিনে বাংলা এবং ইংরেজি অনুবাদ রবীন্দ্রনাথ আগেও করেছেন। *পরিশেষ* কাব্যগ্রন্থের তিনটি কবিতার অনুবাদ। কবিতাগুলো 'শ্রীবিজয়লক্ষ্মী', 'সিয়াম—প্রথম দর্শনে', 'সিয়াম—বিদায়কালে'। তিনটিই রচিত কবির ১৯২৭ সালে দূরপ্রাচ্য ভ্রমণ কালে। তিনটি অনুবাদই ছাপা হয় দি *বিশ্বভারতী কোয়ার্টারলি*-র অক্টোবর ১৯২৭ সংখ্যায়। ভ্রমণকালে তাঁকে বদ্ধতা দিতে হত ইংরেজিতে। সব সময় বদ্ধতা দিতে ভালো লাগত না, কবিতা পাঠও করতেন। সেইজন্যই হয়তো যুগপৎ বাংলা ও ইংরেজি কবিতা। 'শ্রীবিজয়লক্ষ্মী' রচনাকাল ২১ আগস্ট ১৯২৭, ইংরেজি অনুবাদও ২১ আগস্ট ১৯২৭, যেটা কোয়ার্টারলিতে উল্লেখ করা হয়েছে। অন্য দুটো কবিতার অনুবাদ-কাল *কোয়ার্টারলি*-তে বলা হয় নি— তবে অনুমান

করাই যেতে পারে ১১ এবং ১৭ অক্টোবর ১৯২৭ মূল বাংলা রচনার পরে সঙ্গে সঙ্গেই অনুবাদ করা হয়েছে, না হলে অক্টোবর ১৯২৭-এ কোয়ার্টারলি-তে বের করা কষ্ট হতো।

এই ইংরেজি অনুবাদগুলো এখনও পর্যন্ত কোনও গ্রন্থভুক্ত হয় নি, সাময়িকপত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। 'দূরপ্রাচ্য ভ্রমণের সময় রচিত 'বোরোবুদুর' কবিতাটির ইংরেজি অনুবাদ গৃহীত হয়েছে EWRT. তৃতীয় খণ্ডের পরিশিষ্টে, পরিশেষ-এর এই কবিতাটিও ২৩ সেপ্টেম্বর ১৯২৭ রচিত এবং একই দিনে অনূদিত; কোয়ার্টারলি-তে অনুবাদ-কাল নির্দিষ্ট হয়েছে।

নিজের কবিতা নিজেই অনুবাদ করছেন রবীন্দ্রনাথ, এতে আমাদের অনেকেরই একটু অস্বস্তি হয়। মনে হয় এটা আত্মপ্রচারেরই রকমফের। কিন্তু শেষের দিকে দায়ে পড়েই তাঁকে নিজের কবিতা অনুবাদ করতে হতো, অনুবাদের প্রাসঙ্গিক ইতিহাস জানলে অস্বস্তি কিছুটা কাটে।

রাগী যুবক রবীন্দ্রনাথ

সূতপা ভট্টাচার্য

বাবেক চেয়েদেখো আমার মুখপানে—

উঠেছে মাথা মোব মেঘেব মাঝখানে

রবীন্দ্রনাথের যে-ছবিটি আমাদের মানসচোখে ভেসে আসে, সেটি তাঁর পরিণত বয়সের—
আপাদলস্থিত জোবা, দীর্ঘ শুভ্র শ্মশ্রুশোভিত মুখমণ্ডল, ঈষৎ নুয়ে-পড়া দেহ। কিন্তু এই
মানুষটিরও একদিন কম বয়স ছিল। বাল্য থেকে তারুণ্য, তারপব যৌবনবেদনারসে উচ্ছলিত
দিন— এক মানুষের মধ্যে কত না মানুষের ছবি জমানো থাকে! কত না তার বৈচিত্র্য!
শাস্তিনিকেতনের পথেঘাটে রবীন্দ্রমূর্তির ঢালাও বিক্রি দেখতে দেখতে বারবার ভেবেছি, কেন
একটিই মূর্তি বাজারে বিকোয়? রবীন্দ্রনাথ কি শুধুই এমন মসৃণ অবয়ব, শুধুই শান্তির
প্রতিরূপ? তাঁর মধ্যে কি লুকিয়ে ছিল না এক রাগী যুবক?

লুকানো নয়, খুব প্রকাশ্যেই ছিলেন সেই রাগী যুবক তাঁর তরুণ বয়সের গদ্য লেখায়।
রাগী না হয়ে সেই যুবকটির উপায়ই বা কী ছিল! যেন মনে হয় বিশাল ডানা নিয়ে এক
পাখি উড়ান চাইছে, কিন্তু কোথায় সে উড়বে? বড়ো সংকীর্ণ আকাশ, তায় জলীয় বাষ্পের
ভার! উড়তে না পেরে ক্রোধে অধীর হয়ে উঠছে সেই পাখি, উড়ানেই যে তার আত্মপরিচয়।
ভাবতে আশ্চর্য লাগে, কত কম বয়সেই নিজেই ঐকান্ত্য সম্বন্ধে নিঃসংশয় হতে পেরেছিলেন
সেই মহান বালক! নিঃসংশয়, কিন্তু নিরুদ্বেগ নন। উদ্বেগ প্রতিকূল সাহিত্য-বাতাবরণ নিয়ে,
প্রতিকূল সমাজপরিবেশ নিয়ে, পারিবারিক ক্ষমতা-চাপ নিয়ে, অনুকূল সাহিত্যসঙ্গী না থাকা
নিয়ে। সেই উদ্বেগ, ঐকান্ত্যের সেই বয়ঃসন্ধি-সংকট নিয়ে আলোচনা করেছেন মনোবিজ্ঞানী
এরিকসন, তাঁর *Identity, Youth and Crisis* নামে বইতে:

..it is the ideological potential of a society which speaks most
clearly to the adolescent who is so eager to be affirmed by peers,
to be confirmed by teachers and to be inspired by worthwhile
'ways of life'.³

বয়ঃসন্ধির সেই বালকটির সমাজপরিবেশে সেই ideological potential ছিল না। যদিও
নিজের পরিবারে তিনি পেয়েছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কিংবা কাদম্বরীর মতো গুণগ্রাহী, তবু
সেই অলোকসামান্য প্রতিভা দেশীয় পাঠকমহলে নিজের মূল্যায়ন নিয়ে যথেষ্ট উদ্বিগ্ন
ছিলেন। 'কবি যখন আপনার গুণ বুঝিতে পারিতেছেন ও জগৎ যখন তাঁহার গুণের সমাদর
করিতেছে না, তখন তাঁহার কি কষ্ট'^২— বালককবি চ্যাটার্টন প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এই
খেদোক্তি তো প্রকৃতপক্ষে তাঁর নিজেরই কথা।

এই ‘কষ্ট’, ঐকান্ত্য বিষয়ে এই সংকটবোধ থেকেই উঠে আসে উগ্র এক মনোভাব, এক আক্রমণাত্মক ভঙ্গি, যা প্রায় যেন আকস্মিক প্রাণ-বাঁচানোর লড়াই-এ নামা জন্তুর বন্য প্রতিরোধস্পৃহারই তুল্য, অন্তত এরকমই ভেবেছিলেন এরিকসন।^৭ তিনি দেখেছিলেন, সে উগ্রতা তখনই দেখা দেয়, যখন কোনো তরুণ অনুভব করে যে তার পরিপার্শ্ব তাকে সবরকম আত্মপ্রকাশের পথেই বাধা দিচ্ছে— তার বিকাশ ও স্বস্থতার জন্যে যে প্রকাশ একান্তই প্রয়োজনীয়। সে উগ্রতা সে ক্রোধ সদ্যোতরুণ রবীন্দ্রনাথের বেশ কিছু লেখায় ফুটে উঠেছে। পরিণত বয়সে নিজেই লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ :

ক্ষেত্রে প্রথম দেখা দিল কাঁটা গাছ, চাষ না-করা জমিতে। বিশ্বকে খোঁচা মেবে আপন অস্তিত্ব প্রমাণ করবার সেই ঔদ্ধত্য। হবিণ-বালকের প্রথম শিং উঠলে তার যে চাল হয় সেই উগ্রচাল কৈশোরের। বালক আপন বাল্যসীমা পৈবোবাব সময় সীমা লঙ্ঘন করতে চায় দাফ দিয়ে। তার পরিচয় শুরু হযেছিল মেঘনাদ বধ কাব্যের আলোচনা যখন লিখেছিলাম পনেরো বছর বয়সে। এই সময়েই যাত্রা করেছি বিলেতে। চিঠি যেগুলো লিখেছিলাম তাতে খাঁটি সত্য বলার চেয়ে খাঁটি স্পর্ধা প্রকাশ পেয়েছে প্রবল বেগে।^৮

মেঘনাদবধ কাব্য-এর সমালোচনা করেছিলেন তরুণ রবীন্দ্রনাথ ভারতী পত্রিকায়, ছয় কিস্তিতে (১২৮৪)। সে সমালোচনা যে ‘বালকসুলভ স্পর্ধা’ নিয়ে লেখা, ‘দান্তিক’ লেখা, একথা লেখক নিজেই ভিন্ন ভিন্ন সময় বলেছেন। তাঁর সমালোচনার সমালোচনা করেছিলেন যোগীন্দ্রনাথ তর্কচূড়ামণি, তিনিও উল্লেখ করেছেন এ সমালোচনা রচিত হয়েছে ‘অতি রাগ ও রুষ্প spirit-এ’।^৯ এই রাগের ‘spirit’ পূর্বসূরির প্রভাবের উদ্বেগজনিত নয়। মেঘনাদ বধ-এর জনপ্রিয়তাই তাঁর ক্রোধের কারণ। এ কাব্য তাঁর পূর্বপক্ষ নয়, প্রতিপক্ষ। এ কাব্য যাঁদের কাছে প্রিয়, সেই পাঠকদের প্রতি তাই তাঁর রাগ, আর তা প্রকাশ করতে জন্তু-প্রতিমা প্রয়োগ করতে হয় তাঁকে : ‘জনপ্রিয় গ্রন্থের নিরপেক্ষ সমালোচনা করিলেই তাহা ন্যায্য হউক বা অন্যায় হউক, পাঠকেরা অমনি ফণা ধরিয়া উঠেন’।^{১০}

১২৮৪ সালের মেঘনাদবধ সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথের ঐকান্ত্য-প্রতিষ্ঠার ব্যগ্রতার অন্য একটি দিকও আছে। মধুসূদনের ‘রাবণ’ চরিত্রচিত্রণকে গিন্দাযোগ্য মনে করেছেন রবীন্দ্রনাথ রাবণের লিঙ্গভূমিকার যথাযথতা নিয়ে, তাঁর প্রতিকূলতার পূর্বাগর যুক্তি হয়— ‘রাবণকে তিনি মহান চরিত্রের আদর্শ করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাকে স্ত্রীপ্রকৃতির প্রতিমা করিয়া তুলিয়াছেন।’^{১১} যে সুকুমার বালকটিকে ছদ্মবেশী বালিকা বলে বিশ্বাস উপাদান করা সহজেই সম্ভব হয়েছিল ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদের, তাঁর পৌরুষ-প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়ায় প্রয়োজন ছিল এই তিরস্কারের। আপন লিঙ্গ-ভূমিকার অহংকার কীভাবে বয়ঃসন্ধির তরুণটির কলমে আক্রমণাত্মক ভাষা যুগিয়েছিল তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যায় :

ক ইহা পড়িলেই আমাদের মনে হয় গালে হাত দিয়া একটি বিধবা স্ত্রীলোক কাঁদিতোছেন।

খ [রাবণকে] এরূপ বালিকাটির ন্যায় কাঁদাইতে বসানো অতি ক্ষুদ্র কবির উপযুক্ত।

গ [সভাশুদ্ধ সকলের কামাদৃশ্য দেখে] আমাদের মনে হইল আমি একরাশি স্ত্রীলোকের মধ্যে বসিয়া পড়িলাম।

ঘ [ইন্দ্রজিতের মৃত্যু বর্ণনা] বায়ুবলচ্ছিন্ন কিংশুক ফুলটির মতো মৃত মহাবীর মেঘনাদ

পড়িয়া আছেন, ইহা সমুচিত তুলনা হইল না। একটি মৃত বালিকাব দেহ দেখিয়া তুমি ওইরূপ বলিতে পারিতে।

৩ ইহাতেও রাবণ যে স্ত্রীলোক সেই স্ত্রীলোকই বহিলেন।

পৌরুষ-অহংকারের পাশাপাশি নিজের সৌন্দর্য এবং অভিজাত্য নিয়েও কি এ তরুণটির গর্ববোধ ছিল না? এই অহংকার, নিজের এই পৃথকত্বের বোধ তো ঐকাত্ম্যজনিত উদ্বেগেরই আরেক দিক। এই পৃথকত্বের বোধ থেকেই *যুরোপ-প্রবাসীর পত্র*-এর কোথাও কোথাও মানুষকে বর্ণনা করা হয়েছে ঐকান্তিক বিরক্তির সঙ্গে, সরাসরি ক্রোধ না বলা গেলেও তারই আনুষঙ্গিক এক মনোভাব:

১ এক-এক জন কোনো অপরাধ না করলেও তার মুখশ্রী যেন সর্বদা অপবিত্র করতে যাবে।
...তালবৃক্ষের মতো শবীব, ঝাঁটার মতো গোঁফ, সজ্জার কাঁটার মতো চুল, হাঁড়ির মতো মুখ, মাছের চোখের মতো ম্যাড়ম্যাড়ে চোখ।

২ মানুষের 'divine' মুখশ্রী কতদূর পৃথকত্বের দিকে নাচতে পারে তা সেই নৌকোর মাঝিটার মুখ দেখলে জানতে পাববে। তাব চোখ দুটো যেন বাঘের মতো কালো কুচকুচে রং, কপাল নিচু, ঠোট পুরু, সবগুণ্ড মুখের ভাব অতি ভয়ানক।

মানুষ থেকে মানুষের অবয়বকে এরকম টুকরো করে দেখার মধ্যে একধরনের নিষ্ঠুরতা আছে, তার মূল নিজের শ্রেষ্ঠতার বোধ, সেই বোধ থেকে ভিন্ন শ্রেণির মানুষের সম্বন্ধে অসহিষ্ণুতাও। ভিন্ন শ্রেণির ভিন্নতার চিহ্ন-নানারকম হতে পারে, হয়তো বা গায়ের রঙ, হয়তো বা পোশাক, হয়তো বা অঙ্গভঙ্গি, হয়তো বা জাতিবর্ণ। এই ধরনের অসহিষ্ণুতা, এরিকসন বলবেন, ঐকাত্ম্য হারানোর আশঙ্কা থেকে জেগে-ওঠা প্রতিরোধ-কৌশল। ভিন্নতার বিপরীতে থাকে একাত্মতা—পরিবারের সঙ্গে সমাজের সঙ্গে। কিন্তু সেই অলোকসামান্য প্রতিভা তাঁর পরিবার বা সমাজের থেকেও কি পৃথকতা অনুভব করত না? সামাজিক কৃত্রিমতায় পীড়িত ব্যক্তিত্বের আত্মবিশ্বাসের বোধ জেগে উঠেছিল 'সামুদ্রা' নামে প্রবন্ধটিতে। সে কৃত্রিমতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জেগে উঠেছিল তাঁর মনে:

যেমন চিঠিতে মানবর, পরম পূজনীয়, প্রাণাধিক প্রভৃতি সম্বোধন পড়বার সময় আমরা চোখ বুলাইয়া যাই মাত্র, তখন মনে একতিলও বিশ্বাস হয় না যে, যিনি আমাকে লিখিতেছেন তিনি আমাকে সর্বাপেক্ষা মান্য করেন বা আমাকে পরম পূজা করিয়া থাকেন, বা আমি তাহাব প্রাণেরো অধিক, অতীতকালের শিবোনামা-স্রষ্টার উহা আমাদের ববান্দ করিয়া দিয়াছেন মাত্র; তেমনি উহাবা আমাকে যখন জিজ্ঞাসা করিতে আসে, তখন বেশ বুঝিতে পারি যে আমাকে মমতা করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছে না, জিজ্ঞাসা করিতে হয় বলিয়া কবিত্তেছে ...।

সমাজের এই চাপ, ঠাকুরবাড়ির মতো একটি পরিবারে যা অনেকাংশে পারিবারিক চাপ, তারই বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সোচ্চার ছিল *যুরোপ-প্রবাসীর পত্র*। লক্ষ করার বিষয়, এই পত্রগুলিতে স্ত্রী-স্বাধীনতার কথা তিনি ততটা সামাজিক পরিধিতে নিয়ে আসেন না, পারিবারিকতার সীমারেই তা নিবদ্ধ থাকে। ভারতী-সম্পাদক এবং তাঁর বড়দাদাও যিনি, তাঁর সঙ্গে বিতর্কও চিনিয়ে দেয় পারিবারিক চাপের বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদ। দেশে ফিরে 'পারিবারিক দাসত্ব' নামে প্রবন্ধে আবারও তাঁকে সেই বিদ্রোহকেই সূত্রবদ্ধ করতে হয়—

সে লেখায় রাগের ঝাঁঝ লক্ষ করার মতো : ‘যাঁহাদের স্বাভাবিক স্বাধীনতার ভাব আছে, আমাদের দেশের পরিবারের মধ্যে জন্মাইলে রুদ্ধ বায়ুতে তাঁহাদের হাঁপাইয়া উঠিতে হয়। ...অনেক গুরুজন গুরুজনের আর কোনো কর্তব্য সাধন করেন না, কেবল আজ্ঞা করিবার ও মারিবার ধরিবার সময়েই তাঁহারা সহসা গুরুজন হইয়া উঠেন। তাঁহারা ‘হ্যারে’ করিয়া উঠিলেই ছেলেপিলেগুলার মাথায় বজ্র ভাঙ্গিয়া পড়ে।’ এমনকি রবীন্দ্রনাথের মতে স্বাধীনতা-আন্দোলনও আমাদের নিষ্ফল, যদি ‘পারিবারিক দাসত্ব’ দাসমনোবৃত্তিতেই আমাদের প্রোথিত রাখে, এবং সে মত এখানে রীতিমতো আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে প্রকাশ পেয়েছে। ‘পারিবারিক দাসত্ব’ প্রবন্ধটির সঙ্গেও ‘ভারতী-সম্পাদকের প্রতিবাদী নোট ছাপতে হয় বলে রবীন্দ্রনাথের উপর তাঁর পরিবারের চাপ প্রমাণিত হয়ে যায়।’^{১১}

২

আমি নাবব মহাকাব্য সংরচনে / ছিল মনে..

কল্পনাটি গেল ফাটি / হাজার গীতে

ঐকান্ত্য প্রতিরক্ষার তাগিদ থেকেই তখনকার প্রচলিত জনপ্রিয় সাহিত্যতত্ত্ব, সাহিত্যিক রুচিকে তিনি ক্রমাগত আক্রমণ করে গেছেন। মাত্র পনেরো বছর বয়সে লেখা পুস্তক সমালোচনাটিতেই^{১২} দেখা যাবে মহাকাব্য আর গীতিকাব্যের তুলনা, মহাকাব্যই তখন সমাদর পেতো, অথচ বালকবয়স থেকেই বুঝেছিলেন রবীন্দ্রনাথ এ পথ তাঁর নয়, মহাকাব্য ‘পরের জন্য’ রচনা করা হয় কিন্তু তিনি চাইছিলেন আত্মজগতের উন্মোচন, মহাকাব্যের তুলনায় নিজের জন্য রচিত গীতিকাব্য পাঠককে প্রভাবিত করতে পারে বলেই তাঁর বিশ্বাস— ‘যখন অগ্নিশেলের ন্যায় আমাদের হৃদয় ফাটিয়া অগ্নিরাশি উদ্গীরিত হইতে থাকে, তখন সেই অগ্নি আর্দ্র কাষ্ঠও জ্বলাইয়া দেয়।’ কিন্তু কেন তাঁর কলমে আত্মজগতির উদ্গীরিত ‘অগ্নিরাশির’ই উপমা উঠে আসে, উঠে আসে হৃদয় ফাটিয়া-র মতো ক্রিয়াপদ? তাঁর মূলে কি নেই বাধাপ্রাপ্ত আত্মপ্রকাশের অধীরতা? মহাকাব্য বনাম গীতিকাব্য, বস্তুগত কবিতা বনাম ভাবগত কবিতা, সম্পষ্ট কাব্য বনাম অসম্পষ্ট কাব্য— এরকম কত না অভিধা দিয়ে তাঁর সাহিত্যিক প্রতিপক্ষের বিপরীতে আত্মপ্রক্ষের প্রতিষ্ঠা দিতে প্রয়াস করছিলেন সেই তরুণ। প্রক্ষোভমুক্ত ছিল না সেই প্রয়াস, তার আক্রমণাত্মক ভঙ্গি স্থির করে দিচ্ছিল ভাষা-প্রয়োগ। তৎকালীন বাংলা সাহিত্যকে তাঁর মনে হচ্ছিল ‘উদামহীন আকাশকাহীন, প্রাণহীন, ছিন্নপক্ষ সাহিত্য।’ ‘আলস্য ও সাহিত্য’^{১৩} নামে সেই প্রবন্ধে তিনি ধিক্কার দেন বাজলির অলস কল্পনাবৃত্তিকে, ধিক্কার দেন বর্ণনার ক্ষেত্রে আমাদের আকার-আয়তনের মাত্রাহীনতাকে, যার ফলে ‘বলা নাই কথা নাই সুন্দর হঠাৎ কদর্য হইয়া উঠে। সুন্দরীর দেহ সুমেরু ডমরু মেদিনী-গুধিনী— শূকচক্ষু কদলী হস্তিশূণ্ড প্রভৃতির বিষয় সহযোগে গঠিত হইয়া রাক্ষসীমূর্তি গ্রহণ করে।’ প্রচলিত দেশীয় অলংকারবিধিকে এমন তীব্র ভাষাতেই তাঁকে আক্রমণ করতে হয়। প্রাচীন বাংলা কাব্যে তিনি দেখেন কল্পনা যেন ‘অস্তরপুরবদ্ধ’, খুব অল্প আয়তনে তার বিহার ‘পর্বতে, সমুদ্রে, তারাময় আকাশে, জ্যোৎস্নায় পুষ্পবনে’ যে কল্পনার বিচরণ করা উচিত, ‘জমিদারির কাচারিতে’ তা শোভা পায়

না। স্বভাবতই মঙ্গলকাব্যগুলি তাঁর আক্রমণের-লক্ষ্য হয়ে ওঠে। প্রাচীন কবিরা ‘দেশজ’ বলেই যে তাঁদের আঁচল ধরে বসে থাকতে হবে, তার কী মানে— প্রশ্ন তোলেন অধীর সেই তরুণ, বেশ প্রখর ভাষাতেই তিনি বলেন : “‘দেশ কাল পাত্র’ কথাটাই একটা এতকান্ত ভাঙা কুলা— উহার উপর দিয়া অনেক ছাই ফেলা গিয়াছে।” মুকুন্দরামের ‘ফুল্লরার বারমাস্য’র ‘আমানি খাবার গর্ত দেখ বিদ্যমান’ পংক্তিটি তাঁর বিদ্রূপের বিষয় হয় : ‘ইহার মধ্যে অনেকখানি আমানি আছে, কিন্তু কবির অশ্রুজল নাই। ...ইহা কাব্যও নহে কাব্যিও নহে, একে কেউ বলতে পারে ‘কাব্য’।” ‘কাব্য : স্পষ্ট এবং অস্পষ্ট’^৭ প্রবন্ধ থেকে এই উদ্ধৃতি। প্রাচীন দেশজ কবিতা থেকে অবশ্য তিনি অস্পষ্টকাব্যেরও দৃষ্টান্ত খুঁজে পান। বৈষ্ণব পদাবলীতে তো তার অজস্র নিদর্শন আছে। সেক্ষেত্রে তাঁর বিদ্রূপবান নিষ্কিণ্ড হয় তখনকার পাঠককুলের প্রতি, ‘সখি, এ ভরা বাদর, মাহ ভাদর/শূন্য মন্দির মোর’— অস্পষ্ট কাব্যের অন্যতম নিদর্শন এই পংক্তিটি বাঙালি পাঠক এমনি পছন্দ করবে না, ভাবটিকে ফেনিয়ে ফুলিয়ে, তার মধ্যে ‘ধড়ফড় ছটফট বিষ ছুরি এবং দড়ি-কলসি’ লাগিয়ে তাকে ‘যথেষ্ট পরিস্ফুট, যথেষ্ট স্পষ্ট’ করে তুলতে চাইবে, নাহলে নাকি এ পংক্তি তাদের ‘ধুঁয়া এবং ছায়া এবং কাব্য’ বলে তৈরকবে। শুধু এইটুকু বলেই রাগ ক্ষান্ত হয় নি তাঁর, আরো তীব্র ভাষা বলসে ওঠে : ‘যাঁহারা কাব্যের সৌরভ ও মধু-উপভোগে অক্ষম তাঁহারা ব্যয়রণের ‘জ্বলন্ত’ চুম্বিতে হাঁক-ডাক কাল-মসলা ও খরতর ভাষার ঘণ্টা পাকাইয়া খাইবেন।’ টেনিসনের ‘ডি-প্রোফগুস’^৮ কবিতাটি নিয়ে আলোচনা-সূত্রে বাংলা সাহিত্যের পাঠকসমাজকে প্রায় যেন গালাগালির ভাষাতেই আক্রমণ করেন এই তরুণ, বলেন— এই পাঠকেরা যেন দৈত্যকে পর্বত বললে দৈত্যের যন্তিকে শালবৃক্ষ বললে ‘মহানভাবে হাঁ করিয়া’ থাকেন, এঁরা এমন কবিতার মহান ভাব উপলব্ধি করতে সক্ষম নন, এঁরা বস্তুগত মহান ভাব বোঝেন কিন্তু বস্তুর অতীত মহান ভাব বোঝেন না।

বিষ, ছুরি, দড়ি-কলসি— এইরকম কয়েকটি প্রতীক বারবার উঠে আসে তরুণ রবীন্দ্রনাথের কলমে, বাঙালি কবি অথবা পাঠকের প্রবণতা ব্যক্ত করার সূত্রে। *মেঘনাদবধ কাব্য*-এর অন্য একটি সমালোচনায়^৯ এই প্রতীকগুলির ব্যবহার আছে : ‘অনেকসময় সেমিকোলনে যতটা ট্রাজেডি থাকে দাঁড়িতে ততটা থাকে না। কিন্তু যাঁহারা না বুঝিয়া ট্রাজেডি লিখিতে যান তাঁহারা কাব্যের আরম্ভ হইতেই বিষ ফরমাস দেন, ছুরি শানাতে থাকেন ও চিতা সাজাইতে শুরু করেন।’ ‘বাঙালি কবি নয় কেন’^{১০}— এই নামের প্রবন্ধটিতে শিরোনামের প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে এই প্রতীকগুলি ব্যবহৃত হতে দেখি : ‘আন বিষ, আর ছুরি, ঢাল মদ’— এমন একটা প্রকাণ্ড কাণ্ড না হলে নাকি বাঙালি হৃদয়ে কোনো আবেদনই সৃষ্টি হয় না। ‘চৈচিয়ে বলা’^{১১} প্রবন্ধটি মূলত তখনকার বস্তু-সর্বস্ব রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রতি ত্রুদ্ব আক্রমণ, কিন্তু সেই সূত্রে সাহিত্যিক প্রতিপক্ষকেও আক্রমণ করতে ছাড়েন নি রবীন্দ্রনাথ আর তার মধ্যেও সেই একই প্রতীক উঠে এসেছে— আমাদের সাহিত্যে আহ্বাদ ব্যক্ত করতে হলে নাকি ‘বাজ বাঁশি, বাজ কাঁসি, বাজ ঢাক, বাজ ঢোল, বাজ ঢেঁকি, বাজ কুলো’— এসব আরম্ভ হয়ে যায়। আর দুঃখ ব্যক্ত করতে হলে ‘ছুরি, ছোরা, দড়ি, কলসি, বিষ, আগুন, হাঁসফাঁস, ধড়ফড়, ছটফট’— এইসব বিপর্যয় ব্যাপার উপস্থিত হয়। রবীন্দ্রনাথ কবিতায় ব্যক্ত করতে চান, উপভোগ করতে চান— ‘প্রশান্ত বিবাদ, প্রশান্ত ভাবনা’— কিন্তু বাংলা কবিতায় তিনি

দেখতে পান ‘কেবল কোলাহল, কেবল ফেনিলতা, উন্মত্ত আশ্ফালন, অসম্বন্ধ প্রলাপ, আর বাঁচি না, আর সহে না, আর পারি না’ গেছের ছটফটানি। আর আছে বীররসের আধিক্য, সাহিত্য উপভোক্তাবা বীররসই চান, ‘বঙ্গসাহিত্যের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ’কে এঁরা ভয় পান, ‘ইহাবা চান বঙ্গসাহিত্য কেবলমাত্র দাঁত ও নখের চর্চা করিতে থাকুন আর কিছু নয়।’ বীররস, তিনি দেখেন যে, বাংলাসাহিত্যে একটা ‘ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে।’ ‘জিহ্বা আশ্ফালন’^{২০} নামে একটি প্রবন্ধ থেকে এই উদ্ধৃতি। বাঙালি সমাজে যারা জিহ্বা আশ্ফালন করতেই ভালোবাসে, তারা সাহিত্যেও লড়াই দেখতেই চান, চান সবাই যেন ‘লড়াইয়ের গান গায়, লড়াইয়ের কবিতা লেখে, মুখের কথায় যতগুলো রাজা ও যতগুলো উজ্জীর মারা সম্ভব সবগুলোকে মারিয়া ফেলে। যেন বঙ্গসাহিত্যের প্রতি ছত্রে বাকদের গন্ধ থাকে...।’

৩

মাথায় ছোট বহবে বড় বাঙালি সন্তান

সাহিত্যিক প্রতিপক্ষের সূত্রেই খাসে সাহিত্য-পরিবেশের কথা— দেশের কথা, সমাজের কথা। বিরাট সেই প্রতিভা যে বিকশিত হবে, কোথায় তার উপযুক্ত পটভূমি? কাদের কাছে ঘটবে সে বিকাশ? উদীয়মান সূর্যের মতো সেই তরুণটি দেখে এই দেশে সূর্যাতপে বসিয়া ঘুমন্ত বিমগ্ন স্বপ্নস্ত জীবন^{২১} বহন করছি আমরা। অসীম বিরক্তিতে ব্যাকরণ নস্যাৎ করে তাঁর কলমে ‘স্বপ্নস্ত’র মতো শব্দও উঠে আসে! তিনি দেখেন, বাঙালির পাবিপার্শ্বই যেন গভীর কল্লনাব পবিপত্নী, এ পোড়া দেশে কাজকর্ম নেই, অদৃষ্টের সঙ্গে সংগ্রাম নেই, কেবল আলস্যের হাইতোলা আছে, আছে ইন্দ্রিয়পরতা, বিলাস, ফুল মোজা, কালাপেড়ে ধুতি, ফিনফিনে জামা পরে বুকে চাদর বেঁধে পান খেয়ে ঠোঁট রাঙিয়ে রাত জেগে চোখ রাঙিয়ে গুড়গুড়ি টানা। এই হল বাংলাব যুবসমাজ! উনিশ শতকের কলকাতাব বাবু-কালচারকেই শুধু দেখতে পাচ্ছেন এই তরুণ, ‘বাঙালি’ বলতে বিশেষ এই দলটিই তাঁব সমালোচনার লক্ষ্য, তাদের আলস্য তাঁর সমালোচনার লক্ষ্য! কখনো তিনি এমনও বলেন— বাঙালি নিমন্ত্ৰণ রক্ষা করতে যায় শুধু আহারের লোভে, নাহলে সে ‘এত পবিত্রম করিবে কেন।’^{২২} তাকিয়া ত্যাগ করে হাই-তোলা কাজ কামাই করে পরের বাড়ি কেনই বা সে যাবে!

বাঙালি সমাজের প্রতি তাঁর তীব্র শ্লেষাত্মক মনোভঙ্গি ফুটে ওঠে নানা প্রসঙ্গসূত্রে, তাব মধ্যে প্রধান সম্ভবত বাঙালিব দেশহিতৈষিতা, স্বদেশানুরাগ। বাঙালির স্বদেশানুরাগেব মধ্যে কোনো ঋতিন কর্তব্য পালনের ‘নাম নেই’— কেবল বঙ্গসমাজ ঘিরে কানের কাছে তুরি ভেরী জগন্ম্প বাজানো, কেবল ‘চুলিতে দেখিলেই পরস্পর পরস্পরকে খোঁচা মারো এবং ‘উঠ উঠ,’ ‘জাগো জাগো’”^{২৩} বলে অস্থির কবে তোলা। কেউ যদি বাঙালি বিষয়ে কোনো অপ্রিয় কথা বলে, অমনি ‘আদুরে স্বদেশানুরাগ’ ফুলে ফেঁপে কেঁদে-কেটে ‘মুষ্টি উত্তোলন’ করে অনর্থ করে, আব তার ‘মাতৃস্বসা, পিতৃস্বসা, মাতুলানী পিতৃব্যানী’ সবই ছুটে এসে ছেলেকে কোলে তুলে নেয় আর তার ‘চিরন্তন আদরের ডাক’ ডেকে তাকে সাহুনা দেয়। বাঙালি বিষয়ে এতটাই আতিশয্যময় শ্লেষোক্তি বুঝিয়ে দেয় তাঁব প্রতিক্রিয়া। বাঙালির

দাসমনোভাবকে তীব্র আক্রমণ করেন তিনি 'জুতা ব্যবস্থা'^{২৪} প্রবন্ধে, সেখানেও আতিশয্য কম নেই। বাঙালিরা নাকি কে ক ঘা 'জুতো খায়', তাই নিয়ে গর্ব করে বেড়ায়। এমনকি কেউ যদি বরাদ্দ আড়াইশো ঘা জুতো থেকে সাত ঘা কম খায়, তাহলে তাই নিয়ে মামলা করে! লেখা শেষ হচ্ছে এক অসামান্য আশীর্বচন নিয়ে : 'পুত্রপৌত্রানুক্রমে গবর্ণমেন্টের জুতা ভোগ করিতে থেকো, আমার মাথায় যত চুল আছে তত জুতা তোমার ব্যবস্থা হউক।'

বাঙালি বিষয়ে তাঁর একান্ত বীতশ্রুতি প্রায় গালমন্দর পর্যায়ে চলে যায় তখন, যখন নানাবিধ জন্তুপ্রতিমা প্রয়োগ করে বাঙালির চরিত্র বর্ণনা করেন ঐ রাগী যুবকটি। 'চৈচিয়ে-বলা' কিংবা 'জিহ্বা-আস্ফালন'-এর মতো শিরোনাম জানিয়ে দেয় তাঁর আক্রমণের লক্ষ্য বাঙালির বদ্ধতা-প্রিয়তা, সেই চিৎকৃত শব্দাবলি শুনে শুনে তাঁর মনে হয়েছে বঙ্গসমাজে চৈচানোটাই চলিত হয়ে গেছে, (চৈচিয়া বলা) আর তাই পাখিদের মধ্যে যেমন কাক, পশুদের মধ্যে যেমন শৃগাল, মানুষের মধ্যে তেমনই বাঙালি সমাজই শ্রেষ্ঠ! বাঙালির 'Independent spirit' নাকি গুঁয়োপোকাকার মতো কণ্টকিত করে রাখে তাকে। না, শুধু একটি গাল দিয়েই ক্ষান্ত হয় না তাঁর রাগ, পরক্ষণেই তিনি আনেন সজ্জাকর প্রতিমা, বাঙালি নাকি সজ্জাকর মতো সর্বদাই চারিদিকে 'কাঁটা উচিয়ে' ঘুরে বেড়ায়, পাছে এদের কেউ অপমান করে। তারপর আরো আরো জন্তুপ্রতিমা আসতে থাকে লেখাটিতে। বাঙালি নাকি 'বৃহৎ লাঙ্গুল' আস্ফালন করে, যদিও 'শ্বেতমূর্তি' দেখলেই লাঙ্গুল গুটিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। প্রকৃত বল নেই বলেই সে 'গণ্ডারের শিং'-এর মতো তার শক্তির আস্ফালন 'অহোরাত্র নাকের উপর' খাড়া করে রাখে। শেষে আসে খেকি কুকুরের উপমা— খেকি কুকুরের মতো 'আমরাও কেবল দূর হইতে অভদ্রভাবে ঘেউঘেউ করিতেছি।' 'জিহ্বা-আস্ফালন' নামে প্রবন্ধেও কয়েকটি জন্তু-প্রতিমা প্রযুক্ত হয়েছে, সেও বাঙালির বদ্ধতা-সর্বস্বতাকে ব্যঙ্গ করেই। বাঙালির কথা-কোলাহল যেন ব্যাঙের ডাক, ব্যাঙের দল শ্রাবণ রাত্রের বজ্রবিদ্যুৎবর্ষণের সময় সারারাত ধরে 'জগতের কানের কাছে অনবরত মকমক' করতে থাকে, আর মনে করে ভাগ্যে তারা ছিল ও প্রাণপণে সমস্ত রাত চিৎকার করেছে, তাই না জগতে প্রলয় হতে পারল না! উদ্দেশ্যহীন লক্ষ্যহীন ছটফট করা আর বদ্ধতা দেয়া আর মনে করা 'ভারি একটা কাজ' করেছে— বাঙালির মধ্যে এমনধারা প্রবণতাই এখানে ব্যঙ্গের বিষয়। বাঙালির সাংবাদিকতাকে এই যুবক মনে করেন 'খেকিবৃত্তি'। নরিস সাহেব এবং জুরিসডিকশন বিল নিয়ে বাংলা কাগজের আক্রমণ তাঁর অত্যন্ত কুরুচিকর মনে হয়েছে, তাঁর বিরক্তি তিনি জন্তু-প্রতিমা দিয়েই প্রকাশ করেছেন, বলেছেন— 'বানরের মতো মুখ ভেংচাইয়া দাঁত বাহির করিয়া' অতিবড়ো শত্রুকে অপমান করলে সেটা নিজেকেই অপমান করা হয়। অথচ ইংরেজি কাগজের লেখালেখি তাঁর বেশ পছন্দ! *Statesman*-এর বিরুদ্ধে বাংলা সংবাদপত্রে লেখালেখি নিয়ে তাঁর কী রাগ! (চৈচিয়ে বলা) বাংলা কাগজ নাকি মনে করে 'আদুরে ছেলেটির মতো' কেবল তাদের 'স্তুতিগান' করে তাকে বুক তুলে নেচে বেড়ানোই *Statesman*-এর কাজ! বাঙলা কাগজের কোনো একটা দোষ দেখিয়ে দিলেই নাকি সে 'হাত-পা ছুঁড়িয়া চিৎকার করিয়া আকাশ ফাটাইয়া' দেবে! *Statesman*-এর হিতৈষিতার নাকি সহস্র প্রমাণ আছে, সে নাকি বাঙালির হিতকামনা করেই কঠোর কথা বলে, আর বাঙলা কাগজ সেটা বরদাস্ত করতে পারে না, এমনি সে 'নন্দদুলাল' হয়েছে!

এসব ভাষা থেকে এরকম মনে হতেই পারে, ইংরেজ-রাজের বন্ধু ঠাকুর-পরিবারের এই সন্তানটি ইংরেজের পক্ষে বাঙালির বিরুদ্ধে বিবোধগার যে করবেন; এটাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু তাঁর এ সময়ের লেখালেখির মধ্যে নিছক ইংরেজ-পক্ষপাতিত্ব আর বাঙালির বিরোধিতার সরল সূত্র খুঁজে নিলে ভুল করা হবে। বাঙালি যে ইংরেজের দেখাদেখি Political agitation করে, সেইখানে তাঁর রাগ। ‘হাতে-কলমে’^{২৬} নামে দীর্ঘ একটি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ এ-বিষয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি দেখছেন: আমাদের স্বদেশহিতৈষীদের এক হাতে ঢাল আছে, আরেক হাতে তলোয়ার আছে, কিন্তু ঐ-পর্যন্তই। ‘হাতের থেকে হাতিয়ার বেশি, তাই কাজকর্ম স্থগিত।’ কাজকর্ম বলতে কিছু নেই, কিন্তু সেই অবসরে ‘দুশো পাঁচশো ঊর্ধ্বপুচ্ছ জিহবা’ একসঙ্গে ছাড়া পেয়ে ‘দেশের লোকের কানের মাথাটি মুড়াইয়া ভক্ষণ করিতেছে।’ আমাদের দেশহিতৈষিতা ব্যাপারটা যেন ‘কামারের হাপরের’ মতো, মুহূর্তে ফুলে ঢাক হচ্ছে, মুহূর্তেই চূপসে ‘শুকনো চামটিকার আকার ধারণ’ করছে।

Constitutional agitation-কে ব্যঙ্গ করতে তিনি একটি জন্তুগল্প তৈরি করেছেন। মনিবের কুকুরের দেখাদেখি মনিবের গরুটিও মনিবের কোলে পা তুলে দিয়ে ‘সঘনে লাঙ্গুল’ আন্দোলিত করতে লাগল কুকুরের মতো ভালোমন্দ খেতে পাবে বলে, কিন্তু কপালে তার জুটল পেটের খাদ্য নয়, পিঠের মার। কুকুরের নকল যেমন গরু করতে পারে না, ইংরেজের নকল করাও তেমনি বাঙালির শোভা পায় না। বাঙালির কাজ তার নিজের মতো, তার নিজের চারদিকে, চারপাশে, নিজের গৃহের মধ্যে তার কার্যক্ষেত্র। তেইশ বছরের যুবকটি ভাবছে কবে আমাদের সেই সামাজিক মহাদেশ সৃজিত হবে। সেই মহাদেশ ‘ভুঁইকোঁড় ভেঙ্কি’ নয়, তারজন্যে আমাদের সকলকেই নিজেকে সৃজন করতে হবে, আমাদের আশপাশকে সৃজন করতে হবে। এই যাঁর আকাঙ্ক্ষা, আমরা দেখেছি পরিণত জীবনে নিজের কাজের মধ্যে দিয়ে সে আকাঙ্ক্ষা-পূরণের প্রয়াস সাধ্যমতো নিজে করে গেছেন তিনি, তাঁর তো উনিশ শতকের Political agitation-কে ‘ভিক্ষাবৃন্তি’ মনে হতেই পারে। মনে হতেই পারে বড়ো বড়ো কাজের সংকল্প শুধু কথার কথা হয়ে থেকে যাচ্ছে সংবাদপত্রে। মনে হতেই পারে, এ যেন অমুক দিন অমুক সময় দেশের জন্যে একটু কাঁদা পকেট থেকে রুমাল বার করে, ঠিক সাড়ে তিনটের সময় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে ‘তিন-পোয়া আন্দাজ রাগ ও একপোয়া আন্দাজ দুঃখ’ করা! ‘অকাল-কুশ্মাণ্ড’^{২৭} নামে লেখাতে এমনই রাগের ভাষায় তিনি বাঙালির রাজনৈতিক কার্যকলাপকে ব্যঙ্গ করেছেন।

‘আমি ছেড়েই দিতে রাজি আছি সুসভ্যতার আদোক’

রাগী যুবকটির রাগের লক্ষ্য যে তৎকালীন বাংলা সাহিত্যরীতি কিংবা বাঙালির স্বদেশহিতৈষিতা, তার সঙ্গে তাঁর ভাবী জীবনকর্মের চরিতার্থতার গভীর যোগ। আমরা বুঝে নিতে পারি সহজেই। কিন্তু তাঁর রাগের অন্য একটি বিষয়ও আছে যা শুধু তাঁর ভবিষ্যৎই দর্শাচ্ছে না, মহান মানুষটির অন্তর্দৃষ্টি অতি তরুণ বয়সেই যেন তাঁর যুগের এক বিচারও করে চলছিল।

উনিশ শতকের বাংলার বুদ্ধিজীবী মহলে যুরোপীয় আলোক পর্বের প্রভাব বর্তে ছিল আর আলোকপর্বের প্রধান-সুস্তুই তো যুক্তিপ্ৰাণতা। আলোকপর্বের সেই যুক্তিপ্ৰাণতার পথ ধরে বিশ শতকে মানব সভ্যতায় নানান বিপর্যয় ঘটে গিয়েছে— এমন কথা মনে করেন প্রোভারের মতো দার্শনিক,^{২০} যার লেখার উল্লেখ করেছেন অমর্ত্য সেন, তাঁর *Argumentative Indian*^{২১} বইতে। পরিণত বয়সে রবীন্দ্রনাথ তাঁর চতুর্ঙ্গ উপন্যাসের ‘জ্যাঠামশাই’ চরিত্রে উনিশ শতকীয় যুক্তিবাদিতা দর্শিয়েছেন, সেইসঙ্গে দেখিয়েছেন জ্যাঠামশায়ের চেলা হওয়া সত্ত্বেও ননীবালায় আত্মহত্যার চূড়ান্ত যুক্তিহীনতায় ধাক্কা খেয়ে জ্যাঠামশাই-এর মৃত্যুর পর শচীশ চলে যায় একেবারে যুক্তির বিপরীতে, অযৌক্তিক রসের জগতে, আর সেখানেও সে স্থিত হয় না; শেষ পর্যন্ত সে পথের খোঁজ পায়—নিজেরই ভিতর মহলে; অতিযৌক্তিক আত্মবোধে। কম বয়সের রবীন্দ্রনাথও তাঁর তীব্র যুক্তিবিরোধিতায় যুক্তির বিপরীতে অযৌক্তিককে রাখেন না, রাখেন অতিযৌক্তিককে। ‘সঙ্গীত ও কবিতা’^{২২} প্রবন্ধে তাঁর মন্তব্য ‘...যুক্তির একটা ব্যাকরণ আছে, অভিধান আছে, কিন্তু আমাদের রুচির অর্থাৎ সৌন্দর্যজ্ঞানের আজ পর্যন্ত ব্যাকরণ তৈয়ারি হইল না।’ এইভাবেই, যুক্তির বিপরীতে তিনি কখনো রাখেন সৌন্দর্যজ্ঞান, কখনো কল্পনা-জগৎ, কখনো ভাবময়তা। এগুলির কোনোটিই অযৌক্তিক নয়, অতিযৌক্তিক।

কিন্তু কেন তিনি যুক্তির উপর এতটাই খড়াহস্ত? এমনকি, ‘জুতা-ব্যবস্থা’ প্রবন্ধে তিনি এতদূর বলতে পারেন, ‘যুক্তি’ শব্দটিই হয়তো ‘জুতি’ শব্দে রূপান্তরিত হয়েছে। ইংরেজরা আমাদের জুতো মারছে আর আমরা সেটা সৌভাগ্য বলে ধরে নিচ্ছি— ‘জুতা-ব্যবস্থা’-তে এই নিয়েই ছিল তাঁর তীব্র বিদূষ। তাহলে, এই মহান তরুণ কি বলতে চাইছেন, ইংরেজের জুতা খাওয়ারই অনুরূপ ইউরোপের যুক্তিপ্ৰাণতা দ্বারা প্রভাবিত হওয়া, কৃতার্থ হয়ে যাওয়া? সেইসঙ্গে, এও হয়তো ঠিক, সৌন্দর্যবোধ কল্পনাপ্রবণতা ভাবময়তা দিয়ে বিভোর তাঁর নিজস্ব জগৎকে তাঁর অনাদৃত মনে হচ্ছিল তখনকার যুক্তিবাদী বুদ্ধিজীবী মহলে। ‘তার্কিক’^{২৩} নামে একটি প্রবন্ধ পড়ে সেরকমই মনে হয়। সেখানে পাওয়া যাচ্ছে ‘নৈয়ায়িক কুস্তিওয়ালার’ কথা, যখনই ‘ভাবটি’র জন্ম হয়, তখনই সে ‘খ্যাক’ করে তার গলা টিপে ধরে। তারপর আসছে ‘নৈয়ায়িক শিকারী’, যার ‘যুক্তির ক্ষুধিত খেঁকি কুকুর’গুলো একবার ‘দাঁত খিঁচিয়ে অসহায় কচি ভাবগুলির-উপর এসে পড়ে, আর ‘Facts নামক ছোট ছোট ইট পাটকেল চারদিক থেকে’ তাদের উপর বর্ষিত হয়। Facts হয়ে দাঁড়ায় নৈয়ায়িকের ‘সরকারী লাঠিয়াল’, ‘ভাবশিশু’কে আক্রমণ করতে যার পৌরুষে বাধে না। ‘যুক্তির কাকচিল’ কিংবা ‘তর্কবিতর্কের ছোরাছুরি’র ভয়ে হৃদয়ের ভাবগুলিকে গোপন রাখতে হয়; তার্কিক বন্ধু, যে ‘যুক্তি মহারাজের প্রজা’ সে বোঝে না অনন্ত জীবন অনন্ত জগতের কল্পনা, ‘যুক্তির শানবান কুয়ো’র মধ্যে তার গতি, কল্পনাবিচরণ ক্ষেত্রে তার্কিকের ‘বুদ্ধির ফুটো নারিকেল মালায়’ চড়ে যাওয়া যায় না, ‘যুক্তির কারাগার’-এ নিষ্কিণ্ত হলে মানুষের ‘কল্পনার অধিকার’ হ্রাস হয়— ইত্যাদি যখন লিখছেন তরুণ যুবকটি, তখন যুক্তিকে তিনি কী চোখে দেখছেন তা বুঝতে অসুবিধে হয় না। যুক্তি ভাবের শত্রু, অনন্ত অনুভবের বিরোধী, ‘কারাগার’ বা ‘শানবান কুয়ো’র মতো নিত্য সীমিত পরিসরেই যুক্তির বিচরণ। যুক্তি বলতে কার্যকারণ-সূত্র বোঝানো হয়, তা যে সবসময় সববিষয়ে নিঃসংশয় হতে পারে না— তাও উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথ জানান—

কার্যকারণ সূত্রের পদে পদে 'missing link' আছে। 'যুক্তির সৈন্য' নিয়ে তार्কিক অনেক বাজ্য অধিকার করে ঠিকই, কিন্তু ভাবুকের বিস্তৃত রাজ্যের একতিলও কেড়ে নিতে পারে না।

যুক্তির সঙ্গে তार्কিক তথা নৈয়ায়িককে যেমন, তেমনি বুদ্ধি তথা বুদ্ধিমানকেও আক্রমণ কবতে হয় সেই রাগী যুবকটিকে। রাগের তীব্রতায় বিদ্রূপ তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে জঙ্ঘপ্রতিমার প্রয়োগে। 'বিস্তৃত' নামে প্রবন্ধে প্রযুক্ত জঙ্ঘপ্রতিমার সংখ্যা এবং বৈচিত্র্য দেখে লেখকের ত্রোণের বহর অনুমান করা যায়। এ লেখায় বুদ্ধিমান আর বুদ্ধি সমার্থক হয়ে যায়, লেখকের শ্লেষ বুদ্ধিমানের শরীরী বর্ণনাতেও ফুটে ওঠে— 'তীক্ষ্ণ নাসিকা ক্ষুরোজ্জ্বল চক্ষু ধারাল-পেঁচাল' এই 'বুদ্ধিগণ' প্রসঙ্গে একের পর এক জঙ্ঘপ্রতিমা চলে আসে:

ক. সাপ—

জন্মেজয় যখন সর্পসত্র করিয়াছিলেন তখন কি গোটাকতক টোড়া সাপই মরিয়াছিল, তোমাদের মতো বিষাক্ত বুদ্ধিমান সাপগুলো ছিল কোথায়?

খ. কাক—

বসন্ত আসিয়াছে বলিয়া কি কাক মিঠা ডাকিবে? তাহা হইলে বিধাতা তাহাকে কাক কবিলেন কেন? সে যে বুদ্ধিমান পক্ষী।

গ. ভেক—

হে ভেকগণ, তোমাদেরই জয়! তোমরা আরো ফুলিতে থাক, আবো লক্ষ দাও. আরো মক্‌মক্‌ কব। তোমরা কর্কশ কণ্ঠ লইয়া জগতের গান বন্ধ করিতে পাবিয়াছ অতএব তোমরাই জিতিলে।

ঘ. কীট—

এই সকল কীটগণ মনে কবে ফুলেবা যে সুন্দর হইয়া ফুটিয়া উঠে— সে কেবল ইহাদের দংশন সুখ অনুভব করিবার জন্যই।

ঙ. পেচক—

এই সকল পেচকেরা মনে করে যে, সূর্যের কিরণ দান কবেন সে কেবল পেঁচার সহিত শত্রুতা আছে বলিয়াই।

চ. বাদর—

তোমাদের আশ্চর্যরিতা-নামক লাঙ্গুলের প্রসাবটা অত্যন্ত অধিক— নিজ রচিত কুণ্ডলিত লাঙ্গুল-সিংহাসনের উপর বসিয়া দুববীক্ষণের উন্টাদিকে জগৎসংসারকে দেখিতেছ।

ছ. কচ্ছপ—

তোমাদের বিজ্ঞতার প্রাণটা একবিন্দু. তাহাকে ছুঁইলেই কচ্ছপের মত সে নিজের পেটের মধ্যে প্রবেশ করে।

জ. কাঁকড়া—

তাহাব আলিঙ্গন কাঁকড়ার আলিঙ্গনের মতো।

একটিমাত্র প্রবন্ধতেই এতগুলি আক্রমণাত্মক জঙ্ঘপ্রতিমা। অন্যান্য রচনাতেও বুদ্ধিমান কিংবা নৈয়ায়িক প্রসঙ্গে এ জাতীয় প্রতিমার দেখা মেলে। 'গোঁফ ও ডিম'^{৩১}-এর মতো হালকা বসরচনাতেও নৈয়ায়িককে আক্রমণ করা হয়েছে, তার যুক্তিব্যবহারকে 'তীক্ষ্ণচক্ষু ক্ষুদ্র হিংস্র পাখির উপমা দেওয়া হয়েছে, যারা নিজেরা ডিম পাড়ে-না, 'কেবল পরের নীড়ে খোঁচা মারিয়া ও পরের শাবককে ঠোকরাইয়া বেড়ায়।' অন্য একটি লেখায় সেই হিংস্র পাখিদের নামও দেয়া

আছে: ‘কেবলমাত্র শকুনি গৃধিনীদের দ্বারা ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিবার জন্য নির্মমতার অনাবৃত শ্মশানক্ষেত্রের মধ্যে নিজের হৃদয়খানা কে ফেলিয়া দিতে পারে।’ (‘সমাপন’, *বিবিধপ্রসঙ্গ*)

যুক্তিপ্রয়োগের বদলে দৃষ্টান্ত কিংবা উপমা প্রয়োগ যে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের বিশেষ একটি বৈশিষ্ট্য, রবীন্দ্রনাথের পাঠকমাত্রেরই তা জানে। কিন্তু তাঁর তরুণবয়সের রাগী লেখাগুলি না পড়লে জানতাম না তাঁর যুক্তিহীনতার যুক্তিটা কোনখানে। ‘জীবনের উদ্দেশ্য কী?’ এই প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ তরুণ বয়সেই, *ডায়ারি*-তে^{৩২} লিখেছিলেন দুটিমাত্র বিকল্পের কথা: ‘নিজেকে ভালো করিয়া জানা’ আর ‘নিজেকে শ্রেষ্ঠ করা’। দুটির মধ্যে দ্বিতীয়টিই যে বেশি জরুরি, এই নিয়ে তাঁর কোনো দ্বিধাও ছিল না: ‘যতটুকু মাত্র অহংজ্ঞান নিজেকে শ্রেষ্ঠ করিবার পক্ষে উপযোগী, ততটুকু মাত্রই লাভ করিবার চেষ্টা সার্থক, তাহার অতিরিক্ত জানা কেবলমাত্র বিভ্রম।’ তাঁর আত্মসচেতনতা নিজের শ্রেষ্ঠত্ব বোধ দিয়ে সীমিত ছিল বলেই বোধ হয় সেই বয়সের লেখায় এত উদ্ভা।

কিন্তু কোথা থেকে সংগ্রহ করেছিলেন তিনি উদ্ভাপ্রকাশের উপযোগী ভাষাভঙ্গি? এরও একটা দিশা খুঁজে পাই তাঁর সেই কম বয়সের ডায়ারিতে, ১৮৯০ সালের ১৩ আগস্ট তারিখে তিনি লিখেছিলেন— ‘দাসী-সংকুল অন্তঃপুর ঘেঁষা ঘরে বসিয়া কিছু লেখা বড় কঠিন।’ হয়তো লেখা কঠিন, তবু তো লিখছিলেন তিনি, আর তার ভাষাভঙ্গি কি পেয়ে যাচ্ছিলেন সেই ‘দাসীসংকুল অন্তঃপুর’ থেকেই? এত যে জল্পপ্রতিমা চলে আসছিল তাঁর লেখায়, সেসব প্রতিমার উদ্ভাবন তাঁর নিজস্ব ঠিকই কিন্তু ধরনটা কি মনে হয় না, সেই দাসীসংকুল অন্তঃপুরের প্রভাবে গড়ে ওঠা^{৩৩} কিছু কিছু বাগ্‌ভঙ্গি রয়েছে এই সময়ের লেখায়, যা মেয়েলি ভাষারই বৈশিষ্ট্য। দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করা যায়:

- ক এবুপ কাঁদিতে বসিলে আমাদের *গা জুলিয়া যায়* (মেঘনাদবধ কাব্য)
- খ রাবণ যদি ঘৃণাক্ষরেও জানিতে পারিতেন যে লক্ষ্মী অবশেষে এইরূপ *নিমকহারামি* করিবেন... (মেঘনাদবধ কাব্য)
- গ .. ঝাল-মসলা ও খরতর ভাষার *ঘন্ট পাকাইয়া* খাইবেন (কাব্য : স্পষ্ট এবং অস্পষ্ট)
- ঘ পথিকেরা তারই *ল্যাজ মাড়াইতে* চাহিতেছে (বিজ্ঞতা)
- ঙ পরস্পর পরস্পরকে *খোঁচা মারো* (জিহবা আত্মফালন)
- চ দেশের লোকের কানের *মাথাটি মুড়াইয়া* ভক্ষণ করিতেছে (হাতে-কলমে)
- ছ দুটো চারটে জীর্ণ উপদেশ পুরোনো তেঁতুলের সহিত *শিকেয় জেলা* থাক (অকাল-কুশ্মাণ্ড)
- জ একটা লম্বাচোড়া মত শুনিবামাত্রই অমনি *তড়িঘড়ি...* (সমাজ সংস্কার ও কুসংস্কার)

রবীন্দ্রনাথের আদিগদ্যে মেয়েলি ভাষাব প্রভাব থাকার কারণেই কি তিনি ‘নষ্টনীড়’-এ অমল আর চারু প্রতিলিপিতায় চারুকে জিতিয়ে দিয়েছিলেন? এছাড়া আরো একটা কথা ভাবায় আমাকে। *man with the head woman with the heart*— এটা যেসময় সমাজে সাহিত্যে স্বতঃসিদ্ধ ছিল, তখন রবীন্দ্রনাথ যুক্তির বিরোধিতা করে ভাবের স্বপক্ষে সওয়াল করে নিজের অচেতনেই কি পিতৃতন্ত্রের বিরোধিতা করছিলেন না? যদিও অবশ্য অল্পকাল বাদেই *সাধনা*-র সম্পাদনা সূত্রে পিতৃতন্ত্রের ধারক-বাহক রবীন্দ্রনাথকেই দেখতে পাই। আর তাই, তাঁর তরুণ বয়সের গদ্যগুলি আমার মেয়েলি পাঠে খুব মূল্যবান মনে হয়।

সূত্রাবলি :

[রবীন্দ্রনাথের গদ্য নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে গদ্য থেকে বড়ো বেশি উদ্ধৃতি দিতে হয়েছে। উদ্ধৃতিগুলির নয়, আমি সূত্র দিতে চেয়েছি প্রবন্ধগুলির। রবীন্দ্রনাথের নাম বার বার আসবে, তাই তাঁর নামটি বাদই দিয়েছি। লেখকের নাম না থাকলে ধরে নিতে হবে সে লেখা রবীন্দ্রনাথের। তাঁর কম বয়সে লেখা অধিকাংশ প্রবন্ধ অনেকদিন অগ্রহীত ছিল। সম্প্রতি সংকলিত হয়েছে বিশ্বভারতী সংস্করণ রবীন্দ্র রচনাবলীর ঊনত্রিংশ-ত্রিংশ খণ্ডে এবং পশ্চিমবঙ্গ সংস্করণ রবীন্দ্র-রচনাবলীর পনেরো-পনেরো-ক খণ্ডে।]

- ১ Enk. H. Erikson, *Identity, Youth and Crisis*, 1968, p.130
- ২ চ্যাটার্টন—বালক কবি, ভারতী, আষাঢ় ১২৮৬।
- ৩ "... should a young person feel that the environment tries to deprive him too radically of all the forms of expression which permit him to develop and integrate the next step, he may resist with the wild strength encountered in animals who are suddenly forced to defend their lives."
- Enk. H. Erikson, *Identity, Youth and Crisis*, New York 1968, p.130
- ৪ পাশ্চাত্য-ভ্রমণ, বিশ্বভারতী, ১৩৪৩, পৃ.১/১।
- ৫ দৃষ্টব্য প্রশান্তকুমার পাল, *রবীন্দ্রজীবনী* প্রথম খণ্ড, ১৩৮৯, পৃ.৩৬৭।
- ৬ 'মেঘনাদবধ কাব্য', ভারতী, শ্রাবণ ১২৮৪।
- ৭ *যুরোপ-প্রবাসীর পত্র*, ১৩৬৭, পৃ.৮।
- ৮ *যুরোপ-প্রবাসীর পত্র*, পৃ.১০।
- ৯ 'সাদুনা', ভারতী, চৈত্র ১২৮৪।
- ১০ 'পারিবারিক দাসত্ব', ভারতী, চৈত্র ১২৮৭।
- ১১ প্রবন্ধের শেষে রবীন্দ্রনাথের মতামতের প্রতিকূল সমালোচনা করেছিলেন ভারতী-সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
- ১২ ভূকনমোহিনী প্রতিভা, অবসর সর্বোজ্জ্বল ও দুঃখসঙ্গিনী, *জ্ঞানসন্দের ও প্রতিবিম্ব*, ১২৮৩।
- ১৩ 'আলস্য ও সাহিত্য', ভারতী ও বালক, ১২৯৪।
- ১৪ দেশজ প্রাচীন কবি ও আধুনিক কবি (প্রত্যুত্তর), ভারতী, ভাদ্র ১২৮৯।
- ১৫ 'কাব্য : স্পষ্ট এবং অস্পষ্ট', ভারতী, চৈত্র ১২৯৩।
- ১৬ 'ডি প্রোগ্রেন্স', ভারতী, আশ্বিন-কার্তিক ১২৮৮।
- ১৭ 'মেঘনাদবধ কাব্য', *সমালোচনা*, রবীন্দ্র রচনাবলী অচলিত-২, বিশ্বভারতী পৃ.৭৬।
- ১৮ 'বাঙালি কবি নয় কেন', ভারতী, আশ্বিন ১২৮৭।
- ১৯ 'চৈঁচিয়ে বলা', ভারতী, ফাল্গুন ১২৮৯।
- ২০ 'জিহ্বা আশ্ফালন', ভারতী, শ্রাবণ, ১২৯০।
- ২১ 'বাঙালি কবি নয় কেন', পৃ.২৫৯।
- ২২ 'নিমন্ত্রণ-সভা'— ভারতী, আষাঢ় ১২৮৮।
- ২৩ 'জিহ্বা আশ্ফালন', পৃ.১৭৯।
- ২৪ 'জুতা-ব্যবস্থা', ভারতী জ্যৈষ্ঠ, ১২৮৮।
- ২৫ 'হাতে-কলমে', ভারতী, ভাদ্র-আশ্বিন ১২৩৯।

২৫ ক 'অকাল-কুশাণ্ড', ভারতী, চৈত্র ১২৯০।

২৬ Jonathan Glover, *Humanity: A Moral History of the Twentieth Century*, London 1999।

২৭ "The Enlightenment perspective has come under severe attack in recent years, ...Glover goes on to attribute many of the horrors of the twentieth century to the influence of the Enlightenment."— Amartya Sen, *The Argumentative Indian*, London, 2005।

২৮ 'সঙ্গীত ও কবিতা', মাঘ ১২৮৮।

২৯ 'তর্কিক', ভারতী, আশ্বিন ১২৯০।

৩০ 'বিজ্ঞতা', ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১২৮৯।

৩১ 'গৌফ এবং ডিম', ভারতী, আষাঢ় ১২৯০।

৩২ ডায়ারি, *সবুজপত্র* বৈশাখ ১৩২২।

৩৩ "Woman's vocabulary contains a very large number of intensive words and emphatic particles as well as pejorative expletives. There is also a very strong tendency of exaggeration of stress and tone accent to mark emphasis."

—Sukumar Sen, *Women's Dialect in Bengali*, Calcutta 1979, p.2.

শেলি ও রবীন্দ্রকাব্যের প্রথম পর্যায়

কল্যাণ চট্টোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের তখন বয়স বছর কুড়ি। কাব্যচর্চা ও অধ্যয়ন সমান তালে চলছে। এই সময়ে লিখলেন ‘বাঙালি কবি নয়’ (ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১২৮৭), প্রবন্ধটির বিষয় সনাতন বাংলা কাব্য। এ কাব্যে তিনি মনের খাদ্য পান না, কেননা এই কাব্যে প্রাণরস নেই। তীক্ষ্ণ প্রশ্ন তুলেছেন: ‘যাহাতে আদর্শ সৌন্দর্য, আদর্শ মনুষ্যচরিত্র চিত্রিত আছে, বৈচিত্র্যহীন বঙ্গসাহিত্যে এমন কবিতা কোথায়?’^১ প্রশ্নটির মধ্যে নিহিত আছে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য কাব্যের বিশেষ করে ভাব-বিভোল কবি শেলির কাব্যেব তুলনামূলক বিচার। রোমান্টিক মতাদর্শের পরাকাষ্ঠাই তো শেলির কাব্য।

প্রবন্ধটির জের বার হয় ঠিক পরের মাসের ভারতী-তে— ‘বাঙালি কবি নয় কেন?’^২ এটিতেও তাঁর বস্তুব্য সনাতন বাংলা কাব্য নিষ্প্রাণ, কিন্তু রোমান্টিক কাব্য প্রাণবন্ত। দৃষ্টান্তস্বরূপে, বাংলা কাব্যের একটি কানন বর্ণনার সঙ্গে তুলনা করেছেন শেলির *Epipsychidion* কবিতায় কানন বর্ণনার, যার প্রথম কলি— ‘It is an isle under Ionian skies’ দুটি দৃষ্টান্তই দীর্ঘ, এখানে উদ্ধৃত করা সম্ভব নয়, কিন্তু বাংলা বর্ণনাটিতে, রবীন্দ্রনাথের মতে, ‘না আছে কাননের শরীর, না আছে কাননের প্রাণ।’ এতে বিস্ময় নেই, নেই গভীর হৃদয়ানুভূতি।

পক্ষান্তরে, (রবীন্দ্রনাথ বলছেন) শেলির বর্ণনাটির মধ্যে আছে তাঁর বৈশিষ্ট্যময় মানসিকতা তাঁর সূক্ষ্ম ভাবনা। ফলে শেলির কল্পবস্তুর প্রাণ পেয়েছে। বর্ণনায়, তুলনায়, শব্দচয়নে তাঁর বৈশিষ্ট্যময় কল্পনাশক্তি পদে পদে অনুভব করা যায়। প্রতিপাদ্য বিষয়ের সমর্থনে রবীন্দ্রনাথ উদাহরণ দিয়েছেন আর একটি কবিতার (মিলিয়ে দেখা যায় এটি শেলির *Woodman and the Nightingale* নামক অসমাপ্ত কবিতা) উদ্ধৃত করেছেন ও বলেছেন, ‘মনে হয় নাকি যে গান শুনিতে শুনিতে কবির চক্ষু মুদিয়া আসিয়াছে, মনুষ্য হৃদয়ে যতদূর সম্ভব ততদূর পর্যন্ত উপভোগ করিতেছেন?’

এই উক্তি থেকেই বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথ কবিতায় কী ধরনের ভাব ও ভাষার অনুরাগী ছিলেন। এই ভাব হৃদয়ানুভূতির, সৌন্দর্যের আদর্শ চিত্রের ও জীবনদর্শনের। এই ভাব শেলি সৃষ্টি করতে পেরেছেন তার কারণ তাঁর কল্পনা নিষ্প্রাণ নয়, উজ্জীবিত। রবীন্দ্রনাথ সনাতন বাংলা কাব্যে যে-সব গুণের অভাব বোধ করেছিলেন সেগুলিকে পেয়েছিলেন শেলির কাব্যে। তাঁর কাব্যালোচনায় ‘চরিত্র বৈচিত্র্য’ ‘মহান চরিত্র চিত্র’ ‘বিবিধ মনোবৃত্তির খেলা’ প্রভৃতি কথা ব্যবহার করেছেন বারবার। সন্দেহ নেই কে ছিলেন রবীন্দ্রনাথের আদর্শস্থল ও তাঁর কাব্য থেকে কী শিক্ষা তিনি নিয়েছিলেন।

তবে শুধু শেলি নয়, সমগ্র রোমান্টিক ভিক্টোরিও কাব্য সম্বন্ধেও ঐ একই মনোভাব পোষণ করতেন তিনি। তীর্থযাত্রীর মতো মহান কাব্য ভাষার সন্ধানে তরুণ কবি ইংরাজি

সাহিত্যলোকে 'তরী ভাসিয়েছিলেন'। কালক্রমে এই 'তরী' ও 'নেয়ে'-ও রবীন্দ্রকাব্যের এক অতি পরিচিত কাব্যভাষা হয়ে উঠবে।

মহৎ কাব্যের ছন্দ কানে লেগে থাকে, তার ভাব মনে গেঁথে থাকে। বলতে গেলে, লিখতে গেলে স্মৃতির চোরাপথে নিজের ভাষার সঙ্গে মিলে যায়। কাব্য যখন একটি আদর্শায়িত সংস্কৃতির পথ বেয়ে আসে তখন সেই আগমন সচেতনভাবে বরণ করা হয়। ইংরাজি সাহিত্যের এইভাবে ভারতীয় মনে আগমন হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের পূর্বোন্নিখিত প্রবন্ধের ভাষায়, 'সম্প্রতি বাহির হইতে একটা নূতন স্রোত আসিয়া এই স্থির জলের মধ্যে একটা আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছে' (পৃ. ২২৭)। সেই ভাববিভোল রেনেসাঁসের একটি ছবি *মানসী*-র একটি কবিতায় আছে:

মনে আছে সেই প্রথম বয়স,
নূতন বঙ্গভাষা
তোমাদের মুখে জীবন লভিছে
বহিয়া নূতন আশা। ('পরিত্যক্ত')

এই 'নূতন বঙ্গভাষা'র রাবীন্দ্রিক রূপ অর্থাৎ তাঁর প্রথম পর্যায়ের কাব্যে উপরোক্ত আদান-প্রদানের চিত্র আমরা পাই প্রথমে অনুবাদ ও অনুসরণ, ভাবসম্প্রসারণ ও রূপান্তর, পরে গভীরতর প্রভাব; মূলত ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও শেলির দার্শনিকতা, কিটস ও টেনিসনের চিত্রময়তা।

এই পর্যায়ে ইংরাজি ও ইংরাজিতে অনুদিত পাশ্চাত্য কাব্য থেকে অনর্গল উৎসায়নের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এই পর্যায়টি *চিত্রা* অতিক্রম করেও পাওয়া যায়। কিন্তু এখানে সে কথার আলোচনা উদ্দেশ্য নয়। বাল্যকাল থেকেই কবি বিদেশি কাব্যের অনুবাদ, বিদেশি সুরে বাংলা ভাষা আরোপ ও তার বিপরীত প্রক্রিয়ায় অভ্যস্ত ছিলেন। যদিও আমাদের আলোচ্য কবিতা, তাহলেও মনে রাখতে হবে রবীন্দ্রনাথের প্রবণতাই ছিল গানের দিকে, সুরেলা ছন্দের দিকে। প্রতিটি কাব্যগ্রন্থে গান অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ও অনেক কবিতাকে গানে রূপান্তরিত করা যায় বা করা হয়েছে। একথার অর্থ ক্রমে স্পষ্টতর হবে।

প্রথমেই ধরা যাক *সন্ধ্যাসঙ্গীত*-এর কথা। প্রথম কবিতা 'সন্ধ্যা'। রোমান্টিক কবির প্রভাব, সন্ধ্যা, সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত এবং শরৎ, বসন্ত, বর্ষা প্রভৃতি ঋতুর প্রকৃতিচিত্র একেছেন কাব্যে, বিশেষ করে তাঁদের প্রথমজীবনের অনুশীলনী কাব্যে, প্রকৃতির মধ্যে মনের বা আত্মার প্রতিফলন দেখেছেন। কলিঙ্গের 'Ode to Evening'-এ সন্ধ্যার মানবায়িত মূর্তি আছে। এই ইঙ্গিত ছাড়া এই অষ্টাদশ শতকীয় কবির কবিতা থেকে রবীন্দ্রনাথ আর কিছু নেননি, কারণ তাঁর কবিতা রোমান্টিকধর্মী অর্থাৎ মনোময় ও প্রাণবন্ত। 'অনন্ত', 'নিখিল', 'প্রবাসী' প্রভৃতি কবিতাগুলি ইতিমধ্যেই আত্মপ্রকাশ করেছে। কিন্তু বিশেষভাবে লক্ষণীয় বাংলা কাব্যে নির্জনতার একটি অসাধারণ চিত্র—

ঘরে শুধু ঝরিবে শিশিবে,
মৃদু শ্বাস ফেলিবে সমীর,
সুস্বাদু কপোলে হাত দিয়া
একা সেথা রহিবে বসিয়া
মাঝে মাঝে দু-একটি তারা
সেথা আসি পড়িবে ঝসিয়া। (সন্ধ্যা)

টমাস হুড-এর কবিতায় আছে স্তব্ধতার মানবায়িত রূপ, স্তব্ধতার ও শিশিরের—

I saw old Autumn in the misty morn
Stand shadowless like silence, listening
To silence.' ('Ode : Autumn)

যাই হোক এইসব টুকরো দৃষ্টান্ত ছাপিয়ে উঠেছে রবীন্দ্রনাথের কাব্যগুরু কবি শেলির পরিব্যাপ্ত প্রভাব। তার মধ্যে পড়ে শেলির কবি কাহিনি 'Alastor' (1816)। অজানা এক আদর্শের পিছনে ছুটে চলা কিন্তু জগৎ-বিমুখ এবং কবির মানসচিত্র এই কবিতাটি। যদিও তাঁর উদ্দেশ্যে ভিন্ন রকম ছিল, তাহলেও কিশোর, রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ কবিতা *কবি-কাহিনী*-র গভীরে 'Alastor'-এর বিষয়বস্তুটি আছে। আছে প্রকৃতিপিয়াসী এক কবি, যার সঙ্গে প্রকৃতির ছিল নাড়ির যোগ। এই প্রকৃতির মধ্যে সেই কবি ধীরে ধীরে বড়ো হয়ে উঠেছে এবং বড়ো হয়েও ভ্রমণের নেশায় পৃথিবীময় ঘুরে বেరిয়েছে। কবিতাটির প্রায় আরম্ভেই একটা সূত্র— 'There was a poet...' *কবি-কাহিনী* ও আরম্ভ এইভাবে 'ছিল কোন কবি', কাহিনির পরের ধাপে শেলি বলেছেন:

...when early youth had passed, he left
His cold fireside and alienated home
To seek strange truths in undiscovered lands. (75-77)

এই অংশটির সমান্তরাল *কবি-কাহিনী*-তে এইভাবে আরম্ভ হয়েছে— 'যৌবনে যখন কবি করিল প্রবেশ, প্রকৃতির গীতধ্বনি পাইল শুনিতে।' অধিক প্রদর্শন নিম্নয়োজন।

দুটি কবিতাই প্রকৃতিপ্রেমী এক যাযাবর কবির কাহিনি শুধু যে 'বনে বনান্তে' তা নয়, পৃথিবীর নানা দেশে,— আফ্রিকায়, রাশিয়ায়, কাশ্মীরে, মরুদেশে, হিমাদ্রি শিখরে দুই কবিই যাযাবর। এইভাবে প্রকৃতিতে মগ্ন থেকে শেলির আত্মরত নির্জন কবি আবার প্রকৃতির মধ্যেই মিশে গেলেন। *কবি-কাহিনী*-তেও তাই। তাছাড়াও আছে এক সঙ্গিনীর কথা। শেলির আরব কুমারীর ইংগিত থেকে *কবি-কাহিনী*-র নলিনীর জন্ম, যদিও এই নাম রবীন্দ্রনাথ আরো অন্যান্য কবিতায় ব্যবহার করেছেন, যেন আত্মজীবনীমূলক ভাবে। কেন না অনেকের মতে নলিনী কিশোর রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রেম আত্মা তরুণ। যাই হোক, আসল কথা হল 'Alastor' কবিতার ভিতরে রবীন্দ্রনাথ পেয়েছেন আদর্শসন্ধানী এক ধ্যানী কবিচরিত্র, যা তাঁকে একটা আকর্ষণীয় আত্মরূপ দিয়েছিল। সচেতনভাবে তিনি একাত্ম হয়েছিলেন ইংরাজি কাব্যের 'singing god' শেলির সঙ্গে।

এখানে আর একটি কথা বলা দরকার। যে বীণা বা বাঁশি অসংখ্য রবীন্দ্রসংগীতে ও গানে কবির আত্মরূপের প্রতীক তার একটি চিত্র আছে এই 'Alastor' কবিতাটিতেই। কবিকে শেলি এইভাবে চিত্রিত করেছেন—

A fragile lute, on whose harmonious strings
The breath of heaven did wander.

'আমারে কর তোমার বীণা' (প্রেম, ৩৩), 'পরাণে বাজে বাঁশি নয়নে বহে ধারা' (ওই, ১৫৭), নীল আকাশের নীরব কথা ... বেজে উঠুক আজি তোমার বীণার তারে তারে' (প্রকৃতি, ১৪৮), 'মোর বীণা ওঠে কোন সুরে বাজি' (ঐ, ২০৬), 'আমার হিয়ায় হিয়ায় বাজে

... সে যে তোমার রাঁশরী' (পূজা, ৩৬), 'আমার অঙ্গে অঙ্গে কে বাজায় বাঁশি' (প্রেম, ৩৩১) প্রভৃতি গানের কথা এখানে ভাবা যেতে পারে। বোধহয় সমগ্র রবীন্দ্রকাব্যে এইটিই সবচেয়ে ফলপ্রসূ চিত্রকল্প। বলা বাহুল্য শেলির অন্যান্য কবিতায়-ও এই lute বা lyre-এর প্রতীক আছে। প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথের প্রথম পর্যায়ের কাব্যকে বলা যেতে পারে বাংলা ভাষায় ও ছন্দে বয়ে যাওয়া এই ইংরাজ কবির ভাবপ্রবাহ।

সম্ভ্রাসঙ্গীত-এর আর দু-একটি কবিতার কথা ওখানে বলি। যেমন ধরা যাক 'পরিত্যক্ত' কবিতাটি। এই কবিতাটির ভাবাঙ্কুর শেলির অন্তিম বছরের (১৮২২) একটি ছোট্ট লিরিকে নিহিত আছে— 'When the lamp is shattered/The light in the dust lies dead.' ছোট্ট হলেও এই কবিতাটিতে আছে রোমান্টিক চেতনার নির্যাস। আছে নিবে যাওয়া, ব্যরে যাওয়া, ভেঙে যাওয়া, অর্থাৎ ক্ষণস্থায়িত্বের একটি পরিপ্লুত ভাবচ্ছবি। ভেঙে যাওয়া প্রদীপ, হারিয়ে যাওয়া আলো, ছিঁড়ে যাওয়া বীণা এইসব বিলীয়মান চিত্রকল্প শেলির এই কবিতাটিকে রবীন্দ্রনাথের মনের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে প্রতিধ্বনিত করেছিল। রবীন্দ্রনাথের কবিতাটির ভাষা 'তৈলহীন শিখাহীন ভগ্ন দীপগুলি/ধূলায় লুটায়'— শেলির প্রায় আক্ষরিক অনুবাদ। তারপরে আছে 'পুরানো মলিন ছিন্ন বসনের মতো' এটি শেলির আর একটি কবিতার প্রতিধ্বনি— 'The earth doth like a snake renew/Her winter weeds (বসন) outworn.' এই ছত্রগুলি আছে শেলির 'Hellas' নাটকের অন্তিম কোরাস-গানে, কিন্তু মনে রাখতে হবে এই নাটকের সুর নিরাশার বা বিলাপের নয়, বরং তার ঠিক বিপরীত— এক বৈপ্লবিক প্রভাতের, নতুন ভবিষ্যতের। শেলির কাব্যে এই দুই বিপরীত সুর সবাই লক্ষ করেন। মানবতার মুক্তি ও ভবিষ্যতের কথা বলতে-বলতেই শেলির হৃদয়ে ত্রন্দনের সুর বাজে। নিগড় ভেঙে মানবতা হবে মুক্ত, কালিমা ঘুচে আসবে নতুন প্রভাত ও মহাবিশ্বচেতনা, এই রঙিন কল্পনাকে অনেকে বাঙ্গালী বলেছেন কিন্তু শেলি ও রবীন্দ্রনাথের কাব্যে এই সেতু আমাদের নজরে আসে।

কিশোর বয়স থেকেই রবীন্দ্রনাথের মনে শেলি আদর্শ কবি ব্যক্তিত্ব হিসেবে বিরাজমান ছিলেন, কিশোর বয়স থেকেই তাঁর মনে শেলির বাক্য ও ছন্দ অনুরণন তুলত। তার মধ্যে শেলির বিষয় ক্ষণস্থায়িতা তাঁকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করত। তার ছাপ আছে তাঁর অল্প বয়সের কবিতায়— 'On Death' এবং 'To—' যার প্রথম লাইন 'Oh, there are spirits of the air'।^৪

সংগীত, সুগন্ধ, গোলাপ; প্রণয় মরে যাওয়ার পরেও স্মৃতিতে সুবাস ছড়ায়, প্রতিধ্বনি তোলে— এই ভাবটির অনন্যসাধারণ বাক্চিত্র আছে শেলির আর একটি টুকরো কিন্তু ভাবধ্বনি লিরিকে— 'Music when soft voices die/Vibrates in the memory' 'আমি হারা' কবিতাটির শেষাংশে শেলির এই কবিতা পুনর্লিখিত। উদ্ধৃতি দিলেই বোঝা যাবে—

কুসুম শুকায় গেলে যেমন সৌরভ তার

কাছে কাছে কাঁদিয়া বেড়ায়,

সুখ ফুরাইয়া গেলে একটি মলিন হাসি

অধরে বসিয়া কেঁদে চায়

কিন্তু 'আমি-হারা'-য় শেলির আরো একটি কবিতার প্রভাব লক্ষ করা যায়— 'Epipsychidion'—

এটি নিঃসন্দেহে রবীন্দ্রনাথের প্রথম পর্যায়ের সবচেয়ে প্রভাবশীল ইংরাজি কবিতা এবং বারে বারে ফিরে আসা একটি উৎস। মাত্র একটি কবিতা থেকে সমগ্র একটি পর্যায় উৎসারিত হয়েছে একথা বোধে এলে বিস্ময় জাগে। প্রথমেই রোমান্টিক আর্তি:

জীবনের তরুণ বেলায়
কে ছিল রে হৃদয়-মাঝারে,
দুলিত কে অরুণ-দোলায়।

তুলনীয়—

In the clear golden prime of my youth's dawn
Upon the fairy isles of sunny lawn ('Epipsychidion', ll. 191-2)

তারপরে লক্ষণীয় শেলির কবিতাটির মূলভাব— সেই মায়াময় আগন্তুক কবিরই যমজসস্তা—

কে সে প্রাণে এসেছিল নারি?
সে আমার শৈশবের কুড়ি,
সে আমার সুকুমার আমি।

যমজ সস্তা কথাটা ঠিক হল না। 'Epipsychidion'-এর অর্থ 'আত্মার মাঝে আত্মা, এই কবিতায় রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'উপচ্ছায়া'। আর একটি অংশ এইরূপ—

হৃদয়ের অরণ্য আঁধারে
দুজনে আইনু পথ ভুলি।

সম্ভা সংগীত থেকে 'মানসসুন্দরী' কবিতাটি পর্বাস্তুর নাম 'হৃদয় অরণ্য'।^৭ জীবনের অরণ্য মধ্যে কবি ও তাঁর মানসসুন্দরী হারিয়ে গিয়েছিলেন এই ভাব শেলির কবিতাটিতেও আছে—

Therefore I went forth with hope and fear...
Into the wintry forest of our life . (ll 246-249)

এইভাবে আর একটি প্রতিধ্বনি আছে প্রভাতসংগীত গ্রন্থের 'পুনর্মিলন' কবিতায়—

হৃদয় নামেতে এক বিশাল অরণ্য আছে,
দিশে দিশে নাইকো কিনারা,
তারি মাঝে হ'নু পথহারা।

এই ভাষার সঙ্গে দাস্তুর 'ডিভাইন কমেডি'র প্রথম স্তবকের মিল না লক্ষ করে উপায় নেই। শুধু তাই নয়, সমগ্র পুনর্মিলন কবিতাটিকেই 'ডিভাইন কমেডি'র ভাষা বলা যায়, সুরজিৎ দাশগুপ্ত এই মত ব্যক্ত করেছেন পূর্বোক্ত গ্রন্থে। কিন্তু ব্যাখ্যা দেন নি, বিশ্লেষণ করেন নি, এমন কি বলেন নি বিশাল 'ডিভাইন কমেডি'-র কোন্ অংশ এখানে বিবেচ্য। মনে হয় স্বর্গ ('Paradiso') পর্বের কথা বলেছেন, কেননা এই পর্বে আছে স্বর্গীয় প্রিয়তমা বিয়াত্রিচের সঙ্গে কবির আধ্যাত্মিক পুনর্মিলন ও নবজীবন লাভ। এই নবজীবন কথাটাতে ক্রিস্টান আধ্যাত্মিকতার অর্থভার আছে। তুলনীয় দৃষ্টান্ত দেওয়া যায় 'পুনর্মিলন' থেকে—

আজিকে একটি পাখি পথ দেখাইয়া মোরে
আনিল এ অরণ্য-বাহিরে
আনন্দের সমুদ্রের তীরে।

P31195

সহসা দেখিনু রবিকর.

সহসা শুনি কত গান।

এখানে লক্ষণীয় ‘প্রভাতসঙ্গীত’ কবিতাটিরও প্রতিধ্বনি— একটি শুভ প্রভাতে হঠাৎ দৃষ্টিলাভ করা। কাব্য স্বতই ধ্বনিময়। একটি ধ্বনি, একটি ভাবনা বহুদূর ছড়িয়ে যায়, মনকে বেঁধে দেয় একটি সুর বা গৎ-এ। এই যে হঠাৎ আলো ও গানে জেগে ওঠা, এই যে আনন্দসাগরের ধ্বনি শোনা, এই ভাব রবীন্দ্রকল্পনাকে পরিসিদ্ধ করেছিল। এইভাবেই পরতে পরতে জমা হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের ভাবনার ঐশ্বর্য। তবে এখানে মনে রাখা দরকার শেলিও দাস্তুর অনুবাদক ও মুঞ্চ পাঠক ছিলেন। রবীন্দ্রনাথও অল্প বয়সেই দাস্তুর পাঠ করেছিলেন, তার একটা প্রমাণ রেখে গেছেন তাঁর প্রবন্ধে ‘বিয়াত্রিচে, দাস্তুর ও তাঁহার কাব্য।’* বিয়াত্রিচে ও দাস্তুর প্রেম তাঁকে মুঞ্চ করেছিল, তাঁর প্রেম ও পূজার অভিন্ন রূপ কল্পনার প্রেরণা স্বরূপ হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে দাশগুপ্ত পূর্বোন্নিখিত প্রবন্ধে যে মন্তব্য করেছেন তা মনে রাখা উচিত— ‘প্রিয়তমাকে জীবনের ধ্রুবতারা অথবা মর্তের গৃহের প্রান্তে দেবতার দূতীরূপে কল্পনা সমগ্র রবীন্দ্রকাব্যে ব্যাপ্ত।’ রবীন্দ্রনাথের ওপরে দাস্তুর প্রভাবের এই ইঙ্গিতমাত্র দাশগুপ্ত দিয়েছেন, কোনো আলোচনা করেননি। এটি একটি ঘটতি— বইটি যে আশার উদ্রেক করে তা মেটায় না। যাই হোক, দাস্তুর বিয়াত্রিচে, শেলির এমিলিয়া ভিভিয়ানি ও রবীন্দ্রনাথের মানসসুন্দরী, এঁরা সব এক সারের নারীমূর্তি। এই মানসী রবীন্দ্রনাথের কল্পনা থেকে মিলিয়ে যায় নি. চিরস্থায়ী হয়েছে। পূজা ও প্রেমের মিশ্রিত রসের উৎসরণ এই ভাব থেকেই। শেলি, দাস্তুর ও রবীন্দ্রনাথকে একসূত্রে দেখতে গিয়ে ‘পুনর্মিলন’ কবিতায় পাই আর একটি বাক্য প্রতিমা— ‘অশ্রুভেদী শুভ সৌধ’— ‘Adonais’ কবিতার প্রচ্ছায়া— ‘Life, like a dome of many-coloured glass/Stains the white radiance of eternity’ (‘Adonais’ 463-64)। ‘কালের কপোলতলে শুভ সমুজ্জ্বল’ (‘সাজাহান’)— এই কলিটির মধ্যেও কি অজ্ঞান্তে শেলির আভাস আসে নি? অথবা ‘জন্মদিনে’ (২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১) কবিতাটিতে? ‘দেখিলাম সদ্যজাত উষা/আঁকি দিল আলোকচন্দনলেখা/হিমাদ্রির হিমশুভ পেলব ললাটে।’

প্রভাতসঙ্গীত-এর ‘সূচনায়’ (কাব্যগ্রন্থগুলির এইরকম সূচনা পরবর্তী কালের লেখা, পঞ্চাঙ্গদৃষ্টি) কবি লিখেছেন—

সেই সময়কার কথা মনে পড়ছে যখন কোথা থেকে কতকগুলো মত মনের অন্দর
মহলে জেগে উঠে সদবের দরজায় ধাক্কা দিচ্ছিল। ওইগুলোর নাম— অনন্ত জীবন,
অনন্ত মরণ, প্রতিধ্বনি।

দরজায় বা জানলায় আঘাত দিয়ে এক অতিথি বা আগন্তুকের আগমন ও সেই আগমনে কবির জেগে ওঠা রবীন্দ্রনাথের একটি উল্লেখযোগ্য চেতনা। ‘প্রভাতসঙ্গীত’ কবিতাটিতে, জেগে ওঠার অন্য আর একরকম রূপ আছে— প্রবল চিন্তোন্মাদনা ও ছন্দন্ত্য। এইটি প্রথম পর্যায়ের একটি শ্রেষ্ঠ কবিতা, বলা যায়, কবির ‘first fine rapture’। কাব্য এক সুন্দর প্রভাতে ‘শুভক্ষণে’ আর একটি রবীন্দ্র প্রতীক বার্নার মতো কঠিন আবরণ ভেদ করে আত্মপ্রকাশ করে— এই ভাবটি প্রতীকায়িত সমগ্র কবিতায়।

এই কবিতাটির কলোচ্ছ্বাসের পরে ‘অনন্ত জীবন’ ও ‘অনন্ত মরণ’— যুগ্ম কবিতা— ভিন্ন সুরে জগতের আনন্দলৌক্যে জেগে ওঠার বাণী বহন করেছে। ভাষা আবেগময় নয়,

ভাবনাবিহীন। পূর্ব ও পশ্চিমের আদান প্রদানের কথা আছে। আছে 'আর একটি গভীরতর ভাব— জীবন ও মরণ। এই দুটি ভাবই শেলির দার্শনিক চিন্তার আলোতে দীপ্যমান। খ্রিস্টীয় চেতনায়ও 'অনন্ত জীবন' একটি মূল্যবান ধারণা— Eternal Life; খ্রিস্টধর্মে কিন্তু Eternal Death-এর কথা বলা হয় না, অন্তত আদর্শগতভাবে তো নয়ই। শেলি প্রথাগত ধর্ম মানতেন না— মৃত্যুকে তিনি (ও অন্যান্য রোমান্টিক কবিরা) জীবনের মহান পরিণতি রূপে কল্পনা করেছিলেন। কালিসাধন মুখোপাধ্যায় কবিতাটিকে 'Hymn to Intellectual Beauty' থেকে উৎসারিত মনে করেছেন। এখানে একটি বিশেষ দিকের কথা বলি। শেলির Hymn-এ কবিচেতনায় এক ভাবগভীর, 'awful' (মানে awesome), অদৃশ্য শক্তির ছায়া পড়েছে, যেন একটি মহাজাগতিক চেতনা। এই কবিতা রবীন্দ্রনাথকে আজীবন বিমুগ্ধ করে রেখেছিল, ও তাঁর অজস্র ভাবনার উৎসস্থল হয়েছিল। রবীন্দ্র-অম্বোবা^৭ গ্রন্থে উজ্জ্বলকুমার মজুমদার মন্তব্য রেখেছেন যে 'সোনার তরী' কবিতাটিতেও মানসী-র 'বিষাদ', 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' (সোনার তরী) এবং চিত্রা-র কবিতাগুলির মধ্যে শেলির কয়েকটি কবিতা প্রচ্ছন্ন আছে, বিশেষ করে 'Hymn'। এই সব কবিতাতে যে অদৃশ্য শক্তির কথা বলা হচ্ছে সেই 'শক্তি ধারণার সমর্থন' (রবীন্দ্রনাথ) যে শেলির 'Hymn to Intellectual Beauty' থেকে পেয়েছিলেন তাতে সংশয়ের অবকাশ নেই।^৮ ড. মজুমদার আরো বলেছেন যে 'বিহারীলালের কাব্যে অদৃশ্যশক্তির ধ্যান প্রসঙ্গ আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ এই কবিতাটির উল্লেখ করেছেন নিজেই।' একথাও তিনি বলেছেন যে অনন্তর ধারণার উৎস 'Adonais'-এর 'One' ('The one remains the many change and pass')। এই ভাব রবীন্দ্রকাব্যে নানা ভাবে প্রকটিত, একটি রূপ 'জীবনদেবতা' অন্যটি 'অন্তর্যামী' (চিত্রা): 'অন্তর্যামী হলো জীবনদেবতারই কবি-চিন্তাবাসী বেগবান শক্তি। অর্থাৎ এক শক্তিরই দুটি রূপ।'^৯ অন্যদিকে রবীন্দ্রকাব্যে পশ্চিমালোক গ্রন্থটি তালিকামূলক শ্রীমুখোপাধ্যায় প্রায় দেড়শ কবিতার উৎস সনাক্ত করেছেন। ড. মজুমদারও এইরকম অনেক উৎস সনাক্ত করেছেন, কিন্তু তাঁর কৃতিত্ব প্রধানত ব্যাখ্যা।

একই ভাবকে বিভিন্ন কবিতায় ও গানে, বিভিন্ন চিত্র ও ছন্দে প্রকাশ করতে ভালোবাসতেন রবীন্দ্রনাথ। শেলির কয়েকটি মাত্র কবিতা তাঁর মনে অসংখ্য শব্দতরঙ্গের জন্ম দিয়েছিল। যেখানে স্পষ্ট উৎস প্রমাণ সহজে করা যায় না। সেখানেও আছে শেলির অদৃশ্য ছায়াপাত। শুধু যে কবিতা ধরে ধরে উৎসায়ন তা নয়, শেলির সমগ্র মানসিকতা, শেলির ভাবুকতা, উচ্ছলতা, শেলির রোমান্টিক ক্রন্দন, তাঁর বিশ্ব-চেতনা, মহাজগৎ ও অনন্তের ধ্যান, শেলির জীবন ও মৃত্যুর বোধি রবীন্দ্রনাথের চেতনাকে নানা রঙে রাঙিয়ে দিয়েছে। 'Mont Blanc' কবিতায় আছে সেই ভাষা—

The everlasting universe of things
Flows through the mind, and rolls its rapid waves.
Now dark—now glittering – now reflecting gloom.
Now lending splendour, where from secret springs
The source of human thought its tribute brings
Of waters.'

এই অনন্ত বিশ্ব, এই অনন্ত প্রবাহ, এই জলচেতনা রবীন্দ্রকাব্যে নানা বর্ণালির আলোতে

রঞ্জিত। সাগরের পানে ছুটে চলা নদী তার একটি বৃপাভূ পৃথী হতে মহাশ্রোত ছুটিতেছে অবিরাম/সেই মহাসাগর উদ্দেশে' ('অনন্ত জীবন') ; 'জগৎ শ্রোতে ভেসে চলো, যে যেথা আছ ভাই (শ্রোত)। শেবোক্ত কবিতাটি 'Mont Blanc'-এর আরও নিকট প্রতিধ্বনি—

জগৎ শ্রোত বহে গিয়ে কোন সাগরে মেশে

অনাদি কাল-চলে শ্রোত অসীম আকাশেতে,

উঠেছে মহা কলবব অসীমে যেতে যেতে ইত্যাদি।

'দূর হতে শুনি যেন মহাসাগরের গান' ('নিরাবের স্বপ্নভঙ্গ')— রবীন্দ্রনাথ কি এখানে নিজের কল্পনাকেই আস্থান করছেন না? সাগর পার হয়েই তো তিনি দেখতে পেয়েছেন সেই মহান শ্রোতের যাত্রা, যার ভূমানন্দ 'Mont Blanc'-এ ঘোষিত— অতি উত্তাল এই তুমুল হৃদ—

One majestic River

The breath and blood of distant lands, forever

Rolls its loud waters to the ocean waves.

নদী ও সাগরের এই মিলন ও কলরোল ওয়র্ডসওয়ার্থেও আছে, আছে এক মহাপ্রবাহের কথা যা সমস্ত বস্তুর ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে ('Tintern Abbey')। তার কারণ শেলিও একজন ওয়র্ডসওয়ার্থ-অনুপ্রাণিত কবি। স্বীকার করতেই হবে যে শেলিও ওয়র্ডসওয়ার্থ-এর এই অনন্ত প্রবাহ উপনিষদের গতিবাদের সঙ্গে সহজেই মিলে যায়। দেশের মাটিতে বিদেশের কাব্যকে আনতে গেলে চেতনার সেতু তো লাগবেই।

মানসী (১৮৯০) থেকে চৈতালি (১৮৯৬), কবির তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ বছর বয়সের মধ্যে রচিত এই চার গ্রন্থকে অনেকেই রবীন্দ্রনাথের উৎকৃষ্টতম পর্যায়ের মধ্যে ফেলেন। তাহলে বলতে হয় কবি-কাহিনী, সম্বাসঙ্গীত, প্রভাসঙ্গীত, ছবি ও গান এবং ক্লডি ও কোমল অনুশীলন পর্ব। এখানেও উৎকৃষ্ট কবিতা অনেক আছে। তবে সমগ্র পর্যায়টিতেই আছে ইংরাজি কাব্যের ভাবপ্রবাহ। মানসী-র প্রথম ধ্বনিতেই কবির খোলা মনের সাড়া আছে— 'নিভৃত এচিস্ত মাঝে নিমেষে নিমেষে বাজে / জগতের তরঙ্গ আঘাত।' কবি এখন স্থায়ী কবি-সত্তাকে নানান ভাবে দেখছেন। কখনো ছন্দের শ্রোতে ভেসে যাচ্ছেন, কখনো এক উপস্থিতির উদ্দেশে মুখর হয়ে উঠছেন, মিল, যতি, অনুপ্রাস ও নানাবিধ অলংকারে ভূষিত করছেন কাব্যভাষাকে। আবার রোমান্টিক ভিস্তরিও কাব্য থেকে সংগ্রহ করছেন ভাবচিত্র। 'মালা ছিল তার ফুলগুলি গেছে / রয়েছে তোর' ('ভুল-ভাজ')— শেলির পরিচিত কবিতার প্রতিধ্বনি— 'Rose leaves when the rose is dead.' 'ক্ষণিক মিলন'-এ যখন শুনি 'সহসা এ জগৎ ছায়াবৎ হয়ে যায়', তখনি ধরতে পারি শেলির 'Hymn' এখানেও কাজ করছে— 'The awful shadow of some unseen power' ইত্যাদি। শেলির সেই অজানা উপস্থিতি রবীন্দ্রনাথের ভাষায় :

কেবল ধুক ধুক করে বুক নিশিদিন

যেন গো ধ্বনি এই তারি সেই চরণের।

শেলির অদৃশ্য শক্তির কল্পনাকে রবীন্দ্রনাথ ক্রমে ভক্তিমার্গের ভাষা দিয়েছিলেন। 'চরণ' ও 'ধ্বনি' মিলে একটা ভাবশ্রোত উঠে আসছে, এক ব্যক্তনাময় সমাসে জেগে উঠবে কবিতায়, গানে। এই ভাবে কবি তাঁর ভাবের তৃণ ভরে চলেছেন, বর্ণালি ছড়াচ্ছেন-বাংলা কাব্যে।

ক্রমেই তা হয়ে উঠছে তাঁর স্বর্ণতরনী। নূতন জীবন, নূতন মাধুর্য আসছে কবিতায়, আর তা প্রায়ই নেচে উঠছে সংগীতের ছন্দে। দুটি কবিতা, 'ব্যস্ত প্রেম' ও 'শুশু প্রেম'; দুটি-ই যেন গীতিধর্মী— কেন তবে কেড়ে নিলে লাজ আবরণ', 'তবে পরাণে ভালোবাসা কেন গো দিলে/ বুপ না দিলে যদি বিধি হে।' ভাষার মাধুর্য উচ্ছলিত হয়ে উঠেছে স্বরধ্বনির সংগীতায়নে। কাব্যভিসারী রবীন্দ্রনাথ এক মন্ময়, মধুর ভাষার টানে গীতকণ্ঠ হয়ে উঠছেন, কিন্তু আবার ফিরে আসছেন দর্শনমূলক কবিতায়, যেমন 'ধ্যান' ও 'অনন্ত প্রেম' প্রভৃতি। শেষোক্ত কবিতায় শেলির দর্শনে পড়েছে বৈষ্ণব কবিতার রং— 'জন্ম অবধি হম বুপ নেহারলু / নয়ন না তিরপিত ভেল।' কোলরিজের দুটি শর্ত— ছন্দমাধুর্য ও দার্শনিকতা— এই দুই-এর সমন্বয়ে রবীন্দ্রকাব্য হয়ে উঠেছে ধ্যানগম্ভীর।

ছন্দের অফুরন্ত কলাকৌশলে রবীন্দ্রকাব্য সততই গীতিময়। কানের ভিতর দিয়ে মরমে প্রবেশ করা ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। এই ছন্দের মোহ কবিকে ধ্বনিসর্বস্ব লিরিকের দিকে যে টানত না তা নয়, যেমন— চিত্রা-র 'নগরসংগীত'; কিন্তু কবি মানসী, সোনার তরী, ও চিত্রা গ্রন্থে এক নতুন ছন্দের ব্যবহার— অন্ত্যমিল আছে কিন্তু ভাবপ্রবাহ অন্ত্যবদ্ধ নয়, অর্থাৎ রোমান্টিক blank verse, যার বুপ শেলির কবিতাটিতেই রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন। এইরকম পদ্যে ধ্যানগম্ভীর, সম্বোধনমূলক আত্মভাষণের ছন্দ সহজেই আনা যায়। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ সোনার তরী-র 'মানসসুন্দরী' ও 'বসুন্ধরা' এবং চিত্রা-র 'প্রেমের অভিষেক' প্রভৃতি কবিতা।

উল্লিখিত কবিতাগুলি শুধু শেলির ছন্দে নয়, শেলির ভাবেও দোলায়িত। 'মানসসুন্দরী' শেলির 'Epipsychidion' থেকে উৎসারিত একথা আর নূতন নয়— মোহিতলাল,^{১০} কালিসাধন, উজ্জ্বলকুমার এবং আরো অনেকে বলেছেন। নূতন কথার মধ্যে একটি হল রবীন্দ্রনাথের মানসসুন্দরী শেলির নারী এমিলিয়ার মতো 'আলোকবসনা', অন্তরের আলো যেন দেহ ভেদ করে বার হয়ে আসছে। শেলির ভাষায় এই আলোর বুপ এইরকম—

The brightness of the divinest presence trembles through
Her limbs (II 77-78)

আর রবীন্দ্রনাথের কথায়—

মুগ্ধ তঃ নবি যায়, অন্তর কেবল
হৃদয়ের সীমান্ত প্রান্তে উদ্ভাসিয়া উঠে
এখনি ইন্দ্রিয় বন্ধ বুঝি টুটে টুটে।

'অঙ্গের সীমান্ত প্রান্তে উদ্ভাসিয়া উঠে' এই ভাষার উৎস কী তা আর কাউকে বলে দিতে হবে না। অন্তরের আলোতে কল্পিত অবয়ব যেন মূর্ত ও বিমূর্তের মিলনরেখার চিত্র। 'Epipsychidion' ও 'Hymn to Intellectual Beauty' রবীন্দ্রকাব্যে দুহাতে বীজ ও অঙ্কুর বপন করেছে; তবে শুধু রবীন্দ্রকাব্যেই নয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় রবীন্দ্রপ্রিয় ফরাসী কবি গতিয়ের (১৮১১-১৮৭২) কথা। গতিয়ের বহুপঠিত কবিতায় আছে— 'বল আমার সুন্দরী যুবতী কোথায় তুমি যাবে। জাহাজ তার রেশমী পাল তুলে দিয়েছে, মৃদুমন্দ বাতাস বইছে, গজদন্তের বৈঠা জ্বলে পড়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছে।' এই কবিতাটি থেকে 'সোনার তরী' উৎসারিত হয়েছে অনেকে বলেন। আবার একথাও বলেন 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'-র প্রেরণা গতিয়ের এই ছোট্ট কবিতাটি। রবীন্দ্রগুরু আশুতোষ চৌধুরী কবিতাটির বঙ্গানুবাদ

প্রকাশ করেছিলেন ভারতী ও বাসক পত্রিকায় (শ্রাবণ ১২৯৩)^{১১}, কিন্তু কোনো ভুল নেই যে আসলে গতিয়ের এই কবিতা শেলির ভাষান্তর—

Emily, A ship is floating in the harbour now
A wind is hovering o'er the mountain's brow
Say my heart's sister, wilt thou sail with me?

(Epipsychideon, II 407-415)

‘নিরুদ্দেশ যাত্রা’-র অঙ্কুরও শেলিতেই আবিষ্কার করা যায়। শুধু যে বিশেষ বিশেষ ছত্রে তা নয়, ভাবে এবং ব্যঞ্জনাও বটে। রোমান্টিসিজমকে বলা হয় সৌন্দর্যের আশ্চর্য্যায়ন বা দুরায়ন— ‘strangeness added to beauty’। ‘নিরুদ্দেশ যাত্রা’-র নারী সুন্দরী ও বিদেশিনী এবং রহস্যময়ী, শুধু আঙুল তুলে এক সুদূর অঘোষার দিকে দৃষ্টি চালিত করছে, ‘বেলা বহে যায়, পালে লাগে বায়—/সোনার তরণী কোথা চলে যায়’ — কী সুন্দর এই উক্তি, আকুল হৃদয়ের এই উৎসুক আবেদন। গতিয়ে? আশ্চর্য কিছু নয়, তবে তরণী ভেসে যাওয়ার চিত্র তো শেলিতেই আছে— ‘A ship is floating in the harbour now/A wind is hovering’ ইত্যাদি। দুটি কবিতা পাশাপাশি রেখে পড়লে, রবীন্দ্রনাথের নূতন পদগুলিকে যেমন— বিদেশিনী, অপরিচিতা, অকূলসিঙ্গু, অসীম রোমন ‘Epipsychidion’ থেকে উপচে পড়তে দেখা যায়। সন্দেহ নেই শেলির এই কবিতা রবীন্দ্রচিন্তে এক প্রবল কল্পনাপ্রবাহের জন্ম দিয়েছিল। শেলি নিজে একজন মহাশক্তিমান কবি, কিন্তু শেলি রবীন্দ্রনাথের একার আবিষ্কার নয়। শেলির কাব্য রবীন্দ্রপ্রজন্মকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। শেলির কল্পনা রবীন্দ্রনাথের, কবিসত্তাকে কতদূর প্রভাবিত করেছিল তার একটি নিদর্শন নিজের কাব্য সম্পর্কে তাঁর মন্তব্যে ধরা পড়ে—

আমার একটি যুগ্মসত্তা আমি অনুভব করেছিলুম যেন যুগ্মশব্দত্রয়ের মতো, সে আমারই ব্যক্তিত্বের অন্তর্গত এ যেন অর্ধনারীশ্বরের মতো ভাবখানা। (সূচনা, চিত্রা)

এই উক্তিতে ‘Epipsychidion’-এর ভাবাংশ আছে। কবি ও সম্বোধিতা এক যুগ্মসত্তা, একই আত্মার ভিতরে আর এক আত্মা, এমনকি অর্ধনারীশ্বরও। রবীন্দ্রনাথ নিজেই সাক্ষ্য দিলেন শেলির কবিতাখানি তাঁর কল্পনার কতখানি অংশ জুড়ে ছিল।

‘যুগ্মসত্তা’র আর একটি ভাষ্য আছে রবীন্দ্রনাথের তরুণ বয়সের রচনা ‘যথার্থ দোসর’ নামক প্রবন্ধে।^{১২} যুগ্মসত্তা, যমজ সত্তা, যথার্থ দোসর প্রভৃতির দ্বারা শেলির কাব্যের যে কখনো এক অদৃশ্য শক্তিরূপে, কখনো নারীরূপে অপর উপস্থিতি আছে সেই মূলভাবটি বুঝিয়েছেন তরুণ কবি। ওই সঙ্গেই আসে সুদূরলোকে যাত্রার কথা। শেলির কবিতা ‘The World's Wanderers’ অনুবাদ করেছেন— ‘হে তারকা ছুটিতেছ আলোকের পাখা ধরে’ এটি প্রথম ছত্র। তারাকে প্রশ্ন করছেন কবি— এখান থেকে কোথায় যায় তারা-রা। কোন্ সুদূর নীড়ে আছে তাদের ভ্রমণের শেষ?

প্রবন্ধটিতে এডুইন আর্নল্ড, ক্রিস্টিনা রসেটী, আর্থার ও’সেনসীর কবিতাও হয় অনুবাদে না হয় ইংরাজি উদ্ধৃতি দিয়ে পরিবেশন করেছেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর চোখ এড়ায়নি যে এই কবিতাগুলো শেলির ভাবে অনুপ্রাণিত। আর্নল্ডের কবিতাটি ‘দোসর’-এর ব্যাখ্যা দেয়—

একটি আশ্রয়হীন হৃদয়ের তরে

আরেকটি হৃদয় একেলা সঙ্গীহীন।

রবীন্দ্রনাথ নিজেই ব্যাখ্যা করছেন— ‘অর্থাৎ একটি হৃদয়ের জন্য আর একটি হৃদয় গঠিত হইয়া আছে। তাহারা পরস্পর পরস্পরের জন্য। শতক্ৰোশ ব্যাবধানে, এমনকি জগৎ হইতে জগদন্তরের ব্যাবধানেও তাহাদের মধ্যে একটা আকর্ষণ থাকে।’ প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রনাথ আরো বলেছেন— ‘তখন হৃদয়ের সেই দোসরের একটি অশরীরী প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাকেই ভালোবাসে, তাহার সহিত কথোপকথন করে।’ এই শেলির কাব্যে ব্যাপ্ত অশরীরী প্রতিমা, যা তিনি তাঁর প্রিয় ভিক্টরিয় কবিদের মধ্যেও প্রতিফলিত হতে দেখেন, তাই রবীন্দ্রনাথের ‘দোসর’, তাঁর অন্তর্যামী, জীবনদেবতা, মানসী বা মানসসুন্দরী।

শেলির ‘Alastor’, ‘Epipsychidion’, ‘Mont Blanc’ ও ‘Hymn to Intellectual Beauty’, এবং অবশ্যই অসংখ্য ছোটো ছোটো লিরিক (যেমন ১৮২২ সালের লিরিকগুলো) রবীন্দ্রনাথকে ভাবসমুদ্রে ডুবিয়ে রেখেছিল। শেলি থেকে পাওয়া আর একটি বিশেষ বাক-প্রতিমার কথা আমি অন্যত্র আলোচনা করেছি।^{১২} এটি বরা পাতার, তাছাড়াও বীণা, ভগ্নবীণা, শুকনো ফুল, এবং ঐ সঙ্গে শ্রোত, সাগর, মহাজগৎ, হাজীকন, মহাকাশ রবীন্দ্র কাব্যে ব্যাপ্ত হয়ে আছে। এই ভাষার উৎস শেলি। এই ভাষা শেলির গভীর প্রভাব। যে বাক্চিত্র, যে ভাবকল্প এইভাবে ব্যাপ্ত হয়ে থাকে তাকে গভীর প্রভাব বলতেই হবে, এগুলি অনুবাদ বা অনুকরণ মাত্র নয়।

একটি কথা এখানে মনে রাখা দরকার। যখন শেলির একটি বিশেষ কবিতাকে উৎস হিসেবে ধরিছি, তার মানে এই নয় শেলির অন্যান্য কবিতা এবং সমধর্মী অন্যান্য কবির কবিতা উৎসে নেই। ‘মানসসুন্দরী’কে বলা হয়েছে ‘Epipsychidion’-এর বঙ্গ রূপ, কিন্তু ‘Hymn’-ও এখানে আছে। ‘Hymn’-এ ‘spirit of Beauty’-কে বলা হয়েছে পলাতকা—

Where art thou gone?

Why dost thou pass away and leave out state ইত্যাদি

প্রশ্নগুলো এই আকুলতা ‘মানসসুন্দরী’তেও আছে, যেমন—

সেই তুমি

মূর্তিতে দিবে কি ধরা, এই মর্ত্যতুমি

পরশ করিবে রাজ্য চরণের তলে

ধরণীর একধারে

ধরিবে কি একখানি মধুর মুরতি?

‘মানসসুন্দরী’ ও ‘নিরুদ্দেশ যাত্রা’— এই দুয়েরই উৎসস্থলে অন্তত আর একজন রবীন্দ্রপ্রিয় ইংরাজ কবি আছেন। টেনিসনের ‘The Voyage’ কবিতার কথা বলছি। অজানা দিগন্তের অন্বেষা টেনিসনের কাব্যেও রূপ পেয়েছে— এই কবিতাটি ও জগদ্বিখ্যাত ‘Ulysses’ কবিতাটিতে। ‘The Voyage’-এ নূতন নক্ষত্র, নূতন দিগন্ত নাবিকদের নিয়ে চলেছে সুদূরের দিকে, সম্মুখে এক নারী। সে নারী অজানা, দুর্জেরা—

Her face was ever more unseen

And fixt upon the far sea-line.

নাবিকরা সেই নারীর দূর্লভ্য আহ্বানে তাকে অনুসরণ করে চলেছে এক চিরন্তন অভিযাত্রায়। সমগ্র কবিতাটিই একটি রূপক— নিরুদ্দেশ যাত্রার রূপক, দূরত্বভার ভাবচিত্র। রবীন্দ্রকাব্যে

সুদূরের আহ্বানের বীজও এই মাটিতেই উগ্ৰ। ‘নিরুদ্দেশ যাত্রা’ কবিতার রহস্যময়ী সুন্দরী টেনিসনের নায়িকার অনুরূপ— অপরিচিতা, দুর্জেরা—

যখন শুধাই ওগো বিদেশিনী
তুমি হাস শুধু মধুরহাসিনী—
বুঝিতে না পাবি, কী জ্ঞানি কী আছে
তোমার মনে।

টেনিসন লিখলেন—

How oft we saw the sun retire
And burn the threshold of the night
Fall from his ocean lane of fire
And sleep beneath his pillar'd light

রবীন্দ্রনাথ ভাষ্য দিলেন—

ওই যেথা জ্বলে সন্ধ্যাব কূলে
দিনের চিত্তা,
ঝলিতেছে জ্বল তবল অনল
গলিয়া পড়িছে অম্বরতল,
দিকবধু যেন ছলছল-আঁখি
অশ্রু-জ্বলে।

(নিম্নরেখা আমাব)

বিদেশিনী নারীর^{১০} আহ্বানে তরী নিয়ে অসীম সাগরে যাত্রা শুরু, উদ্দেশ্য অস্পষ্ট, উদ্দিষ্টার তরফ থেকে কোনো উত্তর নেই। সোনার তরণী ভেসে চলেছে— এই ভাব ও ভাষার উৎস শুধু শেলি নয় টেনিসনও। রবীন্দ্রনাথের কবিতাটিকে উর্মিমুখর সাগর, নৌ-যাত্রা, করা হুহু বাতাসের দীর্ঘশ্বাস ইত্যাদি ধাকা সত্ত্বেও টেনিসনের সুদূরের অশান্ত আহ্বান নেই, আছে রহস্যময়ী নারীর প্রতি কেন্দ্রীভূত দৃষ্টি ও মরমী ভাষা, আছে শান্তি ও সুপ্তির আহ্বান আঁধার রজনীর শান্ত ছবি। এখানেই রবীন্দ্রনাথের স্বকীয়তা সমর্পণ। ভারতীয় চিন্তের আশ্রয়মুখিতা। ইংরাজি কাব্যের যে ধারাপথেই তিনি তাঁর যাত্রা শুরু ককন না কেন, ভারতীয় ভাব ভাষায় তাকে জারিয়ে নিতে পেরেছিলেন বলেই তিনি স্ফুট।

কিন্তু তাই বলে কি স্বদেশি রূপে বিদেশি আদল লক্ষ না করে পারা যায়? নিও-প্লেটনিক দর্শনের বীজমন্ত্র আত্মার সঙ্গে সন্তার প্রণয়লীলা শেলির মহান কল্পনাকে বারে বারে উজ্জীবিত করেছে। সন্তার দুটি রূপ— পুরুষ ও নারী— প্রণয় কাব্যের ভাষায় আশ্রয় পেয়েছে। বৈষ্ণব কাব্যে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলা ভগবদ্প্রেমের মরমী প্রতীক। কিন্তু প্লেটোর প্রেম নারী ও পুরুষের রতিসুখময়। রবীন্দ্রকাব্যে একদিকে বৈষ্ণবকাব্যের বুলন-রূপক (দ্র: ‘বুলন’, ১৫ই চৈত্র ১২৯৯) অন্যদিকে আত্মা (‘পরান’) ও সন্তার নিবিড় সখ্য। রবীন্দ্রনাথ এই পাঠ নিয়েছিলেন শেলির কাব্য থেকে। চিত্রা কাব্যগ্রন্থে বিদেশি উৎসের বহু বৈচিত্র্য আছে। তার জন্য স্বতন্ত্র আলোচনার প্রয়োজন আছে। এখানে মাত্র দুটি কবিতার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব। ‘অন্তর্যামী’ ও ‘জীবনদেবতা’ প্রথম পর্যায়ের দুটি ভাবপ্রধান কবিতা, দর্শনগম্ভীর, কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ত, অনাবিল, ছন্দের প্রকরণে মুখরিত। সোনার তরীতে ছোটো ছোটো কলি ও

মিলের আধিক্য নিয়ে যে হাঙ্কা গীতিছন্দের সৃষ্টি হয়েছে সেই ছন্দেই *চিত্রা*-র এই কবিতা দুটি লিখিত। রবীন্দ্রকণ্ঠ ক্রমেই স্বচ্ছ, সুরেলা হয়ে উঠছে। একদিকে যেমন সুইনবার্নকে হার-মানানো ছন্দের বাহার, অন্যদিকে মিত্রাক্ষরা blank verse-এর সুপটু ব্যবহার যেমন 'বসুন্ধরা' ও 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতা দুটিতে। 'অন্তর্যামী'র মধ্যে একটা নাটকীয়তা অর্থাৎ প্রত্যক্ষ সম্বোধনের ভাব আছে। 'Epipsychidion' ও 'Hymn'-এর দীর্ঘায়িত ছত্রগুলি আর চোখে পড়ে না এখানে। সম্বোধিতা যেন প্রত্যক্ষা, কিন্তু তাহলেও ব্রাউনিং-এর dramatic monologue-এর মতো নয়। এই সম্বোধন আসলে স্বগত ভাষণ, একটি শৈলীয় আত্মবৃত্তি। এ নারী কবিরই চিত্তস্থিতা মারাবিনী, অর্থাৎ মানসসুন্দরীরই আর একটি রূপ। 'যুগ্মসন্তার' রূপটি এখানেও প্রকট, যার ব্যাখ্যাচ্ছলে কবি নিজেই 'সূচনা'য় এই কবিতা থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। প্রভাব ও স্বভাবের সমন্বয়ে এই কবিতাটিতে রবীন্দ্রভাষার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য প্রবল হয়ে উঠেছে।

অন্তরস্থিত মানবায়িত কবিপ্রেরণার আর একটি শক্তিশালী রূপের দেখা পাওয়া যায় 'জীবনদেবতা' কবিতায়, রবীন্দ্রনাথের দর্শন ও মরমিয়াবাদের নিদর্শন হিসেবে যা বহুলালোচিত। এখানেও সম্বোধনের নাটকীয়তা আছে, আছে হৃদয়কে নির্ভয়ে চলা ছন্দ। অন্তরতমর শৈলীয় কল্পনা যে এখানে কাজ করেছে তা আর কাউকে বলে দিতে হবে না। দাস্তের ভাবও কি নেই? নেই পূজা ও প্রেমের মিশ্রিত মাদকতা? 'কী দেখিছ, বঁধু, মরম মাঝারে রাখিয়া নয়ন দুটি?'

এই ধরনের গীতিকবিতায় একটি দুটি ছত্র বা বাক্চিত্র থাকে যা সমগ্র কবিতায় প্রাধান্য বিস্তার করে বা প্রধান ভাবকে বিপরীত ভাবের সম্মুখীন করে। শেলির সেই অস্তিম বহুরের লিরিক থেকে আবার ফিরে-এল রোমান্টিক রোদনের ভাষা— 'অর্থ্যকুসুম ঝরে পড়ে গেছে/বিজ্ঞান বিপিনে ফুটি।' শৈলীয় বাক্চিত্র ঝরা ফুল, বিজ্ঞান কানন। বিদায় ও বিবাহের পরস্পর বিরোধী সুরে কবিতাটি আলোড়িত। নারী ও পুরুষ স্থান বিনিময় করেছে। বস্তুই নারী, উদ্দিষ্টা হয়েছে দেবতা, নাথ। এই কবিতাটির অর্থ যাই হোক না কেন একটা যেন বেদনার সুর বাজছে। বীণাতে বীণা সুর নামাতে হবে। নূতন বিবাহের দিন উপস্থিত। শেলিকে বিদায় দিচ্ছেন— 'হে কবি, তোমার রচিত রাগিনী/আমি কি গাহিতে পারি।' তাই বোধহয় *চিত্রা*-র অন্যান্য কবিতায় নূতন কবিদের আবির্ভাব হল। 'জীবনদেবতা'-র ঠিক পরবর্তী কবিতা 'রাত্রে ও প্রভাতে' মিন্টনের দিন ও রাত্রির যুগল কবিতার ছায়াবলম্বনে। '১৪০০ সাল' ভাষা পেল আর এক কবির কাব্য থেকে। সে কথা পরে আসবে। আপাতত মনে হল, রবীন্দ্রনাথ তাঁর অফুরন্ত উৎস শেলিকে কিয়ৎকাল ভুলে থাকলেন, আরো অনেক কবির ভাষা মনের দরজায় ধাক্কা মারছে।

চৈতালি-তে দেখা যায় চতুর্দশপদীর ক্রমাঘন্য, যদিও সনেটক্রমের মধ্যে যে একটা কাহিনি চলতে থাকে তা নেই। বিদেশি কাব্যের সামিধ্য করির ভাষাকে সমৃদ্ধি দান করেছে, শক্তিশালী করেছে, কিন্তু *চৈতালি* বস্তুনিষ্ঠ প্রকৃতিচিত্র। কবি নিজেই 'সূচনা'য় বলেছেন— 'বাইরে আমার চোখে ছবি পড়ে, অন্তরে আমি গান গাই।' অন্তরে কিন্তু ভাষা জন্মে আছে। গোপন উৎস থেকে স্রোতধারা বয়ে চলেছে। আপন হতে বাহির হয়ে কবি কিছুকাল বাইরে দাঁড়ালেন।

তারপরে এল *কণিকা*— টুকরো কাব্য, প্রবাদমূলক, ধারাল। রবীন্দ্রনাথ এবার সীমার আনন্দ ভোগ করছেন। এইভাবে নানান রকম পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে কবি এক বিরাট

মোড় নিলেন। এ এক পয়মস্ত মোড়। রূপান্তর, প্রতিধ্বনি, ভাবান্তর এইসব পদ্ধতিগুলো আপাতত আবদ্ধ থাকল হৃদয়-অরণ্য পর্যায়ে। এখন আবিষ্কৃত হল দেশীয় উৎস। দেশীয় ইতিহাস ও উপকথা রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে বাঙ্ময় হয়ে উঠল কথা ও কাহিনী-তে। ‘অভিসার’, ‘পূজারিণী’, ‘বন্দীবীর’, ‘হোরিখেলা’ রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে জনপ্রিয় কবিতার মধ্যে পড়ে।

বাংলায় বিষয়কেন্দ্রিক, মানসিকতাপ্রধান লিরিক কাব্য ও বিদেশি উৎসায়ন প্রায় সমান তালে চলে তার একটি কারণ এই ধরনের লিরিক কাব্য ইংরাজির মারফত এসেছে। নতুন দম নিয়ে ফর্মটি আবার ফিরে আসবে রবীন্দ্রকাব্যে। আসবে বিদেশি প্রতিধ্বনিও। তার মধ্যে একটি প্রধান উৎস ওয়ন্ট ছইটম্যান। শেলির কাব্যও চিরকালের জন্য বিদায় নিল না, বরং কল্পনার গভীরে প্রবেশ করে ভাবকে পাকা রং দিয়ে গেল—ঝরা পাতা, শীর্ণ শাখা, শুকনো কুসুম, ঝড়, নতুন জন্ম, এই সব শেলীয় ভাব রবীন্দ্রকাব্য ও সংগীতে পরিকীর্ণ থাকল।

সাহিত্যে উৎসায়ন অবধারিত। কোনো কবিতা একটি মাত্র ভাবে আটকে থাকে না, এক দমে লেখা হয় না, পরতে পরতে মনে জমা হয়, চেতনার ইতিহাসে নিহিত থাকে। উলটো কথাটাও বলা যায়—একটি ভাবকে একবার মাত্র প্রকাশ করে তৃপ্তি আসে না। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে একথা আরো সত্য। মনের তরঙ্গগুলি একের পর এক আছড়ে পড়েছে কবিতায়, গানে। রবীন্দ্রনাথকে জাগিয়ে দিয়ে গেছেন শেলি। এবং ওয়র্ডসওয়ার্থও। কবি হিসেবে এই দুজনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের জনক-তনয় সম্পর্ক ছিল। তবে শুধু এই দুজনই নয়। যখন যা পড়েছেন, মনে ধরেছে, তার বঙ্গ-রূপায়ণ করা তাঁর আদর্শ ছিল। রেনেসাঁসের মায়াময়তাই তো তাই—মহৎ কাব্য পড়া ও তার প্রতিরূপকে নিজের ভাষায় ধরা।

রবীন্দ্রকাব্যের বৈশিষ্ট্যই হল পদের লালিত্য, বাক্যের অনুরণন ও পুনবুক্তি এবং তা চলে কবিতা থেকে কবিতায়। একটি ভাব বা ভাবময় বাক্য মনে ধরলেই সেটাকে নানান কবিতায় ও গানে পুনঃ পুনঃ ব্যক্ত করায় তাঁর ঝোঁক ছিল, যতক্ষণ না একটা নিটোল কবিতা অনন্ত, অসীম, জীবন, মরণ, সাগরের ভাষা, পৃথিবীর আনন্দলহরী, নদীর ছুটে চলা, বালুকাবেলায় শিশুদের খেলা, জগতের গান, নয়নের জল, আকাশের তারা, কাননের ফুল, অন্তর ও বাহির প্রভৃতি ভাষা তাঁর কাছে ছিল বর্ণালির কাচের মতো। এই বিচ্ছুরণ, এই প্রতিধ্বনিত ভাষা তাঁর কাব্যকে করেছে স্বতই গীতধর্মী। জনচিহ্নে তাঁর প্রতিষ্ঠাই হয়েছে গানের ভিতর দিয়ে।

মানসী-র অন্তর্গত দুটি যুগল কবিতা—‘ব্যক্ত প্রেম’ ও ‘শুণ্ড প্রেম’-এর কথা এই পরিচ্ছেদে আগে একবার বলা হয়েছে। এই দুটি কবিতায় পাই রবীন্দ্রনাথের সেই প্রতিধ্বনিময় মরমী ভাষা, সেই পূজা ও প্রেমের সংমিশ্রণ, সেই ভালোবাসার ব্যথা ও ব্যথার ভালোবাসা। এইভাবে চলে কবিতা থেকে গানে ও গান থেকে কবিতায় যাওয়া আসা। দুটি কবিতারই ছন্দোবদ্ধ গীতধর্মী—অন্ত্য ও মধ্যমিলের প্রাচুর্য, অনুপ্রাস ইত্যাদি তো আছেই। এইসব কলাকৌশলের ব্যবহার চারটি কল্পিত শব্দগুলিকে দিয়েছে এক সাংগীতিক সৌষ্ঠব। স্বরায়ণের মধুর প্রয়োগ (মরম, লাজ, পরান প্রভৃতি তরল ব্যঞ্জন বর্ণের পারস্পর্য) এবং ‘কেন’ ও ‘তবে’ দিয়ে শুরু করা গানের পরিচিত ভাষা (‘কেন তবে কেড়ে নিলে লাজ-আবরণ’, ‘তবে পরাণে ভালোবাসা কেন গো দিলে’) নামধাতু ‘কুহরিয়া’, ‘ব্যাকুলিয়া’ প্রভৃতি কবিতাগুলিকে সংগীতধর্মী করেছে।

কাব্যের এই যে সংগীতায়ন নিশ্চয় তার একটা অর্থপূর্ণ দিক আছে। প্রথম কথা, শেলির লিরিক সংগীতধর্মী। শুধু তাই নয়, তাঁর কাব্যে সংগীত ও সংগীত যন্ত্রের ব্যাপক উপস্থিতি—lyre ও lute, এবং guitar। কবিতাকে song বা music বলা রোমান্টিক কবিদের স্বভাব ছিল এবং কবিসত্তার প্রতীক হিসেবে এই সব বাদ্যযন্ত্র উল্লিখিত হত।^{১*} এই ভাষা রবীন্দ্রনাথে পরিব্যাপ্ত। প্রথম থেকেই রবীন্দ্রনাথ এই আত্মরূপার্থক প্রতীকটির ভক্ত হয়ে পড়েছিলেন। কবিতা ও জীবনকে একসূত্রে গেঁথে দেওয়া কবিতা 'প্রতিধ্বনি' (প্রভাতসঙ্কীর্ণ) তার মধ্যে আছে কবি মনের এই কাহিনি—

অগ্নি প্রতিধ্বনি....

তোর লাগি কাদে মোর বীণা।

তোর মুখে পাখিদের শুনিয়া সংগীত,

নির্ব্বরের শুনিয়া স্বর,

গভীর রহস্যময় অরণ্যের গান,

বালকের মধুমাখা স্বর,

তোর মুখে জগতের সংগীত শুনিয়া,

তোরে আমি ভালোবাসিয়াছি;

পরিচ্ছেদ দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে— রবীন্দ্রনাথের আর একটি প্রধান কবিতার কথা বলেই আলোচনা শেষ করব। কবিতাটি 'বসুন্ধরা' (সোনার তরী), তাঁর শেলি-আবিষ্কৃত্যের আর একটি নিদর্শন। তবে অন্যান্য কবি থেকেও ভাবধারা এসে কবিতাটিকে এক পাঁচমিশেলি চেহারা দিয়েছে। প্রথমে শেলির কথা। উৎস সেই আদি কবিতা, সেই রোমান্টিক কবি চরিত্রের আলেখ্য, সেই কবিসত্তা ও প্রকৃতির মিলনচিত্র। এই কবিতায় রবীন্দ্রনাথ সেই পথেই চলেছেন যার আরম্ভ হয়েছিল কবি-কাহিনী দিয়ে। উৎস কবিতাটি আমাদের পরিচিত—'Alastor'। শেলির সেই কবির মনে পৃথিবীর রূপ, রস, গন্ধ, তার বিচিত্র দেশ সমূহের মানুষ সবই ঢেঁটে তুলত। স্রমিষু কবি অরণ্যে, মরুঅঞ্চলে, অসভ্য জাতির মধ্যে মিশিয়ে দিতেন তাঁর মন। পৃথিবীকে মা বলে ডেকে তার অপত্যস্নেহে সেই কবি লীন হয়ে যেতে চেয়েছেন, বলেছেন—

Mother of unfathomable world

Favour my solemn song, for I have loved

Thee ever, and thee only.

And my heart even gazes on the depth

Of thy deep mysteries.

'বসুন্ধরা'-য় এই ভাবটির নানা মূর্ছনা শোনা যায়—

ওগো মা মৃন্ময়ী

তোমার মৃত্তিকা-মাঝে ব্যাপ্ত হয়ে রই।

এই দীর্ঘ কবিতা থেকে আর উদ্ধৃতি দেওয়া সম্ভব নয়। মোট কথা পৃথিবীর নানা মানুষের, নানা বৈচিত্র্যের মধ্যে লিপ্ত হয়ে থাকার যে আকাঙ্ক্ষা 'Alastor'-এর স্বপ্নিল ভাষায় ধ্বনিত, তারই এক উদাস্ত ভাষা 'বসুন্ধরা'। দুই কবিতাতেই কবিচরিত্রে দৃশ্যমান যাযাবরের

মুগ্ধ রূপ। পরিশেষে বলি, তরুণ বয়স থেকে রবীন্দ্রনাথ শেলি ও ওয়র্ডসওয়ার্থের প্রভাবে একটি প্রকৃতপ্রেমী বিশ্বদর্শী কবি-সত্তাকে নিজের ভিতর অনুভব করেছিলেন। সাগর অথবা স্রোতস্থিনীর তীরে সেই কবিসত্তার জন্ম, তার হৃদয় সমুদ্রের মতো। দেশীয় ভাষা ও ছন্দের মধ্যে বিদেশি কাব্যের স্রোত বইতে দেওয়ার চেষ্টা রবীন্দ্রনাথের একার নয়, তাঁর সমগ্র যুগের। উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র ও কাব্যে মাইকেল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, এবং বিশেষ করে যাঁর দৃষ্টান্ত তিনি অনুসরণ করেছিলেন সেই বিহারীলাল রোমান্টিক সাহিত্যের অনুকরণে অথবা অনুপ্রেরণায় নতুন বাংলা কাব্য সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের কাব্যে আছে নবাবিষ্কারের আনন্দ ও উচ্ছ্বাস। বিহঙ্গকলরবমুখরিত নতুন প্রভাতের আলোয় তিনি বেরিয়েছেন অন্ধকার গুহা থেকে, প্রতীকী ভাষায় সৃষ্টি করেছেন তাঁর সেই পুনর্জন্মের। বিশ্ব, জগৎ, সাগরতীর কথাগুলো বার বার ফিরে এসেছে তাঁর প্রথম পর্যায়ের কাব্যে। তার মধ্যে যেমন আছে শেলির সেই আত্মার ভিতরে আত্মা অথবা অন্তর্যামী, তেমনি আছে অনন্ত ও অসীমের মধ্যে যাত্রা করবার বাসনা। শুধু তাই নয়, শেলির কাব্যের সেই মর্মবেদনা— বিগত সংগীতের প্রতিধ্বনি, ঝরেপড়া কুসুমের সৌরভ, চেতনার ক্রন্দন— এই সব শেলীয় আর্তি রবীন্দ্রনাথের কাব্যে মর্মোচ্ছ্বাস তোলে।

সূত্রাবলি:

- ১ রবীন্দ্র-রচনাবলী, ২৯শ খণ্ড (বিশ্বভারতী ১৯৯৭), পৃ.২০৪-২০৮।
- ২ ঐ, পৃ.২০৯-২২৯।
- ৩ এখানে প্রধানত সঙ্ক্যাসংগীত থেকে চৈতালির কথা বলা হচ্ছে।
- ৪ ক্ষণস্থায়িতা বিষয়ক শেলির আব একটি কবিতা হল 'On A Faded Violet'। কালিসাধন মুখোপাধ্যায় (রবীন্দ্রকাব্যে পশ্চিমালোক (কলিকাতা : তারিখ নেই) এই কবিতাটিকে চিহ্নিত করেছেন কড়ি ও কোমল-এর 'কুসুমের গিয়েছে সৌরভ' কবিতাটির উৎস হিসাবে। 'পবিত্যক্ত' তাঁর মতে 'On Death'-এর সদৃশ। কিন্তু দুটি কবিতায়-ই একই ভাব আছে।
- ৫ প্র: সুরজিৎ দাশগুপ্ত, দাস্তে, গোটে, রবীন্দ্রনাথ (কলিকাতা ১৯৬৭) পৃ.১২। রবীন্দ্রনাথ নিজেই জীবনস্মৃতি-তে 'হৃদয় অরণ্য' কথাটা বলেছেন। রবীন্দ্রকাব্য সমালোচনায় কথাটা প্রথম ব্যবহার করেন মোহিত সেন।
- ৬ ভাবতী, ২য় বর্ষ, ভাদ্র ১২৮৫, পৃ.২০১-২১২।
- ৭ ওই উজ্জ্বলকুমার মঞ্জুমদার, রবীন্দ্র-অধ্বা (কলিকাতা : ১৩৭১)।
- ৮ ওই পৃ.১৪২-১৪৩।
- ৯ 'জগৎ স্রোত বহে', 'অনাদিকাল চলে', শেলির 'universe of things flows', 'everlasting' প্রভৃতির প্রতিধ্বনি বহন করে।
- ১০ মোহিতলাল মঞ্জুমদার, কবি রবীন্দ্র ও রবীন্দ্রকাব্য, ২য় খণ্ড (কলিকাতা ১৩৫৯-৬০), পৃ.৩২-৪১।
- ১১ স্বপ্নস্বীকার : কালিসাধন মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রকাব্যে পশ্চিমালোক।

- ১১ক ভারতী, জ্যৈষ্ঠ (দ্র: রবীন্দ্রবচনাবলী, ৩০, বিশ্বভারতী ১৯৯৮) পৃ.৩৯৩-৪০২।
- ১২ এই প্রতিচ্ছবি ঝরাপাতাব। বিষয়টি আলোচিত হয়েছে 'ঝরা পাতাগো আমি তোমারি দলে'—শীর্ষক প্রবন্ধে : *Journal of Education*, WBCUTA, Vol.5, No.2, (July 1997), পৃ.৫-১০।
- ১৩ ববীন্দ্রনাথের বিদেশিনী কে? প্রশ্নটি করেছেন বুদ্ধদেব বসু (দ্র: কবি রবীন্দ্রনাথ ১৯৬৬) প্রশ্নটির একটি উত্তর শেলি ও টেনিসনের আলোচ্য কবিতাগুলিতে আছে।
- ১৪ 'L'Allegro' এবং 'Il Penseroso'।
- ১৫ যেমন 'Alastor'-এ কবিকে বলা হচ্ছে বীণা 'A fragile lute on whose harmonious strings the breath of heaven did wander.' অথবা 'Ode to the West Wind' কবিতায় : 'Make me thy lyre'।

‘ভাষা ও ছন্দ’ : রবীন্দ্রনাথের কবিতা

বীতশোক ভট্টাচার্য

চিত্রকর অস্তিত্ববান করে তুলতে পারেন ... আরও তারপরে উচ্চ পর্বতমালা হতে প্রবল
বন্যার শক্তিতে পতনশীল নদীসমূহকে, তাদের ধারায় নামিয়ে নিয়ে চলা উন্মূল উদ্ভিদের
সঙ্গে মেশানো সব শিলাখণ্ড শিকড়গুচ্ছ মৃত্তিকা এবং তাদের পথে সেসবের ধ্বংসাবশেষ
সমেত যা যা পড়ে সমুদ্র, কিছুকেই ধুইয়ে দিয়ে ফেনিয়ে-ওঠা চন্দকে;

রবীন্দ্রনাথ বোধ হয় লেঅনার্দো দা ভিঞ্চির চিত্রতত্ত্ব বিষয়ে ইতালিয় গ্রন্থটির ইংরিজি অনুবাদ
থেকে এ উক্তিটি পড়েছিলেন। হয়তো পড়েন নি। যেন হিমকূট হতে ব্রহ্মপুত্র নদের
অবতরণদৃশ্য ও তার আদিগতি তাঁর ‘ভাষা ও ছন্দ’ কবিতার শুরুতেই রবীন্দ্রনাথ বেছে নিতে
পেরেছিলেন, কবির প্রেরণা ও তাঁর সৃষ্টির প্রণালীর তন্নিষ্ঠ বিষয়ের আশ্রয়রূপে উপযুক্ত
হয়েছিল এ প্রসঙ্গের নির্বাচন। কালিদাসের কোনও কাব্যের সূচনার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে লেখা
যেন এ অংশটি, প্রথম ছত্র হতে বাংলাভাষী পাঠকের বাসনালোক থেকে মেঘদূত-এর —
প্রত্যাসন্ন আষাঢ়ের — ছায়া ঘনিয়ে আসে। প্রথম ছত্র হতে রাজবদনত ধ্বনির সুষম সমবায়,
বিষয়ের যথাযথ বাছাই ও পরিস্থিতির চমৎকার বিন্যাসে, কল্পচিত্রগুচ্ছের প্রচণ্ড সংরক্ত
উপস্থাপনে এবং আদিকবি মহর্ষি বাস্মীকির আত্মিক মহিমায় অস্থিত একটি এপিক-উপমার
মহৈশ্বর্যে ঝলসে-উঠে সাবলিমিটির সে-স্তর যে-ভাবে স্পর্শ করতে সক্ষম হয়েছে এই
উপক্রম-অংশটি, রবীন্দ্র কবিতায়ও তেমন অর্জনের উদাহরণ প্রায় বিরল। দা ভিঞ্চি পূর্বোক্ত
রচনায় আরও উল্লেখ করেছিলেন বৃষ্টিধারায় রূপান্তরিত জলের ওপর থেকে আক্রমণের
প্রসঙ্গ, অধিকারী হাওয়ার শিকার ঘন মেঘপুঞ্জের প্রসঙ্গও। তেমনই এক সত্যতর
অনুভবের দ্বারা কবি বাহিত হয়েছেন, অঙ্কিত করেছেন যুযুধান মৌল উপাদানগুলো নিয়ে
নিসর্গদৃশ্য, যা যে-কোনও বড়ো শিল্পীর কাছে এক আনন্দদায়ক ও ব্যঞ্জনাবহ বর্ণনার বিষয়।
‘হিমাঙ্গি’ শব্দের মধ্যে থেকে গেছে জলভরা মেঘের থেকে বেরিয়ে আসা আগুনের আভা,
যেন ইন্দ্রকে আর অগ্নিকেও সম্বোধন করে ঋগ্বেদের একটি মন্ত্রে বলা হচ্ছে : মেঘ থেকে
বৃষ্টির মতো এ-স্রোতা হতে এই প্রধান স্তুতি উৎপন্ন হয়েছে (মণ্ডল ৭ সূক্ত ৯৪ মন্ত্র ১)।
উর্বরতাবিধায়ক বর্ষণ ধারাপাতে বজ্র-বিদ্যুতে জল ও আগুন এবং বৃষ্টি ও কাব্যসৃষ্টিকে
এভাবে বেঁধে এসেছে ঋগ্বেদের সময় থেকে, আরও এ-কবিতাও নেমে আসা সরস কবুগার
ধারা এবং উর্ধ্বগামী তপস্যার আশ্রয়ে উত্তাপের উভযোজিতায় আদ্যন্ত সৃজনশীল। অবশ্য
সবরকমের জলের দৃষ্টিতে সামের উপাসনার ঠিক সুরটি প্রথম বাঁধা হয়েছিল ছান্দোগ্য
উপনিষতে : মেঘ যখন মিলেমিশে বর্ষণে উন্মুখ তখন তা হিংকার, যখন বৃষ্টি হয় তখন তা
প্রস্তাব, যে সব নদী পূর্বদিকে বইছে তারা উদ্গীথ, যারা পশ্চিমে বইছে তারা প্রতিহার, আর

সমুদ্র হচ্ছে নিখন (অধ্যায় ২ খন্ড ৪ মন্ত্র ১)। নগ্ন পর্বতের গায়ে উপবীতের মতন বৃষ্টির প্রপাত লক্ষ করেছিলেন বাঙ্গালীকি। আর রবীন্দ্রনাথ যখন সংহত সে উৎপ্রেক্ষাকে একটি মহোপমায় প্রকীর্ণ প্রক্ষিপ্ত হতে দিয়েছেন, ক্রমশ বৃষ্টি থেকে নদী, নদী থেকে সমুদ্র — এভাবেই সচল ও বিস্তৃত হয়েছে তাঁর কল্পচিত্রমালা, যেন দা ভিস্কির আবার্ত বিষয়ে চিত্রণের এবং আইনস্টাইন-এর আবার্ত বিষয়ক সম্পর্কের কল্পনা প্রতিভার মিশ্রণে শুরুর হতেই সূচিত হয়েছে বৃশ্চাপ রচনার-বোঁকা : ‘মাতিয়া খুঁজিয়া ফিরে’-চলা ‘অন্তরযোগে’ ‘বারম্বার আবার্তিয়া’-ওঠা ছোটো ছোটো বলয়ের শৃঙ্খল, হ্রস্বতর বিশৃঙ্খলা এবং সাময়িকস্থায়ী শৃঙ্খলার গতিময় এক ঘূর্ণি কেবলই কলোয়েল তুলে অগ্রসর। বন্ধুর-দুর্গম সহজ-প্রত্যক্ষকে আঘাতে-অভিঘাতে এভাবে এগিয়ে দেওয়ার এ-ধরণটি তাৎপর্যে পূর্ণ। ভার্জিল যাকে বলেছিলেন ‘ল্যাকরিমে রেরমু’ বা রবীন্দ্রনাথ ‘নিষিলের অশ্রু’, শোকায়ত এক শ্লোক থেকে সেই অখণ্ড বিপুলতার দিকে এর মহাকাব্যোপম অভিযাত্রা। ধ্বন্যালোকের লোচন-টীকায় বাঙ্গালিকির শোকের শ্লোক হয়ে ওঠার এ-প্রক্রিয়াটিকে ‘প্রতিপন্নো রস : পরিপূর্ণ কুণ্ডোচ্চলনবৎ’ বলে তুলনা করা হয়েছিল, এখানে সে কল্পনাটি ফেটে গিয়েছে, হাজার ধারায় তার বিরাট উচ্ছলন।

মানসী কাব্যের ‘মেঘদূত’ কবিতায়ও এ-চলন ছিল মনে হতে পারে : শ্রাবণে জাহ্নবী যথা যায় প্রবাহিয়া / টানি লয়ে দিশ-দিশান্তের বারিধারা / মহাসমুদ্রের মাঝে হতে দিশাহারা। কিন্তু সে টান আসলে ছিল বৃষ্টির চেয়ে শিখরে মেঘের সন্নিপাতের দিকে, ‘গভীর জলদমদ্রের’ আবৃত্ত হলেও এই ‘নব ছন্দ’ অনুষ্টিপ, মন্দাক্রান্তা নয়; এবং এ জলধারাও ‘শ্রাবণে জাহ্নবী’র বদলে আষাঢ়ের ব্রহ্মপুত্র। বাম্পীকির আশ্রম গঙ্গার উত্তরে না দক্ষিণে সে-সম্পর্কে বিতর্কের অবসান হয় নি, গঙ্গাবতরণের বর্ণনা মূল রামায়ণে ছিল কিনা তাও বিতর্ডার বিষয়, গোবর্ধন ‘আর্যাসপ্তশতী’তে রামায়ণের ধারা ও গঙ্গার ধারাকে মিলিয়ে দেখিয়েছেন, আর আষাঢ়ের ভরা নদ ব্রহ্মপুত্রকে তাঁর কবিতার বাহন করলেও মনে হতে পারে মামল্লপুরমে পাহাড়ের গায়ে উৎকীর্ণ সেই উল্লম্ব নির্ঝরসমেত গঙ্গাবতরণের বিশাল রিলিফটির মহিমা রবীন্দ্রনাথ লক্ষ করেছিলেন, সেই সঙ্গেই দেখেছিলেন সে উর্ধ্ববাহু-যোগীকে, তিনি হচ্ছেন যোগী রাজ শিব। শিবের জটা হতে গঙ্গা উৎসারিত, কিন্তু এক্ষেত্রে ব্রহ্মপুত্রই ‘ক্ষিপ্ত ধূজিটির প্রায়’, এবং ‘ভাবোন্মত্ত মহামুনিবর’ বাম্পীকির সঙ্গে শিবের মিল খোঁজার অন্য কারণও রয়েছে। বাম্পীকি প্রগাঢ়ভাবে শৈব কবি, রবীন্দ্রনাথও নিজেই শৈব ভাবতে ভালোবাসতেন বোধ হয়, কাশ্মীরের শৈবতন্ত্র থেকে প্রাচীন ভারতের রসতত্ত্ব তার উৎসাহ আহরণ করেছে। পূর্বোক্ত জল-আগুনের উভযোজ্যতায় বাম্পীকির সামনে সহসা আবির্ভূত দেবর্ষি নারদের ‘জটোরশিজালে’ শাখাসুপ্ত পাখিরা সচকিত : সে-জালে জলকণা নেই, আলোর কণার সে জটিল ফাঁসে অবশ্যই পাখিরা ধরা পড়ে নি, ধরা পড়ে নি মাছেরাও, কিন্তু দেবর্ষি নারদের বিপরীতে মহর্ষি বাম্পীকির শৈব কল্পচিত্রটি নৈসর্গিক প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

১. বহি উর্ধ্বে মেলিয়া অঞ্জুলি
ইঙ্গিতে করিছে স্তব;
২. সমুদ্র ভরঙ্গ বাহু তুলি
কী করিছে স্বর্ণ জানে;
৩. অরণ্য উঠায়ে লক্ষ শাখা
মরিতেছে মহামদ্র;

৪: ঝটিকা উড়িয়ে বুদ্ধ পাখা
গাহিছে গর্জনগান;

বহিঃ-সমুদ্র-অবণা-ঝটিকার প্রাকৃতিক শক্তি একত্রে সংলগ্ন, উর্ধ্ব মেলিয়া-তুলি-উঠায়ে-উড়ায়ের ক্রিয়া সমবেতভাবে উদ্ভীর্ণ করে দিতে চাইছে, যেন সপ্রাণ একটি-কিছু অঞ্জুলি-বাহু-শাখা-পাখা-য় ঘটাতে চাইছে কোনও উত্তরণ। অন্ত্যমিলে মিশে যাচ্ছে তাদের উর্ধ্বায়নের ভঙ্গিমা, তাদের স্তব্ধ-কথা-মহামন্ত্র মিলে যাচ্ছে যাঁর গর্জনগানে, তিনি হচ্ছেন বুদ্ধ, সেই বিশ্রুত রোদনকারী; বাম্পীকির অশ্রুও এখানে নিবিড়। উর্ধ্ববাহ যোগীশ্বর শিবের নিহিত আদ্য কল্পচিত্র এভাবে তপস্বী বাম্পীকির শিল্পগত প্রতিষ্ঠার ভিত্তি রচনা করেছে। এ কবিতায় ঝড়ের মধ্যে বুদ্ধের বিস্ফোভ, ব্রহ্মপুত্রের বন্যার মধ্যে ধূজটির ক্ষিপ্ততা, দুই-ই ধ্বংসের রূপ। কিন্তু শিব শূভংকর, এবং বাম্পীকির ‘ভাবোন্মত্ত’ রূপে তাঁর সৃষ্টিশীল চরিত্রের পরিচয়। ‘তরঙ্গের ডম্বর’ বাজিয়ে ব্রহ্মপুত্র শিবের তাণ্ডবের অনুকরণ করে, হোক সে নাচন প্রলয়ের, তাহলেও ডম্বরবাদন সৃষ্টি শিল্প। ব্রহ্মপুত্র ‘দুঃসহ অন্তরবেগে’ ধাবমান, বাম্পীকিও ‘রক্তবেগ তরঙ্গিতবুকে’ ‘অপূর্ব উদ্বেগভাবে’ ‘ক্ষিপ্ৰগতি তমসার তীরে’ দ্রাম্যমাণ, এবং এই সঙ্কীর্ণ বেগের একত্রে অভিযুক্তা শিল্পের সাধনার মুক্তিকে সূচিত করে, স্মরণে আসে পতঞ্জলির যোগসূত্র : ‘তীব্র-সংবেগানামাসন্নঃ’। ‘আসন্ন’ এ কবিতার প্রথম ছত্রের উপাস্ত্য শব্দ।

লৌহিত্য নদের জলে মহর্ষি কবি বাম্পীকির পিঙ্গল জটর ছায়া ঝলে ওঠে। কিরাতজনকৃতির সন্ধানে ভারতবিদকে যেতে হয় ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকায় কূলে উপকূলে। সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা; ব্রহ্মার পুত্র ব্রহ্মপুত্র নদ এবং কবি বাম্পীকি উভয়েরই মন্ততা লাগে সৃষ্টি ও ধ্বংসের উভয়োজী নেশায় — খেয়ালে। বৈয়াকরণ বাম্পীকি-রচিত প্রথম শ্লোকটিতে আর্ষ প্রয়োগের উদাহরণ খুঁজে পান; ‘মা নিষাদ’... এ উচ্চারণ বদলে ‘ন নিষাদ’ করলে হত না, ‘মা’ শুধু অভিষাপসূচক নিষেধার্থক নয়, আদিকার্যের সংস্কৃত যা সম্ভবত প্রত্ন-ইন্দো-য়োরোপিয় *ম থেকে এসেছে, কিন্তু ছন্দের নতুন রীতিতে বিশ্বস্ত থেকেই বাম্পীকির এ-শ্লোকের সূচনায় ‘মা’ শব্দের অবতারণা, কারণ প্রাত্যহিকতার পদবিধির ওপর এ-অনুষ্ঠান ছন্দের আরোপ এক সংগঠিত হিংস্রতা, এ-সংগঠন বৈদিক অনুষ্ঠানের চেয়ে স্বরূপত স্বতন্ত্র কোনও নির্মাণ, উত্তররামচরিত-এর দ্বিতীয় অঙ্কে এই স্বাতন্ত্র্যের স্বীকৃতি আছে। বাম্পীকির মতো রবীন্দ্রনাথও জ্ঞানতেন ভাষার সহিষ্ণুতা অসীম নয়, তবু ছন্দের অনুরোধে তিনিও ভাষার বলাৎকারে ব্রতী, এ-কবিতার দ্বিতীয় ছত্রেই দেখা যাচ্ছে তিনি দুর্দম না লিখে ব্যাকরণ অসিদ্ধ ‘দুর্দাম’ লিখেছেন, ষষ্ঠ ছত্রে বন-এর বদলে রচনা করেছেন আর একটি নতুন শব্দ ‘বনানী’। ভাষার জাতীয় চরিত্রের দ্বারা নির্ধারিত এ-সব শক্তিপ্রয়োগের ধরন, সীমিত এমন সব সংগঠিত হিংস্রতাই গড়ে দেয় বাম্পীকি রবীন্দ্রনাথদের কাব্যরূপ। বুদ্ধ ব্রাত্যদের শিব, কিরাতবেশী শিব এবং দস্যু রত্নাকর এই হিংস্রতার সূত্রে বাঁধা পড়েন। যিনি অভিষাপ দেন তিনি নিজেই যেন এক নিষাদ, রামের কাছ থেকে সীতাকে বিচ্ছিন্ন করে বাম্পীকি রেখে দেন তাঁর আশ্রমে। নিষাদরূপী অভিষপ্ত বাম্পীকি এবং অভিষাপদানকারী ঋষি কবির এই বিপরীত ভূমিকা এ-কবিতায় স্পষ্ট সক্রিয়তা দাবি করে :

যাও তুমি তমসার তীরে,
বাণীর বিদ্যুৎ-দীপ্ত ছন্দোবাণ-বিদ্ধ বাম্পীকিরে
বারেক শুধায়ে এসো, বোলো তারে, ওগো ভাগ্যবান...

শেষে বাম্মীকির প্রতি উদ্দিষ্ট ও মূলত নারদের প্রতি ব্রহ্মার এককথন থেকে আবিষ্কৃত হয় এক রহস্যময় অন্তরীণ-সংলাপ; সেখানে বাম্মীকির দুই সত্তা চেতনে ও নিশ্চেতনে মুখোমুখি হয়। ফলে তমসা শুধু আর বাম্মীকির আশ্রমের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া নদী হয়ে থাকে না, এ তমসা হয়ে ওঠে সেই অন্ধকার যে বদ্ধমূল অন্ধকার থেকে বাম্মীকি আলোয় জেগে ওঠেন, স্তব্ধতা থেকে অবাক ভাষার বর পান, তপস্যার তাপ থেকে সৃষ্টি করেন স্নিগ্ধ রামচন্দ্রকে। বাম্মীকির গুঢ়গভীর তামসিক চারিত্রের ভিত্তিস্থানীয় তলটিকে অন্তিম গুরুত্ব দান করে এককবিতার শেষ ছত্র : ‘তমসা রহিল মৌন, স্তব্ধতা জাগিল তপোবনে।’ অন্ধকারের ঘুম থেকে মূনির মৌনে না, বাঙময় জেগে-ওঠা সে তো তমসার উৎস হতে উৎসারিত আলোর প্রসাদ পাওয়া, এ সেই প্রসন্নতা যা অর্জন করে একজন রবীন্দ্রনাথ বলতে পারেন : বৃপ-নারানের কূলে / জেগে উঠিলাম; / জানিলাম এ জগৎ / স্বপ্ন নয়। বাম্মীকিরও ‘দিব্যস্বপ্ন’ মিলিয়ে গিয়েছে, ‘দুঃখের তপস্যা’য় বসেছেন তিনি, ‘সত্যের দাবুণ মূল্য লাভ’ করবার জন্যই। ববুণের সন্তান ঋতবান বম্মীকি, ইতিহাসের চেয়ে সত্যতর রচনার জন্য তাঁর রামায়ণের শিল্পায়াস। বম্মীকি জ্বুপের ওপর ইন্দ্রধনু উঠবার সংবাদ আছে মেঘদূত-এ, শ্লোক ১৫, বাম্মীকি যে আলোর প্রসাদ পেয়েছিলেন তাতে ছিল সাতরঙ মেশানো শুদ্ধ শূদ্র তাপ। ‘তমসার তীরে’ তাই শুধু তমসা নদীকূলের অর্থ বহন করছে না, অন্ধকারের তীর একাঙ্গী আলোর তীর হয়ে বাম্মীকির মর্মে বিদ্রু হয়েছ : তমসাবৃত শূন্যের প্রান্তরে অর্থের বিদ্যুৎছটা তো আছেই, ব্রহ্মপুত্রও বান ডেকেছে ভাগ্যবান বাম্মীকির বক্ষে যে বিদ্যুৎ-বাণ বাজল তা বাণীর বিদ্যুৎদীপ্ত ছন্দোবাণ : তীর এবং সমার্থক বাণ শব্দের স্নিগ্ধ প্রয়োগ আরও জোরালো হয়ে উঠতে পারল সমধ্বনিবাচকতার সহায়তায়। এখানেই শ্লেষ ফুরিয়ে গেল না : ছন্দ তো তাই যা আচ্ছাদন করে, আচ্ছন্ন করে। সেজন্যই : যামিনীর শান্তিবাণী ক্ষণমাত্রে অনন্ত সংসার / আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে...। ‘বাণী’ তো রয়েছেই, ‘মাত্রে’ শব্দটিতেও ছন্দের মাত্রার সংবাদ আছে, কিন্তু উপভোক্তার আচ্ছন্নতাই শেষ কথা নয়, যিনি আচ্ছন্ন করে দেন ছন্দোবাণ সে-রচয়িতাকে বিদ্রু করে, যামিনী তখন আর আচ্ছন্ন থাকে না, তমসা বিদ্যুতে বিদীর্ণ হয়। শরবাচক ‘বাণ’ শব্দের নির্ভরে রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ ‘নির্বাণ’ শব্দের দ্ব্যর্থবোধে রচনাটিকে সমান সম্পন্ন করে তোলেন।

নিমেষে নিবাসে দেয় সর্ব খেদ, সকল প্রয়াস,
জীবলোক-মাঝে আনে মরণের বিপুল আভাস;
নক্ষত্রের ধুব ভাষা অনির্বাণ অনলের কণা

এখানে অন্যত্রও : কোথাও মানবের বাক্যে, কোথা নেই অনন্ত আভাস, আভাস শব্দের আশ্রয়ে বৈপরীত্যের আলিঙ্গন ঘনতর হয় : আভাস শব্দের মূল অর্থ দীপ্তি, বাংলায় অর্থ ইয়ৎপ্রকাশ, আর আভাস শব্দের অর্থ পূর্বভাষ, এই আভাষণ ‘নক্ষত্রের ধুবভাষা’য় রূপান্তরিত হতে জানে। সাধারণত যুক্তব্যঞ্জনবহুল বলাই এ-কবিতা অধিক ধ্বনিময় রূপে প্রতীত হলেও ঐ মধ্যবর্তী ছত্রটির মতো অযুক্তব্যঞ্জনময় ‘সরল গভীর’ বিরল মাত্র কয়েকটি পঙ্ক্তিতে রচনাটির প্রকৃত ব্যঞ্জন ধরা দিয়েছে :

১ মাতিয়া খুজিয়া ফিরে-আপনার কুল-উপকূল,

২ আমরা কহিলা ডাকি, 'যাও তুমি তমসার তীরে,

৩ কে পেয়েছে সব চেয়ে, কে দিয়েছে তাহার অধিক,

আখ্যাননির্ভর এ-কবিতায় নাটকীয়তার প্রকাশ বিকাশ ও বিস্ফোরণ এ তিনছত্রে সর্বাধিক। এর প্রথম ছত্রে ব্রহ্মপুত্রের মাতনের মধ্য দিয়ে প্রকাশ হয়েছে তমসাতীরে বাম্বীকির এবং বাম্বীকির ভূমিকায় একদা-অবতীর্ণ পদ্মাতীরে একাকী ভ্রমণরত রবীন্দ্রনাথের 'আপনার' ভাবোন্মাদ। এর দ্বিতীয় ছত্রের বহুঅর্থবাচকতার বিষয়টি পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। এর তৃতীয় ছত্রটিও বিরোধভাসে অলংকৃত, এবং 'চেয়ে' শব্দটির প্রয়োগ এখানে দ্ব্যর্থবোধক, দুই-এর বেশি অর্থের বাচকতা থেকে গেছে বললে আরও ঠিক হয় : 'চেয়ে' মানে তাকিয়ে থেকে, আকাঙ্ক্ষা করে এবং চাইতে বা অপেক্ষা। কে সর্বাপেক্ষা পেয়েছে? এই সহজ প্রশ্নের তলায় জড়িয়ে রয়েছে এক আলংকারিক জিজ্ঞাসা : কে চোখ চেয়ে থেকেই, পাওয়ার ইচ্ছে করেই, সব কিছু পেয়ে গেছে।

চিরবিরহে বিচ্ছিন্ন রাম সীতা যেন ক্রৌঞ্চ ক্রৌঞ্চী, প্রাচীন ভারতের কাব্যতত্ত্বে এ-জাতীয় ব্যাখ্যার সুযোগ ছিল। রবীন্দ্রনাথ বাম্বীকিকেই বাণবিন্দু পাখি রূপে নির্বাচিত করেছেন। বাণবীধা পাখির গান গাওয়ার ক্রিষ্ট তুলনায় আটকে-থাকা কবিতা নয় এটি, বাম্বীকি 'সন্ধ্যাকালে / শাখাসুপ্ত পাখিদের' একজন ভাবলে ডুল হবে। বাম্বীকি পাখিদের মধ্যে গরুড়। মহাভারতের উদ্যোগপর্ব (১০১.১১) এক বাম্বীকির কথা ছিল যিনি গরুড়পুত্র। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বাম্বীকিই যেন গরুড়। মহাভারতের উদ্যোগপর্ব (৯৯.১১) শ্রেষ্ঠ সুপর্ণদের মধ্যে বাম্বীকি অন্যতম একথা বলা হয়েছে। 'ভ্রমিছেন' শব্দে আছে এক ভ্রাম্যমাণ মানুষের বর্ণনা, রবীন্দ্রকল্পনায় এ মানুষটি হয়তো যাযাবর, যাযাবরীয় রাজশেখরের বা বাণভট্টের বা ভট্টির পূর্বকার এক চারণ : অসঙ্গ, অস্থির। মা বিনতা অকালে ডিম ভেঙে ফেলায় অনুর অরুণ বেরিয়ে এসেছিল, সূর্যের এই সারথির সঙ্গে রবীন্দ্রমানসের কিছু একটা থাকলেও তিনি আরও বেশি আত্মীয়তা অনুভব করেন তার ভাই গরুড়ের সঙ্গে, সে পাখিদের রাজা, 'অগ্নিসম' সে, প্রভাস্বর। ব্রহ্মাণ্ডের ডিম বিদীর্ণ করে বেরিয়ে এসেছিল গরুড়, বিষ্ণুর রথের ওপরে স্থিতিশীল তার ধ্বজা, বিশ্ব যেখানে একটি নীড়ের মতো হবে এমন বিশ্বভারতীর স্বপ্ন লালন করেছেন যিনি সে-রবীন্দ্রনাথের স্বাভাবিক মনে হয়েছে এমন বিপুল নীড়ের কল্পনা : অমর বিহঙ্গশিশু কোন বিশ্বে করিবে রচনা / আপন বিরাট নীড়। স্বর্গ থেকে অমৃত আনতে পেরেছে যে পাখি তার সঙ্গে এমন কবির তুলনা চলে যিনি দেববন্দনার বদলে রচনা করেছেন নারায়ণী, যিনি এক মহামানবের নির্বিকল্প স্তুতি সংরচনের জন্য প্রায়-প্রস্তুত। কী মহৎ ক্ষুধার আবেশ / পীড়ন করিছে তারে : রবীন্দ্রনাথের এই বিস্মিত মন্তব্য যার সম্পর্কে যথার্থ প্রযোজ্য হতে পারে সে গরুড় নয়, সে হনুমান, জন্মের পরক্ষণেই সূর্যকে ফল ভেবে তার উল্লসন ও ভক্ষণের আকাঙ্ক্ষা ও তার থেকে বেশি আত্মপরা। চীন ও ভারতের প্রাচীন পুরাণে বানরের বিশেষ সক্রিয় ভূমিকা, রামায়ণের অনুযোজ্য সে-ভূমিকা আরও বিশিষ্ট হয়ে উঠতে পারত, হয়তো হিন্দিভাষী আধুনিক কবি হলে রবীন্দ্রনাথ এক্ষেত্রে বজ্রাঙ্গবলীর তুলনা টানতেন।

ভর্তৃহরি বাক্যপদীয় ব্রহ্মাকাণ্ডে (শ্লোক ১২২) বলেছেন যে, শিশুর আদ্য করণবিন্যাস শব্দভাবনা ছাড়া সম্ভব নয়। বাচস্পতিমিশ্র 'করণবিন্যাস' বলতে ভোজন লেহন এ সবার জন্য

জিহ্বার চালনা বুঝিয়েছেন, বৃষভদেব ‘করণ’ বলতে শুধু উচ্চারণের প্রযত্ন এ-অর্থ করেননি, সঙ্গে সঙ্গে অন্তঃকরণ অর্থও যোজনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতিবাদী শিল্পী না হলেও শরীরের ক্ষুধা এবং মনের ক্ষুধার তুল্যযোগিতা এক্ষেত্রে তাঁর স্বাভাবিক ঠেকেছে। ঋগ্বেদের কাব্যসৃষ্টিতে ‘হৃদয়’ শব্দের ভূমিকা বিশেষভাবে ক্রিয়াশীল ছিল, রবীন্দ্রনাথও উত্তর-বৈদিক রচয়িতা বাণ্মীকির কাব্যসৃজনসূত্রে এ কবিতায় সংক্রান্ত শব্দসমূহের পুনরাবৃত্ত প্রয়োগ ঘটিয়েছেন : দুঃসহ অন্তরবেগে, রক্তবেগতরঙ্গিত বুকে, বেদনায় অন্তর করিয়া বিদারিত, তার বক্ষে বেদনা অপার, উর্ধ্বশিখা জ্বালি চিস্তে। প্রথম স্তবক থেকেই এ-সব উদাহরণ চয়ন করা হয়েছে। বেদনা শব্দটি রবীন্দ্রনাথে শুধু ব্যথার অর্থবাহী নয়, তা বোধ বা সংবেদনের প্রকাশক। ‘ক্ষিপ্ত’, ‘ভাবোন্মত্ত’ এ দুটি শব্দে বাণ্মীকির রচনাপ্রক্রিয়ায় কল্পনার রসায়ন যেমন স্বীকৃত, তেমনই ‘দন্ধ করে প্রাণ’ পদবন্ধে তাঁর বিদন্ধ প্রতিভাও সমান স্বীকৃতি পেয়েছে। বৈদিক তপস্ শব্দটি রবীন্দ্ররচনাপ্রণালীর একটি মূল শব্দ, তপ্ত তপস্যা থেকেই সৃষ্টির উদ্ভব। বৈদিক্যের অনুশঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে : নারদ কহিলা ধীরে। ধীর শব্দটি এক্ষেত্রে ধী-সঞ্জাত। অর্থবোধ থেকে নারদের মূনিরূপে প্রতিষ্ঠা। প্রেরণাস্বরূপ সৌর ও নাস্ত্রিক দিব্য উৎসের উল্লেখ থাকলেও ঋগ্বেদের অগ্নির সম্ভ্রান্ত আবির্ভাব গুরুত্বে পূর্ণ : অগ্নিসম দেবতার দান, ছন্দ সেই অগ্নিসম বাক্যেরে করিব সমর্পণ। ঋগ্বেদে আছে ঐ অগ্নিসম কাব্যের প্রসঙ্গ (৩.১.১৭-১৮)। জল-আগুনের দ্বিক সম্পর্ক মান্য করে রবীন্দ্রনাথের দিব্য প্রেরণার সিদ্ধি : তাই ‘অগ্নিসম দেবতার দান / উর্ধ্বশিখা’, ‘বহি উর্ধ্ব মেলিয়া অঙ্গুলি’ এবং ‘কবুগার উৎসমুখে. মূনি, যে ছন্দ উঠিল উর্ধ্ব’। অবশ্য ‘সংগীতের মতন স্বাধীন’ হয়ে ‘উর্ধ্বমুখে অনন্ত গগনে’ ‘মানুষের ভাষা’ যে উড়তে পারে না এই অকৃতার্থতার বোধ বাণ্মীকির সংস্কৃত অনুভবে যেমন শুদ্ধতাবাদী ফরাসি আধুনিক কবিতায়ও সঞ্চারিত। ব্রাহ্মগাথারণায় ব্রহ্মা কেবল বিশ্বের স্রষ্টা নন, চিত্র-কাব্য-নাট্যের জনক। বেদব্যাসকে যেমন মহাভারত রচনায় বাণ্মীকেকেও তিনি রামায়ণ রচনায় প্রবৃত্ত করিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ এ কবিতার ঘটনা সংস্থাপনে মূল রামায়ণের বিপর্যস্ত বিন্যাস ঘটিয়েছেন, বাণ্মীকির চারিত্রেও নতুন আয়তন যোজনা করেছেন। বাণ্মীকির মধ্যে আর্যভাষীর ধী-শক্তির সঙ্গে অনার্যভাষীর হৃদয়বস্তুর বোধ পূর্ণ হয়েছে। নিষাদ প্রভু-অস্ত্রিক স্মৃতি বহন করছে, কিরাত প্রোটা সিনো-টিবেটান। বাণ্মীকি যে কবুগার উৎসমুখে তাঁর ছন্দ উদ্বারিত করে দিয়েছেন তা বৈদিক ছান্দস-এর থেকে পৃথক কিছু। এ কবুগা বৌদ্ধ পরিভাষায় অহিত-দুঃখ-অপনয়-কামতা। এ কবুগা ইতিবাচক বুদ্ধিনির্ভর সহৃদয়তার বোধ। যে কবুগা যে ভক্তি বাণ্মীকির সময় থেকে রবীন্দ্রনাথের সময় পর্যন্ত ভারত-সাহিত্য বিপ্লাবিত করে গিয়েছে তা অনার্যভাষীদের হৃদয়তা হতে উৎসারিত।

মেলি দিয়া সপ্তসুর সপ্তপক্ষ অর্থভারহীন।/ প্রভাতের শূন্য ভাষা বাক্যহীন প্রত্যক্ষ কিরণ : পূর্বের ছত্রটিতে মায়াময় ‘সপ্ত’ শব্দের আশ্রয়িতা স্মরণ করিয়ে দেয় পৌরাণিক কল্পনায় সূর্যের সপ্তাশ্ব আসলে যে-সাতটি বৈদিক ছন্দ, অনুষ্টুপ তাদের একটি। বৈদিক অনুষ্টুপ যেহেতু বাণ্মীকির অনুষ্টুপ নয়, তা ‘নব ছন্দ’, সেজন্য এ-উদ্ধৃতির ‘পক্ষ’ শব্দটিতে ভর ক’রে তিনি ‘পক্ষবান অশ্বরাজ’-এর কল্পনায় উত্তীর্ণ হয়েছেন, একমাত্র এ-পক্ষিরাজের সঙ্গেই যেন তাঁর উজ্জীন ছন্দের তুলনা। বাংলার উপকথার পক্ষিরাজ ঘোড়া সম্ভবত বিদেশ থেকে এসেছে। অশ্ব শব্দে ইন্দো-য়োরোপিয় মূল *ekwas রক্ষিত, কিন্তু ঘোড়া শব্দের আমদানি হয়েছে

ভারতের বাইরে থেকে। পঙ্কবান অশ্বরাজের কল্পনা মূর্ত হয়েছে গ্রীক পেগাসাসের রূপে, পেগে বা জলের উৎস থেকে তার উদ্ভব। বর্ষগের সাফল্য বহন করে যে মেঘ সে পেগাসাস, সে ঝড় ও বিদ্যুৎ নিয়ে আসে। ঝটিকাবহ বৃষ্টির প্রতীক ঝাঁড়, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতায় সেই ঝড়-বৃষ্টি-বিদ্যুতের আবহ প্রস্তুত করে পেগাসাসকে নিয়ে এসেছেন; কারণ সে উর্বরতা ও উত্তরণের মিথের সঙ্গে যুক্ত, সে কল্পনার উর্ধ্বায়ন ঘটায়। যা কিছু আলোয় ভেসে যায়, জলে ভেসে যায় তা ব্যক্তির নৈর্ব্যক্তিক কল্পনাকে সমুদীর্ণ করে, রবীন্দ্রনাথ তাই 'অগ্নিতরী' ও 'পহুবান অশ্বরাজ'কে তাঁর অভিনব ছন্দের বাহন করেন। আধ্যাত্মিক সৃষ্টিশীলতা এবং কাব্যময় প্রেরণার মূর্ত রূপ এই পেগাসাসকে নিয়ে মর্ত্যের বেলেরোফেন স্বর্গে গিয়েছিল। বেলেরোফেন-এর পত্র ও স্বর্গ অভিযান যাক ও দেবদার সোৎসাহ আলোচনার বিষয় হয়েছে। বৈদিক কাব্য বা শ্রুতি থেকে প্রথম অলংকৃত কাব্য রামায়ণ রচনা প্রক্রিয়ার নয়, লিখন প্রক্রিয়ারও চিহ্ন। ভাষা ও ছন্দ কবিতার একটি কল্পচিত্রে : নক্ষত্রের ধ্রুব ভাষা অনির্বাক্য অনলের কণা / জ্যোতিষের সূচীপত্রে আপনার করিছে সূচনা / নিত্যকাল মহাকাশে; ... কল্পচিত্রটি দান্তেস্ক, কম্মেদিজার পারাদিসোয় (৩৩ : ৮৫-৯০)-এর তুলনা মেলে। সূচীপত্রে এবং সূচনা দুটি শব্দে পুস্তকের কল্পচিত্র চমৎকার গ্রহিত। দান্তের পথপ্রদর্শক ভার্জিল, রবীন্দ্রনাথের বাণ্মীকি।

শোক শ্লোকে পরিণত হলে বাণ্মীকির হয়তো মনে হয়েছিল : সংরক্ষিত এমনকি অব্যবহিত অভিজ্ঞতা থেকে নিশ্চিন্তনায় বুপায়িত হতে থাকা মনের চূড়ান্ত জটিল অবস্থাকে প্রকাশ করা সৃষ্টিশীল কবির একান্ত কাজ, এবং সে অবস্থা এখনও এখনই তাঁকে আলোড়িত আন্দোলিত করছে। ক্রৌঞ্চ মিথুনের একটির হত্যার কাণ্ডটি যদিও কবির বিশেষ কোনও পরিস্থিতিতে তাঁর প্রত্যক্ষ ক্রোধ ও কারুণ্যের ভাবগত প্রকাশ, তবু নৈতিক সক্রিয়তা ও ধর্মবিশ্বাসের সহযোগ সত্ত্বেও, এ প্রকাশ নিরাসক্ত, অনেকটাই নৈর্ব্যক্তিক। সেজন্যই এ প্রকাশে এককালের ছন্দের জ্ঞানের আওতা থেকে বেরিয়ে আসা নতুন অনুষ্টুপ ছন্দে বক্তব্য প্রকাশে তিনি এত বেশি স্বচ্ছন্দ। কিন্তু এই সঙ্গে একথাও সত্য যে, শ্রীত-কাব্যের সংস্কৃত সাংস্কৃতিক পরম্পরার মধ্যে এত বেশি লালিত বলেই এই নতুন অভিজ্ঞতাকে নতুন অনুষ্টুপ ছন্দে আধারিত করবার এবং প্রৌঢ় স্থিতধী প্রাজ্ঞতায় বিষয়টির প্রতি-সুবিচার করবারও সুযোগ তিনি লাভ করেছেন : এমন ভাবলে বিবেচনাটি আর প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যতত্ত্বের বিবেচনা থাকে না, বরং এলিঅটের বিশ-শতকি কাব্যতত্ত্বের সঙ্গে অনেকটাই মিলে যায়।

নারদের জটার জাল দেখে শাখার ঘুমন্ত পাখিরা সচকিত এবং বাণ্মীকি নিজে তাঁর ছন্দের বাণে বিদ্ধ; তবু এককবিতায় সেই একটি পাখির মৃত্যুর প্রত্যক্ষ সংবাদ নেই; বরং রয়েছে একটি পাখির জন্মের কথা; যে পাখি-জন্মেই পরিণত; যে পাখি পৃথিবীতে জন্মেও অমর গরুড়। অশুভ পাখিকে জন্ম দেওয়ার জন্য পাখিনিকে যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়; এই ব্রহ্মাণ্ডের আয়তন ভেঙে যে শিল্প জন্মলাভ করে সেই সৃষ্টিকর্মের অনুভবকে রূপ দিতে চেয়ে রবীন্দ্রনাথ দক্ষতা বিদ্যতা পীড়ন ভেদন উন্মূলন বেদনার উল্লেখ করেছেন, বিশেষত বিদারণের কথাই বলেছেন : "বেদনায় অন্তর করিয়া বিদারিত", "আত্মবিদারণকারী মর্মান্তিক মহান নিশ্বাস"। এ বিদারণ শূণ্য শরীরান্তিক নয়, মর্মান্তিক, প্রাণের কেন্দ্রে থেকে শ্বসিত রাতই-তো ছন্দের নিয়ামক নিরূপক। তবু প্রাতিষিক উপলব্ধিই সব নয়; না বাণ্মীকি না রবীন্দ্রনাথ কেউই পরম্পরাকে

সম্পূর্ণ অমান্য করতে পারেন না। এখানে রবীন্দ্রনাথ একটি নতুন স্তবক যখন শুরু করেন ‘অস্ত্রে গেল দিনমণি’ ব’লে তখন তাঁর চেতনায় অচেতনায় মধুসূদনের পূর্বগামী ছায়া ঘনিয়ে আসে; মনে পড়ে *মেঘনাদবধ কাব্য*-র দ্বিতীয় সর্গের সূচনাবাক্য : অস্ত্রে গেলো দিনমণি।

আশ্রমে সূর্য ‘দিনমণি’ কেন? কেন ‘মহাসংগীত ধন’? কেন ‘নক্ষত্রের অক্ষৌহিণী’? কেন ‘ভাবের চরণে’ শৃঙ্খল? রবীন্দ্রনাথ ঋষিকবির কাছ থেকে রাজারামের কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য পাঠককে প্রস্তুত করছেন, আশ্রম থেকে তাদের পৌঁছে দেবেন কোশল মহাজনপদের রাজধানী অযোধ্যায়। তাই ‘মর্মদ্বার’ উন্মাদিত, তাই কিরণ ‘গীতের ডাঙার’ অবিরত করে দিচ্ছে, রাত্রি ‘পরমনিষেধ’ সূচক প্রহরায় মগ্ন, দুর্গমপল্লবদুর্গে অরণ্যের ঘন অস্ত্রপুর্বে সমীরের প্রবেশ— (দুর্গমপল্লবদুর্গে যমকের চেয়ে যেন বেশি শ্লেষ, সংস্কারহীন বাকের মতো সীতার কাছে অশোকবনিকায় বায়ুপুত্র হনুমানের প্রবেশের ইঙ্গিত), তাই যৌবনের জয়গান, তাই পক্ষবান অশ্বরাজসম নব ছন্দের অপেক্ষা, তাই সে ‘ছন্দ ভাষারে ঘেরিয়া আলিঙ্গনে’ ‘নৃত্যগীতে ঘিরে’ প্রতীক্ষায়। বাম্পীকির আশ্রমের অনতিদূরের অযোধ্যায় তাঁর পরিচিত রাজা দশরথের পুত্র রামের জন্যই এই আয়োজন।

একশো দশ ছত্রের এই কবিতায় নিরানব্বই-এর খাফা পার হয়ে একশোর ছত্রে রামের নাম প্রথম পাওয়া গেল, পাওয়া গেল ‘পুণ্য নাম’ এর সঙ্গে ‘রঘুপতি রাম’-এর অন্ত্যমিল। বাম্পীকি তাঁর ‘কীর্তিকথা’ শুনেছেন, রামের সমগ্র বারতা জানেন না। এ রঘুবংশ নয়, শাহনামা নয়, রামচরিত সম্পূর্ণ না জানলে তিনি রামায়ণের ‘ইতিবৃত্ত’ কেমন করে রচনা করবেন। আরিসতোতেলেসের নির্ধারিত কাব্য ও ইতিহাসের পার্থক্যের প্রসঙ্গ এখানে অবাস্তব, হেরোদোটাসের ইতিহাসেও কল্পনার স্থান অসঙ্কুচিত। প্রায়-আদ্যাবৃষ্টিময় নয় ছত্রে দশটি প্রশ্নের মালা গঁথে যাকে বরণ করতে চাওয়া হয়েছে তিনি দেবতার অবতার এবং — অথবা আদর্শ মানুষ। ‘রাজভালে মুকুটের’ প্রসঙ্গে এসে মহাভারতে রামের কথা শেষ, এবং এ-কবিতায়ও তাই ঘটেছে। মহত্ব ঔদার্য ও ভূমা-সূচক ‘মহা’শব্দের অবিরল ব্যবহারে সম্পন্ন এই কবিতা এক মহামানবকে নিয়ে মহাকাব্য রচনার প্রস্তুতির জন্যই শেষ পর্যন্ত প্রাসঙ্গিক। রবীন্দ্রভাবনায় নায়ক-রাজা হতে পারেন রাজর্ষি; এই রাজর্ষির ধারণার সঙ্গে রাজারাম নন শুধু রবীন্দ্রনাথের বুদ্ধ এমনকি দুঃখমুকুটিত খৃষ্টের হয়তো অমিল নেই। তাহলেও রবীন্দ্রচেতনায় নায়ক দুজন : রাম ও বাম্পীকি। একজন রাজা, অন্যজন এই কবি যিনি তিনি নিশ্চয় নিঃশে ও কার্লহিল-এর ধরনে রচিত নায়ক নন, কিন্তু তিনি স্বয়ং সিদ্ধ ‘গুরুদেব’ ও ‘কবিগুরু’ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরেরই রচিত বাম্পীকি।

...কখনো শুনি, কখনো শুনি না যে

অরুণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

পথের নানান ইশারা

বাখারি বাঁধা হয়েছে। নীচে বাগানের এক কোণে— যেদিকটা কুস্তির কসরত হয়, রোজ সকাল বেলা। নানান কাগজের রঙে রং পড়েছে। হ.চ.হ-র আঁকা সিনারি। মঞ্চ রচনা। নাটকও তারই লেখা। নর্মাল ইন্সকুলে রবির নিত্যসঙ্গী হরিশচন্দ্র হালদার। সঙ্গে ভাগনে সত্যপ্রসাদও ছিল। সেই প্রথম নাটকে নামল রবি। মুক্তকুন্তলা নাটকে, নাম ভূমিকায়। বিকেল নামতেই সোজা দৌড় ছেলেবেলার কথা কওয়ার সাধি, নতুন বৌঠানের কাছে। শাড়ি মালা সাজে সেজেছে রবি। বৌঠানের চোখ একটুখানি জানালার ওদিক হতেই, নিমেষে সিদুরের কৌটো নিয়ে ছুট। বৌঠানের সিদুরকৌটোর লাল আভার রাঙানো সিথিতে তিনি মুক্তকুন্তলাই হলেন।

তখন ঠাকুরবাড়িতে বাংলার নতুন জাগরণের মঞ্চটি যেন স্থায়ী, সচলায়িত। সংস্কৃতির নানা আকারায়িত রূপের আলোকচ্ছটায় উদ্ভাসিত সেদিনের জীবন। ভাব ও কল্পনা জগতের বিস্তারে দেশ বিদেশের কত সম্ভার, জীবনচর্চার সাঙ্গে মিলেমিশে চলেছিল। যার বিভাজন কোনও খোপচর্চায় ধরা দেবার নয়। সংস্কৃত সাহিত্য, তত্ত্ববোধিনী, সরোজিনী নাটক, মেঘনাদবধ কাব্য— ধ্রুপদ, অর্গান পিয়ানোর চতুর্থ মাত্রা; দেশ বিদেশের সাহিত্য, রেখা-লেখা আর নানান সুরে— নতুন পথে এগিয়েই চলেছে। সময়ের ইতিহাস নতুন পুরাতনকে একই প্রাণে ধারণ যেন করেছে। প্রতিদিন রবি-র কাছে চারপাশ এ-দালান ও-দালান— বাহির অন্দর, সবকিছু মিলেমিশে যেন কল্পনার আশ্চর্য দুয়ারখানি মুক্ত করে তুলছিল।

সৃষ্টির নানান ধ্বনি, দখিনের বারান্দার কাছের পৃথিবীর ডাকে সাড়া পাওয়া, একলা পথিকের কিশোর মনে এসে বাসা পেতে লাগল। উত্তরাধিকার ব্যাপকতর হয়ে জেগে রইল। পুরাতন পথের নানান ইশারা আর নতুন পথের হিসেব— নবীন বিশ্বানুভূতিতে মিলতে চলল। কোনও কিছুই ফেলা গেল না। বৈদিক ও বৌদ্ধ যুগের ভারত আবার তার পরের সময়কার পুরাণ কাহিনিও— সবই যেন হাত বাড়ালো, নবীন কবির মনের ল্যাবরেটরিতে। কালিদাসের কল্পনাশক্তি আর কাব্যের এ যেন এক নতুন হরপার্বতীর রূপকল্প। এই তো বৌঠানদের বই নিয়ে দুপুরের অলিন্দে বঙ্কিম-কাহিনি পড়তে গিয়ে মনে পড়ত, পুরাণ কাহিনির পুরাতন পথে কল্পনার রেখায় আধুনিক সাহিত্য-জীবন তো জাগিয়ে তোলাই যায়। তাহলে!

অনেক পরে, ১৩১৯ ভাদ্র মাসে, কবি য়েটস্ প্রসঙ্গে বলবেন : ‘অনুভূতির সেই নবীনতা

যাহার চিন্তকে উদ্বেষিত করে সে এ' পুরাতন পথটাকেই স্বভাবতই ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হয়।' নিজস্ব মন-বিচারের 'পথের সঞ্চয়।'

পুরাণের সংস্কার মন টানে নি। টেনেছিল কাহিনি। রূপকল্পনা। মানুষী অবয়ব— কাহিনি কল্পনা। আর দেবদেবীর নানান রূপ রহস্য। রূপকল্প। নিজস্ব পাওয়ায় সেই সব ভাব ভোরের শিশিরের মতন দিগন্তপথে সূর্য-কাছে যাত্রা করতে চাইত। কল্পনার নানান আলোকচ্ছটায় তাঁর পুরাণ প্রবণতা— অতিপরিচিত দেবদেবীদেরও যেন নতুন পরিচিতির আবেশে এনে হাজির করছিল। প্রথমে কবি মনে— পরপরই কবি হাতে।

দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা— এ কোনো নির্দিষ্ট জীবন-ধাপের পর্ব নয়। নিজস্ব স্বাভাবিক ঘাতপ্রতিঘাতে মনের ইতিহাসে গড়ে ওঠা, সহজ সুন্দর কথকতা— বিশ্বাসের নানান মাত্রা। তবে প্রায় অনেকটাই মানবিকতার— মানুষী রূপে। পুরাতন ধূলি ধূসরতা সরিয়ে, নবীন ভাষ্যের চিরনবীনতা। শক্তির চণ্ডীমূর্তি ক্রমশই যেন, মাটির কাছাকাছি— সবুজ ফসলার ঘরের অন্নপূর্ণার আঁচল নিয়ে, দরিত্রের গৃহলক্ষ্মী রূপে— মাটির দাওয়ায় দূরকে আত্মীয় করে, বসে থাকা হতাশ বাপ-মায়ের বিচ্ছেদ বিরহ কাটানো কন্যার রূপে হাজির হয়। 'গ্রাম্য-সাহিত্য', ১৩০৫ আশ্বিন, আলোচনায় ভারতচন্দ্রের *অম্বদামঙ্গল* পড়া কৈশোর উত্তীর্ণ স্মৃতি থেকে বলবেন— 'তাহার দেবদেবী বাংলা দেশের হরগৌরী'। কৈলাস আর হিমালয়— জেগে উঠতেই তো পারে। সংস্কারহীন কাছের পানাপুকুরে— বৈরাগ্য ও অনুরাগের সংগীতে। ১২৯৩ বঙ্গাব্দে যে 'আলোচনা'র সূত্রপাত করেছিলেন, তাতে কল্যাণ-ভাবনা ও মঙ্গল রূপের চিরপুরাতন চিরনূতনের মিলন ছিল। শিব ও শক্তি ভাবনাও ছিল। ভূগোল ইতিহাস উত্তীর্ণ— মহাবিশ্বেরই যেন কথোপকথন। শুভপরিণয়। সেদিন থেকে দূরের চার অধ্যায় পর্বে— দেশকে তিনি অর্থনায়ীশ্বর রূপে দেখবেন, দেখাবেন— এমন গৃহবাণীর রূপ তিনিই সৃষ্টি করতে পারেন। দেশ-এর নিছক মৃত্যুরূপের মধ্যে চিন্ময়ী প্রত্যয় তাঁর হৃদয়ে উদ্ভাসিত হয়েছিল নানান প্রতিমায়।

পুরাতনের নূতনত্ব

কালের চঞ্চলতা উত্তীর্ণ 'অচঞ্চল দেশ' ভাব — আর এক বহুধায় কালী পূজোর দিনই (৭ কার্তিক ১৩৩৪ *পারিশেষ*)— 'মোহানা'য় আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল— 'কালীকে বহে বক্ষে ধরি শুভ্র মহাকাল বাঁধে না তারে কালো কলুষ জাল।' খণ্ড ও অখণ্ড। Micro-macro-র চিরনবীন বিজ্ঞানচেতনাকেই উদ্ভাসিত যেন করল।

১২৯০-এ *আলোচনা* উৎসর্গ করেছিলেন মহর্ষিকে। বেশ তাৎপর্যময়। মহর্ষির কাছেই Presence of absence-এর শিক্ষা নিয়েছিলেন। হিমালয়ের দ্বারে বসে। পর্বতে। প্রকৃতির বিশ্বরূপের অবিচ্ছিন্ন আমন্ত্রণে। ইতিহাস পুরাণের নির্যাস গ্রহণ পর্বে, মৃত্যুঞ্জয়ী শিবের বরণ রেখায় বলবেন : 'মরণের রঙ্গভূমি শ্মশানের মধ্যে তাঁহার বাস, তবু নৃত্য। মৃত্যু স্বরূপিণী কালী তাঁহার বক্ষের উপর সর্বদা বিচরণ করিতেছেন, তবু তাঁহার আনন্দের বিরাম নাই।' এমন জীবন বিজ্ঞান ধর্ম আলোচনা সেদিন তিনি জোড়াসাঁকোয় করেছেন। ওদিকে সিমলের আর এক মানবিক বিবেকানন্দ বিশ্বপ্রেক্ষাপটে হাজির থেকে, এক কাব্যপত্র সাহিত্যের না-ছাপানো কোনোচে

কোণে, আনমনে, মনের অন্তরতম উপলব্ধি সত্যটি মেলে ধরবেন বৈজ্ঞানিক অক্ষরে Kali = f time। সময় অনন্ত, মহাকাল। মহাকাল— মহাসত্য এমনই আশ্চর্য ভারত-মনন বীক্ষায় উঠে আসছিল। যার প্রাসঙ্গিকতা ‘কালের রাখালের’ও সম্পদ। যা কখনও পুরোনো হয় না। বৃহৎ কালপ্রবাহে নতুন নতুন ভাষ্যে রূপের সাথে প্রয়োগ রূপে ধেয়ে চলে। পুরাণ নির্বাসের যা কিছু চলমান, বহমান সত্য রবীন্দ্রসৃষ্টিতে জীবনে জীবন যোগ করতে চাইত। প্রতিবাদী রূপেও। পাপ ও অন্যায়ের বিনাশকর্তা রুদ্রকে ডেকে এনেছেন, বিকারগ্রস্ত জড় সমাজের হিসাব নিতে— ১৩১৩ চৈত্র মাসের সাহিত্য-তে বললেন, ‘মিথ্যা লিখিতে পারি চোখে ধূলা দিতে পারি, এমন কি নিজেকে ফাঁকি দেওয়াও সহজ, কিন্তু তাঁহাকে তো ভুল বুঝাইতে পারিলাম না।’ কোনওদিনই তা পারেন নি। তিনি কঠিনেরে ভাল বেছেছিলেন। এই তাঁর আত্মপরিচয়।

শিবের আনন্দময় মৃত্যুঞ্জয়ী রূপ আর একই সঙ্গে ভয়ংকর রুদ্র রূপ শৈব কবির প্রেরণা। বঙ্কাল পরে (২ এপ্রিল ১৯৩৪) হেমসুভালাকে চিঠিতে বলবেন সে কথা— ‘রুদ্রের তাপতপ্ত ললাটের তৃতীয় নেত্রেরই দীপ্তি বিগলিত করেছে আমার কাব্যধারাকে।’ দিনের প্রথম সূর্য আর প্রথম রৌদ্র ছিল তাঁর উপাসনার নিবিড়তম ধ্যান ও সত্যস্বরূপ।

অনন্ত আকাশে বাতাসে বিশ্ব প্রকৃতির যে শাস্তিময় মাধুর্য পাতা থাকে, সেখানে মানবলোকে হঠাৎ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন বিক্ষুব্ধ রুদ্রবেশে কে যেন দেখা দিল। স্বপ্নের দুঃখ মহাকালের মাঝে বিপ্লবের আলোড়ন— এ যেন অনন্ত সময়-বিবর্তন আর কাছের বিরোধকেও একই প্রেক্ষাপটে যাচাই করে নেবার তৃতীয় নয়ন।

পূরবী-তে (১৩৩০ কার্তিক) তপভঙ্গ— কালের অধীশ্বর প্রসঙ্গ করবেন। তবে এমনটা হঠাৎ হয় নি। মহাকাল— সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় এসেছিল তো সেই কবে— যেদিন নবীন কবি বরণ হবেন বঙ্কিমে— সঙ্কাসংগীত-এর প্রথম কাব্য পরিচয়ে। তারপর প্রভাতসংগীত-এ:

দেশশূন্য কালশূন্য জ্যোতিঃশূন্য, মহাশূন্য-পরি

চতুর্মুখ করিছেন ধ্যান,

হিমালয়ের কাছাকাছি পাহাড়ি বিশ্বচরাচরে— গোচর ও অগোচরের প্রভাতসংগীত। সৃষ্টি রূপ ধরে চলেছিল অবিরত। গাঁথা চলছিল অতীত ভবিষ্যৎ বর্তমান। কাছাকাছি সময়ে বিবেকানন্দের ‘নাই সূর্য নাই জ্যোতি’ কথা-সুর মেলবন্ধন— যেন জগতের দ্বৈতসংগীত-স্রোত।

১৮৮৫-র আলোচনা, ১৮৮৮-র সমালোচনা গ্রন্থ দুটি যেন অর্থময়তায় জাগা। প্রথমটিতে গ্রন্থকার লিখলেন : ‘এই গ্রন্থ পিতৃদেবের শ্রীচরণে উৎসর্গ করিলাম।’ আর দ্বিতীয়টি পিপলুস প্রেসে ছাপানো, মূল্য একটাকা : ‘পূজনীয়া শ্রীমতী জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর কর-কমলে স্নেহের সামান্য প্রতিদান স্বরূপ এই গ্রন্থ সাদরে সমর্পিত হইল।’

এই সময়েই রবীন্দ্রনাথ ‘পুরাতনের নূতনত্ব’ প্রসঙ্গটি সামনে আনলেন। প্রেমিকের শুদ্ধতায়— পুরাতনকে যে ছাড়া যায় না, বললেন সে কথা অকপটে। পুরাতনের গভীর বিস্তারের আসনে— নূতন কখনও কখনও অতি ক্ষুদ্রও হতে পারে— পুরাতন অতি বৃহৎ সেখানে। হৃদয়-নেণ্ড্রানো প্রাচীন চিত্র কখনও অপ্রচলিত হয় না— তবু কখনও কোনোদিন মৃত হয়ে যেতেই পারে, কিন্তু কবিতা কখনোই নয়। পুরাণকথার সচলায়িত নির্বাস সমন্বিত কবিতা তাই চিরযৌবনা। ‘পুরাতন কথা বলেন বলিয়াই কবির কবি।’ নূতনকে তাই অসন্দ্বিগ্ধচিত্তে প্রাণের অন্তঃপুরের মধ্যে তিনি ‘ডাকিয়া লইতে’ জানেন।

Mrs. Browning-এর 'Inclusions' কবিতা প্রসঙ্গ পরে লক্ষ্মীতে এলেন কবি। '...লক্ষ্মী, তুমি শ্রী, তুমি সৌন্দর্য, আইস তুমি আমাদের হৃদয়-কমলাসনে অধিষ্ঠান করো।' বলে বলছেন, 'যেখানে লক্ষ্মী হৃদয়ে বিরাজ করেন, সেখানে দারিদ্র্যভয় নেই, জগতের ঐশ্বর্যই তাহার ঐশ্বর্য।' হৃদয়ের মধ্যে দুর্ভিক্ষ নিয়ে ঘুরে বেড়ায় লক্ষ্মীছাড়া। 'টাকার থলি ও স্থূল উদর বহন করিয়া বেড়ায়। তাহারা অতি দরিদ্র তাহারা মরুভূমিতে বাস করে, তাহাদের বাসস্থানে ঘাস জন্মায় না তরুলতা নাই বসন্ত আসে না—।' একুশ শতকীয় সবুজ শান্তি-র visions তো এই : 'লক্ষ্মী তুমি বিষ্ণুর গেহিনী। জগতে সর্বত্র তোমার মাতৃস্নেহ'— রাজা চরণ দুখানির প্রত্যাশা করলেন কবি। জগতের হৃদয় আকাশে। মঙ্গল ও কল্যাণে। এই লক্ষ্মী-র রূপটি কবির পাশ্চাত্য অভিভাষণে, ইংরেজি ভাষায়ও আশ্চর্যরূপে রূপ নেবে প্রায় তিরিশ পঁয়ত্রিশ বছর পরেও। কল্যাণময় আধুনিক সামাজিক অর্থনীতিচর্চা গভীর অর্থে কবির কাছেই স্বাণী। পুরাণচর্চায় সন্ধ্যার সঙ্গে লক্ষ্মীর যেন চিরকালের যোগ। এরপরই দেখি কথাবার্তায় সন্ধ্যাবেলার প্রসঙ্গ করছেন। 'আমি সন্ধ্যা কেন এত ভালোবাসি— কারণ সন্ধ্যাবেলায় আমরা জগতে বাস করি। সন্ধ্যাবেলায় দেখিতে পাই, পৃথিবী অপেক্ষা পৃথিবী-ছাড়াই বেশী এমন লক্ষ লক্ষ পৃথিবী কুচি কুচি সোনার মতো আকাশের তলায় ছড়াছড়ি যাইতেছে।' 'সন্ধ্যাবেলায় পৃথিবী স্থায় যেন চলিতেছে। বিশ্ব আকাশে, অনন্ত আকাশে, অযুত গ্রহ উপত্যকার মহাকাশে চলিতেছে।' এমন History অথবা Story of Time and Space, সময়পরিসর কথা সেই কবে, ১৮৮৫ সালেই লক্ষ্মী ও সন্ধ্যা প্রসঙ্গ করতে করতেই যেন অনুভূতি-আকাশে অবিশ্রাম ধারায় উঠে আসছিল। বৈজ্ঞানিক, মানবিক ও আধ্যাত্মিক সমন্বয় ছন্দ, হাজার হাজার বছরের ভারতবাণী, কবি-কলমে উঠে এসেছিল, অনেকটাই অনায়াসে। উপলব্ধ সত্যে।

শ্রীনিকেতনে লক্ষ্মীর আসন প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। দুবেলা দুমুঠোর আশ্রয় সাধনার নির্মাণভূমি (১৯২২) গড়বেন। কিন্তু কত আগেই ২ আশ্বিন ১৩২১— চারপাশের স্নান, হতাশা দেখে— একদিন দুপুরে, সুরুল কুঠিবাড়িতে লিখলেন,

লক্ষ্মী যখন আসবে তখন

কোথায় তারে দিবি রে ঠাই?

দেশ রে চেয়ে আপন-পানে, পদ্মটি নাই, পদ্মটি নাই।

মর্তের কাছে স্বর্গ যে মাধুরী চায় তেমন উজ্জ্বল জীবনময় প্রভাত বাতাস যেন জগিয়ে তুলতে পারি, গহন রাত্রি শেষে— এমন আশাই রাখলেন। আর ক বছরের মধ্যেই গভীর প্রত্যয়ে, আত্মশক্তিতে গড়ে উঠবে— শ্রীনিকেতন পল্লী পুনর্গঠন আন্দোলন। লক্ষ্মীর মানবিক রূপের প্রকাশ তিনি চাইতেন। পুরাতনকে নতুন রূপে বরণ করে নেবার প্রসঙ্গ তো কতবারই— কাজের প্রত্যক্ষ রূপেই এসেছে।

বহুবছর বাদে, ১৯৩৬, 'অগাধ জলের তলা হতে অমল কুঁড়ি উঠল ভেসে'— মানবিক রূপের আশা আকাঙ্ক্ষা-সুর স্টার থিয়েটারে, সুরেকধায় যোগাযোগ করল। নাটকটি পরিচালনা করেছিলেন শিশিরকুমার ভাদুড়ি।

পুজোর ফুলের নির্যাস

১৯০৫। বঙ্গভঙ্গ রোধ আন্দোলনের নেতৃত্বে কবি। কার্জননের বিরুদ্ধে, শাসকের বিরুদ্ধে রুখে

দাঁড়িয়েছেন। সেদিন বহু গান, কবিতা বেঁধেছেন। ১৩১২ ভাণ্ডার পত্রিকায়, স্বদেশি-ভাব-প্রতিমা প্রবল বিক্রমে দেখা দিল। ৩০ আশ্বিন। মাতৃমূর্তি। পরে ইন্দিরা দেবী স্বরলিপি করে দিয়েছেন।

আজি বাংলা দেশের হৃদয় হতে কখন আপনি
তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হলে জননী!

বৃহৎ রূপ পরিকল্পনায় আনলেন :

ডান হাতে তোর ঋজু জ্বলে, বাঁ হাত করে শঙ্কাহরণ,
দুই নয়নে স্নেহের হাসি, ললাটনেত্র আগুনবরণ
ওগো মা, তোমার কী মূৰ্তি আজি দেখি রে।

কালী যেমন প্রবল শক্তির ক্ষেত্রে। করালী কালীমূর্তি সীমাবদ্ধ শক্তিকেও সংহরণ করে নিতে পারে। শক্তির চরমতায় যে বাসনা বিষয় রয়েছে, সেখানে কালী বিরূপ হয়েছেন। শক্তির আর এক মূর্তি— অন্নপূর্ণা, ঐশ্বর্যের দ্বারা আমাদের পুষ্ট করেন। শান্তিনিকেতন অভিভাষণে এমন প্রসঙ্গই তুলবেন।

কালো স্নেহ, আবার স্নেহময় কালীরই— প্রচণ্ডা থেকে তিনি সর্বত্র স্নেহময়ী—
বিশ্বশক্তিরও মাতৃরূপের আভাস আনবেন :

সন্ধ্যা হল গো— ও মা, সন্ধ্যা হল, বুকে ধরো।
আতল কালো স্নেহের মাঝে ডুবিয়ে আমায় স্নিগ্ধ করো।...

তোমার রাতে মিলাক আমাব জীবনসাঁজের বশ্মিরেশা।...

এমন নিবেদন, জীবন-ভক্তের নিবেদন। সেখানেই তিনি শিল্পী— Image. Imageries. Imagination। এই triad-এর রূপ রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব। ঘরের কাছে, মানুষ ও প্রকৃতির আলো সাঁঝে পাওয়া প্রাচীন সবল রূপকে যিনি, ছড়ানো জীবনে, জড়োর আয়োজনে দেখতে পান। তিনিই কবি।

গীতবিতান-এ পূজোর এই আশ্চর্য ফুলাটির নির্যাস এখানেই— ‘আর আমারে বাইরে তোমার, কোথাও যেন না যায় দেখা—’

পুরাণ— চিরনবীন প্রতীক, প্রতিবিশ্ব— নিবেদিত পূজার জীবন দর্শনে তিনি প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। আশ্চর্য দক্ষতায়, পুরাণকে গভীর প্রেমে বর্তমানের জীবনপথে আনতে পারলেন।

মহর্ষির শান্তিনিকেতন ধ্যানে যে বিশ্ববীক্ষা জেগেছিল, সে বীজ থেকে সনাতন ভারতের প্রাণময় শাখা প্রশাখা বিস্তার করেছিলেন কবি— বিশ্বভারতীতে। আধুনিক ভারতে সেদিন তিনি মহর্ষির সাধনার দিনটিকে সময় ও পরিসর উত্তীর্ণ সম্ভাবনা বলে মনে করেছিলেন। স্বরণে এনেছিলেন বিশ্বকর্মার আসনে দিনটি স্থায়ী হয়েছিল। দিনটি আর সরল না। বৃহত্তর আমন্ত্রণে, সামান্য আয়োজন সম্বন্ধতার সম্পর্ক থেকে, নির্মিত পরিবেশের রহস্যকে উদ্ভাসিত করেছেন। শান্তিনিকেতনই যে বিশ্বভারতী, বিশ্বনীড়— এমন প্রত্যয়কে বিজ্ঞান সম্মত পরিবেশচর্চায় প্রতিষ্ঠা দিলেন। বিশ্বকর্মার রূপটি তিনি ‘পঞ্চভূত’ রচনার (১২৯৯) সময় থেকেই বলবেন। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে সৃজনশীল বিশ্বকর্মা বাস করেন। নির্মাণশিল্পে তিনিই অপরিহার্য। ‘আমাদের মধ্যে যে বিশ্বকর্মা আছেন, তিনি আমাদের অন্তরের নিভৃত সৃজনক্ষে

বসিয়া নানা গঠন, নানা বিন্যাস, নানা প্রয়াস, নানা প্রকাশ-চেষ্টায় সর্বদা নিযুক্ত আছেন, পদ্যে তাঁহারই নিপুণ হস্তের কারুকার্য অধিক।' পদ্যকেই স্বাভাবিক-পরিবেশের নির্মাণে যুক্ত করে আধুনিক ভারতে সবুজ পরিসর সৃষ্টির আশ্চর্য সবল শান্তিনিকেতন সমাজ গড়লেন। ৩ অক্টোবর ১৯৩০ রাশিয়ায় সৃষ্টিমুখী প্রযুক্তিযুক্ত কর্মকাণ্ড দেখে চিঠিতে লিখবেন, 'এরা বিশ্বকর্মা। অতএব এদের বিশ্বমনা হওয়া চাই।'

এই হচ্ছে আজও অমলিন আধুনিক ডবিষ্যৎ চিন্তা। বিশ্বকর্মাদের বিশ্বমননের প্রয়োজন বৃহৎ বিশ্বব্যবস্থায় আমরা যেন যুক্ত হতে পারি। একুশ শতকের তথ্য প্রযুক্তি যদি এই 'বিশ্বমনা' ভাবটি নিয়ে এগুতে পারে তবেই সার্থক। মানবিক সাফল্য সর্বতোগামী উন্নয়নেই। প্রযুক্তির খুব বড়ো প্রয়োগ আজকের কম্পিউটারে। ICT-তে বিশ্ব যোগাযোগ এখন এক লহমায়। আনন্দের কথা, সম্ভাবনায়ও নিশ্চয়। কিন্তু তলে তলে বিপর্যয়ও দেখা দিচ্ছে। কারণ অপপ্রয়োগ। ভাবা হচ্ছে প্রযুক্তিকে দৈনন্দিন জীবনযাপন সংস্কৃতির সঙ্গে সার্থক ভাবে যুক্ত করা। এইখানে কিন্তু ঠেকছে। আই কিউ, ইকিউ-এর সঙ্গে এস কিউ প্রয়োজন হচ্ছে। Folk-Formal বোধকে দেশজ-বিশ্বজ পরিসরে বিশ্বকর্মার সৃষ্টিশীলতার এমন বিস্তারকে ভুললে, তলে তলে জন্ম নেয় deculturation (অসংস্কৃতিকরণ) প্রযুক্তি সংস্কৃতি সভ্যতা তলে তলে বিপন্ন। এখন তাই প্রয়োজনে নিবিড় enculturation বা সংস্কৃতায়ন। মানবিক সংস্কৃতির চর্চারও প্রয়োগ। দেশজ লোকজ ভূমিজ সাংস্কৃতিক পুরাণকল্প এবং রবীন্দ্রনাথের আধুনিক ভাষ্য এমন পরিস্থিতিতে বিশেষ গুরুত্বের এবং গ্রহণীয়। কারণ বিভিন্ন Icon-কে (an image, a portrait) আজ সংস্কারাচ্ছন্নতায় প্রায় উন্মাদগ্রস্ত প্রযুক্তিতেও আনা হচ্ছে। ভুলে ভরা ব্যাখ্যায় মনোরোগগ্রস্ত দম্ভে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, পথে প্রান্তে দৈনন্দিনে। চারদিকে দেবদেবীর অবাস্তব উগ্র বিচারও একঘোঁকা কল্পনা, সঙ্কাসের মুখচ্ছবি ও ফ্যানাটিক হুংকারে গড়ে ওঠা নানানুশী-প্রযুক্তি নিত্য যুদ্ধের চেহারা দেখলে মনে হয়— *জাভায়াত্রীর পত্র*-টি প্রাসঙ্গিক, বিজ্ঞানের অগ্রগতি প্রসঙ্গে দেব কারিগর বিশ্বকর্মা'কে স্মরণ করেন— 'মানুষের অমরাবতী নির্মাণের বিশ্বকর্মা,— এই বিজ্ঞান।' যদিও সমসাময়িক কালে মীরা দেবীকে চিঠিতে স্মরণ করিয়েও দিয়েছিলেন যে পৃথিবী শুধুই অমরাবতী নয়। দুই বিশ্বযুদ্ধ মারের পৃথিবী দেখে বলেছিলেন পৃথিবী শুধুই অমরাবতী নয়। দেবরাজ ইন্দ্র যেন 'এখানকার সমস্ত আসবাবেই ছারপোকাকার বসতি স্থাপন করিয়াছেন।' এ কেবল রহস্যের অভিপ্রায় নয়। আজ চারপাশে তাকালে পঁচাশি বছর বাদেও একথা প্রাসঙ্গিকই লাগে। তাই তো প্রয়োগযোগ্য, আধুনিক।

এখনও নীরব অপেক্ষায়

১৯২১ সালেই রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্যের কাছে Creative Unity অভিভাষণ দেন। যেখানে ভারতের Folk Religion প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে The Dignity of Man in his eternal right of truth— এমন প্রসঙ্গটি আনলেন এবং বৈদিক, পুরাণিক, বৈষ্ণব, বৌদ্ধিক জীবন-চর্চার কথা বললেন। ব্যাখ্যা করলেন লোকধর্মের প্রতীক ও প্রতিমা— 'expression of formative forces and the music of Beauty'। আজ এই দিকটাই বৃহত্তর সাধনায় অভিপ্রেত। সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা তাইতো বলে।

১৯৩০-এ *Religion of Man*, Hibbert Lecture-এ আনবেন পৌরাণিক বিষ্ণু আর নারায়ণের নরদেবতা-ভাবটির প্রসঙ্গ। মানবের দেবত্বের সার কথায় উদ্ভাসিত হয় নারায়ণ। বিবেকানন্দ ও শ্রীরামকৃষ্ণের শিবজ্ঞানে জীব সেবা ও মানবিক দেবত্বের প্রয়োগ রূপ হয়তো স্মরণ করতে হবে।

দেবসেনাপতি কার্তিকেয় ভাবটি পৌরুষ আর কমণীয়তায় মিশ্রিত। সে কারণেই দেব-সাহিত্যের গদ্য কাব্যের উপযুক্ত তিনি। এই মনোভাব থেকে জীবনের উপাস্তে এসে সার্থক পৌরুষ রূপের ভাবনা তিনি ভাবতে চেয়েছেন। দান্তিক নাক উচু, আত্মদম্ভ মস্ত আঙ্গকের machoman বা আসলি হিরো আর 'বাংলাদেশের ময়ূরে চড়া কার্তিকটির কথা ভুলতে চেয়েছেন।' আমরা তাঁকে শুনি— শোনাই না। ভুগতে হচ্ছে তাই ঢের বেশি।

সাম্প্রদায়িক শক্তিতে মত্ত, নয়া সদ্ধাসবাদে আঙ্গকের বড়ো হুংকার এই নব্য macho man বা আসলি হিরো আর ভুলে ভরা গণেশের দুখ খাওয়া, কানোয়ারের সতীদাহ। এমনকি দেব দেবীদের অলীক রূপকে সামনে রেখে মানুষ-ভূমি-পরিবেশের নিত্য ছন্দকে প্রতিনিয়ত চুরমার করে দিচ্ছে অহংকারমত্ত যুদ্ধবাজরা। কুসংস্কারে ঢেকে যাওয়া অভব্য উন্ন্যাসের বন্যায় ভেসে যায় মানবিক বিশ্ব পরিবেশ আসনতল। প্রতিদিন লাঞ্চিত হয়েই বলেছে বিশ্ব মানবিকতার আশা ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন। দেবদেবী Icon নিয়ে ভুল বাখ্যা ও অপপ্রয়োগে ছেয়ে যাচ্ছে আধুনিক জীবন। কোন ভূমি কার জন্মমাটি ছিল, এই নিয়ে বয়ে যায় রক্তগঙ্গা ও যমুনা। গাছ, ঘাস, প্রাণ, প্রাণী হতবাক। অথচ রবীন্দ্রনাথ, সেই কবে ১৮৯৫-তে প্রকৃতির সঙ্গে, নদীর সঙ্গে পর্বতদুহিতা পার্বতীর রূপকল্পকে আত্মীয়তার ছন্দে প্রকাশ করেছেন। ইচ্ছামতী নদীর মানবী রূপের পিছনে পার্বতীর প্রসন্নতা লক্ষ করেছেন। নদীর প্রতি মানুষের ভালোবাসা পৃথিবীর সামগ্রিক লোকালয়ের প্রতি আত্মীয়তার দান, এই কটি লাইনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। সেদিন তিনি এই নদী থেকে ওই নদীতে চলে ফিরে বেড়াচ্ছেন তাঁর পদ্মা বোট। বলেওছেন ইন্ডের যেমন ঐরাবত আমার তেমন পদ্মা। আর ইচ্ছামতীকে জেনে লিখলেন : 'আশ্বিন মাসে মেনকার ঘরের মেয়ে পার্বতী যেমন কৈলাস শিখর ছেড়ে একবার তার বাপের বাড়ি দেখেগুনে যায়, ইচ্ছামতী তেমনি সহস্রসর অদর্শন থেকে বর্ষার কয়েকমাস আনন্দহাস্য করতে করতে তার আত্মীয় লোকালয়গুলির তত্ত্ব নিতে আসে।' এমন সব নিদর্শন রবীন্দ্রসাহিত্যে ঢের আছে যেখানে পুরাণ কথায় দেশের প্রকৃতি পরিবেশ, মাটির হাসিকান্না, মেঘের নন্দী-ভূঙ্গী, আবার কখনো বা ফসলের খেত মহাসাগরের ফুলেফেঁপেওঠা বুক কিংবা জলমতী বায়ুসমান. এমন নানান 'Truth and Beauty' আর ভৌগোলিক পরিবেশের রূপ, সীমা আর অসীমতার মূর্তির সঙ্গে সমন্বিত করেছেন। দুর্গার স্নেহ, গণেশের যোগ্যতা, সমুদ্র মছন, গঙ্গার মর্ত্যবতরণ, মৃত্যুঞ্জয়ের ছটা, মাটির কন্যা সারদা, শক্তিবৃপিনী পার্বতী, লম্বোদর গজানন মূর্তি, কলাবধু, ব্রহ্মার সৃষ্টিক্ষেত্র, বিষ্ণুর লোকশক্তি, বলরাম দেবের সভ্যতা, বিজয়রথের বাহন চক্র— এইসবই তাঁর সৃষ্টিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। তিনি আশা করেছিলেন সভ্যতার অগ্রগতিতে মধুর সৌন্দর্য ও রূপকল্পকথা মনুষ্যহৃদয়ে সিংহাসন পাবে। দেবলোক মানবলোকে উত্তীর্ণ হবে, প্রকৃতি পরিবেশের মানবিক সখ্যে। 'তখন বিষ্ণুদেবের গদার কাজ ফুরাইবে, পদ্ম ফুটিয়া উঠিবে।' কিন্তু এখনও তা হচ্ছে কই! সৌন্দর্যের ধৈর্য যেন এখনও তো নীরব অপেক্ষায়। জীবনযাপন-সংস্কৃতি বোধে বিষ্ণু ও লক্ষ্মীর সম্মিলন আশা

করেছেন। ১৩১৩ পৌষ মাসে 'সাহিত্য' আলোচনায়, সামগ্রিক জীবন আলোচনায় এনেছেন : 'মঙ্গলের সঙ্গেই সৌন্দর্যের, বিঘ্নের সঙ্গেই লক্ষ্মীর মিলন পূর্ণ। সকল সভ্যতার মধ্যে এই ভাবটি প্রচ্ছন্ন আছে।'

রক্তিম বেদনা জাগা

রবীন্দ্র, অবনীন্দ্র, গগনেন্দ্র, রীতেন্দ্র, বলেন্দ্র, যেদিন ১৮৮১ জ্যৈষ্ঠাসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে 'বিদ্যজ্ঞানসমাগম সভায়' প্রথম বাৎসরিক প্রতিভা (১৬ ফাল্গুন, শনিবার সন্ধ্যা ৭.৩০) উপস্থাপন করলেন, সেদিন উপস্থিত সকলে অভিভূত হয়েছিল। অরণ্য দৃশ্যে বনদেবীগণের পরাণ কাম্বায়—

দেবি দুর্গে, চাহো, ত্রাহি এ বনে—

রাখ অধীনী জনে, করো শান্তি দান।

বনদেবীগণ যেন পরিবেশের বিবেকের দল। তারা ডেকে আনে—

বাণী বীণাপাণি, করুণাময়ী!

অন্ধজনে নয়ন দিয়ে অন্ধকারে ফেলিলে,

দরশ দিয়ে লুকালে কোথা দেবী অয়ি।

লক্ষ্মীর আবির্ভাবে অভয়া দিল—

কমলা দিতেছি আসি, রতন রাশি রাশি,

ফুটুক তবে হাসি মলিন মুখে।

শেষে আসে সরস্বতী। প্রকৃতির রাগিণী শেখাবেন তিনি—

এই নে আমার বীণা দিনু তোরে উপহার,

যে গান গাহিতে সাধ, ধ্বনিবে ইহার তার।

প্রাণের ভাবে দেবদেবীদের আমন্ত্রণে পুরাণ প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির নানান স্তরে, আধুনিক সভ্যতার ভাবীকালের মানবিক রূপকল্পে দেখা দিয়েছে। বনদেবীগণ তো আজকের বিপর্যস্ত পরিবেশের মাঝে। Envio-Icon : an image, a portrait। আমাদের আশা ভরসার প্রতিবিম্ব।

'Construction versus creation' বা 'Co-operative principle' আলোচনায় এমন রূপের প্রসঙ্গ আনবেন কল্যাণচর্চায়। পরিবেশ ও উন্নয়ন আলোচনায় আর্ন্তজাতিক স্তরে পাওয়া লক্ষ্মীকে প্রায় চল্লিশ বছরের ব্যবধানে আশ্চর্য মননে প্রতিষ্ঠিত করবেন। এ যেন অনেকটাই পুরাণ কল্পের নির্যাসকে বর্তমানের রাজ্যপথে প্রতিষ্ঠা দেওয়া— 'Our Luxmi is not the goddess of the cash balance in the bank : She is the symbol of that ideal Plenitude which is never dissociated from goodness and beauty.'

একঝোঁকা লোভী সভ্যতায় 'goodness and beauty' দেখা পাওয়া যাচ্ছে না বলেই ethical society আজ বড়ো দূরের বলে মনে হচ্ছে। 'আমাকে দেখুন' উল্লাসে— পরিপূর্ণতার বিস্তার দেখা মেলা ভার।

যদিও তিনি স্বয়ং green economy, সবুজ অর্থনীতি সম্প্রসারণে শ্রীনিকেতন ক্ষেত্রভূমিতে এই লক্ষ্মীর নতুন ও আধুনিক কর্মপাঁচালি আকারায়িত করেছিলেন। যেখানে

নানা স্তরের মানুষের অংশগ্রহণ ছিল। নতুন ভারত মনে প্রাণে তা কিন্তু আজও গ্রহণ করেনি। চারপাশের নির্লব্ধ উন্মাদনায় ঢাকা পড়ে গেছে সেই স্নেহ, গেহ, পুষ্পপাতা।

১২৯৯ শ্রাবণ মাসে অবনীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করলেন চিত্রাঙ্গদা। অবনীন্দ্রনাথকে উৎসাহিত করেছিলেন পুরাণে, প্রেম কাব্যে গীতগোবিন্দ, বৈষ্ণব গাথায়। ভারতীয় চিত্রকলায় দূরকে নিকট; আর পিছনে ফেরা— এগিয়ে চলার নূতন পথের আশ্ব অনুসন্ধানে মাতলেন কাকা, ভাইপো। অবনের রবিকা আর রবিকার বৎস অবন—যুগলবন্দী এক নতুন কাব্যচিত্রের চারিত্র-শক্তি এনে দিল। সূর্যোদয়ের অবশুষ্ঠন— উন্মুক্ততায় শতক-পেরনো রাজেন্দ্রনন্দিনী নারী শক্তি অনন্ত মহৎ রূপে দেখা দিল:

দেবী নহি, নহি আমি সামান্য রমণী।
পূজা করি রাখিবে মাথায়, সেও আমি
নই: অবহেলা করি পুষিয়া রাখিবে
পিছে, সেও আমি নহি। যদি পার্শ্বে রাখ
মোরে সংকটের পথে, দুঃসহ চিন্তার
যদি অংশ দাও, যদি অনুমতি কর
কঠিন ব্রতের তব সহায় হইতে,
যদি সুখে দুঃখে মোরে কর সহচরী,
আমার পাইবে তবে পরিচয়।...

ইদানীং রাস্প-নারী Icon— an Image, a glamour parlour portrait নিয়ে নাচানাচিতে বুদবুদ লাফিয়ে উঠেছে ঢের। তবুও নারীশক্তি 'নহি আমি সামান্য রমণী' এমনকি 'দেবীও নই' এমন স্থিতপ্র প্রতিমাকল্প একশো চোন্দো বছর পরেও কিন্তু অমলিন।

প্রবল অভিঘাতে যুদ্ধের মরণ ক্রন্দনে, অচলতার দিন প্রত্যক্ষ করেছেন। চঞ্চল কালের প্রবল রূপ দেখে অচঞ্চল বিশ্বের সচল দিনের বৃহৎ রূপ দেখাও যেন ছিল! রুদ্ধ স্নাত রক্তিম বেদনা জাগা দুহাত তুলে ধরা এক নারীর ছবি। আশুনের হলকায় প্রজ্বলিত শিখার মতন যেন এক মহাকাল। কাছাকাছি সময়ে সানাই-তে (১৯৪০) তার সমসাময়িক কিছু রূপ ধরা থাকবে। ঋণকালের প্রতীক আর অখণ্ডকালের প্রতীকের অভিঘাত, চিত্রকথা, কাব্য সুর কথা, এমনকি শেষ জন্মদিনেও ফিরে আসছিল। 'Energy of time' এবার যেন ভগীরথ বেগে, আকার-না-আকারকেও, প্রবল সৃষ্টির সমন্বয়ে উদ্ভাসিত করছিল। আর অবনের 'উমা'।

কখনো শুনি, কখনো শুনি না যে

একদিন সদর্পে প্রাচ্য পাশ্চাত্যের অভিমুখে আর্ঘ্য অনার্যের মহা সমন্বয়কে Vision of India's History-তে স্থান দিয়েছিলেন। সেদিন তিনি নাগারাজ্যের রাজা জম্মেজয়ের প্রসঙ্গ এনেছিলেন। সভ্যতার ইতিহাস শুধু যুদ্ধের ইতিহাস নয়। সভ্যতার ইতিহাস এই বিশ্বের গৃহবানীরও ইতিহাস। প্রায় পঞ্চাশ হাজার বছরের মানুষভূমি-পরিবেশেরও ইতিহাস। যুদ্ধের ইতিহাস তো পাঁচ হাজার বছরের। বিশ্বের বহির্জগৎ ও অন্তর জগতের মহাকালের যেন এক বিরাট নৃত্যছন্দ। নটরাজের প্রাণচঞ্চলতায় বাঁধন পরায় বাঁধন খোলায়, দুই সত্য।

বৎস অবনকে ছবি আঁকা-আর-না-আঁকার টানাপোড়েনে বলেছিলেন ‘অবন একটা পাগল’। আর অবনের খ্যাপামির চাক্কলাকে সাবাশ বলেছেন; অবন বলেছিল— নিজে খ্যাপা বাউল কি না তাই আমাকে ঠিক চিনেছে। রঙে wash-এ রেখা আর না রেখার দোলাচলে ডেজা হাত কাগজে দিলেন ভোলানাথ আর বাউলকে এক করে। ফাঙ্কুনী-র যেন নটরাজ। উজ্জ্বল জীবনে একতারা ধরে নৃত্য করে। শিরোনামে অবন লিখল ‘রবি বাউল।’ অনেক পরে minimalistic form-এ, আম আঁটির শুকনো ভেলায়, সূতোর খেলায়— বনদেবীর দেওয়া ছোট্ট টুকরো বসিয়ে গাছের ডাল হতে নেওয়া পাটাতনে ভাসিয়ে দেওয়া নদী পরে নদীতে ভাসা— কুটুম কাটাম, জাগিয়ে তুলবেন— ‘এই হল রবিকা, নদীতে বেড়াচ্ছেন’!

পাগল শব্দটা, খ্যাপা শব্দটা রবীন্দ্রনাথের কাছে ঘৃণা বা তচ্ছিল্যের শব্দ নয়। বলেছেন বিচিত্র প্রবন্ধ ‘পাগল’ নামে— ‘আমাদের খ্যাপা দেবতা মহেশ্বর। যে কোনো তুচ্ছকেও যিনি অহরহ অভাবনীয় মূল্যবান করিতেছেন।’ নিজের মধ্যেই এই ভোলা নৃত্যকে অনুভব করেছেন। সৃষ্টির মধ্যে যে একটা পাগল আছে তারই স্পর্শে, পরিচয় ও প্রকাশ নৃত্য করে— রূপের মধ্যে অপরূপ, বন্ধনের মধ্যে মুক্তির প্রকাশে। সেদিন চন্দননগরে গঙ্গার ঘাটে আশ্রয় নিয়েছেন। নিজেকেই যেন আদি সৃষ্টির আবির্ভাবে নিয়ে গেলেন। ১৩৪২, ১লা আষাঢ় চন্দননগরে কালি, তুলি, আর চঞ্চল রেখার Surface tension-এ জেগে উঠলো যথার্থ an Image, a Portrait – the poet! আত্ম প্রতিকৃতি। এ কোন আত্মপ্রতিকৃতি! প্রকাশের মুখচ্ছবি। শ্যামলী মাটির বাড়ি যেমন মানবমাটি সৃজনের প্রতিমা। যেথায় আর্থ অনার্থ, Folk-Formal-Tribal মিলমিশের ভারত প্রাণ, বিশ্বস্নেহ ও পরিবেশ কল্যাণ সচলায়িত। চন্দননগরে ভরা বর্ষায়, সেদিন তাঁর ঐরাবত পদ্মা, শেষবারের মতন গঙ্গায় চলে ফিরেছিল। প্রবল রং-রেখার অভিঘাতে সিপিয়ায় জেগে উঠল — যেন রুদ্র!

নিজের মধ্যে ভোলানাথের খ্যাপামি জীবনের উপাস্ত বেলাতেও প্রত্যক্ষ করলেন। পরম মুহূর্তের কৃতি হঠাৎ জেগে উঠতো। রুদ্রের পালে দক্ষিণমুখেরও শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি ছিল তাঁর জীবন জুড়ে। শেষ সাঁঝে এসেও জীবনের মধ্যে পাগলের খোঁচাকে তখনও বরণ করে চলেছেন। শরীর অশক্ত। রোগের বাড়াবাড়ি। তখনও বলেছেন : ‘আমাদের সকলের মধ্যেই একটা পাগল আছে, সে আমাদের সব দেখা ও ভাবার মধ্যে নিজের খেলালী রঙ মিশিয়ে দেয়, আমাদের ছবির মধ্যে নিজের তুলি বুলায়, আমাদের গানের মধ্যে নিজের সুর লাগিয়ে বসে।’

ক্ষ্যাপা তুই আছিস আপন খেলায় ধরে— তেমন ক্ষ্যাপাই আশার আলোয় শেষের বাঁশিতেও, রাতের তারা দিনের রবির গান, এখনও গেয়ে চলেছে—

তোমার বীণা আমার মনোমাঝে

কখনো শুনি, কখনো ভুলি, কখনো শুনি না যে॥

যুদ্ধ মাঝে বাইশে শ্রাবণ তখনও রুদ্রে জাগে—

হে বীণাপাণি, তোমার সভ্যতলে

আকুল হিয়া উন্মাদিয়া বেসুর হয়ে বাজে

তোমাব বাণী কখনো শুনি, কখনো শুনি না যে॥

শান্তময় ছিল চিরমস্ত। প্রায় নিভেজ দেহমাঝে— বাইশে শ্রাবণের যেতে নাই দিব-র দল
অমিতা ঠাকুরকে বললেন, খাটের শিয়রে দাঁড়িয়ে কবির অস্তিম ঠোটে একটু একটু জল দাও।
কানের কাছে মুখ নিয়ে উচ্চারিত হল তাঁর প্রতিদিনের ধ্যানের মন্ত্র যদি শুনতে পান! ‘শান্তম্
শিবম্ অদ্বৈতম্’। আশ্চর্য গৌরবের অধিকারী। তখনও সমন্বয়ী সুর, কথা হয়ে শব্দে, ছন্দে
সংগীতে তিরতির করে বাতাসে ভেসে ওঠে—

কুহেলী কেন ছড়ায় আবরণে— আঁধারে

আলো আবিল করে, আঁখি যে মরে লাজে।

তোমার বাণী কখনো শুনি, কখনো শুনি না যে।

সৃষ্টির লীলায় পূর্ণ হল মহাকাল। অনন্ত গগন পূর্ণ। প্রকাশ পূর্ণ। পূর্ণ হল সৃজনের সমুদ্র
মস্থল। এবার শুরু হোক অমৃতকুস্ত-অনুধ্যান, মানবিক একুশ শতক!

চিরকুমার সভা-র চির-বিধবা

সুমিতা চক্রবর্তী

স্বরচিত লেখার রূপান্তর ঘটানো ছিল ভাষা-শিল্পী রবীন্দ্রনাথের অভ্যাস। তাঁর সুপরিচিত কমেডি *চিরকুমার সভা* নাটক রূপে লিখিত হয়েছিল ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে এবং গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রসাহিত্য যাঁদের বিশেষ চর্চার বিষয় — তাঁদের বাদ দিলে সাধারণ পাঠকেরা অনেকেই জানেন না যে, *চিরকুমার সভা* প্রথম লিখিত হয়েছিল উপন্যাস হিসেবে, নাটকটি প্রকাশিত হবার পঁচিশ বছর আগে — ১৯০০ থেকে ১৯০১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। *ভারতী* পত্রিকায় এই উপন্যাসের কিস্তিগুলি ১৩০৭ বঙ্গাব্দের বৈশাখ থেকে কার্তিক, পৌষ থেকে চৈত্র; এবং ১৩০৮ বঙ্গাব্দের বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রকাশ পায়।

উপন্যাস রূপে *চিরকুমার সভা* যে পঠিত হয় না বললেই চলে, তার কারণ পৃথক গ্রন্থ রূপে উপন্যাসটি কখনই হাতে পাওয়া যায়নি। রবীন্দ্র-রচনার একটি সংকলন *রবীন্দ্র-গ্রন্থাবলী* ‘হিতবাদীর উপহার’ হিসেবে হিতবাদী প্রকাশনা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল ১৩১১ বঙ্গাব্দে বা ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে। সেখানে ‘রঙ্গচিত্র’ বিভাগে স্থান পেয়েছিল উপন্যাসটি। তারপর ‘মজুমদার লাইব্রেরি’ নামক প্রকাশনা-সংস্থা থেকে ১৩১৪ বঙ্গাব্দে বা ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে গদ্য গ্রন্থাবলী নামে রবীন্দ্রনাথের যে গদ্য রচনার সিরিজ প্রকাশিত হয়েছিল তার অষ্টম খণ্ডে স্বতন্ত্র বই আকারে ‘গদ্য গ্রন্থাবলী ৮’ রূপে চিহ্নিত হয়ে এই উপন্যাসটি প্রকাশিত হল *প্রজাপতির নির্বন্ধ* নামে। উপন্যাস *চিরকুমার সভা* এবং উপন্যাস *প্রজাপতির নির্বন্ধ*-এর মধ্যে পার্থক্য সামান্যই। দ্বিতীয় উপন্যাসটি ঈষৎ পরিবর্তিত। তবে লক্ষণীয়, উপন্যাস হলেও *প্রজাপতির নির্বন্ধ* অনেকটাই নাটকের মতো; সংলাপের পথ ধরেই তা অগ্রসর হয়। উপন্যাসে লেখকের বিবৃতি, ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ — ইত্যাদির যে অবকাশ থাকে তার অতি সামান্যই প্রয়োগ ঘটেছে উপন্যাসটিতে। অর্থাৎ উপন্যাসটি জন্মমূহূর্ত থেকেই নাট্যসত্তাবনাকে লালন করেছে।

পুরোদস্তুর নাটক রূপে *চিরকুমার সভা* পুনর্লিখিত হল ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে। নাটকে নতুন লেখা কিছু অংশ যুক্ত হল; দেওয়া হল অনেকগুলি নতুন গান। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হল ১৯২৬ সালের মার্চ মাসে। তখন থেকেই উপন্যাস *চিরকুমার সভা* ও *প্রজাপতির নির্বন্ধ*-কে ছাপিয়ে গিয়ে কৌতুক-মধুর; গানে গানে মনোরম; বুদ্ধিদীপ্ত; রসোচ্ছল সংলাপে শ্রবণবিলাস; প্রসন্ন মিলনাস্তক এই নাটক *চিরকুমার সভা* জনচিহ্ন জয় করে নিয়েছে বিপুলভাবে।

প্রশ্ন জাগতে পারে, *প্রজাপতির নির্বন্ধ* উপন্যাস লিখে ওঠার আঠারো বছর পরে আবার কেন ওই একই বিষয় নিয়ে কমেডি লেখার ঝোঁক দেখা দিল রবীন্দ্রনাথের মনে।

এই অভিলাষের প্রেরণা ছিল সাধারণ রঙ্গমঞ্চ। রবীন্দ্রনাথ রঙ্গরসাস্রিত নাটক লিখতে

শুরু করেছিলেন অনেকদিন আগে। *খ্যাতির বিড়ম্বনা* (১৮৮৫), *গোড়ায় গলদ* (১৮৯২), *বৈকুণ্ঠের খাতা* (১৮৯৭); এ-ছাড়া ছোটো নাটিকার দুটি সংকলন *হাস্যকৌতুক ও ব্যঙ্গকৌতুক* (১৯০৭)। এগুলি অভিনীত হয়েছে বিভিন্ন উপলক্ষ্যে, শখের অভিনেতৃবর্গ নাটকগুলি অভিনয় করেছেন; ঠাকুরবাড়ির সদস্যরা বঙ্কুবান্ধবসহ নিজেরা অভিনয় করেছেন নিছক আমোদ ও বিনোদনের উদ্দেশ্যে। *গোড়ায় গলদ* অভিনীত হয়েছিল *সঙ্গীত সমাজ*-এ ১৮৯৮ সালে; তার পর ১৯০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বিভিন্ন স্থানে। কিন্তু বাণিজ্যিক থিয়েটারে বিশেষ অভিনীত হয়নি রবীন্দ্রনাথের নাটক। কুমার রায় তাঁর একটি লেখায় একটি তথ্যের উল্লেখ করেছেন — ‘গোড়ায় গলদ’-এর একটি শখের অভিনয় দেখে ‘ইন্ডিয়ান ডেইলি নিউজ’-এর সংবাদদাতা লিখেছিলেন— “Skilled amateurs acquitted themselves famously. The performance was from start to finish a success.” কুমার রায় জানিয়েছেন : “এই ইন্ডিয়ান ডেইলি নিউজ উপদেশ দিয়েছেন স্টার প্রমুখ তখনকার বাণিজ্যিক থিয়েটারে এ নাটক করতে এবং এখানকার অভিনেতাদের কয়েকজনকে ব্যবহার করতে।’ (‘রঙ্গচিত্রময় রবীন্দ্রনাটক’, কুমার রায়, ২০০ বছরের বাংলা প্রসেনিয়াম থিয়েটার, সম্পাদনা: গণেশ মুখোপাধ্যায়, কলকাতা, বিশ্বকোষ পরিষদ, ১৯৯৫, পৃ.-৯০)।

আর একটি কৌতুহলপ্রদ তথ্য জানা যায় এই যে, *খ্যাতির বিড়ম্বনা* নাটকটিও শখের অভিনয়ে অত্যন্ত জনপ্রিয় হওয়াতে নাটকটি ‘দু কড়ি দস্ত’ নামে ‘এমারেন্ড থিয়েটার’-এ ১৮৯৫ সালে অভিনীত হয়েছিল। অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি এই অভিনয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন এবং সম্ভবত তিনিই অবতীর্ণ হয়েছিলেন দু কড়ি দস্তের ভূমিকায়। তবে সাধারণ রঙ্গমঞ্চে রবীন্দ্রনাটকের এই অভিনয়-ব্যাপারে সেই সময়ে ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের কোনো সংযোগ ছিল না।

এই সংযোগ তৈরি হল রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উৎসব উপলক্ষ্যে। ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট-এর সদস্যরা রবীন্দ্রনাথের সম্মানে ১৯১১ সালে অভিনয় করেন *বৈকুণ্ঠের খাতা*। ‘কেদার’ চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন শিশিরকুমার ভাদুড়ী। রবীন্দ্রনাথের ভালো লেগেছিল এই অভিনয়। শিশিরকুমার ভাদুড়ীর সঙ্গে এই পরোক্ষ পরিচয় ক্রমে প্রত্যক্ষ হয়। *চিরকুমার সভা* নাটকটি যখন রচিত হল তখন সেই পরিচয় যথেষ্টই ঘনিষ্ঠ। সাধারণ রঙ্গালয়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সংযোগ সর্বাধিক গাঢ় হয়েছিল ওই ১৯২৫-১৯২৬ সাল থেকে নিয়ে পরবর্তী কয়েক বছর। বাণিজ্যিক মঞ্চে উপস্থাপনের জন্যই *প্রজাপতির নির্বন্ধ* উপন্যাস *চিরকুমার সভা* নামে নাট্যরূপ পরিগ্রহ করল ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে। কুমার রায় লিখেছেন : “শিশিরকুমারের জন্যই ‘চিরকুমার সভা’ রচিত হয়েছিল — এ সংবাদ আমরা জানি। আমরা এও জানি যে শেষ পর্যন্ত আর্ট থিয়েটারের প্রবোধ গৃহ মহাশয় সেটি হস্তগত করেন। ১৯২৫ সালের ১৮ই জুলাই স্টার রঙ্গমঞ্চে এই প্রহসনটি অভিনীত হল আর্ট থিয়েটারেব প্রযোজনায়।” (পূর্বোক্ত প্রবন্ধ, পৃ. ৯৫)। কুমার রায় আরও লিখেছেন : “এই ১৯২৫-২৭ পর্বই যেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে থিয়েটারের একটা যোগসূত্রের সফল অধ্যায়। অথচ কবির কাছের মানুষদের অনেকেই ইচ্ছা ছিল না সাধারণ রঙ্গালয়ের সঙ্গে কবির যোগাযোগ ঘটুক। গগেন্দ্রনাথ অবনীন্দ্রনাথও কবির উৎসাহেই উৎসাহিত হয়ে নানা পরামর্শ দিয়েছেন সাধারণ রঙ্গমঞ্চের প্রযোজনায়। দীনেন্দ্রনাথ তো গানের সুরও করেছেন।” (পূর্বোক্ত

প্রবন্ধ, পৃ. ৯৫)। *চিরকুমার সভা* নাটকটি মঞ্চে অসাধারণ জমাট ও উচ্চাঙ্গের বিনোদনমূলক হয়ে ওঠে আজও। তবুও কেউ কেউ নাটকটির গঠনে অনুভব করেছেন দুর্বলতা।

নাটকটির ঘাটতি বিষয়ে নাট্যসাহিত্য গবেষকের অভিমত উদ্ধার করছি— “কিন্তু এত সম্ভেও নাটক হিসেবে ‘চিরকুমার সভা’ দুর্বল। চতুর এবং চটুল সংলাপের প্রাচুর্যে এর হাস্যরস উছলে ওঠে ঠিকই, কিন্তু এর ভেতরে যে সিরিয়াস কথাটা বীজের মতো ধরা ছিল তার বিকাশ ঘটে না। চন্দ্রবাবুর কল্পনা মহৎ সন্দেহ নেই; কিন্তু তার সঙ্গে চিরকৌমার্যের ব্রত সদস্যদের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার ফলে কীটের জন্ম হয়েছিল ফুলের মধ্যেই।” (*নাট্য ঐতিহ্য ও লঘু নাটক*, শিবব্রত চট্টোপাধ্যায়, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা, বর্ধমান, ২০০৫, পৃ. ১৪৩)।

গবেষকের মতে ভারতী-তে প্রকাশিত *চিরকুমার সভা* এবং *গদ্য গ্রন্থাবলী* ৮-এ প্রকাশিত *প্রজাপতির নির্বন্ধ* — এই দুটি উপন্যাসই *চিরকুমার সভা* নাটকের তুলনায় যৌক্তিক নির্মাণ। কারণ সেখানে উপন্যাসের ধর্ম অনুযায়ী লেখক নিজের বিবৃতির সাহায্যে চরিত্রগুলির সঙ্গে পাঠকের কিছুটা পরিচয় করিয়ে দিতে পেরেছেন, বিশ্লেষণ করতে পেরেছেন চরিত্রগুলির সামাজিক অবস্থান এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক। কিন্তু নাটকে সেই অবকাশও নেই; নাটককার সে বিষয়ে ভাবিত ছিলেন বলেও মনে হয় না। চন্দ্রবাবু এ নাটকে পার্শ্বচরিত্র মাত্র। নাটকের মূল জায়গাটি হল মধুর কৌতুক; নরনারীর পারস্পরিক আকর্ষণ জনিত মনোভঙ্গির লঘু রোমান্টিকতা। সেই সঙ্গে আছে কয়েকটি হাস্য-উদ্বেককারী পরিস্থিতি এবং অবিরল সরস সংলাপের স্রোত; উপরন্তু মন মাতানো গান। যারা *চিরকুমার সভা* চলচ্চিত্র ও নাটক অভিনয় দেখেছেন তাঁরা জানেন গানের সঙ্গে যুক্ত হয় সুবেশা তরুণীদের নৃত্যভঙ্গিও। কাজেই জমে ওঠে বিনোদনের কমেডি। রবীন্দ্রনাথের শোভন শালীন বুচির স্পর্শে মসলিন-কোমল, স্নিগ্ধ, বাগ্‌বৈদম্বনিপুণ, দীপ্ত সরস আর ঝলমলে এই নাটক আজও বাঙালি মধ্যবিত্তের কাছে পরম আদৃত। এখানে কৌমার্যব্রতের সঙ্গে দেশসেবার ব্রতকেও পরিহাস করা হয়েছে। কর্তব্যের দায়ভার নয়; যুবক-যুবতীরা প্রেমের মাধুর্যে নিলীন থাকুক — এমনই একটি অভিপ্রায় এই নাটকের ভিতরের কথা। সিরিয়াস ধরনের সমাজ-মনস্ক পাঠক, বা যে পাঠক মনস্তত্ত্বের সুড়ঙ্গ লালিত সম্পর্কগুলির বিচরণ-পথ সন্ধান করেন সাহিত্যে — তাঁদের এ-নাটক হালকা বলে মনে হবেই।

এই কারণেই বিনোদন-নাটক রূপে *চিরকুমার সভা*-র যেন প্রতিদ্বন্দ্বীই ছিল না অনেক দিন। ‘প্রহসন’ শব্দটি এই নাটকের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে মন চায় না যদি মধুসূদনের *বুড় সালিকের ঘাড়ে রৌঁ*, *একেই কি বলে সভ্যতা*; দীনবন্ধু মিত্রের *সধবার একাদশী*-কেও প্রহসন বলি। এগুলির সঙ্গে *চিরকুমার সভা*-র রসের কোনো সাদৃশ্য নেই। মধুসূদনের নাটক দুটি স্যাটায়ার; দীনবন্ধুর নাটকটি প্রায় ট্রাজেডি। অপর পক্ষে *চিরকুমার সভা* অনাবিল হিউমার-ধর্মী নাটক; প্রীতিমধুর, প্রসন্ন কৌতুকের ভাষাবূপ।

কত যে মঞ্চসফল ছিল এই নাটক, তার সাক্ষ্য ইতিহাস। আর্ট থিয়েটার প্রযোজিত এই নাটকের প্রথম অভিনয় হল ১৯২৫ সালের ১৮ জুলাই। পরিচালক ছিলেন অহীন্দ্র চৌধুরী এবং চন্দ্রবাবুর ভূমিকায় অভিনয়ও করেছিলেন তিনি নিজে। মঞ্চ পরিকল্পনা করেছিলেন গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সংগীত নির্দেশক ছিলেন দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। অহীন্দ্র চৌধুরীর স্মৃতিকথায়

আছে এই অভিনয়-রাত্রির সুন্দর বর্ণনা। সেই সময়ের বিশিষ্ট অভিনেতা ও অভিনেত্রীরা এই প্রথম রাত্রিতে অভিনয় করেছিলেন — অপরেশচন্দ্র, তিনকড়ি চক্রবর্তী, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, হিন্দু মুখোপাধ্যায়, অহীন্দ্র চৌধুরী নিজে। স্ত্রী চরিত্রগুলিতে অভিনয় করেছিলেন সুশীলাসুন্দরী, রাণীসুন্দরী, নীহারবালা, নিভাননী, ফিরোজাবালা। রবীন্দ্রনাথ নিজে এই নাটক দেখেছিলেন ২৫ জুলাই তারিখে। এই প্রথম প্রয়াসের সঙ্গে শিশিরকুমার ভাদুড়ী যুক্ত ছিলেন না। কিন্তু এর পরে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন মঞ্চে (মিনার্ভা, নাট্য নিকেতন, নাট্যভারতী, স্টার) *চিরকুমার সভা* অনেকবারই অভিনীত হয়েছিল। শিশিরকুমার ভাদুড়ী সেগুলির কোনো কোনোটিতে চন্দ্রাবাবু এবং রসিক চরিত্রে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

সব মিলিয়ে বাংলার সাধারণ রঙ্গালয়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এই প্রথম সংযোগ বেশ সমারোহ সহকারেই ঘটেছিল। রবীন্দ্রনাথসহ ঠাকুরবাড়ির সদস্যদের সক্রিয় সহযোগিতা বেশ আভিজাত্য দিয়েছিল সমগ্র ব্যাপারটিকে। সেই সঙ্গে *চিরকুমার সভা* ছিল এত বুচিমার্জিত, সরস, বুদ্ধিদীপ্ত ও মধুর একটি কমেডি; প্রচলিত হাসির নাটকগুলির গতানুগতিকতা, স্থূলতা ও ভাঁড়ামির আতিশয্য থেকে এতটাই দূরে যে, তা ছিল বাঙালি থিয়েটার-দর্শকের কাছে এক মনোরম, প্রাণ ভরানো অভিজ্ঞতা। সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়ের অভিমত উদ্ধৃত করছি:

‘Played by a strong cast and aided by a neat and artistic production, this Tagore play with its interesting love-story of three determined bachelors, punctuated with wit and humour the like of which had not so far been heard on the public stage, and, above all, its songs, immediately won the appreciation and patronage of the contemporary theatre-goers and the Art Theatre acquired a new prestige. (*The Story of Calcutta Theatres 1795-1980*; Calcutta, 1982; p.167)...

কিন্তু *চিরকুমার সভা* নাটকটিকে যদি আমরা সেই কালের, এবং এই কালেরও মঞ্চে উপস্থাপনের ঐ রঙ্গ-রস-আলোকসম্পাত ও সংগীত থেকে একটু সরিয়ে নিয়ে পাঠ করি সাহিত্য হিসেবে, তাহলে একটি সুস্বাদু এবং সূচীমুখ প্রশ্ন আমাদের বিদ্ধ করতেই থাকে। প্রশ্নটি উদ্ভিত হয় আখ্যানের আদি গঠন থেকেই। অর্থাৎ উপন্যাস *চিরকুমার সভা* ও *প্রজাপতির নিবন্ধ* এবং নাটক *চিরকুমার সভা* — তিনটির ক্ষেত্রেই প্রশ্নটি প্রযোজ্য।

এই আখ্যানটির প্রতিপাদ্য বিষয় কী? *চিরকুমার সভা* ও *প্রজাপতির নিবন্ধ* সংরূপের দুটি নাম থেকেই মনে হয় — লেখকের উদ্দেশ্য ছিল এই সত্যটি প্রতিষ্ঠিত করা — নারী ও পুরুষ প্রাণীর চিরকালীন যে জৈব পারস্পরিক আকর্ষণ — যাকে মানুষ অনুরাগ ও প্রেমে বুঝানোর করেছে — তার বিরুদ্ধতা করা নিরর্থক। শ্রেষ্ঠতা অভিমতী পুরুষ এমন ধারণা তৈরি করার চেষ্টা করেছে যে, জিতেন্দ্রিয়তা মানুষের মহৎ জীবনাদর্শ ও বৃহৎ কর্মকাণ্ডের পক্ষে সহায়ক। তাই পুরুষ অনেক সময়ে ভেবেছে যে, নারীকে সে তার জীবনকর্মপথে বর্জন করবে। কিন্তু সেই প্রতিজ্ঞা অতীব ভুলুর। কোনো-না-কোনো ভাবে সেই আদি বাসনা মানব-হৃদয়কে অধিকার করে। এই আখ্যানে সেই প্রেমভাব ও অনুরাগের সঞ্চার এবং গতিপথ অত্যন্ত সরস ও মনোরম ভাবে প্রদর্শিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য বিশেষ ভাবে যুবক-যুবতীদের প্রণয়াক্ষাণ্ডিকেই অবলম্বন করেছেন। রসিক ও চন্দ্রাবাবুর বয়স বিবেচনা করে

বিশ্বব্যাপ্ত প্রেমের ফাঁদের আওতা থেকে লেখক বাদ দিয়েছেন তাঁদের। প্রৌঢ়া মাতৃচরিত্র জগন্তারিণীরও প্রেম-বলয়ে কোনো স্থান করে নেবার প্রশ্ন ওঠেনি। অক্ষয় ও পুরবালা বিবাহিত দম্পতি এবং পরস্পরের প্রতি গভীর অনুরক্ত — তাদের নিয়ে কোনো প্রশ্ন নেই।

এর পরে বাকি থাকে তিন জোড়া যুবক-যুবতী। চন্দ্রবাবুর ভাগিনেয়ী নির্মলা; অক্ষয়ের দুই শ্যালিকা, পুরবালার বোন ও জগন্তারিণীর দুই কন্যা নৃপবালা ও নীরবালা। এই তিন তরুণীর বিপরীতে তিন নব-যুবক — যথাক্রমে পূর্ণ, শ্রীশ এবং বিপিন। এরা চন্দ্রবাবুর সভাপতিত্বে পরিচালিত যে সভার সভ্য তাদের ব্রত আজীবন অবিবাহিত থেকে দেশের কাজ করা। তাই সভার নাম ‘চিরকুমার সভা’। নামটির পরিকল্পনা থেকেই লেখকের কৌতুক-কটাক্ষ পরিস্ফুট। কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় কুমারের দল ব্রত জলাঞ্জলি দেবার জন্য পা বাড়িয়েই আছে। হাসি-খেলা-গান-কৌতুকসংলাপের মধ্যে দিয়ে মন দেওয়া নেওয়ার পালা সম্পন্ন হয়। এবং পরিণামে মধুরেণ সমাপয়েৎ।

কিন্তু এই মধুর-নিষ্যন্দী বলয়টিতে জেগে আছে একটি কঠিন কণ্টক। এই কাঁটা-র নাম শৈলবালা। জগন্তারিণীর মধ্যমা কন্যা পুরবালার ছোটো, এবং নৃপবালা ও নীরবালার দিদি। শৈলবালাও তরুণী। এবং শৈলবালা বিধবা। যে অর্থে *বিক্ষুব্ধ* উপন্যাসের কুন্দনন্দিনী, *কৃষ্ণকান্তের উইল* উপন্যাসের রোহিণী সংসারের কণ্টক হয়ে উঠেছিল ইচ্ছায় ও অনিচ্ছায়, অনেকটাই ঘটনাচক্রে; সেই অর্থে শৈলবালার কণ্টকত্ব একেবারেই অনুভূত নয়। শৈলবালা কাঁটাটি জগন্তারিণীর সংসার-উদ্যানের ফুলগুলিকে বুপে-গন্ধে-সরসতায় বিকশিত হয়ে উঠতে দেবার জন্য কোমর বেঁধে কাজে নেমে পড়েছে। বুদ্ধির কাঁটা বিধিয়ে সে ভিন্ন বাগানের পুষ্প-সঙ্গীদের তুলে এনেছে নিজেদের মহলে তার দুই বোনের জন্য। অতঃপর সম্পন্ন হয়েছে মধু ঝরানো, সুরভি ছড়ানো, গীত-গুঞ্জরিত ফুলের বিবাহ। তবু কাঁটা কাঁটাই থেকে যায়। সেই কাঁটা ক্ষত সৃষ্টি করতে থাকে পাঠকের মনে। যে পাঠক সমাজ-বিধান মেনে নেওয়া সাধারণ মধ্যবিত্ত সাধারণ শিক্ষিত নাগরিক। যাদের লক্ষ্য করে বিদ্যাসাগর মশাই তাঁর *বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব*-এর দ্বিতীয় পুস্তিকায় লিখেছিলেন: “তোমরা মনে কর, পতিবিরোগ হইলেই স্ত্রীজাতির শরীর লৌহময় হয়? ক্ষুধা আর ক্ষুধা বলিয়া বোধ হয় না? তৃষ্ণা আর তৃষ্ণা বলিয়া বোধ হয় না? দুর্জয় রিপুবর্গ এককালে নির্মূল হইয়া যায়?”

চিরকুমার সভা এবং *প্রজাপতির নির্বন্ধ* এই দুটি উপন্যাস ও নাটকটি পড়লে মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ শৈলবালার চরিত্র প্রণয়ন করবার সময়ে অনেকটা তা-ই ভেবেছিলেন। শরীরের প্রশ্ন সংক্রান্ত মধ্যযুগীয়তা অবশ্য নয়; তবু মনে হয় বিধবা তরুণীর যে প্রণয়াকাজক্ষা থাকতে নেই, না থাকাই স্বাভাবিক, না থাকলেই ভালো, অন্তত সংসারের পক্ষে মঙ্গল — এমন একটা দৃষ্টিকোণ খুব স্পষ্টতই শৈলবালার ক্ষেত্রে গ্রহণ করেছেন রবীন্দ্রনাথ।

শৈলবালা জগন্তারিণীর বিধবা কন্যা। সে পরিবারের স্নেহবৃন্তের মধ্যেই বাস করে। তার মনের মধ্যে কোনো অভাববোধের লেশমাত্র আভাস কোথাও পাওয়া যায় না। নাটকটিতে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত শৈলবালার ধ্যানজ্ঞান হল ছোটো বোনদুটিকে সংপাত্রস্থ করা। সেই পাত্রদুটি কারা হবে তা সে এবং তার জ্যেষ্ঠ ভগ্নীপতি অক্ষয় — যে এই নাটকের এবং আখ্যানের অপর প্রধান সক্রিয় চরিত্র — দুজনে মিলে স্থির করে রেখেছে আগেই। *চিরকুমার*

সভা-র সদস্য সেই দুই বন্ধু — শ্রীশ ও বিপিনের মনে নৃপবালা ও নীরবালা সম্পর্কে আগ্রহ জাগাবার প্রথম ধাপ থেকে শুরু করে বিবাহ স্থিরীকৃত হওয়া পর্যন্ত প্রতিটি পর্যায়েই শৈলবালার এই একলক্ষ্যভিমুখী হৃদয় উদ্ঘাটিত। এমনকী তার নিজের জন্য কোনো নির্জনতার অবকাশও রচনা করেননি নাটক-কার। দশদিক জুড়ে আন্দোলিত প্রেমমধুর হাওয়ার স্রোতে, নিজের হারানো স্বামীকে স্মরণ করে একটি বিষন্ন নিঃশ্বাস ফেলবার সুযোগও তাকে দেননি। একবারও সে ভাবেনি— ‘আমি একা’। তাতে বৈধব্যের ‘পবিত্রতা’ ক্ষুণ্ণ হত না। কিন্তু হয়তো তাতে অবিশিষ্ট মধুস্বাদী এই নাটকে একটুখানি বে-সুর মিশে যেত। এই বে-সুরটাকে দূরে রাখবার জন্যই সেই কালের বিয়েবাড়িতে বিধবারা রান্না-ভাঁড়ার সামলাতেন, কিন্তু মাঙ্গলিক কাজে তাঁদের মুখ দেখানো কাক্ষিক্ষিত ছিল না।

নাটকের কোনো চরিত্রকে ভিতর থেকে ব্যাখ্যা করে দেবার অবকাশ থাকে না তার সৃষ্টিকর্তার। চরিত্রের সংলাপ এবং সংলাপের পারস্পরিকতার মধ্যে দিয়েই ফুটিয়ে তুলতে হবে চরিত্রের আভ্যন্তর দ্বিধা-দ্বন্দ্ব। এই নাটকে রবীন্দ্রনাথ কেবল সরস সংলাপই রচনা করবেন বলে স্থির করে রেখেছেন। থাকবে কেবল উইট আর হিউমার; সঙ্গে হিল্লোলিত হয়ে যাওয়া চাই কেবল হাসি আর মজা আর আনন্দ আর কৌতুক। সেখানে শৈলবালার সংলাপও কেবল সেই লক্ষ্যেই ব্যবহৃত। সে নিজেই চিরকুমার সভা-র সভ্য হবে বলে যখন ‘অবলাকান্ত’ নাম নিয়ে পুরুষ বেশে এসে দাঁড়িয়েছে তখন তার তরুণ, সুকুমার, কমনীয় রূপে মুগ্ধ হয়ে দু-চারটি আবেগ-প্রশস্তি উচ্চারণ করেছে অক্ষয় এবং প্রৌঢ় রসিক। সমস্ত নাটকে সেটুকুই শৈলবালার একক প্রাপ্য। তার একাকিত্ব, তার নিজস্ব চাওয়া পাওয়ার পৃথিবীকে নিশ্চিহ্ন করে মুছে দেওয়া হয়েছে এই নাটকে। *চিরকুমার সভা* নাটকের শৈলবালা কোনো অর্থেই প্রকৃত মানবী নয়; সে নৃপবালা ও নীরবালার বিবাহ ঘটিয়ে তোলবার কাজ সম্পন্ন করবার জন্য বিশেষভাবে নির্মিত এক নারী-আকারবিশিষ্ট রোবট।

যেহেতু তার অবয়ব নারীর — তাই রোবট হয়েও অবশ্য তাকে সমাজের অনুশাসিত লক্ষ্মী মেয়ের ভূমিকাও পালন করতে হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ সেই ভূমিকা তাকে দিয়ে পালন করিয়েই ছেড়েছেন। যখন সে কার্যসিদ্ধির প্রয়োজনে পুরুষের বেশ ধারণ করেছে তখনও এই অনুশাসন থেকে মুক্ত হতে পারেনি। নাটকে দেখি, প্রথম যেদিন তাদের বাড়িতে ‘চিরকুমার সভা’র অধিবেশন বসেছে সেদিন সে সকলকে সুখাদ্য পরিবেশন করেছে, নিজে সঙ্গে খেতে বসেনি। পুরুষবেশী হলেও আসলে যে নারী, পুরুষদের সঙ্গে তার একত্রে বসে খাওয়া অনুমোদন করেননি রবীন্দ্রনাথ। শৈলবালার সংলাপ : “আমাকে পরিবেশন করতে দিন, খাওয়ার চেয়ে তাতে আমি ঢের বেশি খুশি হব।” শৈলবালা *চিরকুমার সভায়* প্রথম দেখা দিয়েছে পুরুষের পোশাকে, কিন্তু তার পিছনে ভূত্য এসেছে ভোজনপাত্র নিয়ে। সে সাদা পাথরের টেবিলে ফল মিস্তান্ন ভরা বুপোর থালা সাজিয়ে রেখেছে; অনুরোধ করে সকলকে খাইয়েছে। এ ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের মঞ্চনির্দেশ লক্ষণীয়।

চন্দ্রাবুর পাতে আম ছিল, তিনি সেটাকে ভালোবুপ আমগু করিতে পারিতেছিলেন না—
অনুতপ্ত শৈল তাড়াতাড়ি তাহা কাটিয়া সহজসাধ্য করিয়া দিল। যে সময়ে যেটি আবশ্যক আস্তে আস্তে হাতের কাছে জোগাইয়া দিয়া তাঁহার ভোজন ব্যাপারটি নির্বিঘ্ন করিতে লাগিল।

অনুমান করা যায়, দৃশ্যটি প্রেক্ষাগৃহের পুরুষ দর্শকদের খুবই মনোমতো হয়েছিল। নারী — সে যতই পুরুষের পোশাক পরুক, বুদ্ধি ধরুক আর কর্মক্ষম হোক — পুরুষকে যত্ন করে খাওয়াবে না — তা কি হয়? এ ব্যাপারে শরৎচন্দ্রকেই একা দায়ী করা অনুচিত। রবীন্দ্রনাথও এই নির্দেশই দিয়েছেন। এমন কী চন্দ্রবাবুকে আম কেটে দেওয়া হয়নি বলে অনুতপ্তও হবে সে! এই অনুতাপের দায়ও তার।

নারীর বৈধব্য বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মনোভঙ্গিকে আমরা একদেশদর্শী বলতে পারতাম যদি না প্রথম *চিরকুমার সভা* (উপন্যাস) লেখার প্রায় সম সময়েই *চোখের বালি* উপন্যাসে বৈধব্যের বঞ্চনার তীব্র সংবেদনশীল ছবি এঁকে দিতেন রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু সেই বিনোদিনীকেও তিনি গৃহকর্মনিপুণা এবং সেবাপরায়ণা করেই গড়েছেন। সে-ও খাদ্য পরিবেশন করে, সঙ্গে বসে খায় না।

নাটকের একেবারে অন্তিম লগ্নে শৈলবালার বৈধব্যের প্রতি এক বিন্দু করুণা বর্ষিত হয়েছে অক্ষয়ের উক্তিতে। যখন শৈলবালা পুনরায় নারী-বেশে মঞ্চে এসেছে তখন সকলের বিস্ময়োক্তির মধ্যে অক্ষয় বলেছে: “এঁর অবলাকান্ত হওয়াই উচিত ছিল, কিন্তু ভগবান এঁকে বিধবা শৈলবালা করে কী মঙ্গল সাধন করছেন সে রহস্য আমাদের অগোচর।” বিধাতাকে টেনে এনে — বিধবাদের প্রতি সমাজের অবিচারের প্রসঙ্গটি ঢাকা দেওয়া হয়েছে এখানে। অথচ বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহ আন্দোলন এবং বিধবা-বিবাহের আইন পাস হওয়া উপন্যাসটি লিখিত হবার পঁয়তাল্লিশ বছর আগের ঘটনা। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে বিধবা-বিবাহ দেওয়া হয়েছে — যদিও সুখী হয়নি সেই নারী; কিন্তু উনিশ শতকেই বিধবা-বিবাহ সুখপ্রদ হয়েছে রমেশচন্দ্র দত্তের উপন্যাসে। তবু বিশ শতকের প্রারম্ভে এক নব্য বুচিসম্পন্ন পরিবারে তরুণীর বৈধব্যকে বিধাতার রহস্যময় বিচার বলে মেনে নেবার বিধান পাচ্ছি আমরা।

চিরকুমার সভা নাটকটির (১৯২৫) প্রসঙ্গ ছেড়ে আমরা ফিরে যাই বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে। *অরুণী* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল *চিরকুমার সভা* উপন্যাস (১৯০০ থেকে ১৯০১)। এই আখ্যান থেকেই শৈলবালা চরিত্রটি একই ভাবে উপস্থাপিত। উপন্যাস বলেই সেখানে চরিত্রগুলিকে নিজের দৃষ্টিকোণসহ উপস্থাপিত করবার কিছুটা সুযোগ পেয়েছেন লেখক। দেখা যাক সেখানে কীভাবে দেখানো হয়েছে শৈলবালাকে। শৈলবালার চুল ছোটো করে ছাঁটা, সাজ-সজ্জার কোনো চেষ্টা নেই। গরম হয় এবং খোঁপা বাঁধতে সময় যায় বলে আজানুলব্ধিত চুল ছোটো ফেলে সে নিশ্চিত হয়েছেন। সংস্কৃতে অনার্স নিয়ে বি. এ. পাস করতে চায়। সহজ বর্ণনা। কিন্তু শব্দগুলির ফাঁকে ফাঁকে না বলা কথা আছে আরও। আজানুলব্ধিত চুলগুলি কেটে ফেলেছে সে নিজেই। কারণ গরম হয় এবং খোঁপা বাঁধতে সময় যায়। যদি শৈলবালা অনুচা কিংবা সম্বা নারী হত তাহলে কি উপরিউক্ত কারণে চুল ছোটো নিশ্চিত হতে পারত সে? তাকে চুল কাটতে বাধ্য করেছে সমাজের অনুশাসন — সকলের কাছে অতি নিষ্ঠাবতী বিধবা বলে স্বীকৃত হবার বাসনা। আর একটু এগোলে এই মনোভাব থেকেই স্বেচ্ছায় সতী হয়ে আগুনে পুড়তে যেত মেয়েরা। মেয়েদের, বিশেষ করে বিধবা মেয়েদের এই মনোভাবকে দেখা হয়েছে প্রশংস-প্রশংসার চোখে। *চিরকুমার সভা* উপন্যাসে তা শৈলবালাকে লেখক পাঠকদের কাছে কীভাবে প্রথম পরিচিত করিয়েছেন উদ্ধৃত করছি:

প্রসন্ন হাস্যময়ী শৈলই ক্ষুদ্র পবিবারটির প্রতিষ্ঠাকেন্দ্র। চাকব-বাকর আশ্রিত অভ্যাগত এমনকি প্রতিবেশিরা তাহারই চতুর্দিকে আকৃষ্ট হইয়া যেন আবর্তিত হইতেছে। পাড়ার ছোট ছেলেরা তাহার কাছে পড়া বলিয়া লয়, এবং প্রতিবেশিদের ঘবে পীড়া হইলে শৈল কিনা আড়ম্ববে তাহাদের সেবার ভার গ্রহণ করে। তাহাকে দেখিয়া কেহ পাস কবা বিদুষী বলিয়াও ভয় করিত না। তাহার মধ্যে বালকের কৌতুকপরতা, পুরুষের উদার ঋজুভাব এবং নারীর স্নেহপূর্ণ সেবাসীলতা মিশ্রিত ছিল।

রবীন্দ্রনাথের নারী সম্পর্কিত ভাবনার প্রতিফলন আয়নার ছবির মতো ফুটে ওঠে এই অংশে। আদর্শ নারী (না কি আদর্শ বিধবা নারী?) হবে ‘প্রসন্ন হাস্যময়ী’। সকলের জন্য উৎসর্গ করে দেবে নিজেকে। লেখাপড়া জানলেও কেউ যেন তাকে ‘বিদুষী’ বলে ভয় না করে। তার সহজ আনন্দ বা কৌতুকপরতা ‘বালকের’ মতো। তরুণী মেয়েদের (বিশেষত বিধবার) পক্ষে ‘কৌতুকপরতা’ ঠিক স্বাভাবিক নয়! আর, ‘উদার ঋজুভাব’ কেবল পুরুষেরই থাকার কথা। নারীর মধ্যে তা থাকলে সেটা পুরুষীয় গুণ এবং অতীব মহৎ মনোভাব। নারীর পক্ষে স্বাভাবিক ধর্ম ‘স্নেহপূর্ণ সেবাসীলতা’ শৈলবালার মধ্যে থাকতেই হবে, না হলে তা বড়ো নিন্দাযোগ্য। কিন্তু শৈলবালার মধ্যে থাকবে না কেবল ভালোবাসার জন্য কোনো তৃষ্ণা, প্রেমের জন্য কোনো ব্যাকুলতা। সে যে বিধবা! সে কেবল তার বোনদের জীবনে প্রেম এনে দেবার জন্য প্রাণপাত করবে — এমনই দেখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ।

প্রজাপতির নির্বন্ধ উপন্যাসটি ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে চিরকুমার সভা উপন্যাসের কিছুটা পরিবর্তিত আকার নিয়ে প্রকাশিত হয়। সেখানে শৈলবালাকে আমরা কীভাবে দেখি? উপন্যাসের শুরুতেই বলা হয়েছে অক্ষয়ের শ্বশুর অর্থাৎ শৈলবালার পিতা ছিলেন নব্য হিন্দু সমাজের মানুষ। মেয়েদের বেশি বয়স পর্যন্ত অবিবাহিত রেখে লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন তিনি। তাঁর মৃত্যুর পর সংসারের অনেকটাই দায়িত্ব বর্তায় জামাতা অক্ষয়ের উপর। সে উচ্চপদস্থ চাকুরিজীবী এবং ‘পুরা নব্য’। কিন্তু এত নব্যতার পরিমণ্ডলেও তরুণী বিধবা মেয়েটির পুনর্বিবাহের কোনো প্রসঙ্গ কখনও ওঠেনি। উপরন্তু জননী জগন্তারিণী অবলীলাক্রমে বলেছেন : “বাবা অক্ষয়, শৈল বিধবা মেয়ে, ওকে এত পড়িয়ে পাস করিয়ে কি হবে বোলা দেখি। ওর এত বিদ্যের দরকার কী?”

অতঃপর অক্ষয় ও শৈলবালার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : “এই শ্যালী ভগিনীপতি দুটি পরস্পরের পরম বন্ধু ছিল। অক্ষয়ের মত এবং রুচির দ্বারাই শৈলের স্বভাবটা গঠিত। অক্ষয় তাঁহার এই শিষ্যাটিকে যেন আপনার প্রায় সমবয়স্ক ভাইটির মতো দেখিতেন — স্নেহের সহিত সৌহার্দ্য মিশ্রিত।”

পুরুষবেশে যখন শৈলবালা প্রথম দেখা দিয়েছে তখন তার রূপের নবীনতায় মুগ্ধ হয়েছে সকলেই! পিতামহপ্রতিম রসিক বলেছেন : “যেন কিশোর কন্দর্প”, ছোটো দুটি বোনের চোখে সে তেপান্তর পেরিয়ে আসা রূপকথার, রাজপুত্র এসেছে রাজকন্যাদের উদ্ধার করতে। দিদি পুরবালার মনে হয়েছে : “আহা শৈল আমাদের বোন না হয়ে যদি ভাই হত। ওর এমন রূপ এমন বুদ্ধি ভগবান সমস্তই ব্যর্থ করে দিলেন!” স্বামী না থাকলে মেয়েদের রূপ ও বুদ্ধি ব্যর্থ হয় — এই ধারণায় কোনো অস্বাভাবিকতা আছে বলে পুরবালার মনে হয়নি। যদিও তার পিতা ‘নব্য হিন্দু’ এবং স্বামীও ‘পুরা নব্য’। বিধবা বোনটির প্রতি ‘করুণা ও প্রশ্রয়ের অন্ত

ছিল না’ বলে সে শৈলবালার পুরুষবেশ ধারণ করে চিরকুমার সভা-র সভ্য হওয়ার মতো ‘নিয়মবিরুদ্ধ’ ব্যাপারও মেনে নিয়েছে — কিন্তু শৈলবালার জন্য তার বেশি কিছু ভাবেনি। আর অক্ষয় কিশোর বৈশাখারিণী শৈলকে বলেছে: “তুমি যদি আমার শ্যালী না হয়ে আমার ছোটো ভাই হতে তাহলেও আমি আপত্তি করতুম না।” এর পরেই লেখক আর একবার মনে করিয়ে দিয়েছেন: “বাস্তবিক ইহারা দুই ভাইয়ের মতোই ছিল। কেবল সেই ভ্রাতৃত্বাবের সহিত কৌতুকময় বয়সভাব মিশ্রিত হইয়া কোমল স্নেহ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল।” বার বারই রবীন্দ্রনাথ পাঠককে মনে করিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন যে, অক্ষয় ও শৈলবালার সম্পর্ক ‘দুই ভাইয়ের মতো’। সম্পর্কটির মধ্যে নারী পুরুষ রসায়ন নেই — এই ভাবনাটাই কি প্রতিষ্ঠিত করে দিতে চাইছেন তিনি? শৈলর জীবনে ও মনে কোনো দিক থেকেই কোনো পুরুষের প্রীতি-নিষিক্ত ছায়া না পড়ে সেদিকে তার সজাগ দৃষ্টি। অথচ একবারও কোনো মুহূর্তে শৈল তার প্রয়াত স্বামীর কথা ভেবেও বিষণ্ণ হয়েছে — এমন মুহূর্তও রচনা করেননি লেখক।

চিরকুমার সভা-র তিনটি রূপান্তর আছে আমাদের সামনে। প্রথমটি চিরকুমার সভা উপন্যাস ১৯০০-১৯০১-এ ‘হিতবাদীর উপহার’-এ। দ্বিতীয়টি ঈষৎ পরিবর্তিত প্রজ্ঞাপতির নির্বন্ধ ১৯০৭-এ প্রকাশিত। তৃতীয়টি ১৯২৫-এ রচিত চিরকুমার সভা কমেডি। আখ্যানের কাঠামোর কোনো পরিবর্তন ঘটেনি কোনো সংস্করণে বা রূপান্তরে। শৈলবালার চরিত্রটিও আছে ১৯০০ থেকে ১৯২৫ পর্যন্ত একই রকম। বঙ্কিমচন্দ্র সংস্করণের পর সংস্করণে কৃষ্ণকান্তের উইল-এর রোহিণী সম্পর্কে নিজের দৃষ্টিকোণকে পরিবর্তিত করেছিলেন। ক্রমে পরিমার্জিত ব্যক্তিত্ব হয়ে উঠেছিল রোহিণী। কিন্তু শৈলবালা সম্পর্কে তেমন কোনো ভাবনা দেখা দেয়নি রবীন্দ্রনাথের মনে। যে রবীন্দ্রনাথ প্রথম চিরকুমার সভা রচনার সম সময়েই চোখের বালি-তে বিনোদিনী চরিত্রে বিধবা মেয়েটির তীব্র জীবনাকান্ডাকে গাঢ় সংবেদনায় মূর্ত করলেন — তিনি শৈলবালার শূন্যতাকে শূন্যতা বলে কোনোদিন স্বীকারই করলেন না। একটি পরিস্থিতি নির্ভর, হাস্যরস উছলে ওঠা কমেডি তৈরি করতে গেলে যে যন্ত্রবৎ অংশগুলি প্রয়োজন হয় সেভাবেই ব্যবহার করলেন শৈলবালাকে। তাকে দিলেন নিজের অর্ডার-মাফিক এবং হৃদয় ও ব্যক্তিত্ব। তাকে পুরোপুরি মানুষ হয়ে উঠতেও দিলেন না।

শৈলবালার একটি সংলাপ আছে এই রচনার তিনটি রূপান্তরেই। যখন সে পুরুষবেশে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তখন — ‘মা যদি টের পান’ এ-প্রশ্নের উত্তরে সে বলেছে: “তিনি কন্যাকে কেবলমাত্র স্মরণ করেই মা মনে মনে এত অস্থির হয়ে ওঠেন যে তিনি আমাদের আর খবর রাখতে পারেন না।” গৌরবে বহুবচন বর্জন করলে আসল কথাটা দাঁড়ায়: ‘আমার আর খবর রাখতে পারেন না।’ সংসারের বিধবা মেয়েটি এভাবেই সকলের এবং তার স্রষ্টারও কাজে লাগে। কিন্তু তার খবর কেউ রাখে না। যে রবীন্দ্রনাথ ‘কাব্যে উপেক্ষিতা’-র পত্রলেখা আর উর্মীলাকে দেখেছিলেন আর দেখিয়েছিলেন, তিনিও শৈলবালার খবর রাখলেন না। কিন্তু আমাদের মনে শৈলবালা তাকে উপেক্ষা করা সংক্রান্ত প্রশ্নটি কাটার মতোই রেখে গেল।

রক্তকরবী-র পাণ্ডুলিপি-বিবর্তন : একটি সমীক্ষা

মলয় রক্ষিত

এক

রক্তকরবী নাটকের পাণ্ডুলিপিচর্চার প্রথম সূত্রপাত হয় খুব সম্ভব ১৯৮৬ থেকে। বহুবুপী সম্প্রদায়ের মুখপত্র বহুবুপী পত্রিকার ১মে ১৯৮৬ সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের স্বকৃত একটি পাণ্ডুলিপি প্রকাশিত হয়। বহুবুপী প্রকাশিত রক্তকরবী-র ওই পাণ্ডুলিপির নাম ছিল 'নন্দিনী'। সম্পাদক কুমার রায়। তিনি ওই পাঠটিকে রক্তকরবী-র প্রথম পাঠ হিসেবে ধরে নেন। অবশ্য প্রকৃতপক্ষে প্রকাশিত ওই পাঠটি ছিল রক্তকরবী-র চতুর্থ খসড়া। সে সম্পর্কে পরে নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গেছে। কিন্তু যেটা বলার কথা, বহুবুপী প্রকাশিত ওই 'নন্দিনী' রক্তকরবী-র পাণ্ডুলিপি চর্চার সম্ভাবনাময় দরজা খুলে দেয়। ঠিক ওই বছরেই ২৩ ডিসেম্বর, শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবন প্রকাশিত রবীন্দ্রবীক্ষা-র ১৬ সংখ্যায় রক্তকরবী-র প্রথম খসড়াটি 'প্রাসঙ্গিক তথ্যপঞ্জি' সহ ড. প্রণয়কুমার কুন্ডুর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। এর পর রক্তকরবী-র দ্বিতীয় এবং তৃতীয় খসড়াটিও প্রকাশিত হয় ড. কুন্ডুর সম্পাদনায় ওই রবীন্দ্রবীক্ষা-রই যথাক্রমে উনিশ (৭ অগস্ট, ১৯৮৮) এবং বাইশতম (২৩ ডিসেম্বর, ১৯৮৯) সংখ্যায়।

পরবর্তী পর্যায়ে আর কোনো খসড়া রবীন্দ্রবীক্ষা-য় প্রকাশিত হয়নি। অবশেষে রবীন্দ্রভবনে সংরক্ষিত নাট খসড়া এবং প্রচলিত মুদ্রিত সংস্করণকে একত্রিত করে বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ থেকে রক্তকরবী পাণ্ডুলিপি সংবলিত সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৯৮-এ। সম্পাদনা করেন প্রণয়কুমার কুন্ডুই। গ্রন্থটিতে ওই নাট খসড়ার পাঠভেদ সংবলিত বিশেষ রূপটি প্রণয়কুমার যেভাবে তুলে ধরেছেন, তা অনেকেরই পছন্দ হয়নি। বিশেষত নাট খসড়াকে পাদটীকার আকারে পর পর যেভাবে দশটি করে পংক্তিতে সাজানো হয়েছে, তা পূর্ণাঙ্গ পাঠ-গ্রহণে অসুবিধা হওয়ারই কথা। সামান্য অসতর্কতায় ভুল হয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু তার জন্য প্রণয়কুমারকে কাঠ-গড়ায় তোলা অনুচিত। বরং তিনি ধন্যবাদার্থ এই কারণে যে, গ্রন্থটি প্রকাশিত হবার পর রক্তকরবী নিয়ে আলোচনার একটি নতুন দিগন্ত আমাদের সামনে উন্মোচিত হয়েছে।

বর্তমান আলোচনায় রক্তকরবী-র পাণ্ডুলিপিগুলির বিবর্তনওতৎসংক্রান্ত তথ্যাবলি বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে, নাটকটির পূর্ণতর হয়ে ওঠার সোপানটিকে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা থাকবে।

দুই

একটু পরিশ্রম করলে রক্তকরবী-র দশটি খসড়ার পূর্ণাঙ্গ রূপ হাতের কাছে জোগাড় করে নেওয়া এখন আর অসম্ভব নয়। রক্তকরবী-র খসড়াগত বিবর্তনের একটা রেখাচিত্রও নিজের মতো তৈরি করে নেওয়া চলে। বিশেষত নাটকটির কাহিনিগত যে বিবর্তন ঘটেছে, বিভিন্ন

সংযোজন ও বর্জনের মধ্যে দিয়ে যেভাবে ঘটনাগুলি বিন্যস্ত হয়েছে, অথবা চরিত্রগুলি নির্মিত হয়েছে, তা আমাদের বিস্মিত করে। নাটকটিকে রূপ দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঘটনা ও চরিত্রগুলি নিয়ে কতখানি ঘষা-মাজা করেছিলেন, কতখানি যত্ন ও পরিশ্রম তিনি পাণ্ডুলিপিগুলির প্রতিটি পৃষ্ঠায় করেছিলেন, তা তাঁর পাণ্ডুলিপিগুলি চাক্ষুষ না করলে ধারণা করা সম্ভব নয়। আমরা নাটকটির পাণ্ডুলিপির বিবর্তনের রেখাচিত্রটি তুলে ধরতে গিয়ে রক্তকরবী প্রচলিত পাঠ পরিচয় প্রথমে তুলে ধরিছি।

রক্তকরবী: প্রচলিত সংস্করণ

রক্তকরবী-র প্রচলিত সংস্করণে আমরা দেখেছি নাটকটির কোনো অঙ্ক বা দৃশ্যভাগ নেই। কিন্তু নাটকটি যদি গভীর মনোনিবেশ সহকারে পাঠ করা যায় তাহলে পাঠক অদৃশ্য কতকগুলি দৃশ্য বা পর্ব ভাগের অস্তিত্ব অনুভব করতে পারবেন। প্রকৃতপক্ষে, চরিত্রের সংলাপগুচ্ছ এবং ঘটনা অনুসারে তাদের প্রবেশ প্রস্থান লক্ষ করলে নাটকটিকে বেশ কতকগুলি পৃথক ছোটো ছোটো দৃশ্য ভাগ করা যেতে পারে। আমরা আলোচনার সুবিধের জন্যে বিভিন্ন চরিত্রের সংলাপগুচ্ছ তাদের প্রবেশ-প্রস্থান অনুসারে কতকগুলি একক বা ইউনিটে ভাগ করে নেব। আমাদের বিবেচনায় এই এককগুলি হবে এইরকম:

একক-১

নন্দিনী ও কিশোরের সংলাপ দিয়ে নাটক শুরু হয়। কিশোরের প্রবেশ থেকে আরম্ভ করে নন্দিনীর সঙ্গে তার কথোপকথনের পর প্রস্থান পর্যন্ত অংশকে আমরা প্রথম একক ধরিছি। এককটির শুরু ও শেষ এইরকম—

শুরু:

নন্দিনী ও কিশোর (সুড়ঙ্গ খোদাইকার বালক)

কিশোর ॥ নন্দিনী! নন্দিনী! নন্দিনী!

নন্দিনী ॥ আমাকে এত করে ডাকিস কেন কিশোর! আমি কি শুনতে পাইনে?

শেষ:

নন্দিনী ॥ আচ্ছা, তাই সই। কিন্তু তুই একটু সামলে চলিস।

কিশোর ॥ না, আমি সামলে চলব না, চলব না। ওদের মারের মুখের উপর দিয়েই রোজ তোমাকে ফুল এনে দেব। (প্রস্থান)

একক-২

কিশোরের প্রস্থানের পরেই আসে অধ্যাপক, নন্দিনীকে দেখে তার বিস্ময় আর কাটে না। তার একান্ত ইচ্ছে নন্দিনীকে তার ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে তত্ত্বকথা শোনায়। শেষ পর্যন্ত নন্দিনীর কাছে রক্তকরবীর একটি ফুল পেয়ে অধ্যাপক চলে যায়। অংশটির শুরু ও শেষ—

শুরু:

(অধ্যাপকের প্রবেশ)

অধ্যাপক ॥ নন্দিনী! যেও না, ফিরে চাও।

নন্দিনী ॥ কী অধ্যাপক?

শেষ:

অধ্যাপক ॥ তা, আমাকে ওব একটি ফুল দাও, শুধু ক্ষণকালের দান, ওর রঙের তত্ত্বটি
বোঝবার চেষ্টা করি।

নন্দিনী ॥ এই নাও। আজ রঞ্জন আসবে, সেই আনন্দে এই ফুলটি তোমাকে দিলুম।
(অধ্যাপকের প্রস্থান)

একক-৩

অধ্যাপকের প্রস্থানের পরেই আসে গোকুল। নন্দিনীকে দেখে তার মনে হয় 'ভয়ংকরী', মনে
হয় 'রাজা আলোর মশাল'। নন্দিনীকে সরাসরি এই সম্বোধনের কথা বলেই সে অন্যদের
সাবধান করতে চলে যায়। অংশটির শুরু ও শেষ—

শুরু:

(সুড়ঙ্গ খোদাইকার গোকুলের প্রবেশ)

গোকুল ॥ একবার মুখ ফেরাও তো, দেখি— তোমাকে বুঝতেই পারলুম না। তুমি কে?

শেষ:

নন্দিনী ॥ আমাকে দেখে তোমার এমন ভয়ংকর মনে হচ্ছে কেন?

গোকুল ॥ দেখে মনে হচ্ছে, তুমি বাস্তব আলোর মশাল। যাই, নির্বোধদের বুঝিয়ে বলি
গে; 'সাবধান! সাবধান! সাবধান!' (প্রস্থান)

একক-৪

গোকুল চলে যাবার পরই নন্দিনী রাজার জানালায় ঘা দেয়। সাড়া দেয় রাজা। নন্দিনী তার
ঘরের মধ্যে যেতে চাইলেও রাজা বলে 'সময় নেই'। জালের বাইরে থেকেই তাদের
কথোপকথন চলে। শেষে নন্দিনী যাবার আগে রাজার মুখের উপর চ্যালেঞ্জ দিয়ে যায় যে
রঞ্জন আসবেই কেউ তাকে ঠেকাতে পারবে না। অংশটির শুরু ও শেষ—

শুরু:

নন্দিনী ॥ (জালের দরজায় ঘা দিয়ে) শুনতে পাচ্ছ?

নেপথ্যে ॥ নন্দা, শুনতে পাচ্ছি। কিন্তু বারে বারে ডেকে না, আমার সময় নেই, একটুও না।

শেষ:

নন্দিনী ॥ যাচ্ছি, কিন্তু বলে গেলুম, আজ আমার বঞ্জন আসবে— আসবে— আসবে।
কিছুতে তাকে ঠেকাতে পারবে না। (প্রস্থান)

একক-৫

জালের আড়ালে থাকা রাজার সঙ্গে কথোপকথনের পর নন্দিনীর প্রস্থান ঘটে। এমন
সময়ই ফাগুলাল ও তার স্ত্রী চন্দ্রা প্রবেশ করে। মদ খাওয়া নিয়ে তাদের ঝগড়া। কথাবার্তার
মাঝেই আসে বিশু। হঠাৎ তার গান খুলে গেছে। বিশুর প্রবেশের পরেই আসে গোকুল।
নন্দিনীর নামে সে বিশুর কাছে অনুযোগ করে। গোকুলের প্রস্থানের পরে আসে সর্দার এবং
গৌসাই। তারা কারিগরদের মধ্যে উৎপাত লক্ষ করে। সর্দার এবং গৌসাইয়ের প্রস্থানের

পর হঠাৎ নেপথ্য থেকে নন্দিনীর ‘পাগল ভাই’ ডাক শোনা যায়। নন্দিনী আসার আগেই চন্দ্রা ফাগুলালের প্রস্থান ঘটে। তাদের প্রস্থান এবং একই সঙ্গে নন্দিনীর প্রবেশে এই এককের সমাপ্তি। অংশটির শুরু ও শেষ নিম্নরূপ—

শুরু:

(ফাগুলাল খোদাইকর ও তার স্ত্রী চন্দ্রার প্রবেশ)

ফাগুলাল ॥ আমার মদ কোথায় লুকিয়েছ চন্দ্রা, বের করো।

চন্দ্রা ॥ ও কী কথা! সকাল থেকেই মদ?

শেষ:

চন্দ্রা ॥ এ-সব কথা বুঝি নে বেয়াই— একটা কথা বুঝি যে, যে মেয়েকে তোমরা যত কম বোঝ সেই তোমাদের তত বেশি টানে। আমরা সাধাসিধে, আমাদের দর কম, তবু যা হোক তোমাদের সোজা পথে নিয়ে চলি। কিন্তু আজ বলে রাখলুম, ঐ মেয়েটা ওব বস্তকরবীর মালার ফাঁসে তোমাকে সর্বনাশের পথে টেনে আনবে। (চন্দ্রা ও ফাগুলালের প্রস্থান)

একক-৬

ফাগুলাল চন্দ্রার চলে যাওয়ার পরে নন্দিনীর প্রবেশ। বিশুর সঙ্গে তার কথাবার্তায় তাদের অতীত জীবনের স্মৃতি উঠে আসে। তাদের কথাবার্তার মাঝেই চলে আসে সর্দার। বিশুকে সে কেমন একটু সন্দেহের চোখে দেখে। সর্দারের প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হয় এই একক। অংশটির শুরু এবং শেষ—

শুরু:

(নন্দিনীর প্রবেশ)

নন্দিনী ॥ পাগল ভাই, দুবের বাস্তা দিয়ে আজ সকালে ওরা পৌষের গান গেয়ে মাঠে যাচ্ছিল, শুনছিলে?

বিশু। ॥ আমার সকাল কি তোর সকালের মতো যে গান শুনতে পাব? এ যে ক্লান্ত রাস্তিরটারই ঝোঁটয়ে ফেলা উচ্ছিষ্ট।

শেষ:

নন্দিনী ॥ তাব জন্যে মালা আছে।

সর্দার ॥ আছে বৈকি, ঐ বুঝি গলায় দুলছে? জয়মালা এই কুন্দফুলের, এ যে হাতের দান; আর বরণমালা ঐ রক্তকরবীর, এ হৃদয়ের দান। ভালো ভালো, হাতের দান হাতে হাতেই চুকিয়ে দাও, নইলে শুকিয়ে যাবে। হৃদয়ের দান, যত অপেক্ষা করবে তত তার দাম বাড়বে। (প্রস্থান)

একক-৭

সর্দারের প্রস্থানের পরই নন্দিনী দ্বিতীয়বার রাজার জানলার কাছে গিয়ে রাজাকে ডাকে। রাজা সাড়া দেয়, তার সঙ্গে কথা বলে, কিন্তু ঘরে আসতে দেয় না। নন্দিনীর সঙ্গে বিশুকে দেখে সে রেগে যায়। রঞ্জনর কথা উঠলেও রাজা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। অবশেষে নন্দিনী গান শুরু করলে রাজা সহ্য করতে পারে না, পালিয়ে যায়। রাজা চলে গেলে নন্দিনী বিশুকে নিয়ে

সেই পথের ধারে অপেক্ষা করতে যায়, যেখান দিয়ে রঞ্জন আসবে। এর সঙ্গেই নন্দিনী-বিশু দুজনের প্রস্থান ঘটে। এককটির শুরু ও শেষ অংশ নিম্নরূপ—

শুরু:

নন্দিনী ॥ (জানলার কাছে) শুনতে পাচ্ছ?
নেপথ্যে ॥ কী বলতে চাও বলো।

শেষ:

বিশু ॥ তোমার সেই কিছু না দেওয়া আমি ললাটে পরে চলে যাব। অল্প কিছু দেওয়ার দামে আমার গান বিক্রি করব না— এখন কোথায় যাবি?
নন্দিনী ॥ পথের ধারে, যেখান দিয়ে রঞ্জন আসবে। সেইখানে বসে আবার তোমার গান শুনব। (উভয়ের প্রস্থান)

একক-৮

নন্দিনী-বিশুর প্রস্থানের পরে সর্দার ও মোড়লের প্রবেশ ঘটে। সম্পূর্ণ এক ভিন্ন প্রসঙ্গে তাদের কথাবার্তা শুরু হয়। রঞ্জনকে আসতে দেওয়া নিয়ে তাদের কথাবার্তার শেষ পর্বে প্রবেশ ঘটে ছোটো সর্দারের। রঞ্জনকে কৌশলে রাজার ঘরে ঢুকিয়ে দেবার পরিকল্পনা করে সর্দার। তাদের সকলের প্রস্থানের সঙ্গে এককের সমাপ্তি ঘটে। শুরু এবং শেষ অংশ—

শুরু:

(সর্দার-মোড়লের প্রবেশ)

সর্দার ॥ না, এ পাড়ায় রঞ্জনকে কিছুতে আসতে দেওয়া চলবে না।
মোড়ল ॥ ওকে দূরে রাখব বলেই বজ্রগড়ের সুড়ঙ্গে কাজ করাতে নিয়ে গিয়েছিলুম।

শেষ:

সর্দার ॥ ওকে বলো গে রাজা ওর নন্দিনীকে সেবাদাসী করে রেখেছে।
ছোটো সর্দার ॥ কিন্তু রাজা যদি—
সর্দার ॥ কিছু ভাবতে হবে না। চলো, আমি নিজে যাচ্ছি। (সকলের প্রস্থান)।

একক-৯

সর্দারদের প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গেই প্রবেশ ঘটে অধ্যাপক পুরাণবাগীশের। তাদের কথা প্রসঙ্গে আসে নন্দিনী ও রাজার কথা। মাঝপথে সর্দার আসে, জানিয়ে দেয় পুরাণ নয়, রাজা ভাবছে নবীনীর কথা। নন্দিনী হঠাৎ দ্রুত প্রবেশ করে। সে রাজার ঐটোদের দেখে আঁতকে ওঠে। যক্ষপুরীর এই অঙ্ককার দিক যখন তাকে হতাশাগ্রস্ত করে সেই সময়ই পালোয়ান টলতে টলতে প্রবেশ করে। কিন্তু অধ্যাপক সেই সময়েই সর্দার আসছে দেখে সরে পড়ে। অধ্যাপকের প্রস্থানে এই এককটির সমাপ্তি ঘটে। শুরু ও শেষ অংশ নিম্নরূপ—

শুরু:

(অধ্যাপক ও পুরাণবাগীশের প্রবেশ)

পুরাণবাগীশ ॥ ভিতরে এ কী প্রলয়কাণ্ড হচ্ছে বলো তো— ভয়ংকর শব্দ যে।
অধ্যাপক ॥ রাজা বোধ হয় নিজের উপর নিজে বেগেছে। তাই নিজের তৈরি একটা কিছু চুরমার করে দিচ্ছে।

শেষ :

নন্দিনী ॥ আমার উপরে কেন এত রাগ?
অধ্যাপক ॥ আন্দাজে বলতে পারি। তুমি ভিতরে ভিতরে ওর মনের তারে টান লাগিয়েছ;
যতই সুর মিলছে না, বেসুর ততই কড়া হয়ে চোঁচিয়ে উঠছে। (প্রস্থান)

একক-১০

অধ্যাপকের প্রস্থানের পরেই সর্দার প্রবেশ করে। সর্দারের সঙ্গেই প্রবেশ ঘটে গোসাইয়ের। কথা প্রসঙ্গে নন্দিনী জানতে চায় বিশু পাগলকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সর্দার সে কথার উত্তর না দিলে নন্দিনী গোসাইকে ধরে। গোসাইয়ের জপমালা ছিঁড়ে ফেলে। বিপদ বুঝে গোসাই পালায়। তখন নন্দিনী ফের সর্দারকে ধরে। বলে রঞ্জনকে সে আসতে দেবে কিনা। সর্দার 'কিছুতে না' বললে নন্দিনী সরাসরি তাকে চ্যালেঞ্জ জানায়। এই চ্যালেঞ্জের সঙ্গেই সর্দারের প্রস্থান ঘটে। এককটির শুরু ও শেষ এরকম—

শুরু:

(সর্দারের প্রবেশ)

নন্দিনী ॥ সর্দার।

সর্দার ॥ নন্দিনী, তোমার সেই কুঁদকুলের মালাগাছাটি আমার ঘরে দেখে গোসাইজির দুই চক্ষু— এই যে স্বয়ং এসেছেন। প্রণাম। প্রভু সেই মালাটি নন্দিনী আমাকে দিয়েছিল।

শেষ :

সর্দার ॥ কিছুতে না।

নন্দিনী ॥ কিছুতে না। দেখব, তোমার সাধ্য কিসের। তার সঙ্গে আমার মিলন হবেই হবেই— আজই হবে। এই তোমাকে বলে দিলুম। (সর্দারের প্রস্থান)

একক-১১

সর্দারের প্রস্থানের পর নন্দিনী রাজার জ্ঞানালয় ঘা দেয়, কিন্তু আচম্কা কিশোরের সঙ্গে তার দেখা হয়। তার কাছেই জানতে পারে বিশুকে বন্দি করে এই পথেই নিয়ে আসছে প্রহরীরা। বিশুকে নিয়ে প্রহরী প্রবেশ করলে, বিশু কিশোর ও নন্দিনীর মধ্যে কথাবার্তা হয়। রঞ্জন এসেছে যক্ষপুরীতে, বিশু তাকে যেমন করে হোক খুঁজে বের করতে বলে কিশোরকে। নন্দিনীর কাছ থেকে রক্তকরবীর গুচ্ছ নিয়ে কিশোর চলে যায়। বন্দি বিশুকে নিয়ে প্রহরীরা এগিয়ে চলে। তাদের যাওয়ার সঙ্গে সকলেরই প্রস্থান ঘটে। এই অংশের শুরু ও শেষ—

শুরু:

নন্দিনী ॥ (জ্ঞানালয় ঘা দিয়ে) শোনো শোনো রাজা! কোথায় তোমার বিচার শালা?
তোমার জ্বালের এই আড়াল ভাঙব আমি। —ও কে ও! কিশোর যে। বল তো আমায়, জানিস কি কোথায় আমাদের বিশু।

শেষ :

বিশু ॥ মাঠের দীলা শেষ হল, খেতের মালিক পাকা ফসল ঘরে নিয়ে চলল। চলো প্রহরী, আর দেরি নয়।

গান

শেষ ফলনের ফসল এবার

কেটে লও, বাঁধো আঁটি—

বাকি যা নয় গো নেবার

মাটিতে হোক তা মাটি।

(সকলেব প্রস্থান)

একক-১২

বন্দি বিশুকে নিয়ে প্রহরীর (সঙ্গে নন্দিনীরও) প্রস্থানের পর চিকিৎসক ও সর্দারের প্রবেশ ঘটে। রাজার অস্বাভাবিক লক্ষণ নিয়ে কথাবার্তায় চিকিৎসক জানায়— এ রোগ বাইরের নয়, মনের। রোগ নির্ণয়ের পরই চিকিৎসকের প্রস্থান ঘটে। এবং তার সঙ্গেই এ-পাড়ার মোড়লের প্রবেশ ঘটে। যক্ষপুত্রীর মানুষ এবং প্রশাসন নিয়ে অনেক কথা মোড়ল সর্দারকে জানায়। মোড়লের প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গেই মেজো সর্দার ঢোকে। কথা ওঠে রঞ্জনের নিয়ে, গোসাঁইকে নিয়ে। কিন্তু নন্দিনী আসছে দেখে সর্দার মেজো সর্দার দুজনেই পালিয়ে যায়। এই এককটির শুরু ও শেষ—

শুরু:

(চিকিৎসক ও সর্দারের প্রবেশ)

চিকিৎসক ॥ দেখলুম। রাজা নিজের পরে নিজে বিরক্ত হয়ে উঠেছেন। এ রোগ বাইরের নয়, মনের।

সর্দার ॥ এর প্রতিকার কী?

শেষ:

মেজো সর্দার ॥ কিন্তু তুমি জানো না যে, তোমার চোখেও কর্তব্যের রঙের সঙ্গে বস্তুরবীৰ্য্য রঙ কিছু যেন মিশেছে— তাতেই রক্তমা এতটা ভয়ংকর হয়ে উঠল।

সর্দার ॥ তা হবে, মনের কথা মন নিজেও জানে না। তুমি চলে এসো আমার সঙ্গে। (উভয়ের প্রস্থান)

একক-১৩

আমাদের বিবেচনায় রক্তকরবীর এই ত্রয়োদশ এককটি থেকে নটকের দ্বন্দ্ব তীব্র গতি পেয়েছে। ছোটো ছোটো একাধিক সংলাপগুচ্ছ নিয়ে এককটি দ্রুত এগিয়ে গেছে। প্রথমে নন্দিনী প্রবেশ করে ও রাজার জানালায় যা দেয়, কিন্তু তখনই গোসাঁই প্রবেশ করে ও নন্দিনীকে নাম দিয়ে ভোলানোর চেষ্টা করে। গোসাঁইয়ের প্রস্থানের পরই প্রথমে ফাগুলাল, চন্দ্রা, পরে গোকুলের প্রবেশ ঘটে। তারা বিশুর বন্দি হওয়ার জন্য নন্দিনীকে দায়ী করে। শেষ পর্যন্ত ফাগুলালের নেতৃত্বে তারা বন্দিশালা ভাঙতে এগিয়ে যায়। রেখে যায় নন্দিনীকে। এমন সময় ধ্বজা-পূজার উৎসবে তল্লাবাহীদের দল আসে। নন্দিনী তাদের কাছে জানতে চায় রঞ্জনের খবর। কিন্তু কোনো দলের লোকই সে খবর দিতে চায় না। তাদেরই একটি দল নন্দিনীকে বলে স্বয়ং রাজাকে জিজ্ঞেস করতে। কেননা ধ্বজা-পূজার লগ্ন আসন্ন। রাজাকে বেরোতেই হবে। এই শেষ দলের প্রস্থানের সঙ্গে এককটি শেষ হয়। শুরু ও শেষ অংশ হল—

শুরু:

(নন্দিনীর প্রবেশ)

নন্দিনী ॥ দেখতে দেখতে সিঁদুরে মেঘে আজকের গোখুলি রাজ্য হয়ে উঠল। ঐ কি আমাদের মিলনের রঙ। আমার সিঁথের সিঁদুর যেন সমস্ত আকাশে ছড়িয়ে গেছে। (জানালায় ঘা দিয়ে) শোনো, শোনো, শোনো। দিনরাত এখানে পড়ে থাকব, যতক্ষণ না শোনো।

শেষ:

নন্দিনী ॥ ওগো, একটু থামো, বলে যাও রঞ্জন কোথায়।

এক ॥ শোনো বলি, লগ্ন হয়ে এসেছে। ধ্বজা পূজার রাজাকে বেরোতেই হবে। তাঁকেই জিজ্ঞাসা করো। আমরা শুরুটা জানি, শেষটা জানি নে। (প্রস্থান)

একক-১৪

ধ্বজাপূজার তল্লাবাহীর দল প্রস্থান করলে নন্দিনী ফের রাজার জানালায় ঘা দেয়। নেপথ্য থেকে এবার রাজা সাড়া দেয়। কথাবার্তার মধ্যেই নন্দিনী যখন রাজার প্রশ্নয়কে 'ঘৃণা করি' বলে তখন ক্রুদ্ধ রাজা ভেঙে ফেলে জালের দরজা। রাজার ঘরের মধ্যে পড়ে থাকতে দেখা যায় মৃত রঞ্জনকে। রাজা বুঝতে পারে সর্দার তাকে ঠকিয়েছে। তারই শক্তি দিয়ে তাকে আঁটে-পৃষ্ঠে বেঁধেছে। তখন রাজা নিজেরই বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করে। তারই ধ্বজাদন্ড ভেঙে ফেলে। এমন সময় ফাগুলাল আসে। রাজাকে দেখে সে ভাবে নন্দিনীর সঙ্গে রাজার কোনো গোপন পরামর্শ চলছে। কিন্তু তার ভুল ভাঙে রাজার কথাতেই। ফাগুলালদের সঙ্গে বন্দিশালা ভাঙতে এগিয়ে যেতে চায় রাজাও। এমন সময় সর্দার তার সৈন্যদল নিয়ে এগিয়ে আসে। সর্দারকে দেখতে পেয়ে নন্দিনী এগিয়ে যায় চূড়ান্ত লড়াইয়ে। নন্দিনীর পিছনে পিছনে এগিয়ে যায় রাজাও। তাদের প্রস্থানের সঙ্গে এই এককের সমাপ্তি হয়। শুরু এবং শেষ—

শুরু:

নন্দিনী ॥ (জানালায় ঘা দিয়ে) সময় হয়েছে দরজা খোলো।

নেপথ্যে ॥ আবার এসেছ অসময়ে! এখনি যাও, যাও তুমি।

শেষ:

নন্দিনী ॥ সর্দার! সর্দার!— দেখো, ওর বর্ষার আগে আমার কুন্দফুলের মালা দুলিয়েছে। ঐ মালাকে আমার বুকের রঙে রক্তকরবীর রঙ করে দিয়ে যাব।—সর্দার! —আমাকে দেখতে পেয়েছে।—জয় রঞ্জনের জয়! (দ্রুত প্রস্থান)

রাজা ॥ নন্দিনী! (প্রস্থান)

একক-১৫

রক্তকরবী নাটকের শেষ অংশ এই একক। নন্দিনী ও রাজার প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গেই প্রবেশ করে অধ্যাপক। রাজা চরম প্রাণের সন্ধান পেয়েছে শুনে সে পুঁথিপত্র ফেলে সঙ্গা নিতে এসেছে। নন্দিনী ও রাজাকে অনুসরণ করে অধ্যাপকও ছুটে যায় তাদের সঙ্গা নিতে।

অধ্যাপকের প্রস্থানের পরেই আসে বিশু। কারিগররা বন্দিশালা ভেঙে ফেলায় সে এসেছে নন্দিনীর খোঁজে। কিন্তু নন্দিনীকে দেখতে না পেলেও বিশু তুলে নেয় খুলোয় লুটোনো রক্তকরবীর কঙ্কণ। সেই শেষ দান নিয়ে চূড়ান্ত লড়াইয়ে এগিয়ে যায় বিশু। অংশটির শুরু এবং শেষ অংশ নিম্নরূপ—

শুরু:

(অধ্যাপকের প্রবেশ)

ফাগুলাল ॥ কোথায় ছুটেছ অধ্যাপক?

অধ্যাপক ॥ কে যে বললে, রাজা এতদিন পরে চরম প্রাণের স্থান পেয়ে বেরিয়েছে—
পৃথিবীতে ফেলে সঙ্গ নিতে এলুম।

শেষ:

বিশু ॥ তাকে বলেছিলুম, তার হাত থেকে কিছু নেব না। এই নিতে হল— তার শেষ দান। (প্রস্থান)

দূরে গান

পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে, আয় বে চলে,

আয় 'য আয়

ধুলার আঁচল ভরেছে আঁধার পাকা ফসলে

মরি হায় হায় হায়।

রক্তকরবী-র প্রচলিত সংস্করণকে এই যে পনেরোটি এককে ভাগ করা হয়েছে, তা একান্তভাবেই আমাদের আলোচনার সুবিধার্থে করা হয়েছে, একথা পুনশ্চ স্বীকার করি। আমাদের এই কল্পিত এককগুচ্ছকে সামনে রেখে রক্তকরবী-র অন্যান্য খসড়াগুলিকে ক্রম-অনুসারে মিলিয়ে বিবর্তনের একটা রেখাচিত্র তুলে ধরবার চেষ্টা করছি।

তিন

রক্তকরবী-র প্রথম খসড়া সম্পর্কে প্রণয়কুমার বলেছেন : অনেকটা 'কবির দীক্ষা' অথবা 'ফাঙ্কুনী'র সূচনার মতো প্রথম খসড়াটি নিছক সংলাপসর্বস্ব, বলা যায় তা 'রক্তকরবী'র মূণ রূপ। আপাতভাবে প্রণয়কুমারের বক্তব্য হয়তো ঠিক। কিন্তু মূণরূপ বলতে যা বোঝায় খসড়াটির অন্তরঙ্গ বিশ্লেষণে তা মনে না হওয়াই স্বাভাবিক। খসড়াটি আগাগোড়াই সংলাপের আদলে লেখা। সংলাপের বক্তা নির্দেশক চরিত্রের নাম নেই। নেই কোনো দৃশ্য-বিন্যাস কিংবা পর্ব-বিভাজন। এমনকী নাট্যকারের দেওয়া মঞ্চসজ্জা বা নাট্যক্রিয়া সংক্রান্ত নির্দেশ পর্যন্ত নেই। অতএব বহিরঙ্গিক নাট্যকাঠামোর কোনো চিহ্নই এখানে নেই। অথচ নিবিড় পাঠে খসড়াটিকে আমাদের মনে হয়েছে ভিন্ন আঙ্গিকের একটি চমৎকার নটক।

রক্তকরবী-র প্রচলিত সংস্করণের একক-নির্ভর যে বিভাজন আমরা পূর্ববর্তী আলোচনায় দেখিয়েছি, তার কতগুলি কীভাবে প্রথম খসড়ায় বিন্যস্ত ছিল, তা দেখলেই খসড়াটির কাহিনি সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা করা সম্ভব। লক্ষ করলে দেখা যাবে পূর্বোন্মোখিত ১, ২, ৩, ৪, ৮ এবং ১৫ সংখ্যক একক প্রথম খসড়ায় ছিল না। বাকি ৫, ৬, ৭, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪—

এই এককগুলি ক্রম-অনুসারে পর পর ছিল। অবশ্য প্রচলিত সংস্করণের পাঠেরসঙ্গে এককগুলির পাঠ-পার্থক্য ছিল প্রচুর। কোনো কোনো এককের বড়ো অংশই প্রথম খসড়ায় অনুপস্থিত ছিল। কতখানি ছিল সেই পার্থক্য? সেখানে কাহিনির বা চরিত্রের গতিমুখই বা কীরকম ছিল?

প্রথম খসড়ার পাঠে কাহিনির বড়ো অংশ না থাকায়, যে এককগুলি ছিল সেগুলির উপরেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল বেশি। তাই বেশ কিছু অংশ যেগুলি প্রথম খসড়ায় ছিল, পরবর্তী খসড়াগুলিতে তা বর্জিত হয়েছে। এই বর্জিত পাঠগুলি লক্ষ করলে দেখা যাবে রক্তকরবী-র কাহিনিতে প্রাথমিকভাবে যক্ষপূরীকেন্দ্রিক ভাবনাই প্রাধান্য পেয়েছিল। যেমন চন্দ্রা-ফাগুলালদের কথোপকথনে উঠে আসা রাজার চশমা নিয়ে এই কথোপকথন—

ফাগুলাল ॥ আমাদের মকররাজকে দেখেছ তো?

চন্দ্রা ॥ দেখে কি? মুখের মধ্যে এক জোড়া চষমার কাঁচ ছাড়া আব তো কিছুই দেখা যায় না।

ফাগুলাল ॥ সেই চষমার কাঁচের কথাই বলছি। সেই কাঁচ দিনেও দেখে, রাত্রেও দেখে, মাটিব নীচে অশ্বকারে কাজ করি তাও দেখতে পায়, বেরিয়ে এসে উপরে উঠে মাংলামি করে বেড়াই সেও চষমায় ধরা পড়ে। যেখানে মানুষের চোখ চলে না এমন দেশ আছে, যেখানে ওব চষমা চলে না এমন দেশ পাব কোথায়? দাও, দাও, মদ দাও।

চন্দ্রা ফাগুলালের সংলাপে এই চশমার বিষয়টি পঞ্চম খসড়া পর্যন্ত ছিল। একই প্রসঙ্গ নিয়ে অধ্যাপক পুরাণ-বাগীশকেও কথা বলতে শুনি যা ষষ্ঠ খসড়ায় বর্জিত হয়েছিল—

অধ্যাপক ॥ মকরের মত ওর চোখের পর্দা নেই, একটা চষমা আছে। শূনেছি, যখন ঘুমিয়ে থাকে তখনও খোলে না।

পুরাণবাগীশ ॥ তার কারণ?

অধ্যাপক ॥ ওর চষমায় যে ছায়া পড়ে তার দাগ থাকে। ঘুমের সময় কি দেখা গিয়েছিল জেগে উঠে তা জানতে পায়। চোখ ভুল দেখতে পারে বলে শূনেছি নিজের চোখ প্রায় বুজেই রাখে, চষমার উপরেই দেখার ভার।

রাজার চশমা নিয়ে এই কথোপকথন পরবর্তীক্ষেত্রে বর্জিত হয়েছে। এর কারণ সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছিল বিষয়টি বাহুল্য হয়ে পড়ছে। লক্ষণীয় এখানে রাজার চশমা কোনো বস্তু নয়, তা আসলে প্রতীক। ওটি প্রকৃতপক্ষে রাজার স্পাই বা চরকেই বুঝিয়েছে, যা যক্ষপূরীর সমস্ত মানুষের পিছনে পিছনে ছায়ার মতো ঘোরে। এর চর-এর কথাই পরে অধ্যাপক-পুরাণবাগীশ ও বিশুর মুখে বার কয়েক এসেছে। চশমা বনাম স্পাই-এর কনট্রাস্ট রবীন্দ্রনাথ স্পাই বা চরবৃত্তির ব্যাপারটাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। তাছাড়া চশমার কথা প্রথম খসড়ায় খানিকটা স্থূলভাবেই এসেছিল, যেন চরের প্রতীকী ভাবনার দ্ব্যর্থকতার চেয়ে বস্তুগত স্থূল পরিচয়টাই বড়ো হয়ে উঠেছিল।

যক্ষপূরীর নিয়মকানুন নিয়ে বেশ কিছু সংলাপ প্রথম কয়েকটি খসড়ায় ছিল যা পরবর্তী সময়ে রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছিল বাহুল্য মাত্র। অনেকক্ষেত্রে প্রসঙ্গগুলি নাট্যকাহিনিতে শিথিলতা আনতে পারতো। যেমন চন্দ্রা সর্দারের সংলাপে এসেছে যক্ষপূরীর খোদাইকরদের মাঝে মধ্যে বাড়ি যাওয়ার জন্য ছুটির কথা—

চন্দ্রা ॥ সর্দারদাদা, মাঝে মাঝে এদের সবাইকে ঘরের হাওয়া খাইয়ে আন তাহলে সব নষ্টামি সহজে সারবে। গোসাইয়ের উপদেশ উঠো হবো।

সর্দার ॥ পাকা কথা বলেচ। মেয়ে মানুষ তোমাদের সহজ বুদ্ধিতে সব সমস্যা সহজ হয়ে আসে। তোমাব কথা শুনে মনে পড়চে, 'ঐ' যে রঘুনাতের ব্যামো হল, তাকে যতই বৈদ্যের বাড়ি খাওয়ালুম তার রোগ বেড়ে উঠতে লাগল; তার দ্বারা আমাদের আর কোন কাজ হবে না হিসেব করে তাকে বাড়ি পাঠিয়ে দিলুম— এখন শবর পাচ্ছি সে সম্পূর্ণ সেরে উঠেচে। গোসাইয়ের উপদেশও সেই বৈদ্যের বাড়ি।....

এই সংলাপগুচ্ছটি বর্জিত হয়েছে দ্বিতীয় খসড়াতেই। রাজার হুকুম নিয়ে যক্ষপুরী থেকে বেরিয়ে চলে যাওয়াও চলত। এমনই সংলাপ স্থান পেয়েছিল সপ্তম খসড়া পর্যন্ত—

খঞ্জনী ॥ কিন্তু আব কত দেরি করবে?

সর্দার ॥ দেরি করব না। কিন্তু আমি বলি কি তুমি আমাদের রাজার হুকুম নিয়ে যেখানে খুসি বেরিয়ে চলে যাও না।

অবশ্য এখানে আর একটি ব্যাপার লক্ষণীয়, যক্ষপুরীর খোদাইকরদের বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়ার হুকুম একবার সর্দার, একবার রাজা দিয়েছে। প্রথম কথোপকথনে সর্দার নিজেই বলেছে 'হিসেব করে তাকে বাড়ি পাঠিয়ে দিলুম'। অর্থাৎ সর্দার নিজেই সে ক্ষমতার অধিকারী। পরে একই হুকুম করছে রাজা যা সর্দারের শেষোক্ত সংলাপে পাচ্ছি। এ দুয়ের বন্দ্ব থেকেই হয়তো প্রথম সংলাপগুচ্ছটি দ্বিতীয় খসড়ায় বর্জিত হয়েছে এবং 'রাজার হুকুম' ব্যাপারটাকেই রাখা হয়েছে। পরে নাটকটিতে যেভাবে সর্দারতন্ত্র প্রাধান্য পেয়েছে এবং রাজা হয়ে পড়েছে সর্দারের হাতের পুতুল, তাতে, রাজার হুকুম আদৌ প্রয়োজন ছিল কিনা— তাতেই প্রশ্ন উঠতে পারে। তাছাড়া ততক্ষণে এটাও প্রায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে যে, যক্ষপুরে ঢোকা সহজ, বেরোনো যায় না। হয়তো এই ভাবনা থেকেও রবীন্দ্রনাথ ওই সংলাপ দুটি বর্জন করেছেন।

অধ্যাপক এবং পুরাণবাগীশের সংলাপ প্রথম দুটি খসড়ায় অত্যন্ত গুরুত্ব পেয়েছিল। তাই প্রচলিত সংস্করণে অধ্যাপক পুরাণবাগীশের সংলাপসংখ্যা যেখানে আছে মাত্র কুড়ি (সর্দারের প্রবেশের আগে পর্যন্ত), সেখানে প্রথম খসড়ায় এই সংলাপসংখ্যা ছিল সত্তর। অর্থাৎ সাড়ে তিন গুণ। প্রচুর পরিমাণ সংলাপ রবীন্দ্রনাথ বর্জন করেছেন ধাপে ধাপে। বর্জিত কয়েকটি সংলাপ তুলে ধরলেই বোঝা যাবে এই দুজনের সংলাপের মধ্যেও রাজার আলোচনাই প্রাধান্য পেয়েছিল।

অধ্যাপক ॥ এ জায়গাটা সন্দেহের শনিগ্রহ বললেই হয়। আমরাও দিন-রাত্রি সন্দেহে কবছি ওরাও তাই। শ্রদ্ধার চোখে ভুল দেখবার আশঙ্কা আছে, সন্দেহের চোখে দেখাই সত্য দেখার উপায় এখানকার এই বিশ্বাস।

পুরাণবাগীশ ॥ তাহলে এখন থেকে আমাকে এরা সন্দেহের চোখে যাচাই করবে?

অধ্যাপক ॥ প্রতি মুহূর্তেই হরিনামের কুলি নিয়ে বেড়াও, কুলিটার ভিতরে সন্দেহ সৈথিয়ে কিল্কিল্ করতে থাকবে। মাথা হেঁট করে ওদের পায়ে হাত দিতে যাও,

সন্দেহ হাঁক করে' উঠে বলবে, জুতোচুরির মংলব! ওরা চরের উপর দৃষ্টি রাখাব'জ্ঞান্যে চব লাগায়। ওরা নিজে মিথ্যে বলে তোমাকে ভোলাতে, তুমি যা বল— তা বিশ্বাস করে না।

সংলাপগুচ্ছটি বর্জিত হয়েছে তৃতীয় খসড়ায়। রাজা সম্পর্কেও বেশ কিছু কথা ছিল, যা চরিত্রটির বিকাশে তো বটেই কাহিনির ক্ষেত্রেও ক্ষতিকর হতে পারত। যেমন মকরের সভার কথা বিশুর সংলাপে উঠে এসেছে, যা প্রথম দুটি খসড়ায় ছিল। সেই মকরের সভায় সর্দারদের সঙ্গে যক্ষপুরীর শাসন-ব্যবস্থা নিয়ে রাজা স্বয়ং শলাপরামর্শ করতেন। এছাড়া এসেছে রাজার গোপন পরীক্ষাশালার কথা যা দ্বিতীয় খসড়া পর্যন্ত ছিল।

প্রথম খসড়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল রাজা-পুরাণবাগীশ কথোপকথন। খুব সংক্ষিপ্তভাবে এলেও রাজা কথা বলেছে পুরাণবাগীশের সঙ্গে। মূলত রাজার মধ্যে যে প্রবল মানসিক দ্বন্দ্ব চলছে এবং সেই দ্বন্দ্ব সে ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছে, তা বোঝানোর জন্যই ছিল এই সংলাপগুচ্ছের আয়োজন। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে রাজা চরিত্রটিকে একটু অন্যভাবে গড়ে তোলা হয়েছে। প্রথমত, তার সঙ্গে কোনো চরিত্রেরই প্রত্যক্ষ আলাপ-আলোচনা দেখানো হয়নি, এক নন্দিনী ছাড়া। দ্বিতীয়ত, রাজাকে আঁকা হয়েছে ভয়ংকররকম নিঃসঙ্গ করে, নির্জন করে। পৃথিবীর সমস্ত খুশি থেকে দূরে থাকতে চায়, গান শুনতেও তার ভয়। সুতরাং এরকম একটি চরিত্র 'নূতন'-এর সন্ধান চাইছে, এটা বোধহয় অসামঞ্জস্যময় হত। তাই তা বর্জিত হয়েছে। বর্জিত সংলাপের অংশ-বিশেষ দেখলেই একধার সত্যতা বোঝা যাবে।

পুরাণবাগীশ ॥ আমাব কাছ থেকে মহারাজ কি চান বলুন।

নেপথ্যে ॥ আমি খুঁজছি যে-পরশমণিতে পুরাতন নিয়তই নতুন হয়ে উঠচে। তুমি তার রহস্য জান?

পুরাণবাগীশ ॥ আমাদের পুঁথিতে তার কথা লেখে না।

নেপথ্যে ॥ বস্তুবাগীশ, তুমি এইসব শুকনো পণ্ডিতকে আমার কাছে কেন নিয়ে আস? জাননা, আমি নবীনকে চাই। এরা যে বিদ্যার মধ্যেও জরা প্রবেশ করিয়ে দিলে। নিয়ে যাও, নিয়ে যাও একে।

প্রথম খসড়ায় রাজা চরিত্রটিও ছিল সংক্ষিপ্ত, চরিত্রটিকে সেখানে প্রত্যক্ষভাবে ততখানি না ফুটিয়ে অন্যান্য চরিত্রের বর্ণনাতাই তুলে ধরবার প্রবণতা ছিল। আমাদের দেখানো প্রচলিত সংস্করণের যে পনেরটি একক, তার মধ্যে সপ্তম এবং চৌদ্দতম একক দুটি পরবর্তী খসড়াগুলিতে পরিবর্তিত হয়েছে বেশি। সপ্তম এককটিতে, প্রচলিত সংস্করণে যেখানে রাজার বত্রিশটি সংলাপ আছে, সেখানে প্রথম খসড়ায় এই সংলাপ সংখ্যা ছিল মাত্র বারোটি। আর একক চৌদ্দতে এই অনুপাত ছিল যথাক্রমে তেইশ ও একত্রিশ। এই সংযোজন-বর্জন ব্যাপারটি লক্ষ করলে দেখা যাবে, রাজার সম্পর্কে অন্যান্য চরিত্রের সংলাপে যে বর্ণনা অংশগুলি ছিল, সেগুলি বেশির ভাগ বর্জিত হয়েছে। অন্যদিকে রাজার প্রত্যক্ষ সংলাপ সংখ্যা বেড়েছে যথেষ্ট। পরিবর্তনগুলি ব্যাখ্যাযোগ্য।

রক্তকরবীর দ্বিতীয় খসড়ার সূচনাই হয়েছে রাজা-নন্দিনীর সংলাপে। প্রচলিত সংস্করণে যেটিকে আমরা চতুর্থ একক ধরেছি, দ্বিতীয় খসড়ার সূচনায় ছিল সেই সংলাপগুচ্ছ। অবশ্যই দ্বিতীয় খসড়ার 'ওই সংলাপগুচ্ছের সঙ্গে প্রচলিত সংস্করণের পাঠের বিরাট পার্থক্য আছে।

দ্বিতীয় খসড়ায় একটি গুরুত্বপূর্ণ নাট্যাংশ ছিল রাজা সর্দার কথোপকথন যা-খসড়ায় বর্জিত হয়েছে। রাজা স্বয়ং কথা বলেছেন পুরাণবাণীশ বা অধ্যাপকের সঙ্গে কিংবা শলা পরামর্শ করছেন সর্দারের সঙ্গে, রাজা চরিত্রটির পক্ষে এটা সম্ভবও ক্ষতিকারক হতে পারত। ব্যক্তিত্ব, গাভীর্য ও রহস্যময়তার যে মূর্তিটি কবি নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন, তাতে প্রবল আঘাত আসত ওই ধরনের সংলাপগুচ্ছে। রাজা ও সর্দারের সেই সংলাপগুচ্ছটি তুলে ধরলেই এ কথার সত্যতা বোঝা যাবে।

সর্দার ॥ মহারাজা।

নেপথ্যে ॥ কি?

সর্দার ॥ আজ আমাদের ধ্বজাপূজায় রাজাকে সহস্ত্রে চণ্ডীর কাছে ধ্বজা উৎসর্গ করতে হয়। তার সময় হবে এল।

নেপথ্যে ॥ তোমরা একজন কেউ আমার প্রতিনিধি হয়ে কাজ সমাধা কর গে।

সর্দার ॥ সে কি মহারাজ। বিশেষ কোনো কাজে নিযুক্ত আছেন?

নেপথ্যে ॥ না, না, দিনের পর দিন কেবলি কি কাজেই নিযুক্ত থাকতে হবে; এখন আমি অবকাশে নিযুক্ত থাকব।

সর্দার ॥ মহারাজকে এ-কথা বলা বাহুল্য যে, যক্ষপুরীর কাজে ঠাসবুনানী— অল্পমাত্র অবকাশেই ফাঁক পড়ে যায়।

নেপথ্যে ॥ সর্দার, এখানে আমরা কাজ নষ্ট করতেই ভয় করি, অবকাশ নষ্ট করতে কেন ভয় করি নে। দুটোর মধ্যে কোনটা বড় লোকসান সে সম্বন্ধে কিছুদিন থেকে আমার মনে সন্দেহ এসেচে।

সর্দার ॥ যক্ষপুরীর পক্ষে এটা ভালো খবর নয়।

নেপথ্যে ॥ তর্ক পরে হবে, এখন একটু একলা থাকতে দাও যক্ষপুরীর ভালো যে কার ভালো সে কথা স্পষ্ট বুঝতে পারচিনে। রঞ্জনকে এখানে আনতে বলেছিলুম, মনোযোগ করেচ?

সর্দার ॥ এখানে কি তার প্রয়োজন আছে?

নেপথ্যে ॥ এখানকার প্রয়োজনের কথা জানি নে, আমার প্রয়োজন আছে।

সর্দার ॥ হয়ত তাকে আনা হয়েছে আমি খবর নিতে চল্লুম। (প্রস্থান)

উপরের সংলাপগুচ্ছ থেকে কয়েকটি দিক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। প্রথমত, সর্দারের সংলাপে চণ্ডীর ধ্বজাপূজার কথা। এই সংলাপ বর্জিত হলেও চণ্ডীর প্রসঙ্গ কিন্তু নাটকে থেকেই গেছে। তবে সেই ‘চণ্ডী’ আর শুধু ‘চণ্ডী’ নন, ‘মারগচণ্ডী’ হয়ে উঠেছেন। আর মারগচণ্ডীর ব্রত এবং ধ্বজাপূজা দুটো ভিন্ন দিনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই পরিবর্তন ঘটনা-পরিকল্পনার সঙ্গে সংগতি রেখেই করা হয়েছে।

দ্বিতীয় কথা, রাজা স্বয়ং অবকাশে নিযুক্ত থাকতে চাইছে— এটা চরিত্রটির বর্তমান কনসেপ্টকেই ভেঙে ফেলতে পারত। তৃতীয় কথা, রাজা স্বয়ং রঞ্জনকে যক্ষপুরীতে নিয়ে আসবে হুকুম করছে— এটিও নাটকের ঘটনা পরিকল্পনা ও পরিণতির সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ হয়ে উঠত।

কাহিনিসূত্রে এরকম আরো একটি কথোপকথন শুধু দ্বিতীয় খসড়াতেই এসেছিল। সেটি

সর্দার এবং মেজোসর্দারের কথোপকথন। সেখানে যক্ষপুরীর প্রশাসন এবং রাজার মানসিক দ্বন্দ্ব নিয়ে কথা বলেছে ওই চরিত্রদ্বয়। দ্বিতীয় খসড়াতে সংযোজিত অংশটি ছিল এরকম—

- সর্দার ॥ মেজোসর্দার, তোমাকে একটা কথা বলে রাখি, কিছুকাল থেকে রাজার মধ্যেও একটা দ্বিধা প্রবল হয়ে উঠেছে। রক্তের মধ্যে কার যে কি লুকিয়ে থাকে, আব হঠাৎ কখন যে তা প্রকাশ হয়ে পড়ে তার কিছুই হিসেব পাওয়া যায় না।
- মেজোসর্দার ॥ কিন্তু এবারকার পূজোয় তো রাজা অন্য বছরের চেয়ে বেশি বলির বরাদ্দ করে দিয়েছেন শুনলুম।
- সর্দার ॥ সেটাও ভাল লক্ষণ নয়, নিজের সঙ্গে লড়াই চলছে। শেষ কয়দিন মাঝে মাঝে প্রচণ্ড হয়ে উঠেছেন— আমাদেরই কাছে যেতে ভয় হয়। এত বাড়াবাড়ি করছেন যে, খুব একটা ক্লান্তি আসবার সময় আসছে।
- মেজোসর্দার ॥ এ সব মানুষের ক্লান্তি তাদের শক্তির চেয়ে ভয়ঙ্কর— সতর্ক হতে হবে।
- সর্দার ॥ বুঝতে পারছি একটা সঙ্কটের সময় আসছে। মানুষ যখন দুর্বল হয়ে পড়ে তখন ভালোমন্দ নিয়ে তার বিচার বুদ্ধি জাগে। রাজার মগজে তাবি একটু আমেজ দেখা যাচ্ছে, যদিও সেটা স্পষ্ট স্বীকার করতে তাঁর খুব লজ্জা হয়। কিন্তু আমি বিপ্লবের গন্ধ পাইছি।

বলা বাহুল্য নাটকের প্রথমাংশে সর্দার-রাজা কথোপকথনের সঙ্গে এবং রাজা চরিত্রটির পরিকল্পনার সঙ্গে সংগতি রেখেই এই সংলাপগুলি সংযোজিত হয়েছিল। পরে সে পরিকল্পনা পরিবর্তিত হওয়ায় সংলাপগুলিও বর্জিত হয়েছে।

এই দ্বিতীয় খসড়াতেই— নাটকে প্রথম পর্বভাগ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। মোট ছটি পর্ব এই খসড়ায় দেখা গেছে। প্রচলিত সংস্করণের পূর্ব-উল্লিখিত একক অনুযায়ী ছটি পর্ব ছিল এরকম—

- পর্ব. ১ = একক. ৪
 পর্ব. ২ = একক. ৫
 পর্ব. ৩ = একক. ৬, ৭
 পর্ব. ৪ = একক. ৯, ১০, ১১
 পর্ব. ৫ = একক. ১২
 পর্ব. ৬ = একক. ১৩, ১৪

আরো বিশেষভাবে লক্ষ করার বিষয় হল, একমাত্র এই খসড়ার শুরুতেই রবীন্দ্রনাথ নাটকটির বিষয় ও ভাবগত তাৎপর্য সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করে একটি ‘নাট্যপরিচয়’ লিখেছেন। অর্থাৎ নাটকটি সম্পর্কে একটি পরিপূর্ণতার ভাব যেন প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল। প্রথম খসড়ার শিথিলতাকে নিটোল কাঠামোয় দৃঢ়সংবদ্ধ করে অভিনয়ের উপযোগী করে তোলা হয়েছে। পৌষের গানের উল্লেখ প্রথম খসড়ায় ছিল ঠিকই, কিন্তু সে গানের প্রয়োগ দ্বিতীয় খসড়াতেই প্রথম হয়েছে। নায়িকার নামও ‘খঞ্জনী’, খঞ্জনী থেকে ‘সুনন্দা’ (মাত্র দুবারের জন্য, প্রথমবার ‘নাট্যপরিচয়’-এ নায়িকা নামে, অন্যবার নাটকের প্রথম সংলাপ-নির্দেশক চরিত্র নামে) এবং সবশেষে ‘নন্দিনী’তে পৌঁছেছে। আর এই খসড়াতেই রক্তকরবী ফুলাটির প্রসঙ্গ প্রত্যক্ষভাবে দুবার উল্লেখিত হয়েছে। সব মিলিয়ে দ্বিতীয় খসড়াতেই রক্তকরবী-র আপাত-পরিপূর্ণতা অনুভব করা যায়।

চার

তৃতীয় খসড়া থেকে রবীন্দ্রনাথ নাটকটিকে নিয়ে নতুন করে ভাঙা-গড়ার কাজ শুরু করেছেন। একপাশে জমা করে রেখেছেন প্রয়োজনীয় উপকরণ, প্রয়োজনমতো মূর্তিতে মাটি দিয়েছেন। অন্যপাশে রেখেছেন ছেনি আর বাটালি। যেখানেই বাহুল্য টের পেয়েছেন, ছেনিকে কাজে লাগিয়েছেন। এই গড়নের কাজ চলেছে সেই চূড়ান্ত মুহূর্ত পর্যন্ত যতক্ষণ না নাটকটি প্রকাশিত হচ্ছে।

তৃতীয় খসড়ার শুরুতেই এসেছে অধ্যাপক-নন্দিনীর সংলাপগুচ্ছ, যেটিকে আমরা প্রচলিত সংস্করণে দ্বিতীয় একক হিসেবে রেখেছি। এই খসড়ার নতুন দৃশ্যের/সংলাপে সংযোজন বলতে এটাই। রাজার মানসিক দ্বন্দ্ব-বিক্ষোভ ও বন্দিদের কথা, যা এর ঠিক পরের এককটিতে ফুটে উঠেছে, সেই কথায় যাওয়ার আগে অধ্যাপক-নন্দিনীর সংলাপগুচ্ছ নাটকের মূল সমস্যা সম্পর্কে আমাদের সচেতন করে দেয়। আমরা জানতে পারি যক্ষপুরীর খণ্ডিত, সংখ্যাসর্বস্ব মানুষদের কথা। যক্ষপুরীর মরা ধনের মাঝখানে প্রাণের ধন রঞ্জনকে নন্দিনী কেন জানতে চায় তার সম্ভাব্য ইঙ্গিতও জানতে পারি। অর্থাৎ তৃতীয় খসড়াতেই রবীন্দ্রনাথ নাট্যকাহিনিকে এই পর্বে ভালো করে গুছিয়ে নিয়েছেন। পূর্ববর্তী খসড়ায় মোট ছটি পর্ব ছিল। এই খসড়ায় রবীন্দ্রনাথ একটি পর্ব কম-করেছেন। কমিয়েছেন, কিন্তু কোনো পর্ব বর্জন করে নয়। পঞ্চম এবং ষষ্ঠ পর্ব দুটিকে একত্র করে সেটিকে পঞ্চম পর্ব হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

দ্বিতীয় খসড়ায় পঞ্চম পর্বটিতে সর্দারদের প্রশাসনিক কাঠামো ও তৎসংক্রান্ত আলোচনাই মুখ্য ছিল। আর ষষ্ঠ তথা শেষ পর্বটিতে নন্দিনীর আকুলতা মেজাজে স্বতন্ত্র ছিল। কিন্তু এই স্বতন্ত্রতা কাহিনির মূল ভাবগত দ্বন্দ্বকে বিপর্যস্ত করে নি। কেননা এই দুই পর্বে নাট্যদ্বন্দ্ব, এতটাই-তীব্র এবং পরিণামমুখী যে সর্দারের পরিকল্পনা ও নন্দিনীর আকুল উৎকণ্ঠা মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে। এই অবস্থায় নাট্যদ্বন্দ্বের ওই তীব্র গতি বরং পর্ব বিভাজনের ফলে ধাক্কা খেতে পারত। অন্যভাবে বললে ওই তীব্র গতির জন্যই পর্বভাগ অর্থহীন হয়ে পড়ত। তাই রবীন্দ্রনাথ দুই পর্বকে একত্রে মিশিয়ে দিয়েছেন। পঞ্চম খসড়া পর্যন্ত এই পর্ববিভাজন বজায় থাকলেও, পরবর্তী ক্ষেত্রে পর্ববিভাজন ব্যাপারটাই বর্জিত হয়েছে।^১ অবশ্য ততক্ষণে নাটকটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এক নিটোল সামঞ্জস্যময়তার কাছাকাছি পৌঁছে গেছে।

অধ্যাপক-নন্দিনীর যে সংলাপ তৃতীয় খসড়ার শুরুতেই সংযোজিত হয়েছে, সেটিকে আমরা এক হিসেবে প্রচলিত সংস্করণের খসড়া-মাত্র বলতে পারি। কেননা পরবর্তী খসড়াগুলিতে ওই সংলাপগুচ্ছ ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। তৃতীয় খসড়ায় যেখানে অধ্যাপক-নন্দিনীর ওই এককটির সংলাপ সংখ্যা ছিল মাত্র ২১ সেখানে প্রচলিত সংস্করণে ওই এককের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৪৪। যক্ষপুরীর শাসনব্যবস্থা কেন্দ্রিক কথোপকথন ক্রমে গতিমুখ পরিবর্তন করেছে। পরবর্তী সময়ে সংযোজিত হয়েছে, এরকম দু-একটি উদাহরণ তুলে ধরলেই ব্যাপারটি স্পষ্ট হবে।

নন্দিনীকে দেখে বিচলিত অধ্যাপক-নন্দিনীর সঙ্গ পেতে চায়। তার এই মনোভাবটি বিভিন্ন খসড়ায় ক্রমশঃ পরিস্ফুট হয়েছে—

১. তুমি অমন চমক লাগিয়ে দিয়ে চলে যাও কেন? যখন মনটাকে নাড়া দিয়ে যাও তখন না হয় একটু সাড়া দিয়েই বা গেলে। একটু দাঁড়াও, দুটো কথা বলি।

(সপ্তম খসড়ায় সংযোজিত)

২. আমরা নিরেট সময়ের গর্ভে পতঙ্গের মত; তুমি ফাঁকা সময়ের আকাশে সন্ধ্যাতারাটি, তোমাকে দেখে আমাদের ডানা চঞ্চল হয়ে ওঠে।

(চতুর্থ খসড়ায় সংযোজিত)

৩. জ্ঞান, নন্দিনী, আমারও একটা জ্বালের জ্বালা আছে, তার ভিতর দিয়ে ছাঁকা পড়ে গেছি। সে আমার পাণ্ডিত্যের জাল। আমাতেও মানুষের অনেকটা বাদ দিয়ে কেবল পণ্ডিতটি বাকি রয়েছে। তাই আমাদের রাজা যেমনি ভয়ঙ্কর রাজা, আমিও তেমনি ভয়ংকর পণ্ডিত।

(পঞ্চম খসড়ায় সংযোজিত)

৪. তুমি যে নিজের শক্তিতে আমাকে জ্বালের বাইবে টেনে আন, তোমার চোখের সামনে আমার ভাষা মানুষ ছোড়া লাগে। বেশ বুঝতে পারছি একদিন তুমি আমাদের রাজাকেও জ্বালের বাইরে টেনে নিয়ে আসবে। যে ছিল রাজা সে হঠাৎ মানুষ হয়ে উঠবে।

(পঞ্চম খসড়ায় সংযোজিত)

তৃতীয় খসড়ায় অধ্যাপকের ব্যক্তিসংকটের একটা ভিত্তি হয়েছিল, উপরোক্ত সংলাপগুলি সংযোজনে অধ্যাপকের চরিত্রে আরও গভীরতর পরিবর্তন সূচিত হলো। নন্দিনীর প্ররোচনাতেই তার নিশ্চিত বস্তুত্বের জগতে বোড়ো হাওয়া প্রবেশ করে। ছিড়ে যায় তার পাণ্ডিত্যের জাল।

বোঝা যাচ্ছে, শুধু কাহিনির কন্যাস কিংবা ঘটনা ও দ্বন্দ্বের তীব্র দ্বন্দ্বকেই রবীন্দ্রনাথ তীক্ষ্ণ করে তুলছেন না, খুব যত্ন করে ফুটিয়ে তুলছেন চরিত্রগুলিকেও। এই তৃতীয় খসড়াতেই নন্দিনী-রাজার সংলাপে, উল্লিখিত সপ্তম এককে এক বড়ো-সড়ো সংযোজন ঘটান।

মোটামুটি এখান থেকেই রক্তকরবীর রাজা, সবথেকে দ্বন্দ্ব-বিস্কুদ্ধময়, সব থেকে বেশি আকর্ষণীয় চরিত্র হয়ে উঠছে। প্রথমে নিঃসঙ্গ, ক্ষুদ্র, অস্থিরচিত্ত, তারপর ঈর্ষা এবং অসহিষ্ণুতার মধ্য দিয়ে তীব্র তীক্ষ্ণ, শরীরিকভাবেও আগ্রাসী হয়ে ওঠা এবং তারই প্রতিক্রিয়ায় প্রগাঢ় ক্রান্তির বোধ ও মৃত্যুর অবসাদ।

তৃতীয় খসড়াতে শুধু রাজা চরিত্রটিকে নয়, রক্তকরবীর মূল দ্বন্দ্বটিকেও ধরতে পেরেছেন তিনি। পরবর্তী খসড়াগুলিতে ধাপে ধাপে শিল্পের সোপান বেয়ে ক্রমশ চূড়ান্ত শিল্পরূপের দিকে পৌঁছেছেন তিনি।

পাঁচ

চতুর্থ এবং পঞ্চম খসড়ার নাম রবীন্দ্রনাথ রেখেছেন—‘নন্দিনী’। আমরা জানি যে প্রথম তিনটি খসড়ার কোনো নামকরণ তিনি করেননি। অষ্টম খসড়া থেকে নাটকটির স্থায়ী নাম রেখেছেন— রক্তকরবী। কিন্তু বিচ্ছিন্নভাবে চতুর্থ ও পঞ্চম খসড়ার নামকরণের মধ্য দিয়ে কী ঈজিগত আভাসিত হয়েছে? প্রণয়কুমার এ প্রসঙ্গে বলেছেন— “....চতুর্থ এবং পঞ্চম

খসড়াটির নাম দেওয়া হয়েছে ‘নন্দিনী’।.... অর্থাৎ কবির দৃষ্টি পড়েছে নন্দিনী চরিত্রের উপর। ফলে, নন্দিনী চরিত্রটি উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে, সমগ্র নাটকের মধ্যে চরিত্রটির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। চতুর্থ থেকে সপ্তম খসড়া পর্যন্ত, শব্দগত পাঠান্তর ছাড়া অন্য কোনো পরিবর্তন চোখে পড়ে না। এই অর্থে এই স্তরটিকে ‘নন্দিনী’র স্তর বলা যেতে পারে।”

কিন্তু সত্যিই কি চতুর্থ থেকে সপ্তম— এই চারটি খসড়া শুধুই শব্দগত পাঠান্তরের? আর চতুর্থ ও পঞ্চম খসড়া দুটিতে কবির লক্ষ্য শুধু কি নন্দিনী চরিত্রের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করাতেই আবদ্ধ ছিল? এই দুই খসড়ার বিবর্তনের আলোচনায় যাওয়ার আগে আমরা এক বলক দেখে নিই, নন্দিনীর উপস্থিতি তথা অন্যান্য চরিত্রের সঙ্গে তার সংলাপগুচ্ছগুলি কখন কোন্ খসড়ায় সংযোজিত হয়েছে।

প্রচলিত সংস্করণ	যে খসড়ায় সংযোজিত হয়েছে
ক) কিশোর-নন্দিনী	দশম খসড়া
খ) নন্দিনী-অধ্যাপক	তৃতীয় খসড়া
গ) নন্দিনী-গোকুল	দশম খসড়া
ঘ) নন্দিনী-রাজা প্রথম সংলাপগুচ্ছ	দ্বিতীয় খসড়া
ঙ) নন্দিনী-বিশু-সর্দার	প্রথম খসড়া
চ) নন্দিনী রাজা দ্বিতীয় সংলাপগুচ্ছ	প্রথম খসড়া
ছ) অধ্যাপক-নন্দিনী-সর্দার-গোসাই	প্রথম খসড়া
জ) নন্দিনী-বিশু	প্রথম খসড়া
ঝ) নন্দিনী-গোসাই	প্রথম খসড়া
এ৩) নন্দিনী-ফাগুলাল-চন্দ্রা (গোকুলের তৃতীয় প্রবেশ)	প্রথম খসড়া (পঞ্চম খসড়া)
ট) নন্দিনী ও ধ্বজাপুজার তল্লাবাহীদল	প্রথম খসড়া
ঠ) নন্দিনী-রাজা-ফাগুলাল-চন্দ্রা (শেষ সাক্ষাত)	প্রথম খসড়া

উপরের তালিকাটি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে নন্দিনী নিয়ে স্বতন্ত্র কোনো সংলাপগুচ্ছ চতুর্থ বা পঞ্চম খসড়ায় সংযোজিত হয়নি। বরং নন্দিনীকেন্দ্রিক যে অংশগুলি পরে সংযোজিত হয়েছে, সেগুলিও দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং একেবারে শেষ দশম খসড়ায় সংযোজিত হয়েছে। বলা চলে প্রথম খসড়ায় যে যক্ষপুরীকেন্দ্রিক ভাবনা প্রাধান্য পেয়েছিল, দ্বিতীয় খসড়া থেকে তা একটু একটু করে অপসারিত হয় এবং প্রাধান্য পেতে শুরু করে নন্দিনী। নায়িকার নামকরণে স্থিত হওয়ার মধ্যেও এই প্রবণতার পরিচয় মেলে। দ্বিতীয় খসড়ায় রাজা-নন্দিনীর সংলাপগুচ্ছের সংযোজনেও নন্দিনীর প্রভাবকে স্বতন্ত্রভাবে গুরুত্ব দেওয়ার চেষ্টা ছিল। তৃতীয় খসড়াতেই নাটকের কেন্দ্রে নন্দিনীর প্রাধান্য অবিসংবাদিতভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অধ্যাপক-নন্দিনীর সংলাপগুচ্ছ সংযোজনে কিংবা ওই খসড়াতেই রাজা-নন্দিনীর দ্বিতীয় সংলাপগুচ্ছের পরিবর্তনে নন্দিনীকে গুরুত্ব দেওয়ার চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়।

তার মানে এই নয় যে তৃতীয় খসড়াতেই নন্দিনীর চরিত্রের যা কিছু উন্নয়ন ঘটে গেছে। বিবর্তন অবশ্যই ঘটেছে। কিন্তু সে বিবর্তন একটু একটু করে পরবর্তী প্রায় সব খসড়াতেই

ঘটেছে। শুধু নন্দিনী নয়, নাটকের প্রায় প্রতিটি চরিত্রকে নিয়েই এই ঘষা-মাজা করেছেন রবীন্দ্রনাথ। চতুর্থ থেকে সপ্তম খসড়া যে নিতান্ত শব্দগত পাঠান্তর নয় বরং নাটকের অন্তর্ভবনে সামগ্রিক বিবর্তনের সঙ্গে সংগতি রেখে এই পর্বটিতেও যে গভীর এবং তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছে তা আমরা আলোচনা করব। তার আগে দেখে নিতে চাই চতুর্থ এবং পঞ্চম খসড়ায় নন্দিনী চরিত্রের কীভাবে কতটা কেল্লায়ন ঘটেছে।

তৃতীয় খসড়ায় আমরা দেখেছিলাম রাজার ক্রুদ্ধ আক্রমণাত্মক চেহারার সামনে দাঁড়িয়ে নন্দিনীকে সাহসী হয়ে উঠতে। যক্ষপুরীর শাসনব্যবস্থাকেই সে ‘ভয় দেখানোর ব্যবসা’ বলেছে, রাজাকেও ‘জুজুর পুতুল’ বলে শিকার দিয়েছে। যক্ষপুরীর শাসনব্যবস্থার বিপরীতে নন্দিনীকে প্রতিবাদী করে তোলার চেষ্টা তৃতীয় খসড়া থেকেই লক্ষ করা গেছে। চতুর্থ খসড়াতেও নন্দিনীর এই চেহারার বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয় নি কিন্তু পঞ্চম খসড়ায় লক্ষণীয় কিছু সংযোজন ঘটল যাতে চরিত্রটিকে যক্ষপুরীর সমস্ত অন্যায়, অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের তীব্রতম কণ্ঠ করে তোলা হল। যেমন সর্দারকে নন্দিনীর জিজ্ঞাসা ছিল— ‘কোথায় নিয়ে গেছ বিশু পাগলকে!’ এর উত্তরে সর্দার বলেছে— ‘তাকে বিচারশালায় ডেকেছে। এর বেশি কিছু জানিনি। আমার কাজ আছে।’ একথা বলার পরই চতুর্থ খসড়ায় সর্দারের প্রস্থান ঘটে। কিন্তু পঞ্চম খসড়ায় এর পরে সংযোজিত হয়েছে নিম্নলিখিত অংশটি যেখানে নন্দিনীর ভাষা হয়ে উঠেছে তীব্র তীক্ষ্ণ—

- নন্দিনী ॥ আমি মেয়ে মানুষ বলে’ তুমি আমাকে ভয় কর না! প্রলয়ের আগুন জ্বালিয়ে দেব আমি। ইন্দ্রদেব বিদ্যুৎশিখাকে দিয়ে তাঁর বস্ত্র পাঠিয়ে দেন। আমি সেই বস্ত্র বয়ে এনেছি— তোমার সর্দারের সোনার চূড়া ভাঙব এবার।
- সর্দার ॥ এইবার তোমাকে তবে সত্য কথটা বলে যাই, বিশুর বিপদ ঘটিয়েছ তুমি!
- নন্দিনী ॥ আমি?
- সর্দার ॥ হাঁ তুমি। এতদিন কীটের মত নিঃশব্দ মাটির মধ্যে গর্ত কবে চলেছিল। তুমি আগুনের শিখা, তাকে মরবাব পাখা মেলতে শিখিয়েছ। আরো অনেককে টনবে তা জানি— তারপরে শেষকালটায় তোমাতে আমাতে শেষ বোঝাপড়া হবে। আজ চলুম। (প্রস্থান)

এই পঞ্চম খসড়াতেই নাটকের শেষ দিকে নন্দিনী চরিত্রে দু-একটি পরিবর্তন ঘটেছে। সেখানেও দেখি ওই তীক্ষ্ণতা। যেন যক্ষপুরীর প্রশাসনের বিরুদ্ধে মনস্তাত্ত্বিক লড়াইয়ের আহ্বান জানিয়েছে নন্দিনী। শেষ পর্বে রাজার সঙ্গে কথোপকথনে সেই আহ্বানই ফুটে উঠেছে পঞ্চম খসড়ায় সংযোজিত এই অংশ দুটিতে:

- (ক) নন্দিনী ॥ এইবার আমার সময় এসেছে।
- রাজা ॥ কীসের সময়?
- নন্দিনী ॥ এতদিন তোমাব দ্বারের কাছে অপেক্ষা করেছিলে, আজ দ্বার ভাঙব। তোমার সঙ্গে আমার লড়াই।
- রাজা ॥ আমার সঙ্গে লড়াই করবে তুমি।
- নন্দিনী ॥ হাঁ, আমি। আমাকেও তোমার ভয় করতে হবে।
- রাজা ॥ তোমাকে যে এক নিমেষেই মেরে ফেলতে পারি!

নন্দিনী ॥ পার। তারপরে প্রতি মুহূর্তে আমার সেই মরাকেই তুমি ভয় করবে। আমার
অস্ত্র নেই। আমার অস্ত্র মৃত্যু। আমার মৃত্যু তোমার মৃত্যুবাণ।

(খ) শেষপর্বে রাজা ভেঙে ফেলেছে তার জালের দরজা। চতুর্থ খসড়ায় এই দ্বার খোলার ব্যাপারটি ছিল নিতান্তই সাধারণ ঘটনা— ‘ঐ জয়বাদ্য বাজল, লক্ষ হয়েছে। এইবার দরজা খুলবে, সামনে থেকে সর। (দ্বার উদ্ঘাটন)’ জয়বাদ্য বাজার ফলে লক্ষ ঘোষিত হল— ঘটনা হিসেবে এটি নাট্য-সম্ভাবনাময় হলেও রবীন্দ্রনাথ এটিকে শুধু ঘটনাগত অ্যাকশান হিসেবেই দেখাতে চাননি, চেয়েছিলেন রাজার অন্তর্জগতটিকে উদ্ঘাটিত করতে। তাই পঞ্চম খসড়ায় অংশটি তিনি পরিবর্তন করলেন। পরিবর্তনের ফলে দ্বার-খোলার পূর্ব মুহূর্তে নন্দিনীর মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছে দুটি তীক্ষ্ণ বাক্য যা রাজার অন্তরে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে।—

নেপথ্যে ॥ নন্দিনী, আমার কাছ থেকে তুমি প্রশয় পেয়েচ, আমাকে তুমি ভয় কর না, কিন্তু আজ আমাকে তোমার ভয় করতেই হবে।

নন্দিনী ॥ তোমার কাছ থেকে আমি প্রশয় চাইনে— আমি চাই যে সবাইকে যেমন তুমি ভয় দেখিয়ে বেড়াও আমাকেও তেমনি ভয় দেখাবে। ভয়ের চেয়ে প্রশয়কে ঘৃণা করি।

নেপথ্যে ॥ ঘৃণা কর! আজ তোমার স্পর্ধা চূর্ণ করে ফেলব। (দ্বার উদ্ঘাটন)

ই্যা, তাহলে নন্দিনীর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা হতে শুরু করেছে মূলত পঞ্চম খসড়া থেকে। পরবর্তী খসড়াগুলিতে এই কেন্দ্রায়ন বেড়েছে বই কমেনি। অথচ ‘নন্দিনী’ নামকরণ বিচ্ছিন্নভাবে চতুর্থ ও পঞ্চম খসড়াতেই শুধু এসেছে। একে সেই অর্থে ‘বিচ্ছিন্ন ঘটনা’ বলা যায় না। ‘নন্দিনী’— এই নামের প্রতি এবং চরিত্রটির প্রতি রবীন্দ্রনাথের দুর্বলতা দ্বিতীয় খসড়া থেকেই টের পাওয়া যাচ্ছিল। সেই দুর্বলতা থেকেই হয়তো চতুর্থ ও পঞ্চম খসড়ায় তা শিরোনামের মর্যাদা পেয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ তবু এই নাটকটির ওই নামকরণে তৃপ্ত ছিলেন না। থাকলে তৃতীয় খসড়া থেকেই ওই নাম তিনি গ্রহণ করতে পারতেন, অন্তত ষষ্ঠ খসড়া পর্যন্ত। কিন্তু তিনি তা চাননি। নন্দিনী-সর্বস্ব রক্তকরবী বোধ হয় তাঁর কাম্য ছিল না। পঞ্চম খসড়াটিকে মার্জনা করতে গিয়ে তিনি নাটকটিকে একটু অন্যভাবে ভাবতে শুরু করেন। নন্দিনীর পাশাপাশি অন্যান্য চরিত্রগুলির কথাও ভাবেন। নাটকের কাহিনি-বিন্যাস বা গঠনগত দিকটিও তাঁকে ভাবিয়েছিল। অপূর্ণতার বোধগুলিকে তিনি এরপর পূর্ণ করে তুলতে লাগলেন। অপ্রাসঙ্গিক বা বাহুল্য বিবেচনায় অনেক সংলাপ বর্জিত অথবা পরিবর্তিত হতে লাগল। পাশাপাশি দু-একটি চরিত্র এবং নতুন কিছু ঘটনা ও সংলাপগুচ্ছ সংযোজিত হল। নন্দিনী চরিত্রের সংযোজিত দিকগুলি আমরা আগেই দেখেছি, এবার লক্ষ করব পঞ্চম খসড়ায় সংযোজিত অন্য দুটি চরিত্রের দিকে।

পঞ্চম খসড়ার মার্জনাকালেই সংযোজিত হয় গোকুল চরিত্রটি। প্রচলিত সংস্করণের পঞ্চম একক হিসেবে আমরা যেটি চিহ্নিত করেছি, পঞ্চম খসড়ায় সেটি ছিল গোকুলের প্রথম প্রবেশ।

এছাড়া নাটকের শেষ দিকে আমাদের নির্দেশিত তেরোতম এককে চরিত্রটির দ্বিতীয় তথা শেষবার প্রবেশ ঘটেছে। নন্দিনীর মুক্ত আনন্দোচ্ছল জীবনকে সে দেখে সন্দেহের চোখে, ঠিক যেমনটি দেখে চন্দ্রা। পার্থক্য এখানেই যে চন্দ্রা নন্দিনী সমালিঙ্গের আর গোকুল বিপরীত লিঙ্গের। নন্দিনীর প্রতি তার বিদ্বেষও খানিকটা আক্রমণাত্মক— ‘ঐ ডাইনীটাকে পুড়িয়ে মারতে হবে’, ‘তা পারি, একবার আমার এই হাতুড়িটা ওর নাকের উপরে—’ স্পষ্টত, এ সংযোজন নাটকীয়তার স্বার্থেই হয়েছে। আর একটু স্পষ্ট করে বললে নাটকের সমাপ্তরাল গতিকে উন্টোভাবনার ধাক্কা দিয়ে নাট্য-অ্যাক্শান সৃষ্টি করা হয়েছে এই সংযোজন দুটিতে।

পঞ্চম খসড়াতেই সংযোজিত হয়েছে চিকিৎসক চরিত্র। আমাদের নির্দেশিত বারোতম এককটির শুরুতেই চিকিৎসক ও সর্দারের প্রবেশ ঘটেছে। খুব সংক্ষিপ্ত আকারে এলেও চরিত্রটি সংযোজনের একটি নাটকীয় তাৎপর্য রয়েছে। চিকিৎসক-সর্দারের আলোচনার বিষয় রাজার মানসিক গতি প্রকৃতি। ‘দেখলুম, রাজা নিজের পরে নিজে বিরক্ত হয়ে উঠেছেন। এ রোগ বাইরের নয়, মনের।’—চিকিৎসকের এই সংলাপ সর্দারকে চিন্তিত করে। প্রজা বিদ্রোহ ঘটিয়ে উৎপাত করা দরকার— চিকিৎসকের এই বিধানে সর্দার বিপ্লবের গন্ধ পায়। প্রশাসন সমস্ত আঁট-ঘাট বেঁধে সে প্রস্তুত হয়ে থাকে। সংলাপ দৃশ্যটির নাট্য তাৎপর্য শুধু এটুকুই নয়। রাজার মানসিক অবস্থাতিকে চিকিৎসকের বিধানে যেমন চিনিয়ে দেওয়া হল, তেমনি চরিত্রটির এবং নাট্য ঘটনার পরিণতির আভাসও এই সংলাপগুচ্ছে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব হয়েছে।

অতঃপর ষষ্ঠ খসড়ায় রবীন্দ্রনাথ প্রথাগত পর্ব বিভাগটিকে বর্জন করেছেন। আঙ্গিকের এই পরিবর্তনটুকু ছাড়া পঞ্চম থেকে ষষ্ঠ খসড়ার পরিবর্তন মূলত সংলাপের ভাষাগত। অপ্রাসঙ্গিক বিবেচনায় কতকগুলি সংলাপ তিনি বর্জন করেছেন। কিছু মার্জনা করে পরিবর্তন করে নিয়েছেন। আর কাহিনির দিক থেকে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি সংলাপগুচ্ছের সংযোজন এই খসড়ায় দেখা যায়। সেটি সর্দার-মোড়ল-ছোটো সর্দার-এর কথোপকথন। এই অংশটি নিয়ে আমাদের একটু আলাদা করে বলার আছে।

রঞ্জনকে ‘এপাড়ায়’ আসতে দেওয়া নিয়ে সর্দার-মোড়ল-ছোটোসর্দারের সংলাপগুচ্ছটি আমরা প্রচলিত সংস্করণের অষ্টম একক হিসাবে দেখিয়েছি। পূর্ববর্তী খসড়ার চতুর্থ পর্বের শুরু বা তৃতীয় পর্বের শেষ যেখানে হয়েছিল, ষষ্ঠ খসড়ার ঠিক সেই জায়গায় এই সংযোজন ঘটিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ।

সর্দার-মোড়ল-ছোটোসর্দারের সংলাপগুচ্ছের পরিকল্পনা রবীন্দ্রনাথ করেছিলেন পঞ্চম খসড়াতেই। এই খসড়ার দুটি খাতা ছিল। ‘নন্দিনী-২’ নামাঙ্কিত পাণ্ডুলিপিতে [151-(ii)] লেখা ছিল ৩৮ পৃষ্ঠা পর্যন্ত। এই খাতার শেষ দিকে ৬৫-৬৬ পৃষ্ঠার উন্টো দিক থেকে (অর্থাৎ খাতাটি ঘুরিয়ে উন্টো দিকটিকে প্রথম মলাট হিসেবে দেখলে) ওই দুটি পাতা জুড়ে সংলাপের আদলে কিছু লেখা ছিল। সেই লেখাটিই ছিল পূর্বোক্ত সর্দার-মোড়ল-ছোটোসর্দারের সংলাপগুচ্ছের প্রাথমিক পাঠ। নাট্য-সংলাপের আদলে, লেখা ওই অংশগুলি অনেকটা প্রথম খসড়ার মতো। সংলাপের বস্তু-নির্দেশক চরিত্র-নাম আছে মাত্র চারটি সংলাপের ক্ষেত্রে। আমরা পঞ্চম খসড়ার সেই পরিকল্পিত পাঠ এখানে হুবহু তুলে ধরছি—

পাণ্ডুলিপির মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা হিসেবে-৬

লিখিত পৃষ্ঠা অনুসারে—39

সর্দার

না, এ পাড়ায় রঞ্জনকে কিছুতেই আসতে দেওয়া চলবে না

মোড়ল

আমরা তাকে দূরে রাখব বলে বঙ্কগড়ের সুড়ঙ্গো কাজ করাতে নিয়ে গিয়েছিলুম,

সর্দার

তা কি হ'ল?

তাকে কিছুতেই পাবা গেল না। সে বললে, কারো হুকুম মেনে কাজ ক'বা আমার অভ্যাস নেই। সর্দার (বর্জন করে) প্রধান (বর্জন করে) বড় মোড়লকে ডেকে দিলুম, সে এল তার সব (বর্জন) কোটালদের নিয়ে। লোকটা ভয়ডর কা'কে বলে জানে না— শাসনের সুরে কথা কইতে গেলে হো হো করে হেসে উঠতে (বর্জন) ওঠে।

সুবঙ্কের মধ্যে নিয়ে তাকে খোদাইকরদের সঙ্গে ভিড়িয়ে দিলে না কেন?

তাই তো দিয়েছিলুম। ভেবেছিলুম চাপে পড়ে বশ মানবে। উন্টো হল।

খোদাইকরগুলো সুদ্ধ মেতে উঠল। বললে, আজ আমাদের খোলইনৃত্য হবে।

খোদাই নৃত্য? তার মানে কি?

রঞ্জন শুবু করলে গান; ওরা বললে মাদল কোথায় পাব? ও বললে, মাদল নেই (বর্জন) না থাকে কোদাল আছে। তালে তালে কোদাল পড়তে লাগল, আর সেনার জল (বর্জন) পিঙগুলো নিয়ে লোঙ্কালুফি কাণ্ড (বর্জন) বেধে গেল। বড় মোড়লকে ডেকে দিলুম, সে বললে, কাজ বন্ধ করতে চায় (বর্জন) চালাতে দেবে না না কি? রঞ্জন বললেন, কাজের বেশি খুলে দিচ্ছি, তাকে টেনে চালাতে হবে না, জলে (বর্জন) নেচে চালাব।

লোকটা পাগল দেখছি।

ঘোর পাগল। আমি (বর্জন) ওকে বললুম, কোদাল ধর। ও বললে তার চেয়ে বেশি কাজ হবে যদি আমাকে একটা সাবেঙ্গি এনে দাও।

বঙ্কগড় থেকে ও আমাদের কুবেরগড়ে এল কী করে?

পাণ্ডুলিপির মোট পাতার সংখ্যা অনুসারে— পৃ. ৬৫

লিখিত পৃষ্ঠা অনুসারে— পৃ. 40

কি জানি প্রভু? ওকে শিকল দিয়ে বাঁধলে ও যে কি কৌশলে শিকল কাটে বুঝতে পারিনে। গারদেব ভিত খুঁড়ে রাতের বেলা (সংযোজন) কেমন কবে বেরিয়েছে কেউ জানে না। খোদাইকরদেব সুদ্ধ ও উতলা করে তুলেচে ও যদি আর কিছুদিন এখানে থাকে তাহলে এরা বাঁধন মানবে না; সব উন্টোপাণ্টা হয়ে যাবে।

এখানে তাকে ভাল করে বঁধেচে তো?

বঁধেচে দেখেচি 'মেজ সর্দারকে আপনি ওর কথা কি বলেছেন (বর্জন) দিয়েছিলেন জানিনে— কিন্নু তিনি বড় গা কবছেন না, ছোট সর্দারের পরে ভার দিয়েচেন।

ওকি? ঐ ত বাজা দিয়ে চলেছে গান গেয়ে। কোথা থেকে একটা ভাজা সারেঙ্গি জোগাড় করেছে।

ঐ তো রঞ্জন বটে, আবার কেমন করে বাঁধন এড়িয়ে এসেচে।

যাও, ধর গে ওকে। নন্দিনী'ব সঙ্গে কি ছুতে যেন মিলতে না পাবে।

প্রভু, একলা আমার কর্ম নয়। দেখ না, দেখতে দেখতে ওর দল ভারি হয়ে উঠেছে।
সবাই ওর পিছন পিছন গান ধরে চলেছে।

ছোট সর্দারের প্রবেশ

সর্দার:

কোথায় চলেছ? রঞ্জনকে বাঁধতে চলেছি
না বাঁধতে হবে না। ওকে রাজার ঘরে পাঠিয়ে দাও।
ও তো রাজার ডাক মানতে চায় না।
ওকে বল রাজা ওর নন্দিনীকে অন্তঃপুরে সেবাদাসী করে রেখেছ।
আপনি নিজে যদি আসেন—
না, তুমি নিজে (বর্জন) যাও। আমি এখানে নন্দিনীকে ঠেকিয়ে রাখছি।

এই পরিকল্পিত পাঠকেই সামান্য অদল বদল করে নিয়ে ষষ্ঠ খসড়ায় সংযোজন করা হয়েছে। এই সংলাপগুচ্ছে শুধু দুটি নতুন চরিত্রেরই অবতারণা ঘটল না, পাশাপাশি কাহিনি-পরিকল্পনায় ও নাট্যদ্বন্দ্বের ধারাবাহিকতায় সমতা সৃষ্টি হল। পঞ্চম খসড়ার শেষ গোটা সংলাপগুচ্ছটি যেভাবে লেখা ছিল তাতে এটিকে ষষ্ঠ খসড়ার সংযোজন হিসাবে দেখা উচিত নাকি পঞ্চম খসড়ার সংযোজন হিসেবে সে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক।

ষষ্ঠ খসড়ায় নাট্য আঙ্গিকের পরিবর্তন নিয়েও কিছু বলার আছে। রবীন্দ্রনাথ এই খসড়াটিতে প্রথাগত পর্ব-বিভাজন রীতি বর্জন করেছেন। কিন্তু এই বর্জন ষষ্ঠ খসড়ার মার্জনা কালে হয় নি। আমরা দেখেছি ষষ্ঠ খসড়ার অনুলিপি করেছেন সুধেন্দুরঞ্জন রায়। সাধারণত কোনো পাণ্ডুলিপিকে নতুন করে লিখতে হলে রবীন্দ্রনাথ প্রথমে পূর্ববর্তী পাণ্ডুলিপির প্রায় হুবহু অনুলিপি করে নিতেন। তার পর সেটির মার্জনা কালে পরিবর্তন সংযোজন ইত্যাদি যা কিছু করতেন। সুধেন্দুরঞ্জনকৃত ষষ্ঠ খসড়াটির ক্ষেত্রেও এর অন্যথা ঘটেনি। এর সংযোজন-বর্জনও রবীন্দ্রনাথ করেছিলেন। কিন্তু সুধেন্দুরঞ্জনকৃত ওই অনুলিপিতে একটি ব্যতিক্রম আমরা লক্ষ্য করেছি। খসড়াটির অনুলিপি পর্যায়েই পর্ব-বিভাজন ব্যাপারটি বর্জিত হয়েছে। খুব সম্ভব রবীন্দ্রনাথের তাই নির্দেশ ছিল। কিন্তু কোনো রকম পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়াই কি এই বর্জন ঘটেছে? একেবারেই হঠাৎ করে?

সম্ভবত তা নয়। পঞ্চম খসড়ার মার্জনার মধ্যেই আমরা এর প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত পেতে পারি। এটা আমাদের জানা যে পঞ্চম খসড়ার শুরুই হয়েছিল কোনো দৃশ্য বা পর্ব-বিভাজন চিহ্নিত সংখ্যা না দিয়ে। এটা কি রবীন্দ্রনাথের অসতর্কতা বশত ভুল নাকি ইচ্ছাকৃত? সম্ভবত অসাবধানতা বশতই তিনি ওই পর্ব-সূচক চিহ্ন দিতে ভুলে গিয়ে থাকবেন। কেননা পরবর্তী ক্ষেত্রে ক্রম-অনুসারে ২, ৩, ৪, ৫ পর্বসূচক চিহ্নগুলি ঠিকঠাক আছে। কিছু বলার কথা যেটা, এই খসড়াতেই গুরুত্বপূর্ণ তিন-চারটি সংলাপগুচ্ছ সংযোজিত হয়েছে। গোকুলের দু-দুবার প্রবেশ ঘটেছে, চিকিৎসকের অবতারণা ঘটেছে এবং বিচ্ছিন্নভাবে বলেও সর্দার-মোড়ল-ছোটোসর্দারের সংলাপগুচ্ছের পরিকল্পনাও করা হয়েছে। চিকিৎসকের চরিত্র এসেছে চতুর্থ পর্বের শেষ ও পঞ্চম পর্বের শুরুতে। আর সর্দার-মোড়ল-ছোটোসর্দারের সংলাপগুচ্ছটি পরিকল্পনা অনুসারে সংযোজিত হয়েছে তৃতীয় পর্বের শেষ ও চতুর্থ পর্বের শুরুতে। টুকরো টুকরো সংলাপগুচ্ছ ক্রমশ সংযোজিত হচ্ছে।

অন্যদিকে বাহুল্য বিবেচনায় অনেক সংলাপই বর্জিত হচ্ছে। যে ঝরঝরে গতিতে নাটকটিকে তরতরিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দিকে কবি দৃষ্টি দিয়েছিলেন, তাতে ওই পর্ব-বিভাজনে হয়তো বাধা পড়ত। অন্যভাবে বললে পর্ব-বিভাজন রীতি বর্জনের উদ্দেশ্যই ছিল নাটকটির ঘটনাস্রোতকে অবিচ্ছিন্ন ধারায় পরিকল্পিতভাবে গ্রহিত করা। শেষ পর্যন্ত ষষ্ঠ খসড়ায় সেই পরিকল্পনাটি সার্থক হয়ে উঠেছে।

সাত

রক্তকরবী নাটকটি নিয়ে রবীন্দ্রনাথের ভাবনাবলয় নতুন করে আন্দোলিত হতে শুরু করে সপ্তম খসড়া মার্জনায় সময় থেকে। এই সময় থেকেই নাটকটির কেন্দ্রীয় ভাবনায় রক্তকরবী ফুলটির গুরুত্ব ক্রমে বাড়তে থাকে। ক্রমে ক্রমে এই ফুলটিকে ঘিরেই নাটকের কেন্দ্রীয় প্রতীক ভাবনাটি বিকশিত হয়। সংখ্যাভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, সপ্তম খসড়ায় ফুলটির প্রত্যক্ষ উল্লেখ দুই থেকে বেড়ে হয়েছে আটবার। অষ্টম খসড়ায় প্রত্যক্ষভাবে ফুলটি উল্লেখ এসেছে উনিশবার। এই খসড়াতেই ফুলটি প্রায় কেন্দ্রীয় প্রতীকের মর্যাদা পেয়েছে। কাহিনিবৃত্তে ‘নন্দিনী’ এবং ‘রক্তকরবী’— দুটি যেন সমার্থক হয়ে উঠেছে। এবং তা ছড়িয়ে গেছে সমস্ত নাট্যশরীরে। স্বাভাবিকভাবেই, নাটকের নাম নিয়ে রবীন্দ্রনাথকে আর চিন্তা করতে হয়নি। রক্তকরবী সেই হয়ে ওঠা নাম।

লক্ষ করলে দেখা যাবে দ্বিতীয় খসড়া থেকে রক্তকরবী ফুলের যে দুবার উল্লেখ আছে, সে দুটিই এসেছিল নন্দিনী-রাজার সংলাপে। একবার তাদের প্রথম সংলাপগুচ্ছে অন্যবার শেষ সংলাপগুচ্ছে। সপ্তম খসড়ায় আরো দুবার ফুলটির উল্লেখ এসেছে। এই ছবারের মধ্যে চার বারই উল্লিখিত হয়েছে অধ্যাপক ও নন্দিনীর সংলাপে এবং দুবার রাজা-নন্দিনীর সংলাপে। তাহলে সপ্তম খসড়াতে ফুলটির উল্লেখ বাড়লেও, সে উল্লেখ তিনটি চরিত্রকে ঘিরেই সীমাবদ্ধ ছিল। এরপর অষ্টম খসড়ায় ফুলটির ব্যঙ্গনা ছড়িয়ে পড়ল সমগ্র নাট্য-শরীরেই। প্রায় প্রত্যেকটি চরিত্রই ফুলটিকে কেন্দ্র করে কোনো-না-কোনোভাবে আলোড়িত হয়েছে। নবম খসড়ায় তারই প্রায় অনুলিখন চলেছিল। আর দশম খসড়ায় ফুলটির তথা নন্দিনীর প্রভাবে প্রবলভাবে প্রভাবিত হয়েছে কিশোর। এখানেও ফুলটির প্রত্যক্ষ উল্লেখ এসেছে উনিশবার।^৪ লক্ষ করলে দেখা যায় এই উনিশবারের মধ্যে ছবার ফুলটি উল্লিখিত হয়েছে নন্দিনী-অধ্যাপকের সংলাপে। নন্দিনী-রাজার সংলাপেও এসেছে ওই সমপরিমাণ উল্লেখ। দুবার করে উল্লেখিত হয়েছে কিশোর এবং সর্দারের কথা প্রসঙ্গে। একবার করে উল্লিখিত হয়েছে চন্দা-বিশু, মেজোসর্দার-সর্দার, ফাগুলাল-বিশুর কথোপকথনে। প্রচলিত সংস্করণে রক্তকরবী ফুলটি মোট কুড়ি বার প্রত্যক্ষভাবে উল্লিখিত হয়েছে। সংখ্যাগতভাবে এই উল্লেখ বাড়ার মধ্যে কোনো গুরুত্ব থাকত না, কেন্দ্রীয় চরিত্র নন্দিনীর সঙ্গে তা ব্যঙ্গনায় একাত্ম হয়ে পড়ত।

আট

শুধু রক্তকরবী ফুলটির উল্লেখই বাড়েনি বা ফুলটির ব্যঙ্গনাই শুধু ছড়িয়ে পড়েনি, শেষ চারটি খসড়ায় আরও কিছু পরিবর্তন ঘটেছে যা এই নাটকটিকে পরিপূর্ণতার বোধে পৌঁছে দিতে সাহায্য করেছে।

বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় নাটকের শেষ অংশটির কথা। ‘নন্দিনী, শুনতে পাচ্ছ, ঐ যে তোমার ফসল কাটার দল গান গেয়ে চলেছে!’—ষষ্ঠ খসড়ার সমাপ্তি ঘটেছিল এখানেই। সপ্তম খসড়ায় রবীন্দ্রনাথ যোগ করলেন আরো কিছুটা অংশ, যেখানে সর্দারের সৈন্যদল নিয়ে এগিয়ে আসার গর্জন শোনা যায়। কিছুটা সঙ্কুচিত হয়ে ওঠে রাজা বা ফাগুলাল। সপ্তম খসড়ার সমাপ্তি হয় নন্দিনীর—‘...আমার প্রাণের সাথী গেল, আমার গানের সাথী গেল!’—এই সংলাপের পর গাওয়া ‘সন্ধ্যাতারার শেষ চাওয়া তোর রইল কি ঐ যে’ ইত্যাদি দীর্ঘ গানে।

অষ্টম খসড়া থেকে নাটকের শেষে আরো কিছুটা অংশ সংযোজিত হয়েছে। নন্দিনীর গাওয়া ‘সন্ধ্যাতারায় শেষ চাওয়া তোর’— ইত্যাদি গানটিকে বর্জন করে রবীন্দ্রনাথ এখানে সংযোজন করেছেন একটি দীর্ঘ পাঠ, যেখানে নন্দিনী এগিয়ে গেছে চূড়ান্ত লড়াইয়ে। অধ্যাপক এবং বিশুরও প্রবেশ ঘটেছে এরপর। অধ্যাপক খবর পেয়েছে যে রাজা এতদিনে চরম প্রাণের সন্ধান পেয়ে ছুটে বেরিয়েছে, তাই পুণ্ড্রপত্র ফেলে সেও সঙ্গ নিতে এসেছে। সে বুঝেছে—রাজার ‘জাল ছিঁড়েছে’। অধ্যাপক এই শেষ দৃশ্যে যেন ওই জাল ছেঁড়ার ঘটনায় উল্লসিত। যেন রাজার জালই শুধু ছেঁড়েনি, ছিঁড়েছে তার পাণ্ডিত্যের জালও। তাই নন্দিনীর পিছু পিছু চূড়ান্ত মুক্তির দিকে ছুটে যাওয়ার মধ্যে অধ্যাপকের উল্লাসই বড়ো হয়ে উঠেছে।

শেষ দৃশ্যে বিশুও নন্দিনীকে খুঁজতে এসেছে। তার মুখেই আমরা শুনলাম যক্ষপুত্রীর কারিগররা বন্দিশালা ভেঙে ফেলেছে। তারা চূড়ান্ত লড়াইয়ের দিকে এগিয়ে গেছে। এই দৃশ্যই বিশু ধুলো থেকে কুড়িয়ে নেয় নন্দিনীর ফেলে যাওয়া রক্তকরবীর কঙ্কন। চূড়ান্ত লড়াইয়ের দিকে এগিয়ে যায় বিশু এবং ফাগুলালও।

অষ্টম খসড়ার এই সংযোজনে নাটকটির গভীরতা যেন কয়েক গুণ বেড়ে গেছে। শেষ মুহূর্তে অধ্যাপক এবং বিশু চরিত্র দুটির উত্তরণ ঘটে গেছে আশ্চর্যভাবেই। প্রথম দুটি খসড়ায় যে অধ্যাপককে আমরা পেয়েছিলাম, সে ছিল যক্ষপুত্রীর বেতনভুক্ত এক শিক্ষক মাত্র। ক্রমে তৃতীয় খসড়া থেকে চরিত্রটিকে রবীন্দ্রনাথ গুরুত্ব দিয়েছেন। নন্দিনীর সংস্পর্শে তার বস্তুত্বের নিশ্চিত জগতে ঝোড়ো হাওয়া প্রবেশ করে। বস্তুত্ববিদের মুখোশ ছিঁড়ে তার অন্তরের ব্যক্তিটি জেগে ওঠে। পেশাগত শ্রেণিচেতনার বিপরীতে ব্যক্তি আমির সেই জাগরণে যে সংকটের সৃষ্টি হয়েছিল, তাতে ক্ষতবিক্ষত হচ্ছিল অধ্যাপক। অবশেষে অষ্টম খসড়ায় রাজার জালছেঁড়ার সঙ্গে সঙ্গে অধ্যাপকের পাণ্ডিত্যের জাল ছেঁড়ার উল্লাস ব্যঞ্জিত হওয়ায় চরিত্রটির বিবর্তনেও পরিপূর্ণতা এসেছে।

ঠিক তেমনি বন্দিশালার দরজা ভেঙে ফেলার পর শেষ মুহূর্তে বিশুর প্রবেশ চরিত্রটির বিবর্তিত রূপটিকেই পরিপূর্ণতা দিয়েছে। তার আগে বন্দি হওয়ার মুহূর্তে বিশুকে মনে হয়েছিল, যেন এক বিপ্লবী নেতা। সেই বন্দি তার কাছে ছিল মুক্তির মতোই, অন্তরের জড়তা থেকে মুক্তি। প্রহরীদের সঙ্গে বন্দিশালা যাওয়ার আগে বিশুর সংলাপে ও গানে সংগ্রামের অন্যতর ব্যঞ্জনা ফুটে উঠেছিল। অষ্টম খসড়ায় নাটকের শেষে চরিত্রটিকে কবি শেষ বারের জন্য নিয়ে আসায় চরিত্রটির বিবর্তনে পূর্ণতার আভাস এসেছে। অবশ্য অষ্টম খসড়াতেই এই পূর্ণতা এসে যায় নি, তার জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হয়েছে দশম খসড়া পর্যন্ত। দশম খসড়ায় সংযোজিত একটি সংলাপে দেখি নেতৃত্বের দায়ভার কাঁধে তুলে নিয়ে

নেতার মতোই প্রত্যক্ষ লড়াইয়ে সকলকে সামিল হতে ডাক দিয়েছে বিশু 'আয়রে ভাই, এবার লড়াইয়ে চল।'

একটা কথা এখানে জানিয়ে রাখা অপ্ৰাসঙ্গিক হবে না। অষ্টম খসড়ার শেষে সংযোজিত ওই গুরুত্বপূর্ণ সংলাপগুচ্ছের পরিকল্পনা রবীন্দ্রনাথ করেছিলেন আরো আগেই। সপ্তম খসড়ার [পান্ডুলিপি সংখ্যা-151(vii)] শেষে খাতাটির 111/112 পৃষ্ঠায় (পান্ডুলিপিতে লিখিত পৃষ্ঠার সংখ্যা অনুযায়ী 103/104) সংযোজনের উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ কিছু লিখে রেখেছিলেন। এই লেখাটিই হল অষ্টম খসড়ায় সংযোজিত নাটকের শেষ অংশটির খসড়া পরিকল্পনা। সেখানে রাজা-নন্দিনীর সংলাপ ছাড়াও অধ্যাপক এবং বিশুর প্রবেশও ঘটেছে। যেমনটা আছে অষ্টম খসড়ায়, প্রায় তেমনভাবেই সংলাপগুলি পরিকল্পিত হয়েছিল। শুধু নাটকের শেষে ছিল স্বতন্ত্র একটি গান— 'আমার শেষ রাগিণীর প্রথম ধূয়ো/ধরলি রে, কে তুই?' অবশ্য এই গানটি সপ্তম খসড়ার শেষে সংযোজিত 'সম্ব্যাতারায় শেষ চাওয়া তোর রইল কি ঐ যে'— ইত্যাদি গানেরই একটি স্বতন্ত্র পাঠ বলে মনে হয়। যদিও *গীতবিতান*-এ দুটিকে দুটি স্বতন্ত্র গান বলেই দেখানো হয়েছে।

অষ্টম খসড়ায় কাহিনিবিন্যাসে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল নাটকের শেষে পৌষের গান সংযোজিত হওয়া। রাজা-নন্দিনীর সংলাপের মাঝে দ্বিতীয় খসড়ায় এ গানের প্রথম প্রয়োগ দেখা গিয়েছিল। অবশ্য প্রথম খসড়াতেই এ গানের উল্লেখ ছিল, নেপথ্য থেকে তা গাওয়া হয় নি। পরবর্তী খসড়াগুলিতে এই গানের প্রয়োগ একাধিকবার ফিরে ফিরে এসেছে, অনেকটা 'ধিম সঙ্'—এর মতোই। যক্ষপুরীর প্রাণহীন প্রকৃতিবিচ্ছিন্ন বদ্ধ জীবনের ওপারে আছে এক মুক্ত প্রাণোচ্ছল পরিবেশ, যা যক্ষপুরীর প্রতিটি মানুষকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। *রক্তকরবী*-র পৌষের গানের সুরে তারই আবহ নির্মিত হয়েছে। তাকে ক্রমশ ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে সমগ্র নাট্যশরীরে। অষ্টম খসড়ায় নাটকের শেষে 'সম্ব্যাতারায় শেষ চাওয়া তোর রইল কি ঐ যে,'— ইত্যাদি গানটি বর্জন করে পৌষের গান ব্যবহার করায় সেই সুরের আবহ পরিপূর্ণতা পেয়েছে।

নয়

অতঃপর দশম খসড়ায় পৌছে নাটকের কাহিনিবিন্যাসকে চূড়ান্ত রূপ দিলেন রবীন্দ্রনাথ। দশম খসড়া প্রস্তুত হয়ে যাবার পর তার সংশোধনকালে নতুন একটি চরিত্র সংযোজিত হল। জন্ম হল কিশোরের। নাটকের কাহিনিবিন্যাসে চরিত্রটির ভূমিকা এতটাই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল যে, নাটকে তার প্রবেশ ঘটেছে তিনবারের জন্য। নাট্য-কাহিনির সূচনাই হয়েছে কিশোরের সংলাপ দিয়ে। কিশোর-নন্দিনী কথোপকথনকে সূচনায় রেখে তারপর অধ্যাপকের প্রবেশ ঘটেছে। কিশোরের প্রথম সাক্ষাতে আমরা জানতে পারলাম রক্তকরবী ফুলটির রহস্য, নন্দিনীকে সে কীভাবে জুগিয়ে দেয় রক্তকরবীর মঞ্জরি। আরো জানতে পারলাম শুধু নন্দিনীর সাহচর্য তার মনের মধ্যে প্রতিবাদের আগুন জ্বলে দেয় কীভাবে।

কিশোরের দ্বিতীয় প্রবেশ ঘটেছে বিশুকে বন্দি করে প্রহরীরা বন্দিশালার দিকে নিয়ে চলেছে তখন। বিশু তাকে দায়িত্ব দিয়েছে রঞ্জনকে খুঁজে বার করার জন্য। রঞ্জনকে খুঁজে তাকে নন্দিনীর দেওয়া রক্তকরবীর গুচ্ছ দেওয়ার দায়িত্বও সে নিয়েছে। কিশোরের শেষ

সংবাদ আমরা পাচ্ছি নাটকের শেষ মুহূর্তে রাজার দরজা ভেঙে ফেলার পর। এখানে প্রত্যক্ষভাবে কিশোর মঞ্চে আসেনি। নন্দিনী-রাজার সংলাপসূত্রে জানতে পারি সে রাজাকে উদ্ধতভাবে আক্রমণ করতে গিয়েছিল, কিন্তু বুদবুদের মতো লুপ্ত হয়ে গেছে।

সংক্ষিপ্ত এই তিনটি সংযোজন এ নাটকের কাহিনি-কিন্যাসে আশ্চর্যভাবে মিশে গেছে। শুধু মিশে গেছে নয়, নাট্য-কাহিনিতেও অনেক বেশি পূর্ণতা নিয়ে এসেছে। মূল নাটকটি পাঠ করে একথা ভাবা স্বেনোমতেই সম্ভব নয়, যে কিশোর চরিত্রটির অস্তিত্ব প্রথম নটি খসড়াতেই ছিল না।

তেমনি গোকুল। ছোটো এই চরিত্রটির সংযোজন ঘটেছিল পঞ্চম খসড়ায়, দুবারের জন্য। দশম খসড়ার মার্জনাকালে চরিত্রটিকে আর একটিবারের জন্য সংযোজন ঘটিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। নাটকের শুরুর প্রথমে কিশোর, তারপরে অধ্যাপক, অধ্যাপকের প্রস্থানের সঙ্গেই প্রবেশ ঘটেছিল গোকুলের। কিন্তু তার পরেই ওই সংযোজিত অংশটিকে বর্জন চিহ্ন দিয়ে কেটে দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। জানিনা, কোথায় কী-ই বা দুর্বলতা ছিল ওই সংযোজিত সংলাপগুচ্ছটিতে। শুধু এই একটি সংলাপগুচ্ছ নয়, দশম খসড়ার আরো অনেকগুলি সংলাপের ক্ষেত্রেই তিনি এমন বর্জন চিহ্ন দিয়েছিলেন। সে প্রসঙ্গে পরে আসছি।

গোকুল চরিত্রটির ওই সংযোজন-বর্জন নিয়ে রবীন্দ্রনাথের মনে যে দ্বিধা বা দোলাচলতা ছিল তার কারণ বোঝা সম্ভব নয়। তবে নাট্যকাহিনির বিচারে গোকুলের ওই সংযোজনের গুরুত্ব কিন্তু অসীম। শব্দ মিত্র তাঁর নাটক রক্তকরবী গ্রন্থে দেখিয়েছেন, শুরুর এই কিশোর, তারপর অধ্যাপক এবং অধ্যাপকের পরেই গোকুল— প্রত্যেকের কণ্ঠস্বরের বৈপরীত্যে কীভাবে নাটকে একটি সাংগীতিক ব্যঞ্জনা সৃষ্টি হতে থাকে, যা দর্শকের অবচেতন মনের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে যায়। স্বরের বিচারেই শুধু নয়, নাট্যকাহিনিতে এই ঘটনাসম্ভার ভিন্নতর তাৎপর্য রয়েছে। শুরুর এই কিশোর, নন্দিনীর প্রতি তার সংরাগ, তারপর অধ্যাপক, তত্ত্বাবধানের মধ্যে দিয়ে তার নন্দিনীকে বুঝতে চাওয়া এবং তারপরেই গোকুলের নন্দিনীকে ভয়ংকরী মনে হওয়া— এ যেন ঘটনাপরম্পরায় বৈপরীত্যে এক আশ্চর্য নাটকীয় অভিঘাত সৃষ্টি করেছে।

ঘটনাসম্ভার এই গুরুত্ব অনুধাবন করেছিলেন বলেই হয়ত রবীন্দ্রনাথ এই অংশটি নতুন করে ফিরিয়ে এনেছিলেন প্রবাসীর মুদ্রিত পাঠে। পরিবর্তিত পাঠে প্রত্যক্ষভাবে রক্তকরবী ফুলটির প্রসঙ্গ এসেছে। নন্দিনীর সিঁথিতে রক্তকরবীর মঞ্জরি দেখে গোকুল তার ‘মানে কী?’ জানতে চেয়েছে। দশম খসড়ার পাঠে নন্দিনীকে তার ‘ভয়ংকরী’ মনে হয়েছিল, তাই সে নির্বোধদের সাবধান করতে ছুটেছিল। পরিবর্তিত পাঠে নন্দিনী তার কাছে জানতে চেয়েছে কেন তাকে দেখে গোকুলের ভয়ংকর মনে হচ্ছে? উত্তরে গোকুল বলেছে— ‘দেখে মনে হচ্ছে, তুমি রাজা আলোর মশাল।’ তাই সে নির্বোধদের সাবধান করতে ছুটে গেছে। যে সংলাপগুচ্ছকে তিনি বর্জন করতে চেয়েছিলেন, এই সামান্য পরিবর্তনে তাই-ই যেন নতুন রক্ত নিয়ে ফিরে এসেছে। অধ্যাপকের দৃষ্টিতে যা ছিল ‘আচমক আলো’ গোকুলের দৃষ্টিতে তা হয়ে উঠল ‘রাজা আলোর মশাল’। যেন সকলের অজান্তে এই দুটি উপমার বৈপরীত্যে এক ধরনের নটি-সংঘাত সৃষ্টি হয়েছে।

দশ

শুধু গোকুল চরিত্রের ক্ষেত্রেই নয়, রবীন্দ্রনাথ রক্তকরবীর আরও কয়েকটি সংলাপের ক্ষেত্রেও বর্জনের কথা ভেবেছিলেন। তাই দশম খসড়াতে বেশ কিছু সংলাপ তিনি বর্জন

চিহ্ন দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের এই খুঁতখুঁতে প্রভাব তাঁর কবি-জীবনের শুরু থেকেই ছিল। চিত্রা-র 'প্রেমের অভিষেক' কবিতাটির একটি বৃহৎ অংশ যা প্রথমে সাধনা-য় মুদ্রিত হয়েছিল, তা বর্জন করায় কবির অনুরাগী পাঠক ঔপন্যাসিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় অনুযোগ করেছিলেন কবির এই 'ছাঁটা রোগ' নিয়ে।^১ রবীন্দ্রনাথের মতো শিল্পসচেতন এক স্রষ্টার কাছে এই শিল্প-বৈশিষ্ট্য অত্যন্ত স্বাভাবিক। শিল্পরূপের পরিপূর্ণতার সম্ভান কবি হয়তো এই বাহুল্য বর্জনের মধ্যে পেতেন। কিন্তু শিল্পরূপের সার্থকতার মানদণ্ড তো পাঠকের হৃদয়ের কাছেও হতে পারে। সে দিক থেকে পাঠকের আস্থাদানের আগেই কোনো পাঠ বর্জন করা হলে অনেক উৎকৃষ্ট শিল্প-সম্ভাবনাকে নষ্ট করা হয়। আমাদের সৌভাগ্য যে রবীন্দ্রনাথ রক্তকরবী-র দশম খসড়ায় পরিকল্পিত ওই পাঠ বর্জনের ইচ্ছাকে বাস্তবায়িত করেননি। প্রবাসী-র মুদ্রিত পাঠে পুনরায় সংলাপগুলিকে তিনি ফিরিয়ে এনেছিলেন।

প্রবাসী-র আশ্বিন ১৩৩১ সংখ্যায় রক্তকরবী নাটকটি প্রকাশিত হয় সম্ভবত একেবারে শেষ মুহূর্তে, 'অতিরিক্তাংশ' রূপে। তারপর নাটকটি গ্রন্থ হয়ে বেরোয় ১৩৩৩-এর পৌষে। মাঝে প্রায় দু-বছর তিনমাসের মতো সময়। এই সময়ের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ কি নাটকটিকে নতুন করে মার্জনার কথা ভাবেন নি? হয়তো ভেবেছিলেন কিন্তু সে সুযোগ ও সময় তিনি করে উঠতে পারেননি। তবে প্রবাসী-র মুদ্রিত একটি কপিতে বেশ কিছু সংলাপের তলায় পেনসিলের দাগে চিহ্নিত করে রেখেছিলেন। প্রণয়কুমার তাঁর গ্রন্থে সেই সমস্ত অংশগুলি উদ্ধার করেছেন।^২ সেই সমস্ত অংশগুলি যে তাৎপর্যপূর্ণ এবং অর্থময় সন্দেহ নেই।

সৃষ্টির ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ চিরদিনই ছিলেন অক্লান্ত পরিশ্রমী। একজন কৃষক যেমন নিরন্তর পরিশ্রমের মধ্যে দিয়ে উৎকৃষ্ট ফসল ফলিয়ে থাকেন, রবীন্দ্রনাথকেও তেমনি সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ ফসল ফলিয়ে তুলতে হয়েছে যথেষ্ট পরিশ্রমের মধ্যে দিয়ে। এক্ষেত্রে তাঁকে 'শ্রমিক কবি' বললেও বোধ হয় অত্যাঙ্গী করা হয় না। রক্তকরবী সৃষ্টির ক্ষেত্রে একথা একান্তভাবেই প্রযোজ্য। এ প্রসঙ্গে নাটকটির ইংরেজি অনুবাদের কথাও আমাদের স্মরণ করা প্রয়োজন। প্রবাসী-র মুদ্রিত পাঠকে সংশোধন করার ইচ্ছে তাঁর বাস্তবায়িত হয়নি। রক্তকরবী নাটকটিকে অভিনয় করানোর ইচ্ছেও কবির ছিল। কিন্তু নানা কারণে সে ইচ্ছেও তাঁকে দমন করতে হয়েছিল। যদি অভিনয় করতেন, তাহলে আমরা নিশ্চিত যে 'বিসর্জন' বা 'রাজা ও রাণী' নাটকের মতো রক্তকরবী নাটকেরও আরও এক বা একাধিক রূপ আমরা দেখতে পেতাম।

টীকা ও সূত্রনির্দেশ:

- ১ রক্তকরবী পাণ্ডুলিপি সংবলিত সংস্করণ, সংকলন ও সম্পাদনা : শ্রীপ্রণয়কুমার কুণ্ডু, বিশ্বভারতী গ্রন্থনিবিভাগ, ১৯৯৮, পৃ. ৫৬৫।
- ২ এই পঞ্চম খসড়াটির সঙ্গে বহুব্রূপী পত্রিকায় প্রকাশিত চতুর্থ খসড়াটির ক্রমপর্যায়ের তুলনা, দিতে গিয়ে শ্রী প্রণয়কুমার বলেছেন— 'বহুব্রূপী'তে মুদ্রিত 'নন্দিনী' শীর্ষক পসড়াটি যে রবীন্দ্রভবনে সংরক্ষিত পঞ্চম খসড়ার পূর্ববর্তী খসড়া, তার প্রমাণ, উক্ত 'নন্দিনী'র শুরু হয়েছে তৃতীয় খসড়ার

অনুসরণে '১' চিহ্নিত করে, আগের খসড়ার মতো দৃশ্যবিভাগের পরিকল্পনা নিয়ে, যা পঞ্চম খসড়ায বর্জিত। প্রণয়কুমারেব এই বক্তব্য আপাতভাবে হয়তো ঠিক। কেননা পঞ্চম খসড়া যেখানে শুরু হয়েছে, সেখানে ববীন্দ্রনাথ দৃশ্য-সূচক সংখ্যা দেননি। কিন্তু আমাদের বক্তব্য ববীন্দ্রনাথ এই খসড়ায় দৃশ্যবিভাগ পরিকল্পনা ত্যাগ করেননি। কেননা দৃশ্যসূচক প্রথম সংখ্যাটি না থাকলেও পববর্তী ক্ষেত্রে দৃশ্যবিভাগের সূচনায় ২, ৩, ৪, ৫ এই দৃশ্যসূচক চিহ্নগুলি যথাযথ দিয়েছিলেন। অনুমান কবা যেতে পাবে প্রথম দৃশ্যসূচক সংখ্যাটির ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ অসতর্কতা বশত চিহ্নটি দেননি। দ্র. রক্তকরবী পাণ্ডুলিপি সংবলিত সংস্করণ, ওই, পৃ. ৫৫৮।

৩ বক্তকরবী পাণ্ডুলিপি-সংবলিত সংস্করণ, ওই, পৃ. ৫৬৫।

৪ দশম খসড়ায় রক্তকরবী ফুলটির প্রত্যক্ষ উল্লেখ উনিশবার হলেও প্রবাসী-র মুদ্রিত পাঠে এই উল্লেখ আছে কুড়িবার। দশম খসড়ায় গোকুল-নন্দিনী চরিত্র দুটিকে নিয়ে একটি অতিরিক্ত সংলাপগুচ্ছ প্রথমে সংযোজিত, পাবে বর্জিত হয়। বর্জিত ওই সংলাপদুচ্ছকেই সামান্য পরিবর্তিত আকারে প্রবাসী-তে ফিরিয়ে আনা হয়। প্রবাসী-র পরিবর্তিত পাঠেই রক্তকরবী ফুলের উল্লেখটি আসে। সেখানে গোকুল নন্দিনী বর্জিত বক্তকরবীর মঞ্জরি বুলছে দেখে জানতে চেয়েছিল 'ওর মানে কী?'

৫ দ্র. রবীন্দ্রবনী তৃতীয় খণ্ড, পাল প্রশান্তকুমার, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৩৯৪, পৃ. ২৮৪।

৬ দ্র. বক্তকরবী পাণ্ডুলিপি সংবলিত সংস্করণ, ওই, পৃ. ৫৬৬-৬৭।

পত্রগুচ্ছ
(প্রবালকান্তি হাজরা-কে লেখা)

হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

[এক]

১ বালিগঞ্জ টেরাস
কলিকাতা-২৯
২০. ১০. ৮০

কল্যাণীয়েষু,

ম্নেহের প্রবাল, তোমার ৪.১০.৮০ তারিখের চিঠির একটি অন্তর্বর্তিকালীন উত্তর দিয়েছিলাম। তাতে বলেছিলাম রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে যে প্রশ্নগুলি উত্থাপন করেছ তাদের উত্তর আলাদা পাঠাব। নীচে সেই উত্তরগুলি লিখলাম:

১। রবীন্দ্রনাথের কিসের ব্যবসা করে লাভ করেছিলেন?

রবীন্দ্রনাথ যখন শিলাইদহে থাকতেন তখন কুষ্টিয়াতে একটি আপিস খুলেছিলেন। সে আপিসবাড়ি আমি দেখেছি। কুষ্টিয়া পাট পাইকারী হারে বিপননের একটি বড় কেন্দ্র। তাই জন্যই সম্ভবত তার এই নাম। আমার ধারণা তিনি পাট ব্যবসায় লাভ করেছিলেন এবং তা হতে পুরীতে একটি বাড়ি কিনেছিলেন। ব্রহ্মচর্য আশ্রমের ব্যয় নির্বাহের জন্য তিনি তা বিক্রয় করেছিলেন। আমি এ তথ্য সম্ভবত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্র জীবন কথা' গ্রন্থে পেয়েছি। পুরীর বাড়ি বিক্রয়ের কথা আমার 'ঠাকুর বাড়ির কথা' ও ভারত সরকার প্রকাশিত ইংরাজি জীবনী গ্রন্থ 'Rabindranath Tagore' (Builders of Modern India series) এ উল্লেখ করেছি।

২। রবীন্দ্রনাথের ভারি শিল্প স্থাপনের কোন চিন্তা ছিল কি?

আমার ধারণায় বড় শিল্পকে তিনি উগ্র জাতীয়তাবোধের মতই ঘৃণা করতেন। উগ্র জাতীয়তাবোধ দুর্বল জাতিগুলিকে শৃঙ্খলিত করে। ব্যাপকহারে যান্ত্রিক উৎপাদন মানুষকে ভোগমুখী করে এবং আর একভাবে তার বিকাশে বাধা সৃষ্টি করে। তিনি ভোগ্যপণ্যকে নিয়মিত পরিমাণে ব্যবহার করে মানুষ আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে উন্নতি লাভ করুক এই চাইতেন। কৃত্রিমভাবে ভোগ্য পণ্যের চাহিদা মানুষ যন্ত্রের দাস হক তা চাইতেন [না]। তার প্রতিবাদ তিনি করেছেন তাঁর প্রতীক নাট্য 'মুক্তধারা'য়। Religion of Man-এও তার প্রতিবাদ আছে। তিনি বলেছেন : "The nest is simple, it

has an early relationship with the sky, the cage is complex and costly and it is too much itself excommunicated from whatever lies outside. And man is building his cage fast, developing his parsitism. On the monster thing, which he allows to envelop him on all sides." (Religion of Man, Teachers)

এ বিষয়ে আমার 'How Thou singest My Master' গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা আছে।

৩। রবীন্দ্রনাথ মার্কসবাদের বিষয় পড়াশোনা করেছেন কিনা এবং তার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন কিনা।

দুটির উত্তরই আমার মতে 'না' হবে।

রবীন্দ্রনাথ তত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থ পড়তে ভাল বাসতেন না বলেই আমার ধারণা। যাকে বলা হয় রস সাহিত্য (creative literature) তা খুবই পড়তেন; কিন্তু এ বিষয় তিনি আগ্রহী ছিলেন না। তিনি নিজে শিল্পতত্ত্ব সম্বন্ধে গভীর চিন্তা করেছেন মূল্যবান কথা লিখেছেন; কিন্তু শিল্পতত্ত্ব বিষয়ক বই পড়েন নি মনে হয়। সংস্কৃত ও পাশ্চাত্য ভাষায় শিল্পতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক মৌলিক গ্রন্থ আছে, কিন্তু তাঁর শিল্পতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনায় তাদের সহিত পরিচয় সূচক মন্তব্য কোথাও পাইনি। কেবল দুটি বচন তিনি উদ্ধৃত করেছেন : 'Thing of Beauty is Joy for Ever' এবং কাব্যং রসাত্মকং বাক্যম্। প্রথমটি কীটস্ এর একটি কবিতার অংশ। দ্বিতীয়টি প্রবাদ বাক্যের মত প্রচলিত। সুতরাং মার্কসবাদ পড়েছিলেন মনে হয় না।

তবে তাঁর অপরিসীম ধীশক্তি ছিল। ১৯৩০-এ যখন রাশিয়া যান তখন মার্কসবাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের ফলে তিনি তার মৌলিক তত্ত্বগুলির সহিত যে পরিচিত হয়েছিলেন তাতে সন্দেহ নাই।

দ্বিতীয়ত তিনি যে মার্কসবাদ গ্রহণ করেন নি তা 'রাশিয়ার চিঠি'তে তার সমালোচনামূলক মন্তব্য হতেই প্রমাণিত হবে।

মার্কসবাদ একটি পূর্ণাঙ্গ তত্ত্ব নয়ও। তাই ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর দ্বন্দ্বের সমাধানের যে প্রস্তাব তাতে আছে তা সন্তোষজনক হয়নি। রবীন্দ্রনাথ এই কথাই বলেছেন।

ব্যক্তির সঙ্গে গোষ্ঠীর সম্বন্ধের দুটি দিক আছে। একটি স্বার্থের সংঘর্ষের দিক, ব্যক্তি গোষ্ঠীকে বঞ্চিত করে ভোগ করতে চায়। অন্যটি পরস্পর সহায়কের ভূমিকার দিক (sympiotic relation)। এখানে সমাজ ব্যক্তিকে বিকাশ লাভের সুযোগ দেয় এবং সমাজকে সে নিজ অর্জিত জ্ঞান বা শিল্প বা প্রযুক্তি বিদ্যা দান করে সামাজিক উত্তরাধিকারকে সমৃদ্ধ করে। মার্কসবাদ দ্বিতীয় সম্পর্কের দিকটা নজর করেনি।

রবীন্দ্রনাথ নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে মার্কসবাদকে দেখেছেন। তাই যেমন পরজীবী শ্রেণীর সনাতন মুক্তিতে সাধারণ মানুষও মাথা তুলতে পেরেছে দেখে আনন্দিত হয়েছেন, তেমন ব্যাপকক্ষেত্রে শিক্ষার ব্যবস্থা লক্ষ্য করে আনন্দ পেয়েছেন। অপরপক্ষে তিনি ব্যক্তিকে সম্পদের অধিকার হতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করলে তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটবে না বলেছেন। (রাশিয়ার চিঠি-৫)। এও বলেছেন যে শিক্ষাকে

ছাঁচে ঢালবার চেষ্টা আছে। তার মধ্যে তিনি গুরুতর গলদ দেখেছেন এবং বলেছেন ‘ছাঁচে ঢালা মনুষ্যত্ব কখনো টেকে না।’ (রাশিয়ার চিঠি-১)।

যাকে তিনি বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করতে পারেন নি তার দ্বারা প্রভাবান্বিত হওয়া সম্ভব নয়।

৪। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতের এবং চিত্রের আবেদন সর্বজনীন নয় কেন?

আমার ধারণা রবীন্দ্রনাথের চিত্রের আবেদন সত্যি সর্বজনীন নয়, কিন্তু সঙ্গীতের আবেদন ক্ষেত্র বিশেষে সর্বজনীন না হলেও অনেক ক্ষেত্রে তার সর্বজনীন আবেদন আছে, যেমন তাঁর বাউল সঙ্গীতগুলি (ধনঞ্জয় বৈরাগীর গান)।

চিত্রের আবেদন সর্বজনীন না হওয়ার কারণ তাঁর চিত্র বিমূর্ত প্রকৃতির (abstract) বা প্রতীকধর্মী (যেমন চিত্রলিপির চিত্র)।

তাঁর সঙ্গীত কিন্তু বিমূর্ত প্রকৃতির নয়। তিনি সুর ও বাণীর পরস্পর পরিপূরকের ভূমিকার উপর জোর দিতেন। তাই রাগ প্রধান সঙ্গীত (যেমন আলাপ) তাঁর ভাল লাগত না। সেক্ষেত্রে তার সর্বজনীন আবেদন থাকাই স্বাভাবিক; কিন্তু তা সর্বক্ষেত্রে ঘটেনি। তার একটা কারণ আছে। তিনি সাধারণ স্তরের কবি ছিলেন। তাঁর ধীশক্তি ও মনীষা তাঁর চিন্তাকে উচ্চ স্তরে তুলে দিয়েছিল। তাঁর সঙ্গীতে দার্শনিক তত্ত্ব একটি মূল উপাদান। সেইজন্য গীতাঞ্জলি গানগুলির ভাষা সরল হলেও সাধারণের বোধগম্য নয় (যেমন ‘সীমার মাঝে অসীম তুমি’)। তাঁর নটরাজ পরিকল্পনার গভীর বিজ্ঞান ও দার্শনিক জ্ঞান ভিন্ন রসগ্রহণ করা শক্ত। তাই তাঁর সকল শ্রেণীর সঙ্গীতের রসিক হবার উপযুক্ত হতে হলে তার জন্য পরিশীলিত মনের দরকার। তাই সকলের নাগালের মধ্যে তা আসে না। মান অবনমিত না করলে সঙ্গীতের সর্বজনীন আবেদন সম্ভব নয়। যেমন সহজপাচ্য ঝোলভাত পরিপাকের শক্তি সকলেরই আছে; কিন্তু দুগ্ধপাচ্য বিচিত্রস্বাদ সমন্বিত আহাব যার পরিপাক শক্তি প্রবল সেই গ্রহণ করবার অধিকারী।

আমার সময়ের অভাবে সংক্ষেপে সারতে হল।

অন্তরের স্নেহ ও শুভেচ্ছা জেন। ইতি—

শ্রীপ্রবালকান্তি হাজরা, এম.এ

তোমার
হিরণ্য বন্দ্যোপাধ্যায়

[দুই]

১ বালিগঞ্জ টেরাস

কলিকাতা-২৯

৪. ৬. ৮২

কল্যাণীয়েষু,

স্নেহের প্রবাল, তোমার দুখানি চিঠি যথা সময়ে পেয়েছি। ‘দক্ষনাবিকে’ দিনেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আগে লেখা দিতে বলেছিলে। আমি দিই নি, তার কারণ, তাঁর সম্বন্ধে এমন তথ্য আমার হাতে নেই যা দিয়ে একটি প্রবন্ধ হতে পারে।

সাগরদ্বীপের পত্রিকার জন্য পূজা সংখ্যায় লেখা দিতে পারব। যথা সময়ে স্মরণ করিয়ে দিও।

এবার তোমার ১৬.৫.৮২ তারিখের পত্রে যে প্রশ্নগুলি উত্থাপন করেছ তার উত্তর দিচ্ছি।

১। আমাদের পিতা-মাতার বহু সন্তান ছিল। ছয় পুত্র ও পাঁচ কন্যা। আমি তাঁদের অষ্টম সন্তান। আমার ওপরে দুই দাদা ছিলেন। মেজদা আমার থেকে বারো বছরের বড় ছিলেন।

২। মুরলীধর গার্লস কলেজ ও স্কুল আমার পিতার নামে চিহ্নিত। তিনি ১৯১৯ এপ্রিল, (বাংলা ১৩২৬ বৈশাখে) বালিগঞ্জ বালিকা বিদ্যালয় নাম দিয়ে তাঁর বাগানবাড়িতে তা প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি আমৃত্যু তার সম্পাদক ছিলেন (১৯৩৩)। প্রাথমিক স্তর হতে তিনি তাকে উচ্চ বিদ্যালয়ে উন্নীত করেন। তাঁর মৃত্যুর পর সেটি কলেজ স্তরে উন্নীত হয়। পরে দুটি প্রতিষ্ঠানই তাঁর নামে চিহ্নিত হয়। তাদের এখন নিজস্ব পৃথক বাড়ি আছে।

৩। আমি স্বভাবত লাজুক এবং আত্মপ্রচার বিমুখ ছিলাম। কাজেই ঘটনাচক্রে যাঁদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য পেয়েছি তাঁদের সহিতই নিবিড় পরিচয়ের দাবী করতে পারি। অবশ্য পরবর্তীকালে প্রতীণ বয়সে কয়েকজন বিখ্যাত মনীষীর পরিচয় লাভ করেছি। তাঁদের নাম নীচে দিচ্ছি:

ডঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। থ্রেসিডেন্সী কলেজে তাঁর কাছে পড়ে তাঁর স্নেহ পেয়েছি। সে স্নেহ তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত স্থায়ী ছিল।

ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের কাছে পড়েছি; কিন্তু ঘনিষ্ঠতা হয়নি। অবশ্য তিনি আমাকে চিনতেন।

কর্মজীবনে ডঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সান্নিধ্য ও স্নেহ পেয়ে ধন্য হয়েছি। পরবর্তীকালে যে তিনজন মনীষী আমার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন তাঁরা হলেন : ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। আদর্শ ভদ্র ও উদারচেতা মানুষ ছিলেন। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার। প্রকৃত জ্ঞানতপস্বী ও সহৃদয় মানুষ ছিলেন।

স্বামী লোকেশ্বরানন্দ — বিরাট কর্মশক্তি, যার নিদর্শন নরেন্দ্রপুর আশ্রম। ভারতীয় দর্শনে গভীর ব্যুৎপত্তি।

এঁদের তিনজনের সঙ্গেই আমার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছিল।

৪। বিলেতে ১৯২৭-২৯ (২৬ মাস ছিলাম)। আই সি এস শিক্ষানবিশ হিসাবে। তখন কেক্সিঙ ও প্যারিস ঘুরে এসেছি। পরবর্তী জীবনে আর বিদেশ যাওয়া ঘটে নি।

৫। কর্ম জীবনে বহু স্মৃতি আছে : মুখে বলতে পারি। ডঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সান্নিধ্য দ্রষ্টব্য।

৬। আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ কাজ পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের সেবা ও পুনর্বাসনের সুযোগ ('উদ্বাস্তু' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)।

৭। দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে দেশের কল্যাণ সম্বন্ধে আমি বিশেষ আশা পোষণ করি

না। না রাজনৈতিক নেতা না সরকারী কর্মচারী বর্তমানে সেবার মনোভাব দ্বারা অনুপ্রাণিত।

৮। শাসন ব্যবস্থার ত্রুটি উপরেই বর্ণনা করেছি। মূল কথা যাঁরা দেশের সেবা করবেন তাঁরা আত্মকেন্দ্রিক এবং কর্তব্যনিষ্ঠ নন। অবশ্য ব্যতিক্রম থাকতে পারে।

৯। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার দুটি ত্রুটি লক্ষণীয় : তা মাথা ভারি। উচ্চশিক্ষার ঢালাও ব্যবস্থা অথচ নিম্নস্তরের শিক্ষা অবহেলিত (২) নৈতিক শিক্ষা বা চরিত্র গঠনের শিক্ষার কোনও ব্যবস্থা নাই।

১০। উন্নয়ন পরিকল্পনার বর্তমানে প্রধান দোষ হল গ্রামের উন্নয়নের সুবিন্যস্ত কোনও পরিকল্পনা নাই। দ্বিতীয় যাঁরা সেবা করবেন তাঁদের সেবার মনোভাব নাই। দেশপ্রেম, মানবিকতা বোধ এবং চারিত্রিক গুণের কর্মীদের মধ্যে একান্তই অভাব। স্বাধীনতার পর তবু উচ্চমানের কর্মী কিছু ছিলেন। এখন তাদের নিতান্তই অভাব। ইতি—

অন্তরের স্নেহ ও শুভেচ্ছা সহ

তোমার

হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

[তিন]

১ বালিগঞ্জ টেরাস

কলিকাতা-২৯

১৬. ৬. ৮৩

কল্যাণীয়েষু,

স্নেহের প্রবাল, অনেকদিন পরে তোমার চিঠি পেয়ে ভাল লাগল।

পার্শ্ব পঞ্চায়েত নির্বাচনে দাঁড়িয়ে সফল হয়নি শুনে দুঃখিত হলাম। রাজনীতিতে অনুকূল হাওয়া বইলে পরে সফল হবে আশা করি। এখন বুঝলাম ‘দক্ষনাবিক’ এত পিছিয়ে পড়ল কেন।

আমার ইংরাজী বই লেখা শেষ হয়ে গেছে। বর্তমান তা যেমন টাইপ হয়ে আসছে তা সংশোধনের কাজে ব্যস্ত আছি। এইভাবে পাণ্ডুলিপি তৈরি করতে বোধ হয় আবও দু-মাস লাগবে। মহাভারতের আলোচনায় নিবেদিত বইখানির পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করা এখন বন্ধ রেখেছি।

এবার তুমি যে প্রশ্নটি উত্থাপন করেছ তার উত্তর দিচ্ছি।

অতি প্রাচীন কাল হতে আমাদের দেশে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা ছিল মনে হয়। সামবেদে ‘সমিতি’ শব্দটির উল্লেখ পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে পঞ্চায়েত রীতি ঐতিহ্যের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল। সরকারের সহিত তার প্রত্যক্ষ সহযোগ ছিল না। তা গ্রামের মধ্যে অনাচার হলে তার প্রতিবিধান, সম্পত্তি নিয়ে বিবাদে মীমাংসা করে দিত। জলাশয় খনন, পথ নির্মাণ প্রভৃতি কাজে সহায় ধনী ব্যক্তির সম্পাদন করতেন।

পঞ্চায়েতী রাজের পরিকল্পনা জহরলাল নেহরুর। বলবন্ত রায় মেহটার সুপারিশে তিন স্তরে পঞ্চায়েত আইন করে স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ষাটের দশকের গোড়ায়। উদ্দেশ্য

গণতন্ত্রকে গ্রামের স্তরে পৌঁছে দেওয়া। তার হাতে ক্ষমতা উন্নয়নের কাজেই সীমাবদ্ধ। তবে গণসংযোগের প্রতিষ্ঠান হিসাবে তার সম্ভাবনা প্রচুর থাকায় রাজনৈতিক দলগুলি সেগুলি দখল করবার প্রতিযোগিতায় লেগেছে। যুক্তি সঙ্গতভাবে বিকেন্দ্রীকরণ সুফল দেবে, তবে প্রতিষেধক ব্যবস্থা না থাকলে দুর্নীতি প্রশ্রয় পাবে।

পঞ্চায়েতী ব্যবস্থার কাঠামো মোটামুটি সমগ্র দেশে একই ধরনের। কারণ তা মেহটা কমিটির সুপারিশ অনুসারে তিন স্তরে স্থাপিত। নাম ভিন্ন হলেও বিন্যাস একই : জেলা স্তর সবার উপরে, তারপর ব্লক স্তর, তারপর গ্রামস্তর। আমাদের পশ্চিম বাংলায় ডঃ বিধানচন্দ্র রায় চারটি স্তর করেছিলেন : জেলা পরিষদ, ব্লক পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি এবং গ্রাম পঞ্চায়েত। তার কারণ বাংলাদেশে তার সমস্থানীয় প্রতিষ্ঠান ইউনিয়ন বোর্ড আগে হতেই প্রচলিত ছিল। অঞ্চল পঞ্চায়েত ইউনিয়ন বোর্ডের সমস্থানীয়। পরে আমাদের সরকারও সর্বভারতীয় বিন্যাসের সহিত সামঞ্জস্য রেখে তিনটি স্তর গ্রহণ করেছে। বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন নাম হলেও বিন্যাস একই।

বাহিরে এরূপ প্রতিষ্ঠান (বাংলাদেশ এবং পাকিস্তান ভিন্ন) আছে বলে আমার মনে হয় না। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে তা স্থাপন করবার অবকাশ নেই। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা আছে, তবে গ্রামের স্তর অবধি আছে বলে আমার জানা নেই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গ্রামের স্তরে উন্নয়নের জন্য Extension Service আছে। তবে তা সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক রীতিতে পরিচালিত হলেও তা গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের দ্বারা পরিচালিত নয়। এটি ব্যক্তিগতভাবে বিশেষজ্ঞদের দ্বারা পরিচালিত হয়।

স্নেহ ও শুভেচ্ছা জেন। ইতি—

তোমার মাস্টারমশাই
হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

[চার]

১ বালিগঞ্জ টেরাস
কলিকাতা-২৯
৩০. ৭. ৮৩

কল্যাণীয়েষু,

স্নেহের প্রবাল, তোমার ১৫.৭ তারিখের চিঠি যথা সময় পেয়েছি। এতদিন উত্তর দিই নি কারণ তুমি তাতে এত প্রশ্ন তুলেছ যার উত্তর দিতে সময় লাগে। সে সময় আমার ছিল না।

‘দক্ষনাবিকে’র বিপর্যয় কাটাবার যে ব্যবস্থা তোমরা করেছ তা জানলাম। তুমি লিখেছ ফান্ডুন-চৈত্র সংখ্যা বেরিয়ে গেছে। আমি তা এখনও পাই নি।

এবার তোমার প্রশ্নগুলির উত্তর দেবার চেষ্টা করব।

১। আজকের দিনের সাহিত্যকে কি গণমুখী সাহিত্য বলব?

আমি বলব প্রধানত তা গণমুখী সাহিত্য নয়। বলা হয় সাহিত্য সমাজ জীবনকে

প্রতিফলিত করে। সে কথা ঠিক; তবে যিনি লেখেন তাঁর পরিবেশেই প্রধানত তাঁর রচনা সীমাবদ্ধ থাকে। সকল কালেই তাই হয়। তবে তা বলে যে নীচের মহলের মানুষের কথা থাকে না, তা নয়। যতখানি তাদের, আলোচ্য সমাজে ভূমিকা আছে ততখানি থাকে। 'হাসুলি বাকের' মত বিশুদ্ধ গণমুখী সাহিত্য ব্যতিক্রম। তারাক্ষর বিশেষ করে পাঞ্চীবাহীদের কথা বলতে চেয়েছিলেন বলে তা সম্ভব। ঠিক বলতে কি বিশুদ্ধ গণসাহিত্য গণমানসই সৃষ্টি করে। তার নিদর্শন লোক সাহিত্য। উপর মহলের সাহিত্যিকদের সাহিত্যে তার বিশুদ্ধরূপ মিলবে না।

২। প্রাচীন যুগে সংস্কৃত ভাষার প্রয়োগ কতখানি ব্যাপক ছিল?

বেদের যুগে বৈদিক ভাষা প্রচলিত ছিল। সংস্কৃত ভাষা তা হতে উদ্ভূত। আমাদের আঞ্চলিক ভাষাগুলি (যেমন বাংলা, হিন্দী) গড়ে উঠেছে প্রাচীন কালের মৌখিক ভাষা (প্রাকৃত) এবং সংস্কৃতের মিশ্রণে। সেই অর্থে সংস্কৃতকে আমাদের বাংলা ভাষার দিদিমা বলতে পারি।

সংস্কৃতের বেদের সংহিতা রচনার পরবর্তী সময়ে কথ্য ও লেখ্য ভাষা রূপে ব্যবহার অন্তত উত্তর ভারতে প্রচলিত ছিল মনে হয়। সংস্কৃতে মুখস্থ করা প্রাধান্য দেওয়া হত সীমিত ক্ষেত্রে। শাস্ত্রগুলির জ্ঞান মনে ধরে রাখবার জন্য তার ব্যবস্থা। তার কারণ সেকালে ছাপাখানা ছিল না। বিখ্যাত গ্রন্থ পুঁথি আকারে নির্দিষ্ট সংখ্যায় রক্ষিত হত। তার অর্থ এই নয় যে সংস্কৃতের কথ্য রূপকে প্রাধান্য দেওয়া হত না। সেকালে গ্রন্থ ত প্রধানত সংস্কৃতে রচিত হতই, অতিরিক্তভাবে মার্জিত মহলে সংস্কৃতই কথ্য ভাষা রূপে ব্যবহৃত হত। সংস্কৃত নাটকগুলি তার নিদর্শন। বিলাতে যেমন Standard English আছে, তেমন সংস্কৃত তখন সর্বভারতীয় Standard language ছিল। বেরিডেল কীথ এই প্রতিপাদ্যের সমর্থন করেন। এমন কি মুসলমান রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবার আগে পর্যন্ত এই রীতি ভারতে প্রচলিত ছিল।

৩। সংস্কৃত মন্ত্র তন্ত্র লোকাচার কেন্দ্রিক মন্ত্র কবে সৃষ্টি হয়?

সংস্কৃত মন্ত্রের প্রকৃতি বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন রকম ছিল। দেবতাদের সম্বন্ধে ধারণা বা আনুষ্ঠানিক উপাসনা, রীতির পরিবর্তনের সঙ্গে তা পরিবর্তিত হয়েছে। বৈদিক যুগে বেদের সূক্তের অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রগুলির সৃষ্টি হয়। পৌরাণিক যুগে ভক্তিবাদ প্রতিষ্ঠিত হলে দেবতাদের উপাসনার জন্য বিভিন্ন মন্ত্র বা স্তোত্র রচিত হয়। তান্ত্রিকদের জন্য বিশেষ বীজ মন্ত্র সৃষ্টি হয়। লোকাচার ভিত্তিক মন্ত্র কি আছে? অন্তত সংস্কৃতে আছে বলে আমার জানা নেই। ধর্মঠাকুর বা ইশ্বরের পূজায় যে মন্ত্র উচ্চারণ করা হয় তা সম্ভবত লোক সাহিত্যের অঙ্গ এবং মধ্যযুগে উদ্ভূত হয়েছে।

৪। তুর্কী আমলে কি করে সংস্কৃত টিকে থাকল?

যে কারণে হিন্দুটিকে থাকল সেই কারণে টিকে থাকল। সারা ভারত কোনকালেই মুসলমানের অধীন হয়নি। দ্বিতীয়ত মুসলমান শাসক সাধারণত হিন্দুর ধর্ম আচরণে বা নিষেধ রীতিতে জীবন যাপনে বাধা দিত না। তার একটি বিশেষ কারণ ছিল। যত বেশী-অমুসলমান প্রজা থাকবে তত বেশী জিজিয়া কর মিলবে। রাজভাণ্ডারে পূজো

দিতে হিন্দুর সংখ্যা বেশী থাকা বাঞ্ছনীয় ছিল। দ্বিতীয়ত হিন্দুর স্বধর্মে আকর্ষণ তীব্র এবং উপরের মহলে ইসলাম ধর্মীর প্রতি ঘৃণার মনোভাব ক্রিয়াশীল ছিল। সেই কারণে ভারতে মুসলমান রাজনৈতিক ক্ষমতায় শত শত বৎসর আসীন থাকলেও হিন্দু সংখ্যা গরিষ্ঠ সম্প্রদায় রয়ে গেছে। অন্যত্র প্রায় সকলেই ইসলাম গ্রহণ করেছে। আমাদের দেশে শাসকের পৃষ্ঠপোষকতা ও অবনমিত শ্রেণীর প্রতি অবহেলাই ভারতীয়দের ইসলাম ধর্মে আকৃষ্ট করেছে।

৫। ভারতের সব ভাষারই কি সংস্কৃত জ্ঞানী?

তা নয়। উত্তর ভারতের ভাষাগুলি এমন কি মহারাষ্ট্রের ভাষা সংস্কৃত হতে উৎপন্ন। অবশ্য আঞ্চলিক ভাষা (প্রাকৃত) হতে তাদের বিকাশ। প্রাকৃতগুলি স্থানীয় কথ্য ভাষারূপে প্রচলিত ছিল। তবে প্রাকৃত সাহিত্যও আছে। যেমন আমাদের মেদিনীপুরের কথ্য ভাষা এক রকম, দিনাজপুরের কথ্যভাষা অন্যরকম। তবে দক্ষিণের চারটি ভাষা (তামিল, তেলুগু, মালয়ালাম, কানারী) ভিন্ন গোষ্ঠীর ভাষা ছিল। তাহলেও এই ভাষাগুলি বহু সংস্কৃত শব্দ গ্রহণ করে পুষ্ট হয়েছে। সংস্কৃতে বর্ণমালার যে বিন্যাস আছে উত্তর ভারতের সকল ভাষা তা গ্রহণ করেছে। দক্ষিণের ভাষা গুলির মধ্যে আমি যতদূর জ্ঞানি তামিল ভিন্ন অন্যগুলিও তা গ্রহণ করেছে।

৬। সংস্কৃত ভাষা ওজস্বিনী হওয়া সত্ত্বেও কেন টিকছে না।

তার মূল কারণ যাকে বলে বিশ্বের নিয়ম হল Old order changeth yielding place to the new ব্যক্তি মানুষের মত ভাষা বিকশিত হয় এবং লোপ পায়। তবে তার প্রভাব পরবর্তী ভাষার সঞ্চারিত করে যায়। সংস্কৃতের ক্ষেত্রে যা হয়েছে লাতিন ভাষায় তাই হয়েছে। লাতিন ভাষা নতুন পরিবর্তিত রূপে ইতালীয়, ফরাসী, স্পেনীয় প্রভৃতি ভাষার সৃষ্টি করে নিজে দিদিমার আসন গ্রহণ করেছে। আমাদের দেশে সংস্কৃতের ও সেই দশা ঘটেছে।

তুমি বলেছ বাংলা ভাষার ব্যাকরণ কেন সংস্কৃতের মত হবে? তা বদলান যায় না কি? প্রথমটির উত্তর হল, যেহেতু সংস্কৃত হতে বাংলা বিকাশিত তা সংস্কৃতের বিন্যাস উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে। তা বদলান তার পক্ষে সম্ভব নয়। তবু আধুনিক বাংলা ব্যাকরণে সংস্কৃত বিধি কিছু লঙ্ঘিত হচ্ছে, বিশেষ করে বানানের ক্ষেত্রে। না করলেও চলত। কোনও মানুষ যে প্রজাতি হতে জন্মগ্রহণ করে তার আকৃতি সে পায়। নরীক জাতির মানুষ সাদাটে চুল আর নীল চোখ আর গৌরবর্ণ পায়। সে ইচ্ছা করলেও কালো চুল, কালো চোখ বা শ্যাম বর্ণ পাবে না। তবে ইচ্ছা করলে সে পাশ্চাত্য পোষাক না পরে অন্য জাতির পোষাক পরতে পারে। এও সেই রকম। মৌলিক বিষয়ে পরিবর্তন সম্ভব নয়, সীমিত ক্ষেত্রে সম্ভব, কিন্তু তা গৌণ বিষয়।

আশা করি তোমার সকল প্রশ্নের উত্তর মিলেছে। এখানেই শেষ করছি। অন্তরের স্নেহ ও শুভেচ্ছা জেনো। দাশ দম্পতীকে জানিও। ইতি—

তোমাদের মাস্টারমশাই

হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

ଓଡ଼ିଆ ଶିଳ୍ପୀ,
କଳାକାର - ୧୯୯୯
୧-୧-୮୯

କଳାକାର,

ଆଜିର ସମୟ, ଯେଉଁଠି ୧୦/୮/୯୯ ଓଡ଼ିଆ
ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେଉଛି। ଯାହାର ଫଳ ହେଉଛି ଫିଲ୍ମ
ଦେଖି ହେଉଛି।

ଫିଲ୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଓଡ଼ିଆ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କର 'ଓଡ଼ିଆ'।
ଓଡ଼ିଆ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କର ଫିଲ୍ମ ହେଉଛି। ଯେଉଁଠି ଓଡ଼ିଆ
ଫିଲ୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଓଡ଼ିଆ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କର ଫିଲ୍ମ ହେଉଛି।

ଏହା ଓଡ଼ିଆ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କର ଫିଲ୍ମ ହେଉଛି।

ଓଡ଼ିଆ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କର ଫିଲ୍ମ ହେଉଛି। ଯେଉଁଠି ଓଡ଼ିଆ
ଫିଲ୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଓଡ଼ିଆ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କର ଫିଲ୍ମ ହେଉଛି।
ଓଡ଼ିଆ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କର ଫିଲ୍ମ ହେଉଛି। ଯେଉଁଠି ଓଡ଼ିଆ
ଫିଲ୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଓଡ଼ିଆ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କର ଫିଲ୍ମ ହେଉଛି।
ଓଡ଼ିଆ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କର ଫିଲ୍ମ ହେଉଛି। ଯେଉଁଠି ଓଡ଼ିଆ
ଫିଲ୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଓଡ଼ିଆ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କର ଫିଲ୍ମ ହେଉଛି।

ଓଡ଼ିଆ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କର ଫିଲ୍ମ ହେଉଛି। ଯେଉଁଠି ଓଡ଼ିଆ
ଫିଲ୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଓଡ଼ିଆ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କର ଫିଲ୍ମ ହେଉଛି।

ଓଡ଼ିଆ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କର ଫିଲ୍ମ ହେଉଛି। ଯେଉଁଠି ଓଡ଼ିଆ
ଫିଲ୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଓଡ଼ିଆ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କର ଫିଲ୍ମ ହେଉଛି।

ପିଲାଟିଏ ମଧୁହିନୀ । ଆମେ ତାହାକୁ ବିଷୟ ନିଆଁ । ତେଣୁ
ମନେ ପଡ଼ିଲା ମଧୁହିନୀ ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ମଧୁହିନୀ ।
ଐଶ୍ବର୍ୟ କାନ୍ତି ତ କେବଳ ମଧୁହିନୀ ହିଁ । ଶାନ୍ତି କହ
ହେଉ ଏ ଶୃଙ୍ଖଳା ଐଶ୍ବର୍ୟ ଏକ ଅମିୟାବତ ମନେ
ହେଉ ହିଁ ଏ ଏକ ଏକାକି ହେଉ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଶାନ୍ତି
ଦିଶୁଛି ହିଁ । ଶାନ୍ତି ଦିଶୁଛି, ମନେ ହେଉ,
ମିଶ୍ରଣ ଶାନ୍ତି - ଏକାକି ହେଉ ନା ବିଷୟ ଦିଶୁଛି
ମିଶ୍ରଣ ହେଉଛି ଶୃଙ୍ଖଳା ଐଶ୍ବର୍ୟ ଏକାକି ହେଉ ଶାନ୍ତି
ମାନିଷ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି - ଶାନ୍ତି
ମାନିଷ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ।

ଆମେ ମାନିଷ ମାନିଷ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଏକାକି ହେଉ
ହେଉ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି । ଏକାକି ହେଉ
ଏକାକି ହେଉ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ।

ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ମନେ ଏକାକି ହେଉ ଏକାକି ହେଉ ।
ତେଣୁ ଶାନ୍ତି, ମାନିଷ ଏକାକି ହେଉ ଆମେ ଶାନ୍ତି
'ଶୃଙ୍ଖଳା' ଶାନ୍ତି 'ଶୃଙ୍ଖଳା' ଆମେ ଶାନ୍ତି
ଏକାକି ହେଉ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଏକାକି ହେଉ ଶାନ୍ତି
ଏକାକି ହେଉ 'ଶୃଙ୍ଖଳା' 'ଶୃଙ୍ଖଳା' ଏକାକି ହେଉ ।
ଏକାକି ହେଉ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ।

ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ।

ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ।

ଶାନ୍ତି

ଶାନ୍ତି

ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି

ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି

[পাঁচ]

১ বালিগঞ্জ টেরাস

কলিকাতা-২৯

৮. ৯. ৮৩

কল্যাণীয়েষু,

স্নেহের প্রবাল, তোমার ২০.৮.৮৩ তারিখের চিঠি যথা সময় পেয়েছি। কাজের চাপে উত্তর দিতে দেরী হল।

তুমি সংস্কৃতে দক্ষিণের প্রতিশব্দ ‘অবাচী’ আবিষ্কার করেছ জেনে সুখী হলাম। সংস্কৃত অভিধানে তার সমর্থন পেয়েছি। তোমার কাছে একটি নূতন শব্দ শিখলাম।

এবার তোমার প্রশ্নগুলির উত্তর দিচ্ছি।

আমি রবীন্দ্রনাথকে কয়েকবার দেখেছি। সবই প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়বার সময়। একবার তাঁকে ভাষণ দেবার জন্য আমন্ত্রণ করা হয়। তখন খুব কাছ হতে দেখেছি। আমাদের সহপাঠীরা পূজার ছুটির আগে একটি করে রবীন্দ্রনাথের রচিত নাটক মঞ্চস্থ করত। অভিনয়ের সময় তিনি দর্শকরূপে উপস্থিত থাকতেন। তখন তাঁকে একাধিকবার দেখেছি।

আমি লাজুক স্বভাবের বালক ছিলাম। তাই সুযোগ সত্ত্বেও তাঁর সহিত আলাপ করবার সাহস পাই নি।

রবীন্দ্রনাথকে আমার ভাল লাগবার অনেক কারণ। পুরাণের গল্পে আছে দেবতারা তিল তিল করে সকল সৌন্দর্য আহরণ করে একত্রিত করে তিলোত্তমা গড়েছিল। আমার ধারণা বিশ্ব-শিল্পী তেমন সকল উত্তম পদার্থ একত্র করে রবীন্দ্রনাথকে গড়েছিলেন। তাঁর দেহের কান্তি ত অনন্যসাধারণ ছিলই। অধিকন্তু হৃদয় ও মনীষায় তাঁর মধ্যে এমন মণিকাঞ্চন সংযোগ ঘটেছিল যে এমন একটি মানুষকে পেয়েছিলাম যার দ্বিতীয় মিলবে না। সাহিত্য কীর্তি, সংগঠন ক্ষমতা শিক্ষণের সাধনা — কোন ক্ষেত্রে না তিনি কীর্তির শিখরে উঠেছেন! সর্বোপরি তাঁর বাণীর মধ্যে উপনিষদের বাণীর বর্ণাঢ্যতর ভাষায় প্রতিধ্বনি পাই — যার পাবনী শক্তির তুলনা হয় না।

আমার সাহিত্যিক সাধনায় রবীন্দ্রনাথের অখণ্ডতার দৃষ্টিভঙ্গি বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে। তা আমাকে একদেশদর্শিতা দোষ হতে মুক্ত রেখেছে।

রবীন্দ্রনাথের সকল প্রকার রচনাই ভাল লাগে। তবে তাঁর কবিতা, সঙ্গীত এবং নৃত্যনাট্য আমার বিশেষ প্রিয়।

‘রবীন্দ্রচর্চা’ ও ‘জীবনচর্চা’ আমার মতে বিভিন্ন বস্তু। রবীন্দ্রনাথের বিরূপ কীর্তি ও জীবনী সম্বন্ধে আলোচনা হবে ‘রবীন্দ্রচর্চা’। ‘জীবনচর্চা’ একটি সার্বিক সংজ্ঞা। তা বোঝায় নিজের জীবনকে সার্থকভাবে গড়ে তোলা।

আমাদের খবর মোটামুটি ভাল

আশা করি তুমি ভাল আছ। ইতি—

ড. প্রবালকান্তি হাজরা

তোমার মাস্টারমশাই

হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

[ছয়]

১ বালিগঞ্জ টেরাস

কলিকাতা-২৯

৩০. ১২. ৮৩

কল্যাণীয়েষু,

স্নেহের প্রবাল, তোমার ৫.১২.৮৩ তারিখের চিঠি যথ্য সময় পেয়েছি। দুর্ভাগ্যক্রমে গত ১০.১২.৮৩ হতে আমি গুরুতর ভাবে পীড়িত হয়ে পড়ি। গত ২৫.১২.৮৩ হতে আমি বিছানা ছাড়তে অনুমতি পেয়েছি। তাই উত্তর দিতে এত দেরী হল।

বুঝতেই পারছি স্থানীয় পত্রিকার জন্য আমার রচনা পাঠান বর্তমানে সম্ভব নয়। যদি কোনও সূত্রে কলিকাতায় আস, নিশ্চয়, দেখা করে যেও। অনেকদিন তোমাকে দেখিনি।

প্রায় একমাস আগে পার্থ একদিন এসেছিল। সেও বলে গেছে 'দক্ষ নাবিকের' এখন দুঃসময় চলছে। তবে আশা করবো ডিসেম্বরের পর হতে অবস্থা ভালর দিকে মোড় নিতে পারে।

এবার রবীন্দ্র সঙ্গীত সম্বন্ধে যে প্রশ্ন তুলেছ তার সংক্ষেপে উত্তর দেব। এ বিষয়ে আমার রচিত রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত গ্রন্থ 'রবীন্দ্র শিল্পতত্ত্বে' বিস্তারিত আলোচনা আছে। আমি সংক্ষেপে মর্মকথা এখানে দিচ্ছি।

সঙ্গীতের দুটি রূপ আছে। একটি হল বিমূর্ত রূপ। সেখানে ভাবের সহিত সুরের কোনও সংযোগ নাই। তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ যন্ত্র সঙ্গীত। সেখানে বিভিন্ন সুরের সঙ্গতি ফুটিয়ে সঙ্গীত রচিত হয়। কণ্ঠ সঙ্গীতেও তা সম্ভব। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের আলাপ শ্রেণীর সঙ্গীত তার উদাহরণ।

সঙ্গীতের আর একটি রূপ আছে যেখানে স্বরের সঙ্গে ভাবের সঙ্গতি ফুটিয়ে শিল্প রচিত হয়। বিমূর্ত রূপটি যেন সঙ্গীতের কুমার রূপ। তার যুক্ত রূপটি যেন তার বিবাহিত রূপ। এই রূপ স্বাভাবিক ভাবে কণ্ঠ সঙ্গীতের আশ্রয়ে গড়ে ওঠে।

বাজালীর নিজস্ব সঙ্গীতে — যেমন ভাটিয়ালি, কীর্তন, বাউল সঙ্গীত সঙ্গীতের এই ভাবের সহিত স্বরের মিলিত রূপটি বিশেষ পরিস্ফুট। বরং এখানে সুরের থেকে ভাবের প্রাধান্য বেশী।

অপরপক্ষে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে ভাবের থেকে সুরের প্রতি পক্ষপাত বেশী। সুরের বৈচিত্র্য এবং তালই সেখানে প্রাধান্য পায়। ধ্রুপদ সঙ্গীতে কিছু অর্থবহ বাণী থাকে; কিন্তু তা গৌণ ভূমিকা পালন করে। তাকে অবলম্বন করে ওস্তাদ যে সুর সাধনায় চূড়ান্ত দক্ষতা দেখায় তাই সেখানে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। একথা খেয়াল সম্বন্ধে আরও প্রযোজ্য। এই পক্ষপাত হেতুই হিন্দুস্থানী মার্গ সঙ্গীতে বিমূর্ত কণ্ঠ সঙ্গীত সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছে।

এইভাবে কণ্ঠ সঙ্গীতে ভাবের প্রাধান্য বেশী হবে না সুরের প্রাধান্য বেশী হবে এই নিয়ে এক দ্বন্দ্ব এসে পড়ে। এই দৃষ্টিভঙ্গি হতে দেখলে রবীন্দ্র সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য ভাল রকম হৃদয়ঙ্গম করা যায়। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত চিন্তা এই সুর ও ভাবের প্রতিযোগিতার ভিত্তিতেই বিকাশ লাভ করেছে এবং পরিণতিতে তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে তার পরিপূর্ণ রূপটি পেয়েছে।

সুতরাং রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত চিন্তা বিকাশধর্মী। এই চিন্তা তিনটি অবস্থার মধ্যে দিয়ে পরিণতিলাভ করেছে। তরুণ বয়সে রবীন্দ্রনাথের ধারণা ছিল হিন্দুস্থানী সঙ্গীত সংস্কৃত ভাষার মত মৃত। তা সুরকে প্রাধান্য দিয়ে প্রাণ হারিয়েছে। প্রৌঢ় বয়সে তাঁর সে মত পরিবর্তিত হয়েছে। তিনি বলেছেন সঙ্গীতের আদর্শরূপ তার বিমূর্তরূপে পাই। সুতরাং হিন্দুস্থানী সঙ্গীতই প্রকৃত সঙ্গীত। পরিণত বয়সে যে মতটি পরিবর্তিত হয়েছে। তিনি বলেছেন সুর ও ভাবের সামঞ্জস্যের মধ্যেই শ্রেষ্ঠ প্রকাশ। তাদের সম্পর্ক হবে ‘অর্দ্ধনারীশ্বরের’ সম্পর্ক। কেহ বড় নয়, কেহ ছোট নয়। উভয়ে পরস্পরের পরিপোষক। তাই তিনি ‘সুর ও ভাবের মিলনকে’ সঙ্গীত সাধক হিসাবে পেতে তাঁর জীবনের ব্রত বলে গ্রহণ করেছেন।

রবীন্দ্র সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্যও এইখানে। তাতে ভাবের সঙ্গে সুরের এমন সামঞ্জস্য স্থাপিত হয়েছে যে উভয়েই উভয়ের উৎকর্ষ সাধনে সহায়তা করেছে। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই তিনি স্বরচিত সঙ্গীতে নিজেই সুর দিতেন। বিষয়টিতে তিনি এত গুরুত্ব আরোপ করতেন বলেই তিনি তাঁর সঙ্গীত সম্বন্ধে অত্যধিক স্পর্শকাতর ছিলেন। তিনি চাইতেন না তাঁর দেওয়া সুর যেন পরিবর্তিত করা হয়।

অন্তরের স্নেহ ও শুভেচ্ছা জেন। ইতি—

তোমার মাস্টারমশাই
হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

[সাত]

১ বালিগঞ্জ টেরাস
কলিকাতা-২৯
১৮. ২. ৮৪

কল্যাণীয়েষু,

স্নেহের প্রবাল, তোমার ১৩/২ তারিখের চিঠি পেয়ে খুশী হয়েছি।

পার্থের সঙ্গে সম্প্রতি দেখা হয়নি। হয়ত সে সম্প্রতি এসে থাকবে কিন্তু দেখা না পেয়ে ফিরে গিয়েছে। কারণ, আমি জানুয়ারীর শেষেও মারাম্মক অসুখে পড়েছিলাম এবং আমাকে ১৫ দিন কারও সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হয়নি। এখন এক প্রকার ভাল আছি।

তোমার গবেষণা-নিবন্ধের সংক্ষিপ্ত রূপ ‘উদীচী’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে জেনে খুসী হলাম। নিবন্ধ পুস্তক বিশ্ববিদ্যালয় হতেই ছাপান উচিত। এ বিষয়ে UGC কোনও আর্থিক সাহায্য দেয় কিনা খবর নিতে পার।

এবার তোমার প্রশ্নের উত্তর দেব। তুমি প্রশ্ন করেছ আমাদের সময় Integrated development বলে কিছু ছিল কিনা। আমার অভিজ্ঞতায় তা ছিল। এমন কি রবীন্দ্রনাথের শ্রীনিকেতনের পরিকল্পনায়ও তা ছিল। তার কারণ আমাদের গ্রামগুলির অবস্থা পুরাতন রোগীর মত। নানা ব্যাধি জটিলতার সৃষ্টি করেছে। তাই সর্বাঙ্গক চিকিৎসা প্রয়োজন। তাই আমাদের পরিকল্পনায় এক সঙ্গে, কৃষি, কুটিরশিল্প, যাতায়াতের রাস্তা, পশুপালন বিদ্যা,

নিরক্ষরতা দূরীকরণ ইত্যাদির ব্যবস্থা ছিল। আমরা অবশ্য Integrated development বা Comprehensive development কথার ব্যবহার করতাম না। আমরা বলতাম Simultaneous tackling of all problems-এ বিষয় আমার গ্রন্থ Experiments in Rural Reconstruction-এ বিস্তারিত আলোচনা আছে। সম্ভবত বইখানি তোমার কাছে আছে।

আমার ধারণায় গ্রামের উন্নতি সাধনে শুধু সামগ্রিক সমাধানের চেষ্টা যথেষ্ট নয়, গ্রামের উন্নয়নকে ব্রতের মত গ্রহণ করতে হবে। তবেই প্রয়োজনীয় মানসিক প্রস্তুতি হবে। রবীন্দ্রনাথ এ বিষয় অবহিত ছিলেন; তাই গ্রামের তরুণদের শক্তিকে ব্যবহারের জন্য ব্রতীদল গঠন করেছিলেন। পরিকল্পনা কমিশনের পরিকল্পনায় সমাজ সচেতনতা শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল; কিন্তু তার সম্বন্ধে কর্মীদের সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না। আমি এ বিষয় কর্মীদের উদ্বুদ্ধ করতে চেষ্টা করেছিলাম, ব্রতীর মনোভাব গড়ে তুলতে চেষ্টা করে। তবে আমি চলে আসার পর এ বিষয়টির উপর বিশেষ নজর পড়েনি। আমার 'গ্রাম সেবার স্মৃতিকথায়' এ বিষয় উল্লেখ করেছি।

রামায়ণ সম্বন্ধে আমার সমালোচনা মূলক গ্রন্থখানির অবশেষে প্রকাশক জুটেছে। সম্ভবত এই বছরেই বই ছাপা হয়ে যাবে। এই বইখানি তুমি 'দেহ পাবলিকেশন'কে নিতে অনুরোধ করেছিলে। বইখানি পার্থ ও তোমাকে উৎসর্গ করেছিলাম।

অন্তরের স্নেহ ও শুভেচ্ছা জেন। ইতি—

তোমার মাস্টারমশাই
হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

[আট]

১ বালিগঞ্জ টেরাস
কলিকাতা-২৯
২৯. ৩. ৮৪

কল্যাণীয়েষু,

স্নেহের প্রবাল, তোমার ১৪.৩.৮৪ তারিখের চিঠি যথা সময় পেয়েছি। আমি গত তিন সপ্তাহ যাবৎ সুস্থ আছি। এমন অনেক মাস ঘটে নি। হয়ত এবার কিছুদিন সুস্থ থাকব।...

এবার তুমি যে প্রশ্নটি উত্থাপন করেছ তার উত্তর দিতে চেষ্টা করব। প্রশ্ন হল গ্রন্থে উৎসর্গ পত্র সংযোজনের রীতি কিভাবে এবং বাংলা সাহিত্যে কবে থেকে প্রচলিত হল। আমি এ বিষয় অনুসন্ধান করে যে সিদ্ধান্ত উপনীত হয়েছি তা নীচে স্থাপন করলাম। তুমিও অনুসন্ধান করে দেখতে পার আমার সিদ্ধান্ত কতখানি ঠিক হল।

সেকালের সাহিত্যে উৎসর্গ করার রীতি প্রচলিত ছিল না। হয়ত তাব কারণ হল পরিবেশ অনুকূল ছিল না। তখন হস্ত লিখিত পুথির আকারে গ্রন্থ সংরক্ষিত হত; কাজেই হাতে হাতে ঘুরতে পেত না। সেক্ষেত্রে উৎসর্গ সার্থক হবে কি করে?

দেখা যায় উইলিয়ম ক্যান্টন পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইংরাজী বই ছাপার প্রথম ব্যবস্থা করেন। তার পরেই দেখি সেন্সপীয়ার তাঁর কয়েকটি গ্রন্থে উৎসর্গ পত্র সংযোজন করেছেন। যেমন

'Venus and Adonis' এবং 'The Rape of Lucrece' Earl of Southampton কে উৎসর্গ করা হয়েছে।

Sonnets W.H.All-কে উৎসর্গ করা হয়েছে। কাজেই ছাপার প্রযুক্তিবিদ্যা আয়ত্ত হবার পর তার জন্য অনুকূল পরিবেশ রচিত হয়েছিল মনে হয়।

মনে হয় বাংলা সাহিত্যে উৎসর্গ রীতি প্রবর্তনের কৃতিত্ব রবীন্দ্রনাথের। তাঁর রচিত 'বুদ্ধচন্দ' তিনি জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে উপহার দেন। 'ভগ্নহৃদয়' তিনি কাদম্বরী দেবীকে উপহার দেন। উভয় গ্রন্থই ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত। এখানে কাদম্বরীদেবীকে 'শ্রীমতী হে' বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। শুনছি 'হেকেটি' নামে চরিত্রের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন বলে তাঁর এই নাম।

অন্তরের স্নেহ ও শুভেচ্ছা জেন। ইতি—

তোমার মাস্টারমশাই
হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

[নয়]

১ বালিগঞ্জ টেরাস
কলিকাতা-২৯
২৮. ৪. ৮৪

কল্যাণীয়েষু,

স্নেহের প্রবাল, তোমার চিঠি সহ 'দক্ষনাবিক'র ৪টি সংখ্যা একত্র পেয়েছি। 'দক্ষনাবিক'কে জাগিয়ে তুলতে পেরেছ দেখে খুশী হয়েছি।

আমি এখনও ভাল রকম সুস্থ হইনি। এ মাসেও কঠিন রোগে পড়েছিলাম (Viral Pneumonia)। তার ওপর নূতন বই লেখার ফরমাস পেয়েছি। একটি থিসিসও এসেছে। বুঝতে পারছ আমার অবস্থা। কর্মক্ষমতা আরও সংকুচিত হয়ে পড়েছে। কাজেই 'বর্তমান সাগরে'র জন্য এখন লেখা দিতে পারব না। কাজ হাঙ্কা হলে তোমার ইচ্ছা পূরণ করতে চেষ্টা করব।

শিবপ্রসাদ বাবু সম্মানে ভূষিত হওয়ায় আনন্দিত হয়েছি।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর কৃষিবিদ্যার সার্থক ব্যবহার করতে পেরেছিলেন বলে মনে হয় না। দেশে ফিরে কয়েক বছর শিলাইদহে খামার করেছিলেন। তারপর শান্তিনিকেতন বড় হয়ে উঠলে পিতা তাঁকে সেখানে এনে বসান। আমার জ্ঞাতসারে শান্তিনিকেতনে তিনি কৃষি বিষয়ক কোনও প্রচেষ্টা করেন নি, প্রশাসনিক কাজে পিতার সহায়তা করতেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় বিলাতে কৃষি বিদ্যা শিখে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়েছিলেন। কৃষি বিদ্যার কোনও চর্চা তিনিও করেননি। তবে কুষ্টিয়া থাকা কালে তিনি শিলাইদহ খামারে রবীন্দ্রনাথের কৃষিকার্যে কিছু সহায়তা করেছিলেন জানি।

অন্তরের স্নেহ ও শুভেচ্ছা জেন। ইতি—

তোমার মাস্টারমশাই
হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

পত্র লেখক ও পত্রে উল্লিখিত বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য

মনীষী হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯০৫ খৃস্টাব্দের ৫ সেপ্টেম্বর কলকাতায় জন্মেছিলেন। পরাধীন ভারতবর্ষের প্রশাসনিক কাজে তিনি একজন দক্ষ আই. সি. এস. অফিসার ছিলেন। কৃত্তী ছাত্র, দক্ষপ্রশাসক ও সাহিত্যানুরাগী হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় কর্মজীবনে বহু গুরুত্বপূর্ণ পদে কাজ করেছিলেন। ১৯২৯ থেকে ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মহকুমা শাসক, জেলাশাসক, জেলা জজ হিসাবে বাংলাদেশের নানা মহকুমা ও জেলায় কাজ করেছেন। স্বাধীন ভারতে ১৯৪৯-এর জুন থেকে ১৯৫৫ খৃস্টাব্দের নভেম্বর মাস পর্যন্ত উদ্বাস্ত পুনর্বাসন বিভাগের মহাধ্যক্ষ হিসাবে কাজ করেছেন। ১৯৫৫-র নভেম্বর থেকে ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উন্নয়ন বিভাগের মহাধ্যক্ষ ছিলেন। ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দের মে মাস থেকে ১৯৬৮-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত তিনি ছিলেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। সাহিত্য-সংস্কৃতি ও দর্শন বিষয়ক প্রায় চল্লিশটি গ্রন্থের রচয়িতা তিনি। কর্মজীবনের শেষ পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসক ও শিক্ষক হিসাবে তাঁর ভূমিকা ও কৃতিত্ব চির গৌরবে আসীন করে রেখেছে তাঁকে।

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্র হিসাবে, ১৯৬৮ খৃস্টাব্দের গোড়া থেকেই হিরণ্ময়বাবুর সান্নিধ্যে আসি আমি। তিনি নিয়মিত আমাদের ক্লাসে পড়াতেন। সেই সূত্রেই ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ এবং আমৃত্যু হিরণ্ময় বাবুর সঙ্গে এই শিক্ষক-ছাত্র সম্পর্ক অটুট ছিল। চিঠিতে নিয়মিত যোগাযোগ থাকায় তিনি উত্তর দিতেন এবং পত্রপ্রাপক সম্পাদনা সূত্রে দু'তিনটি সাহিত্য পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত থাকায় লেখাও পাঠাতেন। তাঁর ৬৬টি চিঠি আছে। শেষ চিঠিটি মৃত্যুর চারদিন ১০.৭.১৯৮৫ আগে আমাকে লিখেছেন। এখানে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি চিঠি প্রকাশ করা হল।

পত্র : ১ হিরণ্ময়বাবুকে পত্রের মাধ্যমে নানা সময়ে নানা প্রশ্ন করা হয়েছে। পত্রেই তিনি সেগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়েছেন।

পত্র : ২ দক্ষনাবিক — পূর্ব মেদিনীপুর জেলাব খেজুরী থানা থেকে প্রকাশিত সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক মাসিক পত্রিকা।

দিনেন্দ্রনাথ — দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লেখার অনুবোধ ছিল। সাগবদীপেব পত্রিকা আমাব কর্মস্থল মনসাবীপ বামকৃষ্ণ মিশন, ঐখান থেকে প্রকাশিত হতো বর্তমান সাগর নামে একটি সাহিত্য ত্রৈমাসিক।

পত্র : ৩ খেজুরী — খেজুরী থানা থেকে প্রকাশিত সপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

যা দেখেছি — হিরণ্ময়বাবুর কর্ম জীবনের স্মৃতি নিয়ে লেখা গ্রন্থ।

আদি কাব্য বামায়ণ — বামায়ণ বিষয়ে হিবন্ময় বাবুর আলোচনা গ্রন্থ।

সন্তোষকুমার দে — ববিবাসরেব সম্পাদক।

পত্র : ৩ পার্শ্ব — দক্ষনাবিক ও খেজুরী পত্রিকার সম্পাদক এবং হিরণ্ময় বাবুর ছাত্র পার্শ্বসারথি দাশ।
মহাভারতের আলোচনা — 'মহৎকাব্য মহাভারত' নামে লিখিত বই।

পত্র : ৭ উদীচী — শান্তিনিকেতন থেকে বীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদিত সাহিত্য পত্রিকা।

পত্র : ৯ বর্তমান সাগর — সাগরদ্বীপ থেকে প্রকাশিত সাহিত্য ত্রৈমাসিক পত্রিকা, সম্পাদক ব্যোমকেশ মাইতি।

শিবপ্রসাদ বাবু — বিখ্যাত কৃষি বিজ্ঞানী বোড়ালের শিবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাঁকে বলেছিলেন 'বারিবাক্স অফ মডার্ন ইন্ডিয়া'। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানসূচক ডি.এস-সি প্রদান করে '১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে।

রথীন্দ্রনাথ — রথীন্দ্রনাথের পুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

প্রবালকান্তি হাজরা

সিডিবদ্ধ রবীন্দ্রনাথ

অশোক মুখোপাধ্যায়

সিডি শব্দটা বাজারে খুব চলছে, পুরো কথাটা হল কম্প্যাঙ্ক ডিস্ক। ৪.৬ ইঞ্চি ব্যাসের রূপোলি ও চকচকে দেখতে প্লাস্টিকের চাকতি। সবাই দেখেছেন। হাতে নিলে রামধনুর রং খেলে যায়। সিডিতে সব কিছুই—লেখা, ছবি, শব্দ রেকর্ড করে রাখা যায় ও উদ্ধার করা চলে। এর মধ্যে কোনো নতুন কথা নেই; এই লেখার পাঠক সিডির বিষয়টা জানান এটা ধরে নিতে বাধা নেই। আমাদের এখনকার আলোচনার বিষয় রবীন্দ্রনাথের লেখা, গান, ছবি সিডিতে কতটা ধরা হয়েছে ও তার থেকে কী ধরনের সুবিধে পাওয়া যায়।

আমরা এখনও পর্যন্ত এইরকম তিনটি ‘সিডিবদ্ধ রবীন্দ্রনাথ’ পেয়েছি। আরও থাকতে পারে, হয়তো আছেও, তার খোঁজ আমার কাছে নেই। একটা কথা বলা দরকার; সিডির মাপ ছোটো হলেও তার ধারণক্ষমতা বিস্ময়কর। একটা সিডিতে পুরো রবীন্দ্র-রচনাবলী ধরে রাখা যায়। এবং এইরকম একটা সিডি বাজারে পাওয়াও যায়। সেলসিয়াস টেকনোলজি গ্রুপ ‘চিরন্তন রবীন্দ্র-রচনাবলী’ নামে একটা সিডিতে রবীন্দ্রনাথের প্রায় সব রচনাই ধরে রেখেছেন। ‘প্রায়’ বলা হল, কারণ বিশ্বভারতী প্রকাশিত ৩২ খণ্ডের রবীন্দ্র-রচনাবলীর সবটাই এখানে আছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হয়নি। তবে যা খুঁজেছি সবই পেয়েছি। ‘চিরন্তন রবীন্দ্র-রচনাবলীর’ দাম ন-শো থেকে হাজারের মধ্যে। বিশ্বভারতীর রেজিন-বাঁধাই রচনাবলীর সেট প্রায় চার হাজার, সব খণ্ড পাওয়া যায় না। সুলভ সংস্করণ আঠারো-শোর কাছাকাছি। এই বিচারে সিডি সস্তা। পড়তে হয় কম্পিউটারে স্ক্রিনে অর্থাৎ মনিটরে। এই উপায়ে একটানা পড়াটা কষ্টকর, যথেষ্ট বিরক্তিকরও বটে। কাগজে-ছাপানো ও দুই মলাটে-বাঁধানো বইয়ের বিকল্প কিছু নেই। অন্য একটা দিকও আছে। অফিসে ব্যাঙ্কে এবং অনেক জায়গাতেই কাজের সময় কম্পিউটার খোলাই থাকে। বাড়িতে তা নয়। হঠাৎ কোনো রচনা পড়ার কিংবা মিলিয়ে দেখার দরকার হলে, কম্পিউটার ‘অন’ অর্থাৎ ‘বুট’ করতে হবে। কম্পিউটারভেদে এবং তাতে কত প্রোগ্রাম ডরা আছে, তার ওপর ‘বুটিং’-এর সময় নির্ভর করে। গড়পড়তা দু-মিনিটের কম নয়। সিডি ড্রাইভে ‘চিরন্তনের’ সিডি লাগিয়ে, খুঁজতে হবে যেটা আমার দরকার সেটাকে। খোঁজার জন্য যে তথ্য টাইপ করতে হয়, সেটা কঠিন নয়, তবে টাইপ করার পদ্ধতিটা সুবিধের নয়। কেন নয়, তা পরে বলছি।

সাধারণ পাঠকদের কাছে, এই সিডিবদ্ধ রচনাবলী খুব-একটা কাজে আসবে বলে মনে হয় না। আমি নিজে বিশেষ সুবিধে পাই না। তবে যারা বিদেশে থাকেন, কখনো কোনো রচনা হাতের কাছে পেতে চান— তাঁদের তো সুবিধেই হয়। এর অন্য অনেকগুলি উপযোগিতা অবশ্যই আছে যা খুবই কাজের, বিশেষ করে গবেষকদের কাছে। রবীন্দ্রনাথ

কোনো বিশেষ সময়সীমার কতগুলো কবিতা লিখেছেন এবং তাদের নাম কী? এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে। কোনো একটা কবিতার পঙ্ক্তির মনে পড়ছে কিংবা চোখে পড়ল, কিন্তু কবিতাটির নাম ও প্রথম পঙ্ক্তি জানি না, সেটাও বার করে নেওয়া যায়, এমনকী ছাপিয়েও (প্রিন্ট-আউট) নেওয়া চলে।

‘কনকর্ড্যান্স’ বলে এক ধরনের অভিধান হয়, যা প্রধানত কোনো লেখক, কোনো বিশেষ ধরনের রচনা, মহাকাব্য প্রভৃতিকে ভিত্তি করে নির্মিত হয়। যেমন ‘রবীন্দ্র-কনকর্ড্যান্স’ যদি হয়, তবে সেটা থেকে এই ধরনের খবর পাওয়ার আশা করা যায়। ধরা যাক, ‘আশ্বিন’ শব্দটা রবীন্দ্রনাথের সমগ্র রচনায় অথবা কবিতায়, অথবা কবিতায় এবং গানে, অথবা প্রবন্ধে, অথবা ছোটগল্পে, অথবা ছোটগল্প এবং উপন্যাসে (এই ‘অথবা’ চলতেই থাকবে, যেমন কাব্যে নাটকে, কোনো সময়সীমার মধ্যে) কত বার ব্যবহার করেছেন, কোন কবিতায় ইত্যাদিতে, এবং যেখানে যেখানে এই ‘আশ্বিন’ কথটা আছে সেই লাইনটা কী— এই সব কিছুই জানা যাবে। এবং এটা কম কথা নয়। আলাদা করে কনকর্ড্যান্স তৈরি করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু একটা অসুবিধে আছে, সেটা অবশ্য ‘চিরন্তন’ যাঁরা ভেবেছেন ও তৈরি করেছেন তাঁদের দোষ নয়। বাংলা ভাষারই একটা বৈশিষ্ট্য এরজন্য দায়ী, যা কিনা কম্পিউটারে বাংলা ভাষা চর্চার ক্ষেত্রে কিছুটা অসুবিধে সৃষ্টি করে। তা বলে যন্ত্রের খাতিরে ভাষারীতির পরিবর্তন চাই না। প্রকৃত ব্যবহারে বাংলা শব্দ একটু পালটে যায়। ‘আশ্বিনের মাঝামাঝি উঠিল বাজনা বাজি’। ‘কোন্ খেপা শ্রাবণ ছুটে এল আশ্বিনেরই আঙিনায়’— এই দুই উদাহরণে ‘আশ্বিন’ শব্দটি আছে এবং নেই। ‘আশ্বিনের’ ও ‘আশ্বিনেরই’ দু-টিই যে মূলত ‘আশ্বিন’, তা আমি, আপনি বুঝতে পারলেও মেশিনকে সেটা বোঝানো মুশকিল। কম্পিউটার যন্ত্রের কোনো বুদ্ধি নেই, তাই ‘আশ্বিন’ খুঁজতে বললে যন্ত্র কেবল ‘আশ্বিন’-ই দেখবে, বিভক্তিয়ুক্ত রূপগুলি খুঁজবে না, যদিনা সেগুলোও পৃথকভাবে আগে থেকে জানানো থাকে। যাই হোক, ‘চিরন্তন রবীন্দ্র রচনাবলী’ একটা ভালো কাজ, পাঠকের থেকেও গবেষকরা বেশি উপকৃত হবেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই। এতে আরও অনেক ‘ফিচার’ আছে, সেগুলির উল্লেখ করছি না। খোঁজার আরও অনেক কায়দা আছে। নির্মাতারা খুবই সুন্দরভাবে ভেবেছেন। ‘সার্চ ইঞ্জিন’, যদি এই শব্দটা ব্যবহার করি, বেশ ভালো।

টাইপ করার পদ্ধতিটা খুব সুবিধের নয়, আগে বলেছি। বস্তুত বাংলা ভাষা কম্পিউটারে লেখার জন্য কোনো প্রামাণ্য ‘কি-বোর্ড’ লে-আউট এখনও হয়নি। হয়নি আরও একটা জরুরি কাজ, যাকে বলা হয় ‘প্লিফ স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন’। এই বিষয়ে বিশদ আলোচনা এখানে অনাবশ্যক। সেটা করতে গেলে লেখাটা দীর্ঘ ও জটিল হয়ে যাবে। ‘চিরন্তনে’ যে পদ্ধতিতে বাংলা লেখা হয়েছে, ও খোঁজার জন্য যে পদ্ধতিতে টাইপ করার নির্দেশ দেওয়া আছে, তাতে মনে হয় যে ইংরেজি ভাষার খাঁচার মধ্যে ঢোকানো হয়েছে বাংলাকে। ‘ফোনেটিক কি-বোর্ড’ নামে একটা অদ্ভুত কথা চালু আছে। এই কি-বোর্ডের বিশেষত্ব (?) হল ইংরেজির ‘এ’-তে বাংলার ‘অ’ রাখো, ‘ক’-তে ‘ক’, ‘এল’-এ ‘ল’—এইরকম। তাতেও সবটা হয় না, কিছু গৌজামিল দিতেই হয়। এবং হয়েওছে। ফলে এই অসুবিধে। একটু অপ্রাসঙ্গিক হলেও বলি, ইংরেজি-জুতো পায়ে দিয়ে বাংলার এই ‘ফোনেটিক’ চলন নিতান্তই সীমাবদ্ধ। এই লেখাটা পত্রিকায় ছাপানোর জন্য যিনি হরফবিন্যাস করবেন তাঁর ‘কি-বোর্ড’ তথাকথিত ‘ফোনেটিক’

নয়, অন্যরকম। তবে এই অন্য রকমেরও অনেক রকমফের আছে। আমার যন্ত্রের বাংলা 'কি-বোর্ড' (এবং স্লিফ ম্যাপ, এটা এখন ব্যাখ্যা করার দরকার নেই) আলাদা। এই লেখাটা ইংরেজিতে হলে আমি যন্ত্রে লিখে, প্রুফ দেখে ফ্লপি, সিডি এমনকী ই-মেলে পাঠাতে পারতাম টাইপসেটার-এর কাছে, তাঁকে আর নতুন করে কিছু করতে হত না, কেবল পেজ লে-আউট ছাড়া। বাংলায় এখনও পর্যন্ত তা হবার জো নেই।

সিডিবদ্ধ রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় উদাহরণ 'রবীন্দ্রসংগীত আর্কাইভ', বাজারে পাওয়া যায়, দাম চব্বিশ-শো টাকা, আরগিজি সারেগামা, 'এইচএমডি' এর পরিবেশক। কিন্তু এটি তৈরি করেছেন ডা. পূর্ণেন্দু বিকাশ সরকার। তিনি বিখ্যাত 'চক্ষু-শল্যবিদ', বাংলায় যাকে বলা হয় আই সার্জন। ব্যস্ত ডাক্তার। কিন্তু কাজের আগ্রহ থাকলে হাজার ব্যস্ততাও কোনো বাধা হয় না, ডা. সরকারের এই কাজটি তার প্রমাণ। তাঁর কাজ বিশ্বয় জাগায়। বাংলা আকাদেমি সভাঘরে 'রবীন্দ্রসংগীত আর্কাইভ' প্রকাশের সময় উপস্থিত ছিলাম, কিন্তু বিশেষ কাজ থাকায় 'ডেমনস্ট্রেশন' বা 'প্রেজেন্টেশন' সবটা দেখতে পারিনি। পরে একজন নির্ভরযোগ্য মানুষের কাছে জেনে নিয়ে লিখছি। 'রবীন্দ্রসংগীতে আর্কাইভ', মূলত গ্রামোফোন কোম্পানি অব ইন্ডিয়ান, 'এইচ এম ডি' (ও 'কলাম্বিয়া'?) লেবেলে প্রকাশিত বিভিন্ন গায়ক-গায়িকার গাওয়া রবীন্দ্রসংগীতের সংকলন, সংখ্যায় তিন হাজারেও বেশি। কিন্তু এটাই সব নয়। এর সঙ্গে আছে প্রতিটি গানের কথা, গানটি রচনার তারিখ, কোন স্বরবিতানে স্বরলিপি আছে তার হদিশ, ও আরও বেশ কিছু তথ্য। আছে গায়ক-গায়িকাদের ছবি। এ হল সিডির মধ্যে কোন কোন তথ্য ভরা আছে তার বিবরণ।

কিন্তু যেকোনো ডেটাবেসকে 'ইউজার-ফ্রেন্ডলি' করে তুলতে গেলে অতি ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করতে হয়, তার 'রিট্রিভাল সিস্টেম', তার 'ফ্রেঞ্জিবিলিটি' এবং 'কন্সট্রাকশন অপশনস' প্রভৃতি। এইসব ভাবার পর প্রয়োজনীয় প্রোগ্রাম লিখতে হয়। যথেষ্ট সূচাক্রান্তাবেই হয়েছে কাজটা। একটা বিশেষ গান কবে লেখা হয়েছিল? উত্তর পাব। সেই গানটার কথা জানতে চাই— পাব। সেই গানটা কত জন/কত বার গেয়েছেন? —পাব। তাঁদের নাম কী? —পাব। তাঁদের গাওয়া গানগুলো শুনতে চাই, মনে করা যাক, গায়কির তুলনামূলক বিচারের জন্য—হ্যাঁ, তাও পাব। সেইসব গায়ক-গায়িকাদের ছবি চাই, —অসুবিধে নেই। আরও হয়তো কিছু আছে, হয়তো কেন নিশ্চয়ই আছে। তবে এখানে একটা কথা বলার আছে। এটি পুরো রবীন্দ্রসংগীত আর্কাইভ হয়ে উঠতে পারেনি। এইচ এম ডি, ছাড়া অন্য রেকর্ডিং সংস্থায় অনেকেই রবীন্দ্রসংগীত গেয়েছেন, সেগুলো নেই। সে সংকলনও হয়তো হবে, হয়তো ডা. সরকারই করবেন সেই কাজ।

সিডিবদ্ধ রবীন্দ্রনাথের তিন নম্বর কাজটি এখনও বাজারে আসেনি, তার কোনো নামকরণও হয়নি। কিন্তু কাজটি অভাবনীয়। এটি করেছেন দু-জন ব্যক্তি। মানবেন্দ্রনাথ রায় ও তাঁর ছেলে ইন্দ্রনীল রায়। কী আছে এতে? গীতবিতানের সবগুলি গান আছে, পাঠভেদ-সহ। এ পর্যন্ত প্রকাশিত ৬৪ খণ্ড স্বরবিতারের সব স্বরলিপি আছে, সুরভেদ-সহ। কোন কোন গানের স্বরলিপি নেই, কে কোন গানের স্বরলিপি করেছেন, কবে লেখা হয়েছে গানটি প্রভৃতি সব খবর আছে এর মধ্যে। তবে এইসব দিয়ে আমরা কী করব? একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। মনে করা যাক 'আজ যেমন করে গাইছে আকাশ' গানটির সুর শুনতে চাই, শুনে

শিখতে চাই। মূল গানের প্রথম লাইনের বর্ণানুক্রমিক তালিকা থেকে (যেমন আছে অথও গীতবিতানের সূচিতে) বাছলাম গানটা। গোটা গানটা এল স্ক্রিনে। এবার শুনব। কোন যন্ত্রে বাজবে সেটা? গোটা চল্লিশেক যন্ত্রের ব্যবস্থা আছে— পিয়ানো, সিঙ্গেসাইজার, বাঁশি, এস্ট্রাজের মতন শব্দের যন্ত্র, একাধিক যন্ত্রের মিশ্রণ, দরকার হলে ব্যাকগ্রাউন্ডে তানপুরার মতো টানা সুরও বাজবে। কোন লয়ে,— আপনি ঠিক করে নিন। কোন স্কেল? আপনার গলার সঙ্গে মিলিয়ে ঠিক করে নিন। এইবার প্লে, অর্থাৎ বাজাও। সুর বেজে উঠবে— নিখুঁত সুর। স্ক্রিনে আসবে আকারমাত্রিক স্বরলিপির ছবি, দুই স্তরে; ওপরে স্বর (সা, রা, গা, গা প্রভৃতি) অথবা কোনো স্বরকে টেনে রাখার চিহ্ন। কিংবা -সা, -রা, -রা, ঠিক যেমনটি থাকে আকারমাত্রিক স্বরলিপি পদ্ধতিতে। নীচের লাইনে গানের কথা ও টেনে রাখার সংকেত ...। স্পর্শস্বর, একই মাত্রায় দুই, তিন, চারটি স্বর থাকলে সেটাও আছে। সুর, তালের যে-মাত্রায় আছে স্বরলিপির, কেবল সেই মাত্রায় রং বদলে যাচ্ছে আবার পরের মাত্রায় গেলে সেটা রং বদলাচ্ছে, আগেরটা যেমন ছিল তেমন রঙে ফিরে আসছে। গান এগোচ্ছে— স্ক্রিনের স্বরলিপিও বাঁ-দিকে সরে সরে যাচ্ছে।

‘আচ্ছা রবীন্দ্রসংগীতে অনেক গানের লাইন দ্বিতীয় বার গাওয়ার সময় অন্যরকম সুরে ধরতে হয়, স্বরবিতানে যা [] বন্ধনীর মধ্যে দেখানো হয়।’ —প্রশ্ন করেছিলেন সুভাষ চৌধুরী। ওঁরা জানালেন পুনরুক্ত লাইনটি দু-বারই বাজবে, এবং দ্বিতীয় বার [] বন্ধনীর স্বরই দেখানো হবে, বাজবেও সেটাই। ‘অনেক কথা পুনরুক্তিতে বাদ যায়, () বন্ধনীর মধ্যে যা দেখানো হয়।’ ‘সেটাও দু-বার আছে ও পুনরুক্তিতে সেই কথাগুলো নেই।’ গান যখন বাজছে তখন স্কেল, লয়, কিংবা যন্ত্র বদলানো যায়? উত্তর হল— হ্যাঁ। করেও দেখালেন। ‘প্রথম লাইনটা দশবার শুনে অভ্যাস করতে চাই।’ ‘শুধু প্রথম লাইন কেন, যেকোনো অংশ, একাধিক লাইন, এমনকী একটা শব্দও যত বার দরকার ‘লুপ’ করে নিতে পারেন।’ স্ক্রিনের নীচে একটা দু-অক্টেভের পিয়ানোর মতো ‘কি-বোর্ডের’ ছবি আছে। যখন যে-স্বর বাজছে, কি-গুলোও সেইমতো নামা-ওঠা করছে।

এই প্রোগ্রামে তিনরকম পদ্ধতির স্বরলিপির একইরকম ব্যবহার আছে। একটা জায়গায় ক্লিক করলে ভাতখণ্ডের পদ্ধতির স্বরলিপি হচ্ছে, তখন লেখাগুলো আসছে নাগরী লিপিতে, অন্যান্য চিহ্ন ‘ক্রমিক পুস্তকমালায়’ দেখানো স্বরলিপির মতো। বাজছে একই সুর, অর্থাৎ নির্বাচিত গানটার সেই অংশের যে সুর। কিন্তু তার থেকেও বড়ো বিস্ময় অপেক্ষা করে ছিল। আর এক জায়গায় ক্লিক করলে স্ক্রিনে আসছে ইউরোপীয় স্টাফ নোটেশন। পাঁচটা লাইনের মধ্যে সুরের চিহ্ন, কথাগুলো ডায়াক্রিটিকাল চিহ্নযুক্ত রোমান হরফে।

এ ছাড়া আর কী কী পাওয়া যাবে এই সিডি থেকে? অনেক কিছু। মনে করা যাক, পা-পণা-ধা-পা-মা— এই স্বরসমষ্টির রবীন্দ্রসংগীতের মধ্যে আছে কি, থাকলে কত বার এবং কোন কোন গানে? যন্ত্রে সেটা খোঁজারও বন্দোবস্ত আছে, তিন স্তরে। একজাঙ্কি ম্যাচ, — এত বার। নিয়ার ম্যাচ— এত বার। আরও একটু কম ম্যাচ— এত বার। এটা গানের শুরুর অংশে শুধু নয়, যেকোনো জায়গায়। কোনো বিশেষ শব্দ রবীন্দ্রসংগীতে কতবার আছে? কোন কোন গানে? —পাওয়া যাবে। অনেকেই স্বরলিপি করেছেন রবীন্দ্রসংগীতের— দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী, শৈলজারঞ্জন মজুমদার, অনানিকুমার দস্তিদার,

কাদ্রালীচরণ সেন প্রমুখ আরও বেশ কিছু গুণীজন। যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, প্রকাশিত স্বরলিপিগুলোর কত স্বরলিপি করেছিলেন কাদ্রালীচরণ সেন? সে উত্তর পাওয়া যাবে। কোন কোন গানের? তাও জানা সম্ভব। এইরকম আরও অনেক কিছুই আছে এই কাজটির মধ্যে।

তবে যন্ত্রের তো বুদ্ধি, উপলব্ধি কিছুই নেই। যন্ত্রে-বাজানো গানের সুরে স্বরস্থান নিখুঁত, এক মাত্রায় তিন-চারটি স্বর থাকলে তাদের সবগুলোই সমানভাবে উপস্থিত, লয় বদলায় না। কিন্তু গানের সুরগুলোর মধ্যে উচ্চাচ নেই, মডুলেশন নেই, ঝাঁক নেই। একটানা মেকানিক্যাল আওয়াজ। এটা অবশ্য মানবেন্দ্রনাথ রায় ও ইন্দ্রনীল রায় বিলম্বিত জানেন। তাই ঝাঁকি এটা দেখতে ও শুনতে যান, তাঁদের প্রথমেই ওঁরা বলেন, এটা নেহাতই একটা সাহায্যকারী সফটওয়্যার, কোনো সংগীতগুরুর স্থানে একে বসাবেন না। সত্যি কথা, তবে এটায় যে ধরনের সাহায্য শিক্ষার্থী পাবেন সেটাই-বা কম কীসে। আর গবেষকদের কাছে এটা একটা অসাধারণ সম্পদ।

যে তিনটি সিডিবদ্ধ রবীন্দ্রনাথের কথা বলা হল, তাতে অনেক কথাই হয়তো বলা হয়েছে, হয়নিও অনেক কিছু। ভুল খবরও হয়তো আছে, বিশেষ করে 'রবীন্দ্রসংগীত আর্কাইভ' প্রসঙ্গে তা থাকাই সম্ভব। এঁরা সবাই খুবই ভালো কাজ করেছেন, —অভিনন্দন জানাই। এই লেখার ভুলত্রুটি, অসম্পূর্ণতা কোনোটাই ইচ্ছাকৃত নয়। আশা করি মার্জনা করবেন, দুই অর্থেই।

সম্প্রতি স্বাগতালক্ষ্মী দাশগুপ্ত এক-শো দশটা সিডিতে প্রায় গোটা গীতবিতানটাই গেয়ে ফেলেছেন। অসাধারণ কৃতিত্ব। কিন্তু সিডিবদ্ধ রবীন্দ্রনাথ বলতে এ-জিনিসটি বোঝাতে চাইনি। তাই এই বৃহৎ ব্যাপারটির উল্লেখই শুধু করছি। তার বেশি আর কিছু নয়।

বাংলা কবিতার উন্মেষ ও ভবিষ্যতের ইঙ্গিত

সুভাষ ভট্টাচার্য

আগে পদ্য, পরে গদ্য

ভাষাতাত্ত্বিকদের গবেষণা ও আলোচনায় এই তথ্যটি মোটামুটিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, বাংলা ভাষার, আদি বাংলা ভাষার প্রথম নমুনা বা নিদর্শন রয়েছে চর্যাগীতিতে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, আমাদের ভাষার সাহিত্যের প্রথম নমুনাটি পদ্যের আকারে সংরক্ষিত আছে। একথা কেবল আমাদের সাহিত্য সম্বন্ধেই যে প্রযোজ্য তাও নয়। যতদূর জানা যায়, প্রায় সমস্ত ভার্নাকুলার বা মৌখিক ভাষার সাহিত্যে পদ্যই প্রথমে রচিত হয়েছিল। এখানে এই ‘প্রায়’ কথাটি লক্ষণীয়। দক্ষিণ ভারতে কন্নড় সাহিত্যে দশম শতকে গদ্য ও পদ্য মিশিয়ে ‘চম্পু’ নামে যে মিশ্র সাহিত্য রচিত হয়েছিল তার কথা ভুলে যেতে চাই না আমরা। তবু সামগ্রিকভাবে নিশ্চয় বলা চলে যে, পদ্যই এসেছিল আগে। এই সিদ্ধান্ত প্রাচীন ইয়োরোপীয় সাহিত্য সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। কি ফরাসি জঁগল্যরদের রচনা, কি প্রাচীন ব্রিটেনের উইডসিথ ও বেউলফ নামক রচনা, প্রতিটি ক্ষেত্রেই কাব্যই দেখা যাচ্ছে আদিতম সাহিত্যকর্ম। তাহলে, সব ভাষাতেই সাহিত্যের প্রারম্ভিক চর্চা ছিল পদ্য এ যেন স্বতঃসিদ্ধের মতো এক অনিবার্য ও অব্যতিক্রমী ঘটনা। রবীন্দ্রনাথের কথা মনে পড়বে: ‘পৃথিবীর আদিম অবস্থায় যেমন কেবল জল ছিল, তেমনি সাহিত্যের আদিম অবস্থায় কেবল ছন্দরঙ্গিতা প্রবাহশালিনী কবিতা ছিল।’ সব ভাষার সাহিত্যের প্রাচীনতম নমুনা নিশ্চয় আমাদের হাতে এসে পৌঁছোয় নি। কিন্তু যা আমরা পেয়েছি অর্থাৎ আমাদের জ্ঞানত যাকে আমরা কোনো সাহিত্যের প্রথম নমুনা বলে জেনেছি, তা পদ্যেই রচিত। এর কী কারণ হতে পারে? গদ্যের গঠন জানাই ছিল না, এমন অনুমান গ্রহণীয় নয়, কেননা, লোকে যে-ভাষায় কথা বলত তার গঠন অবশ্যই গদ্যের।

বরং ক্রিস্টোফার কড্‌ওয়েলের অনুসরণে বলতে পারা যায় যে, প্রথম সাহিত্যের স্রষ্টারা আত্মপ্রকাশের জন্য সন্ধান করেছিলেন একটি ‘সুউচ্চ’ বা ‘সমুচ্চ’ ভাষার, কড্‌ওয়েল যাকে heightened language বলতে চেয়েছেন। কেননা তাঁরা তাঁদের প্রতিদিনের ব্যবহৃত মুখের ভাষাকে মনে করেছিলেন বড়োই পার্শ্বি, বড়োই সাধারণ, তাঁদের ধারণায় সাহিত্যের বাহনকে হতেই হবে উন্নত ও সম্ভ্রান্ত কোনো ভাষা। আর এই ভাষাকে উন্নত বা উন্নীত করবার উপায় ছিল তাকে সুরে বাঁধা। অনুমান করা শক্ত নয় যে, লিখনরীতির উদ্ভাবনের আরো কবিতার সঙ্গে সুর ছিল একরকম অবিচ্ছেদ্য। সে সুর ছিল আদিম এবং কাজে কাজেই অ-মার্জিত। এমনকী, পেরিক্রিসীয় অ্যাথেন্সের সমস্ত কবিতাই সুরে বসানো হত, এতটাই যে, কবিতার আর সংগীতের পার্থক্য করাই কঠিন হত। একটি অন্যটির সীমানায়

অধিক্রমণ করত প্রায়ই। ফিরে যাই কড়ওয়েলের কথায়। তাঁর মনে হয়েছে, প্রাচীন কালের মানুষ মনে করত, সাহিত্য-রচিত হবে এমনই এক ভাষায় যা প্রতিদিনের মুখের ভাষার মতো সরল ও অনাড়ম্বর হবে না, যার মান্যতা, গাভীর্য ও শৃঙ্খলা তাকে সমতল থেকে অনেক উচ্চতায় নিয়ে যাবে। ছন্দোবদ্ধ আর অলংকার সমৃদ্ধ পদ এবং ধ্বনির সংগীতময়তা এদের কাছে নিশ্চয় উপযুক্ততর ও অধিকতর রম্য বলে মনে হয়েছিল। অবশ্য এই ‘সুউচ্চ’ ভাষাও যে খুব সুলভ ছিল তা নয়। তাকেও নির্মাণ করে নিতে হয়েছিল নিশ্চয়।

কেন আগে পদ্য এল, এই হল সে বিষয়ে ক্রিস্টোফার কড়ওয়েলের ব্যাখ্যা। প্রথম সাহিত্য পদ্যে রচিত হবার কারণ হিসেবে ওই ব্যাখ্যা উড়িয়ে না দিয়েও আমরা ভিন্নতর এক ব্যাখ্যা দিতে পারি, যে ব্যাখ্যাকে মনে করা যেতে পারে অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য ও অধিকতর যুক্তিসংগত। প্রায় সব ভাষারই প্রথম সাহিত্য ছিল সংগীতেরই নামান্তর। সেই সংগীত স্বভাবতই পদ্যে রচিত ও সুরারোপিত। গদ্যে সংগীত সম্ভবপর নয়। কেননা সংগীতের বাণীকে একটা নির্দিষ্ট নিয়মে আবৃত্ত বা আবর্তিত হতে হয় বারবার। মাত্রার শৃঙ্খলা ও পর্বের নিয়মনির্দিষ্ট বিভাগ কেবল পদ্যেই সম্ভব। পদ্যে ধ্বনিগুলির একটা শ্রুতিসুখকর সংগঠন থাকে। ধ্বনির পুনরাবৃত্তি, ধ্বনিগুচ্ছের সংস্থান ও সবই নিয়মে বাঁধা থাকে। আর এই বন্ধন কেবল পদ্যচ্ছন্দেই সম্ভব। সংগীতমাত্রেরই তাই অবলম্বন করে পদ্যকে। প্রথম সাহিত্য অনেক ক্ষেত্রেই মৌখিক এবং সবক্ষেত্রেই সংগীতধর্মী। তাই সেই সাহিত্য অনিবার্যভাবেই পদ্যে রচিত।

সেই প্রথম সাহিত্য ছিল মূলত মৌখিক। তবে তা লেখাও হত। কিন্তু মুদ্রণযন্ত্র যেহেতু উদ্ভাবিত হয়নি এখন, তাই তার প্রচার ও প্রসার সম্ভব হত মূলত লোকের মুখে মুখে। কখনো কখনো তা নিশ্চয় নকল করে রাখাও হত। কিন্তু একটি দীর্ঘ রচনা কতবার নকল করা সম্ভব, আর তার কতগুলি অনুলিপিই বা সম্ভব? প্রথম যুগের সমস্ত রচনাই সভায় আখড়ায় আর মণ্ডপে মণ্ডপে আবৃত্ত হত শ্রোতাদের সামনে। আর এই আবৃত্তি সম্ভবপর ছিল সেই রচনা পদ্যে গ্রথিত ছিল বলেই। কেননা, কে না জানে যা-কিছু পদ্যচ্ছন্দে রচিত তা-ই স্মৃতিসহায়ক, তা সহজেই কণ্ঠগত হতে পারে। ধ্বনির আবর্তন, অন্ত্যমিল— পদ্যের এইসব চিরন্তন প্রকরণ ও বৈশিষ্ট্য গদ্যের তুলনায় তাকে অনেক বেশি আবৃত্তি যোগ্য করে তুলেছে।

উপরোক্ত ব্যাখ্যাগুলিকে গদ্যের তুলনায় পদ্যের সুলভতার কারণ হিসাবে দেখতেই পারি আমরা। কিন্তু শুধু কি এগুলিই প্রাচীন কালে গদ্যের দুর্লভতার কারণ? শুধুই এগুলি? এই কথাটাও কি গুরুত্বপূর্ণ নয় যে, সাহিত্যিক গদ্যে যে শৃঙ্খলার প্রয়োজন, যুক্তি ও চিন্তার যে পরিণতি একান্তই আবশ্যিক, সাহিত্য সৃষ্টির সেই আদি যুগে তা আদর্শেই সম্ভব ছিল না। মানুষের আবেগ ও অনুভূতি কবিতায় সহজেই প্রকাশিত হতে পারে। সাহিত্য সৃষ্টির সেই প্রথম যুগে পদ্যের পক্ষে সেই আবেগ আর অনুভূতিই ছিল যথেষ্ট। কিন্তু কেবল ওইটুকু পুঁজি পদ্যরচনার পক্ষে যথেষ্ট হতে পারে না। পদ্য, অন্তত সেকালের সেই পদ্য স্বতঃস্ফূর্ত, গদ্য কখনোই তা নয়। তাই পৃথিবীর সমস্ত ভাষার সাহিত্যে গদ্যের জন্য মানুষকে অপেক্ষা করতে হল আধুনিক কাল পর্যন্ত।

আগে এক জায়গায় বলেছি যে, প্রথম পদ্যের যুগেও মানুষ কথা নিশ্চয় গদ্যেই বলত।

তাহলে তো গদ্য সুলভই ছিল, গঠিতই ছিল। তবে কেন গদ্যে সাহিত্য সৃষ্টি করা গেল না? করা হল না? বস্তুতপক্ষে, মুখের ভাষার কাঠামো একধরনের গদ্য বটে, কিন্তু তাতে থাকে না সংগঠনের পারিপাট্য, থাকে না যুক্তির পরস্পরা ও শৃঙ্খলা। মানুষ কথা বলতে শেষে স্বতঃস্ফূর্তভাবে, অনুকরণ প্রবৃত্তির জোরে। কিন্তু গদ্য তো নিছক বলার ব্যাপারেই নয়, গদ্য লেখারও ব্যাপার— মুখের গদ্য, যদি আদৌ তাকে গদ্য বলা যায়, আর লেখার গদ্য আলাদা, শৈলীতে, সংগঠনে, প্রকরণে। পদ্য তাই সেকালের স্বাভাবিক সৃষ্টি, গদ্য তা নয়। এই কথাগুলো যখন বলি, তখন মনে পড়ে যায় ইংল্যান্ডে রাজা অ্যালফ্রেডের সময়ে ইংরেজি গদ্যের উদ্ভবের কথা। মনে পড়ে যায় যে, ইংল্যান্ডে গদ্যের উদ্ভব হল ঠিক তখনই, যখন বাংলা কবিতার সূচনা হল চর্যাঙ্গীতির মধ্য দিয়ে। অ্যালফ্রেডের সময়ের গদ্য মোটেই পরিশীলিত নয়, পরিণত নয়, সে গদ্য অপরিণত বটে, তবে গদ্য তো। তেমন কোনো গদ্যই বা কেন বাংলায় তখন হল না, এই প্রশ্নের উত্তর এখনও আমাদের জানা হয় নি।

বাংলা কবিতার পূর্বাভাস

প্রকৃত থেকে অপভ্রংশ, অপভ্রংশ থেকে অবহট্ট এবং অবহট্ট থেকে বাংলা— বাংলা ভাষার এই বিবর্তন সম্বন্ধে ভাষাতাত্ত্বিকরা মোটামুটিভাবে একমত। তাই প্রত্যাশিতভাবেই, অবহট্ট থেকে উদ্ভূত হয়েছে বলে, আদি বাংলা ভাষার সঙ্গে অর্থাৎ বাংলা ভাষার আদিরূপের সঙ্গে অবহট্টের অনেক মিল খুঁজে পাওয়া যায়। একই কারণে অপভ্রংশ ও অবহট্টে রচিত কিছু কিছু কবিতায় বাংলা কবিতার পদধ্বনি যেন শোনা যায়, পাওয়া যায় প্রথম বাংলা কবিতার পূর্বাভাস। সুকুমার সেন দেখিয়েছেন অষ্টম শতাব্দিরও আগে অপভ্রংশ ও অবহট্টে কড়চা ও ছড়া জাতীয় কিছু রচনা লিখেছিলেন বৌদ্ধ বজ্জয়ানিক ও শৈব নাথপন্থী যোগী সিদ্ধাচার্যেরা। এইসব পদ্যের ভাষা অবহট্ট বটে, তবে লৌকিক ও আঞ্চলিক কথা ভাষার ছাপ তাতে দুর্লভ নয়। আঞ্চলিক কথা ভাষা বলতে নব্য-আর্য ভাষাই বোঝানো হয়েছে, যার মধ্যে বাংলাও পড়ে। কাজে কাজেই বাংলা ভাষার চিহ্ন তাতে দেখতে পাওয়া অস্বাভাবিক নয়।

তো বিণু তরুণি নিরন্তর গেহেঁ

বোধি কি লব্ধই এণ বি দেহেঁ॥

(হে তরুণী, তোর নিরন্তর স্নেহ ব্যতীত এই দেহে কি বোধি লাভ করা যায়?)

এই দুটি চরণের কয়েকটি শব্দকে— তো বিণু, তরুণি, বোধি, নিরন্তর, দেহেঁ— চিনে নেওয়া শক্ত নয়। আরও পরবর্তী কালের বৈষ্ণব পদাবলিতেও এমন শব্দ বারবার ব্যবহৃত হতে দেখেছি। এমনকী, গেহা (নেহা) শব্দটিকেও শনাক্ত করা যায় সহজেই।

শৈব ও বৌদ্ধ তাত্ত্বিক যোগী বা সাধন কবিরা এক ধরনের সম্বোধন বা সম্বোধনীয় কবিতা বা গান লিখেছেন। গুট তত্ত্বের কথা বলেছেন অথচ তার মধ্যে একটা আবরণ রেখেছেন। এ যেন এক আলো-আঁধারি ভাষা। এইসব গানে স্পষ্টই দুটি অর্থ— একটি অর্থ তত্ত্বের কথা বলে, ওটিই কবির অভিপ্রেত অর্থ। অন্যটি সহজ জীবনযাপনের কথা বলে। এইসব পদ্যের কোনো-কোনোটর মধ্যে বাংলা ভাষার পূর্বাভাস ভালোই দেখতে পাওয়া যায়। সরহপাদ অনেকগুলি দোহা রচনা করেছিলেন অবহট্ট ভাষাতেই, সময়ের দিক থেকে

সেগুলি চর্যাগীতির কিছুটা পূর্ববর্তী। স্বভাবতই চর্যার ভাষার সঙ্গে তার মিল দেখতে পাওয়া যায়। কেমন মিল সেটাই দেখবার—

কমল-কুলিস বোধ মজ্জা খিউ
জো সো সুরতবিলাস।
কো তহি রমই ণ ত্রুত্বণে
কস্স ণ পুরই আস।

অর্থ অনুমান করা কঠিন নয়, কমল-কুলিশের মধ্যে যে সুরতবিলাস, তাতে কে আর না মজে? ত্রিভুবনে কার আশা পূরণ না হয়? এখানেও সেই কথা। কতগুলি শব্দ প্রায় অবিকল বাংলায় চলে এসেছে — কমল-কুলিশ, সুরতবিলাস, পূরণ হয় (পুরই), আশ (আস)। জো সো, সুর অ, ত্রিহুঅণ প্রভৃতি থেকে একটু এগিয়ে গেলেই পেয়ে যাব যথাক্রমে যে সে, সুরও, ত্রিভুবন।

প্রবোধচন্দ্র বাগচী ‘পাহুড়দোহা’ নামে দিগম্বর জৈন সম্প্রদায়ের একখানা গ্রন্থের কথা বলেছেন যাতে বহু অপভ্রংশ দোহা সংকলিত আছে। তারই একটি এইরকম—

কিন্তুহু তিথ তপোবন জাই।
মোকখ কি লব্ভাই পানি হুই॥

(তীর্থে বা তপোবনে গিয়ে লাভ নেই। জলে স্নান করলেই মোক্ষলাভ হয় না)

এই পদটির ভাষাও চর্যার ভাষার আভাস দেয়। শুধু আভাসই বা কেন চর্যার অনেক পদ ভাবে ভাষায় এতই অনুরূপ।

অপভ্রংশ ও অবহট্টের একটা মিশেল দেখা যায় ‘প্রকৃত পৈঙ্গল’ গ্রন্থে। ভাষাতাত্ত্বিকদের অনুমান, এটির সংকলন হয়েছিল ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকে। অন্তত তার আগে নয়। কেননা এতে কতকগুলো জায়গায় মুসলমান আক্রমণের উল্লেখ আছে। যদি না ধরে নিই যে কোনো-কোনো অংশ পরবর্তী কালের প্রক্ষেপ। ‘প্রকৃতপৈঙ্গলের অনেকগুলি কবিতার ভাষাকে বাংলার প্রত্নরূপ বলতে বাধা থাকে না—

চলিঅ বীর হসীর পাত্তর মেইনি কম্পই।
দিগমগ্গ গহ অংধার ধুলি সুরহ রহ কম্পই॥

(চলছেন বীর হাশির, পদভরে মেদিনী কম্পিত হচ্ছে। ধুলার দিগমার্গ আর আকাশ আঁধার হল, সূর্য গেল ঢেকে)

প্রকৃতপৈঙ্গলের কোনো কোনো কবিতা যে স্মরণ করায়, তেমনি তা মনে আনে বিদ্যাপতিকে, এবং অনিবার্যভাবে, আদিমধ্য বাংলা কবিতাকেও—

সো মহ কস্তা
দুর দিগন্তা।
পাউসা আএ
চেলু দুলাএ॥

(আমার সেই কান্ত এখন দূর দিগন্তে। বর্ষা আসছে তার আঁচল দোলাবে)

এই চূর্ণপদের একটি পাঠান্তর আছে— ঢেউ দুলাএ। তবে সম্ভবত সেটি ঠিক নয়। পাউস বা পাউখ সম্ভবত সংস্কৃত প্রাবৃত্ত থেকে এসেছে। এই শব্দটি বৈষ্ণব পদাবলিতেও লভ্য। এবং

অন্য শব্দগুলিও প্রত্ন বাংলায় ও পদাবলিতে বিরল নয়, কোনো কোনোটি অবশ্য ঈষৎ রূপান্তরিত বা পরিবর্তিত হয়ে বাংলায় এসেছে। ‘মানসোম্মাস’ নামে দ্বাদশ শতকে মহারাষ্ট্রে সংকলিত আবহুট্ট কবিতার কতকগুলিতে অনেকটা এইরকমই যেন প্রত্নবাংলার আদিরূপের দেখা মেলে। এর অধিকাংশ কবিতার ভাষার নব্য-আর্য ও প্রাচীন কন্নড়ের মিশ্রণ দেখা যায়। আর নব্য-আর্য এর প্রধান উপাদান বলেই এতে প্রত্ন বাংলার সঙ্গেও কোথাও মিল পাওয়া যায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাকে বাংলার আদিরূপ বলে মেনে নেওয়া যায় না।

প্রাচীনতম বাংলা কবিতা

১৮৭৭ সালে যখন রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁর *Literature of Bengal* প্রকাশ করেছিলেন, তখন তাঁর আলোচনার সূত্রপাত হয়েছিল জয়দেব ও চণ্ডীদাসকে দিয়ে। এমনকী, বড় চণ্ডীদাসের *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* গ্রন্থের অস্তিত্বের কথাও তখন তাঁর জানবার কথা নয় কেননা, ওই গ্রন্থের পুঁথি আবিষ্কৃত হয় ১৩১৬ বঙ্গাব্দে। চর্যাগীতিপদাবলির অস্তিত্বও একই কারণে, তাঁর অজানা ছিল। কাজেই রমেশচন্দ্র দত্ত নিশ্চয় এই সিদ্ধান্তই করেছিলেন যে, পদাবলির কবি চণ্ডীদাসই প্রথম বাংলা কবিতার রচয়িতা। দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য* গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ শেষ করেন ১৮৯৬ সালে। দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় দেখা যাচ্ছে ১৯০১ সালের সেপ্টেম্বর মাস। তাঁর গ্রন্থে চর্যাগীতি নয়, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন নয়, প্রথম বাংলা কাব্যের স্বীকৃতি পেয়েছে রামাই পণ্ডিতের *শূন্যপুরাণ*। তিনি লিখছেন *শূন্যপুরাণ* ‘খৃষ্টীয় একাদশ শতকের বলিয়া গ্রহণ করিতে আমাদের দ্বিধা হয় না।’ নগেন্দ্রনাথ বসুর মত উদ্ধৃত করে তিনি এও বলেছেন যে, রামাই পণ্ডিত মহারাজ ‘দ্বিতীয় ধর্মপালের রাজত্বকালে খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বিদ্যমান ছিলেন।’ কিন্তু *শূন্যপুরাণ*-এর পুঁথির ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে অসম্ভাব্যভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, *শূন্যপুরাণ* অত প্রাচীন নয়। দীনেশচন্দ্র ময়নামতীর গান ও গোরক্ষবিজয়কেও আদি বাংলা কাব্যের নিদর্শন বলে গণ্য করেছেন। একালের গবেষকরা এই সিদ্ধান্তকেও ভ্রান্ত বলে নির্দেশ করেছেন। এছাড়া দীনেশচন্দ্র ব্রতকথা, রূপকথা, ডাক ও খনার বচনকে আদিপাঠ্য বলে গ্রহণ করেছেন। এগুলি মূলত মৌখিক সাহিত্য, যুগে যুগে যা বদলে গেছে আর সেইজন্য যে আকারে এগুলি এখন আমাদের কাছে পরিচিত তাতে এগুলিকে খুব প্রাচীন আর বলা যায় না।

আরও আশ্চর্যের কথা, দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর গ্রন্থের পরিমার্জিত পঞ্চম সংস্করণের ভূমিকায় (ডিসেম্বর ১৯২৬)-বলেছেন এই গ্রন্থের সংশোধনাদির কাজে তিনি ‘শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্ভ্রমের সাহায্য নিয়েছেন। অথচ এই সংস্করণেও *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*-এর উল্লেখ নেই। এমনকী, বসন্তরঞ্জন রায়ের আবিষ্কৃত *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*-এর পুঁথির বিষয়েও তাঁকে নীরব দেখি।

প্রথম বাংলা কবিতা কোনটি— এই প্রশ্নের জবাবে কেউ কেউ মহারাষ্ট্রে দ্বাদশ শতকে সংকলিত ‘মানসোম্মাস’ নামে একটি কাব্যকোশের উল্লেখ করে বলেছেন যে, এই কাব্যকোশের ‘গীতবিনোদ’ নামের অংশের ঋগ্গীতিতেই রয়েছে আদি বাংলা ভাষার নমুনা। আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি যে, নব্য আর্য ও প্রাচীন কন্নড়ের মিশ্র ভাষাই ওই পদগুলিতে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রাচীন বাংলার সঙ্গে তার যেটুকু সাদৃশ্য, তা ওই নব্য আর্য ভাষার জন্যই,

যা থেকে উদ্ভূত হয়েছে বাংলাও। মানসোন্নাসের কিছু অংশে প্রত্ন বাংলার একটা পূর্বাভাস মিললেও কোনোমতেই তাকে প্রথম বাংলা কবিতা বলে ধরে নেওয়া সমীচীন নয়। আমাদের বিবেচনায় চর্যাগীতিই প্রথম বাংলা কবিতা।

কিন্তু চর্যাপদের ভাষাও কি প্রকৃতপক্ষে বাংলা? এই প্রশ্ন ওঠার কারণ এটাই যে, অনেকেই যেমন দাবি করেছেন যে, চর্যাপদ বাংলা কবিতারই নমুনা, তেমনি, কেউ বললেন চর্যাপদ মৈথিলিতে রচিত, কেউ বললেন ওটি মগহীতে রচিত, কেউ বললেন চর্যাপদ ওড়িয়া ভাষার আদি কবিতার নিদর্শন। এই দাবিগুলি সম্পূর্ণ অযৌক্তিক নয় অস্বাভাবিকও নয়। অবহট্ট থেকে যখন নব্য ভারতীয় আর্থ ভাষার যুগে এইসব মৌখিক ভার্নাকুলার ভাষাগুলি বিবর্তিত হচ্ছিল তখন, স্বাভাবিকভাবে এবং প্রত্যাশিতভাবে সেইসব ভার্নাকুলার ভাষার সঙ্গে উৎস ভাষার বহু উপাদান থেকে গেছে। তাই প্রত্ন-বাংলার সঙ্গে প্রত্ন-ওড়িয়ার, প্রত্ন-ওড়িয়ার সঙ্গে প্রত্ন-অসমিয়ার এবং প্রত্ন-অসমিয়ার সঙ্গে প্রত্ন-হিন্দির মিল ছিল প্রচুর। তাহলে তো চর্যাপদের ভাষাকে নির্দিষ্ট করে চিহ্নিত করাই যায় না। প্রায় কুড়ি বছর আগে প্রকাশিত একটি নিবন্ধে মৃণাল নাথ বলেছেন, চর্যাপদের ভাষাকে অবহট্ট বলাই সংগততর। এই সিদ্ধান্তটিকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না বটে, তবে বিভক্তির ব্যবহার, পদক্রম বাগ্ভঙ্গির দিক থেকে চর্যার ভাষার সঙ্গে পরবর্তীকালের বাংলার মিল উপেক্ষা করা যায় না।

ভবিষ্যতের ইঙ্গিত

এবারে আমরা অন্য প্রসঙ্গে যেতে চাই। চর্যাপদের ভাষাকে নির্দিষ্টভাবে বাংলা ভাষা বলা সংগত হোক, বা না-হোক, একথা অস্বীকার করা যায় না যে, চর্যাপদগুলির মধ্যে ছিল পরবর্তীকালের বাংলা কবিতার কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের সূত্রপাত। বিশেষত, বাংলা কবিতার সুপরিচিত বীজ যে চর্যাপদের মধ্যেই নিহিত ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ করা চলে না। দ্বিতীয়ত, বাংলা কবিতার লিরিকগুণেরও উৎস চর্যাপদ। তৃতীয়ত, চর্যাতেই নিশ্চিতভাবে সনেটের সূত্রপাত হয়েছিল।

চর্যাগীতির ছন্দ যাচাই করলে দেখা যায় যে, অধিকাংশ গানেই দুটো করে পর্ব আছে, আর অধিকাংশ গানে প্রথম পর্ব আট মাত্রার, দ্বিতীয় পর্ব আট বা ছয় বা সাত মাত্রার। অর্থাৎ মাত্রাসমষ্টি ষোলো কিংবা চোদ্দো। ষোলো মাত্রার ছন্দের নাম পাদাকুলক যা মূলত অপভ্রংশ যুগ থেকে আগত। প্রাকৃতপৈঙ্গলে পাদাকুলক ছন্দের ব্যাখ্যাও আছে।

কা আ তরুর । পঞ্চবি ভাল।

চঞ্চল চীএ । পইঠো ডাল॥ (চর্যা ১)

মাত্রার ভাগটা এইরকম করতে পারি—

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১

কা ০ আ ০ ত বু ব র / প ন্ চো বি ডা ০ জ ০

এই পঙ্কুস্তিকে পনেরো মাত্রায়ও আনা যায় এবং সেটাই স্বাভাবিক শোনাবে—

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১

কা ০ আ ০ ত বু ব র / প ন্ চো বি ডা ০ ল

কিন্তু গান যেহেতু, তাই অনেক সময়েই একটা মাত্রা টেনে বাড়িয়ে দুই মাত্রা করে নেওয়াই

হয়তো তখনকার দস্তুর ছিল। চর্যার বেশ কয়েকটি গানে আমরা চোন্দো মাত্রার পয়ারের লক্ষণ দেখতে পাই। তাই মনে করা অসংগত নয় যে, বাংলা পয়ারের সূত্রপাত চর্যাগীতিতেই লক্ষ করা যায়। আমরা এসব গানের চোন্দো মাত্রার ছন্দকে ‘প্রত্নপয়ার’ বলতেই পারি। এবার এই দুটি পঙ্ক্তি দেখব—

টলিত মোর ঘর নাহি পড়বেষী।

হাড়ীত ভাত নাঁহি নিতি আবেশী॥ (বর্ষা ৩৩)

কিংবা—

পেখমি দহদিহ সর্বই শূন।

চিঅ বিহুরে পাপ ন পুয়॥ (বর্ষা ৩৫)

এইসব গানে চোন্দো মাত্রার পয়ারের ধ্বনি কানে বাজে। একথাও ঠিক যে, এইসব চরণকে ষোলো মাত্রায় টেনে ছাড়াও যায়, গান হিসেবে গাইলে একে আরও সহজ ও স্বাভাবিক ঠেকবে নিশ্চয়।

চর্যার লিরিক গুণ

লিরিক বা গীতিকবিতা বলতে আজ যা বুঝি সেই অর্থ গোড়ার দিকে যে ছিল না, তা বলে না দিলেও চলে। বাংলায় লিরিকের অতিপ্রজ্ঞতা নিয়ে কোনোই সংশয় নেই। বৈষ্ণব পদাবলি থেকে শুরু করে উনিশ শতক পর্যন্ত লিরিক রচিত হয়েছে অজস্র। গীতিকবিতা বা লিরিকের সহজতম ও সংক্ষিপ্ততম ব্যাখ্যা কেউ কেউ দেন এইভাবে— ছোটো কবিতা ও ছোটো ভাব, যার অন্ততলে আছে সুরময়তা। কিন্তু বাংলা লিরিক বা গীতিকবিতা যে সর্বদাই এই সরল সংজ্ঞার্থ মেনে চলেছে তা নয়। বরং বাংলা গীতিকবিতা যত অগ্রসর হয়েছে ততই তার প্রকরণ ও বিন্যাসে ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য যুক্ত হয়েছে, গীতিকবিতার চরিত্রে এসেছে কালোচিত পরিবর্তন। কবির অনুভূতি ও গীতিময়তা নিশ্চয় একটা গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ গীতিকবিতার। কিন্তু বাংলা গীতিকবিতার বর্ণনাধর্মিতা এবং গল্পময়তাও অস্বীকার করা যায় না। বাংলা লিরিক বা গীতিকবিতার সূত্রপাত যে চর্যাগীতিতে, তাও অস্বীকার করা যায় না। শুধু তাই নয়। এই কথাটাও নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, লিরিক বা গীতিকবিতার আদি বৈশিষ্ট্য বলতে যা বোঝায় অর্থাৎ মূলে লিরিকের যা বৈশিষ্ট্য বলে মনে করা হত, তার সবই চর্যাগীতিতে লভ্য। এই কবিতাগুলি যে গায় বা গায়নের জন্য রচিত হয়েছিল তা প্রতিটি রচনার শীর্ষদেশের রাগনির্দেশ থেকেই বোঝা যায়। গানগুলির নাতিদীর্ঘ এবং এগুলির প্রত্নপয়ার ও ত্রিপদী ছন্দও গীতিকবিতার অনুকূল। কেবল গীতিকবিতার পক্ষে যা কিছুটা হলেও অস্বাভাবিক— তা হল এগুলির বর্ণনাধর্মিতা ও গল্পময়তা। তবে পরবর্তী কালের বাংলা লিরিকে এগুলিও সংযোজিত হয়েছে সীমিতভাবে।

যদি কবির ব্যক্তিগত অনুভূতির প্রকাশকে গীতিকবিতার একটি অপরিহার্য লক্ষণ বলে ধরে নিতে হয়, তাহলে চর্যার পদগুলিকে গীতিকবিতা বলে মানতে অসুবিধে হবে, কেননা, ব্যক্তির অনুভূতি সেখানে প্রাধান্য পায়নি। কিন্তু তবু এই পদগুলিকে বাংলা গীতিকবিতার প্রথম দৃষ্টান্ত বলে গ্রহণ করা অনুচিত হবে না। আর প্রথম দৃষ্টান্ত প্রায়ই নিখুঁত হয় না, তাতে পরিণত রূপের সমস্ত লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য না থাকতেই পারে।

বাংলা সনেটের সূত্রপাত

ঠিক একইভাবে একথাও বলতে পারা যায় যে, বাংলা সনেট বা চতুর্দশপদী কবিতারও আদিতম দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় চর্যাগীতিতেই। স্থূল বিচারে সনেট যদিও চতুর্দশপদী কবিতারই নামান্তর, তবু সনেট বলতে বোঝায় আরও অনেক কিছুই। সনেটে চোদ্দো চরণ নিশ্চয় থাকবে। সেই চোদ্দো চরণের মধ্যে আট ও ছয় চরণের দুটি ভাগও থাকার কথা। ইতালীয় বা শেকসপিয়রীয় সনেটে— যে দুই প্রকারের সনেটকে সমালোচকরা সনেটের পরাকাষ্ঠা বলে মনে করেন— থাকে একটা জটিল অন্ত্যমিলের প্যাটার্ন। কোথাও অন্ত্যমিলের প্যাটার্ন কখ থক কখ থক অষ্টকে এবং কখ কখ কখ ষষ্ঠকে; আবার কোথাও আগাগোড়াই কখ কখ কখ এইরকম।

চর্যার পদগুলোর মধ্যে কেবলমাত্র তিনটিকে চরণ সংখ্যার দিক থেকে সনেট বলা যায়। দশ, আঠাশ ও পঞ্চাশ সংখ্যক পদগুলি চতুর্দশপদী। কিন্তু এগুলোর মধ্যে আট পঙক্তি (অষ্টক) এবং ছয় পঙক্তি বা ষটকের কোনো ভাগ নেই। অন্ত্যমিলের প্যাটার্ন অতি সরল প্রায় আগাগোড়াই কখ গঘ গুচ এইরকম। অর্থাৎ একটি প্যাটার্নের কোথাও পুনরাবর্তন হয় না। কেবল এখানে ওখানে রয়েছে দু-একটি ব্যতিক্রমী বা মিলহীন পঙক্তি। এক সংখ্যক গানের শেষ দুটি চরণ এইরকম—

ভণই লুই অমহে সাণে দিধা।

ধমণ কমণ বেশি পাশ্চি বইণ।

এইরকম মিলহীন চরণ আরও কোথাও কোথাও থাকলেও এটা নিয়ম নয়, বরং ব্যতিক্রম।

দশ-সংখ্যক চতুর্দশপদী গানের অন্ত্যমিলে কোনো বৈশিষ্ট্য নেই, বিশেষ প্যাটার্নও দেখতে পাই না। কিন্তু আঠাশ নম্বর গানের অন্ত্যমিলে যেন একটা পরিকল্পনা ফুটে ওঠে—

বালী/মালী (১, ২)

ডালী/ধারী (৫, ৬)

খাই/(পো) হাই (৯, ১০)

রোষে/কই সে (১৩, ১৪)

তোহোরি/সুন্দারী (৩, ৪)

ছাইলী/(পো) হাইলী (৭, ৮)

বার্ণে/নিবার্ণে (১১, ১২)

দৃশ্যত ১ ও ২ চরণের ব্যঞ্জন ও স্বরধ্বনির মিল এবং ৭ ও ৮ চরণের ব্যঞ্জন ও স্বরধ্বনির মিল হুবহু একই প্যাটার্নের। আবার ৩, ৪ এবং ৫, ৬ চরণে স্বরধ্বনির মিল আছে, এমনকী একটি ছাড়া বাকি চরণে ব্যঞ্জন ধ্বনিরও মিল রয়েছে। এই প্যাটার্ন অবশ্য ৫০ সংখ্যক চতুর্দশপদীতে ওতটা স্পষ্ট নয়।

আগেই বলেছি, এগুলোকে যেহেতু বাংলা সনেটের আদিরূপ বলে ধরে নেব, তাই আধুনিক সনেটের অনেক লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য চর্যার ‘সনেটে’ মিলবে না নিশ্চয়। তবু প্রথম বাংলা সনেট হিসাবে চর্যার এই তিনটি পদকে নিশ্চয় চিহ্নিত করা যায়। সনেটের ইতিহাস মোটেই একরৈখিক নয়। স্পেনসারীয় বা শেকসপিয়রীয় সনেটে অন্ত্যমিলের স্বাধীন প্রয়োগের

কারণে পঙ্ক্তি বিন্যাসও তো কোথাও কোথাও বদলে গিয়েছিল। সেখানে ৪+৪+৪+২ এইভাবে চোদ্দোটি পঙ্ক্তি বিভাজন দেখতে পাওয়া যায়। আধুনিক কালেও তো রিলকে বা হপ্কিনস সাবেক পঙ্ক্তি বিভাজন না মেনেই সনেট রচনা করেছেন। এই বিচ্যুতিকেও যখন মেনে নেওয়া হয় তখন চর্যার অস্পষ্ট সনেট রূপকেই বা মানব না কেন?

গ্রন্থপঞ্জি :

- এস. এম. লুৎফব রহমান, *চর্যাপদের ধর্ম দেশনা*, পান্ডুলিপি, (চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়) পঞ্চম খণ্ড, ১৩৮২।
কনক বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাঙ্গলা কাব্য-সাহিত্যের ধারা*, ১৩৫৪।
জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী, *চর্যাগীতির ভূমিকা*, ১৯৯৫;
প্রাচীন ভাবতীয় সাহিত্য ও বাঙ্গালির উত্তরাধিকার, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৩৭১ বঙ্গাবাদ
তমোনাশ দাশগুপ্ত, *প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, ১৯৫১।
প্রবোধচন্দ্র বাগচী, *চর্যাগীতি*, প্রবন্ধ সংগ্রহ, ২০০১।
মণীন্দ্রমোহন বসু, *সহজিয়া সাহিত্য*, ১৯৩২।
মৃণাল নাথ, 'চর্যাগীতির ভাষাব পুনর্মূল্যায়ন', *ভাষা*, যুগ্মসংখ্যা ১৯৮৫-৮৬।
শশিভূষণ দাশগুপ্ত, *বৌদ্ধধর্ম ও চর্যাগীতি*, ১৩৭১ বঙ্গাবাদ।
সুকুমার সেন, *চর্যাগীতি পদাবলী*, ১৯৬৬।
সুখময় মুখোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন কবিদের পরিচয় ও সময়*, ১৯৯৬।

গান্ধী ও গান্ধী-‘বাদ’ : বাংলা কবিতায়

অনুরাধা রায়

এই প্রবন্ধ প্রধানত গান্ধীর প্রথম বৃহৎ সর্বভারতীয় আন্দোলন অর্থাৎ অসহযোগ আন্দোলনে সীমাবদ্ধ থাকবে। অসহযোগের আগে গান্ধী বা গান্ধীবাদ নিয়ে বাংলায় খুব বেশি কবিতা লেখা হয় নি। অসহযোগ পর্বে ‘গান্ধী’ নামটা বাঙালি জাতীয়তাবাদীদের প্রভূত প্রেরণা যুগিয়েছিল এবং ‘গান্ধীবাদ’ ব্যাপারটাও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে প্রয়োগের চেষ্টা হয়েছিল, যদিও খুব ছোট হারে এবং বেশ তাড়াহুড়ো করে। এই সময়ে গান্ধী ও গান্ধীবাদ নিয়ে অজস্র কবিতা রচিত হয়। বিশিষ্ট নৈতিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে গান্ধী যে সামগ্রিক সমাজ-ব্যবস্থার স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং সেই ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য যে বিশিষ্ট পদ্ধতির কথা বলেছিলেন, তা এই সময়ে কবিদের আপ্লুত করেছিল। অসহযোগের পরেও গান্ধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতা থেকে গেলেন এবং তাঁকে নিয়ে কবিতাও রচনা হতে থাকল। কিন্তু এসব কবিতার বিষয় গান্ধী ও তাঁর আন্দোলন, গান্ধীবাদ ততটা নয়। ততদিনে জাতির এজেন্ডা থেকে গান্ধীবাদ প্রত্যাহত—গান্ধী জাতীয়তাবাদী প্রতিরোধ আন্দোলনের নায়ক বলে মান্য, কিন্তু কোন বিশিষ্ট মতাদর্শের প্রবক্তা হিসেবে নয়। তাঁর উচ্চ নৈতিক মর্যাদা, তাঁর ব্যক্তিগত মানুষকে বরাবর প্রত্যয় যুগিয়ে গেছে। তিনি ছিলেন অভয়, মানবতা ও দেশপ্রেমের প্রতীক। কিন্তু তাঁর দার্শনিক বক্তব্য ও আর্থ-সামাজিক প্রকল্প মানুষের মনে দ্রুত গুরুত্ব হারিয়েছিল।

কেন এমন হল? এই গোলমালে ব্যাপারটা আমরা এখানে কিঞ্চিৎ বোঝার চেষ্টা করব। আসলে, অসহযোগের কাল কি তার আগে থেকেই আমরা গান্ধী আন্দোলনে একটা স্ব-বিরোধিতার ব্যাপার লক্ষ্য করি। গোড়ার দিকের এই সময়টাতে মানুষ গান্ধীবাদে খুব আগ্রহ দেখিয়েছিল এবং তা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষাও করতে চেয়েছিল; কিন্তু গান্ধীবাদ ব্যাপারটা তারা ঠিক বুঝতে পারে নি। হয়ত এই স্ববিরোধিতার বীজ নিহিত ছিল গান্ধীর নিজের জটিল ব্যক্তিত্ব ও তদনুযায়ী জটিল নৈতিক আদর্শের মধ্যেই।^১

প্রাক-অসহযোগ

দক্ষিণ আফ্রিকায় সংগ্রামের সূত্রেই গান্ধী ভারতে নামডাক করে ফেলেছিলেন। ১৯১৫ নাগাদ যখন তিনি ভারতে প্রত্যাবর্তন করলেন, তখন এখানে অনেকেই তাঁকে জাতীয় আন্দোলনের নেতা হিসেবে পেতে আগ্রহী। তার আগেই, ১৯১৪-র জানুয়ারি মাসে, যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য একটি কবিতা লেখেন ‘দেশের দাবি’ নাম দিয়ে^২; সেখানে তিনি এমন আগ্রহ প্রকাশ করেন, তবে একটু ঘুরিয়ে। জাতীয় আন্দোলনের নানা দুর্বলতার একটা তালিকা কবি এখানে পেশ করেন। তাতে ছিল— গরিব নিঃস্ব কৃষকদের মধ্যে দেশচেতনার অভাব, ধনীদের স্বার্থপরতা

এবং কবিদের দামামার বদলে ‘বেণু ও বীণা’ বাজানোর কথা (স্পষ্টতই সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের প্রতি কটাক্ষ)। কবি আক্ষেপ করেন যে ভারতের স্বভাব-স্বথতা তাকে ইউরোপ, আমেরিকা, জাপান, এমনকি সদ্য আফিমের-নেশা-ছোটা চীনের থেকেও পিছিয়ে রেখেছে। আর তার সঙ্গেই একটু ঠাট্টা আর দুঃখ মিশিয়ে বলেন— ‘গান্ধীর কথা শোনে না শ্রোতার পাছে লাগে দাঁতকপাটি’।

কেন যতীন্দ্রপ্রসাদ চান যে লোকে গান্ধীর কথা শুনুক? গান্ধী জাতীয় জীবনের ত্রুটিগুলো দূর করতে পারবেন ভেবেই তো? এই সব ত্রুটির মধ্যে চাষিদের দেশচেতনা জাগানো ও ধনীদের স্বার্থপরতা দূর করার বিষয়ে গান্ধী অবশ্যই খুব উদগ্রীব ছিলেন। কিন্তু দামামা বাজানো, যদি বা সেটা নিছক আলঙ্কারিকই হয়, তাঁর অহিংস সত্যাগ্রহের মেজাজের সঙ্গে বোধহয় ঠিক খাপ খায় না। আর জাপান, আমেরিকা ও পশ্চিম দেশগুলির মধ্যে পার্থিব প্রগতির যে প্রতিযোগিতা, তাতে शामिल হবার কোন ইচ্ছেও তাঁর ছিল না। বস্তুত গান্ধীর দর্শন ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত লক্ষ্যের অভিমুখী। যুক্তিবাদ, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, শিল্পায়ন ইত্যাদি নিয়ে যে আধুনিকীকরণের প্রকল্প পাশ্চাত্যে সূচিত হয়েছিল ও রমরম করে চলছিল, উনিশ শতক থেকেই ভারতের জাতীয়তাবাদীরা তাতে মুগ্ধ ছিলেন এবং ঐ প্রকল্পেরই অনুসরণে জাতি হিসেবে নিজেরা সার্থক হতে চেয়েছিলেন (জাতীয়তাবাদের আদর্শও তো তাঁরা ধার করেছিলেন এই প্রকল্পেরই অংশ হিসেবে)। গান্ধী কিন্তু কখনো ঐ প্রকল্পের মোহে পড়েন নি এবং ভারতের জন্য তাঁর আকাঙ্ক্ষা ছিল একেবারে ভিন্ন রকম। যতীন্দ্রপ্রসাদ গান্ধীকে জাতির নেতা হিসেবে চাইলেও এই ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারেন নি। তবে একটা জিনিস তিনি ঠিকই বুঝেছিলেন যে গান্ধীবাদ বোঝা ও অনুসরণ করা সহজ কথা নয়, তাতে সাধারণ মানুষের খুবই অস্বস্তি (দাঁতকপাটি) হবার কথা।

গান্ধীকে অল্প বোঝা ও ভুল বোঝার গরিচয় আমরা কাছাকাছি সময়ে লেখা আর একটি কবিতাতেও পাই। ১৯১৪ সালের এপ্রিল মাসে কোন এক অজ্ঞাতনামা কবি লেখেন ‘আফ্রিকায় ভারতবাসী’ শীর্ষক এক দীর্ঘ কবিতা।^৩ এই কবির জাতীয়তাবাদী আবেগকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীর কার্যকলাপ। বিদেশের মাটিতে গান্ধীর পরীক্ষা-নিরীক্ষা ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পক্ষে কতটা তাৎপর্যপূর্ণ (যে তাৎপর্য তখনো ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত হয় নি) কবিতায় সেটাই আলোচিত। কবিতা খুব উঁচু মানের নয়, কিন্তু কবি অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন বলতেই হবে:

ওই সুদূরে সাগরপারে জাগল দেশের জাতীয়তা।

জাগল প্রাণে জাতির গরব, ফুটল মুখে সজীবতা।

মরবে মিলে মরণ ভাল, বীরের মত মরবে তারা,

কসুর বিনে পশুর মতো অসুরগুলো করবে সারা?

সেখায় তারা জাত ভুলেছে, পরস্পরে গভীর প্রীতি,

মানের দায়ে প্রাণ সঁপেছে, আত্মদানের উজ্জল রীতি!

কুলী মজুব উকিল হাকিম ধনি বণিক ব্যারিস্টার

গান্ধীর কথায় এক হয়েছে, মানছে তাঁকে অনিবার।

মুষ্টিমেয় স্বার্থত্যাগী আফ্রিকাতে রাখল মান,

গান্ধী শিরে আশিস ঝরে, অর্ঘ্য দিল বিশ্বপ্রাণ।

তারপর 'নববর্ষের পণ' (কবিতাটি বাংলা নববর্ষের দিন রচিত):

জমাটবাঁধা জাতীয়তার ক্ষুদ্র চারা আনতে হবে,
 নীরসতার মকমকানি সরসতায় আসবে কবে?
 গান্ধী যেমন সন্ধি করেন তেমনি ধারা সন্ধি চাই
 জগৎ জুড়ে উদাস সুরে গান্ধীগাথা শুনতে পাই
 যা পেয়েছি ছাড়ব নাকো, বিশ্বমাতার নিঃস্বদান।
 উপকে পাহাড় সাগর মেরু আনব দেশে জাতির মান।
 আনতে হবে লুপ্ত গরব, ছাড়ব না তো ছাড়ব না
 বুঝে-শুনেই চলব মোরা মুখের গরাস কাড়ব না।
 ধর্মবীরের কর্মবীরের বীরবীরের বংশধর
 ফতুর হয়ে ফিরবে বুঝি টহল দিয়ে বিশ্বপর?
 জাপুক মৃত জাতির প্রাণে সঞ্জীবনী, সাধন-রীতি।
 বাজুক প্রাণের সকল তারে সাম্য-সুরের গর্ব-গীতি।
 বিশেষত্ব বজায় রেখে রাখব ঋষির অভিমান।
 ফেলব ছুঁড়ে আঙাছুঁড়ে কুসংস্কার অপমান।
 সয় না মোদের বিলাসিতা, যুগ পড়েছে আত্মবোধের,
 যুগের সাথে যাচ্ছি ছুটে, ডঙ্কা বাজাও, শঙ্খা কিসের?
 আজকে বিশাল ভারতবাসী জাতীয়তার গীতি গায়।
 ছিন্ন জাতির জাতীয়তা বীধল জমাট আফ্রিকায়।

বোঝাই যাচ্ছে এই কবিকে গান্ধীর যে দিকটি সবথেকে মুগ্ধ করেছে তা হল সুদূর দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁর একটি সংহত ভারতীয় জাতি গড়ে তোলা। সত্যি করেই দক্ষিণ আফ্রিকার বিশেষ পরিস্থিতি গান্ধীকে নানা প্রদেশ, ধর্ম ও শ্রেণির ভারতীয়দের মেলাতে খুব সাহায্য করেছিল। গুজরাটি, তামিল, শ্রমিক, বণিক, ব্যবহারজীবী, হিন্দু, মুসলমান, পারসি ও খ্রিস্টান—সব ভারতীয় সেখানে অনায়াসে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। গান্ধী যদি ভারতেই কোথাও থাকতেন এবং তাঁর আন্দোলনের লক্ষ্য যদি বর্ণবিদ্বেষ না হয়ে অন্য কিছু হত, তবে বোধহয় এমন একটি সর্বভারতীয় আন্দোলন গড়ে তোলা তাঁর পক্ষে সহজে সম্ভব হত না। কবির চোখে দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে একটি ছোটো কিন্তু প্রকৃত অর্থে ভারতীয় জাতির চারা মাথা তুলেছে গান্ধীর আন্দোলনের দৌলতে। কবির ইচ্ছে সেই 'জমাটবাঁধা জাতীয়তার ক্ষুদ্র চারাটি ভারতের মাটিতে এনে পুঁতে দেওয়া হোক।

দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীর আদর্শ ও কর্মপদ্ধতির যে মহাহ্যায় ও কার্যকারিতা প্রকাশিত হয়েছিল তাতেও কবি মুগ্ধ। বিলাসিতা ও কুসংস্কার ত্যাগ করা গান্ধীবাদের সঙ্গে সুসমঞ্জস, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বও তাই। তাছাড়াও কবি সঠিকভাবেই গান্ধী আন্দোলনে মর্যাদাবোধ ও আত্মত্যাগের গুরুত্বের কথা বলেছেন, এবং অন্যের 'মুখের গরাস' কাড়ার প্রশ্ন নেই সেখানে। আর সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ কথা যেটা কবি বুঝেছেন তা হল গান্ধীর আন্দোলন নিছক সংকীর্ণ রাজনৈতিক-সামাজিক লক্ষ্যে চালিত নয়, এটি সর্বোপরি এক নৈতিক আন্দোলন যেখানে পদ্ধতি লক্ষ্যের মতোই গুরুত্বপূর্ণ। আর গান্ধীর আদর্শ ও পদ্ধতি যে ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনেও নতুন প্রাণ সঞ্চার করতে পারবে এ ব্যাপারেও কবি নিশ্চিত। সারা পৃথিবীতে

ইতিমধ্যেই যে এইসব আদর্শ ও পদ্ধতি সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি পেয়েছে সেটা কবির উৎসাহিত হবার অতিরিক্ত কারণ।

গান্ধীর গণ-আন্দোলনের বিশিষ্ট ধরন ও তাঁর নেতৃত্বের বিশিষ্ট শৈলীও দক্ষিণ আফ্রিকাতেই সূচিত হয়েছিল। তার মধ্যে ছিল দরকারমতো বিরোধী পক্ষের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় বসা ও সমঝোতায় আসার তৎপরতা। গান্ধী নিজে এর আদর্শগত ন্যায্যতায় বিশ্বাস করতেন। কিন্তু আন্দোলনের সাধারণ অংশগ্রহণকারীদের চোখে এটা প্রায়ই অসুবিধাজনক মুহূর্তে একতরফা আন্দোলনের প্রত্যাহার বলে মনে হত। পরবর্তীকালে ভারতেও তাঁর এই ধরনের প্রত্যাহার নিন্দিত হয়েছে, আর দক্ষিণ আফ্রিকায় তো গান্ধীকে এর জন্য রীতিমতো শারীরিকভাবে নিগৃহীত হতে হয়। ‘আফ্রিকায় ভারতবাসীর’ কবি কিন্তু গান্ধীর নেতৃত্বের এই দিকটিও অনুমোদন করেন— ‘গান্ধী যেমন সন্ধি করেন তেমনি ধারা সন্ধি চাই’ পঙ্কজিতে তা স্পষ্ট।

কিন্তু সব মিলিয়ে এই কবি গান্ধীবাদ খুব ভালো বোঝেন নি, বিক্ষিপ্তভাবে বুঝেছেন। বস্তুত তাঁর কবিতার প্রধান প্রতিপাদ্য গান্ধীর মাহাত্ম্য নয়, ভারতীয় জাতির গৌরব— যা গান্ধীর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি ও তাঁর আন্দোলনে আস্থা রাখার সঙ্গে সঙ্গে স্মরণ করা হয়েছে। এবং যেভাবে স্মরণ করা হয়েছে, বলতেই হবে তা গান্ধীবাদের বিরোধী। ভারতের প্রাচীন গৌরবের তিনটি দিকের কথা কবি বলেছেন— ধর্ম, কর্ম ও বীর্য। কবিতাটির অন্যত্র তিনি অন্য কোনো কোন জাতের তুলনায় ভারতীয়দের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনেরও চেষ্টা করেছেন :

আমরা কি এই ত্রিশকোটি আমেরিকার আদিমবাসী?

কাক্সি, বুয়াব— বন্য শস্যের? আমরা সবাই ভারতবাসী।

কোথায় নারী অনল বরি জীবন করে বিসর্জন?

কাদের তাপে সেদিন কাঁপে পাহাড়সম সিংহাসন?—

দেখা যাচ্ছে, এই কবির জাতীয়তাবাদী গর্বের একটি বড়ো উৎস ‘ইতিহাস’, যা অবশ্যই সুবিধাজনকভাবে নির্মিত এবং কবি চান সমসাময়িক ভারতীয়রা তাদের গৌরবময় ইতিহাসের উপযুক্ত হয়ে উঠুক। সেই গৌরবের অভিমান যাঁদের জন্য, তাঁদের মধ্যে অবশ্যই আছেন প্রাচীন ভারতের ঋষিরা, এবং কবি সম্ভবত গান্ধীকে তাঁদেরই সমপর্যায়ের বলে মনে করেছেন। যে ইতিহাসপ্রিয়তা উনিশ শতক থেকেই ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের মনে প্রবল হয়ে ছিল এই কবি স্পষ্টতই তাঁর শামিল। আমরা কিন্তু জানি যে গান্ধী ছিলেন প্রচলিত জাতীয়বাদী চিন্তা-কাঠামোর বাইরে, তার যুক্তিবিন্যাসও তাঁর সমর্থন ছিল না। যেমন আমরা একটু আগে দেখলাম যে তিনি অন্যান্য জাতীয়তাবাদীদের মতো পাশ্চাত্যের আধুনিকতার প্রকল্পে ভরসা রাখতেন না, তেমনি জাতীয়তাবাদী ইতিহাসচিন্তাও তাঁর নয়। তাঁর কাছে নৈতিকতার নীতিনিয়ম সার্বজনীন, অপরিবর্তনীয় ও ইতিহাস-বহির্ভূত। তাঁর পড়া ভারতের ইতিহাস থেকে-মাঝে-মাঝে কিছু দৃষ্টান্ত তিনি অনুসরণযোগ্য বলে তুলে ধরতেন না যে তা নয়, কিন্তু সে তাদের ঐতিহাসিক প্রামাণিকতার জন্য নয়, তাদের নৈতিক শক্তি ও ফলত ইতিহাস-নিরপেক্ষতার জন্য। উলটোদিকে আবার ভারতের ইতিহাসের কিছু জিনিস তাঁর অনুমোদন পায় নি মোটেই। সন্দেহ হয়— ‘পাহাড়সম সিংহাসন’ কাঁপানোর তাপ, যা ক্ষত্রিয়দের বাহুবলের দাপ বলেই চট করে মনে হয় (বিশেষ করে ঠিক তার আগেই ক্ষত্রিয় ললনাদের

জহরব্রত পালনের উল্লেখের জন্য), বোধহয় সেইরকমই একটা কিছু। তাছাড়াও মনে রাখা দরকার, জাতির জনক বলে পরিচিত এই মানুষটি কিন্তু প্রাথমিকভাবে জাতীয়তাবাদী নয়, মানবতাবাদী ছিলেন। অন্তত অন্য জাতিকে হেনস্থা করার মতো আগ্রাসন তাঁর জাতীয়তাবাদে ছিল না। ভারতীয় জাতির গৌরব প্রতিষ্ঠার জন্য আফ্রিকা বা আমেরিকার আদিম জনগোষ্ঠীগুলির অপমান নিশ্চয় গান্ধীর মানবমর্যাদা-বোধের অনুকূল নয়।

অসহযোগ আন্দোলন : এক রাজনৈতি-অতিরিক্ত আন্দোলন

গান্ধী ভারতে ফিরলেন ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে এবং কয়েক মাসের মধ্যেই হয়ে উঠলেন জাতীয় আন্দোলনের সবথেকে বড়ো নেতা। ১৯২১ সালে তিনি শুরু করলেন তাঁর প্রথম বড়ো সর্বভারতীয় আন্দোলন— পাঞ্জাব (জালিয়ানওয়ালাবাগ) ও খিলাফত সংক্রান্ত অবিচারের প্রতিকার এবং স্বরাজ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে। গোটা ১৯২১ জুড়ে এবং ১৯২২-এর গোড়া পর্যন্ত চলল আন্দোলন। বাঙালি কবিরা সোৎসাহে তাতে যোগ দিলেন। তাঁরা শুধু জনমোহিনী শক্তির অধিকারী এক নেতা হিসেবে গান্ধীকে সমর্থন করলেন না, যে নৈতিক ব্যবস্থা তিনি ভারতে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন এবং তার জন্য যে নৈতিক পন্থা বাতলেছিলেন তাকেও সমর্থন করলেন। আবেগ ও নীতিবোধের দিক দিয়ে কবিরা এইসময় গান্ধীবাদের খুব নিকটে চলে আসেন— যে নৈকট্য গান্ধী-আন্দোলনের পরবর্তী সিকি-শতকে আর কখনো অনুভূত হয় নি। নৈতিক দর্শনের সঙ্গে সামাজিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও রাজনৈতিক পুনর্গঠন মিলিয়ে যে গান্ধীবাদ, তা তাঁরা বোঝবার চেষ্টা করলেন খানিকটা। কিন্তু খুব যে সফল হলেন তা নয়। গান্ধীবাদ আসলে তাঁদের আবেগকে যতটা মথিত করেছিল, যুক্তিতে ততটা নাড়া দেয় নি। কাজেই গান্ধীকে অল্প বোঝা ও ভুল বোঝাটা থেকেই গেল। তার সঙ্গে একটা নতুন মাত্রা যুক্ত হল এই সময়। গান্ধীবাদ বোঝার ফাঁকটা ভরাট হল গান্ধীর এক অতিমানবিক ভাবমূর্তি কল্পনা করে। গান্ধী যেন ঐশ্বরিক ক্ষমতাসম্পন্ন এক মানুষ বা সত্যিই এক অবতার— ভারতবাসীর পরিব্রাজকের উদ্দেশ্যে যিনি ধরাতেলে আবির্ভূত। সাধারণ মানুষের (কবিদেরও) গান্ধী ও গান্ধীবাদ-সংক্রান্ত কল্পনায় লজিকের সঙ্গে আশ্চর্যজনকভাবে মিশে গেল ম্যাজিকের ধারণা।

গান্ধীর আন্দোলন যে নিছক রাজনৈতিক আন্দোলন নয়, এটা অধিকাংশ কবিই ঠিক বুঝেছিলেন। তাদের কাছে এ আন্দোলন সত্য ও নৈতিকতার আন্দোলন। এর মুখ্য উদ্দেশ্য সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা নয়, এমনকি জাতীয় উন্নয়নও নয়, এর উদ্দেশ্য প্রতিটি মানুষকে উচ্চতর জীব ও মানব-সমাজকে শ্রেয়োত্তর সংগঠনে পরিণত করা। যথার্থই গান্ধীর আন্দোলন ছিল জাতীয় আন্দোলনের থেকে বেশি-কিছু— মহত্তর মানবতার বোধ ছিল তার প্রেরণা। একদিকে প্রতিটি ব্যক্তিমানুষ, অন্যদিকে সমগ্র মানব-সমাজ ছিল তাঁর আন্দোলনের লক্ষ্য। কিন্তু তিনি জানতেন ব্যক্তি-মানুষকে তিনি যেভাবে পরিশীলিত করতে চান, তার জন্য পরীক্ষা চালাতে হবে সামাজিক স্তরে। এই পরীক্ষার ক্ষেত্র হিসেবে তিনি স্বাভাবিকভাবেই বেছে নেন তাঁর নিজের দেশ ভারতবর্ষকে। এটাও তাঁর মনে হয়েছিল যে ভারতের মতো বিশাল ও জটিল সমাজে যদি তাঁর পরীক্ষা সফল হয় তবে তা সারা বিশ্বের জন্যই দৃষ্টান্ত হবে।

সরকারের সঙ্গে অসহযোগ গান্ধীর কাছে চাষ করার আগে আগাছা পরিষ্কার করার মতো। এটা সরকারের বিরোধিতা নয়, সরকারের কাছে ভারতবাসীর সঙ্গে সহযোগিতা করার আহ্বান—

তাদের কাক্ষিত নৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার জন্য। ঐ নৈতিক ব্যবস্থাটাই মূল লক্ষ্য। তাই অসহযোগ আন্দোলনের কবিতায় আমরা ব্রিটিশরাজের বিরোধিতা, এমনকি ব্রিটিশের নামোল্লেখও পাই না অধিকাংশ সময়। বরং জোরটা ছিল ভারতবাসীর আত্মার জাগরণের ওপর, যার ফলে নাকি দূর হয়ে যাবে মানুষে মানুষে ধর্ম জাতপাত ও অন্য সব ব্যবধান, ন্যায় ও প্রেমের ভিত্তিতে তৈরি হবে নতুন সমাজ। কবিতার পর কবিতায় উঁচু জাত-নিচু জাত, হিন্দু-মুসলমান ও ধনী-দরিদ্রের মধ্যে সৌভ্রাতৃত্বের কামনা। প্রতিটি ব্যক্তির প্রতি আত্মমর্যাদা, আত্মপ্রত্যয়, আত্মনির্ভরতা, আত্মসংযম ও আত্মত্যাগ অনুশীলনের আহ্বান। সরল জীবন ও উচ্চ চিন্তার আদর্শের প্রচার। আর চিন্তাবল দিয়ে অস্ত্রবল জয় করার আবেদন। এসব সত্যি করে গান্ধীরও বক্তব্য ছিল।

‘সুধাকর’ নামে এক কবি তাঁর স্বরাজ-সংগীত বইতে লিখলেনঃ

কষ্টপাথর হয় রে গান্ধী মানুষ ধরার পেতে ফাঁদ,
সত্যধর্ম মন্ত্রদানে ভেঙে দিল প্রাণের বাঁধ।

মোসলেম ভারত পত্রিকায় সুধাকর রায়চৌধুরীর গান্ধীবক্ষনাঃ

বন্দি তোমায় মানব-গুরু, সত্যি ভাবের রত্ন গো,
মিথ্যাচারের ভাঙতে গবব নিত্য তোমার যত্ন গো।
আত্মত্যাগের শক্তি-নিশান উড়িয়ে দিয়ে শূন্যেতে
ভবিষ্যে নিলে হৃদয় আপন প্রেম-সাধন পুণ্যেতে।
আসন আপন বিছিয়ে নিলে কুলি মজুর সঙ্গেতে
মোটো সূতোর পুণ্য বস্ত্র জড়িয়ে নিলে অঙ্গেতে।

মীর ফজলে আলির ‘নবীন ভারত’ শীর্ষক কবিতা মোসলেম ভারতে-ইঃ

মানবের মহা মুক্তি সাধিতে চরম পাশব শক্তি নাশিতে
চিন্তবলের ঘোষিছে মহিমা অজ্ঞেয় মূর্তি ধর্মবীর গান্ধীজীর;
সে মহামন্ত্রে নিযেছে দীক্ষা অযুত তাহার ভক্তবীর
নবীন ভারত। নবীন ভারত! ওই শুন রব জয়-ভেরীর।

চিন্তবলের জয়ধ্বনিতে মুখর অসহযোগ আন্দোলনের কাব্য। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ‘কয়াধু’ নামে রূপক-কবিতা লিখলেন পৌরাণিক প্রত্নদের কাহিনি অবলম্বনে।^১ সেখানে ঘোষণা:

চিন্তবলের লড়াই শুরু পশুবলের সাথে।

ধর্মীয় আবেগ

বলা বাহুল্য, ঐ ধরনের আদর্শবাদিতার সঙ্গে জড়িয়ে ছিল একটা ধর্মীয় আবেগ। গান্ধী নিজে অত্যন্ত ধার্মিক ছিলেন। তাঁর সত্যের সন্ধান ঈশ্বরেরই সন্ধান। ঐশ্বরিক বিধানে তাঁর পরম বিশ্বাস এবং সেটাই তাঁর নৈতিকতার ভিত্তি। প্রেম ও ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত তাঁর আদর্শ সমাজ-ব্যবস্থা ঈশ্বরেরই রাজত্ব। মানবতার সপক্ষে যত আদর্শবাদী ধর্মীয় আন্দোলন পৃথিবীতে হয়েছে তাদেরই মূল কথাগুলি নিয়ে যেন গান্ধীর মতাদর্শ। ভারতীয় সংস্কৃতিতে তো এমন অনেক মরমিয়া আন্দোলনই বড়ো স্থান অধিকার করে রয়েছে। কবিদের মনে হল গান্ধী যেন সেই ঐতিহ্যেরই ধারা বেয়ে এসেছেন। কবিতায় প্রায়ই গান্ধীর তুলনা হয়েছে চৈতন্য, বুদ্ধ, খ্রিস্ট ও মোহাম্মদের সঙ্গে।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের ‘গান্ধিজী’র বর্ণনা এরকম^৮:

যারে মাঝে পেয়ে কাজিয়া থামায় হিন্দু ও মোসলেম
আত্মদমন স্বরাজ সমঝি ভুঞ্জে পরম প্রেম,
মহম্মদের ধর্ম-শৌর্য যাহার জীবন মাঝে
বুদ্ধদেবের মৈত্রীতে মিলি স্মুরিছে নবীন সাজে;
সারাটা জীবন খ্রীস্টদেবের জুশ যে বহিছে কাঁধে
বিস্কৃত-পদে কষ্টক-পথে ‘সত্য’-ব্রত যে সাথে।

দেবকুমার রায়চৌধুরী *নারায়ণ-এ* লিখলেন^৯:

সব ভেদাভেদ ডুলি ভায়ে ভায়ে কোলাকুলি
উচ্চ-নীচ নাহি আর— প্রেমে একাকার,
চৈতন্যচন্দ্রের বঙ্গে প্রমত্ত তরঙ্গ ভঙ্গে
দিব্য চৈতন্যের বন্যা বহিল আবার।

‘পৃথিবী বিধান যাক পুড়ে, বিশ্বের বিধান সত্য হোক’ ডাক দিয়ে গান্ধী নজরুল ইসলাম বললেন:

চিনেছিল খ্রীস্ট বুদ্ধ কৃষ্ণ মোহম্মদ ও রাম
মানুষ কি আর কি তার দাম।
তাই মানুষ যাদের করত ঘৃণা তাদের বুকে দিলেন স্থান
গান্ধী আবার গায় সে গান।

জসীমুদ্দীন ‘মিলন গান’ নামে কবিতা লিখলেন *মোসলেম ভারতে*^{১০}:

অস্ত্র কি চাই? কামান, গোলা? ফেলে দে সব সাগরজলে;
দাগা কামান— মনের কামান, বন্দিনী মার চরণতলে।
মনে কি নেই বুদ্ধ তোদের অস্ত্র ছেড়ে মস্ত ধরি
গড়ল ভারত-সাগর বুকে পরপারের মুক্তি-তরী?
নিমাইটাদের বিশ্ববিজয়। নদীয়ারি প্রেমের গোরা
এ যে তোদের বুকের পাঁজর, ভুলতে কি রে পারিস তোরা?

কোনো অজ্ঞাতনামা কবির গ্রন্থ *স্বদেশ গীতি*-তে পাই^{১১}:

এ যে সেনাপতি বোনাপাটি নয়
ভবুও ঘটিবে কি মহাপ্রলয়
পাইবে নেটালে সেই পরিচয়
কত শৌর্য কাছে হটিয়ে।
বর্তমান যুগের নিমাই সম্যাস,
হেরিতে কাহারো (যদি) থাকে অভিলাষ,
সর্বত্যাগী এ দাঁড়িয়ে শ্রীদাশ,
এসেছে সে ডাকে বেরিয়ে।

এখানে গান্ধী নয়, চিত্তরঞ্জন দাশ নিমাইয়ের সঙ্গে উপমিত। কিন্তু গান্ধী তো দাশেরও নেতা— সর্বস্বত্যাগের প্রেরণাদাতা।

বুদ্ধ, খ্রিস্ট, মোহম্মদ ও শ্রীচৈতন্য তো সাধারণ মানুষের কাছে দৈবী শক্তিসম্পন্ন মহামানব এমনকি অবতার বলেই পূজিত। কৃষ্ণ ও রাম বহু ভারতবাসীর পরম দেবতা।

এখন গান্ধীর ভাবমূর্তিও হল অনেকটা এরকমই। মোহিতলাল মজুমদার *মোসলেম ভারত*—এ প্রকাশিত ‘আবির্ভাব’ কবিতায় গান্ধীকে ‘অবতার’ই আখ্যা দিলেন^{১২}:

কোন যাদু জানে এ নবগহী! এ কি ভাব, এ কি ভাষা।
অনলদগ্ধ শুদ্ধচরিত— উদ্দাম ধায় আশা।
অধরে তাহার মৌন মহিমা, ললাটে অমৃত-ভাতি,
নয়নে গভীর প্রসাদ-দীপ্তি, হেরিছে প্রভাত রাত্তি।
কীর্ণ তনু, তবু বস্ত্রে রুখিতে— ঝড়েরে বাঁধিতে জানে
উদ্যত ফণা কালীয় তাহার বাঁশির শাসন মানে।
জনসমুদ্রে কল্লোল ওঠে— ‘অবতার! অবতার!’
রুদ্ধ-নিশাসে হেরিছে ভারত নবলীলা অবতার।

মহাজাগরণ

গান্ধীর অভিনব আন্দোলন ও তাতে ভারতবাসীর অভূতপূর্ব সাড়া চারিদিকে উজ্জীবন ও আশাবাদের মেজাজ জাগিয়ে তুলল। মানুষের আত্মমর্যাদাবোধ জেগে উঠল ও তারা যেন ভয়কে জয় করার শক্তি লাভ করল। তাদের মনে হল যেন প্রেম ও আত্মত্যাগের শক্তির সাহায্যে অস্ত্রবলের মুখে রুখে দাঁড়ানো যায়, এমনকি তাকে পরাভূতও করা যায়। এইভাবে ভারতবর্ষ এক নবযুগে উত্তীর্ণ হল। কাব্যেও এই মেজাজটা প্রতিফলিত।

জাতীয় আন্দোলনের সুবিখ্যাত চারণ মুকুন্দদাস ডাক দিলেন^{১৩}:

কাঁপায়ে মেদিনী কর জয়ধ্বনি
জাগিয়া উঠুক মৃত প্রাণ।
জীবন রণে জীবন দানে
সবারে করহ আগুয়ান।
হাতে হাতে ধরি ধরি দাঁড়াবে সারি সারি
প্রাণে বাঁধিবে তবে প্রাণ
আলস্য জড়তা নিবাস বারতা
দূরে করিবে প্রয়াণ।^{১৪}

প্যারীমোহন সেনগুপ্ত *নারায়ণ* পত্রিকায় লিখলেন ‘স্বদেশ-বোধন’:

আজকে আমার স্বদেশ জুড়ে প্লাবন জেগেছে
প্লাবন ওরে, মাতন ওরে, পরাণ মেতেছে
দেশ জেগেছে, প্রাণ জেগেছে, শক্তি জাগরুক,
বিপদ জিনে আনতে বিজয় আজ সবে উন্মুখ।

গোলাম মোস্তাফার ‘নূতন যুগ’ *সওগাত* পত্রিকায়^{১৫}:

আজকে এ কোন নূতন যুগের নূতন আপোকে
ভারতভূমি উঠল হেসে পরম পুলকে।
ভয়-চকিত ছিল যারা বেঁচেই মরিয়া
মর্যাদাহীন দাসের অধম জীবন ধরিয়া,
তারাই আজ শূন্যহাতে মুক্তি-রণ রঙ্গে মাতে।
ভয়কে আজি দেখায় যে ভয় স্পর্ধা করিয়া।

স্বরাজ-সাধন ও চরকার গুণগান

কিন্তু ব্যক্তিজীবনে বুপায়িত হওয়ার থেকে বেশি কিছু দাবি করত গান্ধীর মতবাদ। শেষ পর্যন্ত তা পাকাপোক্ত প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেতে চেয়েছিল। যে প্রতিষ্ঠানের নাম অসহযোগ আন্দোলনের মধ্যে পরিণত হয় তা হল 'স্বরাজ'। আর সেই স্বরাজের কর্মসূচিতে চরকার স্থান প্রধানতম। অসহযোগের কাব্যে স্বরাজ ও চরকা দুইয়েরই বহুল উল্লেখ। তবে বলা বাহুল্য, কবিরা এই দুটি ধারণা বুঝেছিলেন যে যার নিজের মতো করে। কিন্তু কে কী বুঝেছিলেন এটা বোঝার আগে আমাদের এ বিষয়ে গান্ধীর ভাবনাটা বুঝে নেওয়া দরকার।

গান্ধীর কাছে স্বরাজ মানে নিজের জীবনের ওপর নিজের নিয়ন্ত্রণ— প্রতিটি ব্যক্তির। তিনি বলেন এটা সম্ভব হতে পারে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে, কারণ কেন্দ্রীভূত ক্ষমতাই হিংসার উৎস। হিংসা বলতে শুধু শারীরিক নিগ্রহ ও রক্তপাত নয়, ব্যক্তিত্বের ধ্বংসই হিংসা। এরকম দমনমূলক কেন্দ্রীকরণের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত রাষ্ট্র। ব্যক্তিক্ত স্তরে স্বয়ম্ভরতা দিয়ে সেই হিংসার প্রতিরোধ প্রয়োজন। প্রতিটি ব্যক্তির উচিত নিজের খাদ্য-বস্ত্র যথাসাধ্য নিজেই উৎপাদন করা এবং এসবের জন্য কোন কেন্দ্রীভূত শক্তির ওপর নির্ভর না করা। অবশ্য মানব-সমাজে পুরোপুরি স্বয়ম্ভর হওয়া কারো পক্ষেই সম্ভব না। বেঁচে থাকার জরুরি প্রয়োজনগুলি মেটাবার জন্য মানুষকে পরস্পরের ওপর নির্ভর করতেই হয়। তার জন্য গান্ধীর বিকল্প ব্যবস্থা— ব্যক্তির মিলিত হোক গ্রামস্তরে সমবায়মূলক ব্যবস্থার মধ্যে। এতে কেউ কারোর ওপর আধিপত্য বিস্তার করবে না, কেউ কারোর অধীন হবে না। সমমর্যাদার কিছু ব্যক্তিমানুষ স্বেচ্ছায় সামাজিক নিয়ন্ত্রণ মেনে নেবে নিজেদের প্রত্যেকের ও সমগ্র সমাজের মঙ্গলের জন্য। সুতরাং গান্ধীর বিকেন্দ্রীকরণ প্রকল্পের একক হল গ্রাম— যা শুধু অর্থনৈতিকভাবেই নয়, প্রশাসন ও প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রেও স্বয়ম্ভর। তবে কোনো কোনো ব্যাপারে গ্রামস্তরের সংগঠন যথেষ্ট না হতে পারে। তার জন্য উল্লিখিত নীতির ভিত্তিতেই একাধিক গ্রামের সমবায় প্রয়োজন। এই হল গান্ধীর স্বপ্নের সমাজব্যবস্থা— গ্রামীণ আবহাওয়ায় ব্যক্তিমানুষের স্বেচ্ছামূলক সমবায়িক সংগঠন। এই তাঁর গ্রাম পঞ্চায়েত বা গ্রাম-স্বরাজ— ব্রিটিশ-পরিচালিত কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রের বিকল্প। গান্ধীর মতে, পঞ্চায়েত রাজই ছিল ভারতের সুপ্রাচীন ঐতিহ্য— ঔপনিবেশিক অর্থনীতি ও দমনমূলক বিদেশি শাসন যতদিন না এসে তাকে হটিয়ে দেয়। তিনি চান ভারত আবার তার সমাজ-সংগঠনের সেই সত্য নীতিতে প্রত্যাবর্তন করুক।

কাজেই গান্ধী ব্রিটিশ শাসনকে সমালোচনা করেন খুব মৌলিক স্তরে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ যে সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থার ওপর প্রতিষ্ঠিত তিনি আসলে তারই সমালোচক। 'যত পার উৎপাদন কর, যত পার ভোগ কর ও তার জন্য নির্মম প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হও'— সীমাহীন আকাঙ্ক্ষার এই যে মানসিকতা, গান্ধীর মতে, এটাই রয়েছে সাম্রাজ্যবাদের পিছনে এবং এর জন্যই ব্রিটেনের মতো দেশ উপনিবেশ গড়ে তুলেছে অর্থনৈতিক শোষণের উদ্দেশ্যে। অনেক আগেই, ১৯০৯ সালে, *হিন্দু স্বরাজ* গ্রন্থে গান্ধী নিজের এই অবস্থান স্পষ্ট করে দেন এবং সারা জীবন তিনি সেখান থেকে তেমন সরে আসেন নি। *হিন্দু স্বরাজে* ভারতেতিহাস সম্পর্কে সাধারণভাবে তাঁর যে আশ্রুত ভাব ছিল তা পরে কেটে গেলেও নৈতিক আদর্শটা বদলায় নি। তাঁর স্বরাজ-সাধনার তাত্ত্বিক ভিত্তি এইভাবেই রচিত হয়েছিল। পাশ্চাত্য-প্রদর্শিত আধুনিক সভ্যতার বিকল্প তাঁর স্বরাজ। তিনি চেয়েছিলেন সম্পূর্ণ অন্যরকম

এক সমাজ, যেখানে থাকবে না হৃদয়হীন প্রতিযোগিতা ও সাড়স্বর ভোগ। তিনি বলেন—
এটা না হলে তো রাজনৈতিক স্বাধীনতা মানে দাঁড়াবে 'ইংরেজ ছাড়াই ইংরেজ শাসন'।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পুনরুজ্জীবন ও আত্মনির্ভরতার জন্য গান্ধী খুব বেশি ভরসা করেছিলেন চরকার ওপর। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে চরকাকে তিনি কেন্দ্রীয় ভূমিকা দিতে চেয়েছিলেন। চরকা শুধু নয়, আরো যত সহযোগী কুটিরশিল্প— যাদের কার্যকারিতা প্রধানত নিজেদের ব্যবহারের জন্য উৎপাদনে— গ্রামের মানুষকে স্বয়ংস্বর করে তুলবে, এই ছিল তাঁর আশা। তাছাড়াও তাঁর আশা, চরকা আনবে সক্রিয়তা ও শৃঙ্খলা, বেকার সমস্যাও সমাধান করবে। তাঁর মতে, কোটি কোটি গ্রামীণ ভারতবাসীর সত্যিকারের অর্থনৈতিক অবলম্বন হতে পারে চরকাই। শিল্পায়িত উৎপাদন ব্যবস্থা এবং তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রতিযোগিতা, বিলাসিতা, অপচয়, দুঃখ-কষ্ট ও দারিদ্র্য— এসবের গান্ধীয় বিকল্প হল চরকা। তবে শুধু গ্রামের গরিব মানুষ নয়, গান্ধী চরকা কাটার পরামর্শ দিয়েছিলেন শহুরে ও ধনী ব্যক্তিদেরও। কারণ তাঁর মতে আলস্য ও উদাসীনতার অসুখ থেকে চরকাই পারবে মানুষকে মুক্তি দিতে, চরকাই পারবে তাদের মধ্যে স্বাধীনতার শক্তি জাগাতে। সুতরাং শুধু গ্রামাঞ্চলের বাস্তব অর্থনৈতিক প্রয়োজনের দিক থেকে নয়, চরকার নৈতিক প্রয়োজনও তাঁর কাছে খুব বড়ো ছিল।

অসহযোগের কবিতা স্বরাজের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছেন বারে বারে। তবে স্বরাজকে কেন্দ্র করে গান্ধীর সম্পূর্ণ পরিকল্পনাটা তাঁরা খুব একটা ধরতে পারেন নি। তাঁরা এটুকুই বুঝেছিলেন যে স্বরাজ শুধু রাজনৈতিক দমন থেকে মুক্তি দেবে না, অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্যও আনবে এবং সাধারণভাবে মানুষের দুরবস্থা দূর করবে। এটাও তাঁরা বুঝেছিলেন যে গান্ধীর স্বরাজ ব্যাপারটা গ্রামকেন্দ্রিক। কিন্তু এইটুকু বুঝেই বেশির ভাগ কবির কাছেই স্বরাজ যেন এক স্বর্গরাজ্য, যেখানে সবার সব সমস্যার সমাধান হবে।

অসহযোগ আন্দোলনের কিছুদিনের মধ্যেই এক গ্রামীণ কবি রচিত গভীর গানে বন্যা ও মহাজনী শোষণের প্রতিকার হিসেবে স্বরাজ কল্পিত। ভোলা অর্থাৎ শিবকে কবি একটু মজা করেই শাসন :

আইল মাঘ সাসিয়া, ধান গেল ভাসিয়া
মহাজনের চোরা কারবারে— ও ভোলা, তুই তাদের করলি রাজা রে,
সকলি দেখ্যা নাক ডাক্যা ঘুমাও পড়া খায়্যা গাঁজারে।
স্বরাজ পাইলে ঘুচাব তো মজা রে।^{১৬}

আর এক অজ্ঞাতনামা পল্লীকবির কাছে স্বরাজ নেহাত 'সুরাজ'— গান্ধী রাজার সুশাসন^{১৭}:

ও ভাই ভাবনা কি আর আছে?
গান্ধী রাজা আনবে সুরাজ, দুঃখ যাবে ঘুচে।

কিন্তু শুধু অশিক্ষিত পল্লীকবিরাই নন, শহুরে শিক্ষিত কবিরও স্বরাজের অর্থ ঠিক বুঝতেন না। তাঁরা পল্লীকবিদের মতো সরাসরি স্বরাজের অর্থবিকৃতি না ঘটালেও তাকে অতিসরলীকৃত করে ফেলতেন। ঐ যেন স্বরাজ সকলের সব সমস্যার জাদুকরী সমাধান। অসহযোগকালীন যত কবিতা আমরা পাই তার মধ্যে এক সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'গান্ধীজী' (ইতিপূর্বেই উল্লিখিত) বোধহয় গান্ধীর স্বরাজ-ভাবনার সবথেকে কাছাকাছি পৌঁছেছিল। এই ব্যতিক্রমী কবিতা থেকেই কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করি :

যা কিছু স্ববশে সেই তো স্বরাজ, সেই তো সুখের খনি,
 আপনার কাজ আপনি যে করে,— পেয়েছে স্বরাজ গণি,
 স্বপাকে স্বরাজ, স্বরাজ— স্বকরে নিজের বসন বোনা,
 স্বরাজ স্বদেশী শিল্প-পোষণে, স্বাধিকারে আনাগোনা,
 স্বরাজ— আপন ভাষা আলাপনে, স্বরাজ— স্বরীতে চলা,
 স্বরাজ— যা কিছু অশুভ তাহারে নিজের দুপায়ে দলা;
 স্বরাজ— স্বয়ং ভুল করে তারে শোধরানো নিজ হাতে,
 স্বরাজ— প্রাণীর প্রাণে অধিকার বিখাতার দুনিয়াতে।
 সেই অধিকারে দেয় যারা হাত প্রেক্ষিত-অজুহাতে,—
 স্বরাজ— সে নৈযুজ্য কেবল আমলা-তন্ত্র সাথে।
 হাতে হাতিয়ার শিক্ষা স্বরাজ, স্বপ্রকাশের পথে,
 স্বরাজ— সে নিজ বিচার নিজেরি স্বদেশী পঞ্চায়তে,—

স্বরাজের কর্মসূচির মধ্যে কবিতায় সবথেকে বেশি করে পাই চরকার উল্লেখ— বিদেশি দ্রব্য, সরকারি চাকরি, ওকালতি ব্যবসা বা স্কুল-কলেজ বয়কটের থেকে অনেক বেশি। স্বরাজ-সাধনের পক্ষে চরকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তা কবির বুঝেছিলেন। কিন্তু এক্ষেত্রেও তাঁদের বোঝায় বিভ্রান্তি ছিল।

আবার সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কথাই বলি। তাঁর 'চরকার গান'-এ চরকার মাধ্যমে সক্রিয়তা ও স্বয়ম্ভরতা জাগিয়ে তোলার আহ্বান^{১৮}:

আর নয় আইচাই টিস্-টিস্ দিন-ভর,
 শোন বিশ্বকর্মার বিশ্বয় মন্তর।
 চরকার চর্যায় সন্তোষ মনটায়,
 রোজগার রোজদিন ঘণ্টায় ঘণ্টায়।
 চরকার ঘর্ষর, বস্ত্রির ঘর-ঘর!
 ঘর ঘর মঙ্গল,— আপনায় নির্ভর।
 বন্দর-পশুন-গঞ্জে সাড়া,—
 দাঁড়া আপনার পায়ে দাঁড়া।

'রোজগার রোজদিন ঘণ্টায় ঘণ্টায়' পংক্তিতে চরকার বাণিজ্যায়ন ও মুনাফার লোভে মানুষের চরকার প্রতি আকৃষ্ট হবার ইঙ্গিত। এটা কিন্তু ঠিক গান্ধীর সঙ্গে মেলে না। তিনি প্রধানত যে যার নিজের প্রয়োজন মেটানোর জন্যই চরকা কাটার কথা বলতেন। তাছাড়া লক্ষণীয়— সত্যেন্দ্রনাথ গ্রামের থেকেও বন্দর-পশুন-গঞ্জের কথা বলেছেন চরকার পরীক্ষা-ক্ষেত্র হিসেবে। গান্ধী এই প্রসঙ্গে জোর দিয়েছিলেন গ্রামের ওপর।

গ্রাম্য কবিরাজ চরকাকে স্বাগত জানান স্বয়ম্ভরতার উপায় হিসেবে নয়, বরং লাভজনক বলেই— অন্তত দরিদ্র গ্রামবাসীর কিছু অতিরিক্ত উপার্জনের ব্যবস্থা হিসেবে। কাজেই শহুরে বাবুদের খন্দর পরার ওপর তাঁরা খুব ভরসা রেখেছিলেন। আর বিশেষ করে মেয়েদের বাড়িতে বসে রোজগার করার পক্ষে চরকার উপযোগিতার কথা খুব ভাবতেন তাঁরা। মুকুন্দ দাস এক মেয়ের জবানিতে বলেন^{১৯}:

চরকা আমার মাতা-পিতা, চরকা বন্ধু সখা,
 চরকায় ভাতকাপড় পরি জোড়ায় জোড়ায় শাঁখা।

এক সজ্জের গানেও পাই—

বউমা আমার সেযানা মেয়ে চরকা কিনেছে,

ঘরের কোণে আপন মনে সুতো কেটেছে।

পল্লীকবির পূর্বোন্নিখিত ‘ও ভাই ভাবনা কি আর আছে’ গানটিতে ‘সুরাজের’ স্বপ্ন সার্থক করার জন্য চরকাই ভরসা—

তাত্তী যারা আছরে ভাইসব, তাঁতের কাপড় বুনাও বইস্যা।

বাবুৱা সব খন্দর পরবেন, ঠাইবেনরাও পরবেন খাসা।

আবাব নুতন মস্তুর দিছে কানে, চরকা তকলী হাতে নিয়ে

(ও) ভাই রাজাঘাটে চলতে ফিরতে তকলীর মেলা দেখ গিয়ে।^{১০}

গানটিতে একদিকে চরকা উপার্জনের হাতিয়ার, অন্যদিকে জাদুশক্তির উৎস। চরকা একটি মন্ত্র— সর্বশক্তিমান রাজা গান্ধীর আদেশ, যা পালন করা একান্ত প্রয়োজন। ঠিক কী করে চরকা স্বরাজ নিয়ে আসবে এ প্রশ্ন অবাস্তব।

শহর বা মফস্সলের অনেক কবির লেখাতেও চরকার জাদুশক্তির কথা। প্রায়ই তাকে তুলনা করা হয়েছে কৃষ্ণের সুদর্শন চক্রের সঙ্গে। স্বরাজ-সঙ্গীত-এর লেখক সুধাকর দেশের মেয়েদের ডেকে বলেন:

তাই মা সুদর্শনের পালা

চরকা ঘুবাও গেল বেলা,

কর না মা অবহেলা

হেদমাকান্ত চৌধুরীর ‘চরকা-স্তোত্র’, জাতীয়-সঙ্গীত গ্রন্থে^{১১}:

অবনত ভারতের দুঃখ দৈন্য ম্লান মুখ

হেরি কি কাঁদিল তব প্রাণ?

তাই সুদর্শনধারী, প্রেরিলা আপন চক্র

করিতে ভারতে আজি ত্রাণ?

দেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের ইতিবাচক দিক হিসেবে চরকার তাৎপর্য কবির ঠিকমত না বুঝলেও, গান্ধীয় অর্থনীতির মধ্যে যে নেতিবাচক বস্তু ছিল তা তাঁরা মোটামুটি বুঝেছিলেন। স্বরাজ পেতে গেলে বিলাসিতা ত্যাগ করতে হবে এটা তাঁরা প্রায়ই বঙ্গতেন। বিলাস-প্রিয় বাবুদের প্রায়ই বিদ্রূপ করতেন। আধুনিক ভোগবাদী সভ্যতার জালে বন্দি বাবুদের ঠাট্টা করেছেন সুধাকর^{১২}:

বাবু হয়ে মলেম ভাই, বাবু হয়ে মলেম ভাই

বাবু হলে সার্ট কোট কলার নেকটাই জুতো চাই।

দুই পাতা ইংরেজী পড়ে মাথায় হ্যাট সাইকেলে যাই।

পাণ্ডনাদারের তাড়ার ভয়ে সে রাস্তায় না আসি যাই।

এই প্রসঙ্গে সুধাকর অতীতের দৃষ্টান্তও তুলে ধরেন:

মুনি ছিল, ঋষি ছিল, ভ্যাগী ছিল ভাই

ধর্ম ছিল, সত্য ছিল, বাবু হয়ে কিছুই নাই।

বিমলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় গান্ধীর মতো করেই আধুনিক ভোগবিলাসী সভ্যতার নিন্দা করেন এবং অতীতকে পুনরুজ্জীবিত করতে চান^{১৩}:

হাল আমলের চমক-সাগা সভ্যতার মর্মে
নাইক মহান উচ্চাধর্ষ আত্ম নাইক ধর্মে
আসবে অতীত সজীব হয়ে সোনার কাঠির স্পর্শে
চরকা আবার ঘুরবে ঘরে সোনার ভারতবর্ষে।

স্বরাজ প্রসঙ্গে অতীতের পুনরুজ্জীবন চান আরো অনেক কবি। লোকনাথ দত্ত 'ভারতে গণতন্ত্র' কবিতায় প্রাচীন মুনি-ঋষিদের জীবনযাত্রা ও ভাবনাচিন্তার সঙ্গে চান ক্ষত্রিয়বীর্য ও ধনসমৃদ্ধিরও পুনরুজ্জীবন^{১৪}:

আর্যাবর্ত-ভূমে ব্রহ্মার্বির দেশে
মানব-মনীষা আবার জাগিল,
আর্যের প্রাচীন জীবনের প্রথা,
ঋষির আশ্রম, পুনঃ দেখা দিল।
গঙ্গা-যমুনার সুবিশাল তটে
ছিল ক্ষত্রিয় রাজ্য, রাজধানী;
চন্দ্র-সূর্য বংশ কৌরব পৌরব,
মণ্ডল-ঈশ্বর বিজয়-বাহিনী।
সেই আর্যাবর্তে আর্যের সন্তান
প্রাচীন গৌরব আরি দাঁড়াইল
বীরের সন্তান মোগল পাঠান
হিন্দুবীর সনে, আসিয়া মিলিল।

এই কবির কাছে গান্ধীবাদের থেকে বড়ো কথা প্রাচীন হিন্দু-আর্যদের গৌরব, যা উনিশ শতক থেকেই ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রাণ ছিল। অবশ্য এই ক্ষেত্রে হিন্দু বীরের সঙ্গে মোগল-পাঠানদের মিলিয়ে আর্যামির মুসলমান-বিরোধী স্বরটি চাপা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু গান্ধী নিজে পৌরাণিক আর্যগৌরবের ক্ষত্রিয় দিকটি একেবারেই পছন্দ করতেন বলে মনে হয় না, যদিও প্রাচীন ঋষি ও তাঁদের জীবনযাত্রার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল। আগেই আমরা দেখেছি গান্ধী জাতীয়তাবাদীদের অন্ধ ইতিহাস-প্রীতির শামিল ছিলেন না। অস্তুত জাতীয় গৌরব প্রতিষ্ঠার জন্য নির্বিচারে ইতিহাসের ব্যবহার তিনি করতেন না।

এই কবির কাছে ভারতের প্রাচীন গৌরবের সঙ্গে পাশ্চাত্য থেকে ধার করা গণতন্ত্রের আদর্শও খুব গুরুত্বপূর্ণ— কবিতার নাম থেকেই তা পরিষ্কার। তাঁর কাছে স্বরাজ বলতে গেলে পশ্চিমি গণতন্ত্রই। কিন্তু গান্ধী এ কথাটা কখনোই মানতেন না। পশ্চিমি গণতন্ত্র, যেখানে ব্যক্তিরা মেলে দলে ও স্বার্থের ভিত্তিতে সন্ধি করে এবং তারপর এরকম এক একটি সমন্বয় পরস্পরের ওপর চাপ সৃষ্টি করে ও ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করে, গান্ধী তা একেবারেই পছন্দ করতেন না। তিনি জোর দিতেন সামাজিক নৈতিকতায়, যা সমগ্র জনগোষ্ঠীর সার্বজনীন মূল্যবোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত। পশ্চিমি ধাঁচের রাজনৈতিক বা আইনী প্রতিষ্ঠান শাসকদের দূরে ঠেলে দেয় সাধারণ মানুষের থেকে, যদিও তাদের সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি হিসেবেই কাজ করার কথা। তাই এই ব্যবস্থাটির ওপর গান্ধীর কোনো ভরসা ছিল না। তাঁর পক্ষপাতি রাজ পশ্চিমি গণতন্ত্রের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

হিন্দু-মুসলিম সৌভ্রাতৃত্বের জোয়ার

গান্ধীর স্বপ্নের সমাজ-রাজনীতিতে হিন্দু মুসলমানের সুসম্পর্ক জরুরি ছিল। তিনি মুসলমানদের খিলাফত আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন অসহযোগকে। কিন্তু দুই সম্প্রদায়ের স্বার্থসিদ্ধির জন্য নিছক রাজনৈতিক সন্ধি তিনি চান নি, চেয়েছিলেন হৃদয়ের ঐক্য। তাঁর এই চাওয়াটা অনেক হিন্দু-মুসলমানেরই হৃদয়কে ছুঁয়েছিল সেই সময়ে এবং কবিতায় সেই সহৃদয়তা প্রতিফলিত হয়েছিল। সাম্প্রদায়িক ঐক্যের এমন জোয়ার এর আগে বা পরে আর কখনো এদেশে আসে নি।

ইতিপূর্বেই আমরা মোসলেম ভারত ও সওগাত পত্রিকা থেকে কিছু কবিতা উদ্ধৃত করেছি। এগুলি প্রধানত মুসলমানদের জন্য মুসলমান পরিচালিত পত্রিকা। কিন্তু বহু হিন্দু লেখক এসব কাগজে লিখতেন। সেরকম মুসলমান কবিরা লিখেছেন নারায়ণ-এর মতো পত্রিকায়, যার নামই এক হিন্দু দেবতার নামে। আর, যে যাই লিখুন, সকলেই জানিয়েছেন মিলনের আহ্বান। মোসালেম ভারত-এ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত লেখেন ‘একতা’ শীর্ষক কবিতা।^{২৬} এখানেই জসীমুদ্দীন লেখেন ‘মিলন গান’।^{২৭} সওগাত-এ কুমুদরঞ্জন মল্লিক ব্রিটিশের বিরুদ্ধে অক্রিয় প্রতিরোধের ধারণার সঙ্গে হিন্দু-মুসলিম মিলনের আবেগ যোগ করে লেখেন ‘হরতাল’^{২৮}:

এ নয় ঘণাব রোষ, বিদ্রোহ সজ্জা,
ভয় দেখানোর কথা? ভাবিতেও লজ্জা।
ছিন্ন হিয়ার ব্যথা দেখাবার ও ভান না,
এ কেবল ভায়ে ভায়ে গলা ধরে কান্না।
বিজয়ের জৌলুসে পুড়ে যায় ঘরটা,
কেমনে রাখিব ঠিক কঠোর স্বরটা?
এক গৃহে উৎসব উল্লাস বটন,
আন গৃহে হাহুতাশ ত্রন্দন লুঠন
এক গৃহে হুলাহুলি শানায়ের তান গো,
আন গৃহে কাতরায় ছোট দুটি প্রাণ গো।
ঢেলেছি ও পদে বহু নয়নের দৃষ্টি,
আজ যিনি সব বড় মাগি তার দৃষ্টি।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসানের পর ব্রিটিশ হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রতি যে অবিচার করে, সেই পরিপ্রেক্ষিতে তাদের দুজনার গভীর অন্তরঙ্গতার ছবি এই কবিতায়।

ইসলাম দর্শন পত্রিকাটি প্রধানত ইসলামের তত্ত্ব ও আচার-আচরণ নিয়েই মাথা ঘামাত। সেখানেও পাই মহম্মদ আবদুল হাকিমের এই আহ্বান^{২৯}:

একবার কর সার সংস্রব বর্জন
দেশময় তুলে দাও গভীর গর্জন
কংগ্রেস কনফারেন্স লীগ আর আঞ্জুমেন
হয়ে গেছে এক দেহ এক প্রাণ এক মন।

নারীজাগরণের আহ্বান

জাতীয় আন্দোলনে মেয়েদের অংশগ্রহণের ব্যাপারে গান্ধী অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন, তদনুযায়ী

অসহযোগ আন্দোলনের কবিরাও। তবে মেয়েদের নিজস্ব সমস্যা নিয়ে গান্ধীর যে বিশেষ ভাবনা ছিল, তিনি যেভাবে মেয়েদের জাতীয় আন্দোলনে অংশগ্রহণের সঙ্গে নারী-পুরুষ সাম্যের আহ্বানকে জুড়তে চেয়েছিলেন, কবিরা সে জায়গায় পৌঁছেন নি। গান্ধীর সামগ্রিক সমাজ উজ্জীবন পরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ ছিল মেয়েদের ইস্যু। কিন্তু কবিরা নেহাত জাতীয় আন্দোলনকে শক্তিশালী করার জন্য মেয়েদের অংশ নিতে আহ্বান জানান। তাঁরা ভেবেছিলেন মেয়েদের অংশগ্রহণ দেশপ্রেমের ব্যাপ্তি ও গভীরতার পরিচায়ক হবে।

মুকুন্দদাস মেয়েদের উদ্দেশ্যে বললেন^{১০} :

মাযেব ডাকে সব জেগেছে
যে যাব কাজে লেগে গেছে
তোমরাই মায়ের জাতি, বসে থাকবে কি নীরবে?

মুকুন্দদাস ও সুধাকর দুজনেই মেয়েদের ‘শক্তি-স্বরূপিনী’ বলে সম্বোধন করে জাতীয় সংগ্রামে শক্তি সরবরাহের আহ্বান জানান। ভারতীয় সাংস্কৃতিক মূল্যবোধে নারীশক্তির ধারণা খুব বলশালী। এ আহ্বান তার সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ। কিন্তু তা বলে এঁরা কেউই চাননি মেয়েরা ঐতিহ্যিক লিঙ্গ ভূমিকার বাইরে যাক। মেয়েরা স্বামীসেবা করবে, সুমাতা-সুগৃহিণী হবে, সরল জীবনের আদর্শে অনুপ্রাণিত করবে পরিবারকে, আর অবশ্যই ঘরে বসে চরকা কাটবে— এটুকুই তাঁরা চেয়েছিলেন। সুধাকরের গান উদ্ধৃত করা যায় এই প্রসঙ্গে^{১১}:

ছেড়ে দাও মা অলসতা, ঘবে বসে কাটো সূতা,
সময় যেন যায় না বৃথা, চিন্তা কর চিন্তামণি।
প্রেম ভক্তি রাখ প্রাণে, স্বামীবে রাখো যতনে
সুশিক্ষা দাও মা সন্তানে, মিলে থাক ভাই ভগিনী।

গান্ধীও অবশ্য নারী-পুরুষ সাম্য বলতে নারী ও পুরুষ একই ধরনের কাজে নিযুক্ত হবে তা মোটেই ভাবতেন না। তাঁর মতে নারী ও পুরুষের কর্মক্ষেত্র আলাদা, কিন্তু নারীর কর্মক্ষেত্রে সে-ই সর্বোত্তম। অসহযোগ আন্দোলনের পরের দিকে অবশ্য তিনি স্বীকার করেন যে পিকেটিং-এর মতো কাজে মেয়েরা যথেষ্ট যোগ্য।

এটাও স্বীকার্য যে সরোজিনী নাইডু বা বাসন্তী দেবীর মতো যে কয়েকজন মহিলা গান্ধী আন্দোলনের সুবাদেই ঐতিহ্যিক লক্ষণরেখা অতিক্রম করে গিয়েছিলেন এবং অ-নারীজনোচিত ভূমিকা পালন করেছিলেন, তাঁরা কবিদের প্রশংসাও অর্জন করেছিলেন। প্রেরণাদাত্রী হিসেবে তাঁদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা সজ্ঞাপন করেছিলেন কবিরা।

মেয়েবা নিজেরাও গান্ধী ও গান্ধীবাদের প্রতি আস্থা জানিয়ে কবিতা লেখেন, সেসব কবিতায় যদিও নতুন কোনো মাত্রা ধরা পড়ে না। শ্রীহট্টে কয়েকটি নারী-পরিচালিত কবিগানের দল ছিল। এইসব নারী অধিকাংশই গণিকা। মনোমোহিনী ছিলেন তাঁদের মধ্যে বেশ বিখ্যাত। তাঁর একটি অসহযোগ-কালীন গান^{১২}:

উঠিল জয়ধ্বনি মেদিনী সকম্পিতা
হিন্দু মুসলমান এক মায়ের সন্তান
একই সূত্রে বাঁধা রে ভাই, এক প্রাণে গাঁথা।

কৃষকদের অসহযোগ

ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ কৃষক এবং গান্ধীর নতুন গ্রামভিত্তিক আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার স্বপ্ন অনেকটা তাদেরই কেন্দ্র করে। জাতীয়তাবাদীদের তিনি কৃষকদের গুরুত্ব সম্পর্কে সত্যি করেই খানিকটা সচেতন করতে পেরেছিলেন। মুকুন্দদাস গাইলেন^{৩২}:

স্বরাজ্য সেদিন মিলিবে যেদিন

চাষার লাগিয়া কাঁদিবে প্রাণ।

স্বরাজ্য-সঙ্গীত-এর সুধাকর বললেন:

চাকরি, বাকরি ছেড়ে দিয়ে

মিলব মোরা কৃষক লয়ে

আপনা-আপনি হয়ে যাবে

স্বরাজ্য হবে সুসংবাদ।

অবশ্য মুকুন্দদাস তো বটেই, খুব সম্ভবত সুধাকরও গ্রামীণ কবি ছিলেন। তাঁদের স্বভাবতই কৃষকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ছিল। শহুরে কবিরাও তাঁদের রচনায় কৃষকদের ঠাই দিতেন, তবে সে যেন নিতান্ত দায়সারাতাবে এবং ওপর ওপর। তাঁদের মনের খুব গভীরে কৃষক ছিল বলে মনে হয় না।

একথা সুবিদিত যে কৃষকরা নিজেরা সোৎসাহে যোগ দিয়েছিল গান্ধীর আন্দোলনে। তাদেরই মতো খাটো কাপড় পরা, সরল হিন্দুস্তানীতে কথা বলা মানুষটিকে তাদের আপন জন বলে মনে হয়েছিল, তাঁর স্বরাজ্য বা রামরাজ্যের ধারণাও সাযুজ্য খুঁজে পেয়েছিল কৃষকদের আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে। অসহযোগ আন্দোলন গ্রামে-গ্রামান্তরে সাড়া জাগিয়েছিল। কৃষক কবিরা আন্দোলনের ছড়া-গান অনেক বেঁধেছিলেন নিশ্চয়, কিন্তু সেগুলির অধিকাংশই আজ আর আমরা খুঁজে পাই না। কয়েকটি গভীরা ও অন্যান্য পল্লীগীতি যা পাই— তাদের রচনাকাল সঠিক জানা নেই, তবে স্বরাজ্য শব্দটা থেকেই মনে হয় যে এগুলি অসহযোগের সময়কার। ‘স্বরাজ্য’ ছিল অসহযোগ আন্দোলনেরই আদর্শমন্ত্র ও প্রধান একটি চিহ্ন। একটি গভীরা গান এরকম^{৩৩}:

স্বরাজ্য যদি পাই ভোলা

খ্যাতে দিব মানিক কলা,

নইলে আঁঠার বিচি কলা।

বলা বাহুল্য, স্বরাজ্য বা চরকার অর্থ ও তাৎপর্য কৃষক-কবিরা নিজেদের মতো করেই ভেবে নিয়েছিলেন— নিজেদের আকাঙ্ক্ষা ও সম্ভাব্যতার বোধ অনুযায়ী। আমরা ইতিপূর্বেই দেখেছি শহুরে শিক্ষিত কবিরাও নিজেদের মতো করেই এসব ব্যাখ্যা করতেন। তবে শেষ পর্যন্ত শহর আর গ্রামের মধ্যে একটা তফাতও থাকত। প্রথমোক্তরা অন্তত গান্ধী আন্দোলনের প্রকরণ মেনে চলতেন, এমনকি বিপ্লবী সম্ভ্রাসবাদীরাও অসহযোগের সময় সাময়িকভাবে নিজেদের কর্মোদ্যোগ বন্ধ রেখেছিলেন। কিন্তু কৃষকরা গান্ধী আন্দোলনের প্রকরণ নিয়ে মাথা ঘামাত না। তাদের আন্দোলনে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্য ও ধরন দুই-ই গান্ধীর থেকে ও উচ্চতর শ্রেণীর থেকে আলাদা ছিল।

অসহযোগের সময়েই আলিপুরদুয়ারে মঘা দেউনিয়ার নেতৃত্বে হয় খাজনা-বন্ধ ও হাটকর-বন্ধের আন্দোলন। কুমারগ্রামে কুলকুলির হাট অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় কর, কর-বন্ধের কায়দা হিসেবে। অজ্ঞাতনামা রাজবংশী কবি সেই পরিপ্রেক্ষিতে গান বাঁধলেন^{৩৪}:

ভাত দিম, পানি দিম, খাজনা দিম না
জ্ঞান দিম, পান দিম, ট্যাক্সো দিম না।
ইংরেজের খাজনা দিম না।
বিলাইতি কাপড়া পরমু না॥
হাট বন্ধ কুলকুলি
বন্দে মাতবম হামার বুলি॥

খাজনা-বন্ধ বা অন্য কোনো ধরনের আইন-অমান্য কিন্তু অসহযোগ কর্মসূচির অন্তর্গত ছিল না। আন্দোলনের একেবারে শেষের দিকে গান্ধী খাজনা-বন্ধ শুরু করার কথা বলেন, তাও গুজরাটের বারদৌলির সীমিত পরিসরে। এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করার আগে তিনি অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহারও করে নেন (ফেব্রুয়ারি, ১৯২২)। তবে ভারতের নানা জায়গার গ্রামীণ মানুষ গান্ধীর অনুমোদনের তোয়াক্কা না করেই আইন-অমান্য শুরু করে দিয়েছিল ইতিপূর্বেই। স্থানীয় স্তরে এইসব আন্দোলনে শুধু ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে নয়, স্থানীয় নিপীড়নকারীদের সঙ্গেও সংগ্রামে অবতীর্ণ হত মানুষ, যা গান্ধীর শ্রেণি-সমঝোতার আদর্শের সঙ্গে মোটেই সংগতিপূর্ণ ছিল না। গান্ধী আন্দোলনে কৃষকদের অংশগ্রহণের এই গান্ধী-অতিরিক্ত র্যাডিকাল মাত্রাটি সম্প্রতিকালের গবেষকরা, বিশেষ করে ‘সাব-অলটার্নিস্ট’রা, ভালো করেই দেখিয়ে দিয়েছেন।

আর এক দিক থেকেও কৃষকরা গান্ধীর থেকে বেশি র্যাডিকাল ছিল। তারা গান্ধীর অহিংস সত্যগ্রহের আদর্শের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে চায় নি। চট্টগ্রামের লোক-কবি রমেশ শীলের গানে ঝরে পড়েছিল ব্রিটিশের প্রতি ঘৃণা ও রীতিমত আগ্রাসী জঙ্গী মেজাজঃ

আমাদের চোখ ফুটেছে, মুখ ফুটেছে, ভয় করি না।
ব্রিটিশ নিল দেশ লুটিয়া, উঠছে মোদের চোখ ফুটিয়া
আমরা আর থাকব না চেয়ে, কুকুর খাবে দুধের ছানা॥
দেখে তোদের চোখ বাঙানি, মনে কি আতঙ্ক গপি?
টোড়া সাপের ফোঁসফোঁসানি, আমরা কি রে ভেকের ছানা?
খলিফাকে গদি দিবি, নয়ত এবার বিলাত যাবি
এই দুইটার একটা হবে, হিন্দু-মুসলিম মাফ করবে না॥

এই মেজাজটা আর যাই হোক ঠিক গান্ধীয় সত্যগ্রহের মেজাজ নয়।

সত্যগ্রহ ও অহিংসার আদর্শ থেকে চ্যুতি

কিন্তু শুধু কৃষক-কবিরাই কি সত্যগ্রহ ও অহিংসার আদর্শ মেনে নিতে অক্ষম ছিল? শহুরে শিক্ষিত কবিরাই কি তা সম্পূর্ণ মেনে নিয়েছিল? এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার আগে সত্যগ্রহ ও অহিংসা ব্যাপার দুটো মোটামুটি বোঝা দরকার। গণ-আন্দোলনের সত্য ও নীতিসম্মত প্রকরণ বলে গান্ধী এই দুটি ধারণা পেশ করেছিলেন। ‘লক্ষ্য যেমন, পন্থাও তেমন’— এই ছিল গান্ধীর মত। তাঁর যা লক্ষ্য তাতে সত্যগ্রহ ও অহিংসাকেই হতে হবে পন্থা। সত্যগ্রহ নিছক নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ নয়। সত্যগ্রহীদের লড়াই করতে হবে রাষ্ট্রের অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে; কিন্তু রাষ্ট্রের ধ্বংস বা এমনকি রাষ্ট্র-পরিচালকদের হটানো তাদের উদ্দেশ্য নয় (অন্তত আপাতত নয়)। ব্রিটিশ শাসকের বিরুদ্ধে কোনোরকম ক্রোধ বা ঘৃণা নয়; শাসকদের

নিজের কথাটা বোঝানো ও তাদের মনের পরিবর্তনই সত্যগ্রহ। আর অহিংসা সঙ্কীর্ণ অর্থে গান্ধীর ব্যক্তিগত জীবনচর্যা, বৃহৎ অর্থে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ যা স্বরাজের আবশ্যিক শর্ত। সেদিক থেকে অহিংসা ও স্বরাজ প্রায় সমার্থক এবং সেটাই গান্ধী আন্দোলনের লক্ষ্য। তবে সাধারণভাবে গান্ধীর অহিংসা বলতে আমরা স্বরাজ-অর্জনের আন্দোলন তথা সত্যগ্রহের পন্থাটাই বুঝি। সত্যগ্রহের সত্যটা বাস্তবায়িত হয় অহিংসার মাধ্যমে।

কিন্তু সাধারণ মানুষ সত্যগ্রহ ও অহিংসা নীতির গভীর তাৎপর্য গান্ধীর মতো করে বুঝতে পারে নি। সত্যি করেই ক্ষমতাদর্পী ব্রিটিশের হৃদয়ের পরিবর্তন আনা সম্ভব এটা খুব কম মানুষই বিশ্বাস করতে পেরেছিল। ব্রিটিশের অন্যায়-অবিচার তাদের কাজে-কর্মে না হলেও অন্তত মনে হিংস্র প্রতিক্রিয়া জাগাত প্রায়শই। গ্রামের কবি রমেশ শীল যেমন স্পষ্ট করে ব্রিটিশ সম্পর্কে তাঁর ঘৃণা প্রকাশ করেছেন, শিক্ষিত কবিরা ঠিক তা করেন নি; বরং বাহ্যিকভাবে গান্ধীর সত্যগ্রহ ও অহিংসার নীতিকে সমর্থনই করেছেন। মনের কোন স্তরে হয়ত তাঁরা বিশ্বাসও করতেন যে এই পন্থায় সত্য শেষ পর্যন্ত জয় আসবে। কিন্তু ঘৃণা ও আগ্রাসন তাঁদের অন্তরে থেকেই গিয়েছিল এবং তাঁদের অজান্তেই তা অভিব্যক্তি পেত— কবিতার শব্দ, রূপক, উপমা ও অন্যান্য অলঙ্কারের মধ্য দিয়ে।

যেমন, স্বদেশ-গীতির অঙ্গাতনামা কবি গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনকে ‘মহারণ’ ও গান্ধীকে আখ্যা দিয়েছেন ‘সেনাপতি’।^{১০} অবশ্য একই নিশ্বাসে তিনি বলেন যে এই যুদ্ধে হিংসা, ঘেঁষ ও রক্তপাত নেই এবং এই সেনাপতি ‘বোনাপাটি’ নন, তাহাড়া কবি গান্ধীর অনুগামী চিত্তরঞ্জন দাশকে তুলনা করেন নিমাই সম্যাসীর সঙ্গে; তবুও ‘শিক্ষা বাজানো’, ‘মহানিনাদ’ ও ‘মহাপ্রলয়ের’ মতো অলঙ্কার তিনি ব্যবহার করেন উল্লিখিত গানটি জুড়ে, ফলে তার মেজাজটি হয়ে ওঠে বেশ জঙ্গী ও ধ্বংসাত্মক।

মোহিতলাল মজুমদারের ‘আবির্ভাব’ কবিতাটিতে আমরা পাই এরকম পংক্তি^{১১}:

বাগের মতন প্রাণ-কোদণ্ডে ভীম-টঙ্কার টানা।

জসীমুদ্দীনের ‘মিলন-গানে’ পাই^{১২}:

পাঞ্জাবের পাঁজর-কাটা রক্তরাজা বালুর কণা

বাংলাদেশের শ্যামল বুকে তুলেছে আজ হাজার ফণা।

যেন জালিয়ানওয়ালাবাগের রক্তপাতের হিংস্র প্রতিশোধ নিচ্ছে বাংলা।

কারারুদ্ধ চিত্তরঞ্জন দাশের স্ত্রী বাসন্তী দেবীর অনুরোধে ১৯২১-এর ডিসেম্বর মাসে নজরুল লিখলেন ‘ভাঙার গান’।^{১৩} শিবের তান্ত্রিকত্বের রূপকল্প ব্যবহারে রচিত এই গানের প্রায় প্রতিটি শব্দে, ছন্দে, সুরে প্রচণ্ড হিংস্রতার অভিব্যক্তি:

কারার এই লৌহকপাট

ভেঙে ফেল, কর রে লোপাট

রক্ত-জমাট শিকল-পাঁজর পাষণ-বেদী।

ওরে ও তরুণ ঈশান।

বাজা তোর প্রলয়-বিষাণ।

ধ্বংস নিশান উড়ুক প্রাচীন প্রাচীর ভেদি।—

নাচে ঐ কালবোশেখী, কাটাবি কাল বসে কি?

দেবে দেখি ভীম কারার ঐ ভিত্তি নাড়ি
লাপি মার, ভাঙ রে তালা, যত সব বন্দিশালায়
আগুন জ্বালা, আগুন জ্বালা, ফেল উপাড়ি।

গান্ধী-আন্দোলনের বিরোধিতা

বেশ কিছু ব্যক্তি সরাসরি অসহযোগ আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিলেন। বাঙালি ভদ্রলোকদের অনেকেই যে গান্ধীর ধ্যানধারণাকে অবাস্তব এমনকি প্রতিক্রিয়াশীল মনে করত তা সুবিদিত। এই সমালোচকরা অবশ্য নিজেরা কবিতা লেখেন নি (অন্তত আমরা তেমন কবিতা পাইনি), কিন্তু সমালোচকদের সমালোচনা করা হয়েছে কবিতায়। যেমন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ‘গান্ধীজী’ কবিতায় এঁদের সম্বোধন করে বলেছেন:

হেসো না হেসো না, হৃদয়দৃষ্টি, হেসো না বিজ্ঞ হাসি.
মূর্ত তপেরে শেখো বিশ্বাস করিতে অবিশ্বাসী;
অবিশ্বাসের বিষ-নিঃশ্বাসে হয় যে প্রাণের ক্ষয়
বিশ্বাসে হয় বিশ্ব-বিজয়, বিদ্রূপে কভু নয়।

অসহযোগের সময়ে গান্ধীর সবথেকে বিশিষ্ট ও সুপরিচিত সমালোচক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কবি গান্ধীকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন এবং তাঁর নৈতিক আদর্শের সঙ্গেও একাত্ম বোধ করতেন। কিন্তু দুজনের মধ্যে রাজনৈতিক মতপার্থক্য ছিল। বা বলা যায় গান্ধী যেখানে রাজনীতিক, রবীন্দ্রনাথ সেখানে খাঁটি দার্শনিক। অসহযোগ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের প্রধান আপত্তি এই যে এতে রাজনীতির ধূলাবালির ঘূর্ণিঝড়ে মানুষের আবেগকে উসকে দেবে এবং তাদের অহিংস থাকতে দেবে না। তাঁর মতে রাজনৈতিক মুক্তির জন্য জাতীয় সংগ্রামের আবশ্যিক পূর্বশর্ত হওয়া উচিত— আরো বড়ো হারে গঠনমূলক কাজ ও নৈতিক পুনরুজ্জীবন।^{৪০}

এই পরিপ্রেক্ষিতে ‘দরবেশ’ ছদ্মনামে কোনো কবি লেখেন ‘কবির প্রতি’ নামে কবিতা— অসহযোগের গান রচনার জন্য রবীন্দ্রনাথের কাছে আকুল আবেদন জানিয়ে^{৪১}:

জাগো কবি। জাগো কবি।
স্বপন-রচিত নন্দন হতে
হের এ ধুলার ছবি।
আনন্দপূত নন্দন হতে
আনো গান— আনো গান;
দীপ্ত রঙীন রক্ত রাগিনী
শক্তি-সফল প্রাণ।
ভিখারীর দল হবেছে বাহির;
মুক্তির লাগি পাতিয়াছে শির,
হে চাবণ। হেব হাসিছে মিহির,
তোল তোল বীণাখান।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথই শেষপর্যন্ত ঠিক প্রমাণিত হলেন। গান্ধী শীঘ্রই বুঝলেন যে তাঁর আদর্শ গ্রহণ করার মতো পরিণত নয় অধিকাংশ ভারতীয়ের মন। তাঁর আন্দোলন তাঁর উদ্দেশ্য ও পন্থার বাইরে চলে গেল। শ্রেণি-সংঘাতমূলক ও হিংসাত্মক ঘটনা বৃদ্ধি পেতে লাগল সংখ্যায়।

ভারত-ইতিহাসের সব ছাত্রই জানে— চৌরিচৌরা এল উটের পিঠের শেষ খড়টির মতো। ১৯২২-এর ফেব্রুয়ারি মাসে গান্ধী তাঁর আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিলেন। কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি কারারুদ্ধ হলেন। চারিদিকে তখন হতাশা ও অবসাদ। বেশ কিছুদিন ব্যাপী প্রবল উৎসাহ-উদ্দীপনার এই হল পরিণতি। গান্ধীর গ্রোথারেও তেমন প্রতিবাদ হল না কোথাও। সরোজিনী দেবীর জাতীয় সঙ্গীত গ্রন্থের একটি গানে খালি এ নিয়ে দুঃখপ্রকাশ দেখি।^{৪২} আর নারায়ণ পত্রিকায় শৈলেন্দ্রনাথ মল্লিকের একটি কবিতায় পাই আশা বজায় রাখার মরিয়া আহ্বান^{৪৩} :

বলি বক্ষে কেন রে ধেম্বে এল ঘন স্পন্দন?

কেন অর্ধেক পথে ধমকি দাঁড়ালি?

উচ্ছ্বসি ওঠে হাহাঙ্করে ভীরা ক্রন্দন।

ওরে চল চল, জোরে চল চল।

আজি আত্মায় তোব উঠুক জ্বলিয়া সত্যের জ্যোতি জ্বলজ্বল।

আজি কর্মের ঘায়ে ভেঙে ফেল— ফেল

পাষণ-কঠিন সব বাঁধ।

কেন অবসাদ— মিছে অবসাদ?

কিন্তু গান্ধীর ‘সত্যে’ কেউই আর তেমন আস্থা রাখতে পারছিল না। আর আত্মার জ্যোতি নিয়েও বেশি লোক আর মাথা ঘামাতে রাজি ছিল না। গান্ধীবাদ অবসিত হল। কিছু গ্রামীণ মানুষ অবশ্য তখনো গান্ধীরাজের স্বপ্নে বিভোর। তবে তারা বহুবিচিত্র অ-গান্ধীয় ধরনে সে স্বপ্নের ব্যাখ্যা করে নিচ্ছিল যে যার নিজের মতো করে। সেইমতো তারা এখানে সেখানে তাদের আন্দোলন চালিয়ে যেতে লাগল। কিন্তু শহুরে বুদ্ধিজীবী শ্রেণির মোহভঙ্গ হতে বাকি রইল না কিছু।

এখন রবীন্দ্রনাথ পেলেন স্বপক্ষ সমর্থনের নিশ্চিত সুযোগ—

সাধন কি মোর আসন নেবে হট্টগোলের কাঁধে?

খাঁটি জিনিষ হয় রে মাটি নেশার পবমাদে!^{৪৪}

নেতা ও সাধারণ মানুষের মধ্যে অ-সেতুবন্ধ ফাঁক

ভারতীয় ও ব্রিটিশ স্বার্থের মধ্যে অজস্র বিসংগতি তীব্রতর ও স্পষ্টতর হয়ে উঠেছিল প্রথম যুদ্ধের ফলে। যুদ্ধোত্তর কালে ভারতবাসীর দুঃখদুর্দশা গভীরতর হল ও আশাআকাঙ্ক্ষাও বৃদ্ধি পেল। বিভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষ প্রতিকারের জন্য লড়াই করতে প্রস্তুত হয়ে উঠল মনে মনে। এই সন্ধিক্ষণেই গান্ধী এলেন এবং প্রতিকারের থেকে বেশি-কিছুই আশা দেখালেন তাদের। এক সরল সুন্দর জগতের, এক অনাবিল ও ক্রটিহীন সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থার স্বপ্ন দেখালেন। এইভাবে মানুষের হৃদয় কেড়ে নিলেন তিনি। কিন্তু তারা বেশির ভাগই গান্ধীর স্বপ্নটা দেখল নিজেদের মতো করে— নিজেদের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ অনুযায়ী। নানা জন নানা কথা ভেবে যোগ দিল গান্ধীর আন্দোলনে। যে প্রক্রিয়ায় পৌছোতে হবে সেই ক্রটিহীন সমাজের লক্ষ্যে, সে সম্পর্কে তাদের ধারণা তো ছিল আরোই অস্পষ্ট। কেন-কীভাবে কিছুই তাদের যুক্তি-বুদ্ধিতে স্পষ্ট ছিল না। সুতরাং তারা গান্ধীর দিকে তাকাল এক পরম পরিত্রাতা হিসেবে। যুক্তির জায়গা নিল বিশ্বাস। লজিক জায়গা ছেড়ে দিল ম্যাজিক-কে।

আমরা অসহযোগের সময়ে রচিত যত কবিতা পেয়েছি, তার মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তই আসতে পেরেছিলেন গান্ধীবাদের সবথেকে কাছাকাছি। কিন্তু তাঁর বোঝাতেও খামতি ছিল। আমরা দেখেছি, তিনি স্বরাজ ব্যাপারটা মোটামুটি গান্ধীর মতো করে বুঝলেও চরকার তাৎপর্য ঠিক অনুধাবন করতে পারেন নি। তাঁর গান্ধী সম্পর্কে ধারণাতেও একটা ধর্মীয় রং ছিল— তাঁর ‘গান্ধীজী’ ‘জগন্নাথের বথের সারথি’।^{৪৬}

অসহযোগ আন্দোলনের কিছুদিন পরেই প্রকাশিত হল রবীন্দ্রনাথের নাটক *মুক্তধারা*। সেখানে শিল্পায়নের অকল্যাণ সমালোচিত। সেই সমালোচনা গান্ধীয় আদর্শের সঙ্গে সুসমঞ্জস। কিন্তু একই সঙ্গে সেখানে আছে নেতার সংকটের কথা— তিনি অনুগামীদের সম্মোহিত করেছেন, কিন্তু তাদের নিজের মতাদর্শ বুঝিয়ে উঠতে পারেন নি। নাটকটিতে জননেতা ধনঞ্জয় অনুগামী শ্রোতাদের কাছে অহিংস নীতির কথা বলেন, কিন্তু বোঝেন যে তারা তাঁর কথা কিছুই বুঝছে না। ফলে এরকম একটি কথোপকথন আমরা পাই:

ধনঞ্জয়— হাঁ করে রইলি যে? কথাটা বুঝলি নে?

শ্রোতা— তোমাকেই আমরা বুঝি, কথা তোমার নাই বা বুঝলুম।

ধনঞ্জয়— তাহলেই সর্বনাশ হয়েছে।

শ্রোতা— কথা বুঝতে সময় লাগে, সে তর সয় না; তোমাকে বুঝে নিয়েছি; তাতেই সকাল সকাল তরে যাব।

ধনঞ্জয়— তার পরে বিকেল যখন হবে? তখন দেখবি কুলের কাছে তরী এসে ডুবছে। যে কথাটা পাকা, সেটাকে ভিতর থেকে পাকা করে না যদি বুঝিস তো মজাবি।

শ্রোতা— ও কথা বোলো না, ঠাকুর। তোমার চরণাশ্রয় যখন পেরেছি তখন যে করে হোক বুঝেছি।

ধনঞ্জয়— বুঝিস নি যে তা আর বুঝতে বাকি নেই। তোদের চোখ বয়েছে রাঙিয়ে, তোদের গলা দিয়ে সুর বেরোলো না।

এটা অনায়াসে হতে পারত গান্ধী ও তাঁর স্বদেশবাসীর কথোপকথন। নাটকটির অন্য এক জায়গায় ধনঞ্জয় পরিতাপ করে যে সে মানুষকে যত মাতিয়ে তুলেছে তত পাকিয়ে তুলতে পারে নি। গান্ধীও নিশ্চয়ই মনে মনে এরকম পরিতাপ করেছিলেন?^{৪৭}

গোলমালটা বোধহয় আদতে গান্ধীর নিজের মধ্যেই ছিল। তাঁর ব্যক্তিত্ব জটিল ও বহুমাত্রিক।^{৪৮} একদিকে তিনি সাধুসন্ত গোছের মানুষ— ব্যক্তিগত জীবনে ‘সত্য’ নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষায় ব্যাপৃত। অন্যদিকে তিনি কাজের মানুষ— সেই পরীক্ষানিরীক্ষাকে বিজুত করতে চান সাধারণ্যে। ব্যক্তিগত নীতি-নিয়মকে তিনি সামাজিক শৃঙ্খলা ও রাজনৈতিক আচরণের নৈতিক সংহিতা বানাতে চান। সেটা তিনি করেন গণ-আন্দোলনের নেতা এক চতুর রাজনীতিক হিসেবে। চতুর রাজনীতিকের মতোই তিনি মানুষকে অল্প সময়ে অনেক কিছু পাইয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দেন (এক বছরের মধ্যে স্বরাজ)। এটাও তিনি পরিষ্কার করে দেন যে তাঁর পরীক্ষামূলক গণ-রাজনৈতিক আন্দোলনের সব নীতি ও তাদের তাৎপর্য জনগণের নিজেদের বোঝার তত দরকার নেই। তাদের তরফে চাই শুধু বিশ্বাস ও শৃঙ্খলা।

এমনকি, তাঁর মূলগত দর্শনে যাদের বিশ্বাস ছিল না, তাদের স্বপথে আনার জন্য গান্ধী তাঁর নৈতিক দর্শনের সঙ্গে সমঝোতা করতেও প্রস্তুত ছিলেন। বস্তুত, প্রথম থেকেই আমরা

গান্ধীবাদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ দিকেরই দ্বৈত তাৎপর্য দেখতে পাই। যেমন, খাদি একদিকে তাঁর কাছে ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক মুক্তির উৎস, অন্যদিকে তিনি তা দেশবাসীর কাছে প্রস্তাব করেন স্বরাজ-সাধন ও অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের অস্ত্র হিসেবে। অহিংসাও একদিকে তাঁর কাছে ব্যক্তিগত নৈতিকতা, অন্যদিকে কংগ্রেসের কাছে তিনি তা রাখেন বাস্তবোচিত রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে। এইসব উদাহরণে নৈতিকতা ও রাজনীতি, ব্যক্তিগত বিবেক ও রাজনৈতিক দায়ের মধ্যে ফাঁকটা খুব বড়ো হয়েই ধরা পড়ে। গণ-আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যত তাঁর রাজনৈতিক আদর্শ চেহারা নিতে থাকে, ততই তিনি আরো সমঝোতা করেন ও ফাঁকটা বড়ো হয়। চরকা চালু করার প্রয়োজনে তিনি শিল্পায়নের বৃহত্তর নৈতিক ইস্যুটাকেই চাপা দেন এবং বলেন যে ভারতের বিশেষ পরিস্থিতি: যেখানে গ্রামাঞ্চলে প্রচুর বেকার সেখানে বৃহৎ শিল্প বাস্তবোচিত নয়। অহিংসা সম্পর্কে তিনি বলেন ভারতের অস্ত্র নেই বলেই তিনি অহিংস নীতির পক্ষপাতী।

সূত্রাং রাজনৈতিক আদর্শ হিসেবে গান্ধীবাদে প্রচুর স্ববিরোধিতা ছিল। পার্থ চ্যাটার্জির ভাষায় :

While it insisted on the need to stay firm in the adherence to its ideal, it was not able to specify concretely the modalities of implementing this as a viable political practice.^{৪৮}

তবু, আবার পার্থ চ্যাটার্জিরই ভাষায়—

the sheer tactical malleability of the "experimental" conception of truth became the principle means by which all the seemingly irreconcilable parts of that ideology were put together.^{৪৯}

ফলে সত্য সম্পর্কে তাঁর নৈতিক ধারণাটা মোটামুটি সুরক্ষিতই থাকে, বাস্তব রাজনীতির জগতে তা যতই সমঝোতা করুক।

উত্তর-অসহযোগ

এইভাবেই ভারতের জাতীয় ক্ষেত্রে তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে গেলেন গান্ধী। একটা আন্দোলন প্রত্যাহার করেছেন, আবার একটু শুক করেছেন। কখনো হতাশ হয়েছেন, মনে হয়েছে একলা চলাই ভালো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি এক গণ-রাজনৈতিক নেতাই থেকে গেলেন। ভারতীয়দের পক্ষেও প্রয়োজন ছিল তাঁর নেতৃত্বের। তাঁর নৈতিক মর্যাদা, অসাধারণ ব্যক্তিত্ব তাদের মধ্যে জাগিয়েছিল এক দুর্লভ মর্যাদাবোধ ও দুর্দম সাহস এবং সেটা তাদের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয় আন্দোলনকেও যুগিয়েছিল বিরাট শক্তি।

কিন্তু গান্ধীর 'সত্য' 'স্বরাজ' 'চরকা' ইত্যাদি আদর্শ ফাঁপা শব্দে পরিণত হল অধিকাংশ ভারতীয়র কাছে। এমনকি এগুলি রীতিমতো ঠাট্টাব বিষয় হয়ে উঠল। তাঁর সমালোচকরা তাঁকে বলতেন ভণ্ড আদর্শবাদী, এমনকি তাঁর গুণমুগ্ধ অনুগামীরাও তাঁকে ক্রিষ্ণে বাতিকগ্রস্ত বলে মনে করতেন। তাঁর আদর্শবাদিতা তাঁদের ভালো লাগলেও আদর্শটা অবাস্তব বলেই মনে হল। গ্রামাঞ্চলে ক্ষুদ্র ও বিক্ষিপ্তভাবে কয়েকজন নির্ভাবান গান্ধীবাদী কর্মী শুধু গান্ধীর আদর্শ অনুযায়ী কাজ করার ও গ্রামের মানুষকে সেই আদর্শে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করতে থাকলেন।

সত্যি করেই তাঁরা মানুষের মধ্যে গান্ধীর প্রতি শ্রদ্ধা ও তাঁর আন্দোলন সম্পর্কে উৎসাহ জাগাতে পেরেছিলেন, কিন্তু মানুষকে গান্ধীবাদ বোঝাতে কতটা সক্ষম হয়েছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

অসহযোগের পরে ভারতীয় রাজনীতিতে একটি সমাজবাদী বাম বিকল্প মাথাচাড়া দিল। বামপন্থী কবিরা প্রকাশ্যে গান্ধীয় নীতিকে চ্যালেঞ্জ জানালেন। নজরুল ইসলাম এঁদের মধ্যে সর্বপ্রধান। স্বরাজ নিয়ে তাঁর প্রবল বিদ্রুপ^{৫০}:

আমবা তো জানি স্বরাজ আনিতে পোড়া বার্তাকু এনেছি খাস।

চরকা-কেও নজরুলেব তীর আক্রমণ^{৫১}—

জাগো রে জোয়ান! বাত ধরে গেল মিথ্যার তাঁত বুনি।

কিন্তু এই নজরুলও পরে অন্য সময়ে গান্ধীর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন, চরকার গান গেয়েছেন। নৃপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এক কবির কথা আমরা জানি, যাঁর তিরিশের দশকের গোড়ার দিকে প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থে^{৫২} বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদের প্রতি সোৎসাহ সমর্থন (সম্ভবত তিনি নিজে বিপ্লবী আন্দোলনে সক্রিয় ছিলেন), কিন্তু গান্ধীর প্রতিও তিনি আনুগত্য জানিয়েছেন নির্বিধায়, একই নিঃশ্বাসে।^{৫৩} চল্লিশের দশকে কমিউনিস্ট কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য গান্ধীর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি পন করেছেন।^{৫৪} কিন্তু গান্ধীবাদ নিয়ে মাথা ঘামানোর প্রয়োজন কেউই এঁরা বোধ করেন নি। কয়েকজন তখনো অহিংসা নীতির গুণ গাইতেন, কিন্তু সে রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে, নৈতিক প্রেরণায় নয়। ত্রিশের দশকে আমার জানা সত্যিকারের গান্ধীবাদী কবি একজনই— প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। আইন অমান্য আন্দোলনের সময়ে জেলে বসে লিখেছিলেন কাব্যগ্রন্থ *মুক্তিপথে*, যেখানে গান্ধীয় মতাদর্শেরই প্রচার।^{৫৫} কিন্তু এই কবি ব্যতিক্রমী। মোটের ওপর অসহযোগের পর থেকে বাংলা কবিতায় গান্ধী রইলেন বটে, কিন্তু বাদ গেল তাঁর 'বাদ'। কবিদের মনোভাবটা হল যেন এবকম— 'গান্ধীবাদ মৃত। গান্ধীজী দীর্ঘজীবী হোন।'^{৫৬}

প্রাস্ত-টীকা :

- ১ গান্ধী মতাদর্শ মানুষ নিজেদের মতো করে বুঝেছে ও গ্রহণ করেছে এ কথাটা নতুন কিছু নয়। সাব-অলটার্ন গোষ্ঠীর ঐতিহাসিকরা গান্ধী আন্দোলনে কৃষিসমাজের মানুষজনের অংশগ্রহণ সম্পর্কে আগেই এ কথা বলেছেন। এ বিষয়ে শাহিদ আমিনের এই প্রবন্ধটি খুব বিখ্যাত— 'Gandhi as Mahatma : Gorakhpur District, Eastern UP, 1921-22', *Subaltern Studies III* (Oxford University Press, Delhi, 1984)। সম্প্রতি Claude Markovits-এর *The Un-Gandhian Gandhi : The Life and Afterlife of the Mahatma* (Permanent Black, New Delhi, 2004) গ্রন্থে দেখানো হয়েছে কীভাবে নানা ধরনের মানুষের মধ্যে তৈরি হয়ে ওঠে 'Gandhi legend', কারা কীভাবে গান্ধীকে iconize করে। এই নানা ধরনের মানুষের মধ্যে আছেন বোমা বলীর মতো পশ্চিমি চিন্তাবিদ, ভারতীয় বণিকগোষ্ঠী ইত্যাদি। বাংলা (ও মহাব্যাপ্তেব) পাশ্চাত্যায়িত মধ্যশ্রেণি সম্পর্কে মার্কোভিটস সংক্ষেপে শুধু এইটুকু বলেছেন যে এরা গান্ধী ও তাঁর দর্শন সম্পর্কে কখনোই উৎসাহী ছিল না। কিন্তু এই বস্তুব্য অতিসরলীকৃত। আমবা এই প্রবন্ধে দেখব অন্তত গান্ধীর প্রথম আন্দোলনের সময় গান্ধী ও গান্ধীবাদ নিয়ে এই শ্রেণির অনেকেই খুব উৎসাহ দেখিয়েছিল, যদিও শীঘ্রই মোহভঙ্গ হয়। মার্কোভিটস আরো

- বলেছেন যে মুসলমানবা-হিন্দুদের থেকে কম উৎসাহী-ছিল গান্ধীর ব্যাপারে। আমবা দেয়ব মুসলমানদেব উৎসাহ কিন্তু অসহযোগের সময় যথেষ্ট ছিল। তবে মোটের ওপর মার্কোভিউস ঠিকই বলেছেন যে 'Gandhi's "polysemy" in his lifetime was linked to a broad symbolic register, which left him open to different kinds of interpretation.'
২. কবিব মঙ্গাধা নামে কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত। কবিতাটি লেখা হয়েছিল ২৭ পৌষ, ১৩২০।
 ৩. কবিব নডোরগু কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত। কবিতাটি লেখা হয়েছিল ১লা বৈশাখ, ১৩২১।
 ৪. স্বরাজ-সঙ্গীত-এর ৪৭ নং গান। মনে হয় স্বরাজ-সঙ্গীত-এর কবি শান্তিনিকেতনের কাছে কোন গ্রাম বা বড়োজোর মফসসলে থাকতেন। বইটি তিনি শান্তিনিকেতনের এডুক সাহেবকে উৎসর্গ করেন এবং একটি কপি উপহার দেন বিশ্বভারতী গ্রন্থাগারে।
 ৫. মোসলেম ভারত, কার্তিক ১৩২৭।
 ৬. মোসলেম ভারত, অগ্রহায়ণ, ১৩২৮।
 ৭. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের বিদায়-আরতি গ্রন্থের (১৯২৪) অন্তর্ভুক্ত।
 ৮. 'গান্ধীজী' কবিতাটি সত্যেন্দ্রনাথের বেলাশেবের গান কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত। কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল প্রবাসী-তে, ১৩২৮ সালের কোনো সময়ে।
 ৯. নারায়ণ, পৌষ, ১৩২৮। এটি ছিল বাংলার প্রধান কংগ্রেস নেতা চিত্তরঞ্জন দাশের পত্রিকা।
 ১০. কার্তিক, ১৩২৮।
 ১১. গীতা চট্টোপাধ্যায়ের বাংলা স্বদেশী গান বইতে উদ্ধৃত (দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৩)।
 ১২. মোসলেম ভারত, পৌষ, ১৩২৭।
 ১৩. তাঁর পন্নীসেবা যাত্রাপালার অন্তর্গত। জয়গুরু গোস্বামীর চারণকবি মুকুন্দদাস ও পুলক চন্দ্রের জনগণের চারণ মুকুন্দদাস ও তাঁর গান গ্রন্থে মুকুন্দদাসের অনেক গান পাওয়া যাবে।
 ১৪. মাঘ, ১৩২৮।
 ১৫. চৈত্র, ১৩২৮।
 ১৬. নির্মলচন্দ্র চৌধুরীর স্বাধীনতা সংগ্রামে রাজবংশী সম্প্রদায় (উত্তরবঙ্গ অনুশীলন সমিতি, জলপাইগুড়ি) গ্রন্থে গানটি পেয়েছি। চৌধুরী বলেছেন এটি ১৯২৪ সালে রচিত।
 ১৭. চিত্তরঞ্জন দাসের পন্নীগীতি ও পূর্ববঙ্গ গ্রন্থে উদ্ধৃত।
 ১৮. প্রথম প্রকাশ মোসলেম ভারত, ভাদ্র, ১৩২৮। পরে বিদায়-আরতি গ্রন্থের অন্তর্গত।
 ১৯. কর্মসেবা যাত্রাপালার অন্তর্গত।
 ২০. পূর্বোক্ত।
 ২১. জাতীয় সঙ্গীত গ্রন্থের অন্তর্গত, বিজয়কুমার চক্রবর্তী প্রকাশিত, ১৯২২।
 ২২. স্বরাজ সঙ্গীত-এবং ১৪ নং গান।
 ২৩. তাঁর নির্মাণ্য কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। এই বিশেষ কবিতাটির রচনাকাল ৯ এপ্রিল, ১৯২১।
 ২৪. তাঁর মায়ের মন্দির কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত, প্রকাশ ১৩৩৫। এই বিশেষ কবিতাটি কিন্তু অসহযোগ-কালীন বলে মনে হয়।
 ২৫. আশ্বিন, ১৩২৮।
 ২৬. কার্তিক, ১৩২৮।
 ২৭. সওগাত, বৈশাখ, ১৩২৭।
 ২৮. ইসলাম দর্শন, ১ম বর্ষ, সংখ্যা ৭, কার্তিক ১৩২৭।
 ২৯. পন্নীসেবার অন্তর্ভুক্ত।

- ৩০ স্বরাজ সঙ্গীত-এব ২৭ নং গান, পূর্বোন্নিষিত।
- ৩১ উদ্ধৃত করেছেন হোমাজ বিশ্বাস, আত্মজীবনী *উজান গাঙ বাইরা*, কলকাতা, ১৯৯০।
- ৩২ কর্মক্ষেত্র পালার গান।
- ৩৩ প্রদ্যোৎ ঘোষের *গণ্ডীরা : লোকসংস্কৃতি ও উৎসব গ্রন্থে* (কলকাতা, ১৯৭৬)। এরকম গান আরো আছে।
- ৩৪ নির্মলচন্দ্র চৌধুরীর পূর্বোন্নিষিত *স্বাধীনতা সংগ্রামে রাজবংশী সম্প্রদায়* গ্রন্থে উদ্ধৃত।
- ৩৫ উদ্ধৃত করেছেন পুলক চন্দ, *গণ-কবিতা রমেশ শীল ও তাঁর গান*, কলকাতা, ১৯৭৮।
- ৩৬ বর্তমান প্রবন্ধে এই গানটি ইতিমধ্যেই উন্নিষিত। এটি পেয়েছি গীতা চট্টোপাধ্যায়ের পূর্বোক্ত গ্রন্থে।
- ৩৭ কবিতাটি ইতিপূর্বেই উন্নিষিত, *মোসলেম ভাবত-এ* প্রকাশিত।
- ৩৮ ইতিপূর্বেই উন্নিষিত, প্রকাশ *মোসলেম ভারত-এ*।
- ৩৯ প্রথম প্রকাশ *বাঙ্গালার কথা*, ২০ জানুয়ারি, ১৯২২। পত্রিকাটি চিত্তরঞ্জন দাস তাঁর পত্নীর সাহায্যে বের করতেন।
- ৪০ রবীন্দ্রনাথ *Modern Review* ও গান্ধী *Young India* পত্রিকায় এ সময়ে বেশ খানিকটা তর্কাতর্কি করেন। সত্যগ্রহকে রাজনীতির কূটকৌশল হিসেবে ব্যবহার করার ফলে মানুষের মনে অন্ধতা ও আলস্য জন্মাচ্ছে সাধারণভাবে এই অভিযোগ করেন কবি। বয়কট ও চরকাব বিশেষ ইস্যুতেও আপত্তি জানান। বিকল্প ও শ্রেয়োতর শিক্ষার ব্যবস্থা না করে স্কুল-কলেজ বয়কট, তাঁর মতে, অশিক্ষার আবাহন। ভারতের সব সমস্যার সমাধান হিসেবে চরকাব কার্যকারিতা নিয়েও তিনি সন্দেহ প্রকাশ করেন ও এ ব্যাপারে মানুষের মনে অন্ধ বিশ্বাস তৈরি হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন। এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য Sabyasachi Bhattacharya (compiled and edited), *The Mahatma and the Poet : Letters and Debates between Gandhi and Tagore 1945-1941*, National Book Trust, first edition 1997, first reprint 1999, আরো দ্রষ্টব্য R. K. Dasgupta, 'Gandhi and Tagore' in S. C. Biswas ed. *Gandhi : Theory and Practice, Social Impact and Contemporary Relevance*, first published 1969, reprinted 1990.
- ৪১ নারায়ণ, ফাল্গুন, ১৩২৮।
- ৪২ বরিশাল থেকে ১৯২২-এ প্রকাশিত। এই গানটি উদ্ধৃত হয়েছে গীতা চট্টোপাধ্যায়ের গ্রন্থে।
- ৪৩ নারায়ণ, বৈশাখ, ১৩২৯। কবিতাটির নম 'অবসাদ'।
- ৪৪ বচনা ৩ মাঘ, ১৩২৮। অনুশীলন সমিতির পত্রিকা *শঙ্কু*-এ প্রথম প্রকাশ।
- ৪৫ কবিতাটি পূর্বোন্নিষিত 'গান্ধীজী'।
- ৪৬ মুক্তধারা নাটকটি পাণ্ডা যাবে বিশ্বভারতী প্রকাশিত *রবীন্দ্র রচনাবলী*-র চতুর্দশ খণ্ডে।
- ৪৭ গান্ধী ও গান্ধীবাদ সম্পর্কে রচনা প্রচুর। বিভিন্ন লেখকের মূল্যায়নের পার্থক্য বিষয়টিকে আবারো জটিল করে তুলেছে। আমাব মূল্যায়ন বিবিধগ্রাহী। তবে যে লেখাটি আমাকে সবথেকে প্রভাবিত করেছে সেটি হল— Partha Chatterjee, 'The Moment of Manoeuvre : 'Gandhi and the Critique of Civil Society' in Partha Chatterjee, *Nationalist Thought and the Colonial World : A Derivative Discourse?*, OUP, New Delhi, 1986 চ্যাটার্জির প্রভাব আমাব প্রবন্ধের আগাগোড়াই আছে, তবে বিশেষ করে আছে এখন যা বলতে যাচ্ছি সেখানে।
- ৪৮ ওই, পৃ. ১১৭।
- ৪৯ ওই, পৃ. ১১৩।

- ৫০ কবিতার নাম 'আমার কৈফিয়ৎ', নজরুলের কাব্যগ্রন্থ *সর্বহারা* (কলকাতা, ১৯২৪)-র অন্তর্গত।
- ৫১ কবিতার নাম 'সব্যসাচী', প্রকাশ *লাঙল*, ৭ জানুয়ারি, ১৯২৬।
- ৫২ বইটির নাম *কারার ফুল*। কবি জেলে বসে লিখেছিলেন, ডিসেম্বর ১৯২৯ থেকে সেপ্টেম্বর ১৯৩০-এর মধ্যে।
- ৫৩ কবি সম্পর্কে বইটিতে বলা হয়েছে যে তিনি বঙ্গভঙ্গ ও অসহযোগ আন্দোলনে অংশ নেন, পরে চিত্তরঞ্জন দাশের সান্নিধ্যে আসেন এবং 'বিপ্লবের কণ্টকাকীর্ণ পথের আহ্বানে' সাড়া দিয়ে সরকারি কলেজের সহকারী প্রধানের পদ ত্যাগ করেন।
- ৫৪ কবিতার নাম 'মহাত্মাজীর প্রতি'। সুকান্তর *ঘুম নেই* কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত। বইটি কবির মৃত্যুর পর প্রকাশিত, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৭। কমিউনিস্ট পার্টির সহযাত্রী বিষ্ণু দে-ও গান্ধীহত্যার পর শ্রদ্ধাঞ্জলি করেন। বিষ্ণু দে-র কবিতাটির নাম '৩১শে জানুয়ারি, ১৯৪৮', তাঁর *আলেখ্য* (১৯৫৮) কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত।
- ৫৫ প্রভাতমোহন আইন অমান্য আন্দোলনে অংশ নিয়ে গ্রেপ্তার হন। মুক্তিপত্র-৫৭টা কবিতার অধিকাংশই জেলে বসে লেখা।
- ৫৬ আবো কিছু কবি ও ঔপন্যাসিক, যারা অসহযোগের পরেও গান্ধী ও গান্ধীবাদকে সমর্থন করেছিলেন, তাঁদের কথা জানা যাবে এই প্রবন্ধটি থেকে— Sisir Kumar Das, 'The Great Victim : Gandhi and Bengali Literature' in *Social Science Probings*, June 1985. তবে দাশ বলেন, এই গান্ধী একটি আদর্শবাদী জীবনের প্রতীক, ঠিক রাজনীতির পথপ্রদর্শক নন। দাশ এটাও লক্ষ্য করেছেন যে গান্ধীর সামাজিক ও রাজনৈতিক দর্শন বেশির ভাগ মানুষের কাছেই আর গ্রাহ্য ছিল না। যেসব কবির কথা এই প্রবন্ধে আছে তাঁদের মধ্যে আছেন সুবিখ্যাত জীবনানন্দ দাশ ও জনৈক কালিপদ ভট্টাচার্য, যিনি গান্ধীকে গৌরবান্বিত করে ১৬টি সর্গের এক মহাকাব্য লিখেছিলেন। তবে যা আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং দাশ যেরকম সঠিকভাবেই আমাদের দুটি আকর্ষণ করেছেন, তা হল তারশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস *গান্ধীদেবতা* (১৯৩৯) ও *গণদেবতার* (১৯৪২) দুই নায়কের চরিত্র। দুটি চরিত্রই গান্ধীয় গ্রাম-পুনরুদ্ধারজীবনের ব্রতে নিবেদিতপ্রাণ। তাহাড়াও দাশ সত্যনাথ ভাদুড়ির *জাগরণী* (১৯৪৪) উপন্যাসের গান্ধীয় পিতার কথা আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন। গান্ধীবাদের যেটুকু প্রভাব কয়েকজন ব্যক্তির জীবনে ও কিছু ক্ষুদ্র গ্রামীণ এলাকায় বিচ্ছিন্নভাবে থেকে গিয়েছিল, এই উপন্যাসগুলি তারই পরিচয় বহন করে।

বিকিরণ, আকরণপক্ষ আর কায়াপক্ষ

প্রবাল দাশগুপ্ত

আলোচনার সূত্রপাতে আলোচ্য বিষয়ের উল্লেখ করতে গিয়ে কয়েকটা মুশকিল ঘটে ঠিকই। উল্লেখ করতে পারার জন্যেও কিছু কিছু জিনিস ধরে নিতে হয়। সেই ধরে-নেওয়াগুলোকে পরে টেনে বার করে শোধরানো সহজ কাজ না হতে পারে। এই ঝুঁকি নিতে হবে জেনেও পাঠকের সুবিধার্থে প্রথমেই বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করব, এখানে বিকিরণ শব্দের যে পারিভাষিক প্রয়োগ পাচ্ছি, সেই বিকিরণ ব্যাপারটা ঠিক কী।

বাংলায় যে নাম কথাটার সঙ্গে নামজাদা কথাটার আত্মীয়তা, এইটার সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে লক্ষ্য করি যে হারাম/হারামজাদা এবং নবাব/নবাবজাদা এ থেকে আলাদা অন্য একটা আত্মীয়তার দৃষ্টান্ত। সম্বন্ধ-দুটো এক সম্বন্ধ নয়। নাম-এর সঙ্গে নামজাদার যে সম্বন্ধ, তা থেকে আলাদা হারাম আর হারামজাদার সম্বন্ধ।

ওই প্রথম সম্বন্ধটা খালি একজোড়া শব্দের বেলাতেই পাচ্ছি, নাম আর নামজাদা। দ্বিতীয় বা তৃতীয় কোনো জুটি পাচ্ছি না ওই ধরনের। অথচ নবাব/নবাবজাদা আর হারাম/হারামজাদার পাশাপাশি পেয়ে যাচ্ছি শাহ/শাহজাদা। এবার বিকিরণের কথায় আসি। আমরা বলব নাম/নামজাদা সম্বন্ধটা একা বা বিচ্ছিন্ন, ওর কোনো বিকিরণ নেই, কিন্তু হারাম/হারামজাদা সম্বন্ধটার বিকিরণ আছে।

এইটুকু নমুনা দিলে অনেকে দেখতে পায় না কী নিয়ে কথা হচ্ছে। তাই একটু এগিয়ে গিয়ে বলি, আরেক পাশ থেকে এও দেখা যাচ্ছে যে হারামজাদা শাহজাদা নবাবজাদার অন্য ধরনের সম্বন্ধ হারামজাদি শাহজাদি নবাবজাদির সঙ্গে। অথচ নামজাদি কথাটার কোনো প্রচলন নেই। এতে আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে নামের সঙ্গে নামজাদার যে অস্ফুট সম্বন্ধটুকু আছে, অভিধানে সে সম্বন্ধের অস্তিত্ব থাকলেও ভাষার গঠনে তার কোনো বিকিরণ নেই। অন্য দিকে নবাব কথাটার সঙ্গে নবাবজাদার যে সম্বন্ধ, বাংলা ভাষায় তার একটা পরিস্ফুট উপস্থিতি বা হাজিরা আছে। সেইটাকে বলছি তার বিকিরণ। অর্থাৎ বলা চলে এই সম্বন্ধটা একটা বিকীর্ণ সম্বন্ধ।

এভাবে বিকিরণের সঙ্গে প্রাথমিক পরিচয় করিয়ে দেওয়া সম্ভব হল। যথাসাধ্য নিম্নগতক জমিতে দাঁড়িয়ে এই কাজ করেছি। এবার কাঁটার দিকে তাকানো, যাক।

বর্তমান নিবন্ধে আমি যে দৃষ্টিভঙ্গির হয়ে লিখছি তাকে বলে কায়াবাদী (সাবস্ট্যান্সিভিস্ট) ভাষাতত্ত্ব। আকরণবাদী (ফর্মালিস্ট) প্রতিপক্ষের সঙ্গে কায়াবাদের তর্ক ভাষাতত্ত্বের অনেকে এলাকাতেই জমে উঠেছে। ব্যাকরণের যে শাখা পদের চেহারা আর মানের সম্বন্ধ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে সেই পদাণুতত্ত্বে (মর্ফোলজিতে) তর্কটা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে

অবিশেষজ্ঞ অথচ আগ্রহী পাঠকের কাছেও অপেক্ষাকৃত সহজে খুলে বলা যায় বিচার্যগুলো কীরকম দেখতে।

অনেকেই লক্ষ করে থাকবেন, অলংকারশাস্ত্রের নামে অলংকারের উল্লেখ থাকলেও ধ্রুপদি যুগে ওই শাস্ত্রের সমস্ত কর্মী অলংকার ধারণাটাকে গুরুত্ব দিত না। রীতিবাদী আর ধ্বনিবাদীরা অলংকারশাস্ত্রের কর্মী ঠিকই। তাই তারা অলংকারবাদের বিরুদ্ধে। তেমনি পদাণুতত্ত্বেও দু'রকমের কর্মীই আছে। কোনো কোনো কর্মী পদাণু বলে একটা ব্যাপারকে গুরুত্ব দিয়ে সেইটার উপর পুরো তত্ত্বটাকে দাঁড় কবাতেন সচেষ্ট। তারা পদাণুবাদী। আর আছি আমরা যারা পদাণুতত্ত্বের চর্চা করলেও পদাণুকে এই কাজের খুঁটি হিসেবে ব্যবহার করি না। পদাণুবাদের বিপরীত মেরুতে যে ভাষ্যের অবস্থান তাকে বলা চলে অখণ্ডপদবাদ। ভাষাতত্ত্বের ব্যাপকতর আলোচনার প্রাঙ্গণে “কায়াবাদ” (সাবস্ট্যান্সিভিজম) বলে যে ভাষ্যের অবতারণা ঘটেছে, তার মূলসূত্রের পদাণুতাত্ত্বিক শাখাসূত্র অখণ্ডপদবাদ (হোল ওয়ার্ড মর্ফোলজি) বলে পরিচিত।

বর্তমান নিবন্ধে বাংলা পদাণুতত্ত্বের কিছু তথ্য অবলম্বন করে যুক্তি সাজাব অখণ্ডপদবাদের পক্ষে এবং পদাণুবাদের বিপক্ষে। প্রথমেই বিকিরণের কথা তুলেছি। কী নিয়ে তর্ক হচ্ছে সেটা অবিশেষজ্ঞ পাঠকের কাছে স্পষ্ট করার জন্যেই এই প্রসঙ্গ বেছে নিয়েছি। পদাণুতত্ত্বের সমস্ত কর্মীই স্বীকার করে বিকিরণের (প্রডাক্টিভিটির) গুরুত্ব।

সর্বাত্মে পদাণুপক্ষের আর অখণ্ডপদপক্ষের প্রস্থান আর কাজের ধরন নিয়ে গোড়ার কথা বলে নেব। তারপর ফিরব বিকিরণের আলোচনায়, দেখাব যে বাংলা ব্যাকরণের স্বাতন্ত্র্য নিয়ে যাঁরা ভাবতে চান তাঁদের কাজ দ্রুত এগোবে যদি তাঁরা অখণ্ডপদপক্ষের দিকটাতেই মন দেন। পরিশেষে ভাষার খেয়ালিপনা (আর্বিট্রারিনেস) প্রসঙ্গের উত্থাপন করে দেখাব আলোচনার সেই নির্বিশেষ স্তরে পদাণুপক্ষকে কতটা নিরাস লাগে, অখণ্ডপদপক্ষের তুলনায়।

পদাণুবাদীরা পদকে কেটে কেটে ছোটো ছোটো টুকরো শনাক্ত করে নেন। দাবি করেন যে এভাবে তাঁরা যে জায়গায় পৌঁছে যান সেটা ভাষার মূল একক। পদাণু, যা নাকি উচ্চারণের সঙ্গে অর্থবোধের অবিভাজ্য মোলাকাতের জমি। যেমন পদাণুবাদীরা “নবাবজাদি” পদটাকে কেটে তিনটে টুকরোকে তুলে তুলে ধরে বলেন— এই দেখ নবাব; তারপর দেখ জাদ; তারপর ই। নবাব— মানে নবাব; জাদ— মানে তার বাচ্চা; আর ই— মানে সেই পুংলিঙ্গে র স্ত্রীলিঙ্গ প্রতিরূপ। এই খণ্ডতত্ত্ব সুপ্রাচীন। ভারতীয় ঐতিহ্যে বলত ভাষার মূল জিনিস দুই ধরনের, প্রকৃতি আর প্রত্যয়, প্রকৃতি আবার দুই জাতের, প্রাতিপদিক আর ধাতু। বর্তমান দৃষ্টান্তের পদাণু-তিনটির মধ্যে নবাব জাতিতে প্রাতিপদিক। জাদ এবং ই জাতিতে প্রত্যয়। সাহেবি ঐতিহ্য টিপ্পনী কেটে বলে ‘পদাণু’ বলে এক মহাজাতির অন্তর্গত ‘প্রকৃতি’ আর ‘প্রত্যয়’।

পদাণু ধারণাটা আকরণবাদী ব্যাকরণের মূলসূত্রের পর্যায়ভুক্ত। আকরণবাদী আদলের ভাষ্যকারের কাছে শুনবেন, নবাব-জাদ-ই পদের এই যে তিন পদাণু নবাব আর জাদ আর ই, এদের মধ্যে দ্বিতীয় অর্থাৎ জাদ পদাণুটা হল মানসিক ধ্যানমূর্তি জাদ = জাদা পদাণুকল্পের বিশেষ একটা বহিরঙ্গ চেহারা। নবাব-জাদা পদে আমরা যে “জাদা” পদাণুকে পাচ্ছি সে নাকি ওই একই পদাণুকল্প জাদ = জাদার আরেকটা বহিরঙ্গ রূপ। পদাণুকল্পের নিরপেক্ষ নাম

রাখতে চাইলে এমন চেহারা বাছা সমীচীন হত যা জাদ এবং জাদার ঠিক মাঝামাঝি। সেরকম সোনার পাথরবাটি তো পাব না। দয়ের গায়ে আধখানা আকার লাগাব কী করে? পদাণুবাদীরা সেইজন্যে বলেন, যে পদাণুকল্পকে আকরণের বিমূর্ত দুনিয়ায় ঈষৎ পক্ষপাতদুষ্ট “জাদা” নাম ধারণ করতে দিচ্ছি, কায়ার জগতে দুখানা পরিস্ফুট চেহারা দেওয়া হয় তাকে— জাদ এবং জাদা। এগুলো ওই পদাণুকল্পের (মর্ফিমের) দুই পদাণুবিকল্প (বা অ্যালোমর্ফ)।

বিশ্লেষণের যে আদি মুহূর্তে বিকল্পতার বিবেচনা শুরু হয় নি সেই পূর্বে বিশ্লেষণের মাল-মশলা নিয়ে কথা বলতে পারার জন্যে “পদাণুকায়” বলে আরেকটা পারিভাষিকের আমদানি। সেই বিচারপূর্ব স্তরে বলা হয় জাদ একখানা পদাণুকায় (মর্ফ), জাদা আরেকখানা পদাণুকায়। কোনো এক ভাষাখণ্ডকে কখন পদাণুকায় বলে গণনা করা হবে? যখন তার শরীরে উচ্চারণের সঙ্গে অর্থবোধের মোলাকাতির স্থল আছে বলে বিশ্লেষণকারী নিশ্চিত হতে পারবেন। আকরণবাদীরা মনে করেন প্রথম ধাপে ভাষার পদাণুকায়গুলোর পূর্ণ তালিকা প্রণয়ন করে নিয়ে তার পরের ধাপে বিশ্লেষণকারীর উচিত কয়েকটা করে পদাণুকায় একত্র করে পদাণুকল্প গুছিয়ে নেওয়া। সেই দ্বিতীয় ধাপের মুহূর্তে বাংলার বিশ্লেষণ স্বীকার করবে যে জাদ=জাদা বলে একটা পদাণুকল্প আছে যার দুই পদাণুবিকল্প জাদ এবং জাদা। এই ধাপের কাজ হল প্রত্যেকটা পদাণুকায়াকে বিশেষ কোনো পদাণুকল্পের বিকল্প হিসেবে শনাক্ত করে নেওয়া। দ্বিতীয় ধাপের কাজ শেষ হবার পর কোনো বেওয়ারিশ পদাণুকায় পড়ে থাকবে না তালিকায়।

অমুককায় আর অমুককল্প আর তার একাধিক অমুকবিকল্পের মতো পরিভাষা পদাণুতাত্ত্বিকদের উদ্ভাবিত নয়। ধ্বনিতত্ত্বের মহলে এ ধরনের কথাবার্তা শুরু হয়েছিল উনিশ শতকেই। ধ্বনিতাত্ত্বিকরা তখন থেকে বলে এসেছেন, ল একটা ধ্বনিকল্প বা ফোনিম, যার দুই ধ্বনিবিকল্প বা অ্যালোফোন। “সলতে, উলটো” এই দুই শব্দের উচ্চারণের মধ্যে সূক্ষ্ম তফাত আছে। “সলতে”-র ল দন্ত্য। “উলটো”-র ল ধ্বনি মূর্ধ্য। কিন্তু সেই তফাতে বাংলায় কিছু এসে যায় না। মারাঠি বা তেলুগুতে এসে যায়, তাই সেই সেই ভাষীর কানে তফাতটা অত সূক্ষ্ম ঠেকে না। মারাঠি আর তেলুগুতে সেইজন্যে মূর্ধ্য ল আর দন্ত্য ল বলে দুটো আলাদা ধ্বনিকল্প আছে; ওদের লিপিতে স্বতন্ত্র হরফও রয়েছে। কিন্তু বাংলায় তফাতটা ধ্বনিকল্পের নয়, ধ্বনিবিকল্পের— ফোনিমিক নয়, অ্যালোফোনিক। বিংশ শতাব্দীতে যে পদাণুতত্ত্বেও এসব কথা চালু হয়েছে সেটা ধ্বনিতাত্ত্বিক মহলের প্রভাবেই। ধ্বনিতত্ত্বেও যেমন, পদাণুতত্ত্বেও তেমনি, লোকে এমনিতে যখন “পদাণু” কিংবা “ধ্বনি” বলে, তখন কায়ার আর কল্পের প্রভেদটা তখনকার মতো মূলতুর্বি রাখে ঠিকই, কিন্তু মোটের উপর ধরে নেয় যে পদাণু মানে পদাণুকল্প এবং ধ্বনি মানে ধ্বনিকল্প।

এবার পদাণুবাদের পাশে রেখে তার অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী কায়াবাদের প্রসঙ্গ উত্থাপনের কাজে হাত দেওয়া যাক। পদাণুবাদের মতে পদ সখণ্ড; পদের অর্থযুক্ত খণ্ডকে সে পদাণু বলে। আমরা কায়াবাদীরা মনে কবি পদ অখণ্ড। ভাষার বিশ্লেষণের পক্ষে জরুরি যেসব বক্তব্য প্রকাশ করবার জন্যে পদাণুবাদীরা পদাণুর প্রসঙ্গ পাড়বার দরকার দেখেন, তার অনুরূপ কথা আমরাও বলি বইকি, তবে আমরা কথাগুলো একটু অন্যভাবে পাড়ি বলে আমাদের জবাবও অন্যরকম দেখায়। সেগুলো ঠিক পদাণুবাদীদের কথার তরজমা নয়।

যেমন ধরুন, পদাণুবাদী বলবেন, নামজাদা পদটাতেও দুটো পদাণু আছে— নাম এবং জাদা; তেমনি নবাবজাদাতেও দুখানা পদাণুকে পাচ্ছি— বলা বাহুল্য নবাব এবং জাদা। কিন্তু এদের মধ্যে দুটো তফাত। প্রথমত, নামজাদাতে যেটা দ্বিতীয় পদাণু সেই জাদা-প্রত্যয় গুণান্বিত-বাচক (সেকেলে রীতিতে বলা চলে “মত্বর্থক”), আর নবাবজাদার দ্বিতীয় পদাণু এ থেকে পৃথক সন্ততি-বাচক জাদা-প্রত্যয় (সাবেক যুগের জবানিতে “অপত্যপ্রত্যয়”)। আরেকটা পার্থক্য— নামজাদাতে যে জাদা আবির্ভূত সেই প্রত্যয়ের কোনো বিকিরণ নেই, কিন্তু নবাবজাদায় প্রযুক্ত জাদা-প্রত্যয় রীতিমতো বিকীর্ণ।

ভাষাতত্ত্বের বিস্তৃত আলোচনার এলাকায় আকরণবাদের সঙ্গে কায়াবাদের যে তর্ক চলছে, পদাণুতত্ত্বের বৈশেষিক কাজের তল্লাটে সেই তর্কের উপতর্ক অনুষ্ঠিত হচ্ছে দুই পক্ষ সাজিয়ে। পদাণুবাদীরা আকরণপন্থার প্রতিনিধি। আর কায়াপন্থার হয়ে তর্ক করছি আমরা যারা অখণ্ডপদবাদী। দেখুন তো এই দৃষ্টান্তের বেলায় আমরা কী বলি।

আমরা নবাবজাদাকেও কাটি না, নামজাদাকেও না। আমরা বলি, দেখতে পাচ্ছি ত্রৈশিকের অঙ্কের মতো সেজে রয়েছে ভাষার ছক, নবাব/নবাবজাদা/=শাহ/শাহজাদা, এমনকি=হারাম/হারামজাদা। অর্থাৎ এখানে খানিকটা বিকিরণ ঘটছে বাংলা ভাষায়। অতএব বৈয়াকরণের দায়িত্ব আছে। আসুন আমরা একটা প্রতিরূপ-ছক ছকে ফেলি যাতে দায়িত্ব পালন করা যায়। নবাব-এর দিকটার রূপ ধরব “অমুক”। অন্য দিকটাতে রাখব “অমুকজাদা”। পাশে সংক্ষেপে লিখে রাখব এ দিক থেকে ও দিক যেতে কথার মানে কীভাবে পালটায়। ছকের দু দিকের প্রতিরূপ-সম্বন্ধ বোঝাতে আঁকব দুমুখো তির। অর্থাৎ লিখব অমুক অমুকজাদা ‘অমুকের সন্ততি’। এই ছক বলছে, আমি যদি বাংলাভাষী হই, বাঁ দিকের আদলের কোনো পদকে ভিত্তি হিসেবে বেছে নিয়ে ডান দিকের ধাঁচের কিছু বলতে চাই (অথবা সেই ধাঁচের কিছু আর কেউ আমার সামনে বলছে যা আমি বুঝতে চাই), তাহলে সুলতান থেকে আমি সুলতানজাদা প্রতিরূপে যেতে পারি (যদিও ঠিক এই “সুলতানজাদা” পদটা হয়ত এর আগে কখনো শুনি নি আমি)। তির দু দিকে মুখ করে আছে কারণ এই ছক উলটো দিকেও কাজ করে। আমি যদি বাংলাভাষী হই, ডান দিকের আদলের কোনো পদকে ভিত্তি হিসেবে বেছে নিয়ে বাঁ দিকের ধাঁচের কিছু বলতে (বা বুঝতে) চাই, তাহলে— হয়ত আমি ছোটো বাচ্চা। হয়ত আমি “শাহজাদা” কথাটাই শুনিছি, এর আগে কখনো কেউ আমার সামনে “শাহ” কথাটা বলে নি— আমি ডান দিকের আদলের ওই “শাহজাদা”-র ভিত্তিতে সেখান থেকে “শাহ” প্রতিরূপে যেতে পারি। গিয়ে হয়ত বাচ্চা হিসেবে আমি “শাহ মানে কী” জিগেস করে আমার একটা দরকার মেটাতেই চাইব, কিন্তু তার আগে আমার মনের ভিতরে যে ছক তৈরি হয়ে গিয়েছিল সেই ছকের দুমুখো তীরের সাহায্যে প্রথমে “শাহ” চেহারাটাকে নিজে ধরব, ধরে তারপর প্রশ্ন পেশ করব বড়োদের দরবারে।

এভাবে অখণ্ডপদপক্ষের কাজের ধরনের সঙ্গে পাঠকের প্রাথমিক আলাপ করিয়ে দেওয়া গেল কেবল। “পদের প্রতিরূপ-ছক” বলতে যা বোঝায়, এই দৃষ্টান্তে তার কিছু সরঞ্জাম দেখাতে পারলাম। বাদ দিলাম বর্গের সূচক, সে সূচকের বন্ধনী-বাহন, সরঞ্জামের টিপ্পনীর ওজন। বিতর্ক উপস্থাপনের কাজ এতেই চলবে।

বিচক্ষণ পাঠকের নিশ্চয়ই চোখে পড়ে থাকবে যে আমি নামজাদা পদের বেলায়

অখণ্ডপক্ষের ছবি আঁকার ধরন কোথায় আলাদা সেটা এখনও দেখাই নি। দেখাই নি তার একটা কারণ এই যে দেখাবার কিছু নেই। অখণ্ডপক্ষ দাবি করে যে কোনো ভাবীর পদভাঙারে যদি মোটে একখানা প্রাসঙ্গিক জুটি থাকে— যেমন নাম/নামজাদা— তাহলে কোনো প্রতিরূপ-ছকের উদ্ভব হয় না, অতএব বলার কিছুই নেই। যার বিকিরণ নেই সে জিনিসের কোনো ব্যাকরণ হয় না। হ্যাঁ, অভিধানের নিভৃতিতে বলার কিছু থাকতেও পারে, হতেও পারে ভাবীর মন এটা লক্ষ করে যে নাম-এর সঙ্গে নামজাদার চেহারার আর অর্থবোধের এক রকম সম্বন্ধ কল্পনা করা যায়। কিন্তু প্রাসঙ্গিক অন্তত দুখানা জুটি দেখতে না পেলে অখণ্ডপক্ষের পদাণুতাত্ত্বিক প্রাতিরূপ্যের ছক ছকতে বসে না।

বাংলা ব্যাকরণের স্বাতন্ত্র্য অর্জনের প্রয়াস যাদের কাছে জরুরি তারা পদাণুপক্ষের বদলে অখণ্ডপদপক্ষকে বেছে নিলে লাভবান হবে বলে কেন মনে করি, সেই প্রশ্নে আসি এবার।

লেখক পাঠক অধ্যাপক নায়ক গায়ক-এর মতো পদের সঙ্গে লেখিকা পাঠিকা ইত্যাদির যে সম্বন্ধ সেটা ঠিকমতো ফুটিয়ে তুলতে চাইলে কী করণীয়, এই প্রশ্নের উত্তর কোন পক্ষ কীভাবে দেয় সেটা খতিয়ে দেখলে তর্কের জায়গাটা দেখতে পাবেন সহজে।

পদাণুবাদীরা বলবেন, পাঠিকা পদের তিনটি পদাণু— পাঠ, ইক্, আ। এদের মানে যথাক্রমে পড়া-ক্রিয়া-কারী, স্ত্রীলিঙ্গ। এদের মধ্যে বিশেষ করে ইক্ নিয়ে একটা গল্প ফাঁদবেন পদাণুবাদী ভাষাতাত্ত্বিক। তিনি বলবেন, পাঠক পদের যে অক্ আর পাঠিকা-র যে ইক্ এ দুটো একই অক্=ইক্ পদাণুকল্পের দুই পদাণুবিকল্প। এদের মধ্যে ইক্ আবির্ভূত হয় আ-পদাণুর আগে; অন্য যেকোনো পরিবেশে অক্ দেখা দেয়।

এ পর্যন্ত আমরা সরঞ্জামের ব্যাপারে যেটুকু বলেছি সেটা এক বার ঝালিয়ে নেওয়া ভালো যদি অনুধাবন করতে চান এ দুই পক্ষের কার জল কতদূর গড়ায়। অখণ্ডপদপক্ষ ছক ছকতে বসতে রাজি হবে। বেশ কয়েকটা জুটি পাওয়া গেছে, লেখক/লেখিকা, পাঠক/পাঠিকা, অধ্যাপক/অধ্যাপিকা, নায়ক/নায়িকা, গায়ক/গায়িকা, আর কত চাই।

“প্রতিরূপ ছক”টা বর্তমান ক্ষেত্রে এইরকম দেখাবে: অমুক-অক্ <— > অমুক-ইকা, ‘সেই কাজের কর্মী, স্ত্রীলিঙ্গ’। পদাণুবাদের সঙ্গে কোনো সূক্ষ্ম প্রভেদ চোখে পড়ল কি?

আগে খেয়াল করিয়ে দিই স্থূল প্রভেদটার কথা। আকরণবাদী পদাণুপক্ষ নায়িকা পদকে কেটে তিন টুকরো করে— ক্রিয়া-ধাতু নায়, প্রত্যয় ইক্, প্রত্যয় আ। কায়াবাদী অখণ্ডপদপক্ষ বলে নায়িকা পদের সঙ্গে নায়ক পদের বিবরণসাধ্য সম্বন্ধের বিবরণ দিতে গিয়ে এটুকুই দেখা দরকার যে প্রাসঙ্গিক উভয় পদকেই এমন উর্দি পরিয়ে দেওয়া যায় যার চেহারা বোঝাবার জন্যে দরকার হয় দুখানা সূচকের— একটা কাঁচা সূচক (ভেরিয়েবল), যা আমাদের এই নিবন্ধের দৃষ্টান্তগুলোতে “অমুক” বলে চিহ্নিত; আর একখানা পাকা সূচক (কনস্ট্যান্ট), যেমন “অমুক-অক্”—এর ওই “অক্” কিংবা “অমুক-ইকা”—র “ইকা”।

এ দুই বিশ্লেষণ পাশাপাশি রেখে অনেকের মনে হতে পারে, অখণ্ডপক্ষও বুঝি আসলে লুকিয়ে লুকিয়ে “অমুক”—এর স্থলে ধাতুকেই বসচ্ছে। এভাবে ভাবলে কিন্তু আপনি দু পক্ষের মধ্যকার স্থূল তফাতটাও ধরতে পারবেন না। ধরুন নেতা/নেত্রী, খাতা/খাত্রী, রচয়িতা/রচয়িত্রী নিয়ে যদি কথা বলতে চাইতাম, তাহলে ছকটা এইভাবে ছকতাম (একটুক্কণের জন্যে ধরে নিন কাজটা করা যায়— বুঝতেই পারছি “রচয়িত্রী, খাতা” অপ্রচলিত

বলে আপনার অস্বস্তি হতে পারে, কিন্তু তর্কের খাতিরে যদি ওই কথাটা একটু মূলত্ববি রাখেন— অমুক-তা <—> অমুক-ত্ৰী, ‘সেই ধরনের ব্যক্তির ত্রীলিঙ্গ’। এবার নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন, যদি ভাবতে চান এই বিশ্লেষণও রচয়িতা পদটাকে আসলে কাটে-ছেঁড়ে, তাহলে “রচয়ি” আর “তা/ত্ৰী” এইরকম চেহারার দু খণ্ডে কাটছে। দেখতে পাচ্ছেন অখণ্ডপদপক্ষ স্পষ্টতই “রচয়ি”-কে ধাতু বলতে চাইছে এমন হতে পারে না। অখণ্ডপক্ষ সত্যি সত্যিই ধাতু বা প্রত্যয়ের ধার ধারে না। বাঁয়ে থেকে ডাইনে যেতে অথবা ডাইনে থেকে বাঁয়ে যেতে চেহারার কী বদল ঘটছে যার সঙ্গে সঙ্গে অর্থবোধেরও নির্দিষ্ট বদল ঘটছে, এই পরিস্ফুট প্রশ্নের পরিষ্কার জবাব খুঁজছে কায়াবাদী, সেই সীমারেখা কোথাও তথাকথিত ধাতু বা প্রত্যয়ের মতো দেখাবে, কোথাও দেখাবে না।

স্কুল তফাতটা এই যে অখণ্ডপক্ষ সত্যিই পদকে খণ্ড খণ্ড করে না। ফলে তার বিশ্লেষণ কোথাও “নারীকা কথাটাতে নাম্ অংশটার মানে কী” এই গন্তব্যহীন প্রশ্ন তুলে সময় নষ্ট করে না। ওদিকে পদাণুপক্ষ যেহেতু ইক্ এবং আ-কে পদাণু বলে মানতে গিয়ে নাম্ ধাতুকেও বাংলা ধাতু বলে স্বীকার করে ফেলে, তাই তাকে এই এলাকায় বিস্তীর্ণ বেকার সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়— নাম্ ধাতু স্বীকার করা তো বাংলা ভাষার বিশ্লেষণে কোনো কাজের কথা নয়। এইখানে পাঠক নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন কেন বলেছি যে বাংলা ব্যাকরণের স্বায়ত্তশাসন যে কর্মীর কাম্য তিনি তাই আকরণবাদের কাছে (পশ্চিমে প্রশিক্ষিত বন্ধুদের চাপে) আত্মসমর্পণ করে ফেললে মুশকিলে পড়বেন। ইংরিজিনিবিশদের ব্যাকরণ এসব ব্যাপারে বাংলাকে ফের তুলে দেয় সংস্কৃতের হাতে।

কিন্তু এ তো গেল স্কুল প্রভেদের কথা। আমি জানতে চেয়েছিলাম পাঠক পদাণুপক্ষের দেওয়া সমাধানের সঙ্গে অখণ্ডপদপক্ষের প্রস্তাবের সূক্ষ্ম প্রভেদ দেখতে পেয়েছেন কিনা। সে তফাতটা অন্য জায়গায়। পদাণুপক্ষ “অক্=ইক্” পদাণুকল্পের অভিত্ব স্বীকার করতে বাধ্য, এই স্বীকৃতি তার নাচের কেন্দ্রীয় মুদ্রা, এবং বলতে বাধ্য যে ওই পদাণুকল্পের অর্থ হল “সেই-ক্রিয়া-কারী”। এখানে ক্রিয়া বেশ ব্যাপক জিনিস। মনে রাখবেন কীটনাশক কেশবর্ধক বস্ত্রবাচক ইত্যাদি অনেক পদে অক-পদাণুর অভিত্ব স্বীকার করতে বাধ্য পদাণুবাদী বৈয়াকরণ। সেসব কোনো কাজের কর্মীর আখ্যা হতে পারে না— নানা প্রক্রিয়ার অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে যে “ক্রিয়াকারী” পদার্থ বা সামগ্রী সেই জিনিসের অভিত্ব সেগুলো। যে নিয়মে পদাণুবাদ বাঁচে তাতে তার পক্ষে অক-এর ওই প্রয়োগগুলো অগ্রাহ্য করে খালি গায়ক নায়ক লেখক-এর মতো মনুষ্যকেন্দ্রিক দৃষ্টান্তের উপর জোর দেওয়া একেবারেই অবৈধ।

পক্ষান্তরে, অখণ্ডপদপক্ষ যা বলতে বাধ্য— নিজের নিয়ম মেনে চললে— তাতে থাকবে প্রতিরূপ-ছক, এবং সেই ছকের অর্থবোধ-বিষয়ক সংক্ষিপ্ত বিবৃতি, “সেই কাজের কর্মী, ত্রীলিঙ্গ”। এই সংক্ষেপণের আওতায় পাঠক লেখক গায়ক নায়ক সেবক পড়ে ঠিকই, কিন্তু কীটনাশক কেশবর্ধক বা বস্ত্রবাচক এর নাগালের একদম বহির্ভূত। ওগুলোর বেলায় বাংলায় কীটনাশিকা কেশবর্ধিকা বস্ত্রবাচিকার মতো কথার প্রচলন নেই। একাধিক প্রাসঙ্গিক জুটি না পেলে অখণ্ডপক্ষ সরঞ্জাম বার করে না বাস্তব থেকে। তাই তার সংক্ষিপ্তসারে স্পষ্ট করা থাকে যে অমুক-অক এবং অমুক-ইকা-র সম্বন্ধটা খালি মনুষ্যবাচকের পদের বেলায় খাটে।

ফলে অখণ্ডপক্ষ যা বলছে তা থেকে তক্ষুনি ধরা যায় যে সাধক যদি মানুষ হয় তাহলে সেই

পদের স্ত্রীলিঙ্গে সাধিকা প্রযোজ্য, আর উন্নতিসাধক যদি কোনো দেশের সরকারের কোনো নীতি হয় তাহলে সেই পদের কোনো স্ত্রীলিঙ্গ হবে না। আপনি বুঝি ভাবছিলেন এটুকু কাণ্ডজ্ঞানের ব্যাপার? ভুল ভাবছিলেন কিন্তু। স্ত্রীলিঙ্গ-চিহ্ন-ধারী পদের প্রয়োগ ব্যাকরণের প্রশ্ন। পুস্তক আর পুস্তিকা, নদ আর নদী, রাগ আর রাগিণী যে ভাষায় আছে সে ভাষায় স্রেফ কাণ্ডজ্ঞান বলে দিতে পারে না কোন পদের স্ত্রীলিঙ্গ আছে আর কোন পদের নেই। পদাণুবাদ স্ত্রীলিঙ্গ সামলাবার নামে অক্=ইক্ বলে একটা পদাণুবাদ তৈরি করে ফেলেছে বলেই কার্যত সে এই ধরনের পদের কোথায় স্ত্রীলিঙ্গ হয়, কোথায় হয় না তার মোদ্দা কথাটা বলতে পারছে না।

তার এই ব্যর্থতার সঙ্গে বিকিরণের কী সম্বন্ধ সেটা একটু ভেবে দেখলে আলোচনা এগোবে সহজে। বাংলায় স্ত্রীলিঙ্গের রূপধারী বেশ কিছু পদ আছে বটে যা মানুষের কথা বলে না, জিনিসের কথা বলে। তার মধ্যে কয়েকটার শেষে “ইকা”-ও নেই তা নয়। কিন্তু যদি পর পর দেখেন, পুস্তিকা পঞ্জিকা কথিকা ভূমিকা চয়নিকা কণিকা বটিকা বর্তিকা, আর আমাদের ওই অন্তত দুটো জুটি না হলে প্রতিরূপ পদের সম্ভাবন লেখা বেআইনি সেই নিয়ম যদি মনে রাখেন, তাহলে দেখবেন, পুস্তক ছাড়া আর কোনো প্রতিরূপ পাওয়া যাচ্ছে না। ভাষায় পঞ্জক ভূমক চয়নক কণক বটক বর্তক নেই। “কথক” যে অর্থে প্রচলিত আছে সেই অর্থের সঙ্গে ঠিকমতো সেতুসাধন হচ্ছে না “পুস্তক/পুস্তিকা” জুটির। ফলে অখণ্ডপদপক্ষ এই ক্ষেত্রে রায় দিচ্ছে যে বাংলায় যেসব অপ্রাণিবাচক পদের শেষে “অক” আছে তাদের বেলায় কোনো “ইকা”-চিহ্নিত প্রতিরূপ পদের সম্ভাবন লেখা যায় না। অর্থাৎ বাংলায় ব্যাকরণের এই এলাকায় যে বিকিরণ আছে সেটা অকভাগান্ত মনুষ্যবাচক পদের বেলাতেই। এই সিদ্ধান্তটাই বৈয়াকরণের পেশ করতে পারা দরকার। কথাটা ঠিকমতো বলতে পারার উপযোগী সরঞ্জাম তাঁর হাতে থাকলে ভালো না থাকলে তাঁকে তৈরি করে নিতে হবে সেই ধরনের তাত্ত্বিক যন্ত্রপাতি।

অখণ্ডপদপক্ষ নিজের লাঘবের (অর্থাৎ প্রত্যেক ধারণার সুমিত প্রয়োগ চিহ্নিত সূষ্ঠ তত্ত্ব নির্মাণের রীতির) নিয়ম মানলে এই সিদ্ধান্তে কীভাবে পৌছয় তা হয়ত দেখাতে পারলাম। কিন্তু হতে পারে পাঠক ভাবছেন যে অখণ্ডপক্ষের সূষ্ঠ কাজের সঙ্গে আমি পদাণুপক্ষের উপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া বাজে বিশ্লেষণ মিলিয়ে দেখছি আমার পছন্দের পক্ষকে জিতিয়ে দেবার জন্যে। এরকম অভিযোগ উঠলে এর মীমাংসা করা দরকার। পদাণুপক্ষও নিজস্ব লাঘবের নিয়মে চলে। সেই পক্ষ পদাণুতে বিশ্বাসী বলে সে অক্=ইক্ নামক পদাণুবাদ স্বীকার করতে বাধ্য। এবং ওই পদাণুকে যথাসম্ভব ব্যাপক বিস্তৃতি দিলে তার সবচেয়ে নির্বিশেষ অনুধাবন কী হতে পারে এই প্রশ্নের ভিত্তিতে সেই পদাণুর অর্থ নির্ধারণ করে নিজের দায়িত্ব পালনই করছে। ভাষাতত্ত্বে আকরণবাদের যে মূলসূত্রের রূপায়ণ পদাণুতত্ত্বের বেলায় পদাণুবাদের চেহারা পায় সেই মূলসূত্রই এই নির্বিশেষ কর্তব্যের নির্ণায়ক। একবার যদি কেউ আকরণবাদের মূলসূত্রের প্রতি আনুগত্যবশত অক্=ইক্ পদাণুর সুনির্গীত ব্যাপক অর্থ হিসেবে “সেই-ক্রিয়া-কারী” লেখে, তাহলে বিশ্লেষণের বাকিটাও ওই ধারাতেই বইবে। এটা নৈপুণ্যের অভাবের ব্যাপার নয়। আমি কোনো পক্ষের মুখে অসংগত কথা বসিয়ে সাজানো তর্কে জেতার চেষ্টা করছি না।

সংশয়ীর সংশয় এতে না ঘুচতে পারে। একটু হয়ত কথা বাড়ানো দরকার। আপনি কি ভাবছেন আমি ইচ্ছে করে তথ্য চেপে যাচ্ছি? অভিধান ঘেঁটে আপনি কি দেখতে চান

পুস্তক/পুস্তিকা জুটির দোসর আরেকটা জুটি পাওয়া যায় কিনা? ভাবছেন সেই দ্বিতীয় জুটি খুঁজে বার করতে পারলে আপনি কায়াবাদী পক্ষকে বাধ্য করতে পারেন অপ্রাণিবাচক অক-ভাগান্ত পদের বেলাতেও প্রতিবুপ-ছক তৈরি করতে, তার ফলে দু পক্ষের বক্তব্যের ব্যবধান কমে যাবে?

তা যদি ভেবে থাকেন তাহলে ধরতে পারেন নি বিকিরণের ব্যাপারটা। পুস্তক আর পুস্তিকা জুটির যে সম্বন্ধ তার বিকিরণ যে বাংলা ভাষায় নেই এর প্রমাণ হল, আপনি যদি কোনো কারণে ছোটো চুম্বক নিয়ে কথা বলতে চান এবং আশা করেন চুম্বিকা বললেই লোকে বুঝতে পারবে ছোটো চুম্বক, কিংবা যদি আশা করেন ফলিকা বললেই লোকে বুঝবে আপনি ছোটো ফলক বলতে চান, দেখবেন যে আপনি চুম্বিকা ফলিকা লিখলে এবং কোনো ব্যাখ্যা না দিলে কেউ ধরতে পারবে না আপনার ঠিক কী অভিপ্রায় ছিল। আর মনুষ্যবাচক পদের বেলায় গল্পটা স্পষ্টতই আলাদা। সেই বিকিরণ আছে রীতিমতো। বিচারক কথাটার স্ত্রীলিঙ্গ প্রচলিত নেই ঠিকই। কিন্তু অবস্থাবিশেষে যদি কেউ বিচারিকা বলতে চান, তাহলে তিনি এই পদ প্রয়োগ কেন করতে চাইছেন অর্থাৎ এর মানে কী সেটা যে কেউ বুঝতে পারবে, কোনো টীকা-টিপ্পনী লাগবে না। এ তথ্যগুলোর গুঞ্জন পালটে যাবে না যদি আগামী কাল প্রাচীন কোনো অভিধান খোঁটে কেউ দেখাতে পারেন যে— ধরা যাক— গল্পক বলে এক রকম অতিকায় উদ্ভিদ ছিল, গঞ্জিকা যার ছোটো সংস্করণ বলে পরিগণিত হত। শুনে মজা লাগবে, কিন্তু ওতে ভাষার বাস্তব পালটাবে না।

অনেকের মনে হয়, কোনো উদাহরণ একটা মতের সপক্ষে স্পষ্ট সাক্ষ্য দিলেও তার জোর বাড়ে পাশ থেকে অনুরূপ আরও দৃষ্টান্ত পেলো। সে কথা তো একশো বার। ইংরিজি থেকে উদাহরণ দেব এবার, যাতে ধরতে পারেন কথা খালি বাংলা নিয়ে হচ্ছে না, ভাষাতত্ত্ব নিয়ে হচ্ছে। ইংরিজির একটা প্রতিবুপ-ছক আছে— অমুক-অর <—> অমুক-ওরিয়াল, ‘সেই ধরনের কর্মীর বিশেষ দক্ষতা বা পদমর্যাদা বা ক্ষমতা-ঘটিত’। যেমন প্রফেসর, প্রফেসোরিয়াল; অ্যান্থ্রাসোডোরিয়াল; ডিরেক্টর, ডিরেক্টোরিয়াল; অথর, অথোরিয়াল। বলা বাহুল্য তথ্যের এই উপস্থাপনটা অখণ্ডপদপক্ষের দিক থেকে সাজানো। পদাণুপক্ষ বলবে, “অর” বলে একটা পদাণু রয়েছে; তার আছে এক বিশেষ পদাণুবিকল্প “ওরি” যা বিশেষণ-নিষ্পাদক “আল” পদাণুর ঠিক আগে বসে। ভালো কথা।

যথার্থি প্যাচে পড়ে পদাণুপক্ষ। ওদের ওই “অর” বেচারি আবার অপ্রাণিবাচকদের পাল্লায় পড়ে যায়। প্রসেসর, জেনারেটর, এলভেটর দিবি বহাল তবিয়তে আছে, এবং যেকোনো পদাণুপন্থী বলতে বাধ্য যে ওগুলো ক্রিয়ার গায়ে “অর” জুড়ে তৈরি। অথচ ওসব পদ থেকে কেউ প্রসেসোরিয়াল, জেনারেটোরিয়াল, এলভেটোরিয়াল নিষ্পাদন করে না তো। এমনকি সাধকের দুই অর্থ ধরে বাংলায় যে কথাটা বলা গিয়েছিল সেটা ইংরিজির বেলায় বলা যায় এডিটরের দুই অর্থ ধরে। আজকাল কমপিউটারের জগতে কেউ কেউ ওয়ার্ড প্রসেসিং সফটওয়্যারকে বলেন এডিটর, যেমন “ওয়ার্ড-স্টার ভালোই, তবে ওর চেয়ে এমনকি নোটপ্যাডও এডিটর হিসেবে অনেক ভালো।” সেই সূত্রে কিন্তু “নোটপ্যাড হ্যান্ড ক্রিয়ারলি সুপিরিয়র এডিটোরিয়াল কোয়ালিটিজ” বলা চলে না। মানুষের বেলায় তো হামেশাই বলে থাকি “ম্যালকম মাগারিজ হ্যাড সেভেরাল এডিটোরিয়াল অ্যাচিভমেন্টস টু হিজ ক্রেডিট”।

পুনরুজ্জীবিত হয়ে খুলে বলছি না। এ তথ্যগুলোর ভিত্তিতে পাঠক সহজেই বাংলার অক/ইকা আলোচনার অনুরূপ যুক্তি সাজিয়ে নিতে পারবেন অখণ্ডপদবাদের সপক্ষে। এ পর্যন্ত যত যুক্তি দিয়েছি সবই বিবরণঘটিত। এবার তাত্ত্বিক সঙ্গতির প্রসঙ্গে আসব।

ফেয়ার্ডিনাঁ দ্য সোস্যুরের প্রস্তাবিত ভাষার খেয়ালি বা আর্বিট্রারি প্রকৃতির ভাষ্য সুবিদিত। আকরণপক্ষের যাঁরা ভক্ত তাঁরা অনেকে বলে থাকেন, পদাণুবাদের একটা সুবিধে নাকি এই যে আর্বিট্রারিনেস বা খেয়ালিপনার ন্যূনতম একক বলে পদাণুকে শনাক্ত করা যায়। অখণ্ডপদপক্ষ নাকি এ ব্যাপারে তাঁদের তৃপ্তি দেয় না। আমি এবার দেখাবার চেষ্টা করব যে ঠিক ওই খেয়ালিপনার দিকেই যদি সম্যক মন দিয়ে তাকাই তাহলেও দেখব যে আসলে পদাণুপক্ষের দিকে নয়, অখণ্ডপদপক্ষের দিকেই হেলে যেতে হচ্ছে করে।

যখন ভাষাতত্ত্বের সবাই পদাণুপন্থী ছিল সেই যুগে লোকে প্রথম লক্ষ করেছিল পদাণু স্বীকার করলে কিছু কিছু এমন পদাণু মানবার দরকার থাকে যা সারা ভাষায় মাত্র একটা প্রতিবেশীর পাশে বসতে রাজি হচ্ছে। ইংরিজি ক্র্যানবেরি পদের বেলায় এই আলোচনা প্রথম উঠেছিল বলে এই ধরনের পদাণুকে অনেকে বলেন ক্র্যানবেরি পদাণু ক্র্যান পদাণুটাকে খালি বেরির বাঁ দিকে পাওয়া যায়। পরে ওগুলোকে “বাবুন্ড মর্ফিম” অর্থাৎ পরাধীন পদাণু বলে অভিহিত করার রীতি চালু হয়। তা, কিছু দিন হল বৈয়াকরণরা পরাধীন পদাণুর আদলে নজর দিচ্ছেন পরাধীন পদের দিকেও— যেমন জিগেস করার “জিগেস” পদ (যার সঙ্গে “করা”-র চিরমিত্রতা), টের পাওয়ার “টের” (“পাওয়া”-র সঙ্গ না হলে যে পদের চলে না)।

এবার তত্ত্বের কথা বলছি বলে একটু ধীরে চলতে হবে সম্যক অনুধাবনের খাতিরে। লক্ষ করুন যে পদাণুপক্ষ দাবি করছে যে তারই হাতে ধরা দিয়েছে ভাষার খেয়ালি ধর্মের ভাষ্যের চাবি। তাই যদি হবে, তাহলে “টের” বা “জিগেস” নিশ্চয়ই খেয়ালিত্বের একক, তার সংকীর্ণ বিস্তৃতি তার ওই খেয়ালি অস্তিত্বেরই একটা দিক। এদের বেলায় দেখতে পাচ্ছি পদাণুবাদের মতেও একটা করে পদাণু। দৃষ্টান্ত একটু পালটে যদি “চেয়ে-চিন্তে নেওয়া” কথাটার “চিন্তে”-র দিকে মন দিই, সেখানে পেয়ে যাচ্ছি এমন পরাধীন পদ যার একাধিক পদাণু— চিন্তা নিশ্চয়ই ধাতু, তার গায়ে অসমাপিকা এ-বিভক্তি, এবং দুই পদাণু বিশিষ্ট এই “চিন্তে” পদটা “চেয়ে-চিন্তে নেওয়া” বাগভঙ্গিতেই দেখা দেয়, সারা ভাষায় আর কোথাও তার সম্মান মেলে না। এক্ষেত্রেও পদাণুবাদ কথা দিচ্ছে, বাংলার যে খেয়ালগুলো বাংলাকে অন্যান্য ভাষা থেকে আলাদা রাখে, সেইসব খেয়ালের সিন্দুকে তুলে রাখবে “চিন্তে” পদটাকে, এই পদও ওই খেয়ালিত্বের ন্যূনতম একক বলে গণ্য। আশা করি লক্ষ করছেন কী বলা হল। পদাণুপক্ষের দাবিটা এই যে পরাধীন পদ প্রচণ্ড বিশেষ জিনিস। সে দলছুট। ভাষার এক কোনায় পড়ে আছে। অভিধানেও সে একা। তাকে নিয়ে নির্বিশেষ কিছু বলার থাকবে না। অর্থাৎ ব্যাকরণ কোনো কারণ খুঁজে পাবে না তাকে পাস্তা দেবার। বিকিরণ-টিকিরণের টিকিটিও দেখতে পাবে না কেউ। কেমন, ঠিক ধরেছি তো?

এবার দেখুন। বাংলায় একটা কথার ধরন আছে, কী ছোটানটাই ছুটেছি! কী ছোটানটাই ছোটালি তোরা! তোর আর কী হয়েছে, আমি যা ঠকান ঠকেছি তার জুড়ি নেই। আচ্ছা, তুই এরকম ঠকান ঠকালি কী করে?

বাংলার এই তথ্য যতদূর জানি ছাপার অক্ষরে আলোচিত হয় নি। ব্যাপারটা খুলে বলা সোজা বলেই হয়ত বৈয়াকরণরা ভাবেন নি যে বিশেষ কিছু বলার থাকতে পারে। কিছু কিছু ক্রিয়াপদের সমধাতুজ কর্ম থাকে, যে কর্ম “আন”-ভাগান্ত। সাধারণ সমধাতুজ কর্মের বেলায় বাক্যের কোনো বিশেষ সুর নাও থাকতে পারে, যেমন— “সৎ লোক যে ঘুম ঘুমোয় আর অসাধু লোক যে ঘুম ঘুমোয় এ দুয়ের মধ্যে কোনো শারীরিক পার্থক্য আছে বলে ডাক্তাররা দেখাতে পারেন নি”; “তোমাদের এরকম কান্না কাঁদতে হয় নি, আশা করি কাঁদতে হবেও না কখনো”, “এতটা সশব্দ হাঁচি হেঁচো না শ্লীজ, আমরা কনসেনট্রেট করতে চাই একটু”। কিন্তু আন-ভাগান্ত সমধাতুজ কর্ম উচ্চারণ করার সময় এক ধরনের সুর টানার রেওয়াজ আছে— “তোরা ওই কাকা আমাদের কী ভোগাআআন ভুগিয়েছে, উফ, ভাবতেও পারবি না!” এই ধরনের সুর টানা জাতীয় স্পেশাল এফেক্ট নিয়ে শুধু শুধু বাক্যব্যয় করে সাবেক কালের ব্যাকরণের বিশ্লেষণতন্ত্র কোনো সিদ্ধান্তে পৌছতে পারত না। ওঁরা কথা বাড়াতে না। সে তো স্বাভাবিক। কিন্তু এযুগের ব্যাকরণের যন্ত্রপাতি আরেকটু বেশি কাজ করে। আমাদের দায়িত্বও তাই বেশি।

পাঠক নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন আন-ভাগান্ত সমধাতুজ কর্মের ব্যাপার স্যাপার লক্ষ করে পদাণুবাদীর কেন চিন্তিত হবার কথা। সমস্ত ক্রিয়া থেকে এ ধরনের কর্ম তৈরি করা যায় না ঠিকই। কিন্তু অনেক ক্রিয়া থেকে যায়। অর্থাৎ এগুলো যে ছাঁচে তৈরি সেটার যাকে “বিকিরণ” বলে সেটা আছে রীতিমতো। কী হাঁটানটাই হেঁটেছি, তুই তখন যে লাফানটা লাফিয়েছিলি, কী ফ্যানসান যে ফেঁসেছি— পর পর দৃষ্টান্ত তৈরি করা যায়। বিভিন্ন পাঠকের রুচি নিশ্চয়ই এ ব্যাপারে খানিকটা আলাদা বলে দেখা যাবে। প্রত্যেক প্রয়োগ প্রত্যেক শ্রোতার কানে সংগত না শোনাতেই পারে। কিন্তু সবাই একমত হবেন যে অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যাচ্ছে। দু-তিনটে ক্রিয়াপদের নিভৃত আতসবাজি নয় মোটেই।

অথচ পদাণুবাদীর মতে তো প্রত্যেকটাই “পর্যায়ী পদ” বলে গণ্য, অতএব এমন জিনিস যা নাকি ভাষার এক কোনায় মুখ খুঁজে থাকবে কারুর সঙ্গে কোনো সম্বন্ধের মধ্যে না গিয়ে, যে জিনিস নিয়ে নাকি ব্যাকরণের নির্বিশেষ কিছুই বলার থাকবে না। যে-কোনো একটা দৃষ্টান্ত পরীক্ষা করে দেখুন না। “কী ছোটানটাই ছোটালি তোরা” এই বাক্যে ব্যবহৃত “ছোটান” শব্দের বিশেষত্ব এই যে তার পক্ষে “ছোটা” অথবা “ছোটানো” ক্রিয়ার সমধাতুজ কর্ম হিসেবে অবতীর্ণ হওয়া ভিন্ন গত্যন্তর নেই। শুধু তাই নয়। এই কর্মের ভূমিকায় তাকে নামতে হচ্ছে অপরিবর্তনীয় অবস্থানে। এমনিতে বাংলা তার ক্রিয়ার ডান দিকেও বসতে দেয় কর্মকে— “রাম অনেক কান্নাই কেঁদেছে, কিন্তু সেও কখনো কাঁদে নি এ ধরনের বুকফাটা সর্বনাশের কান্না”— কিন্তু আন-ভাগান্ত কর্ম কেবল ক্রিয়ার অব্যবহিত বাঁ দিকেই বসতে পারে, যতদূর দেখতে পাচ্ছি। “তোরা ছোটালি এমন ছোটান” জাতীয় বাক্য অচল। কী ছোটান, যে ছোটান, যা ছোটান— এরকম গোটা-তিন-চার শব্দবন্ধের মধ্যে কোনো একটা বেছে নিয়ে তাকে বসাতে হচ্ছে সমধাতুজ ক্রিয়াপদের বাঁ দিকে, এবং শব্দবন্ধের গায়ে বিশেষ সুর জুড়তে হচ্ছে। এই বাধ্যতার সংকীর্ণ চৌহদ্দির মধ্যে বাগভঙ্গিটা চলে ফেরে। অথচ কী সাবলীল তার অস্তিত্ব। বাক্যগুলো শুনতে কখনো আড়ষ্ট লাগে না; ভাষী তাঁর সাবলীল স্বাধীনতা ব্যবহার করেই এমন সমধাতুজ কর্ম রচনা করে নেন যে কর্ম তিনি হয়ত নিজে কখনো কানে শুনে আলাদা করে শেখেন নি।

তাত্ত্বিক তর্কটা এইখানে। আকরণবাদী ভাষ্য বলে, ভাষার যে-জিনিস খেয়ালি, তার আলাদা তালিকা লিখতে হয়, অভিধান গোছের, তাকে কোনো ব্যাকরণের সূত্রে ধরা যায় না। কায়াবাদ বলে, এই বস্তুব্য ভুল, অভিধানে বহু জিনিসের তালিকা রাখতে হতেই পারে, তার মানে এ নয় যে তালিকার বিভিন্ন জিনিসের মধ্যে যাঁতায়াঁত নিয়ে ব্যাকরণের সূত্র কিছু বলবে না। অভিধানে বিশেষের যে খেলা আর ব্যাকরণে নির্বিশেষের যে কাজ, এ দুয়ের মধ্যে বিরোধ নেই কোনো। এবার নাটকে বাংলা আন-ভাগান্ত সমধাতুজ্ঞ কর্মের প্রবেশ। কায়াবাদ বলছে, এই দেখ, এ জিনিসগুলো আকরণবাদীর বিচারে খেয়ালি অতএব তালিকায় বাঁধা থাকার কথা, অথচ তালিকায় এদের বাঁধতে পারছ কই? তোমরাও তো মানতে বাধ্য যে বাংলার সবগুলো আন-ভাগান্ত সমধাতুজ্ঞ কর্মের তালিকা লিখতে পারবে না, কারণ ব্যাপারটার বিকিরণ আছে, ভাষী ইচ্ছেমতন নতুন নতুন এই জাতীয় কর্ম রচনা করে নিতে পারেন। কিন্তু এদিকে তোমাদের শাস্ত্র তো বলছে এদের বিস্তৃতি প্রচণ্ড সীমাবদ্ধ, এরা পরাধীন পদ, খেয়ালিদের চূড়ান্ত, তালিকার খাঁচায় থাকার কথা এদের। কী করবে তোমরা?

আকরণবাদী পাঠক নিশ্চয়ই যুক্তি শাণাচ্ছেন, সেটাই প্রত্যাশিত। হয়ত ডাবছেন “ছোটান” কর্ম একাধিক ক্রিয়ার পাশে বসে এই দিকে নজর টেনে পার পেয়ে যাবেন। বলবেন, এই তো, “কী ছোটানটাই ছুটেছি”, “কী ছোটানটাই ছুটিয়েছে” দুটো ক্রিয়া তো আলাদা, গিজন্ত “ছুটিয়েছে” থেকে অকর্মক “ছুটেছে” স্পষ্টতই পৃথক। অর্থাৎ পরাধীন পদ নয় আদৌ, এই দেখ, কায়াবাদী পক্ষ মামলায় হেরে গেল।

এই তর্কের কি ওরকম ওপরে ওপরে নিষ্পত্তি করা যাবে ভেবেছেন? বাংলায় “পস্তর” কোনো কোনো ভাষীর মুখে “বিছানা-পস্তর, বাসন-পস্তর, বই-পস্তর, চিঠি-পস্তর” এই চারটে পরিবেশে আবির্ভূত হয় (যাঁরা চিঠিকে পস্তর বলেন, যাঁরা বলতে পারেন “তোমার পস্তর পেয়েছি বটে”, আমি এখানে তাঁদের কথা বলছি না; তাঁদের উপভাষায় স্পষ্টতই “পস্তর” স্বাধীন পদ)। তবু তো সেই ভাষীদের উপভাষায় আমরা বলব “পস্তর” পরাধীন পদ। তার বিস্তৃতি এতটাই সীমিত যে অভিধানকে সেই বিস্তৃতি বানান করে বলার দায়িত্ব নিতে হবে, এ কথা আমরা বলব। বলব না কি? শ্রেয় তার একটা মনিবের বদলে চারটে মনিব দেখেই কি আমরা ভেবে বসব সে স্বাধীন হয়ে গেল? ওভাবে হয় না।

বাংলায় যে এমন প্রমাণ পাচ্ছি যে পরাধীন পদ সুদৃঢ় বিকিরণের আওতায় আসতে পারে, এ ব্যাপারটা জরুরি। এর ভিত্তিতে আকরণবাদ আর কায়াবাদের বৃহত্তর তর্কের মানচিত্র নতুন করে আঁকার দরকার হবে। সে কাজে আশা করি অনেকে যোগ দেবেন। আকরণবাদী সহকর্মীদের কথা দিচ্ছি, তাঁদের হয়ে যে যুক্তি সাজানোর, সেই কাজে আমিও যথাসাধ্য যোগ দেব। নানারকম কাজে-কর্মে আকরণবাদী যন্ত্রপাতির দরকার তো হতেই পারে। ভাষার প্রাথমিক কাজ-চালানোর পর্যায়ে, বুনিয়াদী ভাষাতত্ত্ব শেখাবার সময়ে, অথবা কমপিউটারে ভাষাঘটিত কিছু কাজ যখন ন্যূনতম রসদ খরচ করে সেরে নিতে চাই তখন, আকরণবাদী ঐতিহ্যের কাছে আমি নিঃসংকোচে হাত পাতব। আশা করব সকলের সহযোগিতায় বিতর্ক এগোবে, স্পষ্টতা এমনভাবে বাড়বে যা এ বিষয়ের সব রকম কর্মীর কাছে লাগতে পারে। সেকেলে রীতিতে বলা উচিত, কবি সত্যই বলিয়াছিলেন, “দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারা ধায়/অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায়”।

বঙ্কিম-সাহিত্যে ইতর-প্রাণী

অভ্যুত্থান

মানুষকে নিয়েই সাহিত্যের কারবার। মূক-পশু-পাখি-কীট-পতঙ্গ বৃহত্তর প্রেক্ষিতে যা ইতর-প্রাণী, তা সাহিত্যে অচ্ছুৎ বা অপাংস্তেন্য নয়। বিভিন্ন ভাষার সাহিত্যে এর নজির আছে। ইংরিজি সাহিত্যে স্কাইলার্ক, কার্ল, নাইটিংজেল, আউল নিয়ে বিখ্যাত সব কবিতা আজও বিশ্বয়ের উদ্বেক করে। চিরন্তনত্বের দাবিদার। অপরদিকে কবিতাগুলো নানা চিন্তা-ভাবনার খোরাক জোগায়। জ্যাক লন্ডনের ‘কল্ অব্ দি ওয়াইলড্’, ‘হোয়াইট ফ্যাং’, অ্যানা সোয়েলের ‘ব্ল্যাক বিউটি’, সাড়া জাগানো রচনা, অস্কার ওয়াইলড্-এর ‘দি হ্যাপী প্রিন্স’, রবার্ট ব্রাউনিং-এর ‘দ্য প্যায়েড পাইপার অব্ হেমলিন’ প্রভৃতি কালজয়ী সৃষ্টি। এ সব রচনা ইতর-প্রাণীদের অনুভূতির সঙ্গে আমাদের পরিচয় করে দেয়, অপরদিকে সমাজের রূঢ় বাস্তবের চিত্রটি উন্মোচিত করে। সংস্কৃত-সাহিত্যে কোকিল, মৃগ, হংস, চক্রবাক-চক্রবাকী, ডাহুক-ডাহুকি প্রভৃতি ইতর-প্রাণীদের মাধ্যমে মানুষের সুখ-দুঃখ-বেদনা-প্রেম-ভালোবাসা-বিরহ-মিলনের অভিব্যক্তি ফুটে ওঠে। শিক্ষাদান নিয়ে দুটি বিখ্যাত সাহিত্য *হিতোপদেশ* আর একটি *ঈশপের গল্প*-তো ইতর-প্রাণী নির্ভর।

বাংলা সাহিত্যেও ইতর-প্রাণীর আনাগোনা আছে। বঙ্কিম-এর সাহিত্যে ইতর-প্রাণীদের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। প্রবন্ধ সাহিত্যে অপেক্ষা তাঁর উপন্যাসে ইতর-প্রাণীদের বিচরণ বেশি, কিন্তু ভূমিকা গৌণ। ইতর-প্রাণী তাঁর উপন্যাসে অনেক সময় এসেছে পাত্র-পাত্রীর মনের ভাব উদ্ঘাটনের জন্য, কখনো বা তাদের মনকে ভাবান্তর করার উদ্দেশ্যে, কখনো বা পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি বা পরিবেশকে উজ্জ্বল করার মানসে, আবার কখনো বা কোনো পাত্র-পাত্রীর অন্তরের ঘৃণা প্রকাশের হাতিয়ার হিসেবে, আবার কখনো তুলনা জ্ঞানের উদ্দেশ্যে। উপন্যাসে ইতর-প্রাণীদের মধ্যে বঙ্কিম-এর বিশেষ কোনো চিন্তা-ভাবনা বা মননের প্রকাশ নেই। এ সব ইতর-প্রাণী তাঁর উপন্যাসের কোনো ঘটনা বা কাহিনি বা চরিত্রকে নিয়ন্ত্রিত করে নি, যেমনটি প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের ‘আদরিণী’, বনফুলের ‘বুধি’ গাই, শরৎচন্দ্রের ‘মহেশ’, রবীন্দ্রনাথের ‘নেড়ি কুকুরের’ ট্র্যাজেটির ‘নেড়ি কুকুর’, ‘তোতা কাহিনি’র তোতাপাখি এবং তারারকরের ‘কালো পাহাড়’ গল্পের কেন্দ্রবিন্দুতে পিনদ্ধ।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস *দুর্গেশনন্দিনী*-র প্রথম পঙ্কতিতেই ইতর-প্রাণী অশ্বের উপস্থিতি দেখি : “১৯৭ বঙ্গাব্দের নিদাঘ শেষে একদিন একজন অশ্বরোহী পুরুষ বিষ্ণুপুর হইতে মান্দারণের পথে একাকী গমন করিতেছিলেন।” ভাষাও যেন ছুটল অশ্ববেগে। যাহোক, অশ্ব এখানে বাহক মাত্র। কার্য-কারণ সম্বন্ধ নেই।

তাঁর অন্যান্য উপন্যাসেও এই ইতর-প্রাণী অশ্বের বিচরণ দেখা যায়। *সীতারাম*-এ অশ্ব

একাধিকবার এসেছে কার্য-কারণ সম্বন্ধ না নিয়ে : “এদিকে গঙ্গারাম কষ্টে অথচ নির্বিষে অশ্ব লইয়া লোকারণ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।” (সীতারাম, সাহিত্য সংসদ, পৃ. ৮২৯)

সীতারাম-এর আর এক স্থলে, “সীতারাম গঙ্গারামকে বলিলেন, তুমি যে আমার ঘোড়া-চুরি করিয়া পলাইয়াছিলে, সে-ঘোড়া কি করিলে? বেচিয়া খাইয়াছ?” (সীতারাম, সাহিত্য সংসদ)

রাজসিংহ-এ অশ্বের ঘোরাফেরা দেখা যায় : “মানিকলাল পার্বত্য পথ হইতে নির্গত হইয়াই ঘোড়া ছুটাইয়া একেবারে রূপনগরের গড়ে গিয়া উপস্থিত হইয়াছিল।” (রাজসিংহ সাহিত্য সংসদ, পৃ. ৬০০)

এখানেও ইতর-প্রাণীর কোনো ভূমিকা নেই। ঘোড়া মানিকলালের বহনকারী মাত্র।

মনুষ্য-সমাগম-চিহ্ন বিরহিত গৃহের বর্ণনায় বঙ্কিম ইতর প্রাণীকে এনেছেন : “গৃহটি নিতান্ত সামান্য নহে। কিন্তু এখন তাহাতে সম্পদ লক্ষণ কিছুই নাই। প্রকোষ্ঠ সকল ভগ্ন, মলিন, মনুষ্য সমাগম চিহ্ন বিরহিত। কেবলমাত্র শোচক, মুষিক ও নানাবিধ কীট পতঙ্গাদি— সমাকীর্ণ।.... চারিদিকে আরসুলা, মাকড়সা, টিক্‌টিকি, ইন্দুর বেড়াইতেছে।” (বিষবৃক্ষ, সাহিত্য সংসদ) এখানে মনুষ্য সমাগম-বিরহিত গৃহের বর্ণনায় বিভিন্ন ইতর প্রাণীর সমাবেশ ঘটানো হয়েছে।

আবার বাড়ির অতীত গৌরব বর্ণনায় : “বাড়ির বাহিরে আশ্রাবল, হাতিশালা, কুকুরের ঘর, গোসালা, চিড়িয়াখানা ইত্যাদি স্থান ছিল। (বিষবৃক্ষ, সাহিত্য সংসদ, পৃ. ২১৮)

উপন্যাসে প্রদোষকালের ছবি অন্ধনের ক্যানভাসে রেখেছেন খদ্যোতমালা। প্রদোষকালেই ঘনাক্ষারময়ী হইল। গ্রাস, গৃহ, প্রান্তর, পথ, নদী কিছুই লক্ষ্য হয় না। কেবল বনবিটপী সকল সহস্র সহস্র খদ্যোতমালাপরিমণ্ডিত হইয়া হীরক খচিত কৃত্রিম বৃক্ষের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। (বিষবৃক্ষ, সাহিত্য সংসদ, পৃ. ২১০)

“নববারিসমাগমপ্রফুল্ল ভেকেরা উৎসব করিতেছিল।.... পথিস্থ অনিঃসৃত জলে মৃণালের পদসঞ্চারণ শব্দ, কদাচিৎ বৃক্ষাবৃত পক্ষীর আর্দ্র পক্ষের জল মোচনার্থ পক্ষবিধ্বনন শব্দ।” (বিষবৃক্ষ, সাহিত্য সংসদ, পৃ. ২১০) বর্ণনাটি কত হৃদয় গ্রাহ্য।

উপন্যাসে পাত্র-পাত্রীর বেদনাকীর্ণ হৃদয়ের ছবি ফোটাতে ইতর-প্রাণীর আশ্রয় নিয়েছেন বঙ্কিম। “প্রতাপ বলিলেন, তুমি পাপিষ্ঠা, তাই তোমায় গালি দিই।.... ঈশ্বর জানেন, ইদানীং আমি তোমাকে সর্প মনে করিয়া ভয়ে তোমার পথ ছাড়িয়া থাকিতাম। তোমার বিষের ভয়ে তোমার পথ ছাড়িয়া থাকিতাম। তোমার বিষের ভয়ে আমি বেদগাম ত্যাগ করিয়াছিলাম।” চন্দ্রশেখর, সাহিত্য সংসদ, পৃ. ৩৭২)

শৈবলিনী প্রতাপের কাছে সর্প। এই ইতর-প্রাণী ‘সর্প’ শব্দটা না ব্যবহার করলে প্রতাপের মনের অন্দরমহলে আমরা প্রবেশ করতে পারতাম না। শৈবলিনী তো মনের মতো হিংস্র কুটিল, ত্রুর। অন্তত প্রতাপের কাছে।

আবার শৈবলিনীর কাছে প্রতাপও সর্প। শৈবলিনীর তাৎপর্যপূর্ণ উক্তি সাক্ষ্য দেয় : “শৈবলিনী আবার হাসিল, বলিল, শৈবলিনী কে? রসো রসো। একটি মেয়ে ছিল, তার নাম শৈবলিনী, আর একটি ছেলে ছিল, তার নাম প্রতাপ। একদিন রাত্রে ছেলেটি সাপ হয়ে বনে গেল; মেয়েটি ব্যাঙ হয়ে বনে গেল। সাপটি ব্যাঙটিকে গিলিয়া ফেলিল।” (চন্দ্রশেখর, সাহিত্য সংসদ পৃ. ৩৯৮)

চন্দ্রশেখর-এ আর একটি তাৎপর্যপূর্ণ চিত্র দেখা যায়, সেখানেও ইতর-প্রাণীর সাহায্য নিয়েছেন বন্ধিম।

ছবিটি শৈবলিনীকে ঘিরে— “শৈবলিনী নিদ্রিতা ছিল— শৈবলিনী স্বপ্ন দেখিতেছিল— সরোবরের প্রান্তে যেন এক সুবর্ণ নির্মিত রাজহংস বেড়াইতেছে তীরে একটি শ্বেতশূকর বেড়াইতেছে। রাজহংস দেখিয়া তাহাকে ধরিবার জন্য শৈবলিনী যেন উৎসুক হইয়াছে; কিন্তু রাজহংস তাহার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যাইতেছে। শূকর শৈবলিনীপদ্মকে ধরিবার জন্য ফিরিয়া বেড়াইতেছে, রাজহংসের মুখ দেখা যাইতেছে না, কিন্তু শূকরের মুখ দেখিয়া বোধ হইতেছে যেন ফটরের মুখের মত।” (চন্দ্রশেখর, সাহিত্য সংসদ, পৃ. ৩৬৯) শ্বেতশূকর শব্দটি খুবই অর্থবহ। স্বপ্নটিও তাৎপর্যময়। বন্ধিমের উপস্থাপন কৌশল ও শিল্প জনোচিত।

কৃষ্ণকান্তের উইল-এ বসন্তের কোকিলকে এনেছেন। উদ্দেশ্য নায়িকার অন্তরের বেদনাকে ফুটিয়ে তোলা। “বসন্তের কোকিলের কুহুতান রোহিণীর অন্তরকে বেদনায় মথিত করেছিল। যদিও কোকিলকে ‘দূর হ! কালামুখো’ বলিয়া রোহিণী চলিয়া গেল। চলিয়া গেল, কিন্তু কোকিলকে ভুলিল না।” লেখকের মতে “আমার বড়ই সন্দেহ হয়, ঐ দুষ্ট কোকিল রোহিণীকে কাঁদাইয়াছে।” (কৃষ্ণকান্তের উইল, সাহিত্য সংসদ, পৃ. ৪৯৬)

বন্ধিমের কোকিল-প্রিয়তার দর্শন তিনি উপন্যাসে এবং প্রবন্ধে কোকিলকে ব্যবহার করেছেন বার বার।

আবার শৈবলিনীর অন্তরের ব্যথা উদ্ঘাটন করেছেন একটি পতঙ্গের উল্লেখ: “প্রতাপ আমার কে? আমি তাহার চক্ষে পাগিষ্ঠা সে আমার কে? কে তাহা জানি না সে শৈবলিনী পতঙ্গের জ্বলন্ত বহি সে এই সংসার প্রান্তরে আমার পক্ষে নিদাঘের প্রথম বিদ্যুৎ— সে আমার মৃত্যু। আমি কেন গৃহত্যাগ করিলাম, ম্লেচ্ছের সঙ্গে আসিলাম। কেন সুন্দরীর সঙ্গে ফিরিলাম না। (চন্দ্রশেখর, সাহিত্য সংসদ, পৃ. ৩৭৫)

এখানে ‘বিদ্যুৎ’, ‘মৃত্যু’, যা বলা হোক না কেন, ‘পতঙ্গ’ প্রয়োগে প্রতাপ যে শৈবলিনীর হৃদয়ে কী, তা পরিষ্কার ফুটে উঠেছে। এখানে ‘পতঙ্গ’ আনয়ন খুবই সার্থক।

বিশ্ববৃক্ষ-এ বন্ধিম মানুষের মনের ভাবান্তর ঘটানোর জন্যে। বিড়াল ও অন্যান্য কয়েকটি ইতর-প্রাণী ব্যবহার করেছেন। তাদের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া নেই, শুধুই উপস্থিতি।

“ক্ষণকাল পরে টিক্‌টিকি মক্ষিকাকে হস্তগত করিতে না পারিয়া অন্যদিকে সরিয়া গেল। বিড়ালও মনুষ্য চরিত্র পরিবর্তনের কোন লক্ষণ সম্প্রতি উপস্থিত না দেখিয়া হাই তুলিয়া ধীরে ধীরে অন্যত্র চলিয়া গেল। প্রজাপতি উড়িয়া বাহির হইয়া গেল। কমলমণি বিরক্ত হইয়া কাঁপেট রাখিলেন এবং সতুবাবুর সঙ্গে আলাপে প্রবৃত্ত হইলেন।” (বিশ্ববৃক্ষ, সাহিত্য সংসদ পৃ. ২৫২)

রাজসিংহ-এ একটি ফুলের কুকুর (যার মুখ মবারকের মতো) নিয়ে দরিয়া ও জেবউম্মিসার মধ্যে কথোপকথন আছে। এই প্রতীকের মাধ্যমে তাদের মনের ভাব প্রকাশ পেয়েছে। এরকম গুটি কয়েক দৃষ্টান্ত আছে বন্ধিমের উপন্যাসে স্বল্প পরিসরে। (রাজসিংহ, সাহিত্য সংসদ, পৃ. ৫৬৮)

পাত্র-পাত্রীর মনের প্রগলভতা প্রকাশে ইতর-প্রাণীকে দেখা যায় তাঁর উপন্যাসে। “না, চিড়িয়া নাচিবে না। তুই এখন তোর গল্প বল।”

“দলনী বেগম এই বলিয়া, যে ময়ূরটা নাচিল না, তাহার পুচ্ছ ধরিয়া টানিল। আপনার হস্তের হীরকজড়িত বলয় খুলিয়া আর একটি ময়ূরের গলায় পরাইয়া দিল একটা মুখর কাকাতুয়ার মুখে চোখে গোলাপের পিচ্কারী দিল। কাকাতুয়া বাঁদী বলিয়া গালি দিল। এ গালি দলনী স্বয়ং কাকাতুয়াকে শিখাইয়াছিল।” (চন্দ্রশেখর, সাহিত্য সংসদ পৃ. ৩৬১)

সাম্প্রতিক চিহ্ন হিসেবে ইতর-প্রাণীর ব্যবহার করেছেন “সহসা সৌধোপরি হইতে পেচকের গভীর কণ্ঠ শ্রুত হইল। তখন চন্দ্রশেখর অনেক রাত্রি হইয়াছে বুঝিয়া পুতি বাঁধিলেন। সে সকল যথাস্থানে” ইত্যাদি। (চন্দ্রশেখর, সাহিত্য সংসদ, পৃ. ৩৫৪) পেচক প্রাণীটির উল্লেখ রাত্রির গভীরতা প্রকাশ পেয়েছে স্বাভাবিকভাবে।

উপমা অলঙ্কার প্রয়োগ করতে ইতর-প্রাণীকে এনেছেন, তার লেখায়। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে।

“সুপ্ত সিংহ যেন জাগিয়া উঠিল।” (চন্দ্রশেখর, সাহিত্য সংসদ পৃ. ৪২৩)

“যে ব্যক্তি রাখিলে গৌড় রাখিতে পারিত, সে উর্গনাভের ন্যায় বিরলে বসিয়া অভাগা জম্ভূমিকে বন্ধ করিবার জন্য জাল পাতিতেছিল।” (মৃণালিনী, সাহিত্য সংসদ, পৃ. ১৮৭)।

“যে ভয়ে দহমান অরণ্য হইতে অরণ্যস্তর জীব পলায়ন করে, শৈবলিনী সেই ভয়ে প্রতাপের সামনে হইতে পলায়ন করিয়াছিল।” (চন্দ্রশেখর, সাহিত্য সংসদ, পৃ. ৩৮৭)

“শৈবলিনী ব্যাঘ্রীর ন্যায় ঝাঁপ দিয়া চন্দ্রশেখরের কণ্ঠলগ্ন হইল।” (চন্দ্রশেখর, সাহিত্য সংসদ, পৃ. ৩৯৮)। উপমা অলঙ্কার শিল্প-রীতি সম্মত।

এভাবে উপন্যাস-সাহিত্যে বঙ্কিম অনেক ইতর-প্রাণী এনেছেন— যেখানে তারা নিষ্ক্রিয়। তবে উপস্থাপিত বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম করতে পাঠকের সহায়ক হয়েছে বলা যেতে পারে।

কিন্তু তাঁর প্রবন্ধে ইতর-প্রাণীদের ভূমিকাটি স্বতন্ত্র ধরনের। ইতর-প্রাণী চিহ্নিত প্রবন্ধগুলি, বঙ্কিমকে চিনিতে দেয়। দেখি, প্রবন্ধগুলির বিষয়বস্তু কত বিচিত্র। মূল্যবান। বস্তু কত স্বচ্ছ, কত সুদূরপ্রসারী এবং শাস্ত। কোনো কোনো ইতর-প্রাণী বঙ্কিমের চিন্তার উৎসের ভূমিকায় দেখা দিয়েছে। যেমন, ‘বসন্তের কোকিল’-এ বঙ্কিমকে দার্শনিক হিসেবে পাই। বসন্তের কোকিল তাঁর কাছে সুখের সহচর। “যখন নসীবাবুর তালুকের খাজনা আসে, তখন মানুষ কোকিলে তাঁহার গৃহকুঞ্জ পুরিয়া খায়.... যখন নসীবাবু বাগানে যান, তখন মানুষ কোকিল তাহার সঙ্গে পিঁপড়ার সারি দেয়। আর যে রাতে বৃষ্টি হইতেছিল, আর নসী বাবুর পুত্রটির অকালে মৃত্যু হইল, তখন তিনি একটি লোক পাইলেন না। কাহারও ‘অসুখ’, এজন্য আসিতে পারিলেন না; কাহারও বড় সুখ একটি নাতি হইয়াছে, এজন্য আসিতে পারিলেন না; কাহারও সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হয় নাই, এজন্য আসিতে পারিলেন না; কেহ সমস্ত রাত্রি নিদ্রায় অভিভূত, এজন্য আসিতে পারিলেন না। আসল কথা, সে দিন বর্ষা, বসন্ত নহে, বসন্তের কোকিল সে দিন আসিবে কেন?” (‘বসন্তের কোকিল’, সাহিত্য সংসদ, পৃ. ৬৭-৬৮) সহজ ও সুন্দরভাবে মনুষ্য চরিত্রের বিশ্লেষণ। দুঃসময়ের বন্ধু দুর্লভ। এ তত্ত্ব বঙ্কিম আমাদের উপহার দিয়েছেন।

‘বসন্তের কোকিল’-এর আর একস্থলে : “—এ পৃথিবীতে গ্যাডফ্লিন, ডিম্বেলি প্রভৃতির ন্যায় তুমি কেবল গলাবাজিয়ে জিতিয়া গেলে নহিলে অত কত কালো চলিত না; তোমার চেয়ে হাঁড়িচাচা ভাল। গলাবাজিতে এতগুণ না থাকিলে, যিনি বাজে নবেল লিখিয়াছেন, তিনি রাজমন্ত্রী হইবেন কেন?” (বসন্তের কোকিল, সাহিত্য সংসদ, পৃ. ৬৮) আমাদের প্রশ্ন, আজও

কি 'গলাবাজিতে শক্তি হ্রাস পেয়েছে? এখানে বন্ধিমের বক্তব্য কৌতুক মিশ্রিত এবং ক্ষুরধার। কোকিল যেন বন্ধিমের চিন্তার খোরাক জুগিয়েছে। গলাবাজিতে সংসার শাসিত হয় বটে, কিন্তু কেবল চোঁচাইলে হয় না; যদি শব্দ-মস্ত্রে সংসার জয় করিবে, তবে যেন তোমার স্বরে পঞ্চম লাগে।" ('বসন্তের কোকিল', সাহিত্য সংসদ, পৃ. ৬৮) মনুষ্য-স্বভাবের সাবলীল বিশ্লেষণ এবং তার সঙ্গে উপদেশ, স্বরে পঞ্চমের প্রলেপ। এখানে বন্ধিমের সমাজ শিক্ষকের রূপটি ফুটে ওঠে। বসন্তের কোকিল উপলক্ষ্য মাত্র।

কমলাকান্তের মাধ্যমে বন্ধিম তাঁর মনের কথা বলবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেছেন, অবশ্য যদি কোকিলের কণ্ঠ পেতেন : "যদি কোকিলের কণ্ঠ পাই— অমানুষী ভাষা পাই, আর নক্ষত্রদিগকে পোতা পাই; তবে মনের কথা বলি।" ('বসন্তের কোকিল', সাহিত্য সংসদ, পৃ. ৬৯)। বন্ধিমের মনের কথা অব্যক্ত রয়ে গেছে।

'বিড়াল' প্রবন্ধটি তাঁর অসামান্য রচনা। এই প্রবন্ধে বিড়াল বক্তা। বিড়াল-এর মাধ্যমে বন্ধিম মানুষের বেদনার কথা জানিয়েছেন। গভীর সমাজ জিজ্ঞাসার কথা উত্থাপন করেছেন, "ধর্ম কি? পরোপকারই পরম ধর্ম। এই দুধটুকু পান করিয়া আমার পরম উপকার হইয়াছে। তোমার আহরিত দুধে এই পরোপকার সিদ্ধ হইল অতএব তুমি পরম ধর্মের ফলভাগী দেখ, আমি চোর বটে, কিন্তু আমি কি সাধ করিয়া চোর হইয়াছি? খাইতে পাইলে কে চোর হয়? দেখ, যাঁহারা বড় বড় সাধু, চোরের নামে শিহরিয়া উঠেন, তাঁহারা অনেক চোর অপেক্ষাও অধার্মিক। তাঁহাদের চুরি করিবার প্রয়োজন নাই বলিয়াই চুরি করেন না। কিন্তু তাঁহাদের প্রয়োজনাতিরিক্ত ধন থাকিতে ও চোরের প্রতি যে মুখ তুলিয়া চাহেন না, ইহাতেই চোর চুরি করে। অধর্ম চোরের নহে চোরে যে চুরি করে সে অধর্ম কুপণ ধনী। চোর দোষী বটে, কিন্তু কুপণ ধনী তদপেক্ষা শত গুণে দোষী। চোরের দণ্ড হয়, চুরির মূল যে কুপণ তাহার দণ্ড হয় না কেন? ('বিড়াল', সাহিত্য সংসদ, পৃ. ৮৬) এ বন্ধিমের কঠিন প্রশ্ন। এ প্রশ্ন আমাদের ভাবিয়ে তোলে। বিতর্কের প্রতিপক্ষ কমলাকান্ত; আসলে বিড়ালের বক্তব্যের আড়ালে বন্ধিম। "তোমার কথাগুলি ভারি সোশিয়ালিস্টিক। সমাজ শৃঙ্খলার মূল। যদি বাহার যত ক্ষমতা, সে তত ধনসঞ্চয় করিতে না পায়, অথবা সঞ্চিত করিয়া চোরের জুলায় নির্বিঘ্নে ভোগ করিতে না পায়, তবে কেহ আর ধন সম্বন্ধে যত্ন করিবে না। তাহাতে সমাজের ধনবৃদ্ধি হইবে না।" মার্জারের উত্তর : "না হইল, আমার-কি। সমাজের ধনবৃদ্ধির অর্থ ধনীর ধন বৃদ্ধি। ('বিড়াল', সাহিত্য সংসদ, পৃ. ৮৭)

বিড়াল বিদ্রোহী। খাদ্য না পেলে সে চুরি করবে, "অনাহারে মরিয়া যাইবার জন্য এ পৃথিবীতে কেহ আসে নাই।" মার্জার আরও বলেছে, "আমাদের কালো চামড়া দেখিয়া ঘৃণা করিও না। এ পৃথিবীতে মৎস্য মাংসে আমাদের কিছু অধিকার আছে। খাইতে দাও— নহিলে চুরি করিব।" ('বিড়াল', সাহিত্য সংসদ, পৃ. ৮৭)। এতো পশ্চিম শ্বেত সাম্রাজ্যবাদের দিকে কটাক্ষ। 'চুরি করিব' অর্থাৎ বিদ্রোহ করব। বন্ধিমের গভীর আত্মবিশ্বাস থেকে এ প্রশ্ন উদ্ভূত। বিড়াল এখানে তো সোশ্যালিস্ট। বন্ধিমের চিন্তাধারা সমাজতন্ত্রে গ্রথিত।

তাঁর 'পতঙ্গ' প্রবন্ধটি সুখপাঠ্য। প্রবন্ধটি গুঢ় তত্ত্বকথায় সম্পৃক্ত। কালিদাসের 'পতঙ্গবৎ বহিঃ মুখং বিবিক্ষুঃ' ছত্রটি বন্ধিমচন্দ্রের মনে এক বিচিত্র ভাবনার সঞ্চার করেছে। তিনি বলেন, 'মনুষ্য মাত্রই পতঙ্গ। সকলেরই এক একটি বহিঃ আছে সেই বহিঃতে পুড়িয়া মরিতে তাহার

অধিকার আছে। কেহ মরে কেহ কাছে বাধিয়া ফিরিয়া আসে। জ্ঞান-বহি, ধন-বহি, মান-বহি, রূপ-বহি, ইন্দ্রিয়-বহি, সংসার বহিময়, আবার সংসার কাচময়।” (‘পতঞ্জ’, সাহিত্য সংসদ, পৃ. ৫৮) এখানে বঙ্কিম চিন্তাবিদ। কত গভীরে তিনি চিন্তা করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র দেখেছেন, দুর্ঘোষন, মিলটনের প্যারাডাইস লস্ট, সেন্টপল, আন্টনি, ক্রিওপেট্রা, রোমিও জুলিয়েট, ওথেলো, গীতগোবিন্দ, বিদ্যাসুন্দর, সীতা, গ্যালিলিও ও সফ্রেটিস এই বহির শিকার।

অস্বীকার করা যায় না, আজও মানুষ নানাবিধ বহিতে পুড়ে মৃত্যু বরণে তৎপর।

বঙ্কিম তদনীন্তনকালে প্রচলিত রাজনীতির স্বরূপের প্রসঙ্গে ইতর-প্রাণী এনেছেন। কমলাকান্ত শর্মা আফিগ চাপিয়ে দিয়া দৃষ্টি পেয়ে লিখলেন : “দুই রকমের পলিটিক্স দেখিলাম এক কুকুর জাতীয়, আর এক বৃষ জাতীয়। বিস্মার্ক এবং কর্শাকফ এই বৃষের দলের পলিটিশান—” ইত্যাদি। (‘পলিটিক্স’, সাহিত্য সংসদ পৃ. ৯৪) বঙ্কিম তাঁর বক্তব্য পরিস্ফুট করার জন্য ঐ দুটি ইতর-প্রাণীকে অবলম্বন করেছেন। ভারতে একদল কুকুর রাজনীতিদল আবেদন-নিবেদনের পথেই ছিটে ফোঁটা পেয়ে আত্মপ্রসাদে তৃপ্ত থাকেন, আর একদল বৃষজাতীয় রাজনীতিকদল তারা আবেদন নিবেদন না করে বাহুবল কিংবা বাক্যবলের দ্বারা ঈঙ্গিত বস্তু আদায় করে নেন। রাজনীতিক দলের প্রতি বঙ্কিমের শ্লেষ এখানে লক্ষণীয়।

‘ব্যাভাচার্য বৃহদ্রাঙ্গুল’ প্রবন্ধে বর্ণিত “সুন্দরবনের ব্যাঘ্রসভা ভারতবর্ষের পাণ্ডিত্য গর্বা ইংরেজ শাসককুলের প্রতীকমাত্র।” বৃহদ্রাঙ্গুলের সভাস্থলে ঘোষণা : “সম্রাট লোকের আহারান্নেষণের নাম বিষয়কর্ম, অসম্রাটের আহারান্নেষণের নাম জুয়াচুরি, উদ্ধৃতি, এবং ভিক্ষা। ধূর্তের আহারান্নেষণের নাম চুরি, বলবানের আহারান্নেষণের নাম দস্যুতা; লোকবিশেষে দস্যুতা শব্দ ব্যবহার হয় না, তৎপরিবর্তে বীরত্ব বলিতে হয়। যে দস্যুর দণ্ডপ্রণেতা আছে, সেই দস্যুর কাজের নাম দস্যুতা, যে দস্যুর দণ্ডপ্রণেতা নাই, তাহার দস্যুতার নাম বীরত্ব। আপনারা যখন সভা সমাজে অধিষ্ঠিত হইবেন, তখন এই সকল নাম বৈচিত্র্য স্মরণ রাখিবেন; নচেৎ লোকে অসভ্য বলিবে। বস্তুত আমার বিবেচনায় এত বৈচিত্র্যের প্রয়োজন নাই, এক উদর পূজা নাম রাখিলেই বীরত্বাদি সকলে বুঝাইতে পারে।” (লোকরহস্য, ‘ব্যাভাচার্য বৃহদ্রাঙ্গুল’, সাহিত্য সংসদ, পৃ. ২)

মানুষের ভেতরে পশুসুলভ বৃত্তি থাকায় ব্যাভাচার্য বৃহদ্রাঙ্গুলের মতে, ‘মনুষ্য একপ্রকার দ্বিপদ পশু।’ বঙ্কিম ‘ব্যাভাচার্য বৃহদ্রাঙ্গুল’-এ মানুষের স্বভাবের একটা বিরাট ত্রুটি তুলে ধরেছেন— “যাহার ঘরে ইনি নাই — তাহার আবার গুণ কি? যাহার ঘরে ইনি বিরাজ করেন, তাহার আবার দোষ কি? মনুষ্য সমাজে মুদ্রা মহাদেবীর অনুগৃহীত ব্যক্তিকেই ধার্মিক বলে। মুদ্রাহীনতাকেই অধর্ম বলে। মুদ্রা থাকিলেই বিদ্বান হইল। মুদ্রা যাহার নাই, তাহার বিদ্যা থাকিলেও মনুষ্য শাস্ত্রানুসারে সে মূর্খ বলিয়া গণ্য হয়।” (ব্যাভাচার্য বৃহদ্রাঙ্গুল দ্বিতীয় প্রবন্ধ, সাহিত্য সংসদ, পৃ. ৬) এখানে বাক্ বাক্ করছে বঙ্কিমের ব্যাঙ্গ-বিদ্রূপের তলোয়ারটি। এই চিন্তাধারার প্রবণতা থেকে মানুষ আজও কি সম্পূর্ণ মুক্ত? সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থেকে যায়।

‘গর্দভ’ রহস্য রচনা। শূঁধু রহস্য নয়। আক্রমণাত্মকও বটে। “তুমিই ব্রাহ্মণ কুলে জন্মিয়া ধর্মশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলে, সন্দেহ নাই, নহিলে নবমীতে লাউ খাইতে নাই কেন? তুমিই আলঙ্কারিক, সাহিত্য দর্পণাদি তোমারই সৃষ্টি। কিঞ্চিৎ ঘাস খাও।” (বঙ্কিমচন্দ্রজীবনী, অমিত্রসুন্দন

ভট্টাচার্য, আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, পৃ. ২৩৮) কার প্রতি এ আক্রমণ তা সহজেই অনুমেয়। এই রচনাকে কেন্দ্র করে সে সময়ে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। পরে অবশ্য বঙ্কিম বলেছেন, কোন ব্যক্তিবিশেষকে এ আক্রমণ করা হয় নি। (লোকরহস্য-এ আলোচিত বিষয়বস্তু সম্বন্ধে অধ্যাপক শ্রীশচন্দ্র দাস বলেছেন, “ব্যাপ্তাচার্য বৃহন্নাগালের রস উচ্ছলতা স্বার্থাঙ্ক মানব পশুর চরিত্রের উপর নির্মম কশাঘাত। ‘সন্দর্ভে’র ব্যঙ্গোক্তি তে তাহাই আরও নির্মম।” বঙ্কিম ইংরেজের অনুকরণ করা পছন্দ করতেন না। বিভিন্ন প্রবন্ধে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেছেন। ‘হনুমদ্বাবু সংবাদ’ তারই সর্কৌতুক ইঙ্গিতবহ। “দৈবযোগে বুট, কোট, পেণ্টালুম, চেন, চসমা, চুরট, চাবুকধারী টুপ্যাবৃত মস্তক এক নব্য বাবু তথায় উপস্থিত। হনুমানচন্দ্র দূর হইতে এই অপূর্ব মূর্তি দেখিয়া মনে মনে ভাবিলেন, ‘কে, এ? আকার ইঙ্গিতে বোধ হইতেছে, নিশ্চয় কিঙ্কিধ্যা হইতে এ আসিতেছে। এরূপ পরানুকৃত বেশ, গমন চাহুনি প্রভৃতি অন্য কোন দেশে অসম্ভব। এ আমার স্বদেশী ও স্বজাতি, অতএব ইহাকে আমি অবশ্য আদর কবিব।” (হনুমদ্বাবু সংবাদ, সাহিত্য সংসদ, পৃ. ৩৭) বঙ্কিম এভাবে আত্মমর্যাদাহীন পরানুকরী এবং বাবুদের প্রতি নির্মম কশাঘাত করেছেন। এরূপ কশাঘাত এই জাতীয় মানুষকে সচকিত করে। ‘হনুমানচন্দ্রে’র উপস্থিতি ঘটিয়ে তাঁর (বঙ্কিমের) বক্তব্য পরিস্ফুট করা সহজতর হয়েছে।

কমলাকান্তের জীবনবন্দীতে প্রসন্ন গোয়ালিনীর গরু চুরিকে উপলক্ষ্য করে বঙ্কিম কমলাকান্তকে কাঠগড়ায় সাক্ষী হিসেবে তুলে প্রচলিত বিচার ব্যবস্থা এবং তার অনুশঙ্গের সমালোচনা করেছেন।

‘বাস্তালির মনুষ্যত্ব’-এ বঙ্কিম ভ্রমরকে নিয়ে এসেছেন। তিনি ভ্রমরের গুঞ্জন শব্দের সঙ্গে বাজালির চাকরির এবং রাজা মহারাজাদের পদবৃদ্ধির উমেদারিতে এবং পেশাদারদের কার্যসিদ্ধির উদ্দেশ্যে ঘ্যান ঘ্যান করার সঙ্গে তুলনা করেছেন। এখানে বঙ্কিমের মনের কথা স্বচ্ছ পরিষ্কার এবং তাঁর কটাক্ষ উপটীয়ায়মান।

তাঁর প্রবন্ধে যেখানেই বঙ্কিম ইতর-প্রাণী ব্যবহার করেছেন, সেখানেই তিনি নির্মল, শূভ্র সংযত হাস্যরসের মধ্য দিয়ে তাঁর গভীর মানবিক, সামাজিক, দার্শনিক তত্ত্ব এবং জাতীয় চেতনার কথা বলেছেন, যার আবেদন আমাদের হৃদয় বৃষ্টির এবং অন্তর সন্তার কাছে, কিন্তু লক্ষণীয়, ‘তাঁর নিজের মঞ্চটি বীষদীপ্ত, নিরাপদাভিষিক্ত ঘনতম নিবন্ধ স্বাভিমান’ প্রেরণার উৎস স্বরূপ।

বিশ্বায়িত রূপচেতনা ও রামকিঙ্কর চল্লিশের আধুনিকতা

মৃণাল ঘোষ

এক

আধুনিকতার সংশয়

বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতনে কালোবাড়ির দেয়ালে রামকিঙ্কর (১৯০৬-১৯৮০) মাটি দিয়ে রিলিফে কাজ করছিলেন। সেটা সম্ভবত ১৯৩৭ সালের কথা। ‘শিববিবাহ’, ‘বাদনরত সাঁওতাল’— এসব মূর্তি করেছিলেন সে সময়। তাঁকে কাজ করতে দেখে মাস্টারমশাই নন্দলাল বসু বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়কে এসে বলেছিলেন :

বিনোদ গিয়ে দেখো রামকিঙ্কর মাটিব কাজ কবছে, তার হাতের dexterity দেখে বুক কেঁপে যায়। এ কি আর এক জন্মের সাধনায় হয়েছে। অনেক জন্মের সাধনা নিয়ে কিঙ্কর জন্মেছে।

এতটাই মুগ্ধতা, আস্থা ছিল তাঁর এই ছাত্রটির প্রতি। সেজন্যই তাঁর কাজ করার স্বাধীনতায় কখনও বাধা দেন নি। রামকিঙ্করেরও শিল্পীসত্তার স্বাধীনতাবোধ ছিল খুবই প্রখর। বাধা দিয়েও যে খুব একটা লাভ হত, তা হয়তো নয়। কলাভবনে সবাই যখন নিমগ্ন স্বদেশি আঙ্গিকের সাধনায়, রামকিঙ্কর ঘরে বসে লুকিয়ে লুকিয়ে আঁকছেন তেলরঙের ছবি। তথাকথিত ঐতিহ্যের সীমায় বাঁধা থাকছেন না। পাশ্চাত্য তখন তাঁর ভিতর থেকে পরিস্ফুট হচ্ছে সহজাত আবেগেই। তাকে সংযত করার কোনও কারণ তিনি খুঁজে পান না।

নন্দলালের মুগ্ধতা সত্য। তবু একটা সংশয় তাঁকে কোথায় যেন সারা জীবন তাড়িত করেছে। ১৯৫৫ সালেও ভারতশিল্পী নন্দলাল গ্রন্থের লেখক ড. পঞ্চানন মন্ডলকে তিনি বলেছেন এরকম :

শান্তিনিকেতন কলাভবনে এইভাবেই কাজ চলছিল। তবে আমাদের এই কাজে এর কিছু ব্যতিক্রম ঘটলে কলাভবনের কতকগুলি ছাত্র— এখানে স্টেলা ক্রামরিশ আসবার পরে। আমার ছাত্রদের লোভ হলো ওদের পোট্রেট-টোট্রেট দেখে মডার্ন আর্টিস্ট হবার। এবং ওরা সেই চেষ্টাই করতে লাগলো। আমাদের কিঙ্কর, বিনোদ এরা সব সেই চেষ্টাই করতে লাগলেন। কিঙ্করবাবুর বরাবরই হচ্ছে মডার্ন হবার। আসলে কিছু তাঁর ভেতরে মডার্ন হবার ইচ্ছে নাই। ঘুরেফিরে করে বসেন সেই realistic art। ওঁর ধাতই হলো realism-এর।.... আমার পদ্ধতি হচ্ছে পুরাতন ও নতুন মিলিয়ে একটা কিছু। আমার যা নতুন সেটা আপনি হয়েছে। আব ওরা জোর কবে চেষ্টা করছে নতুন কিছু কববে

বলে। যাই হোক আমাদের সুধীর, বিনোদ, কিঙ্কর ঐদেব মধ্যে বেনেসাঁব ফলে আর একটা ধাৰা এসে গেল। তবে ওঁবা Successful হলো কিনা জানি না।

(ভারতশিল্পী নন্দলাল, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ৫২৬-৫২৭)

নন্দলালের এই সংশয়ের ভিতর থেকে উঠে আসে রামকিঙ্করের সন্ধানের নতুন দিগ্‌দর্শন যেমন, তেমনি ১৯৪০-এর দশকের আধুনিকতা ভাবনার মূলগত কিছু বৈশিষ্ট্যও। ভারতীয় দৃশ্যকলার আধুনিকতার বিবর্তনে দুই প্রজন্মের ব্যবধানের কিছু সারাৎসার ধরা থাকে এর মধ্যে।

নন্দলাল কখনও এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকেন নি। ১৯১৬ সালে শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথের সাহচর্যের পর থেকে তাঁর শিল্প ভাবনা ক্রমেই বিবর্তিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের যে বিশ্ববোধ, স্বদেশকে শুধু অতীতবদ্ধতায় না দেখে প্রসারিত প্রকৃতি ও সাধারণ মানুষের প্রবহমান জীবনের মধ্যে দেখা, এটা তাঁর ছবিতে বিরাট পরিবর্তন এনেছে। লৌকিকের ভিতর তিনি মুক্তির স্বাদ পেয়েছেন। নন্দলাল তাঁর শিল্পীসত্তার উৎসারকে কতগুলি উৎসের সঙ্গে সংবদ্ধ করেছিলেন। প্রথম, তাঁর গুরু অবনীন্দ্রনাথ। শিল্পের স্বদেশের দিকে যাত্রায় অবনীন্দ্রনাথই তাঁকে প্রথম উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। দ্বিতীয় উৎস রবীন্দ্রনাথ। ১৯১৪ সালে রবীন্দ্রনাথ প্রথম তাঁকে শান্তিনিকেতন আহ্বান করেন। সংবর্ধিত করেন তাঁকে। তারপর অবনীন্দ্রনাথের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই তাঁকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করে নন্দলালকে শান্তিনিকেতন এনে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠা করেন। রবীন্দ্রনাথের বিশ্ববোধ তাঁর জীবনদর্শন ও শিল্পনন্দনে বিপুল পরিবর্তন আনে। নন্দলালের বিশ্বাসেব জগৎ গড়ে ওঠার পিছনে তৃতীয় উৎস মহাত্মা গান্ধী। গান্ধীর জাতীয়তাবোধ সঞ্চারিত হয় তাঁর মধ্যেও। রবীন্দ্রিক ভূমণ্ডলের সঙ্গে তিনি এর এক সমীকরণ করে নেন। এছাড়া ধর্মচেতনা ও রামকৃষ্ণ দর্শনের একটি চতুর্থ মাত্রাও তাঁর শিল্পচেতনাকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। ফলে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতার সঙ্গে নন্দলাল কখনও আপস করতে পারেন নি। রবীন্দ্রনাথ সত্ত্বেও তিনি তাঁর স্বদেশ চেতনায় অবিচল ছিলেন সারা জীবন।

এখানেই তাঁর দুই প্রধান ছাত্র বিনোদবিহারী ও রামকিঙ্করের নন্দনবোধের সঙ্গে নন্দলালের শিল্পদর্শনের পার্থক্য। স্বদেশের সঙ্গে বিশ্বকে একাত্ম করার মাপকাঠি হবে ঠিক কিরকম, এই ভাবনার অনেক অগ্রগতি ঘটেছে বিনোদবিহারী বা রামকিঙ্করের চিন্তায় সেটা এক দিক থেকে সময়েরই অগ্রগতির লক্ষণ। রামকিঙ্কর আধুনিকতার প্রগতিকে যতটা মুক্তমনে গ্রহণ করতে পেরেছিলেন, গ্রহণ করাকে যতটা অনিবার্য মনে করেছিলেন, নন্দলালের পক্ষে তা সম্ভব ছিল না। যদিও রামকিঙ্করের স্বদেশপ্রেম, নিজের মাটির প্রতি অবিচ্ছেদ্য টান কোনও অংশে কম ছিল না। তবু স্বদেশের জমিতে দাঁড়িয়ে বিশ্বকে আত্মস্থ করার আগ্রহ ছিল তার অনেক গভীর। সেই আগ্রহের মধ্যে, স্বদেশ বিশ্বকে সমন্বিত করে নেওয়ার প্রয়াসের মধ্যেই শিল্পী হিসেবে তাঁর স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় রয়েছে। এই সমন্বয়কে আধুনিক মূল্যবোধের উপযোগী করে গড়ে তোলার মধ্যেই রয়েছে চল্লিশের একজন পথিকৃৎ শিল্পী হিসেবে তাঁর বিশেষ মর্যাদা। রামকিঙ্করের আধুনিকতাবোধের সেই দিকটার উপর আলোকপাতের প্রয়াসই এই লেখায় আমাদের অন্যতম উদ্দেশ্য। কিন্তু সেখানে আসার আগে বা তারই প্রস্তুতি হিসেবে আমাদের দৃশ্যকলার আধুনিকতায় স্বদেশ বিশ্বের সমন্বয়ের প্রকল্পটি কিভাবে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে, সেটা একটু বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করব। বুপের বিশ্বায়নের এই প্রকল্পে রামকিঙ্করের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

দুই

আধুনিকতা ও বিশ্বায়িত রূপচেতনা : অবনীন্দ্রনাথ থেকে রবীন্দ্রনাথ

আমাদের দৃশ্যকলায় আধুনিকতার শুরুর কোথায়, এ বিষয়ে নানা বিতর্ক আছে। মোগল সাম্রাজ্যের পতনের পর থেকে আমাদের দৃশ্যকলার পরিমণ্ডলটি বিপর্যস্ত হয়ে থাকে। পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে সমাজের সম্ভ্রান্ত শ্রেণির শিল্পচর্চা প্রায় স্তব্ধ হয়ে যায়। লৌকিক স্তরে সেই চর্চা অবশ্য প্রবাহিত থেকেছে। থেকেছে বলে অনেক পরে আধুনিকতার বিবর্তনে তা সহায় হতে পেরেছে। কিন্তু অষ্টাদশ শতক থেকে ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত সমাজের সম্ভ্রান্ত স্তরে সুস্থ শিল্পচর্চার কোনও পরিস্থিতি তৈরি হয় নি। ১৮৫০-এর দশকে ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী নিজেদের প্রয়োজনে কিছু শিল্পী কারিগর তৈরির উদ্দেশ্যে দেশীয় মানুষদের শিল্পকলা শিক্ষা দেওয়ার উদ্যোগ নেন। এজন্য বিভিন্ন শহরে তাঁরা কয়েকটি আর্ট স্কুলের সূচনা করেন। ১৮৫০ সালে সরকারি উদ্যোগে প্রথম আর্ট স্কুল খোলা হয় মাদ্রাজে। ১৮৫৪-তে কলকাতায় শুরুর হয় ‘স্কুল অব ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট’। বম্বেতে প্রথম শিল্প শিক্ষাকেন্দ্র খোলা হয় ১৮৫৬ সালে। এই সব স্কুলে ব্রিটিশ অ্যাকাডেমিক স্বাভাবিকতার রীতিতে শিক্ষা দেওয়া হত। অনেকে মনে করেন আমাদের শিল্পকলায় আধুনিকতার শুরুর এখান থেকে।

যদি একে আধুনিকতা বলা হয়, তাহলে এই আধুনিকতার সঙ্গে দেশীয় ধারার ঐতিহ্যের কোনও যোগ ছিল না। কিন্তু জীবনের অন্য ক্ষেত্রের মতো শিল্পকলার ক্ষেত্রটিও এমন যে সেখানে বিভিন্ন উৎসের মধ্যে অবিরত একটা সংযোগ ঘটতে থাকে। ‘রূপ’-এর বিভিন্ন প্রবাহ পরস্পর পরস্পরকে প্রভাবিত করতে থাকে। শিল্পকলার ভিতর বিশ্বায়নের একটা প্রক্রিয়া এভাবেই চলে আসছে অনাদি কাল ধরে। ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে, তথাকথিত আধুনিকতার পরিমণ্ডলেও, এই সমন্বয় প্রক্রিয়া বৃদ্ধি হয় নি। প্রবহমান লৌকিক অ্যাকাডেমিক স্বাভাবিকতার আঙ্গিককে আত্মস্থ করার চেষ্টা করেছে। দুই-এর মধ্যে মিলন ঘটেছে। কোম্পানি স্কুলের ছবি, অনামা শিল্পীদের তেলরঙের কাজ, যাকে ফ্রেঞ্চ-বেঙ্গল বা ডাচ-বেঙ্গল স্কুল বলা হত এক সময়, এমনকী কালীঘাট বা বটতলার ছায়াছবিতেও এই সমন্বয়ের নিদর্শন রয়েছে।

ঊনবিংশ শতকের প্রায় শেষ দশক পর্যন্ত সমাজের উচ্চ স্তরে এই ব্রিটিশ অ্যাকাডেমিক স্বাভাবিকতার রীতিরই আধিপত্য ছিল। শেষ দশকের মাঝামাঝি সময়ে এই আধিপত্যের বিরুদ্ধে প্রশ্ন ওঠে। প্রথম পর্যায়ে দুজন মানুষের অবদান এদিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম জন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। অবনীন্দ্রনাথ প্রথম জীবনে ব্রিটিশ স্বাভাবিকতার আঙ্গিকেই ছবি আঁকা শিখেছিলেন। কিন্তু স্বাদেশিকতার পরিমণ্ডল যখন প্রসারিত হচ্ছে, তাঁর মনে এই আঙ্গিকের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন জাগল। আঙ্গিকের ভিতর দেশীয় আত্মপরিচয় থাকা উচিত বলে মনে হল তাঁর। সেই সন্ধান থেকেই ১৮৯৫ সালে তিনি ‘রাধা-কৃষ্ণ’ বা ‘কৃষ্ণজীলা’ চিত্রমালা শুরু করলেন। এর ভিতরে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য অনুচিত্রের দুটি আঙ্গিককে মেলালেন তিনি। অবনীন্দ্রনাথের এই সমন্বয় প্রক্রিয়া থেকে ভারতের চিত্রকলার আধুনিকতার এক নতুন পর্যায় শুরু হল। শুরু হল আধুনিকতার ভিতর বিশ্বায়নের এক নতুন পর্যায়ও।

দ্বিতীয় যে ব্যক্তি এই সমন্বয় প্রক্রিয়াকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন, তিনি ই. বি. হ্যাভেল। তাঁর

মনে হয়েছিল, কেবল ব্রিটিশ অ্যাকাডেমিক স্বাভাবিকতার চর্চার মধ্য দিয়ে ভারতীয় আধুনিকতার মুক্তি নেই। দেশীয় শিল্পের যে সমৃদ্ধ ঐতিহ্য রয়েছে, শিক্ষাধারার ভিতর তার অনুশীলনও অত্যন্ত জরুরি। এজন্য তিনি কলকাতার সরকারি আর্ট স্কুলে দেশীয় শিল্পরীতির চর্চার উপর জোর দেন। ১৮৯৬ সালে তিনি কলকাতায় আসেন এবং সরকারি আর্ট স্কুলের সুপারিনটেনডেন্ট বা অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করেন। ১৮৯৭-তে তাঁর সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের পরিচয় হয়। তাঁদের যৌথ উদ্যোগে আমাদের তৎকালীন শিল্পশিক্ষা ব্যবস্থায় দেশীয় রীতির চর্চার পথ সুগম হয়। শুরু হয় আধুনিকতার ঐতিহ্যদীপ্ত নতুন এক ধারা, যা পরবর্তী কালে নব্য-ভারতীয় ধারা হিসেবে পরিচিত হয়।

আমাদের আধুনিক চিত্রকলায় বিভিন্ন উৎসের সমন্বয় বা বিশ্বায়নের প্রক্রিয়া এর পর থেকে ক্রমাগত প্রসারিত হতে থাকে। ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যত সক্রিয় হয়েছে, শিল্পকলার ইউরোপীয় রেনেসাঁস উত্তর ধ্রুপদি স্বাভাবিকতার আঙ্গিকের প্রসার সম্পর্কেও তত প্রশ্ন উঠেছে। শুধু প্রাচ্যেই নয়, ইউরোপেও এই প্রতিবাদ জেগেছে। রোমান্টিক আন্দোলন এই ধ্রুপদি চেতনার বিরুদ্ধেই প্রতিবাদ। লৌকিক ঐতিহ্যকে আধুনিকতার মূল স্রোতে নিয়ে আসার প্রচেষ্টা চলেছে এই প্রতিবাদের সূত্র ধরেই। ইংল্যান্ডে উইলিয়াম মরিসের অবদান এদিক থেকে উল্লেখযোগ্য। ফরাসি দেশে উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে যে প্রতিচ্ছায়াবাদ বা ইম্প্রেশনিস্ট চিত্ররীতির আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল তার ভিতরেও রয়েছে এই প্রতিবাদী চেতনা। ইম্প্রেশনিজমের ভিতর প্রাচ্য পাশ্চাত্যের এক ধরনের সমন্বয়ও ঘটছিল। বিশ্বায়নের এক নতুন প্রবাহ শুরু হয়েছিল।

নব্য-ভারতীয় ঘরানার প্রসারের ভিতর এরকম একটা আন্তর্জাতিক প্রতিবাদী চেতনার অনুষ্ণা কাজ করেছিল। ঔপনিবেশিকতার প্রতিরোধ এশিয়ার বিভিন্ন দেশে শিল্পচেতনার সংহতির সন্ধান করা হচ্ছিল। চীন ও জাপানের শিল্পপ্রক্রিয়া ও নন্দনচেতনা থেকে অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল ও নব্য-ভারতীয় ধারার অনেক শিল্পী অকুণ্ঠভাবে গ্রহণ করেছেন। প্রখ্যাত জাপানি মনীষী ওকাকুরা তেনশিন প্রথমবার কলকাতায় আসেন ১৯০২ সালে। পরে আবার আসেন-১৯১২ সালে। নন্দনচেতনায় এশিয়ার একের কথা তিনি বার বার বলেছেন। নব্য-ভারতীয় ঘরানার বিকাশে ওকাকুরার চিন্তার যথেষ্ট প্রভাব আছে। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর ছবিতে প্রথম পর্যায়ে অনেক জাপানি প্রকরণ গ্রহণ করেছেন। সেই সময়ের অনেক শিল্পীর জলরঙের ওয়াশ পদ্ধতিতে জাপানি পদ্ধতি আত্মীকৃত হয়েছে। ব্রিটিশ জলরঙ-এর ও জাপানি ওয়াশ পদ্ধতি মিলে মিশেও গেছে।

পাশ্চাত্য আঙ্গিককে পরিহার করতে অবনীন্দ্রনাথ মোগল দরবারি ও ঐশ্ব্যমিক চিত্ররীতি থেকে গ্রহণ করে তাঁর নিজস্ব আঙ্গিক গড়ে তুলেছিলেন। ১৯০২ সালে আঁকা তাঁর 'সাজাহানের মৃত্যু' ছবিটি এদিক থেকে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ছবিটি বোর্ডের উপর তেলরঙে আঁকা। তেলরঙের প্রকরণ ও পরিপ্রেক্ষিত বিন্যাসে পাশ্চাত্যের স্বাভাবিকতাবাদী রীতির যথেষ্ট প্রভাব আছে এই ছবিতে। আবার ছবিটির রূপরীতিতে রয়েছে মোগল আঙ্গিকের প্রত্যক্ষ অনুষ্ণা। এই দুটি ধারাকে মিলিয়ে ছবিটিতে যে ভাব জগতের প্রকাশ ঘটালেন শিল্পী, তাতে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের আবেগ এসে মিশেছে। সাজাহানের মৃত্যুর অনুষ্ণা যে করুণার পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছে ছবিটিতে, শিল্পীর নিজের কন্যার সদ্য মৃত্যুর গভীর বিষাদ

কাজ করেছে সেই ককণাকে গড়ে তুলতে। ভাবনায় ও আঙ্গিকে বিভিন্ন উৎস কিভাবে মিশে যায় 'সাজাহানের মৃত্যু' ছবিটি তার একটি দৃষ্টান্ত মাত্র।

অবনীন্দ্রনাথের ছবির বিস্তারের দিকে যদি আমরা তাকাই, তাহলে দেখা যায়, তিনি কখনও এক জায়গায় থেমে থাকেন নি। সারা জীবন তাঁর রূপরীতি নতুন নতুন দিগন্তে প্রসারিত হয়েছে। নানা উৎস থেকে তিনি গ্রহণ করেছেন। সেই উৎসকে আত্মীকৃত করে নতুন আঙ্গিক সৃষ্টি করেছেন। এই বিবর্তনের পথে ১৯৩০-এ তাঁর 'আরব্য রজনী' চিত্রমালায় তিনি আরবের পুরাণ কাহিনির ভিতর দিয়ে সেই সময়ের স্বদেশের বাস্তবতা ও সমাজ ও রাজনীতির নানা সমস্যার উপর আলোকপাত করেছেন। ১৯৩৮-এর 'কৃষ্ণ মঙ্গল' চিত্রমালায় লৌকিক শিল্পের নানা অনুঘটকে ব্যবহার করেছেন। আধুনিকতার নানা সূক্ষ্ম বোধের প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর শেষ জীবনের 'কুটুমকাটাম'-এর নির্মাণে ও যাত্রা পালাগুলির মধ্য দিয়ে। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর শিল্পের সামগ্রিক বিকাশের মধ্য দিয়ে দেখিয়েছেন প্রাচ্য-চেতনার ভিত্তির উপর স্থির থেকেই কেমন করে সমগ্র বিশ্বকে আত্মস্থ করে নেওয়া যায়। ভারতীয় আধুনিকতায় 'রূপ'-এর বিশ্বায়নের এক অনবদ্য অভিজ্ঞান আমরা পাই তাঁর সৃষ্টির ভিতর থেকে। যেহেতু ঐতিহ্যের গভীর থেকে উৎসারিত সেই রূপ, এজন্য অবনীন্দ্রনাথকেই আমাদের চিত্রকলায় প্রথম আধুনিকের মর্যাদা দিতে চান অনেকে। আধুনিকতার পরবর্তী পরিকাঠামো অনুধাবন করতে অবনীন্দ্রনাথ নির্মিত এই ভিত্তিটিকে আমাদের ঠিকভাবে বুঝে নিতে হয়।

নব্য-ভারতীয় ঘরানা বিংশ শতকের প্রথম দশকের পরে ক্রমশ বিবর্তিত হতে থাকে অবনীন্দ্রনাথের শিষ্য পরম্পরার চর্চার ভিতর দিয়ে। নন্দলাল বসুর অবদান এদিক থেকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। নন্দলাল অবনীন্দ্রনাথের আদর্শকে গ্রহণ করেছেন, কিন্তু আঙ্গিকে তিনি ভিন্ন পথে চলেছেন। অবনীন্দ্রনাথ নিজে যেভাবে মোগল রূপরীতি আত্মস্থ করেছেন, তাঁর শিষ্যদের সেদিকে খুব একটা উৎসাহিত করেন নি। তিনি বলতেন, যে দরবারি মেজাজ ঐতিহ্য সূত্রে তাঁর রসে প্রবাহিত, সেটা তাঁর শিষ্যদের মধ্যে সেভাবে নেই। তাই দরবারি চিত্ররীতি অনুসরণ করা তাঁদের পক্ষে তত সহজ হবে না। তাঁদের তিনি উৎসাহিত করেছেন ভারতীয় ধ্রুপদি চিত্ররীতি থেকে গ্রহণ করতে। কৃষ্ণের পুরাণকল্প অবনীন্দ্রনাথের ছবিতে এলেও রামায়ণ, মহাভারত বা অন্যান্য দেশীয় পৌরাণিক বিষয় তাঁর ছবিতে খুব গুরুত্ব পায় নি। তাঁর শিষ্যরা এই পৌরাণিক বিষয়কে ভিত্তি করে ভারতীয় ধ্রুপদি চিত্ররীতি নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষার ভিতর দিয়ে তাঁদের চিত্রচর্চাকে প্রসারিত করতে থাকেন। লেডি হেরিংহামের নেতৃত্বে, নিবেদিতার অনুপ্রেরণায় অজন্তার ছবির প্রতিলিপি তৈরির কাজে যুক্ত হন নন্দলাল বসু এবং সেই সময়ের অন্যান্য কয়েকজন তরুণ শিল্পী। অজন্তার এই অভিজ্ঞতা নন্দলালের ছবিতে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। ভারতীয় শিল্পের ধ্রুপদি চেতনাকে নন্দলাল যেভাবে আধুনিকতায় অভিযুক্ত করেছেন, আমাদের আধুনিকতাকে দীর্ঘদিন তা নানাভাবে সমৃদ্ধ করেছে। তাঁর প্রবল দেশাত্মবোধের ভিতর দিয়ে আধুনিকতার পাশ্চাত্য নিরপেক্ষ প্রাচ্যচেতনাকে সম্প্রসারিত করে গেছেন তিনি সারা জীবন। সেই প্রাচ্য চেতনায় খুব সূক্ষ্মভাবে আত্মীকৃত হয়েছে বিশ্বের অন্যান্য নানা উত্তরাধিকার। বিশ্বায়নের প্রক্রিয়া নন্দলালের ছবিতে এক ভিন্ন মাত্রায় উন্মীলিত হয়েছে।

অবনীন্দ্রনাথ ও নন্দলাল— এই দুই শিল্পী ভারতীয় আধুনিকতার প্রথম পর্বের দুই

স্তম্ভস্বরূপ। আমাদের আধুনিকতায় ভারতীয় ঐতিহ্য ও প্রাচ্যচেতনা প্রজ্ঞাদীপ্তভাবে আত্মীকৃত হয়েছে তাঁদের ছবির ভিতর দিয়ে। রূপের বিশ্বায়নের দুই ভিন্ন প্রবাহকে মেলে ধরেছেন তাঁরা। এই উত্তরাধিকারের ভিত্তিতেই আমাদের চিত্রকলার বা শিল্পকলার পরবর্তী বিবর্তন। আধুনিকতার সেই বিবর্তনে রামকিঙ্করের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আধুনিকতায় রূপের যে বিশ্বায়ন, ১৯৩০ ও ১৯৪০-এর দশকে পৌঁছে রামকিঙ্কর তাকে গভীরভাবে নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাবিত করেছেন। এজন্যই রামকিঙ্করের পৌছনোর আগে আমরা আধুনিকতার এই বিশ্বায়নের প্রবাহকে অনুধাবন করে নিতে চাই। যাতে ইতিহাসের সেই ধারাবাহিকতায় রামকিঙ্করের অবস্থান সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত হতে পারে।

১৯১৫-১৬ পর্যন্ত দুটি ধারায় প্রবাহিত হচ্ছিল আমাদের চিত্রকলার আধুনিকতা। ব্রিটিশ অ্যাকাডেমিক স্বাভাবিকতার আঙ্গিকের চর্চা চলছিল। কিন্তু প্রগতিবাদী ধারা হিসেবে তখন চিহ্নিত হচ্ছিল নব্য-ভারতীয় ঘরানা। তখনকার ঔপনিবেশিকতা-বিরোধী স্বাদেশিকতার পরিমণ্ডলে এই ধারা ছিল প্রতিবাদ ও প্রগতির অনুযজ্ঞাবাহী। এজন্য রবীন্দ্রনাথও প্রথম পর্যায়ে একে অকুণ্ঠভাবে সমর্থন করেছেন। কিন্তু ১৯১৫-র পর থেকে তিনি অনুভব করছিলেন যে নব্য-ভারতীয় ধারার বিকাশ যেন কিছুটা থল হয়ে আসছে। বিশ্বের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তা যেন এক বদ্ধ জলায় পরিণত হচ্ছে। তাতে প্রাণের স্ফূর্তি কমে আসছে। তখন তিনি অকীন্দ্রনাথ ও গগনেন্দ্রনাথকে এ বিষয়ে সচেতন করেন। নিজের সংকীর্ণ পরিসর থেকে বেরিয়ে এসে বিশ্বের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করতে বলেন। নতুনভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য জোড়াসাঁকোয় ‘বিচিত্রা স্টুডিও’ স্থাপন করেন ১৯১৫ সালে। কিছুদিন সেখানে নতুন উদ্দীপনায় কাজ হয়েছে। তারপরে সেখানেও নতুন উন্মেষ আর কিছু ঘটছিল না। বছর দেড়েক চলার পর ১৯১৭-তে ‘বিচিত্রা’ বন্ধ করে দেন।

কলকাতায় নতুন উন্মেষের কোনও সম্ভাবনা না দেখে শান্তিনিকেতনে তিনি নতুনভাবে কাজ শুরু করার পরিকল্পনা নেন। ১৯১৯ সালে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা করেন। বিশ্বভারতীর অঙ্গ হিসেবে অন্যান্য জ্ঞান চর্চার সঙ্গে চিত্র সংগীত ইত্যাদি অন্যান্য কলাবিদ্যাকেও অন্তর্ভুক্ত করেন। ১৯১৯ সালে ‘কলাভবন’ও প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯২১ থেকে কলাভবনের দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে নন্দলালের উপর অর্পিত হয়। চিত্রকলার ভারতীয় আধুনিকতার নতুন উন্মীলন শুরু হল এখান থেকে। নন্দলাল হলেন তার প্রধান কাণ্ডারী।

রবীন্দ্রনাথের সংস্পর্শে এসে নন্দলালের বিশ্বদৃষ্টি প্রসারিত হয়েছে ক্রমশ। কলকাতায় যে নন্দলাল ধর্ম, পুরাণ ও আধ্যাত্মিকতার কল্পলোকে স্বদেশকে দেখতেন, শান্তিনিকেতনে এসে তাঁর সেই স্বদেশ প্রসারিত হল দেশের বাস্তব মানুষের মধ্যে, বাংলার বিস্তৃত প্রকৃতির মধ্যে এবং পরবর্তী কালে বিস্তৃত লৌকিক উৎসের মধ্যে। তাঁর সেই দৃপ্ত ধ্রুপদি রেখার মধ্যে সংহত হল প্রবহমান জীবনের প্রজ্ঞা। চীন ও জাপানের চিত্ররীতির নানা আঙ্গিককে আত্মস্থ করে প্রাচ্য চেতনার এক স্বতন্ত্র প্রত্যয় গড়ে তুলতে চাইলেন তিনি। আবার খুব সন্তর্পণে একটা পর্যায়ে তাঁর ছবিতে আত্মীকৃত হল পাশ্চাত্য আধুনিকতার কিছু বৈশিষ্ট্যও। তাঁর কিছু কিছু নিসর্গচিত্রে স্পষ্টভাবে শনাক্ত করা যায় প্রতিচ্ছায়াবাদ বা ইম্প্রেশনিজমের ছায়া। সেজন্যই গঠনিকতার নানা অনুযজ্ঞাও ভেসে ওঠে কখনও কখনও। সচেতনভাবে না হলেও বিস্তৃত ‘ক্রিয়েটিভ সার্কিট’-এর সূত্রে বিশ্বের নানা উত্তরাধিকার তাঁর ছবিতে এসেছে। তিনি তাকে

তাঁর স্বদেশচেতনার মধ্য দিয়ে পরিশ্রুত করে, নিজের আঙ্গিকে মিলিয়ে দিয়েছেন। প্রাচ্য নিরপেক্ষ পাশ্চাত্যকে কখনও প্রগাঢ় হতে দেন নি। বিশ্বায়নের এক স্বতন্ত্র স্বরূপ তিনি গড়ে তুলতে চেয়েছেন।

বিশ্বভারতীতে রবীন্দ্রনাথের মূল পরিকল্পনা ছিল সমগ্র বিশ্বের জ্ঞানকে এক জায়গায় সংহত করা। ‘যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্’। অন্যান্য বিষয়ের মতো শিল্পকলাতেও সারা পৃথিবীর জ্ঞানভাণ্ডারকে এখানে একত্রিত করেছেন। বহু গুণী শিল্পী ও পণ্ডিতকে নিয়ে এসেছেন অধ্যাপনার জন্য। গ্রন্থাগারকে সমৃদ্ধ করেছেন শিল্পবিষয়ে একেবারে আধুনিক গ্রন্থের সমাহারে। ১৯২২ সালে প্রখ্যাত শিল্পতাত্ত্বিক স্টেলা ক্রামরিশ এখানে ইউরোপের চিত্রকলার ইতিহাস নিয়ে বিজ্ঞত বক্তৃতা করেন। আধুনিকতার ইতিহাসে কিউবিজম এবং ডাডাইজম পর্যন্ত তিনি আলোচনা করেন। এর আগে আমাদের দেশে অন্য কোথাও আধুনিকতার ইতিহাস এভাবে আলোচিত হয় নি।

বিশ্বভারতীতে এভাবেই বিশ্বায়নের একটা পরিস্থিতি তৈরি হয়ে উঠেছিল ১৯২৩-২৪ সালের মধ্যে। নন্দলাল ও তাঁর অন্যান্য ছাত্র বা অনুসরণকারীরা এই পরিবেশের মধ্যে শিল্পচর্চা করেছিলেন। নন্দলাল তাঁর নিজের স্বদেশচেতনার ভিত্তিতেই এই বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার মুখোমুখি হয়েছেন। তাঁর নিজের ছবিতে কোনও বৈপ্লবিক পরিবর্তন না এলেও বিশ্বায়নের হাওয়ায় তা অনেক জঁজাম, অনেক প্রাণময় থেকেছে। এরই মধ্যে ১৯২৪ সাল থেকে রবীন্দ্রনাথ নিজে শুরু করেছেন চিত্রচর্চা। কবিতার পাণ্ডুলিপি কাটাকুটির মধ্য দিয়ে যে চর্চার সূচনা, কয়েক বছরের মধ্যেই তা তাঁর সমগ্র ধ্যান আকৃষ্ট করেছে। ভারতীয় আধুনিকতায় বিশ্বায়নের এক নতুন দরজা খুলে দিল তাঁর ছবি। আদিমতা ও পাশ্চাত্য অভিব্যক্তিবাদকে তিনি তাঁর নিজস্ব সংবিতের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে আধুনিকতার এক নতুন মূল্যবোধ গড়ে তুললেন। যাকে বলা যেতে পারে আধুনিকতার তৃতীয় অভিজ্ঞান। আধুনিকতা যখন স্বদেশ বিশ্বকে একাত্ম করে, আধুনিকতা যখন ব্যক্তির অন্তর্লোকের সংস্কাভ ও প্রশ্নাকুল সংশয়কে উন্মীলিত করে, তখন সেই আধুনিকতা জীবনের এক নতুন মূল্যমান গড়ে তোলে, জীবনকে নতুন মাত্রায় বিশ্লেষিত করতে চায়। আমাদের চিত্রকলায় সে অর্থেই রবীন্দ্রনাথকে প্রথম আধুনিক বলা হয়।

শান্তিনিকেতনে বিশ্বায়নের এরকম পরিস্থিতিতে দুজন শিল্পী এসে যোগ দেন, পরবর্তী আধুনিকতার বিস্তারে যাঁদের অবদান হবে বহুব্যাপ্ত। সেই দুই শিল্পী হলেন : বিনোদবিহারী ও রামকিঙ্কর।

তিন

শান্তিনিকেতন : বিনোদবিহারী ও রামকিঙ্কর

বিনোদবিহারী কলাভবনে ছাত্র হিসেবে যোগ দেন ১৯১৯ সালে। কলাভবনের একেবারে প্রথম পর্যায়ের ছাত্রদের অন্যতম তিনি। রামকিঙ্কর কলাভবনে শিখতে আসেন ১৯২৫ সালে। তখন তাঁর বয়স ১৯ বছর। বাঁকুড়ার গ্রামের অতি দরিদ্র পরিবারের ছেলে তিনি। চিত্র ও ভাস্কর্যে তাঁর ছিল জন্মগত প্রতিভা। পড়াশুনোয় তত মনযোগী ছিলেন না। কিন্তু ছবি আঁকার

শৈশব থেকেই তাঁর সমগ্র ধ্যান সমর্পিত ছিল। তাঁদের ঘরে ছিল রাধা-কৃষ্ণের যুগল মূর্তির ছবি। এই ছবি দেখে আঁকার চেটায় তাঁর ছবিতে প্রথম হাতেখড়ি। ঘটনাটি অন্য তাৎপর্য বহন করে। স্বদেশের পুরানকল্পের ভিতর দিয়ে শিল্পের অনুশীলনে তাঁর প্রবেশ। এই ঐতিহ্য তাঁর ভিতর গভীরে প্রাণিত থেকেছে। এই ভিত্তির উপরেই পরবর্তীকালে তিনি বিশ্বকে প্রসারিত করেছেন। আবিষ্কৃত আধুনিকতাকে গ্রহণ করেছেন। কৃষ্ণ তাঁর ছবির পরিণত পর্যায়ে অনেকবার এসেছে। কৃষ্ণের জন্ম নিয়ে তিনি যে ছবি আঁকেছেন তাতে পুরানকল্পের ভিতর আধুনিকতার সংঘাত ও সম্ভাসকে মিলিয়ে দিয়েছেন। নন্দলালের পার্থসারথি বা কৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর কৃষ্ণের ব্যবধান অনেক। যদিও একই উৎস থেকে তা উঠে এসেছে। দুজনের কৃষ্ণের রূপায়ণের মধ্য দিয়ে আধুনিকতার দুটি প্রান্তকে চিনে নিতে পারি আমরা।

স্বাভাবিকতার রীতি ও চর্চাতেও তাঁর হাত পেকেছিল শৈশবেই। স্বদেশি আন্দোলনের নানা কার্যক্রমে বিভিন্ন মনীষীর প্রতিকৃতি আঁকে হাত পাকিয়েছেন। বড়ো বড়ো চিত্রপট নাটকের দৃশ্যাবলি আঁকেছেন। নাটকের সঙ্গেও তাঁর যোগ শৈশব থেকেই। ছবি ও ভাস্কর্যের পাশাপাশি নাটকও তাঁর সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার অন্যতম অঙ্গ ছিল সারা জীবনই। স্বাভাবিকতার রীতিতে যথেষ্ট অধিকার থাকলেও শৈশবে বা কৈশোরে তাঁর মানস প্রবণতায় স্বদেশ চেতনাই প্রাধান্য পেয়েছে। তাঁর এক বন্ধু তাঁকে একবার রাফায়েলের ম্যাডোনার ছবি দিয়ে সেটি দেখে একটি প্রতিলিপি তৈরি করে দিতে বলেছিলেন। তিনি ম্যাডোনা না আঁকে আঁকেছিলেন নির্বাসিতা সীতার ছবি। তাঁর বন্ধু এতে চটেছিলেন। সেই ছবি পরে কোনও একটা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। শান্তিনিকেতনে আসার আগে ছবিতে ও জীবনে এই স্বদেশিকতার পরিমন্ডলের মধ্যেই তিনি বড়ো হয়েছেন।

ভাস্কর্যও তিনি শিখেছেন তাঁর নিজের পরিবেশ থেকেই খুব স্বাভাবিক প্রবণতায়। বৃষ্টির জলে ধুয়ে যাওয়া নীল মাটি হাতে তুলে নিয়েছিলেন শৈশবে একদিন। সেই মাটি হাতের কারুকাজে পরিণত হল ভাস্কর্যে। বাঁকুড়ার মাটির এই নীল রং-ও তাঁর জীবনে প্রতীকী তাৎপর্য নিয়ে এসেছে। কৃষ্ণের রঙের সঙ্গে মিলে গেছে তাঁর চেতনার গভীরে। পরিণত বয়সে দিল্লির রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 'যক্ষ-যক্ষী' মূর্তির জন্য যখন পাথর খুঁজছিলেন, তখন একটি নীল পাহাড় তাঁকে এভাবেই আকৃষ্ট করেছিল। সেই পাহাড় কেটে পাথর নিয়ে গিয়ে তৈরি করেছিলেন সেই মূর্তি। স্বদেশের এই পুরাণকল্প প্রতীক হিসেবে তাঁর চেতনার ভিতর ছিল চিরদিন। সেই ভিত্তির উপরই বিশ্ব এসে মিশেছে। তাঁর আধুনিকতার প্রক্রিয়া, আধুনিকতা সজ্জাত বিশ্বায়নের প্রক্রিয়া বুঝতে এই বিষয়টি আমাদের মনে রাখতে হয়। ছেলেবেলায় ভাদুর মূর্তি তৈরি করা ছিল তাঁর একটি প্রিয় খেলা। গ্রামের মেয়েরা ভাদুর পূজো করে সেই মূর্তি গন্ধেশ্বরী নদীতে বিসর্জন দিতেন। রামকিঙ্করকে দিয়ে তাঁরা করিয়ে নিতেন সেই ভাদুর মূর্তি। লৌকিকের সঙ্গে এই সংযোগও তাঁর পরবর্তী শিল্পচেতনাকে প্রভাবিত করেছে। তাঁর গ্রামে অনন্ত জ্যাঠার আখড়ায় দুর্গা প্রতিমা তৈরিতে তালিম নিয়েছেন। এই অনন্ত জ্যাঠাই তাঁর ভাস্কর্যের প্রথম গুরু। তাঁর তেলরং-এর প্রকরণ শেখার কাহিনিটিও মজার। তরুণ বয়সে কলকাতায় এসেছিলেন কোনও কাজে। রঙের দোকানে গিয়ে জানতে চেয়েছেন তেলরং ব্যবহারের পদ্ধতি। দোকানি তাঁকে বলেছেন টিউব থেকে রং নিয়ে তিসির তেলে মিশিয়ে তুলি দিয়ে চিত্রপটে লাগালেই হয়ে গেল তেলরঙের প্রয়োগ। গুটুকুতেই তারও শেখা হয়ে গেল তেলরং।

এরকম সারল্যময় দরিদ্র জীবন থেকে একদিন তিনি শান্তিনিকেতনে এসে পড়লেন। প্রবাসী পত্রিকার সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় বাঁকুড়ার ওই অঞ্চলের মানুষ। স্বদেশি আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছবি আঁকার সূত্রে রামকিঙ্করের প্রতিভাকে তিনি আবিষ্কার করেন। তাঁর চিঠি নিয়ে রামকিঙ্করকে দেখা করতে বলেন শান্তিনিকেতনে নন্দলাল বসুর সঙ্গে। গ্রামেব সেই কিশোর খুঁজতে খুঁজতে একদিন সেই অচেনা জায়গায় এসে পড়ল। তাঁর গভীর নিমগ্ন স্বদেশচেতনা বিশ্বের আলোয় উদ্ভাসিত হল। তাঁর চেতনার ভিতরে স্বদেশ ও বিশ্বের সমন্বয় প্রক্রিয়া চলতে থাকল এরপর থেকে।

শান্তিনিকেতন রামকিঙ্করের কাছে বিশ্বের দরজা খুলে দিয়েছিল। সেটাই ছিল সেখানে তাঁর শ্রেষ্ঠ পাওয়া। কলাভবনে শিক্ষার পদ্ধতিতে কোনও বাধ্যবাধকতা ছিল না। বিশ্বভারতীতে রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ অবদান এই স্বাধীনতার আবহমণ্ডল গড়ে তোলা। প্রত্যেকে নিজের মতো কাজ করবে। কোনও কিছু চাপিয়ে দেওয়া হবে না কাবুর উপর। নন্দলালও হাতে ধরে কিছু শেখাতেন না। শুধু তৈরি করে দিতেন শেখার পরিবেশ। প্রকৃতির সঙ্গে যোগ ঘটিয়ে দিতেন। বুঝিয়ে দিতেন প্রকৃতিই শ্রেষ্ঠ শিক্ষক। তাঁর দুই প্রধান ছাত্র—বিনোদবিহারী ও রামকিঙ্কর শান্তিনিকেতন থেকে শ্রেষ্ঠ যে সম্পদ অর্জন করেছেন, তা সম্ভবত এই প্রকৃতিমগ্নতা।

দুজনেই অবশ্য প্রকৃতির প্রতি নিবিড় মুগ্ধতা নিয়েই এসেছিলেন এখানে। দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ, তাই বিনোদবিহারীর স্কুলের পড়াশুনো খুব বেশি দূর এগোয় নি। নিমগ্ন এক একাকিত্ব ঘিরে ছিল তাঁকে। সেই একাকিত্ব তাঁকে তন্ময়তা দিয়েছে। তন্ময়তা থেকে একদিকে অর্জন করেছেন পড়াশুনোর প্রতি গভীর আগ্রহ। যা তাঁকে শিল্প বিষয়ে এবং জীবন সম্পর্কে অসামান্য পাকিত্ব দিয়েছে। ভারতীয় শিল্পশিক্ষায় শিল্প ইতিহাস বিষয়ে পঠন পাঠনে কলাভবনের রয়েছে অগ্রণী ভূমিকা। এ বিষয়ে অধ্যাপনায় প্রধান একজন পথিকৃৎ হয়ে উঠেছিলেন বিনোদবিহারী। অন্যদিকে তাঁর অন্তর্মুখীনতা তাঁর মধ্যে জাগিয়েছিল গভীর প্রকৃতিমগ্নতা। প্রকৃতির প্রতি নিবিড় ভালোবাসা। এই দুই প্রেম, জ্ঞানের প্রতি আর প্রকৃতির সৌন্দর্যের প্রতি, তাঁর আত্মমগ্নতায় জারিত হয়েছে। তারপর হয়ে উঠেছে তাঁর সৃষ্টির উৎস। তিনি বলতেন, দিগন্ত বিস্তৃত নির্জন খোয়াইয়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা নিঃসঙ্গ। একটি তাল গাছ, এই হল তাঁর আত্মস্বরূপের প্রতীক। এই আত্মমগ্ন নির্জনতা থেকে বিনোদবিহারী প্রকৃতি, জীবন ও সমাজকে দেখেছেন। সেই নির্জন প্রেম, ধ্রুপদি প্রশান্তি যার অন্যতম বৈশিষ্ট্য, সমৃদ্ধ রূপ পেয়েছে তাঁর ছবিতে।

চল্লিশের আধুনিকতার ও রূপের বিশ্বায়ন ভাবনার প্রধান দুই পথিকৃৎ বিনোদবিহারী ও রামকিঙ্কর, পরিণত বয়সের দীর্ঘ সময় একই প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক আবহমণ্ডলের মধ্যে কাটালেও, খুব স্বাভাবিক কারণেই তাঁদের ব্যক্তিত্ব ও প্রকাশভঙ্গি ছিল একেবারেই ভিন্নমুখি, একেবারেই স্বতন্ত্র। প্রকৃতি-মগ্নতা রামকিঙ্করেরও মননের প্রধান বৈশিষ্ট্য। বিনোদবিহারীর মতো তিনিও সেই মগ্নতা অর্জন করেছেন শৈশব ও কৈশোরের জীবনচর্যার মধ্য দিয়ে। গ্রামবাংলার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসে। কিন্তু রামকিঙ্করের শৈশব ও কৈশোর জীবনেও যে উত্তাল আবেগ তাঁর সমস্ত অনুভূতিকে নিয়ন্ত্রণ করেছে, সেই আবেগই তাঁর প্রেমকেও আলোড়িত করেছে। তাঁর নারীপ্রেম ও প্রকৃতিপ্রেম, উভয় ক্ষেত্রেই একথা সত্য। গভীর সংবেদন ও

স্পর্শময়তা দিয়ে তিনি প্রকৃতিকেও বুঝতে চেয়েছেন। তাঁর সম্পর্কে এক সত্য ঘটনা বর্ণনা করেছিলেন তাঁর প্রতিবেশী হৃষীকেশ চন্দ। এক জ্যোৎস্না রাতে শ্রীনিকেতন থেকে সাইকেলে শান্তিনিকেতন ফিরছিলেন তিনি। হঠাৎ দেখলেন পথের ধারে একটি পাকুড় গাছের তলায় রাস্তার উপর হামা দিয়ে চলেছেন একজন লোক। কাছে গিয়ে দেখলেন মানুষটি আর কেউ নন, রামকিঙ্কর। জ্যোৎস্নায় আলোছায়ায় যে আলপনা গাছের তলায়, সেটাই নিবিড়ভাবে উপভোগ করতে চাইছিলেন নত হয়ে ভূমি সংস্পর্শে নিজেকে স্থাপন করে। রামকিঙ্করের আবেগ সম্পৃক্ত ভালবাসার স্পর্শময়তার এই এক দৃষ্টান্ত।

এই আবেগ রামকিঙ্করকে সারা জীবন চালিত করেছে। এই আবেগ দিয়েই তিনি শান্তিনিকেতনের মননকে গ্রহণ করেছেন যেমন, তেমননি নিজের মধ্যে মিলিয়েছেন শান্তিনিকেতন উৎসারিত বিশ্বের প্রবাহকে। রামকিঙ্কর ও বিনোদবিহারী এই দুই শিল্পীর বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার বা বিশ্বকে আত্মস্থ করার প্রক্রিয়ার ভিন্নতার মধ্য দিয়ে আমরা চল্লিশের আধুনিকতার দুটি অভিমুখকে অনুভব করতে পারি। এজন্যই এ লেখায় বিনোদবিহারীর কথাও মাঝে মাঝে আসছে।

বিশ ও তিরিশের দশকে পাশ্চাত্য আধুনিকতাকে শান্তিনিকেতনই প্রথম বুঝতে চেষ্টা করেছিল। শুধু নন্দলালের শিক্ষণ প্রণালী থেকে এটা হয় নি। এর পিছনে রবীন্দ্রনাথের অবদান ছিল প্রগাঢ়। স্টেলা ক্রামরিশ যখন বঙ্কতা দিয়েছিলেন এখানে ১৯২৬ সালে, রামকিঙ্কর তখনও এখানে এসে পৌঁছান নি। বিনোদবিহারী শুনেছিলেন সেই আলোচনা। কিন্তু রামকিঙ্কর পাশ্চাত্য আধুনিকতাকে অধ্যয়ন করেছেন কলাভবনের গ্রন্থাগারের বই থেকে। তাঁর মানসপ্রবণতায় আদিমতার দিকে একটা স্বাভাবিক ঝোঁক ছিল। বাঁকুড়ায় লৌকিক জীবন দেখেছেন। শান্তিনিকেতনে এসে বীরভূমের চারপাশে সাঁওতাল অধিবাসীদের জীবনচর্যা লক্ষ করেছেন দীর্ঘদিন। এই আদিমতার সূত্রেই কিউবিজমের প্রতি তাঁর একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ হয়তো গড়ে উঠেছিল শান্তিনিকেতনে অধ্যয়ন পূর্বে। কিউবিজমের গাঠনিকতা ও ত্রিমাত্রিক স্পর্শময়তার সঙ্গে এই যোগ তাঁর নিজের অস্তিত্ব থেকেই হয়তো উঠে এসেছিল।

কাজেই তিনি যে নিসর্গ ঐঁকেছেন, তা গাঠনিক, বিশ্লেষণাত্মক। সেই গাঠনিকতার ভিতর দিয়েই তিনি প্রকৃতির ছন্দকে উন্মীলিত করেছেন। আপাতভাবে যাকে পাশ্চাত্য উৎস থেকে আহৃত মনে হয়, তাকে তিনি মিলিয়ে দিতে পেরেছেন এখানকার জল হাওয়ার ছন্দের সঙ্গে। বিনোদবিহারীর ছবিতে রেখার সাবলীল গতির অনুষ্ণে ছন্দ গড়ে ওঠে। তা অনেকটাই সুরেলা, সংগীতময়। নন্দলালের শিক্ষাধারায় যে ধ্রুপদি চেতনার বিস্তার ছিল, তাকে তিনি আত্মস্থ করেছেন। কিন্তু সেখানে আটকে থাকেন নি। তাকে একেবারে রূপান্তরিত করে নিয়েছেন চিন ও জাপানের শিল্পনন্দনের প্রশান্ত অন্তর্মুখীনতা ও ক্যালিগ্রাফির রৈখিক ছন্দের সঙ্গে মিলিয়ে। পাশ্চাত্য আধুনিকতার ইম্প্রেশনিজম বা পোস্ট-ইম্প্রেশনিজমের সঙ্গে তাঁর মানসপ্রবণতাকে তিনি হয়তো কিছুটা মেলাতে পারেন, কিন্তু সেখানের গাঠনিকতা বা কিউবিজমের সঙ্গে তিনি কখনও একাত্ম হতে পারেন নি। রামকিঙ্করের রূপচেতনার সঙ্গে এখানেই তাঁর পার্থক্য।

অথচ রামকিঙ্কর কখনই নিজেকে পাশ্চাত্য প্রভাবিত বলে মনে করেন নি। তাঁর ছবিতে আপাতভাবে যেটাকে কিউবিজম প্রভাবিত গাঠনিকতা বলে মনে হয়, তাঁর মতে সেটা

এসেছে তাঁর ভাস্কর্যের অভিজ্ঞতা থেকে। তিনি বলেছেন, ভাস্কর্যের ভিতর বস্তুর বা অবয়বের তিনটি মাত্রাই স্পর্শগ্রাহ্যভাবে দৃশ্যমান। বিভিন্ন ভল্ল যেখানে পরস্পরের সঙ্গে মেলে, সেখানে কৌণিকতার সৃষ্টি হয়। এই কৌণিকতাই গাঠনিকতার বোধ জাগায়। ছবিতে যদি এই বিভিন্ন তলের অনুভবকে মিলিয়ে না দিয়ে বা অন্তর্হিত না করে জাগিয়ে রাখা যায়, তাহলেই ছবি হয়ে ওঠে গাঠনিক। তাতে ত্রিমাত্রার বোধ জাগে। বলিষ্ঠ ধজুতা সঞ্চারিত হয়। সেই দৃঢ়বদ্ধ গাঠনিক ধজুতার ভিতর থেকে সংক্ষুব্ধতা জেগে ওঠে। প্রতিবাদী চেতনা পরিস্ফুট হতে থাকে। যে কোনও আদিম শিল্পের ভিতর আমরা বুপের এই সংক্ষুব্ধতাই লক্ষ্য করি। পাশ্চাত্য আধুনিকতা আদিমতা থেকেই কিউবিজমের বিশ্লেষণাত্মক গাঠনিকতায় পৌঁছেছে। রামকিঙ্কর কিউবিজম অধ্যয়ন করে তাকে নিজের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়েছেন। তাঁর চার পাশে ভারতীয় জীবনধারার মধ্যেই যে আদিমতার প্রকাশ, তাকে তিনি আধুনিকতায় বিশ্লেষণ করেছেন।

চার

বিশ্বায়িত রূপচেতনা : চন্দ্রিশের অভিজ্ঞতা

শান্তিনিকেতন বিশ্বের অভিজ্ঞতাকে এভাবেই আত্মস্থ করতে চেয়েছে। বুপের বিশ্বায়নের এই এক নিরিখ সফলভাবে উঠে এসেছে সেখান থেকে। রবীন্দ্রনাথের দেশাত্মবোধ ও বিশ্ববোধের সম্মিলন সম্পর্কিত যে ভাবনা, সার্থক প্রয়োগ আমরা দেখি তাঁর নিজের ছবিতে, তারও বুপপুঞ্জের গহন অন্তর্মুখীনতার উৎস আদিমতা। জার্মান এক্সপ্রেশনিজমের সঙ্গে এর যা মিল, তা তো সেই আদিমতার সূত্র ধরেই। নন্দলাল, বিনোদবিহারী বা রামকিঙ্কর— এই তিন শিল্পীর কেউই রাবীন্দ্রিক অভিব্যক্তিবাদের সঙ্গে সাযুজ্য অনুভব করেন নি। কিন্তু বুপের বিশ্বায়ন প্রক্রিয়াকে তিনজনে তিনটি স্বতন্ত্র অভিমুখে নিয়ে গেছেন।

নন্দলাল তাঁর ঔপনিবেশিকতাবিরোধী দেশাত্মবোধের সঙ্গে কখনও আপস করেন নি। পাশ্চাত্যের ছায়াপাত সম্পর্কে সব সময় সন্দ্বিষ্ট থেকেছেন। সেজন্যই শেষ জীবনেও রামকিঙ্কর সম্পর্কে তাঁর সংশয় দূর হয় নি। পরিপূর্ণ সমর্থনের মধ্যেও সূক্ষ্ম সংশয়ের কাঁটা থেকে গেছে। অথচ তিনি নিজের আধুনিকতার বিশ্বপ্রবাহকে এড়িয়ে থাকতে পারেন নি। সেজানের সূক্ষ্ম ছায়াও তাঁর ছবিতে কখনও কখনও জেগে উঠেছে। প্রকৃত বিশ্বায়নের ধর্মই এটা। খুব সহজ ছন্দে বিশ্ব এসে নিজের মধ্যে মিলে যায়।

রামকিঙ্করের মধ্যেও দেশাত্মবোধের কোনও অভাব ছিল না। স্বদেশি আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। সেই আন্দোলন থেকেই তিনি উঠে এসেছেন। কিন্তু সেই দেশাত্মবোধ তাঁকে কোনও সংকীর্ণ স্বদেশিকতায় আবদ্ধ করতে পারে নি। তিনি মুক্ত মনে সব কিছুই গ্রহণ করতে পেরেছেন। গ্রহণ করে নিজের দেশাত্মবোধে মিলিয়ে নিয়েছেন। তেলরঞ্জের ব্যবহার সম্পর্কে সুন্দর যুক্তি ছিল তাঁর। বলতেন তিসির তেল তো আমাদের দেশেই তৈরি হয়। তাহলে তেলরঞ্জকে বিদেশি মাধ্যম বলা হবে কেন? মাধ্যমের যে কোনও স্বদেশ বিদেশ নেই, এটা তিনি উপলব্ধি করতেন। ছবি বা ভাস্কর্যের ভিতর দিয়ে একজন শিল্পী প্রকাশ করেন তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা, নিজের বিশ্বদৃষ্টি। সেটা যদি ঠিকভাবে করতে হয়, তাহলে সমস্ত

আঙ্গিককে, সমস্ত প্রকাশভঙ্গিকে নিজের জীবনচর্যার সঙ্গে মিলিয়ে নিতে হয়। তেলরং ব্যবহার করা ছাড়া রামকিঙ্করের কোনও উপায় ছিল না। কেননা তাঁর নিজের সময়ের, নিজের অভিজ্ঞতার যে জীবনকে তিনি প্রকাশ করতে চেয়েছেন, তার জটিল বুনাটকে তেলরঙেই ধরা যায় প্রকৃষ্টভাবে। শিল্পকে জীবনের সঙ্গে তাঁর মতো করে মিলিয়ে নিতে পেরেছিলেন তিনি। শিল্পী হিসেবে তাঁর সার্থকতার মূল সূত্র এটাই। বিনোদবিহারীর ব্যক্তিত্বের ধরন আলাদা। তাঁর ভিতর প্রতিফলিত সময়ের চরিত্রও আলাদা। তাই তাঁর বুপের বিন্যাসও আলাদা। তিনি প্রসারিত করেছিলেন। আধুনিক বুপচেতনার অন্য এক অভিমুখ।

চম্পিশের আধুনিকতার বিস্তারে বা বুপের বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় এখানেই তাঁদের স্বাতন্ত্র্য। বিনোদবিহারী বা রামকিঙ্কর দুজনেই চম্পিশের মূল প্রবাহের শিল্পীদের থেকে বয়সের দিক থেকে একটু অগ্রবর্তী। তিরিশের দশকেই তাঁরা তাঁদের বুপের নিজস্বতায় পৌঁছেছেন। এবং তাদের গুরুত্বপূর্ণ কাজের অনেকগুলি করে ফেলেছেন। চম্পিশের শিল্পীদের জন্য তাঁরা আধুনিকতার এবং বুপের বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার একটি মডেল তৈরি করতে পেরেছেন। কিন্তু চম্পিশের নবীন শিল্পীরা তখন এর গুরুত্ব খুব একটা গ্রহণ করতে পারে নি। অথবা এই আদর্শকে গ্রহণ করার মতো সম্পূর্ণ প্রস্তুতিও তাঁদের ছিল না। তাঁরা তাঁদের বাস্তবতা অনুযায়ী বা মনন অনুযায়ী তখন সন্ধান করে গেছেন। তাতে প্রথম পর্বে কিছু সমস্যা দেখা দিয়েছিল। বিভিন্ন উৎসের আত্মীকরণের পথে কিছু অসমর্থিত স্বপ্নের সৃষ্টি হয়েছিল। চম্পিশের আত্ম আবিষ্কার প্রক্রিয়াকে বুঝতে সেই স্বপ্নের বা অসমর্থয়ের চরিত্র বোঝা দরকার।

একটু পিছিয়ে গিয়ে দেখতে পারি আমরা। নব্য ভারতীয় ঘরানার অন্তর্নিহিত সমস্যার কথা বলেছি আগে। যে সমস্যার নিরসনের একটা উপায় হিসেবে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীর সঙ্গে ‘কলাভবন’ শুরু করেছিলেন। কাছাকাছি সময়ে বা কিছু পরে আরও কয়েকজন শিল্পী আধুনিকতার বিকল্প পথের সন্ধান করছিলেন। গগনেন্দ্রনাথ নব্য-ভারতীয় ঘরানার মধ্যে থেকেও বুপভাবনায় তথাকথিত স্বাদেশিকতাকে প্রশ্ন দেন নি। পাশ্চাত্য আধুনিকতা নিয়ে তিনি নানাভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন। কিউবিজমের গাঠনিকতাকে তিনি নিজের পারিপার্শ্বিক বাস্তবতা ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারেন। যামিনী রায় পোস্ট ইম্প্রেশনিজমের আঙ্গিককে আত্মস্থ করে দেশীয় লৌকিককে তার স্বর্গে নতুনভাবে উদ্ভাসিত করেন। বিশ্বায়নের অসামান্য দীপ্ত বুপরেখা গড়ে তুলতে পেরেছিলেন তিনি। রবীন্দ্রনাথ তো ছিলেনই। আরও ছিলেন সুনয়নী দেবী ও অমৃতা শের গিল। চম্পিশের শিল্পীদের সামনে তাঁরাই ছিলেন বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার কতগুলি মডেল। সুনয়নী দেবী অবশ্য বিদেশের উৎস থেকে কিছু গ্রহণ করেন নি। তবে তিনিই প্রথম লৌকিকের গভীরে অবগাহন করেছিলেন। তাঁর দৃষ্টান্ত যামিনী রায়কেও অনুপ্রাণিত করেছিল।

চম্পিশের দশকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে সমাজ ও রাজনীতিতে যে আলোড়ন এসেছিল, তাতে নব্য-ভারতীয় ধারার জাতীয়তাবাদী বুপভাবনা আর তত প্রাসঙ্গিক থাকল না। প্রয়োজন হল আঙ্গিকের নতুন বিন্যাসের। এর ফলে সংঘবদ্ধ শিল্প আন্দোলন জেগে উঠল। কলকাতায় ‘ক্যালকাটা গ্রুপ’ তৈরি হল ১৯৪৩-এ। ১৯৪৭-এ বস্বেতে ‘বস্বে প্রগ্রেসিভ গ্রুপ’। অন্যান্য অঞ্চলে তৈরি হয়েছিল আরও কয়েকটি দল। সময়ের উপযোগী নতুন ভাষার সন্ধানে তাঁরা পাশ্চাত্য আধুনিকতাকে ব্যবহার করতে চাইলেন। তখন যুদ্ধের পরিমণ্ডলে

ইউরোপ থেকে অনেক সৈনিক আসছেন এদেশে। তাঁরা সঙ্গে করে আসছেন অনেক বই ও ছবির অ্যালবাম। বড়ো বড়ো শহরে সেগুলি তখন ছড়িয়ে পড়ছে। এখানকার অনেক তরুণ শিল্পী তা থেকে পাশ্চাত্য আধুনিকতাকে আবিষ্কার করছেন। পরবর্তী কালে অনেকে ইউরোপে গেছেনও শিল্পশিক্ষার উদ্দেশ্যে। পাশ্চাত্য আধুনিকতার আঙ্গিককে তাঁরা ব্যবহার করতে শুরু করলেন এখানকার বাস্তবতাকে পরিস্ফুট করার উদ্দেশ্যে। এর সঙ্গে তাঁরা মেলাতে চেষ্টা করলেন দেশীয় লৌকিকের বিভিন্ন উৎসকে।

এই বিভিন্ন আঙ্গিক পদ্ধতি সমন্বিত হতে, শিল্পীর নিজের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিশতে সময় লেগেছে। চম্পিশের শিল্পীদের প্রথম পর্যায়ের ছবিতে এই অসমন্বিত দ্বন্দ্ব অনেক ক্ষেত্রেই দুর্বলতার সৃষ্টি করেছে। পরবর্তী কালে তা নিয়ে সমালোচনাও হয়েছে অনেক। এখানেই রামকিঙ্করের অবদান স্মরণীয়। তখনকার স্বাদেশিকতার পরিমণ্ডলে এবং নন্দলালের ছত্রছায়ায় থেকেও তিনি উপলব্ধি করেছিলেন পাশ্চাত্য আধুনিকতাকে সহজভাবে মিলিয়ে নিতে না পারলে আমাদের আধুনিকতার মুক্তি নেই, এই সমস্বয়ের কাজটি তাঁর পক্ষে সহজ হয়েছিল, কেননা দেশের মাটির সঙ্গে ও বাস্তবতার সঙ্গে তাঁর সংযোগ ছিল নিবিড় এবং শাস্তিনিকেতনের বিশ্বায়িত আবহমণ্ডলে বিশ্বের সঙ্গেও একাত্মতা গড়ে তুলতে তাঁর কোনও অসুবিধা হয় নি। চম্পিশের অন্যান্য অনেক শিল্পীর এই সমস্বয় প্রক্রিয়াকে স্বাভাবিক করে তুলতে সময় লেগেছিল। কিন্তু অনেকেই শেষ পর্যন্ত সফল হয়েছিলেন।

চম্পিশের অনেক শিল্পীরই প্রকৃত মূল্যায়ন এখন পর্যন্ত হয় নি। মকবুল ফিদা হুসেন তাঁর সারা জীবনের কাজের মধ্য দিয়ে এখন সমস্ত দেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছেন। ধ্রুপদি ভারতীয়তাকে এক সময় তিনি নতুন করে আবিষ্কার করেন। সেটা স্বাধীনতা প্রাপ্তির কিছু পরের ঘটনা। লৌকিকের সাবলীল ছন্দকে মিলিয়ে নেন তার সঙ্গে। তিনি সাযুজ্য লক্ষ করেন পাশ্চাত্য আধুনিকতার অনেক রূপরীতির। তাঁর এই সমস্বয় প্রক্রিয়া পরিপূর্ণ সফল হতে পেরেছিল ১৯৫০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে। পরিতোষ সেন প্যারিসে গিয়ে পিকোসোর দ্বারা প্রভাবিত হন। পিকাসো তথা কিউবিজমের আঙ্গিক তাঁর রূপরীতিকে দীর্ঘদিন প্রভাবিত করেছে। কিন্তু তাকে নিজের করে নিতে পেরেছেন যখন দেশীয় লৌকিক থেকে রসদ সংগ্রহ করে তিনি প্রবহমান জীবনকে রূপ দিতে পেরেছেন। সেই স্বকীয়তায় পৌঁছতে পেরেছেন তিনি ১৯৭০-এর দশকের কাছাকাছি সময়ে। নীরদ মজুমদারের অবদান নিয়ে আজকের সাধারণ দর্শকের অনেকেরই সামগ্রিক কোনও ধারণা নেই। বিস্তৃত কোনও গবেষণা হয় নি এখনও তাঁর কাজ নিয়ে। তেমনি আরও একজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শিল্পীর কাজ এখনও সাধারণের দৃষ্টির অন্তরালে রয়ে গেছে। তিনি সুনীল মাধব সেন। বিশ্বায়িত সমস্বয় প্রক্রিয়ায় তিনি যে গভীর অবদান রেখেছেন, এর কোনও মূল্যায়নই এখন পর্যন্ত হয় নি। এরকম অনেক অনালোকিত ক্ষেত্রে উদ্ঘাটিত করতে পারলে আমরা দেখব, এই বিশ্বায়িত রূপচেতনার বিস্তারে চম্পিশের একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। এই প্রক্রিয়ায় রামকিঙ্কর প্রধান একজন পথিকৃৎ।

পাঁচ

সমাজচেতনা ও রূপচেতনা

রামকিঙ্কর নিজের সমগ্র জীবনকে উৎসর্গীকৃত করেছিলেন শিল্পের প্রতি। অন্য কোনও

বস্তুগত সার্থকতার দিকে কখনও তাকান নি। ১৯২৫ থেকে ১৯২৯ পর্যন্ত কলাভবনে তাঁর শিক্ষানবিশি চলে। ১৯৩০-এ কলাভবনেই শিক্ষকতায় যুক্ত হন। প্রথম কিছুদিন সেই শিক্ষকতা ছিল অবৈতনিক। তারপর সাড়ে বারোটাকা করে মাইনে পেতেন মাসে। তাতেই চলে যেত তাঁর। দু-বেলা খাওয়ার খরচ হত দশ টাকা। বাকি আড়াই টাকায় সারা মাসের হাত খরচ চলত। ১৯৩১-এ কিছুদিনের জন্য আসানসোলের উষাগ্রাম মিশনারী স্কুলে শিল্পশিক্ষকের কাজ করেন। ১৯৩২-এর ডিসেম্বরে দিল্লির মডার্ন স্কুলে যোগ দেন শিল্পকলা শেখানোর কাজে। মাত্র ছ'মাস ছিলেন সেখানে। তারপর ফিরে আসেন শান্তিনিকেতনে। আর কখনও শান্তিনিকেতন ছাড়েন নি।

তাঁর সৃজনশীল শিল্পচর্চা শুরু হয়েছিল শান্তিনিকেতনে আসার আগেই। বড়ো পত্রিকায় ছাপাও হয়েছিল ছবি, শান্তিনিকেতন আসার পর পরিপূর্ণভাবে নিমগ্ন হন ছবি ও ভাস্কর্য, দুই ধারার সৃষ্টিতেই। পরবর্তীকালে নথিভুক্ত হয়েছে তাঁর যেসব ভাস্কর্য, এর মধ্যে প্রথম ১৯২৮-এর একটি প্লাস্টারের রচনা ২৫ সে.মি. উচ্চতার 'মা ও ছেলে'। ১৯২৯-এ যে ভাস্কর্যগুলি করেন তার মধ্যে 'কচ ও দেবযানী' গুরুত্বপূর্ণ। পৌরাণিক বিষয় নিয়ে অভিব্যক্তিবাদী রীতির কাজ করেছেন। বিশ্বায়িত আধুনিকতার প্রথম দৃষ্টান্ত এই রচনা। ১৯৩৯-এর সিমেন্টে করা 'মিথুন' শীর্ষক কয়েকটি রচনাতেও অব্যবহিত ভিত্তি করেই বিমূর্তায়ণ প্রক্রিয়া নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। দিল্লিতে ছিলেন যখন, তখন সেখানেও ১৯৩৩ সালে সিমেন্টে সরস্বতীর একটি রিলিফমূর্তি করেছিলেন। এসবকে ছাড়িয়ে ভাস্কর্যে বিশ্বায়িত আধুনিকতার প্রকাশে তাঁর প্রথম গুরুত্বপূর্ণ কাজ ১৯৩৫ 'কলাভবন সংলগ্ন প্রাঙ্গণে করা সিমেন্ট কংক্রিটের মূর্তি 'সুজাতা'। ভারতীয় ভাস্কর্যে আধুনিকতার সূচনা হল এই মূর্তিটির মধ্য দিয়ে।

তাঁর ভাস্কর্যের বিস্তারে আমরা হয়তো একটু পরে আবার আসব। যে প্রসঙ্গটি শুরু করেছিলাম, সেটি একটু বলে নি আগে। রামকিঙ্কর তাঁর জীবনের সমস্ত কিছুই সমর্পণ করেছিলেন শিল্পের পাদপীঠে। শিল্পের জন্য এরকম নিবেদিতপ্রাণ শিল্পী আধুনিক ভারতে আর খুব বেশি আছেন বলে, জানা নেই। বিয়ে করা বা সংসার করার কথা ভাবেন নি কখনও। ভয় পেয়েছেন, পাছে তাঁর শিল্পচর্চা ব্যাহত হয়। বলতেন, শিল্পচর্চাই তাঁর কাছে সমস্ত রকম জাগতিক সুখ বা প্রেমের বিকল্প। তাঁর ভাতুপুত্র দিবাকর বেইজের একটি লেখা থেকে জানতে পারি, তাঁর মায়ের মরণাপন্ন অবস্থায়ও মায়ের কাছে উপস্থিত থাকতে পারেন নি। কাজের তাড়া ছিল শান্তিনিকেতনে। ফিরে এসেছিলেন কাজের টানে। অথচ মা-র প্রতি তাঁর ভালোবাসা ছিল অকৃত্রিম। সংসারের কোনও কিছুই বাঁধতে পারে নি এই বাউল প্রতিম মানুষটিকে। বাস্তব জীবনে, মানবিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে আঘাত পেয়েছেন অজস্র। তাঁর প্রিয় শান্তিনিকেতনেই সেখানকার বৃধমণ্ডলীর একটা অংশের কাছে অপমানিত হয়েছেন বারবার। সমরেশ বসুর *দেখি নাই ফিরে* উপন্যাস এবং নভেন্দু সেনের *নীল মাটি জাল কাঁকর* নাটকে এর অনেক নজির দেখতে পাই। এগুলি শুধুই কল্পকাহিনি ছিল না। এই আঘাত তাঁর ভিতর যে ক্ষত তৈরি করেছিল, সেই ক্ষত হয়ে উঠেছে তাঁর সৃষ্টির উৎস। তাঁর ভিতরের এই ক্রন্দনকে না বুঝলে তাঁর সৃষ্টিপ্রবাহকে সম্পূর্ণ উপলব্ধি করা যায় না। তাঁর যে বিশ্বায়িত রূপচেতনা, এই জাগতিক কণ্টকজনিত প্রবল দুঃখের অভিঘাতও এর অন্যতম উৎস ছিল। শুধু রবীন্দ্রনাথের গানের ভিতর সাধুনা পেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথই তাঁর সৃজনের প্রধানতম প্রেরণা।

চল্লিশের আধুনিকতার প্রধান নিয়ন্ত্রক উৎস সমাজ বাস্তবতা। রূপের বিশ্বায়নের যে প্রক্রিয়া চলছিল আমাদের আধুনিকতার সূচনা পর্ব থেকে, চল্লিশে পৌঁছে তার ধরনটা পাশ্টেছে। ঔপনিবেশিকতার সঙ্গে সহাবস্থানের মধ্য দিয়েই নৈতিক প্রতিবাদ জাগানোর চেষ্টা করেছে নব্য-ভারতীয় মরানা। এখান থেকে উদ্ভাবিত যে রূপ, তাতে জাগিয়ে তুলতে চাওয়া হয়েছে প্রাচ্যের আত্মপরিচয়, সে কথা বলেছি আগে। পাশ্চাত্য অবরোধের বিরুদ্ধে সেই ছিল এক প্রতিবাদ। এই আঙ্গিকের ভিতরেও সমাজবাস্তবতা সঞ্চারিত হয়েছে ক্রমে ক্রমে। অবনীন্দ্রনাথের ‘আরব্য রজনী’ চিত্রমালা এর দৃষ্টান্ত। গগনেন্দ্রনাথ সমাজবাস্তবতাকে পরিস্ফুট করতে তাঁর কার্টুন বা ব্যঙ্গচিত্রের বিরাট প্রবাহ গড়ে তুলেছেন। গগনেন্দ্রনাথের ছবিতে পাশ্চাত্য আধুনিকতা আত্মীকরণের কথাও আমরা জেনেছি। নন্দলালও প্রয়োজনে সাড়া দিয়েছেন সমাজ বাস্তবতায়।

চল্লিশের দশকে পৌঁছে সমাজবাস্তবতাই হয়ে উঠল প্রত্যক্ষভাবে শিল্পের একটি উৎস। পরাধীনতাজনিত ঔপনিবেশিক শোষণ, স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রত্যক্ষ অভিঘাত, ১৯৪৩-এর মধ্যসূত্র, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিমণ্ডলে আন্তর্জাতিক অশান্ত পরিস্থিতি, এর পর খণ্ডিত স্বাধীনতা, দেশভাগ, সাম্প্রদায়িক হানাহানি, উদ্ভাস্ত ও গৃহহারা মানুষের হাহাকার— এ সমস্ত সামাজিক রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ শিল্পকলাকে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করেছে। শিল্পের ‘রূপ’ গড়ে উঠেছে এই বাস্তবতা থেকে। এই বাস্তবতাকে রূপ দিতেই শিল্পকে নতুন আঙ্গিক আবিস্কার করতে হয়েছে। দেশীয় ঐতিহ্যকে জারিত করে নিতে হয়েছে পাশ্চাত্য আধুনিকতার সমন্বয়ে। পোস্টইম্প্রেশনিজম, এক্সপ্রেশনিজম ও কিউবিজম-এর আঙ্গিককে আত্মীকৃত করতে হয়েছে। চল্লিশের একটি ধারায় এই সমাজবাস্তবতাই হয়ে উঠেছে প্রকাশের প্রধান ভিত্তি। বামপন্থী রাজনীতির মানবতাবাদ চল্লিশের প্রকাশের একটি শাখাকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করেছে। জয়নুল আবেদিন, চিত্তপ্রসাদ, সোমনাথ হোর, দেবব্রত মুখোপাধ্যায় প্রমুখ শিল্পী এই বাস্তবতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী চেতনাকেই রূপায়িত করেছেন আজীবন। এই সময় থেকে উৎসারিত ‘ক্ষত’-প্রত্যয় আজও সোমনাথ হোরকে তড়িত করে। আজও তাঁর ছবি বা ভাস্কর্যে মানবতার এই হাহাকার শোনা যায়। চল্লিশের প্রধান যে শাখা, অর্থাৎ ‘ক্যালকাটা গ্রুপ’, ‘বম্বে প্রগ্রেসিভ গ্রুপ’ ইত্যাদি দলের অন্তর্গত শিল্পীরাও এই সমাজবাস্তবতাতে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। তাঁদের আঙ্গিকও নির্ধারিত হয়েছে এই বাস্তবতা থেকেই। আরও মকবুল ফিদা হুসেন বা পরিতোষ সেনের কাজে এর পরিচয় রয়েছে।

এই সমাজ বাস্তবতাই চল্লিশের বিশ্বায়িত রূপচেতনাকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। এই চেতনা ও আঙ্গিকের উদ্বোধনে রামকিঙ্কর প্রধান এক পথিকৃৎ। এই সমাজ বাস্তবতা প্রকাশের উপযোগী ফর্ম প্রথম তিনিই উদ্ভাবন করেছিলেন ছবি ও ভাস্কর্য উভয় ক্ষেত্রেই। শিল্পী হিসেবে তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদান এটাই।

রামকিঙ্কর অবশ্য শিল্পের এই সমাজবাস্তবতার প্রত্যয়কে মনে রেখে কাজ করতেন না। তিনি মনে করতেন, ‘আর্ট মূলতঃ যুক্তিবিহীন, কারণহীন’ (প্রকাশ দাস সম্পাদিত *রামকিঙ্কর*, পৃ. ৬৮)। আবার বলেছেন ‘আর্ট জিনিসটা চিরদিনের ডিসস্যাটিসফ্যাকশন, অহেতুকী।’ কোন কিছু প্রপাগেট করবার কাজ তার নয়।’ (পূর্বোক্ত উৎস, পৃ. ৭২)। শিল্পকে তিনি দেখেছেন এক ‘রহস্যময় মায়’ হিসেবে। (পূর্বোক্ত উৎস, পৃ. ৬৯)। শিল্প তাঁর কাছে সব সময়ই বাস্তবতা

নিরপেক্ষ। কিন্তু বাস্তবতাতেই নিহিত তার শিকড়। রাজনীতির সঙ্গে শিল্পের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই। কিন্তু পরোক্ষ একটা গভীর এবং জটিল সম্পর্ক রয়ে গেছে। বাস্তবতা বা রাজনীতিব শিকড় থেকে উৎসারিত হয়ে শিল্পের এই যে ‘অহৈতুকী’ বা ‘রহস্যময় মায়া’-র জগতে উত্তরণ, এটাই এর প্রকাশের বিশেষত্ব। বাস্তবতা থেকে তার শুরু। অথচ বাস্তবতার সংকীর্ণ সীমায় আটকে থাকা নয়। বাস্তবতাকে আত্মস্থ করে তাকে আলোর মায়ায় উদ্ভাসিত করা, তাঁর মতে এটাই শিল্পের কাজ। চল্লিশের রূপচেতনায় তাঁর এই অনুভব মূল্যবান। এ সম্পর্কে সরাসরি তাঁর বক্তব্য আমরা শুনে নিতে পারি। তিনি বলেছিলেন এক সাক্ষাৎকারে :

কোনোদিন প্রত্যক্ষ রাজনীতি তো করিনি, তাই বুঝতে পারি না শিল্পীর কতটুকু রাজনীতি কবা উচিত আর কতটা করা উচিত নয়। আমার অনেক শিল্পী বন্ধু ছিলেন যারা অনেকেই প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই শেষ পর্যন্ত সব ছেড়ে ছুড়ে দেন। অনেকে টিকে থাকেন। আবার অনেকে শুধু ফয়দা তুলে নিয়ে বসে রইলেন। প্রত্যক্ষ রাজনীতির কথা বুঝি না— এতো দ্রুত ভোল বদলায়। কিন্তু শিল্পী হিসেবে এই সমাজের প্রতি সবসময়ই কিছু না কিছু দায়িত্ব বর্তে যায়ই। যিনি শিল্প করেন, তিনিও তো একজন মানুষ— সামাজিক জীব। এবং তাঁর শিল্পের বিষয়বস্তু তো সেই মানুষ— তাঁর সব জাগতিক এবং আত্মিক অনুভূতি। সুতরাং দাঙ্গা, দেশবিভাগ, মনস্তত্ত্ব, যুদ্ধ যেখানে যত মানুষের প্রতি অপমান, শিল্পীকে আন্দোলিত করবেই। রবীন্দ্রনাথ বারবার আন্দোলিত হয়েছেন। যে কোনো মহান শিল্পীই হবেন। শিল্পীও উচিত তাই আলোর কথা, ক্রোধ উত্তীর্ণ জগতের, জীবনের কথা ঘোষণা করা। (পূর্বোক্ত উৎস, পৃ ৬৮-৬৯)

রামকিঙ্করের ভাবনায় শিল্প এবং জীবন, সমাজবাস্তবতা ও রাজনীতির সম্পর্ক এই উক্তি থেকে স্পষ্টভাবে উঠে আছে। এই প্রত্যয় থেকেই তাঁর রূপচেতনা বিদ্যায়িত হয়েছে। স্বদেশ ও বিশ্বকে সমীকৃত করেছে।

শান্তিনিকেতনে চল্লিশেরই আর একজন শিল্পী বিনোদবিহারী এ বিষয়ে কী ভেবেছেন, তার উপর একটু আলোকপাত করা যায়। আমরা দেখব বিনোদবিহারী সমাজ রাজনীতি ও শিল্পনন্দনের দ্বৈতকে সুন্দরভাবে মিলিয়ে দিয়েছেন। তাঁর নিজের ছবিতে প্রত্যক্ষ রাজনীতির স্পর্শ নেই। কিন্তু গভীরের এক বাস্তবচেতনা আছে। চিত্রকর গ্রন্থের ‘শিল্প-জিজ্ঞাসা’ প্রবন্ধে তিনি বলেছেন : ‘শিল্পীর সর্বপ্রধান প্রয়োজন সমাজের ভাবময় চেতনাকে নিজের মধ্যে উপলব্ধি করা। অন্যদিকে পারিপার্শ্বিক অবস্থা ব্যবস্থার সঙ্গে তাল রেখে ভাষার বৈশিষ্ট্যকে গড়ে তোলা’ (পৃ. ১৪৪)

এর একটু পরেই তিনি তিনটি সূত্র দিয়েছেন, যাকে তিনি বলেছেন, ‘শিল্প সৃষ্টির মোটামুটি তিনটি পথ’। সেগুলি হল :

- ১ সমাজের ব্যাপক তাৎপর্য সম্বন্ধে চেতনা।
- ২ সমকালীন অবস্থা ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত শিল্পের আঙ্গিক।
- ৩ ধ্যান-ধারণার পথে স্বতঃস্ফূর্ত জ্ঞানের সাহায্যে শিল্পসৃষ্টি। (পৃ. ১৪৫)

এই সমন্বয়ের ভিতর দিয়েই গড়ে ওঠে সার্থক শিল্প। এই সমন্বয়ের পথ বিনোদবিহারী একভাবে দেখিয়েছেন, রামকিঙ্কর অন্যভাবে।

ছবি

‘রূপ’-এর বিশ্বায়ন ও রামকিঙ্কর

সমাজ, রাজনীতি ও শিল্পনন্দনের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বগুলিই আঙ্গিকের বিভিন্ন উৎসের পারস্পরিক দ্বন্দ্বগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে। এবং এই দ্বন্দ্বের সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে গড়ে তোলে শিল্পীর নিজস্ব আঙ্গিক বা ‘রূপ’ পদ্ধতি। রূপের বিভিন্ন উৎস সেখানে মিলেমিশে যায়। দেশের ঐতিহ্যের সঙ্গে বিদেশের ঐতিহ্য মেলে। ‘রূপ’ বিশ্বায়িত হয়। রামকিঙ্করের ভিতরের এই সমন্বয়ের বা বিশ্বায়নের এক নিজস্ব রসায়ন কাজ করেছে। এভাবেই তিনি নিজস্ব ‘রূপ’ সৃষ্টি করেছেন যা চল্লিশের আধুনিকতায় গুরুত্বপূর্ণ অভিঘাত এনেছে। সেই আধুনিকতাকে নতুন পথনির্দেশ দিয়েছে। এই বিশ্বায়িত রূপচেতনার চরিত্র বুঝতে আমরা তাঁর কয়েকটি ভাস্কর্য ও ছবি একটু নিবিষ্টভাবে পর্যবেক্ষণ করব।

১৯৩৫-এর ‘সুজাতা’ নামের রচনাটিকে আমরা বলছি আধুনিক ভারতীয় ভাস্কর্যের প্রথম পদক্ষেপ। এই ভাস্কর্যটি কোনও পৌরাণিক বা পুরাণকল্পমূলক উৎস নেই। যেমন ছিল তাঁর ১৯২৯-এর ‘কচ ও দেবযানী’ রচনাটিতে বা ‘কৃষ্ণের জন্ম’ বিষয়ক ছবিতে। একজন বিশেষ মানুষকে দেখে এই মূর্তিটির পরিকল্পনা করেছিলেন তিনি। এটা আজ সকলেরই জানা যে জয়া আপ্রাস্বামী তখন কলাভবনে তাঁরই ছাত্রী ছিলেন। তাঁর লম্বা ছিপছিপে চেহারা দেখেই এই মূর্তিটির পরিকল্পনা তাঁর মাথায় আসে। কিন্তু এটিকে তিনি স্বাভাবিকতাবাদী রীতিতে রূপায়িত করলেন না। একজন বাস্তব, মানুষের চেহারার আদলকে ভিত্তি করে তিনি বিশেষ এক ‘ফর্ম’ গড়ে তুললেন। সেটা তিনি করলেন একটি অপ্রচলিত মাধ্যমে। মাধ্যম হিসেবে যে সিমেন্ট কংক্রিটকে বেছে নিলেন, সেটাও একটি বাস্তব সীমাবদ্ধতাকেই অতিক্রম করতে। টাকার অভাব সিমেন্ট কংক্রিট সহজলভ্য এবং খরচও খুব কম। তাই এই মাধ্যম। মূর্তিটি কোনও বেদীর উপর বসানো নয়। মাটি থেকে গাছেরই মতো শিকড় ছড়িয়ে সে উপর দিকে উঠে গেছে। তার এই শীর্ণ, দীর্ঘায়ত, অমসৃণ ত্বকের বুনোট সৌন্দর্যের এক রহস্যময় পরিমণ্ডল তৈরি করে। এই যে অস্বাভাবিক, ‘আনক্যানি’ এক রহস্যের বোধ, যা একই সঙ্গে সুন্দর, মায়াবী, বাস্তব থেকে উৎসারিত অথচ বাস্তব, অতিক্রান্ত, এর মধ্যেই রয়েছে আধুনিকতার এক অভিজ্ঞান। ঠিক এরকম ভাস্কর্য আধুনিক ভারতে আগে হয় নি। নন্দলাল একে বুদ্ধের অনুষ্ণোর ‘সুজাতা’-য় পরিণত করে পুরাণকল্পের আদল দিয়েছেন। নব্য ভারতীয় ঘরানার আধুনিকতার সঙ্গে রামকিঙ্করের নবোন্মেষিত আধুনিকতার এক দ্বন্দ্বিক অবস্থানও তৈরি হল এ থেকে। এই দ্বন্দ্বকে সমন্বিত করেই রামকিঙ্করের চল্লিশের আধুনিকতা উদ্ভাবনের দিকে যাত্রা।

১৯৩৮-এর ‘সাঁওতাল পরিবার’ ভাস্কর্যে এরকম কোনও পুরাণকল্পের আবহ প্রশ্নই পায় নি। পরিপূর্ণভাবে প্রবহমান জীবন থেকে উঠে এসেছে এই রূপ। ১৯৩২-এ দিল্লির পাবলিক স্কুলে চাকরি করতে যাওয়ার আগে মাটি দিয়ে একটি সাঁওতাল দম্পতির মূর্তি করে রেখে যান। ফিরে এসে দেখেন সেটা ছাদ থেকে পড়া বর্ষার জলে আলগা হয়ে গেছে। নন্দলাল সেটিকে সারাই করে গুছিয়ে রেখে দিয়েছেন। মাটির এই প্রাথমিক খসড়া থেকেই কলাভবন সংলগ্ন প্রাঙ্গণের ৩৬০ সে.মি. অর্থাৎ প্রায় ১২ ফুট উচ্চতার সিমেন্ট কংক্রিটের এই মূর্তিটি

গড়ে ওঠে। শোভন সোম তাঁর শিল্প সংস্কৃতি সমাজ গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত এক নিবন্ধে এই কাজটি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। ১৯৩০-এর দশকের গোড়ার দিকে বীরভূম অঞ্চলে খরার কারণে শস্যহানি হয়ে দুর্ভিক্ষজনিত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। তখন বোলপুর অঞ্চলের সাঁওতালরা বর্ধমানের চালকলে বা মাঠে চাষের জমিতে কাজের সন্ধানে যেত। সপরিবারে পায়ে হেঁটে যাওয়ার পথে রাতের দিকে তাঁরা শান্তিনিকেতনের আশেপাশে বিশ্রাম নিত। এই মাইগ্রেশন বা অভিবাসনের একটি দৃশ্যকেই রামকিঙ্কর এই মূর্তিতে ধরতে চেয়েছেন। প্রত্যক্ষ সমাজ বাস্তবতাই রূপায়িত এখানে। সিমেন্ট কংক্রিটের অমসৃণ বুনোট এখানে সমস্যাঙ্কুর এক রিক্ততার পরিমণ্ডল সৃষ্টি করেছে। আবার সিমেন্ট মাখা কাঁকর ছুঁড়ে ছুঁড়ে লাগিয়ে তারপর তা থেকে ছুরি দিয়ে কেটে কেটে তল তৈরির যে প্রবণতা, তা তীক্ষ্ণ কৌণিক তলবিন্যাস ঘটিয়েছে, যা কিউবিজমের সঙ্গে কিছু সাযুজ্য আনে। আবার মূর্তির উপস্থাপনায় রয়েছে সাঁওতালদের জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট লৌকিক সারল্য। এই সারল্য ও জটিলতার দ্বন্দ্ব সমন্বিত হয়েই গড়ে উঠেছে এই ‘রূপ’। প্রাচ্য-পাশ্চাত্য রূপবোধের এক সংশ্লেষণও ঘটে গেছে এভাবে।

‘কলের বাঁশি’ বা ‘মিলকল’ স্বাধীন ভারতের সামাজিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির একটি ভাষ্য। এরকম বলা যেতে পারে। এর প্রথম মাটির ম্যাকেট তৈরি শুরু করেছিলেন ১৯৫১ সালে। ১৯৫৩-র মধ্যে দুটি ম্যাকেট তৈরি হয়েছিল। ১৯৫৩-তেই পাশাপাশি শুরু করেছিলেন দিল্লি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের জন্য ‘যক্ষ-যক্ষী’ মূর্তির ছোটো ছোটো ম্যাকেটও। ১৯৫৬ পর্যন্ত ‘যক্ষ-যক্ষী’র অনেকগুলি ম্যাকেট তৈরি হয়েছিল। পরে মূর্তিটি শেষ হয় ১৯৬৬-তে। আর ১৯৫৬-তে শেষ হল ‘কলের বাঁশি’। বলার উদ্দেশ্য, একই সময়ে তাঁর মনের ভিতর একেবারে ভিন্ন আঙ্গিকের দুটি মূর্তির পরিকল্পনা চলছিল। অথবা প্রচ্ছন্ন, অপ্রত্যক্ষ কোনও মিলও হয়তো আছে দুটি কাজের মধ্যে। ‘কলের বাঁশি’-তে রয়েছে স্বাধীন ভারতের শিল্পায়নের দিকে এগিয়ে যাওয়ার পরিপ্রেক্ষিত। দুই সাঁওতাল যুবতী চালকলের বাঁশি শূনে কাজে যাচ্ছে। সকালের স্নান সেরে চলেছে তাঁরা। দুজনে দুহাতে ধরে ভেজা কাপড়টি হাওয়ায় ভাসিয়ে নিয়ে শুকোতে শুকোতে চলেছে। তাঁদের পিছনে পিছনে যাচ্ছে একটি বালক। হাতে একটি লাঠি। লাঠিটি উচিয়ে আছে সে লাঠিটি দিয়ে। এই বালকটির যৌক্তিকতা সম্পর্কে একবার রামকিঙ্করের প্রশ্ন করেছিলেন সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর শিল্পী রামকিঙ্করের আলাপচারী বইতে লিখেছেন এ কথা সোমেন্দ্রনাথ। জানতে চেয়েছিলেন, সাঁওতাল যুবতীদের চলার মধ্যে যে জঙ্গমতার ছন্দ আছে, বালকটির গঠনে সেই প্রাণচঞ্চল গতির যেন অভাব আছে, ঠিক কি তাঁর এই মনে হওয়া? উত্তরে জানিয়েছিলেন রামকিঙ্কর, বালকটিকে জুড়তে হয়েছে একটি বাস্তব প্রয়োজনে। ওই যে অতটা পাথর আর সিমেন্ট দিয়ে করা অত বড়ো উড়ন্ত কাপড়ের ভার, তাকে রাখা যাবে কি করে যদি একটি ‘সাপোর্ট’ না থাকে? ওই ‘সাপোর্ট’ হিসেবেই বালকটির অবতারণা। কিন্তু আমাদের মনে হয় ওই বালকটি না থাকলে ওই যুগল যুবতীর চলার মধ্যেও কি একটু শূন্যতা থাকত না? বালকটি সংসারের সেই পূর্ণতা এনে দিয়েছে। কলের বাঁশির ডাকে ভেজা কাপড় বাতাসে উড়িয়ে যেন নৃত্যের ছন্দে হেঁটে চলেছে দুই যুবতী। সংসারের দারিদ্র্য, জীবনের সমস্ত মালিন্যকে বাতাসে উড়িয়ে দিয়ে জীবনের জয়গান গাইছে তারা।

১৯৪২-এ রামকিঙ্কর শুরু করেছিলেন ‘হার্ভেস্টার’ মূর্তিটি। প্রথমে একটি প্লাস্টারের ম্যাকেট করেছিলেন। কংক্রিটে ৩১৫ সে.মি. বা দশ ফুটের বেশি উচ্চতার এই মূর্তিটি শেষ করেন ১৯৪৫ সালে। এক কৃষক রমণী ধান ঝাড়াই করছে। তার মাথাটি অনুপস্থিত। পিছন দিকে হেলানো বলে সামনে থেকে দেখা যাচ্ছে না। তাঁর সমগ্র শরীর জুড়ে কাজের হন্দ। তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষের পরিমণ্ডল রয়েছে এই মূর্তির প্রেক্ষাপটে। একদিকে, খাদ্যের জন্য হাহাকার, আর একদিকে খাদ্য উৎপাদনের জন্য প্রাণপাত করে শ্রম। এই দুইয়ের মাঝখানে রয়েছে অপ্রতিরোধ্য এক শূন্যতা।

‘সাঁওতাল পরিবার’, ‘হার্ভেস্টার’ আর ‘কলের বাঁশি’, এই ত্রয়ী মূর্তির ভিতর দিয়ে রামকিঙ্কর প্রাক-স্বাধীনতা ও স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলার গ্রামজীবনের আখ্যান তৈরি করেছেন। তিনটি দশকের বাস্তবতার প্রতীক এই তিনটি ভাস্কর্য। এর আঙ্গিকের দিকে যদি তাকাই, তাহলে দেখা যায় একদিকে আদিমতার সংহত শক্তি, ভারতীয় প্রাক ধ্রুপদি ভাস্কর্যের সংস্কৃদ্ধ স্বাভাবিকতায় সংবদ্ধ গতিছন্দ, অন্য দিকে পাশ্চাত্যের রদাঁ পরবর্তী ভাস্কর্যের অভিব্যক্তিবাদী অনুযজ্ঞা— এই তিনটি বৈশিষ্ট্যকে সমন্বিত করে রামকিঙ্কর গড়ে তুলেছেন একান্ত নিজস্ব আঙ্গিক। বিশ্বায়িত রূপচেতনার অনন্য অভিজ্ঞান। আধুনিকতায় ভাস্কর্যের এক নতুন ভাষা তৈরি হল তাঁর হাতে। সে ভাষায় শিল্প ও জীবন মিলে গেল। আবিশ্ব রূপচেতনার সমন্বয় ঘটল।

এর সঙ্গে আমরা যদি ‘যক্ষ-যক্ষী’ ভাস্কর্যটিকে ধরি, তাহলে তাঁর রূপ সন্ধানের আরও কতগুলি দিক উন্মোচিত হয়। ‘যক্ষ-যক্ষী’ তিনি পাথর কেটে গড়েছেন। তিনি অনেকবারই বলেছেন, পাথর কেটে মূর্তি গড়তে গেলে কিছু ‘কিউবিক’ অনুযজ্ঞা এসেই যায়। বিভিন্ন তলের সংযোগের ক্ষেত্রে তীক্ষ্ণ কোণ তৈরি হয়। এই কৌণিকতা থেকে অস্তিত্বের সংস্কৃদ্ধ শক্তি বিকীর্ণ হয়। এই বিকীর্ণণের ভিতর দিয়ে আদিমতা ও আধুনিকতা সমন্বিত হয়ে যায়। ‘যক্ষ-যক্ষী’তে শিল্পী বিষয় তুলে এনেছেন পুরাণকল্প থেকে। রূপের ভিতর এনেছেন অভিব্যক্তিবাদ ও ধনকবাদের (কিউবিজম) সংমিশ্রণ। আদিমতা ও আধুনিকতার এই সংঘাতের ভিতর থেকে পরিস্ফুট করতে চেয়েছেন কৃষি ও প্রযুক্তিশিল্পের দ্বন্দ্ব। আধুনিক ভারতের এই মূলগত সমস্যা রূপ পেয়েছে এই ভাস্কর্যে।

যদি অন্য কোনও কাজ নাও করতেন রামকিঙ্কর, তাহলে এই চারটি ভাস্কর্যের জন্যই স্মরণীয় হয়ে থাকতেন তিনি। এই ক’টি কাজের মধ্য দিয়ে তিনি সনাতন ভারতীয় ভাস্কর্যের আঙ্গিককে আধুনিকতায় উন্মীলিত করেছেন। বিশ্বায়িত রূপচেতনার শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত এগুলি। ভাস্কর্যকে সামগ্রিকভাবে জীবনের সঙ্গে যুক্ত করার এরকম প্রয়াস আমাদের দেশে তাঁর আগে আর হয় নি।

অজস্র মুখাবয়ব ভাস্কর্য করেছেন তিনি। ১৯৩০-৩১-এ করেছেন ‘মিঃ ব্যানার্জী’ নামে একটি মুখাবয়ব। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের মূর্তি করেছিলেন ১৯৩০ থেকে ৩৩-এর মধ্যে সিমেন্টে মাসোজীর অবয়ব গড়েছিলেন ১৯৩৩-এ। ১৯৩৫-এ ‘আলাউদ্দিন খাঁ’ মূর্তিটি তাঁর শ্রেষ্ঠতম স্মরণীয় রচনা। এই মূর্তি করার সময় তাঁর অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছিলেন। সরোদ নিয়ে যখন সংগীতে নিমগ্ন থাকেন আলাউদ্দিন, তখন তাঁর ব্যক্তিত্বের এক আলোকিত দিক বেরিয়ে আসে। সেই রূপকই ভাস্কর্যে ধরতে চেয়েছেন রামকিঙ্কর। শুধু মডেল হিসেবে বসে

থাকার মধ্যে সেই ব্যক্তিত্ব পরিস্ফুট হয় না। ১৯৩৬-এ ‘গাঙ্গুলীমশাই’ নামে একটি মূর্তি করেছিলেন সিমেন্টে। অভিব্যক্তিবাদী ধারার রচনার সেটিও একটি দৃষ্টান্ত। ১৯৪০-এ করেছিলেন ‘মধুরা সিং’। ১৯৪৫-এ ‘বিনোদিনী’। দুটিই সিমেন্টে। এসবকে ছাপিয়ে তাঁর প্রতিভার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ ঘটেছে রবীন্দ্রনাথের দুটি প্রতিকৃতিতে। ১৯৩৮-এ করেছিলেন বিমূর্ত রবীন্দ্রনাথ। কবির বাস্তব মুখাবয়বকে সম্পূর্ণ রূপান্তরিত করেছিলেন বিমূর্ত অভিব্যক্তিতে। রবীন্দ্রিক ভাবনার জগৎকে ভাস্কর্যে ধরার অনবদ্য দৃষ্টান্ত এটি। ১৯৪৯-এর অভিব্যক্তিবাদী মুখাবয়বটির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের ছবির জগতের সুক্ষ্ম প্রতিফলন অনুভূত হয়। সম্ভবত মাত্র একটি কাজেই কবির ছবির প্রভাবে গ্রহণ করেছেন রামকিঙ্কর।

মহাত্মা গান্ধী (১৯৪৮, ১৯৫৭), নেতাজি সুভাষচন্দ্রকে (১৯৬০-৬১) নিয়ে কয়েকটি রচনাধর্মী ভাস্কর্য ছাড়াও তাঁর গুরুত্বপূর্ণ কাজের মধ্যে রয়েছে কয়েকটি বিমূর্ত ভাস্কর্য। ‘স্পীড অ্যান্ড গ্র্যাভিটি’ (১৯৪৯, ১৯৫৩), ‘আগুনের জন্ম’ (১৯৬৩), ‘মহিষ ও ফোয়ারা’ (১৯৬৩) ‘আলোর ঝাড়’ (১৯৪১)— ইত্যাদি কাজে অবয়বকে বিমূর্তায়িত করে তিনি গতি ও ছন্দের অনুভব জাগিয়েছেন। এই কাজগুলিতে পাশ্চাত্য আধুনিকতার আঙ্গিককে আমাদের দেশকালের অনুযোজ্য রূপান্তরিত করেছেন। আমাদের সনাতন ভাস্কর্যেব আলোকিত ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মধ্যে যে শূন্যতা বিরাজ করছিল, সেখানে রামকিঙ্করই প্রথম আলো ফেলেন। আধুনিক ভারতীয় ভাস্কর্যের স্বতন্ত্র ভাষা তৈরি করেন।

ভাস্কর্যচেতনাই রামকিঙ্করের ছবিতে এক স্বতন্ত্র চরিত্র এনেছে। অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, নন্দলাল, যামিনী রায়, বিনোদবিহারী এমনকী রবীন্দ্রনাথ— সকলেই চিত্রীয় ঐতিহ্যের শিল্পী। দ্বিমাত্রিক অনুভবকে প্রাধান্য দিয়েই ছবিতে রূপ নিয়ে তাঁরা নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন। ভারতীয় আধুনিকতায় রামকিঙ্করই প্রথম শিল্পী যিনি ভাস্কর্যের ত্রিমাত্রিক সংবেদনকে ছবিতে সংগঠিত করেছেন। তাঁর অগ্রবর্তী আর একজন শিল্পী দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীও ছিলেন একাধারে চিত্রী ও ভাস্কর। কিন্তু দুটি মাধ্যমে দেবীপ্রসাদের দূরকম ব্যক্তিত্ব প্রতিফলিত হয়েছে। ছবিতে তিনি নব্য-ভারতীয় ধারার অনুসরণ করেছেন, আর ভাস্কর্যে অ্যাকাডেমিক স্বাভাবিকতাই তাঁর ভিত্তি। রামকিঙ্কর এই দুটি আঙ্গিককেই আত্মস্থ করেছেন তাঁর কৈশোরে। শান্তিনিকেতনে আসার পর নিজের সৃষ্টির ক্ষেত্রে যখন অবতীর্ণ হলেন তিনি, তখন এই দুই রূপভঙ্গির সমীকরণ ঘটেছে তাঁর কাজে। এর ভিত্তির উপর তিনি পাশ্চাত্য আধুনিকতার তিনটি আঙ্গিককে মেলাতে চেষ্টা করেছেন। সেগুলি হল পোস্ট-ইম্প্রেশনিজম, এক্সপ্রেশনিজম আর কিউবিজম। এসব মিলিয়ে ছবিতেও তিনি এক বিশ্বায়িত রূপচেতনা গড়ে তুলেছেন। পাশ্চাত্য আধুনিকতাকে তাঁর আগে এভাবে আর কেউ আমাদের ঐতিহ্যের সঙ্গে মেলাতে পারে নি। এখানেও তাঁর পথিকৃতের মর্যাদা। এদিক থেকেই চল্লিশের আধুনিকতার প্রধান পুরোধা তিনি।

মানুষের শিল্পিত প্রকাশের ভিতর বিশ্বের বিভিন্ন ঐতিহ্যের মূল্যবোধ এসে মেলে। মানবিক চৈতন্যের বিশ্বায়নের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ এই শিল্পকলা। এই সহজ স্বচ্ছন্দ বিশ্বায়নের পাশাপাশি বিশ্বায়নের আর এক ধরনের কথাও আজ আমরা জানছি। সেই অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের মধ্য দিয়ে উত্তর-ওপনিবেশিক অর্থনৈতিক অবরোধ কিভাবে চলছে, সে সম্পর্কেও আমরা সকলেই অবহিত। আজকে সম্ভ্রাসও বিশ্বায়িত হয়ে গেছে। এর নানা প্রকাশ আমরা অহরহ দেখতে পাই। লেবাননে ইস্রায়েলি হানা ক্রমশই জটিল আকার ধারণ করছে। অল্প

কয়েকদিন আগে (১১ জুলাই ২০০৬) মুম্বাইয়ের ট্রেনের ধারাবাহিক বিস্ফোরণে মাঝা পড়ল কয়েকশো মানুষ। বিশ্বায়নের অন্ধকার সভ্যতাকে আচ্ছন্ন করছে আজ।

বিশ্বায়িত রূপচেতনা এই অন্ধকারের ভিতর আলো খোঁজে। রামকিঙ্করও খুঁজেছেন। চল্লিশের যুদ্ধ, সংঘাত, সম্ভ্রাস, মনস্তত্ত্বের আলোড়নের ভিতর থেকে মানবিক চৈতন্যের আলোকে বের করে আনতে চেয়েছেন। এরই প্রকাশ তাঁর ছবি ও ভাস্কর্য। আধুনিকতায় বিশ্বায়িত রূপচেতনার শ্রেষ্ঠ ফসল।

তথ্যসূত্র ও সহায়ক উৎস:

- ১ পঞ্চানন মন্ডল, ভারতশিল্পী নন্দলাল, চতুর্থ খণ্ড, বাঢ় গবেষণা পর্ষদ, শান্তিনিকেতন, ১৯৯৩।
- ২ প্রকাশ দাস সম্পাদিত, রামকিঙ্কর, এ. মুখার্জি অ্যান্ড কোং, কলকাতা, ১৯৮৯।
- ৩ সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শিল্পী রামকিঙ্কর আলাপচারি, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৪।
- ৪ রামকিঙ্কর, মহাশয়, আমি চাক্ষিক, রূপকারমাত্র, মনচাষা, আলিপুরদুয়াব, ২০০২।
- ৫ কে. জি. সুব্রামনিয়ন, 'রামকিঙ্কর অ্যাণ্ড হিজ ওয়ার্কস' ও 'রিমেমবাবিং রামকিঙ্কর'। নন্দন. কলাভবন, বিশ্বভারতী. ২০০৫।
- ৬ আব শিবকুমার. শান্তিনিকেতন : দ্য মেকিং অব আ কন্টেম্পোরারি মডার্নিজম. ন্যাশনাল গ্যালারি অব মডার্ন আর্ট, নিউ দিল্লি, ১৯৯৭।
- ৭ শোভন সোম. সংকলিত প্রবন্ধ শিল্প সংস্কৃতি সমাজ, মনচাষা, আলিপুরদুয়াব, ২০০৪।
- ৮ মৃণাল ঘোষ, সমকালীন ভাস্কর্য, প্রতিক্ষণ, কলকাতা, ১৯৯৫।
- ৯ মৃণাল ঘোষ. বিংশ শতকে ভারতের চিত্রকলা : আধুনিকতার বিবর্তন, প্রতিক্ষণ, কলকাতা, ২০০৫।

প্রবোধকুমার সান্যাল : শতবর্ষে স্মরণ

সুজিৎ ঘোষ

বাংলার ইতিহাসের এক উল্লেখযোগ্য সময়ে প্রবোধকুমার সান্যালের জন্ম। তাঁর জন্মের বছরেই বঙ্গভঙ্গ ও বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সূচনা। প্রবোধকুমার জন্মেছিলেন ০৭.০৭.১৯০৫ এবং তাঁর মৃত্যু ১৭.০৪.১৯৮৩— ৭৮ বছর তাঁর জীবৎকাল। তাঁর সাহিত্যে হাতেখড়ির কৈশোর সম্পর্কে আমাদের কিছু জ্ঞান নেই। কিন্তু *কল্লোল* পত্রিকার প্রথম বর্ষে দশম সংখ্যায় তাঁর গল্প প্রথম প্রকাশিত হয় (মাঘ ১৩৩০) অর্থাৎ ১৯২৩ সালে। তখন প্রবোধকুমারের বয়স ১৮/১৯ বছর। কিন্তু নবীন লেখক পত্রিকার দপ্তরে সাক্ষাৎ করে তাঁর রচনাটি প্রকাশের জন্য কোনও চেষ্টাই করেন নি। *কল্লোল*-এর অন্যান্য সাহিত্যিকদের সঙ্গে *কল্লোল*-এর আড্ডায় তাঁর যোগাযোগ ঘটে এর চার বছর পরে। প্রবোধকুমারের প্রথম উপন্যাস *যাযাবর* প্রকাশিত হল তাঁর ২৩ বছর বয়সে, ১৯২৮ সালে।

বাল্যে পিতাকে হারিয়ে মামার বাড়িতে তাঁদের আশ্রয় নিতে হয়েছিল। স্কটিশ চার্চ কলেজে পড়াশুনার জন্য ভর্তি হয়েছিলেন। কিন্তু আমরা দেখি জীবিকার সন্ধানে কখনও শ্রীরামপুরের ডাকঘরে কাজ নিয়েছেন, কাশীতে ছাপাখানায় কাজ করছেন, ভেড়িতে কাজ করছেন, সেনাবাহিনীর কেরানি হিসেবে উত্তর-পশ্চিম ভারতে থেকেছেন, ইংরেজি *ফরওয়ার্ড* পত্রিকা এবং বাংলা *কথা* পত্রিকায় নিয়মিত লেখালেখি করেছেন। ১৯৩৭ সাল থেকে *যুগান্তর* পত্রিকার সাহিত্য বিভাগে কাজ করেছেন। সেই অর্ধে নিয়মিত স্থির আয়ের কোনও চাকরিতে তিনি বাঁধা থাকেননি।

নিয়মিত চাকুরিজীবী হওয়ার পথে প্রধান অস্তুরায় সম্ভবত তাঁর চরিত্রগত স্বভাব। সেই স্বভাব হল তাঁর পরিব্রাজকের স্বভাব। হিমালয়ের দুর্গম অঞ্চলগুলিতে বারে বারে তিনি অভিযাত্রী। তাঁর ভ্রমণের অভিজ্ঞতা দেশের সীমানা অতিক্রম করে এশিয়া, ইয়োরোপ, রাশিয়া, আমেরিকা পর্যন্ত বিস্তৃত। ১৯৫৭ সালে ভারতীয় সাংস্কৃতিক দলের প্রতিনিধি হিসেবে গিয়েছিলেন পাকিস্তানে। তারপরে গেছেন তাসখণ্ডে আফ্রো-এশিয় লেখক সম্মেলনে ভারতীয় প্রতিনিধি হিসেবে। এমন কি ৭২-৭৩ বছর বয়সেও উত্তরমেরু অভিযাত্রী দলের তিনি অন্যতম সদস্য এবং নরওয়ের পথে উত্তরমেরুতে পৌঁছলেন। কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হিমালয়ান এ্যাসোসিয়েশন এবং হিমালয়ান ফেডারেশনেরও তিনিই প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি।

১৯০৫ থেকে ১৯৮৩ এই দীর্ঘ কালপর্বে বিশ্বের এবং বাঙালির জীবনের নানা পরিবর্তন তিনি দেখেছিলেন।—দুই বিশ্বযুদ্ধ, জাতীয় আন্দোলন, দাঙ্গা, দেশভাগ, স্বাধীনতা, স্বাধীনতার স্বপ্নভঙ্গ, মধ্যবিস্তৃত বাঙালি জীবন এবং সে জীবনের বেপথু অবস্থা প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

সমকালীন সাহিত্যের পরিমন্ডলটিও প্রবোধকুমারের কথা আলোচনা করতে গেলে

আমাদের স্মরণে রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে যুগ-প্রগতি ও সাহিত্য-প্রগতি সর্বদা সমলয়ে এগিয়ে চলে না। কিন্তু প্রবোধকুমারের সাহিত্য রচনার পর্বে বাঙলা সাহিত্যে যুগ প্রগতি ও সাহিত্য-প্রগতির এক বিস্ময়ের সমলয়তা আমরা প্রত্যক্ষ করি। প্রবোধকুমারের প্রথম উপন্যাস যখন প্রকাশিত হচ্ছে তখনও ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথের কলম সক্রিয়। প্রবোধকুমারের *যাযাবর* (১৯২৮) প্রকাশিত হওয়ার কালে আমরা দেখি রবীন্দ্রনাথ রচনা করছেন তাঁর *যোগাযোগ* (১৯২৯)-এর মতো যুগ পরিবর্তনের রচিত উপন্যাস। ১৯২৯এই প্রকাশিত হল রবীন্দ্রনাথের *শেষের কবিতা*, যে উপন্যাসে তিনি নবীন 'আধুনিক'দের প্রতিস্পর্ধী। ১৯৩৩-এ যথাক্রমে প্রকাশিত হল *দুই বোন* এবং *মালঞ্চ*। ১৯৩৪-এ আমরা পেলাম তাঁর শেষ ও বিতর্কিত উপন্যাস *চার অধ্যায়*। আর ১৯৪০-এ প্রকাশিত তাঁর *তিনসঙ্গী* গল্পমালা—যেখানে বুদ্ধিদীপ্ত ক্ষুরধার প্লটে ও সংলাপে তিনি তাঁর *গল্পগুচ্ছ*-এর প্রথম খণ্ডের বাঙলার গ্রামীণ সমাজের থেকে এক ঝকঝকে নাগরিক জীবনযাপনকে চিত্রায়িত করলেন। ঔপন্যাসিক হিসেবে উপন্যাসের গুণাগুণ ছাড়াও রচনাকালের দিক থেকে ও পরিমাণগত দিক থেকে রবীন্দ্রনাথকে মনে রাখতেই হবে। আমাদের সর্বদা স্মরণে থাকে না যে রবীন্দ্রনাথের প্রথম কাব্যগ্রন্থ *কবিকাহিনী* (প্রকাশকাল ১৮৭৮)-র আগেই তিনি রচনা করেছিলেন তাঁর *কবুলা* উপন্যাস। অবশ্য সে উপন্যাসও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মাত্র ১৬-১৭ বছর বয়সের রচনা। এবং সে উপন্যাসের সাহিত্য-সাফল্য হয়তো কিছু ছিল না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যেখানে পরবর্তী সাহিত্যিক প্রজন্মকে প্রভাবিত ও আচ্ছন্ন করেছিলেন সে ক্ষেত্রটি হল কবিতা। প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজ বলে বাঙলা কাব্যধারায় একদল কবি চিহ্নিত হয়ে আছে। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৭৬-১৯৩৮) ওপর রবীন্দ্র উপন্যাসের কিছু কিছু প্রভাব অবশ্য প্রত্যক্ষ করা যায়, যদিও সে প্রভাবের ভালোমন্দের মূল্য নিরূপণ এখানে প্রাসঙ্গিক নয়।

রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্র ছাড়াও সমকালে বাঙলা উপন্যাসে ও ছোটগল্পে—সামগ্রিকভাবে কথাসাহিত্যে আধুনিকতা এবং সাধারণ মানুষের জীবন ও প্রকৃতিকে নিয়ে এলেন একঝাঁক বাঙালি কথাসাহিত্যিক। রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজ গড়ে উঠলেও 'রবীন্দ্রানুসারী কথাসাহিত্যিক'-সমাজ কিছু গড়ে ওঠেনি। বরং রবীন্দ্রনাথই *শেষের কবিতা*-য় এবং *তিনসঙ্গী*-তে মনে হয় এই আধুনিকদের সঙ্গে কদম মেলাতে চেয়েছিলেন।

কম্বোজ (১৯২৩), *কালিকলম* (১৯২৬), *প্রগতি* (১৯২৭), *বিচিত্রা* (১৯২৭) প্রভৃতি সাময়িকপত্রকে কেন্দ্র করে এক শক্তিশালী কথাসাহিত্যিক গোষ্ঠী সৃজনে মগ্ন হয়েছিলেন : গোবিন্দ নাগ (১৮৯৫-১৯২৫), দীনেশরঞ্জন দাশ (১৮৮৮-১৯৪৯), মণীন্দ্রলাল বসু (১৮৯৭-১৯৮৬), বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০), শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (১৯০১-১৯৭৬), জগদীশ গুপ্ত (১৮৮৮-১৯৫৭), মণীশ ঘটক (১৯০২-১৯৭৯), তারাসঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১), রবীন্দ্রনাথ মৈত্র (১৩০৩-১৩৩৯ব), প্রমথনাথ বিশী (১৯০১-১৯৮৫), সরোজকুমার রায়চৌধুরী (১৯০৩-১৯৭২), বনফুল (১৮৯৯-১৯৭৯), অন্নদাসঙ্কর রায় (১৯০৪-২০০২), শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৯-১৯৭৩), বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৮৭), মনোজ বসু (১৯০১-১৯৮৭), মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬), ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৬১), বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪), প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৮-১৯৮৮), অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৯০৪-১৯৭৬) এবং আরও অনেকে।

এই ক্রমবিসারী সাহিত্যের পরিমণ্ডলে প্রবোধকুমারও অন্যতম হয়ে উঠলেন। এবং অতি দ্রুত তিনি গল্প ও উপন্যাস রচনা করলেন। শুধু তিরিশের দশকেই তাঁর রচিত উপন্যাস ও গল্পগ্রন্থের তালিকা বিস্ময়কর। উপন্যাস হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে— দুই আর দুইও চার (১৯৩১); বাতাস-দিল দোল (১৯৩১); কাজললতা (১৯৩১); কলোরব (১৯৩২); প্রিয়বান্ধবী (১৯৩৩); অগ্রগামী (১৯৩৬); আলো আর আগুন (১৯৩৭); আঁকাবাঁকা (১৯৩৮); নদ ও নদী (১৯৪০)।

এই পর্বে প্রকাশিত গল্পগ্রন্থগুলি: চেনা ও জানা (১৯৩১); নিশিষ্ম (১৯৩৩); অবিকল (১৯৩৩); দিব্যঙ্গ (১৯৩৬); অস্ত্রাগ (১৯৩৯); কয়েকঘণ্টামাত্র (১৯৩৯)। অর্থাৎ এক দশকেই ১৬টি গ্রন্থ এবং এর সঙ্গেই মহাপ্রস্থানের পথে (১৯৩৭)-র মতো কালজয়ী ভ্রমণ উপন্যাস।

প্রবোধকুমারের কলরব প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৩২ সালে। ১৩৪০ বঙ্গাব্দের বৈশাখ পরিচয়-পত্রিকায় অন্য একটি গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ এই গ্রন্থটি সম্পর্কে তাঁর মতামত জানিয়েছিলেন: ‘প্রবোধ সান্যালের কলরব পড়লুম। পড়ে তাঁর রচনা ও কল্পনা শক্তির প্রশংসা করতে হলো। এই বইয়ের নানা চরিত্র ও ঘটনার ভীড়, কোনটাই মনে হয় না যে বেঠিক। এতোগুলো মেয়ে পুরুষকে স্পষ্ট করে গড়ে তুলতে ক্ষমতার দরকার। সে ক্ষমতা আছে লেখকের। লেখক ইচ্ছে করেই এ বইয়ে দেখাতে চেয়েছেন একটা বাড়িতে অত্যন্ত সাধারণ লোকের জীবনযাত্রার একটা ঘোলা আবর্ত।’—রবীন্দ্রনাথের উক্তির মধ্যে নিহিত সত্যকে আমরা সহজেই প্রত্যক্ষ করতে পারি। প্রবোধকুমার নানা ঘটনা এবং বহু চরিত্রকে তাঁর উপন্যাসে ধরতে চান। ব্যক্তির চেয়ে সমষ্টির প্রতি—মাইক্রোর চেয়ে ম্যাক্রোর দিকে তাঁর শিল্পকে বিস্তৃত করতে চান।

এখানেই এসে পরে আর একটি প্রসঙ্গ।—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁর কম্বোলয়ুগ গ্রন্থে হেম বাগচি প্রসঙ্গের পরেই প্রবোধকুমার সম্পর্কে বলেছেন:

কিন্তু প্রবোধ সান্যাল অনাজ্ঞাভব মানুষ। ক্ষিতি-অপ-তেজ হয়তো ঠিকই আছে, কিন্তু মন্ত্রণ আর ব্যোম যেন অন্য জগতের। মুক্ত হাওয়াব আর মুক্ত আকাশের মানুষ সে, আর সেই হাওয়া আব আকাশ আমাদের এই বন্ধ জগতের জীবনে অল্পদৃষ্ট। তাকে খুঁজে নিতে হয় না, সে আপনা থেকেই উচ্ছসিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। “কম্বোলে” প্রথম বছরেই তাব গল্প বেবোষ, কিন্তু সশবীবে সে দেখা দেয় চতুর্থ বর্ষে। আর দেখা দেওয়া মাত্রই তার সঙ্গে রক্তের বাণিবন্ধন হয়ে গেল। প্রবোধের চরিত্রে একটা প্রবল বন্যতা ছিল, সেই সঙ্গে ছিল একটি আশ্চর্য স্বৈর ও দৃঢ়তার প্রতিশ্রুতি। বাসা ভেঙে দিতে পারে প্রবোধ, কিন্তু কোনোদিন আশ্রয় তুলে দেবে না, কিছুতেই। বিচ্ছেদ আছে প্রবোধের কাছে, কিন্তু বিয়োগ নেই। সমস্ত চাকলা—চাপলা সম্বন্ধেও তার হৃদয়ে একটা বলিষ্ঠ উদার্য আছে, সমস্ত উত্থানে পতনে তার মধ্যে জেগে আছে ঘবছাড়া সদাতৃপ্ত সম্যাসী। দুর্বিপাকে পড়েও তাব এই উদারতা ঘোচে না। শত ঝড়েও মুছে যায় না তার মনের নীলাকাশ। আর সকলের সঙ্গে বুদ্ধির ও বিদ্যার যোগাযোগ, প্রবোধের সঙ্গে একেবারে অন্তরের সম্পর্ক। গুর মাঝে মেঘ এলেও মলিনতা আসে না। ‘রমতা’ সাধু আব ‘বহতা’ জল, মানে যে সাধু ঘুবে বেড়ায় আর যে জলে নিরন্তর স্রোত বয়, তা কখনো মলিন হয় না।

অচিন্ত্যকুমারের এই উদ্ধৃতির পরেও আমরা দেখি যে সমকালীন বাঙলা সাহিত্যিক সাহিত্যপ্রেমী সকলের সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তার সম্পর্ক।

কথাসাহিত্যের আলোচনায় প্রধান ভরকেন্দ্র কথায়, অর্থাৎ গল্প কাহিনিতে। প্রবোধকুমারের সমগ্র রচনাকে আমরা তিন ভাগে ভাগ করতে পারি : ১. ছোটগল্প, ২. উপন্যাস, ৩. ভ্রমণকাহিনি। মানুষ চিরকালই কাহিনি শুনতে চেয়েছে, গল্প শুনতে চেয়েছে। গল্প শুনতে চাওয়ার এই চিরন্তন মানববাসনা তাঁর রচনায় পূর্ণ করার প্রয়াস দেখা যায়। শুধু রোমান্টিক সংজ্ঞায় তাঁর রচনা সীমায়িত নয়। আবার যুবনাথের *পটলডাঙার পাঁচালি* (১৩৩১-১৩৩২ বঙ্গাব্দ) অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের *বেদের* (১৯২৮) মতো অতিবাস্তবতার পথেও তাঁর পরিক্রমণ নয়। বাস্তবের সঙ্গে কল্পনার মিশ্রণে যে স্বাভাবিক অধিকার শিল্পীর থাকে সেই স্বাভাবিকতায় প্রবোধকুমারের বিচরণ। উদাহরণ তাঁর *তুচ্ছ* উপন্যাসটি। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর *বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা* গ্রন্থে এই উপন্যাসটি সম্পর্কে ‘খাঁটি উপন্যাসিক প্রেরণার বশবর্তী হয়ে রচিত’ বলেছেন। প্রবোধকুমার পিতার মৃত্যুর পর মামার বাড়িতে থাকার সময়ে আত্মজৈবনিক অভিজ্ঞতা এই উপন্যাসের ভিত্তি। একটি বালকের চোখ দিয়েই তিনি সবকিছু দেখিয়েছেন। অথচ সময় সমকাল সমাজ পরিবেশ ও মানব সম্পর্কের পরিবর্তন এবং টানা পোড়েন এই উপন্যাসে বিধৃত। পরাক্রান্ত বালকের অভিজ্ঞতায় বাল্যের আবেগ বা কিছু তিক্ততা স্বাভাবিক। কিন্তু *তুচ্ছ* উপন্যাসে আবেগ অথবা তিক্ততার কোনও ছাপ নেই। তাঁর স্মৃতিকথা *বনস্পতির বৈঠক*-এর পূর্বভাষণে প্রবোধকুমার বলেছেন : “এই গ্রন্থের সঙ্গে ‘তুচ্ছ’ ও ‘জলকম্বল’— এ দুটি বইয়ের সম্পর্ক অচ্ছেদ্য। তাদের থেকে কিছু কিছু প্রসঙ্গ এই গ্রন্থে পোশাক বদলিয়ে এসেছে।” (*বনস্পতির বৈঠক* ‘পূর্বভাষণ’ দোলপূর্ণিমা, ১৩৮০) এই নৈর্ব্যক্তিকতা প্রবোধকুমার অর্জন করেছিলেন। এবং সেই অর্জনের জন্য তাঁর জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নবনব অভিজ্ঞতার প্রসারণ ঘটেছে। প্রবোধকুমার পাঠকদের শোনাতে চান কাহিনি, সেই কাহিনির জন্য ক্রমাগত প্রসারিত করেন অভিজ্ঞতা। কিন্তু সে অভিজ্ঞতার প্রকাশ হয়ে পড়ে প্রবোধকুমারের নিহিত স্বভাবের নৈর্ব্যক্তিকতা। তিনি যেন চলমান দর্শক— সে কারণেই তাঁর সম্পর্কে যারা আলোচনা করেন তাঁরা কখনও বলেন তিনি পথিক, তিনি অভিযাত্রী।

পথিক এবং অভিযাত্রী— দুটি অভিধাই সত্য— এই অভিধার সূত্রেই তাঁর ভ্রমণ-কাহিনিগুলি সংলগ্ন। বিশেষ করে তাঁর হিমালয় সম্পর্কিত কাহিনিগুলি। *মহাপ্রস্থানের পথে*, *দেবতাস্থা হিমালয়* (১ম ও ২য়, ১৯৫৫), *উত্তর হিমালয় চরিত* (১৯৫৫)। সুপ্রিয় সরকার তাঁর *প্রকাশকের ডায়েরি* (আশ্বিন ১৪০০; আনন্দ পাবলিশার্স) গ্রন্থে লিখেছেন :

হিমালয়ের পটভূমিকায তাঁর উপন্যাস ‘মহাপ্রস্থানের পথে’ লিখে এক চিলে অনেক কটি পাখি মেরেছিলেন। প্রথমত ভ্রমণসাহিত্যে যাকে ‘ট্রাভেলোগ’ বলা হয়— এরকম কোনো দিক বাংলা সাহিত্যে একবকম ছিল নাই বলা চলে। এর আগে যে কয়েকটি বই ছিল, বেশির ভাগ লেখাই ছিল তীর্থস্থান সম্পর্কে তথ্যবস্তু পরিচিতি। ব্যতিক্রম এনেছিল রায়বাহাদুর জলধর সেনের ‘হিমালয়’ যদিও কালের সঙ্গে সঙ্গতি বেখে রোমাঞ্চ সৃষ্টিকারী উপাদানেব অভাব ছিল। সুন্দর বিবরণের প্রাচুর্য ছিল— কিন্তু জীবনের রামধনুর রং ছিল না। প্রবোধকুমারই প্রথম যিনি ভ্রমণসাহিত্যকে উপন্যাসের চাইতেও

আকর্ষণীয় করে তোলার ক্ষমতা দেখিয়েছিলেন। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ভ্রমণ-সাহিত্য বলে এক নতুন অধ্যায়ের সংযোজন হলো। নিঃসন্দেহে প্রবোধকুমারকে এব পঞ্চিকুৎ বলা চলে।

এব ফল এই হলো যে দশ-বারো দিন ছুটি পেলেই সদলবলে বাঙালিরা বেরিয়ে পড়ে হিমালয় ভ্রমণে— দর্শনে নয়। লেখাব হাত থাক বা না থাক ফিরে এসেই ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিখতে শুরু করে। আর যাঁবা একটু সাহিত্যভাবাপন্ন তাঁদের তো আব কথাই নেই। এই প্রবণতা এখন আর হিমালয়ে সীমাবদ্ধ নেই, ছড়িয়ে পড়েছে ঘাটে মাঠে, বনেজঙ্গলে, সমুদ্রবেলায় মবুড়ুমিতে।

একদিন প্রবোধদা এলেন না। ভবানীদার কাছে জানতে পাবলাম প্রবোধদা অসুস্থ। বাড়ি ফেরাব সময় একদিন দু'জনেই গেলাম প্রবোধদাব বাড়িতে। কোথাও কিছু কমতি দেখলাম না প্রবোধদার। তেমনি সহজ, সবল, হাস্যমুখব রসিকতায় ভরা। মনে হলো না অসুস্থতাটা তেমন কিছু গুরুতর। হঠাৎ নজরে পড়লো তাঁর হাতে ধবা একটি বইয়ের দিকে— মহাপ্রস্থানের পথে।

আমার বিস্মিতভাব লক্ষ্য করেই হাসতে হাসতে বললেন— ‘জানো বাচ্চু, গুরুদেবের সেক্রেটারি অনিল চন্দ আমাকে বলেছিলেন যে, শিলাইদহেব নদীৰ বুকে বজ্রায় সময় কাটাবাব জন্য গুরুদেব একটিমাত্র বই সঙ্গে নিয়েছিলেন, সেটি মহাপ্রস্থানের পথে। তেমনি আমিও ছুটি কাটাবার জন্যে নিয়েছি বইটিকে।

প্রবোধকুমারের সময়ে বহু সাহিত্যিক খ্যাতি অর্জনের পরে স্থিত হয়ে লিখেছেন ঐতিহাসিক উপন্যাস। জাতীয় আন্দোলনের যুগে অতীত জাতীয় গৌরব সঞ্চারিত করার জন্য ঐতিহাসিক উপন্যাস বা নাটকের সাহিত্যিক ভূমিকা ছাড়াও ঐতিহাসিক ভূমিকা ছিল। স্বাধীনতা উত্তরকাল থেকে অদ্যাবধি অনেক প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক অভিজ্ঞতার সঞ্চয় তাঁড়ারে ঘাটতির ফলেই ইতিহাসের জগতে উপন্যাসের উপাদান সংগ্রহ করেছেন। অথবা প্রবোধকুমারের ঘনিষ্ঠ বান্ধব অচিন্ত্যকুমার যেমন লিখেছিলেন ভক্তিসিন্ধু পরমপুরুষ শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ (১৯৫১-৫২) কিন্তু মহাপ্রস্থানের পথে ব দেবতাত্মা হিমালয়-এ পুরাণ ইতিহাস থাকলেও ধর্মীয় ভক্তিবাদ নেই। এই ভ্রমণকাহিনিগুলিতে আছে মানুষ, প্রকৃতি, আছে দুর্গমের প্রতি চিরকালীন মানবিক আকর্ষণ, রোমান্টিক অ্যাডভেঞ্চার বোধ— মানুষের যাত্রা, জয়যাত্রা।

প্রবোধকুমারের অভিজ্ঞতার জগতে কখনও টান পড়েনি বরং তিনি সতত তা প্রসারিত করেছেন। তিনি কল্লোল-এ লিখলেও শুধু কল্লোলগোষ্ঠীরই নন, উপন্যাসের আধুনিকতার এবং আজিকের নানা মত ও মতবাদ তাঁর জ্ঞানের সীমায়। কিন্তু কোনও মতবাদই তাঁকে আচ্ছন্ন করতে পারে নি।

উপন্যাসিক তাঁর কথায় কাহিনিতে নারী-পুরুষের সম্পর্ক সন্ধান করবেন এটাই স্বাভাবিক। প্রবোধকুমারের উপন্যাসে নারী-পুরুষের এই সম্পর্ক সন্ধানের কথা শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে উজ্জলকুমার মজুমদার (৩.৭.০৫-এ প্রবোধকুমারের বাস গৃহে প্রদত্ত স্মারক বক্তৃতায়) পর্যন্ত অনেকেই বলেছেন। এই সম্পর্কে নানা ভেরিয়েশন নানা বৈচিত্র্য প্রবোধকুমার দেখান তাঁর গল্প-উপন্যাসে। প্রবোধকুমারের প্রিয়বান্ধবী, আঁকাবাঁকা, শ্যামলীর স্বপ্ন, উত্তরকাল, জলকল্লোল প্রভৃতি উপন্যাসে তাঁর এই অন্বেষণের সন্ধান পাওয়া যাবে। মানব মানবী দেহজ

সম্পর্ক শাস্ত্রত অমোঘ— কিন্তু মনের বিস্তারের শাখা প্রশাখার জটিলতা যা ‘মানব’কে প্রাণীজগতে বিশিষ্ট করেছে, মানবের এই মানব-সম্পর্ক অনুসন্ধানই তাঁর রচনায় প্রাধান্য পায়। সমকালীন দেহবাদ প্রবোধকুমারের সাহিত্যে প্রাধান্য পায়নি। দেহভাণ্ডের সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতাকে তিনি কাজে লাগাননি। *প্রিয়বাক্ষবী*-তে শ্রীমতী ও জহরের প্রেম বাঙলা সাহিত্যের নরনারীর প্রেমে নতুনত্ব এনেছে। এ প্রেম যদি বাস্তবধর্মী না হয়, শুধু কাহিনি বা গল্প বলা হয় তাহলে সাহিত্যও তো পরিপূর্ণ বাস্তব নয়, কল্পনানির্ভর।

মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যে উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ কবিকঙ্কন তাঁর *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যে তথাকথিত নিম্নবর্ণের ব্যাধেদের জীবন-স্বপ্ন-বাস্তবকে তুলে ধরেছিলেন। একটা সময় পর্যন্ত বাঙলা সাহিত্যে উচ্চবর্ণের হিন্দুদেরই আধিপত্য। আমরা মনে রাখিনি, মনে রাখি না বাঙালি সমাজের একটা বিশাল অংশ মুসলমান। উচ্চবর্ণের বাঙালি হিন্দু এই বাঙালি মুসলমান সমাজ সম্পর্কে অবজ্ঞা থাকলেও অভিজ্ঞতা নেই, অবজ্ঞার জন্যেই অভিজ্ঞতাও নেই। দু’একটি ছোটোগল্পে এদের কথা এসেছে। (রবীন্দ্রনাথের ‘মুসলমানীর গল্প’, শরৎচন্দ্রের ‘মহেশ’, রমেশ সেনের ‘সাদা ঘোড়া’, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের ‘সারেঙ’, নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ‘রস’, সমরেশ বসুর ‘আদাব’ প্রভৃতি।) কিন্তু মুসলমান জীবন নিয়ে প্রথম পূর্ণাঙ্গ দীর্ঘ উপন্যাস *হাসু বানু* লিখলেন উচ্চবর্ণের হিন্দু প্রবোধকুমার। এ ধরনের উপন্যাসের অন্য উদাহরণ গৌরকিশোর ঘোষের *প্রেম নেই* (১৯৭৮)। *হাসু বানু*-র প্রকাশ ১৯৫২ সালে, দেশবিভাগ হয়ে গেছে, হিন্দু ও মুসলমান বাঙালির সম্পর্কে তিক্ততার স্পর্শ, পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিদের কোনও ভাবে প্রভাবিত করে নি। এমন এক সময় কোনও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কোনও ক্রীড (creed) থেকে নয় অবলোকন এবং অভিজ্ঞতার প্রকাশে প্রবল তাড়নায় রচিত হয় *হাসুবানু*। এই গ্রন্থের উৎসর্গপত্র লক্ষ্য করার মতো:

উৎসর্গ

প্রাতঃস্মরণীয় দেশকর্মী ও সমাজসেবক

স্বর্গত জনাব লিয়াকত হোসেন

ও

অগ্রজপ্রতিম শ্রদ্ধেয় বন্ধু

স্বর্গত জনাব সোফিয়ার রহমেনের

পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে

আমার বাল্যে ও কৈশোরে স্বয়িপ্রতিম জনাব লিয়াকত হোসেনকে খুব কাছের থেকে দেখতুম। প্রকৃত দেশকর্মী ও আদর্শবাদী নেতা কাকে বলে— তখন সে কথা সঠিক বুঝবার বয়স আমার নয়। কিন্তু কালক্রমে জ্ঞানতে পেরেছিলুম সেই উদারপ্রাণ ধর্মনিরপেক্ষ এবং দেশবৎসল ব্যক্তি হলেন একজন আদর্শ সমাজসেবী। পরবর্তীকালে তাঁকে মহাপুর্ব্ব বলতে আমার বাধে নি। তাঁর মৃত্যুতে প্রিয়জনবিচ্ছেদবেদনা অনুভব কবেছিলুম।

দ্বিতীয় ব্যক্তি জনাব সোফিয়ার রহমেন ছিলেন একজন তরুণ সুদর্শন ব্যবহারজীবী,— আমাদের পরিবারেব জনৈক অকৃত্রিম স্নেহশীল বন্ধু। তাঁর অকালমৃত্যুতে আমবা বহুদিন অবধি শোকতাপে মুহুমান ছিলাম।

এই দুই সাধু ও সজ্জন বাঙালি মুসলমানের উদ্দেশে অনেককাল পর্যন্ত মনে মনে আমি অর্ঘ্য নিবেদন করেছি। 'হাসুবানু' বইটির সঙ্গে এই দুই অমৃত আত্মাব সংযোগ কবে দিয়ে আমি কৃতার্থ বোধ কবলুম।

প্রবোধকুমার স্যানাল

বৈশাখ ২৫, ১৩৫৯

সমগ্র উৎসর্গপত্রে যা বিশেষভাবে লক্ষণীয় তা হল উৎসর্গপত্রের তারিখ। 'বৈশাখ ২৫, ১৩৫৯'। ২৫শে বৈশাখ তারিখে এই উৎসর্গপত্র রচনার মধ্যে প্রবোধকুমার মনে হয় বাঙালির বাঙালিত্বের নিহিত বাঙানার দিকে ইঙ্গিত করেছেন।

প্রসঙ্গাত আর একটি এ ধরনের উৎসর্গ পত্রের কথা পাঠকের মনে পড়তে পারে তা হল কবি সমর সেনের প্রথম কাব্যগ্রন্থ কয়েকটি কবিতা (প্রকাশ কাল : মার্চ ১৯৩৭) উৎসর্গ মোজাফর আহমেদকে— সমর সেন তাঁর নিজস্ব বিশ্বাস থেকে বইটি এভাবেই উৎসর্গ করেছেন।

কবিতার ক্ষেত্রে কবির নিজস্ব ভাষা, diction গুরুত্বপূর্ণ। বাঙালি কোনও কোনও উপন্যাসিকের আঙ্গিকের স্বাতন্ত্র্য নিজস্বভঙ্গি গড়ে উঠেছে— কেউ কাব্যধর্মী (বুদ্ধদেব বসু) কেউ মননধর্মী (খুজ্জিৎপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়); কেউ বা যুক্তিবাদী (গোপাল হালদার), কেউ নিচুতলার প্রতি দরদী সংগ্রামী (মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়)— অর্থাৎ বিশিষ্ট মতাদর্শের ওপরে তাঁরা তাঁদের উপন্যাস গড়ে তুলেছেন। প্রবোধকুমারকে এরকম কোনও সংজ্ঞায় বাঁধা যাবে না। কিন্তু তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলির গঠনকৌশল বিশ্লেষণের দাবি রাখে।

প্রবোধকুমারের *বনহংসী*-র মতো উপন্যাস সমকালীন তরুণ পাঠকদের মনেও চিরস্থায়ী ছাপ রেখে যায় : দীপেন, দ্বিজেন, যমুনা, বরুণা, ক্ষয়িষু সমাজ ও পারিবারিক সম্পর্কের উদাহরণ, সংসারের চাপে পড়া তাদের মা তবুবালা, পাশাপাশি অসহায় অথচ আদর্শে স্থির পিতা এবং সংসারের অসহায় কর্তা মৃগেন্দ্র এবং সমান্তরালে আছে ভাস্বতীঅতনুর সুন্দর সম্পর্কের কথা।

উত্তরজীবনে বিদেশভ্রমণের অভিজ্ঞতার বিবরণ রয়েছে তাঁর *রাশিয়ার ডাইরী*, *পরিব্রাজকের ডাইরী* প্রভৃতি রচনাগুলিতে। প্রবোধকুমারের শেষ বিখ্যাত ও বিতর্কিত রচনা *বনস্পতির বৈঠক*। দেশ পত্রিকাতে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হওয়ার পর গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। সুপ্রিয় সরকার তাঁর *প্রকাশকের ডায়েরি* গ্রন্থে *বনস্পতির বৈঠক*-এর প্রকাশ কলকাতায় সাহিত্য জগতে যে প্রভাব ফেলেছিল এবং বিতর্ক কীভাবে গড়িয়েছিল তার বর্ণনা দিয়েছেন :

তারপর ধারাবাহিকভাবে সাহিত্য জীবনের পটভূমিকায় 'দেশ' পত্রিকায় লিখলেন অপূর্ব 'বনস্পতির বৈঠক'। কিন্তু আকস্মিক একটা অঘটন ঘটলো বাংলা সাহিত্যজগতে নয়, ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে। তার ধাক্কা এসে লাগলো মোঁচাকের আড্ডায়।...

...তা প্ররোধদার ধারাবাহিক লেখা 'বনস্পতির বৈঠক' 'দেশ'-এ বেরুচ্ছে। সেখানে একটা জায়গায় প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রসঙ্গে প্রবোধদা লিখেছিলেন— প্রেমেন্দ্র মিত্রের আসল নাম প্রেমেন্দ্রহবি মিত্র। এছাড়া আবো কতগুলি কথা লিখেছিলেন যা প্রেমেন্দ্রের কাছে মনে হতেছিল অবমাননাকর। আর এই নিষেই বেশ তীব্রভাবে দুজনের মধ্যে বিরোধ

বেধে যায়। প্রেমেন্দা মৌচাকের আড্ডায় আসা বন্ধ করে দিলেন। আমাকে জানিয়ে দিলেন তাঁর ফোডের কথা। আমার কিছু করার ছিল না।

‘দেশ’ পত্রিকায় চিঠি লিখে প্রেমেন্দা জবাবদিহি চাইলেন প্রেমেন্দ্রহবি মিত্র নামটি প্রবোধকুমার কোথায় পেলেন তাব উপযুক্ত প্রমাণ দাবী করে। এই নিয়ে অনেক চিঠি বেবোতে আবস্ত কবলো ‘দেশ’ পত্রিকায়। ‘বনস্পতির বৈঠক’ যখন বই হয়ে বেবেলো তাব ‘পূর্বভাষণে’ প্রবোধকুমার লিখলেন,—

তাব আদিনাম নাকি প্রেমেন্দ্রহবি, এটি যখন শুনি (১৯২৫-২৬), তখন তাঁকে চোখে দেখিনি। তাঁর কাশীবাসী এক ভাই ছিলেন, তাঁর নাম ছিল সম্ভবত সহায়হরি। এটি কাশীবাসী আমাদের উভয়েবই বন্ধু কেশরনাথ মুখোপাধ্যায়ের মুখে শোনা। সহায়হরি সূত্রে প্রেমেন্দ্রহবি হতে পারে ধরে নিয়েছিলম। যাই হোক, প্রেমেন্দ্র তাঁর শৈশবেব ও বাল্যকালের নামের মধ্যপদটি প্রকাশ কবতে কেন কুণ্ঠিত হল আমি জানিনে।

চিঠিতে একটু আপসধর্মী ভাব থাকলেও, প্রেমেন্দা সেটা মনে নিলেন না। মৌচাকের আড্ডাব তানপুরার পাঁচটি তাবের একটি তাব বেসুরো হয়ে গেল। প্রেমেন্দা আড্ডা ছাড়লেও আমার সঙ্গে ষোগাযোগ ছাড়েননি এতটুকুও।

বয়সেব জনাই হোক কিমবা ঘনিষ্ঠ বন্ধুদেব মধ্যে এই অপ্রীতিকর সম্পর্কেব জনোই হোক, বাদ বাকি সদস্যরা ঠিক করলেন এখন থেকে সপ্তাহে একদিন অর্থাৎ শুক্রবার আড্ডা বসবে। প্রেমেন্দ্রবিহীন আড্ডা এইভাবে চলতে লাগলো। কথটা বোধ করি প্রেমেন্দার কানেও পৌছায়। একদিন ফোন কবে বললেন, ‘ঐ দিন বাদ দিয়েই আমি তোমার ওখানে যাবো।’ আসার আগে ফোন কবে জেনে নিতেন প্রবোধদার আসাব সম্ভাবনা আছে কিনা। প্রেমেন্দা বেশিভ ভাগ দিন আসতেন তরুণ রায়েব গাড়িতে। ফিবতেন আমাব সঙ্গে। তাঁকে আমি বাড়ি পৌছে দিতাম।

কিছুদিন থেকেই অচিন্ত্যকুমারের শরীর ভালো যাচ্ছে না। এই বয়সে অসুখ-বিসুখ হওয়াটা আশ্চর্যেব নয়। কিন্তু তাবতেই পারিনি হঠাৎ অচিন্ত্যকুমার মারা যাবেন। ব্যথা-বেদনা, দুঃখ যখন গভীর হয়, মনটাও তখন আপনা থেকে নিথর হয়ে আসে।

ফোনে ভবানীদাব বিবাদকণ্ঠ ভেসে এলো— তোমাব গাড়িতে প্রবোধ ও আমাকে তুলে নিও।

গাড়িতে কাবো মুখে একটি কথা নেই। বঙ্গনী সেন বোডে অচিন্ত্যকুমারকে শেষ প্রণাম জানিয়ে ফিবছি। অনেকটা সময় কেটে গেছে নীববতাব মধ্যে।

হঠাৎ আমাকে চমকে দিয়ে প্রবোধদা বললেন— জ্ঞানো-বাচ্চু, প্রেমেনের নাম যে প্রেমেন্দ্রহবি, একথা আমাকে অচিন্ত্যই বলেছিল।

—তাই যদি হয় তাহলে ‘বনস্পতিব বৈঠকে’র ভূমিকায় আপনি অন্য কথা লিখেছিলেন কেন?

—অচিন্ত্যকে বলেছিলাম চিঠি লিখতে— ও লেখেনি। তাই বাধ্য হয়েই আমাকে ও কথা লিখতে হয়েছিল।

বেশ কিছুক্ষণ নীববতাব পর বিষণ্ণ কণ্ঠে ভেসে এলো— ‘প্রেমেন-অচিন্ত্য দু’জনেই অভিন্নহৃদয় বাল্যবন্ধু। এই অচিন্ত্য হয়তো চায় নি যে এই সামান্য একটা বিষয় নিয়ে প্রেমেনের সঙ্গে কোনাবকম মনোমালিন্য হয়। এ নিয়ে আমাব মনেও কিছু ফোড ছিল। আজ কিন্তু মনে হচ্ছে, অচিন্ত্যব দিক থেকে অচিন্ত্য ঠিকই করেছিল।’

ভবানীদা একটা কথাও সাবাক্ষণ বলেননি। নীরবই ছিলেন। মনটা হয়তো স্মৃতিব

জ্বালা জড়িয়ে গিয়েছিল। বেহালায় ভবানীদাকে নামিয়ে দিয়ে, গোলপার্কে প্রবোধদাব বাড়িব সামনে গাড়ি এসে দাঁড়াল। গাড়ি থেকে নেমে যেন স্বগতোক্তির মতোই বললেন— “এটা না কবলেই পারতুম।” আমি বিস্মিত হয়ে কোনো প্রশ্ন করবাব আগেই তিনি দবজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেলেন।”

কিন্তু প্রবোধকুমারের যা আমাদের বিস্মিত করে তা হল সূঠাম সুস্বাস্থ্যে ভরপুর এই চঞ্চল পরিব্রাজক ১৫০টির অধিক* গ্রন্থ রচনার সমাহিত মুহূর্তগুলি। ধ্যানের সময়, বা কনসেনট্রেশন কী আশ্চর্য মনোবলে বের করে নিয়েছেন। প্রাত্যহিকতার উপরিতলে, তিনি অস্থির চঞ্চল, ভেতরে রচনার সময় ধ্যানে স্থির।

* প্রবোধকুমার সদস্যদের মোট গ্রন্থসংখ্যা এখনও অনিশ্চিত। কেউ বলেছেন ১২৪টি, কারও মতে ১৩৩টি, কবাব মতে ১৫০টি আবার কেউ বা বলেছেন ১৫৮টি।

শুরুত্বপূর্ণ। লোকসংগীত একাধারে লোকসমাজের জীবন, পেশাগত পরিচয়, আনন্দ, বেদনা, শিল্প, সাহিত্য, কাব্য ও ঐতিহাসিক ঘাত-প্রতিঘাতের নান্দনিক প্রতিরূপ। এ সংগীত আবার দৈনন্দিন সমাজজীবনের ধারাভাষ্যও। দেশজ সংগীত বিষয়ক আলোচনার সঙ্গে ভূ-প্রকৃতি ও ভৌগোলিক পরিমন্ডলের একটা নিবিড় যোগাযোগ থাকা খুবই স্বাভাবিক। এর রসগ্রহণ করতে গেলে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও সূচেনতা গড়ে তোলা দরকার। ভাষা উপভাষার প্রসঙ্গে তা অবশ্যই বিবেচ্য। এছাড়াও মনে রাখা দরকার যে অঞ্চলভেদে ভূ-প্রকৃতির অবস্থান ও চরিত্র অনুযায়ী বিভিন্ন আবহাওয়া দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় শিল্পীর কণ্ঠ তথা সেখানকার সাংগীতিক পরিকাঠামো (Melodic Superstructure)-এর ফলে খুব সহজাতভাবেই গড়ে ওঠে স্বর প্রকাশের বিভিন্ন রূপভেদ (Timbre), বাগভঙ্গি (Intonation) ইত্যাদি। তার সঙ্গে সুরের মিশ্রণে অজান্তে তৈরি হয়ে যায় দেশজ সংগীতের গায়কী অর্থাৎ গায়নশৈলী। মেঠোগলা বা কণ্ঠস্বরের গ্রাম্যতা গুণ (Rusticity) নির্ভর করে শিল্পীগোষ্ঠীর শ্রমপ্রক্রিয়া, সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ-জল-মাটি-হাওয়া, জাতিগত বৈশিষ্ট্য (Ethnic Structure) এবং অনেকাংশে তার জন্মসূত্রে পাওয়া বংশপরম্পরাগত (Racial) শারীরিক কাঠামোর ওপর। এইভাবেই কণ্ঠস্বরের উচ্চতা-নিচতা (Pitch), তীক্ষ্ণতা (Intensity), কম্পন (Vibration) প্রক্ষেপণ (Throwing) — এমনকি বিবিধ স্বরের মীড়-পদ্ধতিও একটা বিশেষ চরিত্রলাভ করে। হোমস্‌গে বিশ্বাসের কথায় “লোকসংগীত গুরুমুখী নয়— গণমুখী। লোকসংগীতের কোন ‘ঘরানা’ নেই, আছে ‘বাহিরানা’। এই আঞ্চলিকতাকেই আমি ‘বাহিরানা’ বলছি।”

আঞ্চলিকতা, সুরের স্বর-সংহতি ও প্রচলিত ভাষার বিচারে বাংলা লোকসংগীতের তিনটি মূল কাঠামো। এরা অঞ্চল বিশেষের বৈশিষ্ট্য বহনকারী। উত্তর বাংলার সমতলে *ভাওয়াইয়া*। নদীমাতৃক পূর্ববঙ্গে *ভাটিয়ালি*। আর রাঢ়বাংলার গীতিরূপ *ঝুমুর*। মধ্যবঙ্গের গীতিরূপকে *বাউল* ধারা বলে চিহ্নিত করেছেন হোমস্‌গে বিশ্বাস। মধ্যবঙ্গ বলতে যদি পদ্মার পশ্চিমপাড় অর্থাৎ অধুনা বাংলাদেশ-রাষ্ট্রের ফরিদপুর, কুষ্টিয়া, খুলনা, যশোর, আর এপার বাংলার নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, উত্তর চব্বিশ পরগনার বিস্তৃত অঞ্চলকে ধরা হয়, তবে দেখা যাবে যে সেখানে বাউল তথা সুফী মতবাদ থেকে সৃষ্ট নানারকম দরবেশী গানের ব্যাপক প্রচলন। কিন্তু বাউলকে কি কোনো ভৌগোলিক সীমায় আবদ্ধ করা যায়? সে তো সর্বত্র ঘুরে বেড়ায় তার মনের মানুষের খোঁজে। ভাবের আপাত সামঞ্জস্য থাকলেও অঞ্চলভেদে বাউল গানের সুর-ছন্দ-ভাষা পরিবর্তিত হয়। ভাবনা এক হলেও এই কারণেই শ্রীহট্টের হাছন রাজা (হাসন রাজার) বা শেখ বানু (ভানুর) গানের সঙ্গে লালন ফকির, গগন হরকরা থেকে নবনী দাস, ত্রিভঙ্গ খ্যাপা প্রমুখের বাউল গানের স্বরূপ ও তারতম্য নির্ধারিত হয়। কাজেই কেবলমাত্র মধ্যবঙ্গকে বাউল রীতির জন্য চিহ্নিত করলে চলবে কেন? বাউলের সুর, বাউলের ছন্দ ইত্যাদি বহুল ব্যবহৃত কথাগুলির যথার্থতা নতুন করে বিবেচনা করা দরকার।

এবারে ফিরে যাই উত্তর বাংলার প্রধান গীতধারা *ভাওয়াইয়া* প্রসঙ্গে। ভয়াল অথচ স্নেহময়ী নদী, অরণ্য আর পাহাড়ের আশ্রয়ে লালিত রাজবংশী ও কোচ জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত এই সমতল। এই ভাওয়াইয়ার মৈষাল আর গাড়িয়ালরা কিন্তু তাদের সুর ও ছন্দে দুলাতে দুলাতে পৌঁছে যায় রাজনৈতিক সীমানা ছাড়িয়ে ওপার বাংলার রংপুর আর পূর্ব দিনাজপুরের গ্রাম নগরে। শুধু তাই কেন? এ গীতধারা চলে গেছে রাজ্যের সীমানা ছাড়িয়েও। গেছে

প্রতিবেশী অসম রাজ্যের গোয়ালপাড়ায়। অবশ্য এ অঞ্চলগুলি একসময় ছিল বাংলার সীমার মধ্যেই। অসমে এ গান গোয়ালপাড়িয়া নামেই পরিচিত। ভাওয়াইয়ার নামকরণ নিয়ে নানাবিধ মতামত রয়েছে। তার মধ্যে সবচাইতে যুক্তিগ্রাহ্য মতানুসারে মরানদীর দোলা জমিতে বা চরে কাশবনে বা নলখাগড়ার জলাভূমিতে গবাদি পশুচারণক্ষেত্রে ‘ভাওয়া’তে বা মহিষবাথানে যারা মহিষ চরায় তারা যেহেতু এ গানের স্রষ্টা সেই কারণে এ গানের নাম ভাওয়াইয়া বা মৈষাল তথা মৈষালবন্ধুর গান। পরবর্তীকালে অবশ্য মৈষালকেন্দ্রিক ভাওয়াইয়া মৈষালী বা সোয়ারী চালের ভাওয়াইয়া বলে আখ্যাত হয়েছে। উদার প্রান্তরে কোনো বৃক্ষচ্ছায়ে ঘুঘুডাকা দুপুরে দোতরার ড্যাং-এর সঙ্গে আপন মনে গান ধরত এই মৈষালরা। প্রান্তরের গান বলে কোনো কোনো অঞ্চলে ভাওয়াইয়া গানকে বলা হয় পাথারিয়া বা পাছারিয়া গান। নারীকূলের মর্মবেদনা, বিরহবিচ্ছেদজনিত কবুণ রস সোচ্চারিত হয় এই গানে পুরুষের কণ্ঠে। ভাওয়াইয়াকে সামন্ত সমাজের বিরুদ্ধে নারীজাতির প্রতিবাদের গান বলেছেন হেমাঙ্গ বিশ্বাস। এই পরোক্ষ অভিপ্রকাশের জন্য দায়ী রক্ষণশীল সামাজিক অনুশাসন। সমাজপতিদের আশঙ্কা ছিল যে এইসব গান নারীকণ্ঠে প্রত্যক্ষভাবে মূর্ত হয়ে উঠলে তাদের কুলধর্ম ব্যাহত হয়ে উঠতে পারে। ফলে সামাজিক শাস্তি বিদ্রিষ্ট হবার অকারণ আশঙ্কাও ছিল। মিথ্যা ও স্রষ্টাচারের আবরণ সরে গিয়ে সত্য উদ্ঘাটিত হতে পারত। শুধু তাই কেন? এইসব স্বার্থঘেষীদের অত্যাচারে পুরুষরাও প্রকাশ্যে লোকালয়ে ভাওয়াইয়া গাইতে পারত না। সেকালে গায়করা তাদের বাদ্যযন্ত্র লোকালয়ের বাইরে কোনো গাছের ডালে লুকিয়ে রাখত। এ যেন সেই ‘অজ্ঞাতবাস’ কালে শমীবৃক্ষে পাণ্ডবদের অস্ত্রশস্ত্র লুকিয়ে রাখার মতো। কর্মের অবসরে তারা সমবেত হয়ে দোতরা, ব্যাণা, সারিন্দা, বাঁশী, খোল, জুড়ি ইত্যাদি নিয়ে মাঠে বসে গান করত। প্রচলিত ছড়ায় পাওয়া যায় :

সারিন্দা বাজায় সাউদ সওদাগর, বাঁশী বাজায় চোর।

ব্যাণা বাজায় ত্যানা পিন্দা দোতরা হাবামখোর।

এইসব অপপ্রয়াস খুব সংগত কারণেই আজ শিক্ত। পুরুষ তো বটেই— নারীরাও এখন প্রকাশ্যে ভাওয়াইয়া গানে অংশ নিচ্ছেন সদর্পে, নির্ভয়ে। অধ্যাপক ড. আশুতোষ ভট্টাচার্যের উক্তি এই সূত্রে উল্লেখ করতে চাই :

ভাওয়াইয়া গান রিক্ততার বেদনায় মধুর হইয়া ওঠে। ইহাব সুরের মধ্যে একটি মাদকতা আছে। দ্বিপ্রহরের নির্জনতার কিংবা নিশীথের স্তব্ধতার ভিতর হইতে একটি মর্মভেদী বেদনায় সুব ইহাতে উদ্ভিত হইয়া যেন আকাশ বাতাস আচ্ছন্ন কবিতা দেয়। তাহাতে শ্রোতার মন সহজে অভিভূত হইয়া যায়।

ভাওয়াইয়ার ভাব সম্পর্কে ড. হরিপদ চক্রবর্তী লিখছেন :

ভাওয়াইয়া প্রেমের গান। আরও তীক্ষ্ণভাবে দেখলে বলা যায়, প্রোথিতভর্তৃকাব গান বা বিপ্রলব্ধ শৃঙ্গার রসের গান। নারীর বিবহব্যাকুলতাই এ গানের মর্মবাণী; নাযক কোথাও সাধু, নাবিক, মইষালবন্ধু, মাহুতবন্ধু, কোথাও বা বৈদ। যৌবন বেদনার প্রকাশ স্বভূ।

অন্যান্য ধারার লোকসংগীতের তুলনায় ভাববাদী দর্শনের প্রভাব কম। বরং অনেকাংশে পার্থিব। জীবন-ঘনিষ্ঠ। তিস্তা-তোষা এ গানে যমুনায় বুপান্তরিত হয় নি। এর নাযক-নাযিকা

রাধা-কৃষ্ণের যুগল মিলনে আবদ্ধ নয়। এ গানের কালা গরু-মোষ চরায় বা দাঁড় বায়। আবার অর্থের বিনিময়ে অসমঞ্জস বিয়েকে ‘বেচিয়া খাওয়া’ বা দশাপড়া (বৃদ্ধ) স্বামীকে ‘পানিয়া মরা (অপুষ্টি ও বার্ধক্যহেতু হাতে-পায়ে হাজার আক্রান্ত) বলতে দ্বিধা লাগে না এ গানের নায়িকার। ভাওয়াইয়া গবেষক ও ভাওয়াইয়ার ভূমিপুত্র গায়ক ড. সুখবিলাস বর্মার মতে পঞ্চদশ বা ষোড়শ শতকে এই শৈলীর গানের উদ্ভব। তখন থেকেই গানগুলি কয়েক শতাব্দী ধরে মুখে মুখে প্রচারিত হয়ে আসছে। ভাওয়াইয়া গানের প্রথম লিখিত লিপি বা কথা পাওয়া যায় ড. গ্রীয়ারসন কর্তৃক ১৯০৪ সালে প্রকাশিত *Linguistic Survey of India* গ্রন্থে। ভাওয়াইয়ার ভাব ও বিষয়বস্তু বড়ো, না সুর ও ছন্দ বড়ো তা নিয়ে মাঝে মাঝে তর্ক বাধে। এ সম্পর্কে হেমাঙ্গ বিশ্বাস বলছেন :

অপূর্ব লোক কাব্যের দিক ছেড়ে দিলেও, শুধু মেলোডির আকৃতি ও তীক্ষ্ণতার দিক দিয়ে বাংলা কেন ভারতের লোকসঙ্গীতের বিরল সম্পদ এই ভাওয়াইয়া।

এই গীতধারার স্বরকাঠামো সম্পর্কে সুন্দর আলোচনা করেছেন প্রাগুক্ত ড. বর্মা তাঁর ‘ভাওয়াইয়া’ গ্রন্থে। অবশ্য এর আগেই সংগীতচার্য্য সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী সংগীত বিজ্ঞানের নিরিখে, ভাওয়াইয়ার স্বরসংহতিকে শাস্ত্রীয় খান্সাজ ঠাটের অন্তর্গত বলে যুক্তি দেখিয়েছেন। ভাওয়াইয়ার সুর আরোহণে মধ্যসপ্তকের ষড়জ থেকে ক্রমশ এগিয়ে কোমল নিখাদে দীর্ঘ বিরাম নিয়ে অবরোহণে ফিরে আসে। তার সপ্তকের ষড়জে যেতে চায় না। তবে খান্সাজের ‘ন’-এর চাইতে ভাওয়াইয়ার ‘নি’ কিছুটা চড়া। আরও বিচার বিশ্লেষণ করলে হয়ত দেখা যাবে যে ভাওয়াইয়ার মূল স্বরসংগঠন (দক্ষিণী) ‘হরি কাঞ্চোজী’ ঠাটের অনুসারী। রাণাঘাটের সংগীতশাস্ত্রী শিবকুমার চট্টোপাধ্যায় এই গীতরীতির প্রকৃতিগুলি বিশ্লেষণ করে যে দুটি ধুন বর্গের রাগকে চিহ্নিত করেছেন তা হলো ‘আশমাণ্ড’ ও ‘প্রতাপবরালী (রী)।’ প্রথমটির চলন: সা রে ম, গ রে গ সা। রে গ রে ম ধনি সা। সাধ, নি প, ধ ম সা। প গ রে গ সা। অপরটির চলন : সা রে ম গ রে, রে ম প প ধসা। সানি ধ প ধ প ম। প ধ প ম গ রে। সা রে প ম গ রে সা।

চলমান মহিষ পৃষ্ঠে মৈষালকে যদি ভাওয়াইয়ার স্রষ্টা বলে ধরা হয় তবে সংগতভাবেই তার বাহনের চতুষ্পদে চলার উপযোগী চার ছন্দের তালে নিবদ্ধ হতেই পারে ভাওয়াইয়া। এটা শ্রম প্রক্রিয়া সঞ্জাত শিল্পকর্ম। এই গীতধারার আরেকটি বৈশিষ্ট্য প্রধানত কথা ও সুরের আবেগকে প্রাণবন্ত করে তুলতে স্বরভঙ্গ। স্বর প্রক্ষেপে এমন ধরনের গলাভাঙ্গা (yodeling) বা গলার খোঁচ বা লৌকিক অলংকার অন্যত্র পাওয়া যায় না। এমন কি পাশ্চাত্য সংগীত-রীতির সঙ্গেও মিল নেই। কুশলী সংগীতশিল্পী ও নট কিশোরকুমার তাঁর অনেক গানে যে Yodelling-এর ব্যবহার করেছেন তার সঙ্গে ভাওয়াইয়ার স্বরভঙ্গ রীতির বিস্তর ফারাক। ভাঙ্গা মাটির পথ বা উঁচু-নীচু মেঠো পথে চলমান গায়কের আবেগবুদ্ধ কণ্ঠস্বরের উচ্চাচ কুহর কম্পনে সৃষ্ট এই বিস্ময়কর আকুলতা এ গানের ক্ষেত্রে একান্ত নিজস্ব এবং অনিবার্য। শিল্পকর্ম হিসেবে এ বড়ো কঠিন কাজ। শ্রমপ্রক্রিয়া ও সহজাত বৃত্তি ব্যতীত একে আয়ত্ত করা সম্ভব নয়। বাণীর ভাব, সুর-সংহতি এবং গায়নরীতি বিচারে ভাওয়াইয়া গানের বিভিন্ন শ্রেণি বিন্যাসের উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন— মইষালী বা সোয়ারী, ক্ষীরোল, চিতান, কবুন বা গড়ান এবং দরিয়া বা দীঘলনাসা। বল বাহুল্য এই শ্রেণি বিভাজন বিশেষ কোনো কঠোর নিয়মে আবদ্ধ নয়। এখানে দরিয়া শৈলীরই প্রাধান্য। এই কবুনরাসাম্বন্ধ ভাবগভীর

গীতরীতির হ্রতলে সৃষ্টি হয়েছে সূতীক্ষ্ণ বিদ্রূপ আর বিচিত্র রঙ্গরসপ্রধান চটুল ছন্দের চটকা গান। ভাষা ও বাগভঙ্গি বিচারে ভাওয়াইয়ার স্বগোত্র হলেও সুর-ছন্দ বা ভাবের দিক থেকে এদের মিল নেই। কাজেই ভাওয়াইয়া দ্রুত ছন্দে পড়লেই চটকা হয় না। এর তাল প্রধানত ত্রিমাত্রিক খেমটা জাতীয়। উত্তর বাংলার সুখ্যাত লোকনাট্যগুলিতে এই ভাওয়াইয়া ও চটকার বহুল প্রভাব রয়েছে। সেই সঙ্গে ব্রতধর্মী পালাগুলিতে লক্ষ করা যায় পাঁচালির টানাটানা ঢং। ভাওয়াইয়া গানের উপরোক্ত রীতি উত্তর বাংলার সর্বত্র সমানভাবে প্রচলিত একথা বলা যায় না। জলপাইগুড়ি জেলার তিস্তাবুড়ির গান বা ভৈদৈখেলি বা মেহেনীখেলি গানের সুর ও ছন্দ ভিন্ন। ব্যবহৃত ভাষাও অপেক্ষাকৃত প্রাচীন ও লৌকিক। তিস্তাপারের জেলে সম্প্রদায়ের মধ্যে এর প্রচলন। এদের একটি বিয়ের গানে অসমঞ্জস বিবাহের শিকার এক গ্রাম্য কিশোরীর খেদ ও অসামাজিক রীতির প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে। এমন একটি গান : টাকা খায়া মুখৎ বান্ধিনী ডাঙ্গাও। মর্মার্থ হচ্ছে বিয়ের জন্য টাকা খেয়ে রেখেছে এমন মুখে ঝাঁটা ছুঁড়ে মার। হয়ত তার বাবাকে উদ্দেশ্য করেই বলছে কন্যা। আবার আলিপুরদুয়ারের জনবসতি এলাকাতে বসবাসকারী কোচ ও রাভা সম্প্রদায়ের গানের ভাষা ও সুরের সঙ্গে ভাওয়াইয়ার কোনো মিল পাওয়া যায় না। ভাওয়াইয়ার সুরধারা যখন দিনাজপুরে নেমে আসে তখন তার মধ্যে ভাটিয়ালির সঞ্চরণ (Transition) লক্ষ করা যায়। আবার উত্তর বাংলার সিংহদ্বার মালদার প্রচলিত দেশজ সংগীত সম্পূর্ণভাবে ভিন্ন। ভৌগোলিক অবস্থান এবং দীর্ঘকাল ব্যাপী রাজশাসন বোধহয় এর মূলে। এর ফলে কথ্যভাষায় আরবি ফারসি উর্দু ও হিন্দির অনুপ্রবেশ ঘটেছে। বাচনভঙ্গিতেও তার প্রভাব।

‘বহুগাথা-কিংবদন্তীর নকসী কাঁথা মালদহ’। এখানকার প্রধান সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য গভীরা। বিকৃত ইংরাজিসহ স্থানীয় কথ্য ভাষায় সংলাপ, গান ও বিচিত্র দেহভঙ্গিমা সহ নাচে সমৃদ্ধ এই প্রবহমান লোকসংস্কৃতি। এর গানের সুরে একাধিক শাস্ত্রীয় সুর ও তালের মিশ্রণ। মিশ্র মাঝখান্বাজে রচিত ‘মায়ের পায়ের জবা হয়ে’ গানখানির প্যারোডি পাওয়া যায় গভীরার অনেক গানে। তার সঙ্গে তালফেরতা। ব্যঙ্গাত্মক উক্তি ও তীক্ষ্ণ শ্লেষাত্মক কটাক্ষ সহ হাস্যরসের প্রসবণ থাকলেও চটকার ব্যবহার গভীরাতে পাওয়া যায় না। লৌকিক ও শাস্ত্রীয় সুর ও ছন্দের অপূর্ব সহাবস্থান গভীরা গানে। তেমনি এই জেলারই দিয়ারা অববাহিকায় রতুয়া-মানিকচক অঞ্চলে প্রচলিত ডোমনি পালা গানে খুঁটা ভাষায় ভোজপুরী গানের বহুল প্রভাব লক্ষ করার মতো। প্রচলিত কথ্য ভাষায় প্রধানত চতুর্মাত্রিক তালে গীত ‘দেওরা-ভাউজী’ গান ডোমনি পালার অন্যতম আকর্ষণ। একটি গানে রয়েছে : ‘ও ভাউজী শাক তুইলে দিব তুমার আঁচলাতে। চল না গে মহাস্বনের ক্ষেতে।’ মালদা জেলার আই হো— মুচিয়া অঞ্চলে অম্মান মাসে উদ্‌যাপিত কুমারী মেয়েদের সাইনবার গান ব্রতধর্মী। টানা টানা ছন্দে সমস্তরে গাওয়া হয়। মুর্শিদাবাদ ও তৎসংলগ্ন মালদার গ্রামাঞ্চলে আলকাপ গানের প্রচলন আছে। সামাজিক প্রহসন জাতীয় এইসব পালাগানের সুরে প্রচলিত হিন্দি ও বাংলা ছায়াছবি ও রেকর্ডের গানের অনুকৃতি পাওয়া যায়। একটি গানে পাওয়া যায় : ‘গুড় মিষ্টি, মধু মিষ্টি, হে কন্যা আর মিষ্টি চিনি। তার চেয়ে অধিক মিষ্টি তোমার হাতের পানি।’ এক বিশেষ দেহভঙ্গিমায় হাতে তাল রেখে গাওয়া হয় এইসব গান। সুরের কারুকার্য কম। কেউ কেউ বলেন যে উত্তরের ধারার সঙ্গে রাড়ের

ছিচোর বা সমজাতীয় নৃত্যগীতাভিনয়ের সংমিশ্রণে পুষ্টিলাভ করেছে এই আলকাপ। এপালা শুরু হয় বন্দনাগীত দিয়ে।

এবারে আসি বাংলার দেশজ সংগীতের প্রাণভোমরা *ভাটিয়ালি*-র প্রসঙ্গে। প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে ভাওয়াইয়া ও ভাটিয়ালির মধ্যে কিছুটা যোগসূত্র থাকলেও ভাটিয়ালির ক্ষেত্রে অনেক ব্যাপক। ভাব আরও গভীর। বৈচিত্র্য বৈভবে আরও সমৃদ্ধ। নদীর ভাঁটার টানে নৌকো ভাসিয়ে মাঝিরা যে গান গায় তা থেকে ভাটিয়ালির উদ্ভব হলেও দিনের শেষে গোধূলি বেলায় গরুর পাল নিয়ে ঘরে ফেরার পথে মন উদাস করা রাখালিয়া গানও ভাটিয়ালি। আবার জীবন সায়াহ্নে ভবতরী পারে বিশ্বাসীর আকৃতিও তো ভাটিয়ালি। সুরের রাজ্যে ভাটিয়ালি যেন কুবের। অফুরন্ত সুর সন্তার। এই সুর বাঙালির তন্ত্রীতে স্পন্দন জাগায়। লোকসংগীত বিজ্ঞানীদের মতে সুরের স্বরসংহতি ভাটিয়ালিকে প্রায় ঠাটের মর্যাদা দিয়েছে। শাস্ত্রীয় সংগীতের সুনির্দিষ্ট স্বরে সীমাবদ্ধ (codified) না হলেও ভাটিয়ালির স্বরসংগঠন সমগ্র পূর্ববঙ্গের সাংগীতিক কাঠামো (Melodic Structure) বলে স্বীকৃত। তবে স্থানভেদে কিছু স্বর প্রয়োগের বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়। আমরা জানি যে শুদ্ধ গাংকার দিয়েই ভাটিয়ালির পরিচয়। কিন্তু হেমাঙ্গ বিশ্বাস বলছেন : “শ্রীহট্ট ও ত্রিপুরার সীমান্তে কোনো কোনো সময় ভাটিয়ালি অবরোহণে কোমল গাংকারের স্পর্শে অপরূপ মাধুর্য সৃষ্টি করে। ধৈবত থেকে নেমে আবার ধৈবতে উঠে, ঝটকা মেরে নীচে নেমে আসার চঙ্কটি শ্রীহট্টের একটি বৈশিষ্ট্য।” ভাটিয়ালির সঙ্গে শাস্ত্রীয় কঁসৌলী-ঝিঝিট রাগিণীর সাদৃশ্য সম্পর্কে সুরেশচন্দ্র চন্দ্রবতীর মন্তব্যও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য রচিত *বাংলার লোকসাহিত্য* গ্রন্থের পরিশিষ্টে এ প্রসঙ্গে তাঁর রচনাতে পাওয়া যায় : “পূর্বভারতীয় সংগীতে ঝিঝিটের দুই রূপ স্বীকৃত— এক, যা খাদের বা মন্ড্র সপ্তকের পঞ্চম পর্যন্ত নেমে আসে এবং অন্যটি, যা খাদের বা মন্ড্র সপ্তকের ধৈবত পর্যন্ত গিয়েই থেমে যায়। রাগসংগীতে এই শেষোক্ত প্রকার ঝিঝিটের নাম ‘কঁসৌলী ঝিঝিট’। মুদারার পঞ্চম থেকে উদারার কোমল নিখাদে নেমে ধৈবতে যে বিরাম— ভাটিয়ালির পকড় বা প্রাণ সেখানেই। পল্লিগীতির ঝিঝিট বা এই কঁসৌলী ঝিঝিটের স্বরূপ এই রকম : সা রে ম। পম গ রে সা ণ ধ। ধসা রে গ, রে গসা।” শেষোক্ত প্রকার ঝিঝিটের মূল রয়েছে এই পল্লিগীতির মধ্যেই। তিনি আরও বলছেন যে ভাটিয়ালিকে পূর্ববঙ্গের বহুবিধ লোকগীতির ভিত্তিস্বরূপ ধরা যায়। হেমাঙ্গ বিশ্বাস লিখছেন : “অধিকাংশ লোকসংগীত শুঁড়ব জাতীয়— অর্থাৎ পঞ্চস্বরী, পঞ্চস্বরিক। বাংলার লোকসংগীতের বৈচিত্র্য ও ঐশ্বর্য্যের একটি বড় কারণ (বৈশিষ্ট্য) এই যে, কড়ি মধ্যম ছাড়া সব কটি শুদ্ধ ও কোমল স্বরেরই প্রয়োগ এতে পাওয়া যায়। ...মুদারার পঞ্চম থেকে উদারার কোমল নিখাদে নেমে ধৈবতে যে বিরাম— ভাটিয়ালির পকড় বা প্রাণ সেখানেই।” এমন বৈচিত্র্যময় গীতিরীতিকে কোনো নির্দিষ্ট শাস্ত্রীয় রাগের নিগড়ে বেঁধে রাখা যায় কি? তবে লিখিতভাবে একটা সুরশৃঙ্খলের আভাস পাওয়া যায়। ভাবের ভারে ভাটিয়ালি বিভোর। তবে স্থায়ী রস কবুণ। বেদনাতুর কবুণ রসে সিক্ত বাংলার *নিমাই সম্যাস* প্রভৃতি পালাতেও এই ভাটিয়ালিরই প্রলেপন। মধ্যযুগীয় লোককাব্য *মনসামঙ্গল*-এ বিভিন্ন রসের সমন্বয়। কিন্তু পূত্রশোকে কাতর আর অভাগিনি বেহুলার বুকফাটা আর্তনাদে ভাটিয়ালির জুড়ি নেই। অবশ্য এটা পূর্ববঙ্গের মনসাগীতে যতখানি প্রখর অন্যত্র ততটা নয়। দেশ বিভাগ সমগ্র বাঙালি জাতিকে

তার স্বাভাবিক সরল গ্রামীণ জীবন থেকে তুলে এনে-নিষ্ক্ষেপ করেছে আধুনিক ঘূর্ণাবর্তে। সংস্কৃতিসম্পন্ন জাতি হিসেবে আজ সে নিজ ঘরে পরবাসী। সেই স্নিগ্ধ মাটি নেই। নেই সেই দুকূলভাসানো নদী। এপার ওপার ঝাপসা করা নদীর কিনারা নেই। প্রমত্তা নদীর জোয়ার ভাটা নেই। মন্ডর ভাটার টানে পালটানা নৌকার মাঝির হালে বসে থাকা নেই। দিনান্তের স্নান আলোকে তার ভাবুক চিন্তে আগামী দিনের সোনালি স্বপ্ন নেই। অন্তরে গান নেই। অধরে স্মিত হাসি নেই। বাঙালির প্রাণের গান ভাটিয়ালি এ পারের মানুষের কাছে— এ প্রজন্মের কল্পনায় কেবলই ধূসর চিত্রপট। অগ্রণী প্রাবন্ধিক নারায়ণ চৌধুরীর কথায়: “ভাটিয়ালি... বেদনাপীড়িত মানুষের ক্রন্দনপরায়ণতার শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি। ভাটিয়ালি সুরের ভিতর সুস্পষ্ট একটি wailing বা কান্নার ভাব আছে।... বিশিষ্ট মানুষের রূপকের আশ্রয়ে একজোড়া স্ত্রী-পুরুষের বিরহকাতরতা কান্নার বেদনায় মিশে দুর্নিবার আবেগের তাড়নায় আমাদের অন্তরকে মথিত করে তোলে। এ গানে কথা বড় কি সুর বড় সে প্রসঙ্গ অবাস্তব। পরস্তু কথা ও সুরের সুসামঞ্জস্য ঐক্যের মধ্যে তার সার্থকতা। ...পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শ্রেষ্ঠ লোকসঙ্গীতের গঠনের ভিতর একই প্রকার কান্নার ভাব লক্ষ্য করা যায়। এ কান্না আদিম মানুষের কান্না। বিরহবেদনার অন্ধকার গুহামুখ থেকে উচ্ছ্বিত হয়ে প্রকাশ্য দিবালোকে মুখ ধুবড়ে পড়েছে।... সর্বত্র লোকগীতির সুরে এই কান্না ভেঙে পড়েছে।” আদিত ভাটিয়ালিতে ছিল বাস্তব জীবন-নির্ভর কথা, ব্যথা, নদী ও নৌকা। ক্রমে এলো দার্শনিকতা, এলো রাধা-কৃষ্ণ তত্ত্ব। এরা কিছু নিতান্তই পার্থিব চরিত্র হয়ে ঠাই পায় ভাটিয়ালিতে। ভাটিয়ালির করুণ রস আর রাধা-কৃষ্ণ মিলনের অপূর্ণতা জনিত বিরহব্যাকুলতা জন্ম দিয়েছে অফুরন্ত বিচ্ছেদী গানের— যা এই গীতধারার শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন। ‘ভালবেসে কাঁদিতে হবে জানি না স্বপনে’, আবার ‘রাই বিচ্ছেদে প্রাণ বাঁচে না’, ‘শুনায়ে শাস্ত কর মন আমার রাধা শ্রীবৃন্দাবনে আছে গো কেমন’ প্রভৃতি দূতি-সংবাদের নানা গানে মথিত হয়ে আছে বাংলার দেশজ গানের আপুজনের হৃদয়। শুধু তাই কেন? সর্ববঙ্গব্যাপী কৃষ্ণলীলা বা কৃষ্ণযাত্রার সুরেও এই গীতরীতির প্রাধান্য। ভাটিয়ালির নায়ক গহিন জলের মাঝি কখনও তরঙ্গ হিল্লোলে আবার কখনও বা আকাশের চাঁদের মধ্যে খুঁজে ফেরে তার ‘পিয়ামুখচন্দা’। আবার প্রিয়াসঙ্গ থেকে বঞ্চিত নায়ক গান ধরে ‘দ্যাশ বিদেশ ঘুইর্যা মরি, মনের মানুষ তালাশ করি।’ এই প্রিয়াসঙ্গ থেকে বঞ্চিত নায়িকা চরম আক্ষেপে গায় ‘প্রাণনাথ গো, তোমার বদল দিয়া যাও বাঁশী।’ যখন কেউ কাউকে পায় না তখন পিয়া-মিলন-তিয়াসী গান ধরে ‘কোথায় পাইবাম কলসী কইন্যা, কোথায় পাইবাম দড়ি, তুমি হও গহিন গাঙ আমি ডুইব্যা মরি।’ নায়ক-মাঝির কঠোর শ্রমের আশঙ্কায় বিহ্বল নায়িকা গান ধরে ‘ও ভাটির গাঙের নাইয়া, ক্যমন কইর্যা যাইব্যা তুমি উজান নদী বাইয়া?’ শ্রমের ফল থেকে বঞ্চিত হবার আর্জিও রয়েছে এইগানে। বহিজীবনের বঞ্চনা আর অন্তর্জীবনের গুমরে মরা। জীবনের সর্বস্ব হারানোর ব্যথাও এই গানে। ভাটিয়ালির গুরু বা মনমাঝি তাই বিশেষ অর্থ বহন করে। প্রাণাবেগের মূর্ত লীলা এই গীতধারার সপ্তসুরে। চট্টগ্রামের কর্ণফুলী, ফেনী প্রভৃতি দরিয়াতে সাম্পান নিয়ে যখন গান শোনা যায় ‘দেওয়াইল্ল্যা বানাইল মোরে সাম্পানের মাঝি’ শোনা যায়, তখন এই ভাটিয়ালি সাম্পানের গীত বলে পরিচিতি পায়। নদীর গতির ক্ষিপ্ততা অনুযায়ী এইসব গানের তাল ছন্দেরও পরিবর্তন হয়। ভারী নৌকা বাইতে গেলে বৈঠা বা দাঁড়ের সঙ্গে নদীর জলের যে সংঘাত

সৃষ্টি হয় তা পর্যায়ক্রমে চারটি শ্রম প্রক্রিয়াতে সম্পূর্ণ হয়। সেই বিধায় ভাটিয়ালির মুখ্যতাল চতুর্মাত্রিক কাহারবা। ছন্দবৈচিত্র্যের জন্য অবশ্য অন্যান্য তালেরও প্রয়োগ হয়ে থাকে। তালের গতি দ্রুততর হলে ভাটিয়ালির ঔদার্য ও কাব্যময়তা ব্যাহত হয়।

এই গীতধারার ছত্রছায়ায় আমরা পাই সারি গান। নদীকেন্দ্রিক সারি গানে দ্রুত ছন্দের কার্য ও দাদরা তালে বৃন্দগীত প্রাণশক্তির জোয়ার আনে। আবার প্রেমের উচ্ছাস-মথিত সারি গান একক কণ্ঠেও গীত হয়। তাতে দ্রুত লয়ের ব্যবহার বেশি। শৈশব স্মৃতি রোমন্থনে মনে পড়ে শ্রাবণ সংক্রান্তিতে মনসার ভাসান উপলক্ষ্যে ওপার বাংলার দামাল নদীতে কালো-হলুদ-লাল ডোরাকাটা বাইচের নৌকার পাল্লাদারি। সঙ্গে প্রতিটি নৌকায় দলবদ্ধ ভাবে বাইচের সারিগানের কথা আর পিছনের গলুইতে রঞ্জন ধ্বজার নীচে বসে দামামাতে তালের নির্বোধরত দলপতির অঙ্গভঙ্গিসহ বাইচ পরিচালনা করার ব্যস্ততা। ভাটিয়ালির সঙ্গে সারিগানের রীতি প্রকৃতির মিল নেই।

ভাটিয়ালি দরিয়ার আর একটি বৈশিষ্ট্যমূলক শিল্পকৃতি ধামাইল। এই শিল্প শ্রীহট্ট তথা ওপার বাংলার নিজস্ব সম্পদ হলেও অসম রাজ্যের বাঙালি অধ্যুষিত জেলাতে এখনও প্রবহমান। হেমাঙ্গ লিখছেন :

ধামাইল গান ভাবের দিক থেকে মূলত রাধাকৃষ্ণ প্রেমকে অবলম্বন করে রচিত হলেও সুরে ও ছন্দে তা বিরহ-বিচ্ছেদ বা বৈরাগ্যকে অভিক্রম করে পার্থিব উল্লাসে ডরপুর। জন্ম, বিবাহ বা কোনো উৎসব প্রভৃতির আনন্দলব্ধে এই গানের অবধা লীলা। গানের Scansion বা ছন্দবিভাগে স্ববাহু বৌক প্রাধান্যই তাঁর বৈশিষ্ট্য। ধামাইলের বহুবুপ আছে। কিন্তু সুরের দিক থেকে তা মূলতঃ ভাটিয়ালি ঠাটের ভিতবেই। তবে ভাটিয়ালির টান বা মীড়ের আন্দোলন না থাকতে প্রকাশভঙ্গি গেছে সম্পূর্ণ পালটে।

এ গান মধ্যলয়ের তিন বা চার ছন্দের তালে নাচের সঙ্গে ক্রমশঃ দ্রুতলয়ের দিকে এগোতে থাকে। সঙ্গে তালফেরতা ও লয়কারির কাজ বাড়তি মজা আনে। ভাটিয়ালির ঝিঝিট চরিত্র ধামাইলে কোমলগাঙ্গার ও কোমল ধৈবতের স্পর্শে পিলুর আমেজ নিয়ে আসে। তবে জনক ঠাট হিসেবে স্বাস্থ্যের প্রতাপ অক্ষুণ্ণ থাকে। অনেক ভাটিয়ালি গানে ধামাইলের এই ত্রিমাত্রিক ছন্দের প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। শতবর্ষের আলোকে উদ্ভাসিত নাম কুমার শচীন দেববর্মণের গাওয়া ‘বধু বাঁশী দাও মোর হাতেতে’ গানখানি দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা যায়। লোকসংগীত আশ্রিত অনেক গানকেই এই প্রথিতযশা শিল্পী স্বীয় উদ্ভাবনী শক্তি ও অপূর্ব সৃজনশীলতায় বৈচিত্র্যময় করে পরিবেশন করেছেন। বাঙালি শ্রোতা দ্বিধাবিহীন চিন্তে তাকে সাদরে গ্রহণ করেছে। কিন্তু এতে একটা অপূর্ণতা থেকে যাচ্ছে। এ প্রজন্মের সংগীতপিপাসুরা চিরায়ত লোকসংগীতের মূল রূপ রস ও স্বাদ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। কোথাও কোথাও ধন্দেরও সৃষ্টি হয়েছে। উল্লেখ করা যেতে পারে শ্রীহট্টের সুখ্যাত মারফতি গান শেখ বানু (ভানু)র ‘নিশীথে যাইয়ো ফুলবনে রে ভমরা’ গানটি। সুফী ভাবধারায় সৃষ্ট জালালশাহী মুর্শিদা গানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে উত্তরবঙ্গের চটকার সঙ্গে সুর ছন্দের মিল। বুমুর প্রভাবিত রাঢ়বঙ্গের বাউল গানের মতো কাটা-কাটা ত্রিমাত্রিক ছন্দের প্রাধান্য। লয়ও বেশ দ্রুত। ধামাইলের মতো সমে সমে ঝুঁকি দিয়ে গাইবার প্রবণতা। সেই বিচারে ভাটিয়ালির মতো টানা-টানা টিমে লয়ে চার চার ছন্দে বাঁধা মূল এই গানটি একটি বিরল সৃজন। হেমাঙ্গ বিশ্বাস,

কালী দাশগুপ্ত, রণেন রায়চৌধুরী প্রমুখেরা গাইতেন এইভাবেই। কিন্তু শচীন দেবের কাছে এটি রেকর্ড করা হয়েছে তিন তিন ছন্দে। কথা ও বাচনভঙ্গীও পরিশীলিত। কেউ কেউ এ প্রয়াসকে সিঙ্গেটিক বলে চিহ্নিত করেছেন। কালী দাশগুপ্ত স্মৃতি রক্ষা সমিতির প্রথম বার্ষিকী অনুষ্ঠানে আশীষ লাহিড়ী স্মরণিকায় প্রকাশিত নিজের রচনা থেকে উদ্ধৃতি সহ এ প্রসঙ্গে যে আলোচনা করেন সেই সূত্রে এ গানের সনাতন রূপটি গেয়ে শোনান সঞ্চিরা রায়চৌধুরী। শ্রোতারা কিছুটা হতবাক এবং সম্মোহিত। এছাড়াও রয়েছে স্বল্প পরিসরের দুই বা তিন তুকের কিছু কীর্তন গান যা ছুট কীর্তন নামে পরিচিত। শ্রীহট্টের বসন্ত উৎসবের একটি বিখ্যাত হোলির গান ‘আজ হোলি খেলব রে শ্যাম’ ললিত রাগের আমেজে সৃষ্ট। এ গানটি ডিমে তেওড়ায় শুরু হয়ে লয় বেড়ে দাদরা ও দ্রুতকাহারবাতে শেষ হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, হোমাজ বিশ্বাসের সৃষ্ট বহুশ্রুত গণসংগীত ‘বাঁচবো বাঁচবোরে আমরা’ এই হোলিগানখানির সুর-ছন্দ প্রভাবিত।

পশ্চিম সীমান্ত বাঙলার জনপ্রিয় দেশজ সংগীত ঝুমুর নিয়ে কিছু আলোচনা করা যাক। ঝুমুরের উদ্ভবকাল ও স্বরূপ নিয়ে নানা তর্ক বিতর্ক থাকলেও সঙ্গীত দামোদর, আইন-ই-আকবরী প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে ঝুমুরের উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে ছোটনাগপুরকে কেন্দ্র করে যে বিশিষ্ট আদিবাসী পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছে সেখানকার ওঁরাও, মুণ্ডা ও সাঁওতালরাই একালের ঝুমুরের স্রষ্টা। ১৯৫৬ সালে পূর্বতন বিহারের মালভূম জেলার কিছু অংশের বঙ্গভুক্তি হয়। স্বতন্ত্রভাবে গড়ে ওঠে পুরুলিয়া জেলা। বাংলার লাল মাটিতে ঝুমুরের স্থায়ী আসন প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রাথমিক অবস্থায় ঝুমুরের কাঠামো ছিল ত্রিস্বরিক। তার পরে চতুঃস্বরিক। ছন্দের ক্ষেত্রেও ত্রিমাত্রিক ‘জড়ণ’-এর প্রাধান্য। পরবর্তীকালে সামন্ত প্রভুদের পৃষ্ঠপোষকতায় নানা রাগ-রাগিণীর প্রয়োগ হতে থাকে। বাণীতেও সংযোজিত হতে থাকে নানা পদ। অনেকটা বৈষ্ণব পদাবলির মতো। পদকর্তাদের ভণিতায়ুক্ত এই সব ঝুমুর গান সুর ও বাণীতে সমৃদ্ধ হয়। রাধাকৃষ্ণের লীলা লৌকিক ভাবনায় ও শৈলীতে মিশে ভিন্নরূপ লাভ করে। এইভাবেই সৃষ্টি হয় ঝাড়খণ্ডী কীর্তনের। আবার স্থানীয় জমিদার ও ভূস্বামীদের উৎসাহে এই ধরনের ঝুমুরের ব্যাপ্তি ঘটায় এদের নাম হয় জমিদারীয়া বা বৈঠকী ঝুমুর। লৌকিক ভাষা-উপভাষার সংমিশ্রণে আর তার সঙ্গে হৃদয়গ্রাহী সুরের সংযোজনে ঝুমুরের মাধুর্য বৃদ্ধি পায়। তাল-সুর-ছন্দে ঝুমুর অন্য প্রবাহে বইতে থাকে। ফলে সনাতন ঝুমুরের কাটাকাটা (Staccato) ঢং টানটানা (Legato) ঢং-এ রূপান্তরিত হয়। হড়মিতান (হড় = জনগোষ্ঠী। মিতান = মিত্রতা) সংস্কৃতি থেকেও কিছুটা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আদি পর্বের হাঙ্কাইকা, টাইড, বাগাইল্যা, উখআ, ছুট প্রভৃতি লৌকিক ঝুমুরের সারল্য নিষ্পন্ন হয়ে খানদানি মর্যাদা লাভ করে। তবে ঝুমুর গানের অবরোহী চরিত্রটি ব্যাহত হয় নি। এখানেই স্বাতন্ত্র্য। ঝুমুর এইভাবেই লৌকিক ভাষা ও উচ্চারণে এক বিশিষ্ট দেশজ সুরধারায় পরিণত হয়ে লোকসমাজের স্বীকৃতি পায়। লৌকিক সুরের সঙ্গে শাস্ত্রীয় রাগরাগিণীর মিশ্রণে ভিন্ন মাত্রা সংযোজিত হয় ঝুমুরে। এ ক্ষেত্রে অবশ্য ঠুংরি অঙ্গের তিলক কামোদ, দেশ, জয়জয়ন্তী, পিলু প্রভৃতি ঋষাজ ঠাটের রাগ-রাগিণীরই প্রচ্ছন্ন ব্যবহার বেশি। এই প্রসঙ্গে সুরেশ চক্রবর্তীর মন্তব্য : “এক ঋষাজ ঠাটের স্বরবিন্যাসের সূত্রে বাঁধা পূর্ববঙ্গ, মধ্যবঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের মূল চরিত্র”, এর সঙ্গে ‘রাঢ়বঙ্গ’ শব্দটিও জুড়ে দেওয়া যায় নিঃসন্দেহে।

অবশ্য এই রূপটি পুরুলিয়াতে যতখানি প্রকট ঝুমুরখণ্ডের অন্যত্র—বাঁকুড়া, বীরভূম বা ঝাড়গ্রামে ততটা নয়। এই সমৃদ্ধতর ঝুমুরের পাশাপাশি মানভূমি ও কুমিল্লা ভাষায় সাবেকী মেঝেলি (=মাঝি সাঁওতালী) ঝুমুর এখনও শোনা যায় এই লাল মাটির দেশে। রাঢ়ের রুক্ষ টাড় জমিতে এত রসের প্রসারণ আসে কীভাবে— তা ভাবতে বিস্ময় জাগে।

রাঢ়বঙ্গে ঝুমুরের প্রীতি এতই প্রখর যে এখানকার বাউল গানেও ঝুমুরের প্রত্যক্ষ প্রভাব লক্ষ্য করার মতো। অনেক বাউল গান ঝুমুর— বিশেষত ‘নিদাইন্যা ঝুমুর’ বলে গাওয়া হয় ঝমকের সঙ্গে। ‘কাঁচা হাড়িতে না রাখিলি প্রেমজল’ এক জায়গায় বাউল আবার কোথাও ঝুমুর। আবার ঝাড়গ্রাম এলাকার বিনপুরের শিল্পীদের মুখে শুনেছি চার-চার ছন্দে, বিখ্যাত ভাটিয়ালি ‘প্রেমের নদীতে সেই কেন ডুব দিলাম না’ গানটি তিন তিন ছন্দে ঝুমুরের মতো গাইতে। ঝুমুরের নামকরণ নিয়েও নানা মতামত আছে। লোকসংস্কৃতি গবেষক ড. তুষার চট্টোপাধ্যায়ের মতে : “পশ্চিম সীমান্তবঙ্গে লোকসংস্কৃতি বিষয়ক ব্যাপক ক্ষেত্রানুসন্ধানের সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য এবং ‘এথনো মিউজিকোলজি’ ও লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞানের তত্ত্বের আলোকে আমার মনে হয়— ঝুমুর বিবর্তনের ধারায় যে রূপই গ্রহণ করুক না কেন, (ঝুমুর) মূলত প্রমোদ বা ধর্মীয় সঙ্গীত নয়। মৌল উৎসে ঝুমুর জুম বা জুম চাব সংশ্লিষ্ট আদিম কর্মসংগীত। জুম > জুম+উর=ঝুমুর। স্থানীয়ভাবে জুমর ঝুমুর। ঝুমুর উভয়ভাবেই উচ্চারিত হতে দেখা যায়। ভাষাতত্ত্বের দিক থেকে সম্ভবত জ+ঝ মহাপ্রাণিত হয়েছে।”

‘ভাদরিয়া’ জুমর গীতের একটি আকর্ষণীয় ধারা। এ প্রসঙ্গে অকাল প্রয়াত সুহৃদ ও গবেষক নরনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের উক্তি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁর মতে : “‘ভাদরিয়া’ বা ‘ভাদরি’ এই নামপদটি বিশ্লেষণ করলে স্বাভাবিকভাবেই ‘ভাদর’ বা ‘ভাদ্র’ শব্দ এসে পড়ে। বর্ষ পঞ্চম্বে ভাদ্র মাসের অবস্থান সাময়িকভাবে, খাল-বিল, ডাঙ্গা-ডহর, টাড়-টিকর সবই বর্ষায় বর্ষণসিক্ত হয়ে উঠে। কৃষিকর্মের উপযোগী হয়ে উঠে মালভূমির ঊষর অঞ্চলও। ভাদ্র মাসে ভাদরিয়া— কৃষি প্রক্রিয়ার সঙ্গে ঝুমুরগুলি ভাদরিয়া হলেও প্রচলনের ব্যাপকত্ব, জনপ্রিয়তা ভাদ্র মাসকে অতিক্রম করে সব মাসেই গীত হচ্ছে এখন ‘ভাদরিয়া’ ঝুমুর। বর্তমানে ভাদ্রমাসে গীত ঝুমুর মাত্রই ভাদরিয়া নয়। ভাদরিয়া ঝুমুর শব্দার্থের প্রসার ঘটিয়ে বিভিন্ন লোকনৃত্যের সঙ্গেও গীত হচ্ছে। কেবলমাত্র বুলবুলি নাচ, বাঈনাচ, ডাঁড় নাচের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। এখন সুরবৈচিত্র্যহেতু ভাদরিয়া ঝুমুর ঝুমুরের একটি শাখারূপেই চিহ্নিত।... ‘খেমটা’ বা ‘খেমটি’ ঝুমুরের সঙ্গে ভাদরিয়া ঝুমুরের একটা আপাত-সাদৃশ্য দেখা যায়। কিন্তু এ দুটি এক জাতীয় ঝুমুর নয়। ভাদরিয়া ঝুমুরের ‘ধুআ’তে [যে] বিশেষতা আছে সেটি খেমটিতে দেখা যায় না।... ভাদরিয়া ঝুমুরকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা চলে।... এই তিন শ্রেণী যথাক্রমে ‘ফুলওয়ারী’, ‘চাইল’ ও ‘জড়ণ’ নামে পরিচিত। পদগঠনবৈচিত্র্য ছাড়াও তালবৈচিত্র্য হেতু আবার এই তিন উপবিভাগেরও কয়েকটি স্বতন্ত্র ভাগ দেখা যায়।... ভাদরিয়া ঝুমুরে ‘উস্তি-প্রত্যুস্তি’ দেখা যায়।... [ঝুমুরের বিবর্তনে] ডাঁড় ধরার পরই আবির্ভাব ঘটে ‘ভাদরিয়া’ ঝুমুরের। ভাদ্র মাসের ডালগাড়ার দিন ডালতলা থেকে উঠে এসে এই ঝুমুর গীতি ভাদরের ফসলক্ষেত্রে গানের সুরে ছাপিয়ে দিয়ে, সমস্ত লোকায়ত জীবনে প্রবেশ করেছে। একথা সত্য যে ভাদই ফসল, ভাদ্রমাস এবং ভাদু এই তিন সাদৃশ্যমূলক শব্দার্থ ভাদরিয়া ঝুমুরের উৎস সন্ধানে মূর্ত হয়ে ওঠে।... ভাদু হচ্ছে গান কিন্তু ভাদরিয়া হলো

ঝুমুর।.... পর্বাদের প্রথম অক্ষরে ঝাঁক বা স্বাসাঘাত দেখা যায়।” রাড়ের খেটে খাওয়া মানুষের শয়নে, স্বপনে, বসনে, নিত্যকর্মে ও সামাজিক উৎসবে ঝুমুর নিত্যসঙ্গী। রাড়ের মানুষ বলে ‘হামদের বলটাই ঝুমুর আর চলটাই লাচ।’”

এইসঙ্গে ভাদু গান নিয়ে কিছু বলে নেওয়া ভালো। বাঁকুড়া বিষ্ণুপুরের লোকসংস্কৃতি গবেষক অধ্যাপক কান্তি হাজরা বলেছেন ভাদু গান শস্যকামনার গান। প্রধানত ভাদ্র মাসের ভাদুলী শস্য বিশেষত আউস (=আশু) ধানের পর্যাপ্ত ফলনের প্রত্যাশায় কৃষিজীবনে ভাদুর আবাহন। কল্পনার দেবী এই ভদ্রাবতীকে নিয়ে শাস্ত্র পদাবলির অনুকরণে আগমনী ও বিজয়া গীতের প্রসার ঘটেছে। লাল মাটির কিশাণির ঘরে আদরের দুলালির মতোই ভাদুকে নিয়ে নানা প্রাসঙ্গিক গান গাওয়া। থাপা বা ভাদুস্থাপন, জাগরণ ইত্যাদি নানা পর্যায়ের গানে মেতে ওঠে রাড় বাংলার কুমারী ও সধবা মেয়েরা গোটা ভাদ্র মাস ধরে। ভাদুর আপ্যায়নের জন্য কত রকমারি খাদ্যবস্তু, সাজসজ্জার নানা উপকরণ। সব নিয়েই গান। আবার একটি গানে পাওয়া : ‘বাজার যাও হে কালা। ভাদুর লেইগে আনগে ফুল মালা।’ কিন্তু ভাদ্র সংক্রান্তিতে ভাদুর বিসর্জনের বেদনায় ভারাক্রান্ত সবাই। তা নিয়েও তো গান : ‘কত সোহাগের ভাদুমণিরে ছেড়ে দিতে আজ মন চাহে না।’ এমন কিছু গানে শাস্ত্রীয় নানা সুরের প্রয়োগ হয়েছে। নইলে অন্যান্য গান ব্রতধর্মী। সুরের বৈচিত্র্য কম। তাল ছন্দও একঘেঁয়ে। ভাদু পরবের গান অবশ্য খুবই উদ্দীপক এবং জম-জমাটি। নমুনা : ‘ভাদু পরবের হাট লাইগলরে’।

এমনই একটি ব্রত উৎসব ভাজুই। পর্যাপ্ত ফলনের আশায় বর্ধমান ও তৎসম্মিহিত বাঁকুড়া এবং মুর্শিদাবাদ জেলার জজ্ঞান, বিন্দারপুর প্রভৃতি অঞ্চলে এর প্রসার। ভাদ্র মাসের ইন্দ্র দ্বাদশীতে পঞ্চশস্যের বীজ রোপণ করে কুমারী মেয়েরা। সাতদিন পরে তা থেকে অঙ্কুর উদ্গমন হয়। তাই নিয়ে নানা ছড়া ও গ্রাম্য কবিতা সুরে গাওয়া হয়। একটি ছড়ায় আছে : ‘ধূপ দিলাম ধুনটি দিলাম। ধূপের ধুনো খাওরে ভাজু, ধূপের ধুনো খাও। ঘি নাও মুটে মুটে। জল খাও ঠোটে ঠোটে। অকুমারী মেয়ে মোরা ভাজু পেতেছি।’

তেমনি পৌষালি ফসলকে ঘিরে বাঢ় বাংলার গ্রামগঞ্জে গোটা পৌষ মাস জুড়ে পালিত হয় তুসু বা টুসু উৎসব। শস্য উৎপাদনের আনন্দ উচ্ছাস জনিত রাড়ের ‘লবান্ন’ স্বরূপ এই পূজা উৎসবে তুসু গানই প্রধান উপাচার। সুব-তাল-ছন্দ আর প্রকৃতিতে তুসু গান ভাদু গানেরই সমগোত্রীয়। অনেক গান আছে তাতে কেবল ‘ভাদু’ আর ‘টুসু’ শব্দের ব্যবহারে তারতম্য। বাকি সব কথা হুবহু এক। তবে টুসুর মনোলোকের দৌড় বর্ধমান-রানীগঞ্জের কয়লাখনি পর্যন্ত। ‘খাদের জলতুলা’ শস্যরূপিনী গ্রাম্য কিশোরী, তুসুর কাছে বোধ হয় পরম বিস্ময়। অনেক গানে এ প্রসঙ্গের উল্লেখ আছে। টুসুর আদর যত্নে যাতে ব্যাঘাত না ঘটে তাই গানে রয়েছে : ‘আমার টুসুর হাতে লাল ছাতা চিরকা রোদে ধরেছে মাথা।’ কাঁসাই আর কুমারী নদী আর তার বাঁধ, কানালী, তাতে ছোট্ট টুসুর মাছ ধরা এসব কথাও পাওয়া যায় একালের তুসু গানে। তুসুর আবাহন আর মকর পরবে তার বিসর্জনের অভিব্যক্তি ভাদুর মতোই। ভাদু ও তুসু গানে গাল-মন্দ, কৌতুক, প্রতিপক্ষের গালিগালাজ সব কিছুকেই মেনে নেয় গ্রামীণ সমাজ। উত্তেজনা বশে একপক্ষ অপর পক্ষের তুসুকে ‘পঁচা পেঁয়াজগলা চোখ’ এবং আরও অনেক অশ্রাব্য ভাষা প্রয়োগ করতেও ইতস্তত করে না। কন্যাকে পাত্রস্ব করার বাসনা আর গৃহস্থের নানা সমস্যার কথাও আসে ভাদু ও টুসু গানে। আবার পৌষ সংক্রান্তিতে

তুষু ভাসানের চলমান মিছিল এবং পরকুলদহ, মটগোদা, আদাবোনা প্রভৃতি জায়গার মেলা মুখরিত হয়ে ওঠে রকমারি তুষু গানে আর নাচে।

এই তিনটি মূল সাংগীতিক কাঠামো নির্ভর করে গ্রাম বাংলায় অজস্র গান গড়ে উঠেছে। আবার এদের মিশ্রণে বা কোনো ক্ষেত্রে এদের বাইরেও অনেক লোকপ্রিয় দেশজ সংগীত রয়েছে। তাদের ভাষা যে সবসময়ে বাংলাতেই হবে এমন কোনো কথা নেই। ওপরের আলোচনার সূত্রে কয়েকটির উল্লেখও করেছি। শেষ করার আগে আর কয়েকটি এমন গুরুত্বপূর্ণ দেশজ লোকগান সম্বন্ধে সামান্য কিছু বলতে চাই। লোকসংগীতের সংজ্ঞায় এদের ঠাই হোক বা না হোক গ্রামীণ লোকসমাজের কাছে এরা পরম আদরনীয়। এইসব দেশজ সংগীতও বাঙালির ধমনীতে স্পন্দন জাগায়।

বর্ধমান, হুগলি ও হাওড়া জেলাকে লোকসংগীতের ব্যাপ্তি ও উদ্ভবের বিচারে বন্ধ্যভূমি বলা হয়। কিন্তু বর্ধমানের পশ্চিম অঞ্চলে চিরায়ত লোকসংগীতের অস্তিত্ব খুবই স্পষ্ট। বাকি অংশে পাওয়া যায় *লেটো*, *ঘেঁটু* প্রভৃতি। অবশ্য পালা-নির্ভর লেটোর গানে নানা ভাষা ও সুরের মিশ্রণ যা অফুরন্ত হাস্যরসের যোগান দেয়। এই হাল্কারসের লেটোগান কাজী নজরুল ইসলামের মতো প্রতিভাধর সুরস্রষ্টাকেও আকৃষ্ট করেছে। সরস্বতী বন্দনা গীত দিয়ে শুরু হয় লেটো পালা। রোগ-ব্যাধির উপশমের জন্যেও সৃষ্টি হয়েছে অনেক দেশজ গান। চর্মরোগ ইত্যাদির প্রতিকারে *ঘেঁটু=লোকদেবতা ঘণ্টাকর্ণ* প্রতীক ঝাড়ু বা ফুলঝাড়ু, পূজার আয়োজন। প্রচলিত ছড়া : 'দাদা ফুলঝুড়িটা ধর। আমার ঘেঁটুর বিয়ে হবে সবাই মজা কর' সুরে গাওয়া হয়। তেমনি রয়েছে বসন্ত রোগ থেকে মুক্তি পাবার জন্যে দেবী শীতলার দয়া। এইভাবেই প্রসার ঘটেছে *শীতলা মঙ্গল*-এর। ওলাওঠা (=কলেরা) রোগের প্রতিকারে ওলাইবিবি আর তার পূজার উদ্দেশ্যে *ওলাইবিবির গান*।

বাংলার *বিয়ের গান* গ্রাম্য ললনাদের সৃজনশীল কাব্যমহিমার অপূর্ব নিদর্শন। আপন সৃষ্টিকে রক্ষা করার প্রয়োজনে প্রকৃতি আদিম কাল থেকে জীবজগতে যে স্বাভাবিক প্রেরণা দিয়ে এসেছে, বিবাহ সংগীতের সূচনা পর্বে হয়ত ছিল তারই মানবিক প্রকাশ। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে গ্রাম বাংলার প্রায় সর্বত্র এয়োস্ত্রীরা মুখে মুখে গান বেঁধে হাস্য পরিহাসের ছলে বিভিন্ন স্ত্রী আচাদের মধ্য দিয়ে প্রকৃতির এই চিরন্তন নির্দেশ পালন করতেন। কালের বিবর্তনে সূচনাপর্বের এই আপাত স্থূলবুচি পরবর্তীকালে সংযত ও প্রতীকি রূপ নেয়। ফলে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল ও কাল অনুযায়ী বিয়ের গান এক বিশিষ্ট শিল্পরূপ হিসেবে স্বীকৃত হয়।

প্রায় এই সূত্রেই আসে *খেউড়* গানের কথা। বাংলা *বিশ্বকোষ* (২য় খণ্ড) অনুসন্ধানে পাওয়া যায় যে অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর যুগসন্ধিতে নদিয়া জেলার শান্তিপুর অঞ্চলে *খেউড়* বা *খেড়ু* নামে গ্রাম্য ভাষায় রচিত আদিরসাত্মক কাহিনিমূলক দেশজ সংগীতের প্রচলন হয়। নিম্নবিস্তৃত সমাজের গ্রামীণ মানুষেরা এই গানের স্রষ্টা। মুসলিম শাসনের অবসানে বাঙালির কর্মজীবনে নিস্পৃহতা এবং বিদেশি শক্তির অশুভ পদার্পণে 'নব্যসভ্যতা' নামধারী বিকৃতবুচির প্রাদুর্ভাব প্রভৃতির প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় এইসব গানে। রাজধানী খাস কলকাতা এবং হুগলি নদীর দুই পারের জনপদগুলিতে এর ব্যাপক প্রচলন ছিল। সেকালের ভোলা ময়রা, কেপ্ট মুচি, নিতাই বৈরাগী প্রমুখ বিখ্যাত গায়করা রাগরাগিণীর ভাঙ্গাসুর, আড়ছন্দ, টপ্পার গিটকারিসহ চাপান-উতোর পদ্ধতিতে উক্তি-প্রত্যুক্তি সহ ছন্দায়িত দেহভঙ্গিমায়

আপ্ত করে আসর মাতাতেন। আবার ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত* (চতুর্থ খণ্ড) গ্রন্থে পাওয়া যায় যে, বিয়ের পর, বিশেষত গৌরীদানের ক্ষেত্রে, মেয়েদের প্রথম রজোদর্শন, অঞ্চলভেদে ‘ফলদেখা’, ‘দ্বিতীয় বিয়ে’ বা ‘পুষ্পবতী হওয়া’ প্রভৃতি নামে পরিচিত নারীদেহের প্রকৃতি প্রকাশ উপলক্ষ্যে অন্তঃপুরে স্ত্রীসমাজে প্রজনন প্রক্রিয়ার ইঙ্গিতবাহী যে মেয়েলি আচার সংক্রান্ত গীত বা কাদাখেলা বা প্রচলিত কথায় ‘কাদা খেড়ু’ উদযাপিত হোত তা থেকেই ‘খেড়ু’ বা ‘খেউড়’ গানের উদ্ভব হয়ত। কিন্তু লোকসংস্কৃতিবিজ্ঞানী ড. তুষার চট্টোপাধ্যায়ের মতানুসারে নদিয়ার শান্তিপুুরের সুপ্রাচীন তন্তুশিল্পকর্মের সঙ্গে একটি বিশিষ্ট কর্মসংগীতই ‘খেড়ু’ বা ‘খেউড়’— যা পরবর্তী কালে নানারূপে বিবর্তিত ও পরিবর্তিত হয়। তাঁত-বয়ন সংশ্লিষ্ট— খেই, খেরো, খেড়ো, ক্ষেড়া— প্রভৃতি শব্দের অনুবর্ণেই ‘খেড়ু’ বা ‘খেউড়’ শব্দের উৎপত্তি। সাবেককালে সওদাগরি হিসেবের খাতার মোড়ক হিসেবে ব্যবহৃত খেড়ো বা খেড়ুয়া বস্ত্রবয়নের কালে তাঁতি সমাজ যে শ্রমসংগীত করতেন তাই খেউড় গানের আদি উৎস।

দেশজ সংগীতের ক্ষেত্রে ঝাংলার অনন্য অবদান কীর্তন প্রসঙ্গে কিছু বলতেই হয়। প্রাক্ চৈতন্য যুগে কীর্তন লোকসংগীত হিসেবেই প্রচলিত ছিল। চৈতন্যদেব তাঁর প্রবর্তিত ধর্ম প্রচারের বাহন হিসেবে এই লৌকিক ধারাকেই অবলম্বন করেছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীতে নরোত্তম ঠাকুর আয়োজিত খেতুরীর মহোৎসবের পরে এই লোকায়ত ধারার আমূল পরিবর্তন ঘটে। গৌড়ীয় ধর্ম ও সাহিত্যের সমৃদ্ধির প্রত্যক্ষ প্রভাবে কীর্তন বিদম্ভ সংগীতে পরিণত হয়। তা সত্ত্বেও একাধিক লোকসংগীতে কীর্তনের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। সংগীতজ্ঞ রাজ্যেশ্বর মিত্রের মতে :

কীর্তন অতি সহজেই পল্লীসঙ্গীতের সহযোগী হয়ে পড়েছে। এর কারণ কীর্তনের প্রচারধর্মিতা। প্রচারের জন্য কীর্তন বহুভাবে রূপায়িত হয়েছে এবং এর এমন একটি সামল্য আছে যাতে পল্লীসঙ্গীতের পাশে স্থান গ্রহণ করতে এর কোনও বাধা হয় না। এইভাবে কীর্তন লোকসঙ্গীত না হয়েও তার সহযোগী বা allied বলে বিবেচিত হতে পারে।

লোকসংগীতবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রাগুক্ত ড. তুষার চট্টোপাধ্যায় কিন্তু ভিন্নতর মত প্রকাশ করেছেন। তাঁর কথায় :

সামগ্রিক বিচারে.... মনে হয় কীর্তন গানের প্রাচীনতম রূপে রাধাকৃষ্ণ প্রসঙ্গের কোন অস্তিত্ব ছিল না। লৌকিক সমাজে ব্যাপকভাবে প্রচলিত প্রেম সম্পর্কিত কোন বিশেষ লোকপ্রিয় গানের আধারকেই পরবর্তীকালে বাধাকৃষ্ণের অলৌকিক বর্ণনার জন্য ব্যবহার করে সংকীর্তন রীতির প্রসার ঘটেছে।.... ছোটনাগপুরের ওঁরাও উপজাতির নৃত্য সম্বলিত লোকসঙ্গীতের একাংশের ‘কীর্তন’ নামের কথা প্রসঙ্গত স্মরণ করা যায় এবং বাংলা কীর্তন গানের বিকাশে ওঁরাও বা অনুরূপ সংস্কৃতির অধিকারী উপজাতির প্রভাবের প্রসঙ্গও অনুমান করা যায়। চৈতন্য প্রবর্তিত কীর্তনের প্রধান বৈশিষ্ট্য এটি স-নৃত্য সমষ্টিগত গীত অনুষ্ঠান। কীর্তনের গোষ্ঠীগত সঙ্গীতরীতির সঙ্গে আদিবাসী সমাজেব প্রচলিত সঙ্গীতনৃত্য পদ্ধতির নিকট-সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। আদিবাসী প্রভাবের দিক থেকে কীর্তনে মাদলের ব্যবহার প্রসঙ্গও সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।.... আনন্দ যন্ত্রের বিবরণে বিশেষজ্ঞগণ মৃদঙ্গকে সভ্য এবং মর্দল বা মাদলকে গ্রাম্যশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

বস্তুত মাদল বা ধুমসা আদিবাসী সমাজের একটি প্রধান তালযন্ত্র। কীর্তনে মাদলের ব্যবহার তাই শুধু, বাদ্যযন্ত্রের ওপর নয়, কীর্তনের মূল উৎসের ওপরেও আলোকসম্পাত কবে।

কীর্তনে— বিশেষত পদাবলিতে ব্যবহৃত রাগ-রাগিণীর সঙ্গে শাস্ত্রীয় ধারার কিছু মিল থাকলেও এতে শাস্ত্রীয় তালের ব্যবহার খুবই বিরল। দ্রুত বা বিলম্বিত ছন্দের যে সব কীর্তনসঙ্গ তাল রয়েছে তাদের উৎস শাস্ত্রীয় নয়। বরং কীর্তনের পদের ছন্দ অনুসরণ করার জন্যই এইসব তালের সৃষ্টি। অনেকটা যেন রবীন্দ্রসৃষ্ট তালের অনিবার্যতার মতোই। কীর্তনের ‘আখর’ এবং ‘মাতন’ প্রভৃতি অলংকার একান্তভাবেই দেশজ ভাবনা প্রসূত। বরং পুরুলিয়ার বৈঠকী ঝুমুরে এসবের প্রয়োগ দেখা যায়। কীর্তনের ভাষা প্রধানত ব্রজবুলি, মৈথিলী, মগধী ইত্যাদি। শাস্ত্রীয় সংগীতে ব্যবহৃত ভাষার সঙ্গে কোনো মিল নেই। কীর্তনের প্রধান দুটি ধারা— নামকীর্তন বা সংকীর্তন ও রসকীর্তন বা লীলাকীর্তন। এছাড়াও রয়েছে স্বল্প পরিসরে দুই বা তিন তুকের কিছু কীর্তন গান যা ছোট কীর্তন নামে পরিচিত। গ্রামীণ মানুষের কাছে অবশ্য নামকীর্তনই বেশি আপন। তার সহজিয়া আবেদনের জন্য।

ঢিলেঢালা ভাবে অনেকে সারি জারি শব্দগুলি সমার্থক জ্ঞানে উচ্চারণ করে। বাস্তবে কিন্তু দুইয়ের মধ্যে ব্যবধান বিস্তর। সারি পূর্ববাঙলার প্রচলিত একটি কর্মসংগীত বা প্রেমসংগীত। সামাজিক ঘটনা তথা বিষয়ের মধ্যে সাধাক্ষ ইত্যাদি নাম প্রক্ষিপ্ত হয় কখনও। কিন্তু জারিগান একান্তভাবেই ইসলামধর্মীয়দের শোকগাথা। কারবালা প্রান্তরে হাসান হোসেনের মৃত্যুজনিত বিষাদময় কাহিনি স্মরণ করেই জারিগান গাওয়া হয় দলবদ্ধভাবে। জারিগান-এর শ্রেণিবিন্যাসও রয়েছে— ধূয়া, মশিয়া, আসগরনামা ইত্যাদি। শব্দগানেও জারির প্রভাব রয়েছে। প্রধানত মধ্যবঙ্গ, মুর্শিদাবাদ এবং তৎসংলগ্ন বীরভূম জেলার মুসলিম অধ্যুষিত গ্রামাঞ্চলে এর প্রসার। লোকনাট্যের আঙ্গিকেও জারি অনুষ্ঠিত হয়। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে গ্রামীণ মানুষ এতে অংশ নেয়। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ পরম আনন্দে উপভোগ করে এইসব অনুষ্ঠান। জারিগানের প্রভাব পাওয়া যায় ক্ষেত্র বিশেষে সুন্দরবনের ভাটি অঞ্চলের বনবিহি পালা আর ওপার বাংলার গুণাইবিহিতে। রক্ষণশীল বিচারে ইসলাম ধর্মে সংগীত তো গুনাহ। ধর্মের সূত্র ধরে জারি গানের সুযোগ যদি না পাওয়া যেত তবে শিল্পভাবাপন্ন হৃদয়াবেগ শুদ্ধ হয়ে যেত হয়ত। পরবর্তীকালে ইসলামি গানের উৎসও বোধহয় এই জারি গান। তেমনি পটুয়া গীতেও জারির প্রভাব— বৌক দিয়ে তাল রাখা, লক্ষ করা যায় নদিয়া ও মুর্শিদাবাদে। আবার রাঢ়ের মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বর্ধমান ও বীরভূম জেলার পটশিল্পীরা যে গানের অবতারণা করেন তাতে পাঁচালি ও ভাঙ্গা কীর্তনের প্রভাবই বেশি।

এছাড়া রয়েছে উত্তরের পাহাড়তলির লোকসমাজের নানারকম নৃত্যগীত। সেখানকার অধিবাসীদের আচার-ভাষা, সুর ও ছন্দ সমতলের মানুষদের সংস্কৃতি থেকে একটু স্বতন্ত্র। তা সত্ত্বেও এসব বাংলার গন্ডির মধ্যেই। কাজেই সেখানকার বিয়ের উৎসবে ‘ডাম্ফু’, দেওয়ালিতে ‘দেওশী’, ভাইফোঁটাতে ‘ভাইলানী’, দীপাবলিতে ‘মারুনী’, লেপচাদের ‘কাককুকু’, জলপাইগুড়ির বকসাদুয়ার অঞ্চলের তিব্বতীদের ‘ডুক পা’ (ডুক > ড্র = বজ্র) পা জনগোষ্ঠী বীরত্বসূচক লোকগীতি প্রভৃতি চিত্তাকর্ষক সাংস্কৃতিক সম্পদ তো সমগ্র বাংলার দেশজ সংগীতের ভাণ্ডারকেই সমৃদ্ধ করে চলেছে। বিধ্বস্ত মূল্যবোধ তথা বিপন্ন মানবিকতার এইক্ষেণে এহেন

শিল্পসম্ভারের প্রতি যত্নশীল না হলে জাতীয় সংস্কৃতির সংকট কাটানো কঠিন। সে প্রয়াস যত দ্রুত, যত নিষ্ঠার সঙ্গে সম্পন্ন হয় ততই মঙ্গল। কে বা কোন প্রতিষ্ঠান কতখানি দায়িত্ব নিয়ে এ কাজে এগিয়ে আসবেন জানি না। তবে মনে রাখা দরকার যে আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রগতির ফসল বৈদ্যুতিক কলাকৌশলের খলনায়করা কিন্তু নিরস্ত্র নয়। এইসব চিরায়ত সংস্কৃতির ব্যাপক প্রচার ও প্রসারে আরও অনুপুঙ্খ অনুসন্ধান ও স্বরূপসন্ধান প্রয়োজন। শুধু তাই নয়, এই সম্পদকে যাদুঘরের প্রদর্শনালার সামগ্রী করে তুলে না রেখে তাকে সুস্থভাবে প্রয়োগের মধ্যে আনতে হবে। সেক্ষেত্রেও ‘সুরবাহার’ এর *মনসামঙ্গল পালা*, *মেঠোসুরের আরশি*, *মেঠো সুর মেঠো ছন্দ*, নবমযুগ-এর *ভদ্রেশ্বরীর গল্প*, *কল্যাণীকলামণ্ডলম*-এর *মলুয়াসুন্দরীর পালা*। অর্থাৎ-এর *চন্দ্রাবতী*-কে স্মরণ করা যেতেই পারে।

ফিঙ্গাপুরী খেপুত

ত্রিপুরা বসু

অবস্থানক্ষেত্র ও পরিচিতি

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমার দাসপুর থানার একটি প্রাচীন গ্রাম খেপুত। সরকারি নথিতে খেপুত নামের কোনো মউজা নেই। উত্তরবাড়, দক্ষিণবাড়, কিস্তিবাড়ি পদ্বি তিনটি খেপুত নামে পরিচিত। মউজা উত্তরবাড়, জে. এল. নং ২২২। মউজা দক্ষিণবাড়, জে. এল. নং ২২৪। স্থানীয় অধিষ্ঠাত্রী দেবী খেপ্তেশ্বরীর নাম থেকেই গ্রামের নাম (খেপুতেশ্বরী > খেপ্তেশ্বরী)। প্রখ্যাত বিপ্লবী নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বা মানবেন্দ্রনাথ রায় ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে এই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন বলে কারো কারো অভিমত। খেপ্তেশ্বরী দেবীর সেবাহিত পূজক ভৈরবচন্দ্র ভট্টাচার্য ছিলেন মানবেন্দ্রনাথের পিতামহ। পিতা দীনবন্ধুর দ্বিতীয়া স্ত্রীর দ্বিতীয় পুত্র ছিলেন মানবেন্দ্রনাথ। ইনি স্ত্রীপুত্রকে নিয়ে পরে উত্তর ২৪ পরগনার কোদালিয়া চলে যান খেপুত ত্যাগ করে। আঠারো শতকেও কবি শ্রীকৃষ্ণকিঙ্করের বিভিন্ন রচনায় সমৃদ্ধ খেপুত ও তৎপার্ব্বর্তী ভটিরা, তড়া, গোপালনগর ও শ্রীবরা গ্রামগুলির বিবরণ পাওয়া যায়।

কীভাবে যাওয়া যাবে

দক্ষিণপূর্ব রেলপথের হাওড়া খড়গপুর সেকশনের বাগনান স্টেশন থেকে বাগনান-মানকুর ঘাট বাসে মানকুর। সেখান থেকে নৌকাযোগে গোপীগঞ্জ হয়ে ২ কি.মি. পশ্চিমে খেপুত। অথবা, কোলাঘাট স্টেশন থেকে বাগনান-মানকুর ঘাট বাসে মানকুর। সেখান থেকে নৌকাযোগে গোপীগঞ্জ হয়ে ২ কি.মি. পশ্চিমে খেপুত। অথবা, কোলাঘাট স্টেশন থেকে বাস, ট্রেকার ইত্যাদিতে যশাড— শ্রীবরা— দুধকোমরা— গোপীগঞ্জ হয়ে। এখন হাওড়া থেকে বাসে সুলতাননগর হয়ে সরাসরি যাওয়া যায়।

দর্শনীয় কী আছে

কয়েকটি প্রাচীন মন্দির, নাগ রায়চৌধুরী পাল ভট্টাচার্য এধরনের কয়েকটি বিশিষ্ট পরিবারের বাসস্থান খেপুত এই সেদিন পর্যন্ত ছিল কৃষিপ্রধান শান্ত গ্রাম। গ্রামজীবনে ‘আর্বানাইজেশনের’ প্রভাব পড়ার ফলে এটি এখন রূপনারায়ণের অদূরবর্তী, গোপীগঞ্জ সুলতাননগর পিচরোডের পাশেই এক জনবহুল জনপদ, স্কুল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ডাকঘর, বিদ্যুৎ, টেলিযোগাযোগে পুরোনো খেপুত আজ নতুন রূপে জেগে উঠেছে। বিরাট কিছু দেখার স্বপ্ন নিয়ে খেপুত ভ্রমণ হয়ে যাবে ‘অন্ধের হস্তীদর্শন’।

গ্রামের বিখ্যাত দেবী খেপ্তেশ্বরীর দক্ষিণমুখী ত্রিখিলান আটচালা রীতির ইটের মন্দিরটি এখানকার উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি। পাগলা কুকুরের দংশনে আক্রান্ত রোগীর নিশ্চিত

রোগনিরাময়কারিণী রূপে খ্যাতা এই দেবী— লোকবিশ্বাস এমনই। দেবী এক অষ্টভুজা দুর্গার— প্রস্তরফলকে খোদিত। মনে হয়, আদিত্যে ইনি বৌদ্ধ মহাযানী কোনো দেবীর হিন্দুরূপায়ণ। মন্দিরের গর্ভগৃহে আছে প্রায় ½ মি. দীর্ঘ একটি পাথরের বিষ্ণুমূর্তি, যা সেনযুগের শিল্পকীর্তি বলে (১২শ শ.) মনে করা যায়। মন্দিরের প্রবেশপথের শীর্ষে পোড়ামাটির ফলকের লিপিটি নিম্নরূপ:

শ্রী শ্রীমাতা খে
পুতেশ্বর চরণে
স্বরগং শূভমুখ
সকাদা ১৭০১
সন ১১৮৬ সাল
মাহ আশ্বিন ১১ই

....।

সুতরাং ১৭৭৯ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত এই মন্দিরটি এক উল্লেখযোগ্য পুরাবস্তু। এর ত্রিখিলান অলিন্দের ছাদ টানা-খিলান এবং গর্ভগৃহের ছাদ লহরা-অবলম্বী গম্বুজ দ্বারা নির্মিত। একদা প্রাচীরবেষ্টিত এই দেবালয়ের পূর্বদিকে নহবতখানার দেওয়ালে নিবদ্ধ একটি আয়তাকার পাথরের ফলকে নৃত্যরতা কয়েকটি নারীমূর্তি খোদিত। মন্দিরপ্রাঙ্গণে পড়ে থাকা কষ্টিপাথরের খোদিত মূর্তিটি যে বুদ্ধমূর্তি তা বোঝা যায় এর অবশিষ্ট ভিত্তিটুকু দেখে। নীচের পাদপীঠের খোদাই কাজ থেকে মথুরা-শৈলীর শিল্পকৃতি লক্ষিত হয়।

উত্তরপাড়ায় কালিন্দীনাথ শিবের পশ্চিমমুখী আটচালা মন্দিরে সামান্য পঙ্খের অলংকরণ আছে। এটি ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি সময়কার স্থাপত্য। মন্দিরের বাইরে দক্ষিণ দিকে প্রোথিত কষ্টিপাথরে নির্মিত একটি বিষ্ণুমূর্তি পাল-সেন যুগের শিল্পকীর্তি বলেই অনুমিত।

বাজার এলাকায় (দক্ষিণবার্ড মডুজা) দণ্ডেশ্বর শিবের পশ্চিমমুখী দালানমন্দিরটির নির্মাণকাল যে ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দ, তা মন্দিরের প্রতিষ্ঠালিপি থেকেই জানা যায়। এর দেওয়ালে আছে পঙ্খের বেশ কিছু অলংকরণ।

গ্রামের উত্তরে ‘রায়মণি রোড’ রাস্তার পাশে চৌধুরীবেড় নামক স্থানটি খেপুতের এক রহস্যময় পুরাঙ্কন। এখানকার মৃৎকাগর্ভ থেকে বিভিন্ন সময় পাওয়া গেছে ভগ্ন প্রস্তরমূর্তি, খোদিত মন্দিরদ্বার, ফ্রেম, কোনো দেবীমূর্তি ও দেউলাকৃতির মন্দিরখোদিত বর্গাকার প্রস্তরখণ্ড, খোদাই কাজের জন্যে আনা বড়ো আকারের চতুষ্কোণ প্রস্তর ইত্যাদি, যার দু’ তিনটি খেপুতেশ্বরী মন্দির প্রাঙ্গণেও আছে। অযত্ন অবহেলায় এসব মূল্যবান পুরাবস্তু প্রায় কিনিস্ট হয়ে যাচ্ছে। এখানকার বিভিন্ন পুষ্করিণী থেকেও পাওয়া গেছে প্রস্তরখণ্ড, পুরাবস্তু। কিন্তু এই সবকিছুর মধ্যে মিশে থাকে ইতিহাসের সঙ্গে মানুষের পরিচয় আজো ঘটেনি।

হুশেন শাহের রাজত্বকালে, ১৫ শতকের শেষ দিকে এই অঞ্চলে এসেছিলেন সিদ্ধপির বড়ো খান গাজি সাহেব। ইসলাম ধর্মপ্রচার করতে এসে এখানেই তিনি দেহরক্ষা করেন। তাঁর সমাধির ওপর নির্মিত একগম্বুজবিশিষ্ট ক্ষুদ্রাকার সমাধিসৌধটি গ্রামের খেলার মাঠের একপ্রান্তে প্রায় অনাদৃত অবস্থায় পড়ে আছে। জানিনা, এখানকার অতিপ্রচলিত ছড়া ‘বাঁশ বাদুড় ভূত, তিন নিয়ে খেপুত’ কোনো ঐতিহাসিক সত্য বহন করে চলেছে।

গুরুত্বপূর্ণ পুরাণকল্প

‘চৌধুরীবেড়ের’ টিবিটির বিস্তীর্ণ এলাকার চারদিকে গড়াই বা পরিখার চিহ্ন স্পষ্ট। স্থানীয় মানুষ এটিকে ‘ফিঙ্গা রাজার গড়’ বলে থাকে। গড়ের একস্থানে একটি ক্ষুদ্রাকার মন্দির দেখা যায়। ১৯৭২ সালে সরেজমিন অনুসন্ধানের সময়, বর্তমানে কৃষিক্ষেত্রে পরিণত এই ‘ফিঙ্গা গড়ের’ এখানে সেখানে দেখেছিলাম খোদিত প্রস্তরখণ্ড বেশ কয়েকটি। সেখানকাব টিবিটিও বেশ রহস্যময় বলে মনে হয়েছিল। টিবির নীচে কোনো প্রাচীন স্থাপত্য লুকিয়ে থাকাও বিচিত্র নয়। প্রস্তরখণ্ডগুলি কোনো বিশাল সৌধেরই প্রবেশপথ বা ভিত্তির অংশবিশেষ বলে মনে হয়। প্রয়াত তারাপদ সাঁতরাও মন্তব্য করেছিলেন :

চৌধুরীবেড় নামক স্থানে এক উঁচু টিবিকে স্থানীয় লোক কিংবদন্তীগত ঐনৈক ফিঙ্গা রাজার প্রাসাদের অবশেষ বলে মনে করেন। প্রাচীন মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ সমাকীর্ণ এস্থানটি সুদীর্ঘ অতীতের পরিচয় বহন করে। তাছাড়া উল্লিখিত এতগুলি প্রাচীন মূর্তি-ভাস্কর্যের সমাবেশে ধারণা হয়, রূপনারায়ণ তীরবর্তী এই কেন্দ্রে একদা এক লুপ্ত মন্দিরের অস্তিত্ব ছিল। তবে সত্যাসত্য নির্ণয়ের জন্য প্রত্নতাত্ত্বিক উৎসর্গ প্রয়োজন।

(পশ্চিমবঙ্গের পুরাসম্পদ, ‘উত্তর মেদিনীপুর’, ১৯৮৭, পৃ ১৭২)

ফিঙ্গারাজ্য সম্ভাব্য পরিচিতি

ঠিক কোন সময়ে কোথা থেকে এই জনশ্রুতিনির্ভর ফিঙ্গারাজ্য এসেছিলেন ইতিহাস সে বিষয়ে নীরব। তবে রূপনারায়ণ-তীরবর্তী এই স্থানটির গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান বিবেচনা করে আমরা কিছু কিছু ইতিহাসসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি।

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার উত্তর ও উত্তর-পূর্ব প্রান্ত এবং পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পূর্ব প্রান্তের এলাকাগুলি পশ্চিমবঙ্গের মানচিত্রে নিবিড়ভাবে লক্ষ করলে দেখা যাবে শিলাবতী ও রূপনারায়ণ নদের তীরে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নস্থলের অবস্থান। এই দুটি নদীর উত্তরপূর্ব এবং পূর্ব তীরে যথাক্রমে হুগলি ও হাওড়া জেলা। শিলাবতী নদীর তীরে গড়বেতার নিকটে বগডিহি থেকে প্রাপ্ত নব্য প্রস্তরযুগের আয়ুধ আবিষ্কার এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই নদীর পশ্চিম তীরে ঘাটাল থানার পান্নাগ্রাম থেকে পাওয়া গেছে গুপ্ত ও পালযুগের নানা প্রত্ননিদর্শন। শিলাবতী ও দ্বারকেশ্বরের মিলিত প্রবাহ রূপনারায়ণের পশ্চিম তীরে খেপুত। একদা রূপনারায়ণের পশ্চিম তীরবর্তী হাওড়া জেলার বাগনান থানার হরিনারায়ণপুর থেকে পাওয়া গেছে নানা প্রত্নবস্তু যেগুলি নব্যপ্রস্তরযুগের সভ্যতার সাক্ষ্য বহন করে। রূপনারায়ণ তীরবর্তী তমলুকের উত্তরে অবস্থিত এই হরিনারায়ণপুর, শ্যামপুর থানার বাছরি গ্রামের ‘দমদমা’ থেকে প্রাপ্ত নানা মৃৎপাত্র, পোড়ামাটির মূর্তি, ফলক, খেলনা-পুতুল ইত্যাদির সঙ্গে তমলুকে প্রাপ্ত প্রত্নবস্তুর সাদৃশ্য থাকায় এগুলিকে খ্রিস্টপূর্ব ৩য় শতক থেকে খ্রিস্টীয় ২য় শতক পর্যন্ত সময়কালীন সভ্যতার নিদর্শন বলা হয়েছে। রূপনারায়ণ তীরবর্তী হাওড়া জেলার শ্যামপুর থানার রাধাপুর থেকে প্রাপ্ত রোমান শিরস্কাণ পরিহিত যুগ্ম মুখবিশিষ্ট হাতল যুক্ত পোড়ামাটির অদ্ভুত মূর্তিটি (আশুতোষ. মিউজিয়াম)। প্রাচীন রোমের দেবতা ‘জানুস’-এর সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত। সুতরাং দেখা যাচ্ছে উত্তরে শিলাবতী তীরের গড়বেতা-বগডিহি থেকে শুরু করে পান্না, রূপনারায়ণ তীরবর্তী হরিনারায়ণপুর, রাধাপুর আর দক্ষিণে তমলুক পর্যন্ত বিস্তৃত

পূর্ব ভারতের শিলাবতী-বুপনারায়ণ তীরবর্তী এক উল্লেখযোগ্য পুরাক্ষেত্র। প্রধানত নদী অববাহিকার পথ ধরে সমুদ্রপথে এই অঞ্চলের সঙ্গে সুদূর ভূমধ্যসাগরীয় মিশর, রোম ও ক্রীট দ্বীপের এক সাংস্কৃতিক আদানপ্রদানের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। খ্রিস্টপূর্ব ৩য় শতক থেকে শুরু করে গুপ্তযুগ এবং পরে পাল যুগ পর্যন্ত সময়কালে মেদিনীপুর ও হাওড়া জেলার এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলটি প্রায় সমগোত্রীয় এক প্রত্নসংস্কৃতিবলয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সেই দিক থেকে প্রাথমিকভাবে বিচার করলে খেপুত ও জনশ্রুতিনির্ভরতার ‘ফিঙ্গ’ বা ‘ফিঙ্গগড়ের’ প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্বকে অবহেলা করা যায় না। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী *সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা*-য় প্রকাশিত ‘হিন্দু ও বৌদ্ধে তফাৎ’ রচনায় (বর্ষ ৩১, সংখ্যা-২ পৃ.৪৫-৬৪) এই সম্প্রদায় সম্পর্কে প্রথম আলোকপাত করেন। শীতলামঙ্গল ইত্যাদি বহু কাব্য রচয়িতা আঠারো শতকের কবি শ্রীকৃষ্ণকবির লিখেছেন ‘খেপুতে খেপাই বন্দো ফিঙ্গারাজার গড়ে।’

জৈনগ্রন্থ *আচার্য্যসূত্রে* উল্লিখিত সুন্দাভূমির অন্তর্গত প্রাচীন তাম্রলিপ্ত রাজ্যের এলাকাভূক্ত ছিল খেপুত। বৌদ্ধধর্মের খ্যাতনামা কেন্দ্ররূপে পরিচিত বন্দরনগরী তাম্রলিপ্তি সম্পর্কে হিউয়েন সাঙ, ফা-হিয়েন ও ইৎসিং-এর বিবরণ থেকে আরো জানা যাচ্ছে সিংহল, সুমাত্রা যবদ্বীপের সঙ্গে তাম্রলিপ্তের যোগাযোগ ছিল নিবিড়। *দশকুমার চরিত*, *জৈনকল্পসূত্র*, *জৈনপ্রজ্ঞাপনাসূত্র* ইত্যাদি সূত্রে সুপ্রাচীন তাম্রলিপ্ত রাজ্যের সমৃদ্ধির কথা জানা যায়। তখন তাম্রলিপ্ত (তান্-মো-লি-টি) সমুদ্রতীরের এক ঐতিহ্যময় নগরী এবং বৌদ্ধধর্ম প্রচার ও প্রসারের এক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। ঐতিহাসিকদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাঢ়, সুন্দা, তাম্রলিপ্ত রাজ্যগুলি মেগাস্থিনিস কথিত, মহাপরাক্রমশালী ‘গঙ্গারিডি’ রাজার অধীনস্থ করদ রাজ্যরূপেই পরিচিত ছিল। সুতরাং সেই দিক থেকে দেখলে হয়ত মৌর্যসম্রাট চন্দ্রগুপ্তের (খ্রি. পূ. ৪র্থ শতক) সময়কাল থেকেই শিলাবতী বুপনারায়ণ তীরবর্তী এই পুরাক্ষেত্রগুলির ইতিহাসের শুরু। এরপর শূঙ্গ, কাহ্ল, সাতবাহন ছাড়াও বহিরাগত শক, পল্লব ও কুবাণ সম্প্রদায়ও হয়ত এই অঞ্চলে অধিকার বলবৎ করেন। বলা বাহুল্য, এরা অনেকেই ছিলেন বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। সেই দিক থেকেই খেপুতের ‘ফিঙ্গা’ সম্প্রদায়ের ইতিহাস কিছুটা অনুসরণ করা যায়।

‘ফিং-গাং’ একটি তিব্বতি শব্দ, যার একপ্রকার অর্থ হয় ‘দ্রুত’ বা ‘সচরাচর গমনশীল’ জনগোষ্ঠী। তা যদি হয়, তাহলে তো ফিঙ্গারা তিব্বত থেকেই এসে থাকবেন বৌদ্ধধর্মের বার্তাবহন করে। এবং হয়ত যাযাবর শ্রেণির মানুষ। কিন্তু ঠিক কোন্ সময়ে তাদের আবির্ভাব ঘটেছিল, তা স্থলপথে তাম্রলিপ্ত হয়ে না জলপথে, সে বিষয়ে কিছুই জানা যায় না। ১৮৮২তে তমলুক থেকে প্রাপ্ত কণিষ্কের তাম্রমুদ্রা যেমন এই অঞ্চলটিকে কুবাণ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বলে নির্দেশ করে, তেমনি, জানা যায় পরবর্তীকালে চতুর্থ শতকে গুপ্ত সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের সময়কালে সমতট, কামরূপ, নেপাল, তিব্বত অঞ্চল সহ তাম্রলিপ্ত অঞ্চলও ছিল গুপ্তসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। সেইসময়ই বৌদ্ধ ফিঙ্গাদের আবির্ভাব ঘটে থাকবে খেপুত অঞ্চলে। নিজেদের ক্ষমতায় এরা বুপনারায়ণ তীরবর্তী বিস্তীর্ণ অঞ্চলে একটি ক্ষুদ্র বাজ্য প্রতিষ্ঠা করে থাকবে।

এরা যে নিরুপদ্রবে এখানে শাসনাধিকার বলবৎ করেছিল, তার কারণ বহু শাখা প্রশাখায় বিভক্ত শিলাবতী ও বুপনারায়ণের অবস্থান। সুপ্রশান্ত বুপনারায়ণের বৃক্কে হয়ত কয়েক বর্গকিমি জুড়ে একটি দ্বীপ ছিল ফিঙ্গা রাজ্যটি। রাজার সুরক্ষিত গড়টি যে খেপুতের ‘চৌধুরীবেড়ে’ই ছিল, প্রাপ্ত বিপুলায়তন প্রস্তরখণ্ডগুলিই সেই সাক্ষ্য বহন করে। এখানকার মাটি নদীর পলিতে গড়া,

উর্বর। একটি বড়ো আকারের ঢিবি আজও যেন মনে করিয়ে দেয়, এর নীচেই হয়ত ঘুমিয়ে আছে ফিঙ্গারাজাদের নানা অজানা কৃন্তান্ত। এখানকার মৃত্তিকাগর্ভ থেকে বা পুষ্করিণী থেকে বিভিন্ন সময়ে যে সব খোদিত প্রস্তরখণ্ড, মূর্তি বা মূর্তির ভগ্নাংশ পাওয়া গেছে সেগুলি উপযুক্ত ভাবে পরীক্ষা করা গেলে, ঢিবিটিতে খনন কার্য চালালে ইতিহাসের নষ্টকোষ্ঠীর উদ্ধার সম্ভব হতেও পারে।

পাল ইতিহাসের সঙ্গে সম্পর্ক

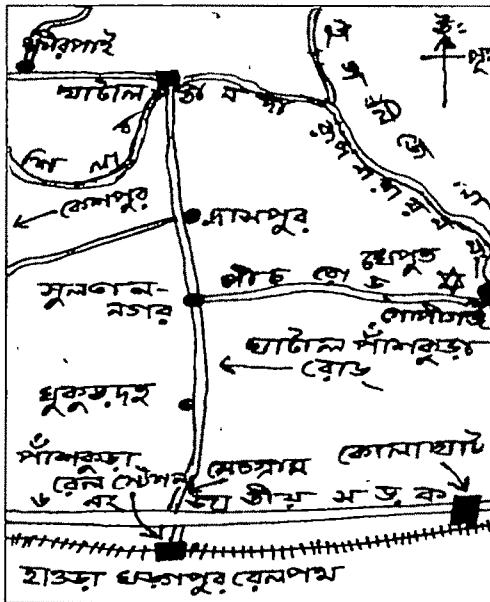
অষ্টম শতাব্দীর শেষ থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত প্রায় চারশো বছর ধরে, গোপাল থেকে মদন পাল পর্যন্ত উনিশ জন ‘দেব’ যুক্ত পাল রাজা এদেশ শাসন করেন। সম্ভ্রতিকালে মালদহ জেলার জগজীবনপুর বৌদ্ধবিহার আবিষ্কারের ফলে তৃতীয় পালসম্রাট দেবপালের পুত্র মহেন্দ্রপালদেবের ইতিহাস জানা (নবম শতক) গেছে। সারা ভারতে বৌদ্ধধর্মের সংকটকালে এই পাল সম্রাটরা পরম নিষ্ঠায় এই ধর্মটিকে লালন ও সংরক্ষণ করে এসেছেন। ধর্মপালের গ্রামদান (বিষ্ণুমন্দির নির্মাণের জন্য), নারায়ণপালের ভাগলপুর অনুশাসন অনুযায়ী, ‘তীরভুক্তির’ মকুতিকা গ্রামে হাজার শিবালয়যুক্ত মঠ নির্মাণে সম্রাটের সহযোগিতা ইত্যাদি থেকে পাল রাজাদের পরধর্মসহিস্রুতার কথা জানা গেলেও তাঁরা প্রধানত ছিলেন বৌদ্ধধর্মের ধারক ও বাহক। তাঁদেরই সময় ওদন্তপুরী, ত্রৈকুটক, জগদল, দেবীকোট, সন্নগর, পট্টিকেরক, হলুদবিহার, সুবর্ণ বিহার, বিক্রমশীলা, নালন্দা আপনক, সোমপুরী, তুলাভিটার বৌদ্ধ বিহার, মহাবিহার, সংঘারাম ইত্যাদি নির্মিত হয়। অনুলিখিত হয় অজস্র বৌদ্ধধর্মগ্রন্থ, নির্মিত হয় অসংখ্য বৌদ্ধ মূর্তি-স্থাপত্য-ভাস্কর্য। বৌদ্ধধর্মের এক সহজতর লৌকিকরূপ ‘মহাযানী’ পন্থায় বিশ্বাসী ছিলেন এঁরা। সে সময় তন্ত্রযান, বজ্রযান, কালচক্রযান ইত্যাদি নানা শাখায় বিভক্ত মহাযানী বৌদ্ধধর্মে কল্পিত হন বিভিন্ন বৌদ্ধদেবদেবী। সমগ্র মগধ, বিহার, নেপাল, বঙ্গদেশ, বরেন্দ্র, পুন্ড্র, সমতট, কামরূপ ও উত্তর কলিঙ্গের সর্বত্রই সে সময় বৌদ্ধসংস্কৃতির এক স্বর্ণযুগ বলা চলে। সুতরাং খেপুতে তিব্বতগত বৌদ্ধ ফিঙ্গারাজের এলাকাতেও মহাযানী বৌদ্ধসংস্কৃতির প্রভাব পড়া বিচিত্র নয়। শুণ্ডযুগ থেকে ফিঙ্গাদের কল্পিত ইতিহাসটি অনুভব করলেও পালযুগ পর্যন্ত সময়কাল অর্থ চতুর্থ/পঞ্চম থেকে অষ্টম/নবম শতক পর্যন্ত এই তিনশো বছর সময়কালের ইতিহাস খেপুতকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে তা অস্বাভাবিক। পালযুগ বা তারও আগে থেকে এদেশে বৌদ্ধ ধর্ম-দর্শন পাঠ করতে শিক্ষার্থীরা তিব্বত থেকে দলে দলে রাঢ়-বঙ্গ-সমতটের বিহার মহাবিহারে ভিড় জমাত। তাহলে কি বিপুলায়তন রূপনারায়ণের কন্যার বার বার প্রাবিত হয়ে এখানকার সবকিছু পলির নীচেই ঢাকা পড়ে গেছে? সেভাবেই কি ‘চৌধুরীবেড়’ সমিহিত ঢিবির নীচে লুকিয়ে আছে ফিঙ্গা রাজাদের প্রকৃত ইতিহাস, প্রাসাদ, বৌদ্ধবিহার বা দেবালয়, দেবদেবীর মূর্তি; তারই খণ্ড খণ্ড অংশই বোধ হয় বিভিন্ন সময়ে খেপুতের মাটির নীচে থেকে বেরিয়ে এসেছে।

খেপুতের অধিষ্ঠাত্রী দেবী খেপুেশ্বরী এখন হিন্দু শক্তিদেবীর ধ্যানমগ্নে পূজিতা হলেও (অষ্টভুজা দুর্গা) আদিতে ইনি বৌদ্ধ মহাযানী দেবী অষ্টভুজা মহাপ্রতিসরা বা রক্ষমহাদেবীর কোনো বিশেষ ভঙ্গিমায় হিন্দুরূপায়ণ কিনা জানি না। পালরাজারা বৌদ্ধ হলেও তাঁদের সময়ে হিন্দুস্থাপত্য ভাস্কর্যেরও যথেষ্ট সমৃদ্ধি ঘটে। তাঁদেরই সময়কার এই মূর্তিটি। এছাড়া খেপুতে প্রাপ্ত অন্যান্য মূর্তিগুলি পাল বা পরবর্তী সেনযুগের শিল্পনিদর্শন। ১৯৭৬ সালে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার

চন্দ্রেশ্বর খাল (বুপনারায়ণের সঙ্গে যুক্ত সেচখাল) সংস্কারকালে খালের ভেতরের চার ফুট মৃত্তিকার স্তর থেকে পাওয়া যায় ১২শ ১৩শ শতক সময়কার প্রায় এক ফুট দীর্ঘ, কণ্ঠিপাথরের মহিষমর্দিনী মূর্তি। প্রাপ্তিস্থান খেপুতের পার্শ্ববর্তী চাইপাই গ্রাম। খেপুতের 'চৌধুরীবেড়ের' বেষ্টনকারী গড়খাইয়ের মধ্যে একটি ক্ষুদ্রাকার মন্দিরের শীর্ষদেশ দেখা যেত, গ্রীষ্মকালে খালের জল শুকোলে।

সুতরাং এইসব নিয়েই খেপুতের তথাকথিত ফিঙ্গা-রাজকাহিনি। বুপনারায়ণের পশ্চিম-তীরবর্তী, দ্বীপসদৃশ অঞ্চলটি বাণিজ্যকেন্দ্ররূপে যে গুরুত্বপূর্ণ ছিল, তা এর অবস্থান থেকেই বোঝা যায়। পাল ও সেন বংশের পর মুসলিম শাসনকালেও এর সমৃদ্ধি অটুট ছিল। নদীতীরবর্তী বর্তমান জনপদ 'গোপীগঞ্জ'কে কেন্দ্র করে খেপুত ও তৎপার্শ্ববর্তী উর্বর কৃষিব্যবস্থানির্ভর মানুষের জীবন আজও রীতিমতো সচ্ছলতায় সমৃদ্ধ। ১৫ শতকের শেষদিকে হুশেন শাহের রাজত্বকালে সরকার মান্দারণের চেতুয়া বা মণ্ডলবাট পরগনায় ভূমিবন্দোবস্ত (Settlement) কর্মে যেসব মুসলিম কর্মচারি গৌড় থেকে এদেশে আসেন, তাঁদের সঙ্গে আসেন সিদ্ধপির বড়ো খান গাজি সাহেব। মনে হয় এতদঞ্চলে মুসলিম ধর্মপ্রচারে ইনি পথিকৃৎ। কিন্তু সে ইতিহাস অনেক পরবর্তীকালের।

ফিঙ্গা সম্প্রদায় নিজেদের ক্ষুদ্র রাজ্যটিতে যে বৌদ্ধ সংস্কৃতির পরিমণ্ডল গড়ে তোলেন, প্রাকৃতিক দিক থেকে তা কিন্তু কোনোভাবেই নিক্রপদ্রব ছিল না। শিলাবর্তী, দ্বারকেশ্বর, মুণ্ডেশ্বরীর মিলিত জলপ্রবাহে সৃষ্ট রূপনারায়ণের প্রবল বন্যা আর জলোচ্ছ্বাস যে প্রতি বছরই খেপুতে প্লাবন আনত, তা যথার্থই। সেই বারংবার প্লাবনেই হয়ত ধীরে ধীরে ফিঙ্গা-রাজপাট ডুবে যায়, হারিয়ে যায় পলিমাটির গভীরে। তারই ঋণাত্মক কখনও কখনও বেরিয়ে আসে মৃত্তিকাস্তর থেকে। উপযুক্ত খননকার্য হলে হয়তো কোনো রাজপ্রাসাদ, দেওয়াল বা বৌদ্ধবিহারের ধ্বংসাবশেষের সন্ধান মিললেও মিলতে পারে।*



* ১৯৭২-এর সবেজমিন অনুসন্ধানের ভিত্তিতে লেখা।

গঙ্গাপুত্র : শৈলবালা ঘোষজায়ার সমাজচেতনা

অরুন্ধতী সুর

এক

সামাজিক প্রেক্ষাপট যে কোনো সাহিত্যের উপরে অনিবার্যভাবেই একটা প্রভাব বিস্তার করে থাকে। সমাজের পট পরিবর্তনে সাহিত্যও ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হতে থাকে। কখনো সাহিত্যিক সেই পরিবর্তনকে দেখেন রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গিতে এবং পুরানো ঐতিহ্যকে আঁকড়ে ধরার প্রেরণার মধ্য দিয়ে। কখনো বা সাহিত্যিক দেখেন যুক্তি ও বুদ্ধির প্রেক্ষিতে প্রগতিমনস্ক চেতনা দিয়ে, নতুন সমাজ ও জীবনকে স্বাগত জানিয়ে বরণ করে নিয়ে। সেখানে পুরানো ঐতিহ্যকে শ্রদ্ধা জানিয়েও বরণ করে নিয়ে। সেখানে পুরানো ঐতিহ্যকে শ্রদ্ধা জানিয়েও থাকে নতুনের প্রতি সমর্থন। শৈলবালা ঘোষজায়া এমন একজন সাহিত্যিক যার বিবাহ হয়েছিল মাত্র তেরো বছর বয়সে, বধু ছিলেন রক্ষণশীল পরিবারের, কিন্তু মনে ছিল প্রগতিশীল চেতনা। এই প্রগতিমনস্কতা বোধ হয় তাঁর পিতৃপরিবার থেকেই এসেছিল। মানুষের জীবনে বিশেষ করে নারীর জীবনে যে সমস্ত পুরাতন প্রথা ও সংস্কারের বেড়াজাল ছিল, শৈলবালা আঘাত হেনেছেন সেই বদ্ধমূল প্রথা বা সংস্কারের গভীরে। নাড়া দিতে চেয়েছেন মানুষের অন্তরকে, সচেতনতা বোধ জাগাতে চেয়েছেন মানুষের মধ্যে।

কুঞ্জবিহারী নন্দী ও হেমাক্ষিনী দেবীর প্রতিভাময়ী কন্যা শৈলবালার জন্ম হয়েছিল ১৮৯৪ সালের ২ মার্চ চট্টগ্রামের কক্সবাজারে। চাকরি থেকে অবসর নিয়ে শৈলবালার পিতা বর্ধমানে বসবাস শুরু করেন। শৈলবালার পরিবার ছিল খোলামেলা। সংস্কার, প্রথা, রক্ষণশীলতা তাদের পরিবারকে ততটা আচ্ছন্ন করেনি। তাই শৈলবালার পড়াশুনার বাধা আসেনি তাঁর পিতৃপরিবার থেকে। বর্ধমানের রাজ বালিকা বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেন। কিন্তু তেরো বছর বয়সে বর্ধমান জেলার মেমারি গ্রামে এক বিশাল একান্নবর্তী পরিবারে বিবাহ হয়। ফলত বিদ্যালয়ের পড়াশুনায় ছেদ টানতে হয়। তবুও পিতার আনুকূল্যে ছোটোবেলা থেকেই তাঁর সাহিত্যরুচি গড়ে উঠতে থাকে। অবসরপ্রাপ্ত পিতাকে হেমচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বই পড়ে শোনাতে হত। বিবাহের পরেও সংসারের সমস্ত কাজ করে রাতে লুকিয়ে লঠনের আলোয় তিনি লেখাপড়া করতেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করতে হয় দু-একজন দেবর ও ভাসুরপো ছাড়া বাকি সকলেই তাঁর সাহিত্য সাধনার বিরোধী ছিলেন। তাঁর স্বামী কিছু কিছু ক্ষেত্রে তাঁর সাহিত্য সাধনায় সহযোগিতা করেছেন।

শৈলবালার স্বামী নরেন্দ্রমোহন ঘোষ প্রথম থেকেই একটু অপ্রকৃতিস্থ ছিলেন। শৈলবালার

স্বামী কিছুদিন কলকাতায় এসে শর্টহ্যান্ড টাইপরাইটিং শেখেন এবং হোমিওপ্যাথি পড়েন। এই সময় তাঁর পড়ার খরচ দিতেন শৈলবালা নিজের রোজগার থেকে। শৈলবালার ছাব্বিশ বছর বয়সেই তাঁর স্বামী সম্পূর্ণ উন্মাদ হয়ে যান এবং শৈলবালার উপর শারীরিক নির্যাতন শুরু করেন। এই সময় তাঁর দাদা মেজর অশ্বিনীকুমার নন্দী পুলিশের সাহায্যে শৈলবালাকে উদ্ধার করে বর্ধমানের বাড়িতে নিয়ে আসেন। শাশুড়ির মৃত্যুর পর ১৯২৬ সালে শ্বশুরবাড়িতে ফিরে আসেন। তিন বছর পর ১৯২৯ সালে তাঁর উন্মাদ স্বামীর মৃত্যু হয়। কিন্তু শ্বশুরবাড়ির ষড়যন্ত্রে অতিষ্ঠ হয়ে ১৯৪০ সাল নাগাদ সংসার ত্যাগ করে পুরুলিয়ার রামচন্দ্রপুরের বিজয়কৃষ্ণ আশ্রমে আশ্রয় নেন। ১৯৭৪ সালে শৈলবালার জীবনের সমাপ্তি ঘটে।

আশি বছরের জীবনে তিনি প্রায় বাহান্নটি উপন্যাস, গল্প ও নাটক লিখেছেন। ১৯১৫ সালে লেখা শৈলবালার প্রথম গল্প ‘বীণার সমাধি’ বেগমবাহার গল্প প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় পুরস্কার পায়। তাঁর প্রথম উপন্যাস *শেখআন্দু* প্রকাশিত হয় ১৯১৭ সালে। উপন্যাসটি ধারাবাহিক ভাবে ১৩২২ বঙ্গাব্দের *প্রবাসী* মাসিক পত্রিকায় বৈশাখ থেকে ফাল্গুন পর্যন্ত (১৯১৪ এপ্রিল থেকে মার্চ) এগারোটি কিস্তিতে বত্রিশটি পরিচ্ছেদে প্রকাশিত হয়েছিল। বৈশাখ সংখ্যায় যখন উপন্যাসটি ছাপা হয় তখন লেখিকার নাম ছিল শৈলবালা ঘোষ। কিন্তু জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় লেখিকার নাম ছাপা হয় শৈলবালা ঘোষজ্ঞায়া। প্রসঙ্গত জানা যায়, শ্বশুরবাড়ির লোকদের হাত থেকে নিজের পরিচয় গোপন করার জন্যই তিনি নামের পরে ‘ঘোষজ্ঞায়া’ লিখতে শুরু করেন। তাঁর বিখ্যাত কয়েকটি উপন্যাস হল, *অভিশপ্ত সাধনা*, *তেজস্বতী*, *ঘণাহতা*, *গঙ্গাজল*, *গঙ্গাপুত্র*, *জন্ম অভিশপ্তা*, *জন্ম অপরাধী*, *নীলার শিক্ষা*, *শাস্তি* ইত্যাদি।

দুই

শৈলবালা ঘোষজ্ঞায়ার সাহিত্য জীবনের শুরু বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক। সমকালীন, রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশ আমাদের আলোচিত *গঙ্গাপুত্র* (১৯৩৯) উপন্যাসে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল। তাই সমকালীন রাজনৈতিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট একটু দেখে নেওয়া যাক। বাংলার রাজনৈতিক পটভূমি তখন বিপর্যস্ত। ভারতের শাসক ইংরেজ কিন্তু ভারতীয়ের লক্ষ্য স্বাধীনতা অন্যদিকে বিশ্বের ইতিহাসে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা। ভারতের স্বাধীনতার যুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনের ঢেউ যখন বাঙালির মজ্জায় মজ্জায়, তখন বিশ্বযুদ্ধের সংগে একান্ত বাধ্য হয়ে জড়িয়ে পড়া ভারতবাসী বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতে অর্থনৈতিক দিক থেকে বেসামাল। ব্রিটিশ সরকারের পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় বাংলার কৃষি, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, মাঝারি আকারের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি ধ্বংসের মুখোমুখি। ফলে প্রধানত কৃষিভিত্তিক এই দেশের মানুষের মধ্যে বেকারত্ব, হতাশা, কর্মচ্যুতি একটা দৈনন্দিন ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। শ্রমিক কৃষকের এই বিপর্যস্ত পরিণতিতে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন শ্রমিক ও কৃষক সংগঠন এবং শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলন। আবার এরই পাশাপাশি চলেছিল সমাজ সংস্কারবাদের প্রচেষ্টায় সমাজের বিভিন্ন পরিবর্তন। সামাজিক এই পরিবর্তনের ধারায় সর্বাত্মে স্থান পেয়েছিল সমাজের সর্বস্তরে শিক্ষা বিস্তারের ব্যাপক প্রবণতা।

ফলত জাতি-ধর্ম-বর্ণ, নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকল শ্রেণির মানুষের মধ্যে দেখা দিয়েছিল একটা সচেতনতা বোধ। বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনে এবং সমাজ সংস্কারমূলক আন্দোলনে পুরুষের পাশাপাশি নারীও অংশগ্রহণ করেছিল স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই। বিশেষ করে একদিকে যেমন স্বদেশি ও বয়কট আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন, আইন অমান্য আন্দোলনে নারী অংশ নিয়েছে, তেমনি অন্যদিকে শিক্ষায় সংস্কৃতিতে পরিবারের উন্নতিতে, আর্থিক সংকট মোচনেও অংশ নিয়েছে স্বাভাবিক ভাবেই।

ঔপনিবেশিক শক্তির আগমনের পর থেকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ও সমাজ চেতনার উদ্ভবের ফলে ধর্মীয় অনুশাসন ও সামাজিক বিধি সম্পর্কিত নতুন চেতনা ও মূল্যবোধ জাগ্রত হয়েছিল। ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম যতই প্রবল আকার ধারণ করেছে, সংকীর্ণ, স্থানীয় প্রাদেশিক জাত ও সাম্প্রদায়িক সচেতনতাও ততই দুর্বল হয়ে পড়েছে। ভারতীয়দের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধির ব্যাপারে ১৯২০ সালের অসহযোগ আন্দোলন এবং ১৯৩০ সালের আইন অমান্য আন্দোলন বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। এই সমস্ত আন্দোলনের মধ্য দিয়ে জাতীয় চেতনা আত্মপ্রকাশ করেছিল এবং জনসাধারণের মধ্যে জাতীয় সচেতনতা গভীর ও ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল। বস্তুতপক্ষে জাতীয় আন্দোলনের প্রসার হিন্দুদের মধ্যে জাত সম্পর্কিত চেতনা অনেকটাই শিথিল করে দিয়েছিল। আবার অন্যদিকে ভারতে পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ার ফলে কলকারখানায় যে পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে উঠল তাতে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার স্পর্শে শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী শ্রেণি জাতিভেদ ও বর্ণভেদের ভিতকে অনেকটাই দুর্বল করে দিয়েছিল। আবার সারাদেশে এক ধরনের আইন প্রবর্তন করে ব্রিটিশ সরকার এই বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার উপর আঘাত এনেছিল। বিশেষ করে ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে 'স্পেশাল ম্যারেজ এ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট' (Special Marriage Amendment Act) চালু করে জাত ব্যবস্থার পরিকাঠামোকে কিছুটা পরিবর্তিত করেছিল।

প্রাক ব্রিটিশ যুগে হিন্দুদের মধ্যে একটা গোষ্ঠীকে অস্পৃশ্য বলে বিচ্ছিন্ন রাখা হত এরা সমাজের নিম্নস্তরের কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকত এবং এদের কতকগুলি প্রাথমিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হত। এদের উপর যে সব অবিচার করা হত তার মধ্যে সবচেয়ে প্রকট ছিল মন্দিরে প্রবেশ সর্বসাধারণের ব্যবহার্য জলাশয়ে যাবার বাধা, সর্বসাধারণের স্কুলে ভর্তি হবার বাধা এবং স্বতন্ত্র এলাকায় বাস করবার বাধ্যবাধকতা। উপরন্তু তাদের স্পর্শে উঁচু জাতের লোকেরা অশুচি হয়ে যেত। ভারতীয় জনসাধারণের শিক্ষিত ও সচেতন অংশের মনে গণতান্ত্রিক চেতনা থেকে যে রোখ জাগ্রত হয়েছিল অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে রোধ তারই অঙ্গ।

ব্রাহ্মসমাজ, আর্যসমাজ, সোশ্যাল রিফর্ম কনফারেন্স (Social Reform conference) এমনকী গান্ধী নেতৃত্বাধীন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মতো রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান এবং গান্ধী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত নিখিল ভারত হরিজ্ঞন সংঘের মতো আন্তর্জাতিক সংগঠন, এরা প্রত্যেকেই অস্পৃশ্যদের সমান সামাজিক ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে ড. বি. আর. আম্বেদকার-এর নাম অবশ্যই স্মরণ করতে হয়। ড. আম্বেদকার বঞ্চিত শ্রেণিকে একটা রাজনৈতিক বাহিনীতে পরিণত করতে চেয়েছিলেন এবং তাদের রাজনৈতিক দাবিকে আদায় করবার চেষ্টা করেছিলেন। এই দাবি

সমূহই বিশেষভাবে ১৯৩৫ সালের সংবিধানে স্বীকৃত হয়। গান্ধী ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে তাঁর দ্বারা প্রবর্তিত নিখিল ভারত হরিজন সেবক সংঘ এবং অন্য কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নিপীড়িত শ্রেণি সমূহের জন্য সমাজ সংস্কার ও তাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা করেছিলেন। ১৯৩৭ সাল থেকে কংগ্রেস যে বিভিন্ন প্রদেশে সরকার পরিচালনা করেছিল তার মধ্যেই সরকারি উদ্যোগে নিপীড়িত শ্রেণি সমূহের উন্নতির জন্য কিছু প্রগতিশীল ভূমিকা নিয়েছিল। বোম্বাইয়ে কংগ্রেস সরকার ‘বম্বে হরিজন টেম্পল ওয়রশিপ’ (Bombay Harijan Temple Worship [Removal of Disabilities] Act) পাশ করে। এই আইন অনুসারে হরিজনদের মন্দিরে প্রবেশাধিকার দেওয়া হয়। মধ্যপ্রদেশ এবং বিহার কংগ্রেস সরকার প্রাথমিক পর্যায় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত হরিজনদের অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করে।

তিন

অস্পৃশ্য বা নিম্নশ্রেণি সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার কারণ হল— গঙ্গাপুত্র (১৯৩৯) উপন্যাসটি আবর্তিত হয়েছে নিম্নশ্রেণির (মুন্ডফরাস) অন্তর্গত একটি চরিত্রকে অবলম্বন করে, যার পেশা শবদাহ করা। আর আছে নারীর সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে উপন্যাসিকের দৃষ্টিভঙ্গি। উপন্যাসটির একদিকে উদ্ঘাটিত হয়েছে নারী পুরুষ সম্পর্কিত সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি অন্যদিকে ব্রাহ্মণ এবং তথাকথিত নিম্নশ্রেণি সম্পর্কে উপন্যাসিকের মানসিক প্রবণতা ও সচেতনতা বোধ।

উপন্যাসটি শুরু হয়েছে — বসন্ত রোগগ্রস্ত এক মৃত্যুপথযাত্রী গৃহবধুর করুণ কাহিনি দিয়ে। এই গৃহবধু জমিদারের আত্মীয়া এবং বিয়ে বাড়ি উপলক্ষ্যে তার জমিদার বাড়িতে আগমন। জমিদার বাড়িতেই যখন বসন্ত রোগগ্রস্ত হয় মেয়েটি, তখন তার স্বামী কর্মসূত্রে অন্যত্র চলে গেছে। এই গৃহবধু যখন বসন্ত রোগের শূশ্রূষা না পেয়ে সাময়িকভাবে চেতনাহীন হয়ে পড়েছে তখন গ্রামের পুরুষ মানুষের বিবেচনায় সে মৃত। মেয়েমানুষের আবার ডাক্তার কি? তাই শবদাহ করতে নিয়ে যাওয়া। কিন্তু বাদ সাধল প্রকৃতি। শবদাহকারী দলের নিজেদের মধ্যে বিবাদ এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয় — এই দুয়ের কারণে শবদাহকারীরা শবদাহ না করেই গঙ্গার ঘাটে মৃতদেহ ফেলে রেখে পলায়ন করে। শ্মশানঘাটের অদূরেই শ্মশান রক্ষক লালু মুন্ডফরাসের বাস এবং কিছুটা দূরে শব সৎকারক মস্ত্রপাঠক এবং আনুষ্ঠানিক কর্তব্য নির্দেশক রামঠাকুর সপরিবারে বাস করে। প্রতিদিনের মতো সেদিনও লালু কৃষ্ণমঙ্গল গানের আসর থেকে সকলের ছোঁয়া বাঁচিয়ে বৃষ্টির আশঙ্কায় একটু তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরছিল। সেই সময় মৃতদেহটি তার দৃষ্টিগোচর হয় এবং ঘনঘন ডাক দিয়ে শবদাহকারী দলের কোনো সন্ধান না পেয়ে মৃতদেহটি বৃষ্টি ও বানে ভেসে যাবার আশঙ্কায় শবদেহ পাড়ে তুলে আনে। তখনই সে বুঝতে পারে এ মৃতদেহ নয় — এ দেহে আছে প্রাণের স্পন্দন। লালু মুন্ডফরাস দেহটি তার ঘরে নিয়ে আসে এবং সেবা শূশ্রূষার জন্য পাশের গ্রাম থেকে ধর্ম মাকে ডেকে আনে। লালু এবং ধর্মমায়ের চেষ্টায় নানা সেবা যত্নের মধ্য দিয়ে মেয়েটি সুস্থ হয়ে ওঠে। কিন্তু মেয়েটির পূর্বস্মৃতি লোপ পায়। স্মৃতিভ্রষ্ট হওয়ায় মেয়েটি তার নিজের নাম পরিচয় কিছুই

জানাতে পারেনি। লালু গোপনে আশেপাশের গ্রামে খোঁজখবর করেও মেয়েটির পরিবারের কোনো সন্ধান পায়নি। মেয়েটি লালুর সংসারের থেকেই তার সংসারের কাজগুলি রপ্ত করে নিচ্ছিল। কিন্তু বিবাহিত এক অপরিচিত নারীর লালুর একার পরিবারে একসঙ্গে বসবাস সমাজসম্মত না হওয়ায় মেয়েটির নিরাপত্তার কারণে লালু মেয়েটিকে বিবাহ করে। এই বিবাহ লালুর সমাজের সকলেই অনুমোদন করে। দুই পুত্র সন্তান নিয়ে লালুর সংসার সুখেই কাটছিল।

এরপর পনেরো বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। একদিন এক ধনী বৃদ্ধের মৃতদেহ শ্মশানে আনা হয়েছে। বয়স চম্বিশের এক ব্রাহ্মণ জপান্তে জল থেকে ওঠার সময় লালুর পুত্রদের দেখে তাদের পরিচয় জানতে আগ্রহী হয়। তার জীবনে পূর্বদিনের স্মৃতি জেগে ওঠে। লালুর পুত্রদের পরিচয় সূত্রে তাদের মাতৃপরিচয়ও ব্রাহ্মণের অগোচরে থাকে না। সকলেই জানতে পারে বর্তমানে লালুর স্ত্রীই হন ব্রাহ্মণের পূর্বপত্নী। এখানে মেয়েটিকে ব্রাহ্মণের পরিবারে ফিরিয়ে দেওয়ার প্রসঙ্গে সমাজ মুবুঝিদের আলোচনা শেষ পর্যন্ত তর্ক-বিতর্কে পৌঁছায়। এক প্রৌঢ়া স্পষ্টই জানিয়ে দেয়, “ব্যাটাছেলে আর মেয়েছেলের কার্য্যাকার্য্য এই সমাজে এক নিষ্কিঁতে ওজ্জন করা হয় না”, এবং এখানে হিন্দু নারীর সতীত্ব, পবিত্রতা প্রভৃতি নিয়ে তর্ক উপস্থিত হয়। এসব উপেক্ষা করে ব্রাহ্মণ লালুকে নমস্কার জানিয়ে তার পুত্রদের পড়াশুনার ভার নিতে চায় এবং বলে, “কিন্তু মন, বুদ্ধি, হৃদয়ের দিক থেকে তুমি অনেক কদাচারী তথাকথিত ব্রাহ্মণের চেয়ে বড় ব্রাহ্মণ, গৌরবের অধিকারী।” ব্রাহ্মণ লালুকে তার কথা লালুর স্ত্রীকে জানাতে নিষেধ করে এবং তাকে নমস্কার জানিয়ে আবার আসবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ফিরে যায়।

উপন্যাসটিতে ঔপন্যাসিক প্রবণতার দুটি দিক বিশেষভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রথমত তথাকথিত নিম্নজাতি সম্পর্কিত চেতনার স্বরূপ, দ্বিতীয়ত সমাজে নারীর অবস্থান সম্পর্কিত বাস্তব চিত্র। মনে রাখতে হবে শৈলবালার *গঙ্গাপুত্র* উপন্যাসটির প্রকাশকাল ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা লগ্ন। তার কিছু পূর্বে ঔপনিবেশিক শাসন ও সভ্যতা এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব জাতীয় জীবনকে প্রভাবিত করেছিল নানাভাবে। ফলে একদিকে সংস্কারপন্থী অন্যদিকে সংস্কারমুক্ত মানসিকতার মধ্যে দেখা দিয়েছে দ্বন্দ্ব। জাতিভেদ বর্ণভেদ প্রথা নিয়ে বিভিন্ন সংস্কার আন্দোলন এবং মানুষের চেতনায় পরস্পরবিরোধী সত্তার উন্মোচন যখন বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে তখন শৈলবালা ঘোষজায়া তাঁর উপন্যাসে নির্দিধায় একজন মুন্সফরাসকে (যার পেশা শবদাহ) নায়ক নির্বাচন করলেন। শুধু নায়ক চরিত্র হিসাবে নয় সামাজিক কর্তব্য পালনে, উদারতায়, মনুষ্যত্ববোধে সে উচ্চজাতি তথা সাধারণ ব্রাহ্মণ শ্রেণির থেকে অনেকটাই উচ্চ মানবিকতাবোধের অধিকারী।

শৈলবালা ঘোষজায়ার উপন্যাস রচনার কিছু পূর্বে এবং সমসাময়িক কালের সাহিত্যিকের রচনায় সাধারণ মানুষের জীবন-দুর্দশা, জীবনের নানা সমস্যা এসেছে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রবোধকুমার সান্যালের রচনায়। সাধারণ মানুষ এমনকী বেদে, যাযাবর শ্রেণি, বস্তি-জীবনের আলেখ্য উপস্থাপিত হয়েছে, তাদের জীবন ইতিহাস ব্যস্ত হয়েছে। কিন্তু শৈলবালার *গঙ্গাপুত্র* উপন্যাসের বস্তব্য সম্পূর্ণ পৃথক। শৈলবালা নিম্নশ্রেণির মানুষের দারিদ্র্য, হতাশার জীবন আলেখ্য রচনা করেননি। তাঁর রচনায় তথাকথিত নিম্নশ্রেণির

মানুষের মনের মানবিক চিত্র বুঝায়িত হয়েছে। আমরা যেভাবে অর্থ, প্রতিপত্তি, জাতি, ধর্ম, বর্ণের ভিত্তিতে সমাজের উচ্চ-নিচ শ্রেণি-বিভাজন করি, সেই দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি কটাক্ষ বর্ষিত হয়েছে লেখিকার। তিনি দেখাতে চেয়েছেন মানুষের মনুষ্যত্ববোধের শ্রেষ্ঠত্ব। ঔদার্য, মনুষ্যত্ব, স্নেহ, ভালোবাসা মানুষের জাতি বা বর্ণ নয়, মানুষের মানবিকতাবোধের উপর নির্ভর করে। তাই তথাকথিত নিম্নশ্রেণির অন্তর্গত লালু চরিত্রের পাশাপাশি ব্রাহ্মণ সমাজের চিত্র পরিস্ফুট হয়েছে উপন্যাসে। সাধারণ ব্রাহ্মণ সমাজের থেকে লালুর প্রতি লেখিকার সহানুভূতি বর্ষিত হয়েছে। তাই বলা যায় ঔপন্যাসিকের চেতনায় দেখা দিয়েছে জাতি নয়, ব্যক্তির মনুষ্যত্ববোধের প্রতি আস্থা। মানবিকতাবোধের মাপকাঠিতে বিশ্লেষণ করতে চেয়েছেন মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব।

সমাজবিধান এবং নারীর সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে শৈলবালার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অত্যন্ত সচেতন। জমিদারের আত্মীয়া এক মহিলা জমিদার বাড়িতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এসে বসন্তরোগে আক্রান্ত হয়। কৃপণ জমিদার বাবুর বক্তব্য : “মেয়ে মানুষের আবার ডাক্তার কি?” সুতরাং ‘মেয়ে মানুষের জীবন’ যত তাড়াতাড়ি শেষ হয় ততই ভালো। তাই বসন্ত রোগগ্রস্ত মৃত্যুপথযাত্রী সাময়িক অচেতন্য এই নারীকে শবদাহ করতে নিয়ে আসা হয়। কিন্তু নিজেদের মধ্যে বিবাদে মৃতদেহ সংকাব না করেই তারা ফিরে যায়। মৃতদেহ সংকার না হওয়ার দায়ও বর্তায় এই নারীর ভাগ্যের উপর। “ওর কপালে মরণ ঘনিয়ে এসেছিল তাই মরেছে, গতি হওয়া ওর কপালে নেই, আমার দোষ কি?” — এই হল জমিদারবাবুর বক্তব্য। কোনো সভ্য সমাজে নারীজাতির প্রতি এই বঞ্চনা অবহেলা যে কতটা নিমম, কতটা অমানুষিক শৈলবালা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন।

এখানেই শেষ নয়, কাহিনির অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এই নির্মমতা আরও প্রকট হতে দেখা যাবে। পরবর্তীকালে দেখা যায় মুন্দোফারাস লালু ও ধর্মমায়ের সেবা যত্নের মধ্য দিয়ে মেয়েটি সুস্থ হয়ে ওঠে কিন্তু পূর্বস্মৃতি লোপ পায়। তাই মেয়েটির নাম, পরিচয়, পূর্বের জীবন সবই অজানা থেকে যায় সকলের কাছে। মাসের পর মাস লালুর ঘরেই মেয়েটি আশ্রয় পায়। পরবর্তীকালে অবশ্য লালু তার সমাজের অনুমতিক্রমে মেয়েটিকে বিবাহ করে স্ত্রীর মর্যাদা দেয়। লালু এখন দুই পুত্রের পিতা। দীর্ঘ পনেরো বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। একদিন ঘটনাচক্রে মেয়েটির স্বামীর পরিচয় পাওয়া গেল এবং তখনই মেয়েটিকে সমাজে ফিরিয়ে নেওয়ার সূত্র ধরে শুরু হল বাক-বিতণ্ডা। এখানেই পুরুষশাসিত সমাজে নারীর উপর আরোপিত সমাজবিধান সম্পর্কে লেখিকার তীব্র কটাক্ষ বর্ষিত হয়েছে। কয়েকজন যুবক ও প্রৌঢ় ব্যক্তির কথোপকথনের অংশ উদ্ধৃত করলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে। নিচে তাদের উক্তি প্রত্যুক্তির কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া হল।

প্রতিবাদী যুবকের প্রতি এক প্রৌঢ়ার বক্তব্য— “আহা মোশাই এতদিন মুন্দোফারাস-এর ঘরে রইল, তাদের ভাত জল খেল। সে মেয়েকে, কে কোন ভদ্রলোক ঘরে নেয়?”

যুবকটির উদ্দেশ্যে আর প্রৌঢ়ার বক্তব্য— “বাপু আমরা স্নেহ নই, হিন্দু ব্যাটাছেলে আর মেয়েছেলের কার্য্যাকার্য্য আমরা এক নিক্তিতে ওজন করি না। চোন্দোপুরুষ ধরে এই নিয়ম চলে আসছে। তোমার কথায় তো সে বিধান উন্টে দিতে পারি না।” আরও বলে—

“হিন্দু মেয়েছেলের পবিত্রতা কোন দৃষ্টিতে বিচার করে সেটা কি তুমি জান না বাপু?”

যুবকটি তখন শাস্ত্রের কথা বলে —

সর্বত্র শাস্ত্রমাম্রিত্য ন কর্তব্যবিনির্গমঃ

যুক্তিহীনবিচারে তু ধর্মহানিঃ প্রজায়তে।

যুবকটি আরও বলে, “সুতিকাগারে আমাদের মায়েরাও হাড়ির জল খান”—

কিন্তু আমাদের সমাজে দেশাচার সংস্কার মানুষের মনে এতটাই দৃঢ় বদ্ধমূল যে সেখানে শাস্ত্রকেও পরাভব স্বীকার করতে হয়। শাস্ত্রের বিধান এরা অমান্য করে কিন্তু চোদ্দো পুরুষের বিধান অমান্য করবার সাহস নেই। পুণ্যবাবু অর্থাৎ মেয়েটির পূর্ব স্বামী দুঃখে কাতর হয়ে পড়লে সমাজ মুরুবিদের বক্তব্য : “একটা মেয়ে মানুষের জন্য এত হৈ চৈ কেন? যা হয়েছে তা তার কর্মফলেই হয়েছে।”— কেউই মেয়েটির সেদিনের অবস্থা খতিয়ে দেখল না। এজন্য দায়ী কে? সমাজ না মেয়েটি নিজে? কী দোষ ছিল মেয়েটির? এ ভাবনা কাউকে বিচলিত করল না, কাউকে মর্মসীড়া দিল না; কিন্তু মেয়েটির যে জাত গেছে, সে যে ভয়ানক অপরাধ করেছে একথা সকলের মুখে মুখে আলোচিত হতে থাকল।

এ প্রসঙ্গে নানা জনের নানা মতামত শোনা যায়। কেউ কেউ জানতে চায় ‘বিবাহ’ শব্দটার মানে কী? শালগ্রাম অগ্নিসাক্ষ্য করে শপথ রক্ষা হয়েছে কী? এ-সব প্রশ্নের উত্তরে আরও দৃঢ় ও বক্তকণ্ঠে হিড়িম্বি ঠাকুরের জবাব শোনা যায়— “অত হিসাব করে কেউ শপথ করে না মোশাই। চারযুগ ধরেই এই নিয়ম চলে আসছে। রামচন্দ্র সীতাকে বিবাহ করেছিলেন, সীতা যে পবিত্র তাও জানতেন। তবু সমাজকে সন্তুষ্ট করবার জন্যই পত্নীত্যাগ করেছিলেন।” বোধ হয় পত্নীত্যাগ হিন্দুসমাজের একটা ধর্মসঙ্গত গৌরবময় উচ্চ আদর্শ। আর ব্যক্তি মানুষ অপেক্ষা সমাজের দাবি রক্ষা করাই যেন পবিত্র কর্তব্য।

পুণ্যবাবু অর্থাৎ মেয়েটির ব্রাহ্মণ স্বামী মেয়েটির জাত নিয়ে কোনো প্রশ্ন তোলেনি বরং ধিকার জানিয়েছে হিন্দুসমাজকে। লালু মেয়েটিকে স্ত্রী বলে গ্রহণ করায় সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে এবং ইচ্ছা থাকলেও পূর্বস্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে মেয়েটির দুঃখ বাড়াতে চায়নি। লালুর কাছে আশ্রয় না পেলে মেয়েটির যে দুর্গতির শেষ থাকত না তা অনুভব করেছে অন্তর দিয়ে। তাই লালুর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে সে বলে : “ভগবান কারুর বাইরের কার্য বিচার করেন না, বিচার করেন অন্তরের উদ্দেশ্য। হও তুমি অস্পৃশ্য — তোমার হৃদয়বস্তাকে নমস্কার করছি আমি।”

সুতরাং একটা জিনিস এখানে পরিষ্কার আধুনিক মনস্ক মন হিন্দু সমাজের এই অন্তঃসার-শূন্য আচার আচরণের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলেছে। আর ক্ষমতালোভী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে হিন্দুধর্মের প্রতি অনাচারের কারণেই হিন্দুধর্মের প্রতি বিশ্বাসে চিড় ধরেছে আধুনিক মনের। তাই পুণ্যবাবু বলেন, “হিন্দু সমাজে এমন সব পেশাদার পুরোহিত যেখানে বর্তমান সেখানে দেবদ্বিজে শ্রদ্ধা রাখাও আশঙ্কার বিষয়।” ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে ভণ্ডামি, অনাচারকে আশ্রয় করে যে হিন্দু সমাজকে কলুষিত করে তুলেছে লেখিকা তাকেই দেখাতে কলম ধরেছেন।

আবার অন্যদিকে মেয়েটির ব্রাহ্মণ স্বামী পুণ্যবাবুর চরিত্রকে অনেকটা উদার হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কিন্তু সমাজ শাসনকে উপেক্ষা করবার মতো মনের জোর ততটা দেখা যায় না। তাই সমাজের কাছে তাকে মাথা নত করতে হয়। লেখিকা হয়তো দেখাতে

চেয়েছেন ব্যক্তির একক প্রচেষ্টায় সমাজ-শাসনকে উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। তাই প্রয়োজন সমাজের প্রতিটি স্তরে সচেতনতা শিক্ষার বিস্তার। আর এখান থেকেই বোধ হয় তাঁর মনে হয়েছিল, লালুর দুই পুত্রের শিক্ষার ব্যয় বহনের জন্য পুণ্যবাবুর আর্থিক সহায়তার প্রসঙ্গ।

গঙ্গাপুত্র উপন্যাসে নারীর সামাজিক অবস্থানের বিষয়টিকে শৈলবালা বর্ণ-হিন্দু সমাজ এবং তথাকথিত নিম্নবর্ণীয় সমাজের পার্থক্যের দিক থেকেও বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। উপন্যাসটির বিশ্লেষণে দেখা যায় বর্ণ-হিন্দু সমাজেই নারীর প্রতি উৎপীড়ন, কলঙ্কলেপন বেশি। তথাকথিত নিম্নবর্ণীয় সমাজে বিবাহ, পুনর্বিবাহ কিংবা বৈধব্যা, বিবাহ বিচ্ছেদ — ইত্যাদি সম্পর্কে রীতিনীতি অনেকটা সহজ সরল ও উদার। লেখিকার চোখে বোধ হয় এই সমাজ অধিকতর মানবিক বলেই মনে হয়েছে। তাঁর এই মনোভাবনা থেকেই লালু ও তার সমাজের প্রতি লেখিকার সহানুভূতি বর্ণিত হয়েছে।

শৈলবালা ঘোষজায়া সমাজের অন্যায় শাসন ও শোষণ মেনে নিতে পাবেননি। তাঁর প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে তীব্রকণ্ঠে। জাতিধর্ম নির্বিশেষে নারী-পুরুষের সম্মিলিত প্রয়াসে গড়ে ওঠা এক সুস্থ ও স্বাভাবিক সমাজের স্বপ্ন দেখেছিলেন শৈলবালা। তাই তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসে ধনী-দরিদ্র, ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ, নারী-পুরুষ, জাতি ও ধর্মের বৈষম্যজনিত সমাজচিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। শৈলবালার দৃষ্টিকোণ ছিল বিশ্লেষণী ও সত্যনিষ্ঠ। সাধারণত বাঙালি মেয়েদের স্বাধীন চিন্তাকে কিছুটা পঙ্গু করে রাখে আজন্ম পোষিত সংস্কার ও সনাতনী শিক্ষা। খুব আশ্চর্যভাবে শৈলবালা ঘোষজায়া এই চাপকে সরিয়ে রাখতে পেরেছিলেন। তাই তাঁর উপন্যাসে নারী সম্পর্কে প্রথাসিদ্ধ যে আত্মত্যাগ ও গৃহনির্ভর জীবনের চিত্র এবং জাতি ও ধর্ম সম্পর্কে প্রথাসিদ্ধ রীতিনীতির স্বীকৃতি খুব একটা দেখা যায় না, বরং বিভিন্ন সামাজিক অসমতাব প্রতি ক্ষোভ, বিদ্রোহ, প্রতিবাদ তাঁব মানসিকতাকে চালিত করেছিল।

শৈলবালা ঘোষজায়ায় সমকালীন যুগ অপেক্ষা বর্তমান যুগে জাতপাত সমস্যা এবং সংসার সমাজে নারীর অবস্থান তুলনামূলক ভাবে অনেকটা উন্নত হলেও আমরা কিন্তু সম্পূর্ণ এই প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারিনি। শহরাঞ্চল এই প্রভাব থেকে অনেকটা সরে এলেও গ্রামাঞ্চলে জাত-পাত বৈষম্য প্রকট এবং নারীর সামাজিক মর্যাদা অনেকটাই উপেক্ষিত। তাই গঙ্গাপুত্র উপন্যাসটির প্রাসঙ্গিকতা আজও উল্লেখের দাবি রাখে। আর এখানেই শৈলবালা ঘোষজায়ায় সাহসিকতা ও প্রগতিশীলতা প্রশংসনীয়।

রচনাপঞ্জি :

- ১ এ. আর. দেশাই, ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সামাজিক পটভূমি
- ২ ক্ষেত্র গুপ্ত, বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস (তৃতীয় খণ্ড)
- ৩ ড. স্তানেশ মৈত্র, নারীজাগৃতি ও বাংলা সাহিত্য
- ৪ শৈলবালা ঘোষজায়া, গঙ্গাপুত্র
- ৫ শিবনারায়ণ রায়, শেখ আব্দু
- ৬ সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্য, ভারতীয় রাষ্ট্রদর্শন ও জাতীয় আন্দোলন
- ৭ সুমিত সবকার, আধুনিক ভারত

প্রসঙ্গ : অনুবাদ

কেতকী কুশারী ডাইসন

সাহিত্যের অনুবাদ সম্পর্কে কিছু বলতে বা লিখতে অনেকেই অনুরোধ করেন আমাকে। আবারও অনুরোধ এসেছে। বিষয়টা নিয়ে অনেক দিন ধরে ভাবনাচিন্তা করছি। এ বিষয়ে নানা আসরে সভায় সেমিনারে অন্যদের বক্তব্য শুনেছি এবং নিজের বক্তব্য পেশ করেছি। অনেক কিছু শিখেছি অন্যদের বই রিভিউ করতে গিয়ে। ইন্টারনেট পত্রিকা *পরবাস*-এ আমার বেশ কয়েকটি দীর্ঘ ইংরেজী লেখা প্রকাশিত হয়েছে, যেগুলি অন্যদের করা অনুবাদগ্রন্থের সমালোচনাসূত্রে। সে-সমস্ত লেখালেখি থেকে সাহিত্যের অনুবাদ সম্পর্কে আমি কী ভাবি তার একটা পরিচয় নিশ্চয় পাওয়া যায়।

এই প্রবন্ধ যাঁরা পড়ছেন তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ (আশা করি!) আমার রবীন্দ্রকবিতা-অনুবাদ এবং বুদ্ধদেবের কবিতার অনুবাদ এই দুই বইয়ের ভূমিকাংশের সঙ্গে পরিচিত আছেন। কিন্তু আমার নাটক *রাতের রোদ*-এর ইংরেজী অনুবাদের ভূমিকাংশের সঙ্গে খুব কম বাঙালী পাঠকই পরিচিত। তিন জায়গাতেই অনুবাদ সম্পর্কে আলোচনা আছে।

নব্বইয়ের দশকে আমাকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও অনুবাদবিষয়ক একটা প্রকাশ্য বিতর্কের মধ্যে জড়িয়ে পড়তে হয়। সেই সময়কার গোটা তিনেক প্রবন্ধ *আনন্দবাজার পত্রিকা* এবং *দেশ*-এ প্রকাশিত হওয়ার দরুন অনেকের দৃষ্টিগোচর হয়। তবুগরা আমাকে বলেছেন যে সেগুলি পড়ে তাঁরা উপকৃত হয়েছিলেন, অনুবাদসংক্রান্ত যে-ইশ্যুগুলি আগে তাঁদের কাছে অস্পষ্ট ছিলো সেগুলি নাকি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

সে যাই হোক, আমার ধারণা অনুবাদ বিষয়ে আমার চিন্তা প্রথম সুসংবদ্ধ আকার নেয় ষাটের দশকের শেষের দিকে। সেই সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া অ্যাংলো-স্যাক্সন (অর্থাৎ আদি-ইংরেজী) কবিতা-সম্ভারের ভিতর থেকে আমার পরিচিত এবং প্রিয় চারটি নমুনা বেছে নিয়ে বাংলায় অনুবাদ করি, এবং সেই অনুবাদগুলোর জন্য একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকাও লিখে ফেলি। সেই লেখাগুলি ১৯৭১ সালে *বিশ্বভারতী পত্রিকা*-র একটি সংখ্যায় ছাপা হয়। আরও অনেক পরে সেই ভূমিকা আর অ্যাংলো-স্যাক্সন কবিতা থেকে অনুবাদের এগারোটি টুকরো-সহ একটি ছোট বই নাভানা থেকে বেরোয়, কিন্তু বইটির ঠিক মতো বিতরণ না হওয়াতে অনুবাদ সম্পর্কে আমার প্রথম প্রকৃত আলোচনার সঙ্গে অধিকাংশ বাঙালী পাঠকই পরিচিত নন।

অ্যাংলো-স্যাক্সন কবিতা থেকে সেই প্রথম চারটে অনুবাদ যখন করি, সেই সময়টার খুঁটিনাটি মনে আছে। সেটা ১৯৬৭ সালের প্রথমার্ধ; তখন আমি আমার স্বামীর সঙ্গে ব্রাইটনে একটি ভাড়া-করা ঘরে সংসার করি। আমার স্বামী স্নাতকোত্তর ছাত্র, ডি. ফিলের থিসিস লেখা শেষ করছে, প্রায় মেরে এনেছে। শীঘ্রই আমাদের ক্যানাডায় যাবার কথা, তার

প্রস্তুতি চলছে। একটা চাকরি করতাম, ক্যানাডায় যেতে হবে বলে চাকরিটা ছেড়ে দিয়েছি। এও জানি যে আমার প্রথম সন্তান পেটে এসেছে। ঐ সময়েই— কাজে যেতে হচ্ছে না বলে খানিকটা অবকাশ হাতে পেয়ে, মা হতে চলেছি সেই চেতনার প্রচ্ছন্ন আনন্দে, এবং নিশ্চয়ই দুর্মর কবিত্বভাবে তাড়নায়— প্রাচীন ইংরেজী কবিতাকে আধুনিক বাংলায় একটা রূপ দেবার চেষ্টায় মেতে উঠেছিলাম। ঘরে ছিলো একটাই টেবিল, তার এক দিকে চলতো একজনের পদার্থবিদ্যার গবেষণার বিরামহীন আঁকিবুঁকি, অন্য দিকে যথাসময়ে ঘটতো রান্নাবান্নার উদ্যোগ। আর ঠাণ্ডা-ভিজ়ে ফাঁকা-ফাঁকা দুপুরবেলাগুলোতে আমি সংক্ষিপ্ত লাঞ্চ সেরে নিয়ে গ্যাসের আশুন পোহাতে পোহাতে সোফার উপরে উঠে বসতাম, হাঁটু মুড়ে আরামসে বসে কোলে খাতা নিয়ে পুনঃসৃষ্টির দিঘিতে ডুব দিতাম।

ব্যক্তিগত কথাগুলি বলার উদ্দেশ্য একটি তথ্যকে প্রতিষ্ঠা দেওয়া। সাহিত্যের অনুবাদের কাজ আমার অনুভবে এবং পরিপ্রেক্ষিতে গোড়া থেকেই সৃষ্টির আর পুনঃসৃষ্টির মঞ্জতা তথা চ্যালেঞ্জের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। সবার আগে মনের অনাবিল আনন্দে আর দুর্দম উত্তেজনায় কাজটা করা। তত্ত্বের আলোচনা আসে তার পরে, এবং কাজের খুঁটিনাটিরই সূত্র ধরে। যে-মানুষটি কর্মী, তার পক্ষে তাত্ত্বিক আলোচনা করার চাইতে কাজটা হাতে কলমে করে দেখিয়ে সহজতর এবং অধিক আরামদায়ক; *পরবাস*-এ প্রকাশিত আমার কয়েকটি গ্রন্থসমালোচনা তাই ওয়ার্কশপের শৈলীতে। তবে এ-ও ঠিক যে আমরা কেউই মায়ের পেট থেকে পড়েই কর্মীতে রূপান্তরিত হই না, মাতৃগর্ভে বাসকালে পাই না কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে কোনো গোপন দীক্ষা। কার্যতঃ সব কাজই আমরা কাউকে না কাউকে দেখে শিখি, বারবার সযত্নে মস্ত ক'রে ক্রমে ক্রমে আয়ত্ত করি। এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে কাজ শিখতে শিখতে এবং করতে করতে তৎসংলগ্ন কোনো-একটা তাত্ত্বিক মডেল অব্যক্তভাবে হলেও অনিবার্যভাবেই আমাদের অন্তঃস্থ হয়ে যায়, তাকে হস্তস্থ কর্মের প্রয়োজন অনুসারে সামান্য বদলে নিয়ে আমরা এগোতে থাকি। সেই ঈষৎ-পরিবর্তনশীল কাঠামো আমাদের মাধ্যম প্রচ্ছন্নভাবে সক্রিয় থেকে আমাদের যুগপৎ দৃঢ়তা এবং নমনীয়তা সরবরাহ করে।

ঘটনাচক্রান্তে অনুবাদ নামক প্রক্রিয়াটা আমাদের কারও কারও জীবনচর্যার একেবারে কেন্দ্রে এসে দাঁড়ায়। আমি সেরকম একজন। জীবনযাত্রা আমার কাছ থেকে অনবরত অনুবাদ-দক্ষতা দাবি করে। দক্ষতা অর্জন করতে না পারলে ব্যক্তিগত স্তরে টিকে থাকাও অসম্ভব। এবং সেই অনুবাদ কেবল ভাষাগত নয়। যা দুটি ভাষার মধ্যে অনুবাদ তা দুটি সংস্কৃতির মধ্যে অনুবাদও বটে। ডায়ালেক্টিক অবস্থানের দরুন আমার অনেক লেখাতে অনুবাদের একটা উপাদান আবশ্যিকভাবেই এসে পড়ে। অনুবাদকে স্বীকার করে না নিলে আমি নারী, নগরী বা নোটন নোটন পায়রাগুলি, রবীন্দ্রনাথ ও ভিক্টোরিয়া ওকাস্পোর সন্মানে বা জল ফুঁড়ে আগুন নির্মাণই করতে পারতাম না। ধরুন, যারা বাংলায় কথা বলছে না তাদের সংলাপ-বাংলায় পরিবেশন করতে হলে একটা ন্যূনতম অন্তর্লীন রূপান্তর প্রক্রিয়াকে মেনে তো নিতেই হয়। তার মানে এ নয় যে সংলাপরচনা অনুবাদের খাত ধরে এগোয়। না, তা নয়। কার্যতঃ সংলাপের প্রবাহ প্রাথমিক সৃষ্টির মতোই উৎসারিত হয়, তবে কী চলবে আর কী চলবে না সে সম্পর্কে রচনাকারের চেতনায় একটা সীমানাজ্ঞান সক্রিয়

থাকে। যখন কোনো ইংরেজীভাষী চরিত্র আঁকছি তখন তার মুখে ইংরেজী ইডিয়মের তর্জমা (যেমন ‘ম’রে যাওয়া’ অর্থে ‘বালতিতে লাগি মারা’) চলতে পারে, কিন্তু তার মুখে আমি কখনো ‘ধান ভানতে শিবের গীত’ বা ‘অনেক সম্মাসীতে গাজন নষ্ট’ বসাবো না। আবার কখনও কখনও আমি হয়তো ইচ্ছে ক’রেই অনুবাদের পথ ধ’রে এগোবো। *রবীন্দ্রনাথ ও ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর সন্ধ্যা*-তে যেগুলি খাঁটি দলিলের অনুবাদ, মূল টেক্সটগুলি কোনোভাবে বানিয়ে নেওয়া হয় নি। কিন্তু *নোটন নোটন পায়রাগুলি*-তে নোটন যখন ফতিমার ডায়েরি এবং টেপে ধরা কথাবার্তা অনুবাদ করে তখন সেই সব দলিলকে উপন্যাসের অনুষঙ্গেই নিতে হবে, আমি তাদের ঐতিহাসিকত্ব প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করছি না, সে বিষয়ে আমার কোনো দায় নেই। উপন্যাসের জন্য প্রয়োজনীয় রিসার্চ আমি আনুপুঙ্খিকভাবেই ক’রে নিয়েছি, কিন্তু সেটা আমার কাজের সাজঘরের ব্যাপার। মঞ্চে যা দিচ্ছি সেটাই পাঠকদের জন্য। কোনো পাঠক যদি ওখানে তুলে ধরা ছবির কোনো অংশ চ্যালেঞ্জ করতে চান, তা হলে তাও উপন্যাসের পরিপ্রেক্ষিতেই করতে হবে। অর্থাৎ, ফতিমা একটি ফিকশনাল চরিত্র, তাকে আমি যেভাবে আঁকছি সেভাবেই দেখতে হবে। তবে হ্যাঁ, কেউ যদি বলেন, ফতিমার দেওয়া আলজেরীয় পটভূমিকায় এই মুখ্য ঐতিহাসিক ক্রটি রয়েছে, সেগুলি এই উপন্যাসের মর্যাদা হরণ করে, তা হলে তাঁকে আলজেরীয় ইতিহাসে বিশেষজ্ঞ হতে হবে এবং তাঁর বক্তব্যের সপক্ষে খুঁটিনাটি সহ সাক্ষ্য দাখিল করতে হবে। ইয়োরোপীয়দের লেখা ভারতবিষয়ক উপন্যাসে বিস্তারিত তথ্যগত ক্রটি থাকে। আমার ধারণা আমার উপন্যাসে আলজেরিয়া-সংক্রান্ত সেরকম কোনো মারাত্মক ভুল নেই।

তাছাড়া ঐ কাহিনীতে যেসব চিঠি ইংরেজী ছাড়া অন্য কোনো ভাষায় লেখা হয়ে থাকতে পারে না সেগুলি আমাকে বাংলাতেই রচনা করতে হয়েছে, অনুবাদ করা হয়েছে এই কথাটি ব’লে নিয়ে। মঞ্চার রীতিনীতির সঙ্গে তুলনীয় এগুলি— নাট্যকাররা আর থিয়েটারের মানুষরা এ-জাতীয় কলাকৌশল নিশ্চয়ই বুঝবেন। অভিনয়ের সঙ্গে অনুবাদের একটা গভীর মিল রয়েছে— হাবে-ভাবে এবং আত্মায়, এ কথা অনেকবার মনে হয়েছে আমার। আপনি হ্যামলেট নন, কিন্তু হ্যামলেট সেজে একবার স্টেজে উঠলে আপনাকে আগাগোড়া ভান করতে হবে যে আপনিই হ্যামলেট, আপনারই মুখের উচ্চারণ আর দেহভাষার মাধ্যমে শেক্সপীয়র-কল্পিত ডেনমার্কের রাজকুমার দর্শকদের সামনে মূর্তিপরিগ্রহ করবে। তেমনি আমিও ‘কবিগুরু’ বা ‘বু. ব.’ বা অজ্ঞাতনামা অ্যাংলো-স্যাক্সন চারণ নই, কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাঁদের লাইন অনুবাদ করার সময়ে আমাকে তাঁদেরই ভূমিকায় সপ্রাণ অভিনয় করতে হবে, তাঁদেরই সঙ্গে একাত্ম হয়ে কথা বলতে হবে। একই সঙ্গে অভিনেতার এবং অনুবাদকের নিজস্ব ব্যক্তিত্ব, জীবনবোধ এবং কলানৈপুণ্যের জায়গাটাও অশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তারই জোরে একই ভূমিকায় অথবা একই টেক্সটের অনুবাদে ভিন্ন-ভিন্ন অভিনেতা বা অনুবাদকের কাজ ভিন্ন-ভিন্ন স্বাদের হয়ে থাকে। একজন কৃতী ব্যক্তি অভিনেতা বা ব্যক্তি অনুবাদক কোনো প্রাণহীন কলের পুতুল নন, কেবলই যান্ত্রিক নিয়ম মেনে কাজ করে যান না। তিনি প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন, এবং সেই কাজে সফল হতে হলে একদিকে যেমন আঙ্গিকের সূক্ষ্ম খুঁটিনাটি জানতে হয়। অন্যদিকে তেমনি সৃষ্টিশীলতার হাওয়াকেও বইতে দিতে হয়।

এখন থেকে বছরখানেক আগে কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির আমন্ত্রণে সাহিত্যিক অনুবাদে যেসব ইশ্যু বা সমস্যা ঘুরে-ফিরে আসে তাদের সম্পর্কে কিছু বক্তব্য রেখেছিলাম। তারপর চলতি বছরে (২০০৬) সাহিত্য অকাদেমির পূর্বাঞ্চল শাখা এবং মণিপুর কালচারাল ফোরামের যৌথ নিমন্ত্রণে ইম্ফলে অনুবাদ-সাহিত্য বিষয়ে একটি সেমিনারে উদ্বোধনী বক্তৃতা দিই। এই ইংরেজী ভাষণ দুটিতে আমার কিছু সাম্প্রতিক ভাবনা ধরিয়ে দেবার চেষ্টা করি। ঐ দুই জায়গায় যেসব কথা বলেছি তাদের সঙ্গে বর্তমান প্রবন্ধের কোনো কোনো বক্তব্যের ওভারল্যাপ থাকবে।

আমার নিজের ধারণা, সাহিত্যের অনুবাদ উৎসবের যোগ্য বিষয়। একবার ভাবুন, সাহিত্যের অনুবাদ না ঘটলে আমাদের সামগ্রিক অবস্থা কিরকম হতো। দেশে দেশে সাহিত্য এগোতোই না। প্রতিটি ভাষাগোষ্ঠী তার নিজস্ব একসাংস্কৃতিক দুনিয়ার মধ্যে বন্দী হয়ে যেতো। আমরা না জানতাম নিজেদের প্রাচীন ঐতিহ্যকে, না জানতাম অন্যদের প্রাচীন বা সমকালীন সাহিত্যিক উত্তরাধিকারকে। অনুবাদের সহায়তা ছাড়া আমরা আমাদের নিকট প্রতিবেশীদেরও বুঝতে সক্ষম হই না,— দূরস্থিত প্রতিবেশীদের কথা বাদই দিলাম। ‘দূরস্থিত প্রতিবেশী’র ধারণাটি আমার কাছে ব্যক্তিগতভাবে খুব অর্থবহ। আমার নিজের জীবনদর্শনে পৃথিবীর মানুষরা অসংখ্য ছোট-বড় গোষ্ঠীতে বিন্যস্ত একটিই ছেদহীন সমাজ। কোনো-কোনো গোষ্ঠী আমাদের কাছাকাছিই বাস করছে, তারা আমাদের নিকট প্রতিবেশী। কোনো-কোনো গোষ্ঠী আমাদের থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে, তাদের বলা যায় আমাদের দূরস্থিত প্রতিবেশী। আমাদের মধ্যে সাংস্কৃতিক সাদৃশ্য আছে, বৈসাদৃশ্যও আছে, কিন্তু এক গভীর— গভীরতম— অর্থে আমরা সকলেই পরস্পরের প্রতিবেশী। আজকের দিনে এটা কোনো রূপকথাও নয়, একেবারেই বাস্তব সত্য। কিন্তু এই দুনিয়ার মানবসমাজের ঋদ্ধ বৈচিত্র্য নিয়ে উৎসব করা দূরে থাক, অনুবাদের মদত ছাড়া তাকে আমরা ঠিক ক’রে বুঝতেও অপারগ। নানা ভাষা আর নানা সংস্কৃতির সমাহারে গঠিত ভারতীয় উপমহাদেশ এক অণুবিশ্ব, বৃহত্তর পৃথিবীর এক ক্ষুদ্রতর সংস্করণ। ভারতের— এবং সারা পৃথিবীর— সাহিত্যিক জীবনে অনুবাদ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে, এবং সেটা তার করা উচিত।

আবহমান কাল ধরে পৃথিবীর মানুষ পুরোনো গল্পকে নতুন ক’রে বলেছে, এক ভাষার গল্পকে আরেক ভাষায় চালান করেছে, এক দেশ থেকে অন্য দেশে পাঠিয়েছে। ঐভাবেই পঞ্চতন্ত্রের কাহিনীগুলি পশ্চিম দিকে যাত্রা ক’রে ঈশপের গল্পে রূপান্তরিত হয়েছে। অল্প বয়সে আমরা সকলেই এমন কিছু-কিছু গল্প পড়েছি বা শুনেছি, যেগুলি ঠিক আমাদের মাটির নয়, যেগুলি অন্য কোনো ভাষা থেকে সরাসরি— অথবা তৃতীয় কোনো ভাষার দরজা ছুঁয়ে— আমাদের দেহলীতে এসে পৌঁছেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেগুলি লাইন ধরে ধরে করা তর্জমা নয়, বরং ইংরেজীতে যাকে বলা হয় ‘অ্যাডাপ্টেশন’ সেই জিনিস। আমার পঞ্চম জন্মদিনে আমার মামীমা আমাকে ঐরকম একটি বই উপহার দিয়েছিলেন : *আংকল্ টম্‌স্ ক্যাবলিন*-এর একটি সংক্ষিপ্ত শিশুপাঠ্য বাংলা রূপ। আমি তখন অবিভক্ত বাংলার নদীয়া জেলার মেহেরপুরে থাকি— যা বর্তমানে বাংলাদেশে। উপহার হিসেবে পাওয়া বইটা প’ড়ে খানিকটা অস্পষ্টভাবে হলেও ঐ বয়সেই বুঝতে পেরেছিলাম যে গল্পটা কিন্তু আমাদের

দেশের পরিপার্শ্ব থেকে বেরোয় নি. আমার চার পাশের পরিচিত পরিবেশের সঙ্গে গল্পে বর্ণিত পরিবেশ ঠিক মেলে না।

সাত বছর বয়সে বাবা-মা-র দেওয়া কৃত্তিবাসী রামায়ণ আর কাশীদাসী মহাভারত পড়তে শুরু করলাম। সেই টেক্সটগুলি আমার কাছে তখন শুধুমাত্র বাংলা কাব্য— তাদের নিজস্ব জোরেই বাংলা মহাকাব্য। চরিত্রদের নামধাম চেনা-চেনা, অনেক খুঁটিনাটিও বেশ পরিচিত লাগছে। আবার অন্য কতগুলি ডিটেল রীতিমতো আজগুবি ঠেকছে। তখনই জানি যে বাস্তব জগৎ গুরুত্ব নয়। সেই ডিটেলগুলিকে আমি আমার পড়া রূপকথার সঙ্গে মিলিয়ে নিতে লাগলাম। ততদিনে ঠাকুরমার ঝুলি আর বাংলা চেহারায় হাস্য অ্যাণ্ডারসেনের সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেছে, তাই আজব ডিটেল জড়ো করবার জন্য মনের মধ্যে একটা স্বতন্ত্র কুঠুরীও তৈরি হয়ে গেছে।

আরও পরে রামায়ণ-মহাভারতের রাজশেখর বসুকৃত গদ্য সারানুবাদ আবিষ্কার করলাম। ততদিনে স্কুলে সংস্কৃতের পাঠ নেওয়া পুরোদমেই শুরু হয়ে গেছে। এই এতদিনে ঠিক ক'রে বুঝতে পারলাম যে বাংলা কাব্যগুলি একটি প্রাচীন ভাষার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, প্রাচীন কাব্যের 'অ্যাডাপ্টেশন'। বাংলা *অ্যাংক্ল টম্‌স্ ক্যাবিন* থেকে শুরু ক'রে কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কাশীদাসী মহাভারত, রাজশেখর বসুর গদ্য রামায়ণ-মহাভারত, অ্যাণ্ডারসেনের রূপকথার বাংলা সংস্করণ— সবই কিন্তু সম্প্রসারিত অর্থে অনুবাদ-সাহিত্য, 'অ্যাডাপ্টেশন' যার অন্তর্গত। এইসব পাঠের সাহায্য ছাড়া নিজেকে কিভাবে শিক্ষিত করতাম?

জীবনভর অনেক গুরুত্বপূর্ণ টেক্সটই আমাদের হয় অ্যাডাপ্টেশনে নয় বিশ্বস্ততার অনুবাদে প'ড়ে নিতে হয়, তাছাড়া আর কোনো পছন্দ নেই। তাদের মধ্যে আছে প্রাচীন ধর্মীয় গ্রন্থ, যেমন বাইবেল বা কোরান বা গীতা। আছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ঋপদী সাহিত্যের নিদর্শনগুলি। অনুবাদে পড়তে না পেলে এগুলি হতো আমাদের সম্মুখে রুদ্ধদ্বার তলাবন্ধ ঘর। অনুবাদই সেই চাবি যার সাহায্যে আমরা ঘরগুলো খুলে একটু দেখে-বুঝে নিই। তলস্তয় বা দস্তয়েভস্কি, চেখভ বা ইবসেন আমরা ক'জন মূলে পড়তে পারি? সাধারণতঃ ভারতে আমরা এ ধরনের বই ইংরেজী তর্জমাতেই প'ড়ে থাকি, তবে অন্য দেশের মানুষরা এই লেখকদের ফরাসীতে বা জার্মানে, চীনাতে বা জাপানীতেও পড়তে পাবেন। এইসব অনুবাদের মান একরকম হবে না। কোনোটা হবে বিদম্ব, কোনোটা চলনসই। তবু সেই সব উৎস থেকে অন্যান্য দেশের সাহিত্য সম্বন্ধে কিছু খবরাখবর তো আমরা সংগ্রহ ক'রেই থাকি। তা না করতে পারলে কোথায় দাঁড়াইতাম আমরা? সাধারণ জ্ঞান হিসাবেও তো ঐ খবরগুলো আমাদের কাছে দরকারী। নয়তো আমাদের মানসিক দৈন্য ঘোচে না। আবার, অনুবাদের মান উঁচু না হলে আমাদের ধারণাগুলো ভ্রান্ত হতেই পারে। রবীন্দ্রনাথের বাংলা টেক্সটের নিম্নমানের তর্জমা অনেক অবাঙালী পাঠককে ওভাবেই বিভ্রান্ত করেছে।

অল্প বয়সে আমাকে আমার পিতৃদেবের কাছে ফরাসীতে তালিম নিতে হয়েছিলো। তিনি আমাকে ফরাসী গদ্যানুবাদে হোমারের *ইলিয়াড* এবং *অডিসি* পড়িয়েছিলেন! উদ্দেশ্য এক টিলে দুটো পাখি মারা— কিছু ফরাসীও আমার শেখা হবে, একই সঙ্গে ঐ দুই বিখ্যাত মহাকাব্যের সঙ্গে কিছুটা পরিচয়ও ঘটবে। অনূদিত সাহিত্য পড়লে আমাদের মানসিক দিগন্ত সত্যিই বিস্তার লাভ করে। আমরা নতুন উদ্দীপনা পাই, নিজেরা সাহিত্যিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা

করবার তাগিদ অনুভব করি। আমাদের সাধারণ জ্ঞানের জন্য তো বটেই, অপিচ আর্টসের আর মানবিক বিদ্যার শিক্ষাদীক্ষায় অনুবাদপাঠের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। দেশবিদেশের ইতিহাস একটু ঘাঁটলেই আমরা দেখবো যে দেশে দেশে যুগে যুগে অনুদিত সাহিত্য মানুষকে নতুন বৌদ্ধিক এবং সৃষ্টিমূলক কাজের দিকে এগিয়ে দিয়েছে, পর্ব থেকে পর্বান্তরে ঠেলে দিয়েছে। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাষায় ধাপে ধাপে বাইবেলের অনুবাদের মধ্য দিয়ে খৃষ্টধর্মের বিবর্তন ও বিকাশ ঘটেছে। ইয়োরোপীয় মাতৃভাষাগুলিতে বাইবেলের অনুবাদ হওয়া উচিত কি অনুচিত, সেটা ছিলো একদা একটা বিরাট ইস্যু। ইংরেজীতে অনুবাদ হয়েছে; তা থেকে মিশনারিদের আওতায় বাংলায় রূপান্তর হয়েছে, তাই আপনি বা আমি চট করে পাতা খুলে দেখে নিতে পারছি বিখ্যাত বইখানার ভিতরে সত্যি কী আছে। নয়তো ওল্ড টেস্টামেন্টের জন্য হিব্রু আর নিউ টেস্টামেন্টের জন্য গ্রীক জ্ঞানার দরকার হতো। ওদিকে যীশু নিজেকে গ্রীক ভাষায় কথা বলতেন না, বলতেন আরামাইক ভাষার গ্যালিলীয় রূপে। সেও সেমিটিক গোষ্ঠীরই ভাষা, কিন্তু শাস্ত্রীয় হিব্রুর থেকে কিছু আলাদা। তাঁর বাণীগুলি আরামাইক থেকে গ্রীকে তর্জমা হয়েই সুসমাচারগ্রন্থগুলিতে পৌঁছেছে।

গ্রীক সাহিত্য ইয়োরোপে যখন প্রায় হারিয়ে গিয়েছিলো তখন আরবরা আরবী অনুবাদের মাধ্যমে সে সম্পর্কে জ্ঞানের একটা প্রবাহ সচল রেখেছিলেন। আমরা জানি, গ্রীক টেক্সটগুলির পুনরাবিষ্কার ইয়োরোপীয় রেনেসাঁসকে ধাক্কা দিয়ে এগিয়ে দেয়। ঐভাবে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ভাষাবিদ ইয়োরোপীয় পণ্ডিত-অনুবাদকরা প্রাচীন ভারতীয় টেক্সটগুলি আবিষ্কার করে আরও একটি বৌদ্ধিক নবজাগরণের উন্মেষ ঘটান, যা ইয়োরোপের চিন্তাকে নানাভাবে তীক্ষ্ণ আর আধুনিক করে তোলে। সে ঘটনাও ইয়োরোপের পক্ষে আরেক রেনেসাঁস, যদিও ঘটনাচক্রে তার যথার্থ পরিচয় বর্তমানে অনেকটা চাপা পড়ে গেছে। তার আগে প্রাচ্য জগৎ সম্বন্ধে ইয়োরোপীয় পণ্ডিতদের ধারণা ছিলো মোটের উপর হিব্রু আর আরবী এই দুই সেমিটিক ভাষাকে আশ্রয় করে। ইয়োরোপীয় পণ্ডিতরা যখন সংস্কৃত-পালি শিখে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য অনুবাদ করতে আরম্ভ করলেন তখন প্রাচ্য দুনিয়া সম্পর্কে ইয়োরোপীয় বিদ্বৎসমাজের ধারণা আরও অনেক বিস্তৃতি এবং গভীরতা লাভ করলো। তাঁদের বিশ্ববীক্ষাই বদলে গেলো।

দুঃখের বিষয়, বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে বিদ্যাজগতের দলাদলি প্রাচ্যজ্ঞানী পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের কাজের মূল্যায়নমন করে। ‘ওরিয়েন্টালিজম্’ শব্দটির অর্থাবনতি ঘটে, ‘ওরিয়েন্টালিস্ট’ পণ্ডিতদের নাম অন্যায়ভাবে মসীলিপ্ত হয়। এই অসম্মান তাঁদের প্রাপ্য ছিলো না, দক্ষিণ এশিয়ার বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে তো নয়ই, আরবী বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রেও নয়।

আশার কথা, সম্প্রতি আবার কিছু বুদ্ধির মুক্তি ঘটছে। এখন কেউ কেউ প্রকাশ্যে স্বীকার করছেন যে ‘ওরিয়েন্টালিজম্’ শব্দটির অর্থাবনমন পাশ্চাত্য দেশের প্রাচ্যবিদ্যাচর্চার ক্ষতি করেছে, এবং তার জন্য এডওয়ার্ড সাঈদ আর তাঁর শিষ্যবৃন্দ কিছু পরিমাণে দায়ী। আমার নিজের অবস্থান থেকে এ কথা আমি নানা জায়গায় বলেছি, কিন্তু আমি বিদ্যায়তনিক জগতের ভিতরের লোক নই,— সেই জগতের সঙ্গে আমার লেনদেন আছে, কিন্তু আমার গবেষণাগুলো আমি করি কার্যতঃ একজন ফ্রীল্যান্সার-গবেষকের অবস্থানভূমি থেকে,— আমার কথা কেউ কেন শুনবে? এটা স্বস্তির বিষয় যে কথাটা এখন পাশ্চাত্য অ্যাকাডেমিক

জগতের ভিতরমহল থেকেই বলা হচ্ছে। এটা নাকি ঘটনা যে পাশ্চাত্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ইয়োরোপীয় পণ্ডিতদের তত্ত্বাবধানে আরবী ভাষার এবং তৎসংলগ্ন বিন্যাস চর্চা শুকিয়ে গেছে।^১ তরুণ বিদ্যার্থী এবং উঠতি গবেষকরা এই চর্চাকে এড়িয়ে গেছেন, পাছে তাঁদের গায়ে কেউ অবাপ্তিত লেবেল সেঁটে দেয়। পাশ্চাত্য ছেলেমেয়েদের পক্ষে আরবী শেখা তো কোনো মুখের কথা নয়। তার উপর যদি সে এলাকায় স্কলার হলে ‘উপনিবেশবাদী’, ‘সাম্রাজ্যবাদী’ ইত্যাদি খেতাব অর্জন করতে হয়, তা হলে তারা ও পথ মাড়াবে কেন? তাই ভাষাজ্ঞান ক’মে গেছে, উপযুক্ত অনুবাদকের সংখ্যাও ক’মে গেছে। ফলে এই ভাষার বিভিন্ন রূপ এবং সেগুলিতে রচিত সাহিত্যকে আশ্রয় ক’রে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে বিচিত্রায়িত যে-সংস্কৃতির বিকাশ, তাকে বুঝবার মতো মানসতার মানুষ পাশ্চাত্য পণ্ডিতমহলে লক্ষণীয়ভাবে হ্রাস পেয়েছে। সেই জ্ঞানের অভাবের বিষফল আমরা প্রত্যক্ষ করছি এখনকার রাজনীতিতে।

এও সত্য যে দক্ষিণ-এশিয়া-সংক্রান্ত বিদ্যাচর্চায় সাঙ্গদের প্রভাব শুভংকর হয় নি। কোনো পাশ্চাত্য মানুষ ওরিয়েন্টাল স্কলার হবার চেষ্টা করলে তাঁকে যদি সাম্রাজ্যবাদী-শিরোপা পেতে হয়, তা হলে পশ্চিমের তরুণ স্কলাররা কষ্ট ক’রে সংস্কৃত-বাংলা-হিন্দী-মারাঠী-তামিল ইত্যাদি শিখতে যাবেন কেন? তাঁদের পক্ষে আমাদের ভাষাগুলো শেখা, তার জন্য নতুন লিপি আয়ত্ত করা, ভৌগোলিক দূরত্বে স্থিত একটা স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক বিশ্বে প্রবেশ ক’রে তার মর্মোদ্ধার করা— কোনো সহজ কাজ নয়। অনেক পরিশ্রম ক’রে, অনেক দাগা বুলিয়ে, অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে, অনেক দাম দিয়ে তবেই তাঁরা বিদ্যাচর্চার এই ক্ষেত্রে তাঁদের ভিত পাকাপোক্ত করতে পারেন। সেই ক্রিয়াকলাপে বিদ্যায়তনিক পবিমগুলের কাছ থেকে যদি উৎসাহ, স্বীকৃতি, বা মদত না পাওয়া যায়, কেবলই পেতে হয় তাঁদের লক্ষ্য সম্পর্কে সন্দেহ, শুনতে হয় পরিভাষাকটকিত আধুনিক সমালোচনার টীকাভাষ্যের কচকচানি, তা হলে তাঁরা এগোবেন কী ক’রে, অনুপ্রাণিত হবেন কেন? ভারত সম্পর্কে কৌতূহল বা আগ্রহ থাকলে তার চাইতে বরং সহজতর সম্পূর্ণ অন্য লাইনে কাজ করা— অর্থনীতির পরিসংখ্যান আর ইংরেজী খবরের কাগজের প্রতিবেদন সংগ্রহ ক’রে ‘ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ’-এর দিকে চ’লে যাওয়া, তৃতীয় বিশ্বের ‘উন্নয়ন’-এর চেষ্টা করা, সাম্রাজ্যোত্তর যুগে আবারও তথাকথিত ‘সাদা মানুষের বোঝা’কে স্বীকার ক’রে নেওয়া।

সঙ্গদের প্রভাবই এই ঘটনার একমাত্র কারণ নয়, অন্যান্য নিয়ামকও আছে। প্রথমতঃ আছে অর্থনীতির নিয়ামন। আগেকার আমলে প্রাচ্যবিদ্যার বিলেতী পণ্ডিতরা সাম্রাজ্যের কোণকানাচে প্রশাসনিক অথবা অধ্যাপকীয় কাজে অর্থোপার্জন করতে পারতেন। এখন আর

১. এ বিষয়ে অতি সম্প্রতি একটি বই প্রকাশিত হয়েছে : Robert Irwin, *For Lust of Knowing: The Orientalists and their Enemies*, Allen Lane: বইটি আমি এখনও নিজেব চোখে দেখি নি, কিন্তু লেখক তাঁর বইয়ের চূড়ক হিসেবে লন্ডনের একটি পত্রিকায় যে প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন সেটি পড়েছি : Robert Irwin, ‘Fall of Orientalism’, *Prospect*, February, 2006। লেখক বিলেতের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে মধ্যপ্রাচ্যবিদ্যায় বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক।

সে-চাকরির বাজার নেই। আবার এও ঠিক যে চাকরিবাকরির সেই সুযোগ মার্কিন অথবা জার্মান পণ্ডিতদের ছিলো না; তাঁরা তো তবুও যথেষ্ট নিষ্ঠা নিয়েই প্রাচ্যবিদ্যার চর্চা করতেন।

এখন কিন্তু যা কিছু কঠিন এবং শ্রমসাধ্য, কালের বোতাম টিপলেই হয় না, যার জন্য খাটিতে হয়, মাথা খাটিতে হয়, অথচ বিপুল অর্থাগম হয় না, তেমন চর্চার প্রতি অনীহা নানা ঘটনাস্রোতের যোগসাজশে আমাদের যুগের ধর্ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। পাশ্চাত্য বিদ্বজ্জনদের পক্ষে প্রাচ্যভাষাশিক্ষা অবশ্যই একটি দুরূহ চর্চার পর্যায়ে পড়ে। দুরূহ চর্চাতে, এমন কি যে দুরূহ চর্চা থেকে প্রচুর ধনাগম হয় না তেমন চর্চাতেও মানুষ আত্মনিবেদন ক'রে থাকে— যদি পরিবেশ কিছুটা অনুকূল হয়। অধ্যাপক সান্সিদের প্রচারিত তত্ত্বের ব্যাপক প্রভাবের ফলে পাশ্চাত্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সেই অনুকূল বাতাবরণ হারায়। প্রাচ্যবিদ্যার মূল্যাবনমন-সহ এমন এক বৌদ্ধিক পরিমণ্ডল গ'ড়ে ওঠে, যার আওতায় পাশ্চাত্য বিদ্যায়তনিক পরিবেশ গত বিশ-পঁচিশ বছরে যথেষ্টসংখ্যক প্রাচ্যভাষাশিষ্যদ, সাহিত্যপ্রেমিক পণ্ডিত গঠন করতে পারে নি। গত দুই-আড়াই দশকে পাশ্চাত্য জগৎ থেকে এমন আরও বিদ্বজ্জন বেরোতে পারতেন, যাঁরা মানবিক-বিদ্যার পণ্ডিত, ভারতীয় ভাষাবিদ, মূল টেক্সট থেকে অনুবাদ করতে সক্ষম। যাঁরা বেরিয়েছেন তাঁদের আঙুলে গোনা যায়। আমার বিশ্বাস, আমরা এমন কাউকে কাউকে হারিয়েছি, যাঁরা অনুকূলতর পরিবেশে আমাদের সাহিত্যগুলির সুযোগ্য অনুবাদক হয়ে উঠে বিশ্বে তাদের পরিচিত করতে পারতেন। এখানে অধ্যাপক সান্সিদ-প্রবর্তিত তত্ত্বের একটি নঞর্থক অবদান আছে ব'লেই মনে হয়।



বলতে চাইছি যে সাহিত্যের অনুবাদক হয়ে উঠতে হলে আমাদের পরিশ্রম ক'রে বিভিন্ন ভাষা শিখে নিতে হয়। আর এই ভাষাশিক্ষা দানের এবং গ্রহণের প্রক্রিয়াটার মধ্যেও অনুবাদের একটা বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে। আমাদের আমলে আমরা যখন স্কুলে অথবা কলেজে একটা নতুন ভাষায় পাঠ নিতাম তখন আমাদের লম্বা লম্বা গদ্যাংশ অনুবাদ ক'রে শিক্ষক-পরীক্ষকদের বুঝিয়ে দিতে হতো যে হ্যাঁ, আমরা মূলের সব খুঁটিনাটি বুঝেছি : বিশেষ শব্দের বিশেষ অর্থ বুঝেছি, বাক্যগঠনের কৌশল বুঝেছি। মনে আছে যে সংস্কৃত শেখার সময়ে এবং পরে অক্সফোর্ডে আদি-ইংরেজী (অ্যাংলো-স্যাক্সন) আর মধ্য-ইংরেজীর সিলেবাসের জন্যে এটা আমাকে করতে হয়েছে। কলকাতায় আমি যে স্কুলে পড়েছিলাম তা তখনকার ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত বাংলামাধ্যমিক, তারপর সপ্তম থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ইংরেজী মাধ্যমিক ছিলো। 'স্কুল ফাইনাল'-এর ইংরেজী পরীক্ষায় অনুবাদের কী ভূমিকা ছিলো তা আমার সচেতনভাবে মনে নেই— আমার সমসাময়িক অন্যান্যদের হয়তো মনে আছে— কিন্তু একটা জিনিস আমার মনে আছে, ফাইনালের প্রস্তুতিপর্বে গরমে ঘামতে ঘামতে তথাকথিত 'টেস্ট পেপার্স' থেকে রাশি রাশি বাঘা বাঘা গদ্যাংশ বাংলা থেকে ইংরেজীতে চালান করতে হতো। সেটা কি বাড়ির চাপে, না স্কুলের চাপে, পরীক্ষাসংক্রান্ত, না শুধুই ইংরেজীর উন্নতিকল্পে, তা এখন আর বলতে পারছি না, তবে বলতে চাইছি যে ইংরেজীটাও কিন্তু অনুবাদ না ক'রে শিখি নি। হাল আমলে যে শিক্ষার্থীরা মাতৃভাষাকে প্রায় বাদ দিয়ে কেবল ইংরেজীর মধ্যে আকণ্ঠ নিমজ্জিত থেকে ইংরেজী শিখছে, তারা ইংরেজীটা হয়তো ভালোই আয়ত্ত করছে, সে ভাষায়

সম্প্রতিভাবে কথা বলতে বা তত্ত্ব ক'রে লিখতে তাদের কোনো অসুবিধা হবে না, কিন্তু একভাষিতার সীমাবদ্ধতার দরুন সাহিত্যিক অনুবাদক হিসেবে তারা কতটা দাঁড়াতে পারবে সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। আমার বিশ্বাস, ভালো অনুবাদক হতে হলে একাধিক ভাষার হাবভাব সম্বন্ধে একটা চেতনা; একটা ধারণা থাকা চাই। সাহিত্যিক অনুবাদকদের প্রশিক্ষণে অনুবাদ করা একটা আবশ্যিক প্রক্রিয়া। যারা মাতৃভাষার বাইরে অন্য কোনো ভাষা শিখছে, তা সে ভাষা প্রাচীনই হোক, অথবা সমকালীন, তাদের জন্য অনুবাদ একটি প্রয়োজনীয় পায়ে চলার পথ।

ঠিক এই জায়গাটাতেই একটা সমস্যার বীজও ঢুকে পড়ে লুকিয়ে থাকে। ভাষাশিক্ষার পথেই কেউ কেউ হয়ে যান এক বিশেষ ধরনের যোদ্ধা। বলা চলে যে তাঁরা সাহিত্যিক অনুবাদের 'মৌলবাদী' ক্যাডারে রেজুটেড হয়ে যান। তাঁরা বিশ্বাস করত আরম্ভ করেন— নিজেদের বোঝান এবং অন্যদেরও বোঝাতে চেষ্টা করেন— যে মূল ভাষার প্রতিটি শব্দ বা শব্দবন্ধের জন্য সমতুল্য একটি শব্দ বা শব্দবন্ধ টার্গেট ভাষায় পাওয়া যাবে। তাঁরা ভাবতে ভালোবাসেন যে মূল টেক্সটটির একটি ১০০% বিশ্বস্ত তর্জমা— কবিতার ক্ষেত্রে তার ছন্দমিলসুন্দর— অনুবাদের ভাষাটিতে করা সম্ভব। কিন্তু সেটা একটা অলীক ধারণা, একটা অধ্যাস, কেননা প্রত্যেকটি ভাষাই হচ্ছে একটি বিশ্ববীক্ষা, একটি পরিপ্রেক্ষিত, পৃথিবীকে দেখবার একটি উপায়, দৃষ্ট বস্তুসমূহের বিশ্লেষণ ও বর্ণীকরণের জন্য একটি হাতিয়ার। এক-একটা ভাষা যেন বিশ্বভূবনকে দেখবার জন্য এক-একটা জানালা; কোনো দুটো জানালা থেকে ছব্ব্ব একই দৃশ্য দেখা যায় না, সামান্য হলেও পরিপ্রেক্ষিতের হেরফের থাকেই।

কোনো এক কারণে, বোধ হয় ভারতীয় শিক্ষাদানের কোনো মৌল আঙ্গিকের কারণেই, হয়তো এইজন্যে যে ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় বুঝে নেওয়ার বস্তুকে বারবার আবৃত্তি ক'রে স্মৃতিস্থ করার দিকে একটা স্পষ্ট ঝোঁক আছে, অনুবাদ যে শতকরা একশো ভাগ বিশ্বস্ত হতে পারে, প্রায় মূলের প্রতিলিপির মতো— এই অধ্যাস ভারতীয় পরিবেশে প্রশ্রয় পায় এবং কখনও কখনও উৎপাতে পরিণত হয়। ব্রাহ্মণবালকরা যেভাবে বারবার আবৃত্তি ক'রে, মুখস্থ ক'রে বেদ বা মহাকাব্যের মৌখিক পরম্পরা চালু রেখেছিলেন, হয়তো সেরকম কোনো জাদু-উপায়ে অনুবাদও কঁটায় কঁটায় ঠিক, মূলের ছব্ব্ব নকল হতে পারে— এমনই কি ভাবেন তাঁরা? খোঁজ নিলে দেখতেন তথাকথিত পরম্পরার মধ্যে প্রায়শঃ ছেদ থাকে— কি সাহিত্যে, কি গানে। পাঠ বদলে যায়, সুর বদলে যায়।

আবার এই দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীতে মাতৃভাষার প্রতি গভীর অনুরাগের আতিশয্যে কেউ কেউ বিশ্বাস করতে আরম্ভ করেন যে তাঁদের ভাষার সৌন্দর্য অথবা সেই ভাষায় তাঁদের প্রিয় লেখকের গুণাবলী অন্য কোনো ভাষায় কিছুতেই সঞ্চারিত করা সম্ভব নয়। ভালো অনুবাদ আদৌ সম্ভব নয়— এটাই হয়ে দাঁড়ায় তাঁদের প্রাথমিক প্রতিজ্ঞা। সংশয়ের সুরে তাঁরা শুধান, 'রবীন্দ্রনাথের কবিতার অনুবাদ কি সত্যিই সম্ভব?'

হয়তো এই দুটো দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে একটা অন্তর্লীন যোগসূত্রও আছে। অনুবাদ মূলের ছব্ব্ব নকল হবে এটাই যদি আদর্শ অথবা লক্ষ্য হয়, আর কার্যতঃ যদি দেখা যায় যে সে-আদর্শ বা লক্ষ্যে কিছুতেই পৌছনো যাচ্ছে না, তা হলে রাগটা এসে পড়তে পারে অনুবাদ নামক পুরো প্রক্রিয়াটির ওপরেই। তখন অনুবাদ ব্যাপারটাকেই অবৈধ এবং অভিশপ্ত মনে হতে

পারে। ইংরেজীতে একটা ইডিয়ম আছে— 'to flush out the baby with the bath-water'। অর্থাৎ বাচ্চাকে বাথটবে স্নান করিয়ে প্লাগ টেনে ময়লা জলটা নিষ্কাশিত ক'রে দিলাম, তারই সঙ্গে বাচ্চাটাকেও নিষ্কাশিত ক'রে দিলাম। কোনো বড় কবির কবিতা ভাষান্তরিত করতে গিয়ে নাকানিচোবানি খাচ্ছি, অতএব ঘোষণা ক'রে দিলাম যে তাঁর সব কবিতাই অনুবাদের অতীত, অনুবাদ ব্যাপারটা তাঁর বেলায় আদৌ খাটে না।

খেয়াল করুন যে অন্য ভাষার একটা সাধারণ ইডিয়ম বুঝতেও কিছুটা সাংস্কৃতিক সেতুবন্ধনের জ্ঞান লাগতে পারে। আপনি যদি জীবনে কখনোই বাথটবের বা বেসিনের হিঙ্গপথে প্লাগ লাগিয়ে সেখানে জল ধ'রে কাচাকাচি ধোয়াধুয়ি বা স্নান ক'রে নিয়ে তারপর আবার প্লাগ টেনে জল বের না ক'রে দিয়ে থাকেন, তা হলে প্রবচনটির মর্ম আপনি হয়তো একমুহূর্তেই বুঝবেন না, কিন্তু বুঝিয়ে দিলে না বুঝবার তো কোনো কারণ নেই। আর যেই একবার বুঝে নিলেন অমনি ওটা আপনার নিজের চিন্তার গেরস্থালিরও অঙ্গ হয়ে গেলো। অন্য ভাষার সাহিত্য পাঠে ছোট ছোট সাংস্কৃতিক ভিন্নতাগুলোর স্বাদ পাওয়া একটা বড় লাভ। জলের গভীরে আমরা এক, ছোট ছোট পার্থক্যগুলির সুবাদেই আমরা আলাদা। অনুবাদে সেই ভিন্নতার স্বাদ সঞ্চারিত করতে হয় বৈকি, তবে তা সব সময় শব্দের বদলে শব্দ বসিয়ে সোজা পথে সম্ভব হয় না, অবস্থাবিশেষে ঘোরা পথ দিয়ে আসতে হয়।

এই সমস্যাগুলি সম্বন্ধে আমি অনেক দিন ধ'রেই অবহিত। তার কারণ সাহিত্যের অনুবাদক হিসেবে আমি তৈরি হয়েছি দুটো পথে। প্রথমতঃ স্কুলকলেজের জীবনে অনুবাদে যাতে ভুল না থাকে সে বিষয়ে ট্রেনিং পেয়েছি। দ্বিতীয়তঃ পঞ্চাশের আর ষাটের দশকে যেসব বাঙালি কবি-অনুবাদকরা আমাদের আলোড়িত করছিলেন— বুদ্ধদেব বসু, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে, লোকনাথ ভট্টাচার্য— তাঁদের কর্মকাণ্ডের দ্বারা প্রভাবিত এবং অনুপ্রাণিত হয়েছি। অল্প বয়সেই বুঝে গেছিলাম যে পরীক্ষকদের সন্তুষ্ট করার জন্য যে অনুবাদ তা এক জিনিস, আর অন্য একটা ভাষার (অর্থাৎ ঈষৎ ভিন্ন একটা সংস্কৃতির) সাহিত্য পাঠ ক'রে আমরা যে রস পাই তাকে অনুবাদের মাধ্যমে টেনে আনতে হলে যে ধরণের অনুবাদ দরকার তা আরেক জিনিস। ব্যক্তিগতভাবে আমার দৃষ্টি যেহেতু নিবদ্ধ ছিলো কবিতার অনুবাদের উপর, ব্যাপারটা তাই আরও দ্রুতই উপলব্ধি করেছিলাম। বুঝে গেছিলাম যে সাহিত্যবস্তুর অনুবাদ কেবল শিক্ষাদান আর শিক্ষাগ্রহণের কর্মসূচীর অন্তর্গত নয়। সেটা একটা সৃষ্টির, পুনঃসৃষ্টির প্রক্রিয়াও হতে পারে।



এখানে আরেকটা ব্যাপার ছুঁয়ে যাওয়া যাক। মৌখিক হোক, অথবা লিখিত হোক, ভাষান্তরিত সব ভাববিনিময়ই একটা মৌল অস্থিরতা দ্বারা আক্রান্ত। সেটা পাথরের মতো শক্ত কোনো জিনিস নয়। বরং সততসঞ্চারমাণ জলধরপটলের মতো বদলে বদলে যায়। আমাদের চিন্তা অথবা অনুভব ব্যক্ত করার জন্য আমরা ভাষা ব্যবহার করি, চেষ্টা করি এই ইশ্যু বা সেই ইশ্যুকে স্পষ্ট বা স্বচ্ছ করতে। কিন্তু অন্যদিকে আমাদের আসল ভাবনাকে অন্তরালে রাখার জন্যও তো কত কায়দা ক'রে কুটনীতিজ্ঞের মতো ভাষাকে ব্যবহার করি আমরা। ভাষা যেমন বস্তুবকে প্রাঞ্জল করতে পারে, তেমনি মুখোশের মতো তাকে আড়ালও করতে পারে। আমাদের ভাষাব্যবহারের মধ্যে থাকে অনেক রকমের ফাঁকফোকর আর কারসাজি, ইচ্ছাকৃতভাবে

বা অনিচ্ছাকৃতভাবে কোনো প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে যাওয়া, একটা বক্তব্যের আড়ালে আরেকটাকে লুকিয়ে রাখা, অপরিবর্তিতভাবে এক বিন্দু থেকে সটান অন্য বিন্দুতে চলে যাওয়া, ইত্যাদি বোঝাপ্রদান বা ভঙ্গিমা বদলে ফেলা। সাহিত্যের ভাষা এই সব ফাঁক, অর্থদ্বিধা আর চঞ্চলতাকে পূর্ণভাবে ব্যবহার করে; যা মোটের উপর বিদিত তথ্য তার সঙ্গে মেশায় উপমা-রূপকের অলংকার, চিত্রকল্পের চমক, বাগ্মিতার ভঙ্গি; ঝুঁচকে বা দুমড়ে দেয় বাক্যের বিন্যাস; বিশেষতঃ কবিতার কারুশিল্প অর্থকে ধ্বনির নকশার ভিতর দিয়ে বারবার নর্তিত করে। প্রাথমিক রচনার সময়েই এত কৌশল অবলম্বন করি আমরা। যখন একটা টেক্সটকে একটা ভাষা থেকে আরেকটা ভাষায় স্থানান্তরিত করতে হয়, তখন প্রক্রিয়ার জটিলতা আরও বাড়ে।

আসলে সাধারণ চিন্তাবিনিময়ও ঠিক ততটা সহজ নয়, যতটা আমরা মনে করি। কেননা আমরা প্রত্যেকেই নিজস্ব অবস্থান থেকে কথা বলতে ভালোবাসি, এবং যে যার অবস্থানের জায়গাটায় চেপে বসি, খুঁটি গেড়ে বসি। আমরা 'যে যার চেয়ারে বসে কথা বলে যাই। হয়তো প্রয়োজনবোধে একটু নড়াচড়া করি, একটু সামনের দিকে ঝুঁকি বা পিছনে হেলান দিই, কিন্তু মোটের উপর যে যার স্বস্তিজনক আসনে সন্তুষ্ট। সভা সেমিনারে, এমন কি বন্ধুচক্রের বা পারিবারিক আলোচনার আসরেও যথার্থ অর্থে চিন্তার আদানপ্রদান কতটা ঘটে তা তর্কসাপেক্ষ। অনুবাদ যেরূপ ভাষাকে আশ্রয় করে যোগাযোগ স্থাপনের প্রয়াস, তাই সেখানেও একটা তুলনীয় দোলাচলবৃত্তি দেখতে পাওয়া যায়। তার মধ্যে অস্পষ্টতা থাকে, অস্ফুট গুঞ্জন, রেডিওর বোতাম ঘোরালে যেমন শোনা যায়। সেগুলো সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া যায় না। অনুবাদ নিয়ে যে আলোচনা, তার সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য।

সাহিত্যিক অনুবাদ তাই এমন একটা কাজ যা যুগপৎ টেকনিকাল অনুশাসনে আবদ্ধ এবং সৃষ্টিশীলতার নৃত্যে লীলায়িত। একজন সাংসদ অনুবাদক অবশ্যই চেষ্টা করেন মূলের প্রতি যতটা বিশ্বস্ত থাকা সম্ভব ততটা থাকতে। কিন্তু তাঁর মধ্যে সৃষ্টিশীলতার হাওয়া না বইলে তিনি সেই রূপান্তর ঘটাতে পারবেন না, যার ফলে অনূদিত দলিলটাও নিজের জোরে সাহিত্য হয়ে ওঠে, মৌলিক সাহিত্যের মতোই আমাদের ধাক্কা দেয়, কানে বেজে ওঠে। সৃষ্টিশীলতার মধ্যে আমি ধরছি সেই জাতের সমাধান অন্বেষণকেও যা ব্যবহারিক, কারুশিল্প বা এঞ্জিনিয়ারিংয়ের সমস্যা-সমাধানের সগোত্র। একই শব্দ বা শব্দগুচ্ছ বিভিন্ন প্রসঙ্গে বিভিন্ন উপায়ে তর্জমা করতে হতে পারে। কেননা সাহিত্যিক অর্থ প্রসঙ্গনির্ভর, তাছাড়া ধ্বনি-নকশার সঙ্গেও অন্তরঙ্গভাবে জড়িত। অনূদিত টেক্সটে ব্যঙ্গনা আর ধ্বনিতে মিলিয়ে আরেকটি সমান্তরাল প্যাটার্ন অনুবাদককে তৈরি করতে হবে, কিন্তু সেটা কেবল নকলনবিসির ব্যাপার হতে পারে না, কেননা প্যাটার্নটাকে কাজ করতে হবে অনুবাদের ভাষার জমিতে। কবিতার 'ফর্ম' তেমন কোনো পেরেক নয় যে তাকে অন্য একটা ভাষা থেকে তুলে এনে আরেকটা ভাষায় হাতুড়ি পিটিয়ে বসিয়ে দেওয়া যাবে। 'অ্যাডজাস্টমেন্ট' নিশ্চয়ই লাগে। সেইখানেই সৃষ্টিশীলতার ভূমিকা এসে পড়ে।

সৃষ্টিশীল অনুবাদের অভিঘাত কিন্তু সত্যিই শক্তিশালী হতে পারে, যে ভাষায় অনুবাদ করা হচ্ছে তার ভাবসম্পদকে স্বচ্ছ করতে পারে এবং তার প্রকাশক্ষমতাকে বাড়িয়ে দিতে পারে। বোদলেয়র, হোন্ডার্লিন, রিল্কে থেকে বুদ্ধদেবের সৃষ্টিশীল অনুবাদগুলি এই ভূমিকা পালন করেছিলো। তাঁর চেষ্টার ফলে ঐ কবিরা আমাদের কাছে আর নিছক বিদেশী থাকেন

নি, অনেকটাই আপনজন হয়ে উঠেছিলেন। তাঁদের কবিতা আমাদের নিজস্ব জিনিস হয়ে উঠেছিলো। আবার ঐ কবিরা যে ঠিক আমাদেরই ঘরের ছেলে নন, ঈষৎ ভিন্ন এক সংস্কৃতির জাতক, তাও আমরা বুঝতে পারতাম। আকর্ষণটা তো ঐখানেই। সৃষ্টিশীল অনুবাদককে এই কাজটাই করতে হয়— চেনার সঙ্গে অচেনাকে মিলিয়ে দিতে হয়, আত্মীয়তার সঙ্গে ভিন্নতার সমঝোতা করতে হয়। অনূদিত সাহিত্য হবে দোআঁশলা, আধা-দেশী, আধা-বিদেশী। তাদের দ্বৈত, মিশ্র স্বভাবের গুণেই বুদ্ধদেবের ঐসব অনুবাদ বিশ শতকের মৌলিক বাংলা কবিতার উপর প্রভাব ফেলতে পেরেছিলো।

আমার অ্যাংলো-স্যাক্সন কবিতার অনুবাদের ভূমিকায় এই মিশ্রণের ব্যাপারটা নিয়ে আমি আলোচনা করেছিলাম। আমি চেয়েছিলাম যে আমার অনুবাদের বাংলা আধুনিক বাংলাই হবে, কিন্তু তার গায়ে ‘একটা বিদেশী ছোঁয়াও থাকবে, নইলে আর অনুবাদ ক’রে লাভ কী’। লিখেছিলাম :

...ঠিক যেখানে দুই ভাষাজগতের মধ্যে ব্যবধান দৃষ্ট, যেখানে অনুবাদ কঠিনতম, সেখানে আমি প্রত্যাশা করি যে আছাড় না খেলেও অন্ততঃ একটু হোঁচট খাবো, অর্থাৎ অনুবাদের মধ্যে এমন কোনো চেষ্টা থাকবে যার দ্বারা আমি ভিন্ন জগৎটির ইঙ্গিত পাবো, যেন হঠাৎ বুঝতে পারবো ঘোমটায় শান্তিপূরী পাড় হলে হবে কি, তার আড়ালে চুলের রঙ কালো নয়, সোনালী,— এই ভিন্দেদেী ভাষার খাঁটি স্পর্শটুকু না থাকলে অনুবাদ পড়াই বৃথা মনে হয়। সে-মুহূর্তে অনুবাদক যদি তাঁর দৃষ্টকে উন্মোচন না ক’রে বরং এড়িয়ে যান, বন্ধুরতাকে মসৃণ ক’রে দেন, বিদেশীকে একেবারে দেশী বানিয়ে ফেলেন, তা হলে যে উদ্দেশ্যে অনূদিত সাহিত্য পড়ি,— অভিজ্ঞতার সম্প্রসারণ,— তা-ই হয় না।

তর্ক করেছিলাম সুধীন্দ্রনাথ দত্তর সঙ্গে। তিনি তখন বেঁচে নেই। তাঁর *প্রতিধ্বনি*’র ভূমিকায় তিনি লিখেছিলেন, ‘বঙ্গানুবাদ যখন বাঙালীদেরই পাঠ্য, তখন তার বিচারে বঙ্গীয় আদর্শের বিধিনিষেধ অকাটা’; আমি আমার অনুবাদের ভূমিকায় লিখলাম, ‘অনুবাদের বাংলা সর্বত্র আমাদের পরিচিত বাংলা হতে পারে না, কিন্তু সম্প্রসারিত অর্থে বাংলা হতে পারে, যাতে নতুন দ্যোতনা সংযোজন করার চেষ্টা হয়েছে।’

অনুবাদে মূল পরিবেশের ভিন্নতা ধরিয়ে দেবার ব্যাপারে আমার একটা দায়বদ্ধতা আছে। তাই এ ব্যাপারে কতগুলি নিজস্ব নিয়ম আছে আমার। গাছগাছালি, জীবজন্তুর নাম ইত্যাদি ব্যাপারে যথার্থ প্রতিশব্দ না পেলে মূল নামটি ব্যবহার করাই আমার কাছে যুক্তিযুক্ত মনে হয়। টিউলিপ ফুল বা রবিন্ পাখি বাংলা অনুবাদে টিউলিপ বা রবিন্ই থাকবে। বাংলা থেকে ইংরেজীতে অনুবাদের সময়ে সমস্যায় পড়লে স্থানবিশেষে বিশ্বজনীন বৈজ্ঞানিক নামটি ব্যবহার করা চলতে পারে। বাংলা থেকে ইংরেজীতে অনুবাদ করার সময়ে চৈত্র-বৈশাখকে মার্চ-এপ্রিলে রূপান্তরিত না ক’রে চৈত্র-বৈশাখ রাখাই যৌক্তিক মনে হয় আমার।

বিভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে সেতু বাঁধবার এক ঈর্ষণীয় ক্ষমতা রয়েছে অনুবাদ সাহিত্যের। বিভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষকে সে পরস্পরের কাছে টেনে আনতে পারে। কিন্তু পাঠকদের এই মুহূর্তে স্পর্শ করতে হলে, উর্বর বীজের মতো তাঁদের চিন্তে অঙ্কুরিত হতে হলে অনুবাদের ভাষাটাকে পাঠকগোষ্ঠীর সময়ের ভাষা হতে হবে। উৎস-টেক্সট যত প্রাচীনই হোক না কেন,

তাকে প্রোথিত করতে হবে টার্গেট-ভাষার সমকালীন জীবনের মাটিতে। একজন অনুবাদক তাঁর সৃষ্টিশীলতাকে ধার-করা প্রাকালীন ভাষায় যথার্থভাবে খেলাতে পারেন না : চেষ্টা নিশ্চয়ই করতে পারেন, তবু তা শোনাবে অনুকরণাত্মক, ব্যঙ্গাত্মক, প্যারডি বা ক্যারিকেচরের মতো।

বিশ শতকের গোড়ার দিকে প্রকাশিত ইংরেজী অনুবাদে গ্রীক নাটক যখন পড়েছি তখন তা আমার মনে বিশেষ কোনো দাগ কটতে পারে নি। সুদূর আর নিষ্প্রভ মনে হয়েছে তাদের। কিন্তু একদিন যখন টেলিভিশনে টোনি হ্যারিসনের আধুনিক অনুবাদে *অরেস্তেইয়া*-র প্রযোজনা দেখলাম, তখন মন দিতে বাধ্য হলাম। মধ্যে নয়, মুগ্ধাঙ্গনে অভিনয়। ছোট্ট সাদা-কালো টিভি সেটে দেখছি, প্রযোজনার দৃশ্যগত দিকটা তেমন ফোটে নি। কিন্তু নিছক ভাষার দাপট আমার মনোযোগ কেড়ে নিলো। শিরদাঁড়া সোজা ক'রে বসলাম, ভল্যুম বাড়িয়ে দিলাম, শ্রবণে নিমগ্ন হলাম। গ্রীক নাটক কেন মহৎ তা মর্মে মর্মে বুঝলাম। একজন আধুনিক কবির করা অনুবাদে বুঝিয়ে দিলো, সে এক ধরনের আবিষ্কার। সমকালীন ভাষায় করা সৃষ্টিশীলতা-অবহিত অনুবাদ এইভাবেই আমাদের সেই সাহিত্যকে চিনিয়ে দিতে পারে, যা স্থানকালের বিচারে আমাদের থেকে অনেক দূরে।

কবিতার ক্ষেত্রে নির্ভুল অনুবাদের তাগিদ যেমন অনুবাদককে 'মৌলবাদ'-এর দিকে ঠেলে দিতে পারে, রসাল সামগ্রীর বদলে শুকনো কেঠো জিনিস তৈরি করতে প্ররোচিত করতে পারে, তেমনি নাটক অনুবাদের ক্ষেত্রে একটা বিপরীত তাগিদ— সংলাপের সচল প্রবাহের প্রতি অত্যধিক আনুগত্য— অন্য একটা সমস্যা তৈরি করতে পারে। মধ্যে 'এখন'-এর দাবি খুব বেশী, বিশেষতঃ যাঁরা নাটককে প্রধানতঃ বিনোদন হিসেবে দ্যাখেন তাঁদের মাপকাঠিতে। তাঁদের নিরিখে প্রতি মুহূর্তে সংলাপের সচলতা বজায় রাখাটাই সব চাইতে দরকারী, যাতে শ্রোতা-দর্শকদের মনোযোগ কখনোই ছিন্ন না হয়। তাঁদের বিবেচনায় শ্রোতা-দর্শকদের অত সাংস্কৃতিক ভিন্নতা বোঝার চাড়া নেই, প্রেক্ষাগৃহে ব'সে টীকাটিপ্তনী পড়বার অবকাশ নেই, তাঁরা যে মুহূর্তে সংলাপ শুনছেন সেই মুহূর্তেই তার পূর্ণ মর্ম উদ্ধার ক'রে নেওয়া তাঁদের প্রয়োজন, সব উল্লেখ আর ঠাট্টা তৎক্ষণাৎই বুঝে নেওয়া দরকার।

এই প্রত্যাশা অলীক। মাতৃভাষার নাটক হলেও শ্রোতা-দর্শকরা সব অনুষঙ্গ, সব উল্লেখ, সব রসিকতা, সব তাৎপর্য তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারেন না সব সময়। বিশেষতঃ নাটকটা যদি একটু পুরোনো হয়। শেক্সপীয়রের নাটকের সব কিছু কি আজকের দিনের ইংরেজীভাষী সাধারণ দর্শক নিমেষেই বুঝতে পারেন? পারেন না। অসম্ভব। নাট্যরচনার সমকালীন প্রসঙ্গের উল্লেখের কথা বাদ দিলাম, বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী ভাষা আর সাহিত্য নিয়ে রীতিমতো পড়াশোনা না করলে চারশো বা সাড়ে চারশো বছর আগেকার নাটকের নিছক ভাষার কাজের একটা অংশই রীতিমতো অনধিগম্য হয়ে যায়। সেটাই স্বাভাবিক, কারণ ভাষা স'রে যায়। তবু থিয়েটার জগতের লোকেরা এই মিথটা বজায় রাখতে ভালোবাসেন যে সবাই সব কিছু নিমেষে বুঝে নিচ্ছে।

আমার বিচারে, সাহিত্যের অন্যান্য শাখার ক্ষেত্রে অনুবাদের সমস্যাগুলো যেরকম, নাটক অনুবাদের ক্ষেত্রেও সমস্যাগুলো মোটের উপর সেইরকমই, তেমন কিছু আলাদা নয়। আমার *রাতের রোদ*-এর অনুবাদের মুখবন্ধে এ বিষয়ে বিশদভাবে লিখেছি। হ্যাঁ নিশ্চয়, অনুবাদের ভাষায় সংলাপের প্রবাহ যাতে বজায় থাকে সেদিকে অবশ্যই দৃষ্টি দিতে হবে, নয়তো অভিনেতার

তাদের লাইনগুলো স্বচ্ছন্দে বলতেই পারবেন না। কিন্তু সেই দেশী-বিদেশীর, কাছে-দূরের, চেনা-অচেনার সূষ্ঠ মিশ্রণ ঘটানোর ব্যাপারটা থেকেই যায়। সেটা শ্রমসাধ্য, পরীক্ষানিরীক্ষানির্ভর; সংবেদনের সূক্ষ্মতা, সৃষ্টিশীলতা, কাণ্ডজ্ঞান সবই দাবি করে। যারা মধ্যয়ন করবেন তাঁদেরও একই গুণাবলী লাগবে। অনুবাদ কাজটা মূলতঃ আন্তঃসাংস্কৃতিক, তাই যে-লিখন এক ভাষা থেকে নেমে আরেক ভাষার নৌকায় উঠছে, তাকে আপন ক'রে নেওয়া যেমন কাম্য, তার ঈষৎ ভিন্নতা বা 'অপরত্ব'-এর স্বাদটুকু রক্ষা করা এবং ধরিয়ে দেওয়াও তেমন জরুরী। চেখভ বা ইবসেনের নাটককে যদি পুরোপুরি 'ঘরের জিনিস' ক'রে ফেলি, তা হলে মূল নাট্যকারকে আর চেনা হয় না। অবশ্য যদি তাঁদের নাটক 'অবলম্বনে' কোনো 'ঘরোয়া' নাট্যবস্তু নির্মাণ করাই প্রয়োজনার অভিপ্রেত হয়, তা হলে অন্য কথা। সেটা 'অ্যাডাপ্টেশন'-এর পর্যায়ে পড়তে পারে। আমি এই মুহূর্তে ভাষাগত অনুবাদের কথাই বলছি।

এখানে আমার একটি সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতার উল্লেখ করি। এবার কলকাতায় কৌশিক সেনের নির্দেশনায় 'স্বপ্নসন্ধানী'-প্রযোজিত সমুদ্রের মৌন দেখলাম। ঠিক অনূদিত নাটক নয়, তবে অনুবাদের একটা উপাদান এর মধ্যে প্রবলভাবে বর্তমান। নাটকটির উৎস বিশ শতকের একটি ফরাসী গল্প, যেটি একদা অনুবাদ করেছিলেন বিষ্ণু দে। বিষ্ণু দে-র সেই অনুবাদ অবলম্বনে নাটকের স্ক্রিপ্ট তৈরি করা হয়েছে। অনূদিত গল্পটি দেখার সুযোগ হয়েছে, তাই জানি যে নাটকের ভাষা যথেষ্ট বিশ্বস্তভাবেই অনূদিত গল্পটিকে অনুসরণ করে। মধ্যয়ন দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। আমার মনে হয়েছিলো যে দেশী-বিদেশীর যে সূক্ষ্ম ও সংবেদনশীল মিশ্রণ এ ধরনের কাজে আমি খুঁজি, তা পেয়েছিলাম। নাটকটা ছিলো একদিকে স্বচ্ছন্দভাবে বাংলা জিনিস—মনোজ্ঞ, পরিশীলিত, এবং কাব্যময়, অন্যদিকে ঠিক যতটুকু দরকার ততটুকু 'ভিন্ন', প্রয়োজনীয় মাত্রায় ইয়োরোপীয়। ইয়োরোপীয় অনুবঙ্গে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে দুটি ফরাসী চরিত্র আর একটি জার্মান চরিত্রের মধ্যে অবস্থানের (এবং মেজাজের) পার্থক্যটুকুও ভারী চমৎকারভাবে তুলে ধরা হয়েছিলো।



সাহিত্যিক অনুবাদের সৃষ্টিশীলতার দিকটা সব থেকে বেশী খোলে যখন অনুবাদক দুটো ভাষাই ভালোমতন জানেন, দুটো সংস্কৃতিকেই কাছ থেকে চেনেন। তখন তিনি এক উল্লস্ফনে সমুদ্র পার হতে পারেন, হনুমানের লঙ্কায় চ'লে যাওয়ার মতো। বিশেষ ক'রে কবিতা অনুবাদের ক্ষেত্রে এ কথা সত্য। কিন্তু তেমন দ্বৈভাষিক-দক্ষতা-সম্পন্ন অনুবাদক সব সময় মেলে না। তখন একটা মধ্যবর্তী প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হয়। হয়তো আরেকটা ভাষা যোগসূত্রের কাজ করে। কিংবা দুজন কবি সহযোগিতা ক'রে একটা অনুবাদ খাড়া করেন। এভাবেও মোটামুটি ভালো অনুবাদ বেরোতে পারে।

শেষ বিচারে সবই নির্ভর করে ব্যক্তি-অনুবাদকের নিজস্ব ক্ষমতার উপরে। তার উপরে কোনো কথা নেই। বুদ্ধদেব বসুও নিয়ম ক'রে ফরাসী জার্মান শেখেন নি। একই কবিতার একাধিক ইংরেজী অনুবাদ যোগাড় ক'রে নিতেন। একদিকে মূল টেক্সট, অন্যদিকে ইংরেজী অনুবাদ, এ ধরনের একাধিক বই মিলিয়ে দেখে মূলের অর্থ ঠিক কী, কবিতাটি ঠিক কী বলছে, তা বুঝে নেবার চেষ্টা করতেন। মনে কোনো প্রশ্ন জাগলে ভাষাজ্ঞানী বন্ধুদের

জিজ্ঞাসা করে নিতেন। আমার বাবা ফরাসী-জার্মান জানতেন, কবিতাভবনে আড্ডা দিতে যেতেন। তাঁকেও প্রশ্ন করতেন।

ফরাসী-জার্মান থেকে বুদ্ধদেবের অনুবাদে তাই অর্থোদ্বারে দু’চারটা ভুল এখানে-সেখানে থাকতেই পারে, কিন্তু সে ত্রুটি পুষিয়ে দেয় তাঁর কবিত্ব। কবিতার অনুবাদে অর্থের পরিবহন একটা দিকমাত্র। সেটা গৌণ দিক এমন বলছি না, কিন্তু অর্থের পরিবহন কবিতার উৎকৃষ্ট সটীক গদ্য অনুবাদেও মোটামুটি পাওয়া যেতে পারে। যদি চাই যে নতুন টেক্সটটি কবিতাই হবে, নতুন পাঠকের চেতনায় কবিতার মতোই কাজ করবে, তা হলে কিন্তু ব্যঞ্জন আর ধ্বনি মিলিয়ে অনুবাদের ভাষায় নতুন একটা নকশা নির্মাণ একটি গুরুদায়িত্ব হয়ে দাঁড়ায়। সেই নতুন নকশার উপরেই নির্ভর করে কবিতা হিসেবে নতুন টেক্সটটি উত্তরাবে কিনা—নতুন পাঠকের কানে তা কবিতা হয়ে বাজবে কিনা। এইজন্যই অনুবাদককে অনুবাদের ভাষায় কবিতার কারুশিল্প জানতে হয়। কবিতা থেকে কবিতা তৈরি করার কাজে ধ্বনির নকশা তৈরি করা যে কত জরুরী তা অনেকে বোঝেন না, না বুঝে এঁড়ে তর্ক করতে থাকেন। উৎস-কবিতার প্রতিটি শব্দ বা বাক্যাংশ বোঝার বা বুঝিয়ে দেবার ব্যাপারে কিছু গোঁজামিল দিয়েও একজন বড় কবি সার্থক অনুবাদ কবিতা তৈরি করতে পারেন, এটাই ঘটনা। গদ্যের অনুবাদে অর্থানুসরণের দায়দায়িত্ব বেশী।

কবি-অনুবাদকদের প্রভাবচ্ছায়ায় বড় হয়েছি ব’লে আর নিজে কবিতা অনুবাদ করেছি ব’লে কবিতার অনুবাদ নিয়েই আমি সব থেকে বেশী মাথা ঘামিয়েছি। গদ্যের অনুবাদও জীবনে করেছি কিছু কিছু, কিন্তু গোড়ার দিকে সে কাজের খিওরির দিক নিয়ে মাথা ঘামাতে হয় নি। গদ্যের বেলায় সর্বপ্রথম যে সিরিয়াস দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলাম সেটা হলো *দ্য ওয়ান্ডার অফ টোয়াইলাইট* সংকলনগ্রন্থটির জন্য সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কয়েকটি প্রবন্ধের অনুবাদ। খুবই অল্প বয়স তখন আমার, তেইশ আর চব্বিশের মাঝামাঝি হবে। কাজটা কলকাতায় আরম্ভ করে ব্রাইটনে শেষ করেছিলাম। অ্যাংলো-স্যান্সন কবিতা অনুবাদ করবার অনেক আগেই সে কাজ শেষ হয়ে গিয়েছিলো। সুধীন্দ্রনাথের জটিল বাক্যাগুলির জট ছাড়িয়ে অর্থানুসরণ করে সাবধানে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাওয়ার কাজ। পরে কারও কারও কাছে শুনেছি, সুধীন্দ্রনাথের গদ্যের অর্থোদ্বার করতে আমার ইংরেজী অনুবাদ নাকি তাঁদের সাহায্য করেছিলো। বিষ্ণু দে-র উপরে সুধীন্দ্রনাথের প্রবন্ধটি অনুবাদ করেছিলাম; সেই সূত্রে বিষ্ণু দে-র কবিতার কিছু টুকরোও অনুবাদ করতে হয়। তখন বিষ্ণু দে-র সঙ্গে পত্রমাধ্যমিক আলোচনা করে নিয়েছিলাম।

পরবর্তীকালে যেসব গদ্য অনুবাদ করেছি, তাদের মধ্যে কতগুলির বেলায়,— যেমন মানবেন্দ্রনাথ রায়ের *দ্য আইডিয়াল অফ ইন্ডিয়ান উমানহুড* (বাংলা রূপে *ভারতীয় নারীত্বের আদর্শ*), পিকাডর বুক অফ *মডার্ন ইন্ডিয়ান লিটরেচার* সংকলনের জন্য *তিথিভোর* উপন্যাসের টুকরো, রাজশেখর বসুর দুটো গল্প,— অনুবাদের তাত্ত্বিক দিক নিয়ে খুব বেশী ভাবতে হয় নি। বিশ্বস্তভাবে তর্জমা করতে করতে এগিয়ে গেছি।

প্রথম ভাবতে হলো ঐ নিজের নাটক তর্জমা করতে গিয়ে। সেই সময়েই নাটক অনুবাদ বিষয়ে একটি বড় কনফারেন্সে গেলাম, জানলাম যে নাটক অনুবাদের পদ্ধতি কেমন হওয়া উচিত তাই নিয়ে রীতিমতো লড়াই আছে তাত্ত্বিকদের মধ্যে। তারপর ‘অনুবাদের খিওরি’

বিষয়ে পড়াশোনা করলাম। এই এলাকাটা যে কত বড় একটা কুরুক্ষেত্র তার আন্দাজ পেলাম। আমার চিন্তার ফসল নাটকটির তর্জমার (নাইটস্ সানলাইট) অনুবাদকের প্রাক্কথন অংশে ধরিয়ে দেওয়া আছে।

গদ্য অনুবাদের আরেকটি দিক নিয়ে আমাকে বেশ খানিকটা ভাবতে হলো যখন গোলাম মুবশিদের মাইকেল জীবনী আশার ছলনে ভুলি বইটির ইংরেজী তর্জমা (লিওর্ড বাই হোপ) পরবাস-এর জন্য রিভিউ করার দায়িত্ব পেলাম। গোপা মজুমদার পুরস্কারপ্রাপ্ত অনুবাদিকা, ভালো ইংরেজী লেখেন, কোনো গণ্ডগোল প্রত্যাশা করি নি। কিন্তু ইংরেজী বইটির রিভিউ কপি যখন আমার হাতে এসে পৌঁছলো তখন সেটি হাতে নিয়েই বুঝলাম যে অনুদিত বইটি মূল বইটির চাইতে আয়তনে ছোট। ফলে মূল টেক্সটটা আর অনুবাদ একটু মেলাতে বসতে হলো, আর তা করতে গিয়ে আবিষ্কার করলাম যে গোপা বিস্তর কাটছাঁট করেছেন, তাঁর নিজের মতো করে বইটার রীতিমতো ‘সম্পাদনা’ করেছেন। তাঁর মুখবন্ধে তিনি যদিও দাবি করেছেন যে তাঁর কাটছাঁট মূল বইয়ের পুনরুজ্জীবন এড়াবার জন্য, আমি দেখলাম যে মোটের উপর সেই দাবি ঠিক নয়। সম্পাদনা বা সংশোধন যেটুকু দরকার তা মুবশিদ তাঁর বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণে নিজেই করে দিয়েছিলেন। গোপার কাজ ছিলো কেবল সোজাসাপটা তর্জমা করে যাওয়া। কিন্তু তিনি তা করেন নি। সম্ভবতঃ নিজের কাজকে সংক্ষিপ্ততর করার তাগিদে মোটা বইটাকে তিনি ছোট করতে চেয়েছেন, আর তা করতে গিয়ে এখানে-ওখানে কাঁচি চালিয়েছেন, এখানকার ইনফর্মেশন বা আলোচনা ওখানে ঢুকিয়েছেন, বস্তুতঃ বইটাকে তিনি নানাভাবে পুনর্বিন্যস্ত করেছেন। ইংরেজী বইটি এক অর্থে তাঁর করা অ্যাডাপ্টেশন বা পুনর্লিখন। ব্যাপক পুনর্লিখনের ফলে ইংরেজী টেক্সটটার মধ্যে ছোট বড় অনেক ভুলত্রুটি ঢুকে পড়েছে। আমাকে আবার সমালোচকের ভূমিকায় সেই সব ভুল তুলে দেখাতে হলো— যে ভূমিকা আমি একদম পছন্দ করি না। মুশকিল এই যে মাইকেল জীবনীর জন্য গবেষণাকর্মটি তো গোপা করেন নি, করেছিলেন মুরশিদ। সেই গবেষণাকর্মের সঙ্গে গোপা কোনোদিন কোনোভাবেই যুক্ত ছিলেন না। মূল বইটার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক স্রেফ একজন অনুবাদকের। যে-তথ্যাবলীর খুঁটিনাটি ও পরস্পরসম্পর্ক আমরা ভিতর থেকে জানি না তাকে নিয়ে খুব বেশী নাড়াচাড়া করতে গেলে ভুল হবেই। লিওর্ড বাই হোপ-এর পর্যালোচনা করার সূত্রে আমি পরিষ্কার বুঝলাম যে আমরা যদি অন্যের গবেষণাগ্রন্থ অনুবাদ করতে বসি, তা হলে আমাদের উচিত টানা তর্জমা করে যাওয়া। গবেষণার ক্ষেত্র সম্বন্ধে যেখানে আমাদের বিশদ জ্ঞান নেই, সেখানে সম্পাদনা বা অ্যাডাপ্টেশন বা পুনর্লিখনের এস্তিমার আমাদের নেই; তা করতে যাওয়া বিপজ্জনক, কোথায় কিভাবে ভুল ঢুকে যাচ্ছে তা আমরা ধরতেও পারবো না।

আমার সমালোচনায় একটি ব্যাপারে আমি বিশেষ আক্ষেপ প্রকাশ করেছিলাম। বংশতালিকাসহ মাইকেলের বংশধরদের সম্বন্ধে যথাসাধ্য খবর দিয়ে ‘সংযোজন’ শিরোনামে যে অধ্যায়টি মুরশিদ তাঁর বইয়ের সর্বশেষে জুড়ে দিয়েছিলেন, সেটি ইংরেজী সংস্করণে একেবারেই বাদ দেওয়া হয়েছে। আমার নিজের সহজাত গবেষক প্রবৃত্তি থেকে আমার মনে হয়েছিলো যে এটা ভুল সিদ্ধান্ত। মাইকেলের বংশধরেরা এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে এখনও বেঁচে আছেন; তাঁরা ইংরেজীভাষী; তাঁদের সূত্রে নতুন কিছু খবরও সংগ্রহ করা

যেতো। আমার অভিমত যে নেহাৎ ফালতু নয় তার প্রমাণ পেলাম এই সেদিন। ইঠাৎ অস্ট্রেলিয়া থেকে একটি ই-মেইল পেলাম— *পরবাস*-এ আমার প্রবন্ধটি পড়ে পার্থ শহর থেকে একজন আমাকে লিখেছেন; পার্থ শহরে তাঁর পরিচিত এক বৃদ্ধ ব্যক্তি মারা গেছেন; তাঁর ধারণা মৃত ব্যক্তি সরাসরি লাইনে কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের বংশধর হতে পারেন। তিনি জানতে চান তাঁর অনুমান ঠিক কিনা, এ বিষয়ে কী করে নিশ্চিত হওয়া যায়? মুরশিদের বাংলা বইয়ে দেওয়া-বংশলতিকার সঙ্গে নামধাম মিলিয়ে পরলোকগত মানুষটিকে অনায়াসেই মাইকেল ও হেনরিয়েটার প্রপৌত্র ব'লে সনাক্ত করা গেলো।

এ কথা জোর দিয়ে বলতে চাই যে বহুভাষাভাষী ভারতীয় উপমহাদেশে পরস্পরের ভাষা শেখার প্রয়োজন বিরাট। স্কুলে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষাশিক্ষার সুযোগসুবিধা আরও অনেক সম্প্রসারিত হওয়া উচিত, যাতে বিভিন্ন ভাষার মধ্যে সরাসরি অনুবাদ হতে পারে, ইংরেজীর মধ্যস্থতা ছাড়াই। ভারতীয় প্রেক্ষাপটে অনুবাদের মধ্যে ইংরেজীর নিশ্চয়ই একটা ভূমিকা আছে, কিন্তু তার সর্বময় কর্তৃত্ব স্বস্তিদায়ক নয়। এই প্রভুত্বের ফলে বিভিন্ন ভারতীয় সাহিত্যগুলি পরস্পরকে সরাসরি প্রভাবিত করতে পারে না। মনে রাখতে হবে যে অনুবাদের ভূমিকা দ্বিবিধ। অনুবাদ-সাহিত্য উৎস-ভাষার সম্পদ সম্বন্ধে খবর দেয়, কিন্তু সমৃদ্ধ করে গ্রহীতা ভাষাকেই। যখন মণিপুরী সাহিত্য থেকে ইংরেজীতে অনুবাদ করা হয় তখন যাঁরা ইংরেজী পড়তে পারেন তাঁরা সে অনুবাদ পড়ে জানতে পারেন যে ইঁা, মণিপুরী সাহিত্যের ভাণ্ডারে এই রত্নগুলি রয়েছে বটে। সেই খবর বিলি করাটাও অবশ্যই জরুরী, কিন্তু খবরটা মোটামুটি পৌছবে ভারতের ইংরেজীশিক্ষিত এলিট শ্রেণীর কাছে। সেই শ্রেণীর বাইরে যাঁরা, তাঁরা কিন্তু দ্বিতীয় ভাষা মাধ্যমিক অনুবাদ পড়ে ঠিক সেভাবে আলোড়িত ও চঞ্চল হতে পারবেন না, যেমন আমরা হয়েছিলাম বুদ্ধদেব বসুর করা বাংলা বোদলেয়ার পড়ে।

প্রক্রিয়াটার আরেকটু গভীরে ঢোকা যাক। বুদ্ধদেব নিজে আলোড়িত হয়েছিলেন ফরাসী-জার্মান কবিতার ইংরেজী অনুবাদ পড়েই। কিন্তু তিনি আলোড়িত হতে পেরেছিলেন ইংরেজীতে অত্যন্ত উচ্চশিক্ষিত ছিলেন বলেই। বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী সাহিত্যেরই কৃতী ছাত্র ছিলেন তিনি। অজস্র পড়তেন, ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে কবিতাকে কিভাবে গ্রহণ করতে হয় তা ভালোভাবে জানতেন। কিন্তু তিনি যখন সেই সব কবিতাকে বাংলায় রূপ দিলেন, তখন এমন অনেক পাঠক আলোড়িত হলেন, যাঁদের পক্ষে ইংরেজী রূপগুলি থেকে রসগ্রহণ অত সহজ ছিলো না। যাঁরা প্রধানতঃ মাতৃভাষাতেই সাহিত্যচর্চা করেন এবং ইংরেজীতে অতটা নিষ্ণাত নন— এবং তাঁদের সংখ্যা ভারতে নেহাৎ কম হবে না— তাঁদের জন্য অনুবাদটা মাতৃভাষায় হওয়া দরকার। তা হলে সে জিনিস তাঁদের উত্তেজিত এবং নতুন সৃষ্টিতে অনুপ্রাণিত করতে পারে। যদি আমরা মণিপুরীকেই উন্নততর করতে চাই, তা হলে অনুবাদ করতে হবে অন্যান্য ভাষা থেকে মণিপুরীতে। সাহিত্য অকাদেমির একটি নিউজলেটার থেকে জানলাম যে ভারতের বিভিন্ন ভাষাগুলির মধ্যে অনুবাদ ক্রমশঃ বাড়ছে। এটা আনন্দের খবর, এবং এই কাজ বর্ধিত পৃষ্ঠপোষকতা দাবি করে।

দুঃখের বিষয়, সমকালীন ভারতীয় মধ্যবিত্তদের একটা বড় অংশ মাতৃভাষা সম্পর্কে হীনমন্যতায় ভোগেন। তাঁরা একাগ্রচিত্ত ইংরেজী আয়ত্ত করার ব্যাপারে। উচ্চশিক্ষাব্যবস্থার

ভিতর দিয়ে যাঁরা যান, তাঁদের কম বেশী ইংরেজী আয়ত্ত হয়। কিন্তু কিছুটা ইংরেজী জানলেই ঐ ভাষায় সাহিত্যের অনুবাদক হওয়া যায় না। সাহিত্যের ভাষার সঙ্গে একটা জীবন্ত সম্পর্ক থাকা চাই। জীবিকার প্রয়োজনে অনেকেই ইংরেজীতে প্রশাসনিক, সাংবাদিক, বা বিদ্যায়তনিক গদ্য লেখেন; তার অর্থ এই নয় যে তাঁরা ঐ ভাষায় আবশ্যিকভাবে কবিতা-গল্প-উপন্যাস-নাটকেরও সং অনুবাদক হতে পারবেন। সাহিত্যের ঐসব শাখায় লিখতে হলে যে কারুশিল্পজ্ঞানের প্রয়োজন, তাও লাগবে, কারণ সাহিত্যিক অনুবাদ এক জাতের সাহিত্যিক লিখন। যদি আপনি বাংলা কিংবা মণিপুরী থেকে ইংরেজীতে কবিতা অনুবাদ করতে চান, তা হলে আপনাকে ইংরেজী ভাষায় কবিতারচনার কারুশিল্প বুঝতে হবে। যদি ইংরেজী থেকে বাংলা কিংবা মণিপুরীতে কবিতা অনুবাদ করতে চান, তা হলে বাংলায় অথবা মণিপুরীতে কবিতা রচনার কারুশিল্প বুঝতে হবে। আর মাইকেলজীবনীর অনুবাদের আলোচনায় এইমাত্র যেমন দেখলাম, গবেষণাগ্রন্থের অনুবাদ করতে হলে গবেষণাজগতের কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধেও ওয়াকিরাহাল হওয়া দরকার। গোপা মজুমদার এর আগে গল্প-উপন্যাস অনুবাদ করেছেন, গবেষণাভিত্তিক বই অনুবাদ করেন নি। মাইকেলের জীবনচরিত অনুবাদ করতে গিয়ে অনুবাদের সঙ্গে সঙ্গে তাকে সম্পাদনার দ্বারা সংক্ষিপ্ত করতে যাওয়ার মধ্যে যে কোনো বিপদ থাকতে পারে তা তিনি বুঝতে পারেন নি। বলছি যে লেখালেখির বিশেষ যে-জ্ঞার থেকে আমরা অনুবাদ করতে যাচ্ছি সেই জ্ঞানের সঙ্গে আমাদের একটা ‘বন্ধুত্ব’ থাকলে ভালো হয়।

সবশেষে বলি, ভারতীয় উপমহাদেশে কিন্তু ভাষার ব্যাপারে কিছু বিভ্রান্তিকে প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সেটা হয়তো ঠিক বিভ্রান্তিও নয়, সচেতন কৌশলই। কলকাতায় থাকাকালীন অপর্ণা সেনের নতুন ফিল্ম ‘ফিফ্টিন পার্ক অ্যাভিনিউ’ দেখলাম। মূল সংস্করণটি দেখেছি। হিন্দীতে ‘ডাব’-করা আরেকটি সংস্করণ আছে জানি, সেটি দেখি নি। আমার বক্তব্য মূল সংস্করণের ভিত্তিতেই। সন্দেহ নেই, নানা দিক দিয়ে খুবই উজ্জ্বল এবং উঁচু তারে বাঁধা ছবি এটি, কিন্তু সংলাপের ভাষাগুলি যেভাবে নির্বাচন করা হয়েছে তাতে আমার অস্বস্তি লেগেছে। সিরিয়াস বৌদ্ধিক আলোচনা, ব্যক্তিতে ব্যক্তিকে গুরুত্বপূর্ণ বিনিময়, অন্তরঙ্গ পারিবারিক দৃশ্য, এমন কি মা আর মেয়ের মধ্যে আবেগময় মুহূর্তমালা, চিকিৎসকের সঙ্গে রোগীর পরিবারের আদানপ্রদান— এসব ক্ষেত্রে ইংরেজী ব্যবহার করা হয়েছে; একজন পরিচারিকা হিন্দীতে কথা বলে, যে রাজনৈতিক গুণ্ডারা নারী সাংবাদিককে ধর্ষণ করে তারাও হিন্দী বলে; কলকাতার রাস্তায় বাংলায় কিছু টুকরো কথা শোনা যায়, আরেকটি স্বল্পদৃষ্ট চরিত্রের মুখে বাংলায় দু’একটি কথা একবার শোনা যায়। এই নির্বাচনের সামাজিক ব্যঞ্জনা আমার কাছে বিপজ্জনক মনে হয়েছে,— যেন যাবতীয় সিরিয়াস কথাবার্তা কেবল ইংরেজীতেই হতে পারে, হিন্দী শোভা পায় দাসীদের আর গুণ্ডাদের মুখে, আর বাংলা নেহাৎ প্রান্তিক, তার প্রায় কোনো গুরুত্বই নেই— কচিং বৃদ্ধদের মুখে শোনা যেতে পারে, কিংবা রাস্তা থেকে ভেসে আসতে পারে। প্রচণ্ড আবেগমণ্ডিত দুঃখের মুহূর্তে মা আর মেয়ে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান না হয়েও পরস্পরের সঙ্গে কেবলই ইংরেজীতে কথা বলছেন, ইংরেজীতে কামাকাটি করছেন, ডাক্তারও তেমনি চূড়ান্ত সংকটে রোগীর পরিবারের সঙ্গে আগাগোড়া ইংরেজীতে কথা বলে যাচ্ছেন, কখনো এক লাইন হিন্দী পর্যন্ত ব্যবহার করছেন না— এটা কাহিনীর পরিপ্রেক্ষিতে বাস্তব বিচারে অলীক। অপর্ণার মতো বিদগ্ধ চিত্রপরিচালিকা এটা ঠিক

কেন করলেন? যদি সর্বভারতীয় পণ্যায়ন বা বিদেশে রপ্তানির সুবিধার কথা ভেবে ইংরেজীকে সংলাপের প্রধান মাধ্যম করা হয়ে থাকে,— আর ফিল্মটা সত্যি এরই মধ্যে লগুনে এসেও গেছে,— তা হলে তো পুরো ফিল্মে ডাক্তার থেকে গুপ্তা পর্যন্ত সবাইকার মুখেই ইংরেজী বসানো উচিত ছিলো, অন্য ভাষা থেকে ইংরেজীতে অনূদিত নাটকে যেমন হয়ে থাকে।

অথবা বহুভাষাভাষী পরিবেশে কাহিনী যেখানে যেমন দাবি করে, সেই দাবি মেনে এক এক মুহূর্তে যার পক্ষে যেটা ঠিক, সেই ভাষা ব্যবহার করে প্রয়োজনবোধ নীচে সাবটাইটল বসিয়ে দেওয়া যেতো। অপর্ণা যদি পুরো ছবিটা বাংলায় করতেন, তা হলে তো বাংলার বাইরে পণ্যায়নের জন্য সাবটাইটল লাগাতোই, নয় কি? সাবটাইটল হচ্ছে সংক্ষিপ্ত অনুবাদ। অনুবাদের ব্যাপারটা অপর্ণা কি এড়িয়ে যেতে চেয়েছেন? আমার খটকা লেগেছে। ভারতের মতো বহুভাষাভাষী রাষ্ট্রে অনুবাদকে বাদ দেওয়ার চেষ্টা কি ঠিক? আধুনিক বাণিজ্যের চাপ শিক্ষকলার সব বিভাগেই বাড়ছে, বাড়ছে বিশ্বায়নের দাবানল। ভাষার গুরুত্ব সম্পর্কে এখনই পরিচ্ছন্নভাবে ভাবনাচিন্তা করতে না শিখলে ইংরেজী বা হিন্দীর মতো একটি কি দুটি শক্তিশালী যোগসাধক ভাষার দাপটে ভারতের অন্যান্য ভাষাগুলির শ্রী এবং আত্মপ্রকাশ মার খেয়ে যাবে, ভারতের বাইরেও ভারত সম্পর্কে ভুল ছবি তুলে ধরা হবে। সাহিত্য আর গান থেকে থিয়েটার আর সিনেমা পর্যন্ত শিক্ষাশাখায়, যেখানেই ভাষার ব্যবহার আছে, সেখানেই পরিচ্ছন্ন চিন্তার প্রয়োজন। বৈচিত্র্যের লোপসাধন বিবর্তনের পক্ষে কখনো শুভ হয় না। ভারতের ভাষাবৈচিত্র্য তার পরম সম্পদ, কেননা এর দ্বারা এই বিশাল অঞ্চলে ভাবনাবৈচিত্র্য সংরক্ষিত হয়। ভারতের মানুষের মুখে যতরকমের ভাষা শোনা যায় তাদের যথাযোগ্য সম্মান দিতে হলে অনুবাদকেও মর্যাদা দিয়ে আসরে টেনে আনতে হয়। তাই উপসংহারে আবারও বলি, অনুবাদ সত্যিই উৎসবের যোগ্য বিষয়।

পরিষৎ-সংবাদ

১৭ আষাঢ় ১৪১৩ রবিবার ২ জুলাই ২০০৬
বিকাল পাঁচটায় পরিষদ ভবনের সভাঘরে
রামকমল সিংহ স্মারক বস্তুতা প্রদান করেন
পরিষদের চিত্রশালাধ্যক্ষ শ্রী ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী।
তাঁর বিষয়-শিরোনাম বাংলার মন্দির স্থাপত্য।
সভায় সভাপতিত্ব করেন পরিষদ সভাপতি
অধ্যাপক পবিত্র সরকার।

৮ শ্রাবণ ১৪১৩ মঙ্গলবার ২৫ জুলাই ২০০৬
বিকাল চারটায় পরিষদ ভবনের সভাঘরে
পরিষদের ১১৩-তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপিত
হয়। ‘বাংলা সাহিত্য : ভবিষ্যতের ভাবনা’
বিষয়ে প্রতিষ্ঠা দিবসের ভাষণ প্রদান করেন
প্রবীণ গবেষক ও লেখক, অধ্যাপক অশ্রুকুমার
সিকদার। অনুষ্ঠানে অন্যান্য বছরের মতো
এবারেও অর্চনা চৌধুরী স্মৃতি পুরস্কার প্রদান
করা হয় বিশিষ্ট গবেষক অধ্যাপক অলোক
রায়কে। সৃজনশীল লেখক হিসেবে শ্রীমতী
তৃপ্তি সান্মাকে ইলা চন্দ স্মৃতি পুরস্কার প্রদান
করা হয়। তাঁরা উভয়েই এই সম্মান প্রাপ্তির
জন্য নিজেদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। সভায়
সভাপতিত্ব করেন পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক
পবিত্র সরকার।

প্রতিষ্ঠা দিবসে পরিষদের অস্থায়ী কর্মী
চিত্রশিল্পী শ্রীসমীর ঘোষ, সাহিত্যিক নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ
চট্টোপাধ্যায়ের একখানি প্রতিকৃতি বঙ্গীয় সাহিত্য
পরিষদে প্রদান করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য সেন্ট্রাল

ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া (মানিকতলা শাখা) প্রতিষ্ঠা
দিবসে উপস্থিত অতিথি অভ্যাগতদের
আপ্যায়নের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করে
পরিষদকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেন।
সভার শেষে সংগীত পরিবেশন করেন ড.
দেবারতি সোম ও শ্রী স্বপন সোম।

১৪ ভাদ্র ১৪১৩ রবিবার ২৭ আগস্ট ২০০৬
বিকাল পাঁচটায় — যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য
জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে এক ভাবগম্ভীর পরিবেশে
স্মরণসভা আয়োজিত হয়। সভায় যতীন্দ্রমোহন
বিষয়ে লিখিত ভাষণ প্রদান করেন পরিষদের
সম্পাদক অধ্যাপক রমাকান্ত চক্রবর্তী এবং
যতীন্দ্রমোহনের কন্যা শ্রীমতী মায়্যা ভট্টাচার্য।
সভায় সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক পবিত্র
সরকার।

প্রকাশন

গত ১৪১২ বঙ্গাব্দের মাঘ-চৈত্র ১১২ বর্ষের
৪র্থ সংখ্যা সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা প্রকাশিত
হয়েছে ১৪১৩ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে।
সংখ্যাটি শুরু হয়েছে মন্মথনাথ বোষকে লেখা
কাব্য ও সাহিত্য জগতের পাঁচজন স্বনামধন্য
ব্যক্তির ছটি পত্র দিয়ে। ‘পত্রলেখকরা হলেন
কামিনী রায়, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, কুমুদরঞ্জন

মল্লিক, রাধারানী দেবী, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত।
পত্রগুলির পবিচিতি লিখেছেন অশোককুমার
রায়। পরবর্তী প্রবন্ধগুলির লেখক যথাক্রমে
বিবেকানন্দ দাশ, অনিমেষকান্তি পাল, মীনা দাঁ,
বিদ্যুৎবরণ চৌধুরী, মনাজ্জলি বন্দ্যোপাধ্যায়,
মহিবুল ইসলাম, জগন্নাথ ঘোষ, সেরিনা
জাহান, অরুণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, পার্থ বসু,
সোমেন ঘোষ, অসীমকুমার মান্না, মলয়শঙ্কর
ভট্টাচার্য্য, সাগর চট্টোপাধ্যায়, রঞ্জনকান্তি জ্ঞান।

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালার অন্তর্ভুক্ত তিনটি
জীবনীগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে: *সুনীতিকুমার
চট্টোপাধ্যায়, বিহারীলাল সরকার* এবং *বিনয়
সরকার*, লিখেছেন যথাক্রমে কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য,
অভিজিৎ রায়, প্রদ্যোৎ ঘোষ। অল্প দিনের
মধ্যেই প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের জীবনী প্রকাশিত হবে।
নতুন বর্ষের অধ্যাপক পকিৎ সরকারের ডুমিকা

সংবলিত *বৌদ্ধগান ও দোহা* গ্রন্থের তৃতীয়
সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশকের নিবেদনে
জ্ঞানানো হয়েছে : 'বর্তমান সংস্করণে প্রথম
সংস্করণের সম্পূর্ণ প্রতিলিপি মুদ্রণ করা
হয়েছে। সেই সঙ্গে সংযোজিত হয়েছে তারাপ্রসন্ন
ভট্টাচার্য্য সংশোধিত পাঠ, বাংলা গদ্যানুবাদ ও
ব্যাখ্যা ও প্রয়াত ড. নীলরতন সেন কৃত
চর্যাগীতি আলোচনা সংক্ষিপ্ত পরিচয় এবং
১৩২২ বঙ্গাব্দের ২য় সংখ্যা সাহিত্য-পরিষৎ-
পত্রিকায় মুদ্রিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'সম্বোধন'
শীর্ষক অভিভাষণ থেকে 'সুচি' অংশটি। এতে
চর্যাগীতির শব্দসমূহকে সংস্কৃত, সংস্কৃত থেকে
উৎপন্ন, পুরনো বাংলা এবং প্রচলিত বাংলা —
এই চারভাগে বিন্যস্ত করা হয়েছে।... ভরসা
করি, বর্তমান সংস্করণ বাংলা সাহিত্যের নিষ্ঠ
ও আগ্রহী পাঠকের প্রয়োজনে লাগবে।'

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ

অক্ষয়কুমার বড়াল গ্রন্থাবলী, সজ্ঞনীকান্ত দাস সম্পাদিত

এষা : ৪০.০০ ● কনকাঞ্জলি : ৮.০০ ● প্রদীপ : ১০.০০ ● বিবিধ (গ্রন্থাকারে অমুদ্রিত ও সম্পূর্ণ
অপ্রকাশিত বিবিধ কবিতাবলী) : ২০.০০ ● ভুল : ৮.০০।

দীনবন্ধু গ্রন্থাবলী ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজ্ঞনীকান্ত দাস সম্পাদিত

কমলে কামিনী নাটক : ১৫.০০ ● জামাই বারিক : ৮.০০ ● দ্বাদশ কবিতা : ৬.০০ ● নবীন তপস্বিনী ১৫.০০
● নীলদর্পণ : ৩০.০০ ● বিয়ে পাগলা বুড়ো : ৬.০০ ● বিবিধ (গদ্য-পদ্য) : ১২.০০ ● লীলাবতী : ২০.০০
● সধবার একাদশী : ২০.০০ ● সুরধুনী কাব্য : ১৫.০০

নবীনচন্দ্র রচনাবলী (৫ খণ্ডে একত্রে) সজ্ঞনীকান্ত দাস সম্পাদিত ৪৫০.০০

১ম খণ্ড : আমার জীবন ৬৫.০০ ● ২য় খণ্ড : আমার জীবন : ৬৫.০০ ● ৩য় খণ্ড : আমার জীবন : ৬৫.০০
● ৪র্থ খণ্ড : অবকাশরঞ্জিনী, পলাশীর যুদ্ধ, রত্নমতী : ১৩০.০০ ● ৫ম খণ্ড : কুরুক্ষেত্র, প্রভাস, রৈবতক :
১৩০.০০ ● পৃথক গ্রন্থ : অবকাশরঞ্জিনী : ৩০.০০ ● কুরুক্ষেত্র : ২৫.০০ ● পলাশীর যুদ্ধ : ৭৫.০০ ●
প্রভাস : ১৫.০০ ● রত্নমতী : ১৫.০০ ● রৈবতক : ১০০.০০।

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনাবলী (১ম খণ্ড), ৫০.০০

ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজ্ঞনীকান্ত দাস সম্পাদিত

(অধুনা দুষ্প্রাপ্য 'বঙ্গবাসী', 'সাহিত্য', 'প্রবাহিনী', 'নায়ক' প্রভৃতিতে প্রকাশিত
রচনাবলীর নির্বাচিত সংগ্রহ)

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা

১ম-২০শ খণ্ড, একত্রে মূল্য ১৩০০.০০

১ম খণ্ড : ১০০.০০ ; ২য় খণ্ড : ১৫০.০০ ; ৩য় খণ্ড : ৯০.০০ ; ৪র্থ খণ্ড : ৯০.০০ ; ৫ম খণ্ড :
৪০.০০ ; ৬ষ্ঠ খণ্ড : ৪০.০০ ; ৭ম খণ্ড : ৩৫.০০ ; ৮ম খণ্ড : ৬৫.০০ ; ৯ম খণ্ড : ৩৫.০০ ; ১০ম
খণ্ড : ৪০.০০ ; ১১শ খণ্ড : ৪০.০০ ; ১২শ খণ্ড : ৬০.০০ ; ১৩শ খণ্ড : ৬৫.০০ ; ১৪শ খণ্ড :
৪০.০০ ; ১৫শ খণ্ড : ৪০.০০ ; ১৬শ খণ্ড : ৪০.০০ ; ১৭শ খণ্ড : ৭০.০০ ; ১৮শ খণ্ড : ৮০.০০ ;
১৯শ খণ্ড : ৮০.০০ ; ২০শ খণ্ড : ১০০.০০।

বঙ্কিমচন্দ্র রচনাবলী ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজ্ঞনীকান্ত দাস সম্পাদিত,

ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলি যদুনাথ সরকারের ভূমিকা সম্বলিত।

১. আনন্দমঠ : ২০.০০ ● ২. ইন্দিরা : ১৫.০০ ● ৩. কপালকুণ্ডলা : ২০.০০ ● ৪. কমলকান্ত : ৫০.০০ ● ৫.
কৃষ্ণকান্তের উইল ৫০.০০ ● ৬. কৃষ্ণবির ১৩০.০০ ● ৭. গদ্যপদ্য বা কবিতা- পুস্তক : ৮.০০ ৮. চন্দ্রশেখর
: ২০.০০ ● ৯. দুর্গেশনন্দিনী ২০.০০ ● ১০. দেবী চৌধুরাণী : ২০.০০ ● ১১. ধর্মতত্ত্ব : ২৫.০০ ● ১২.
বিজ্ঞান রহস্য : ১৫.০০ ● ১৩. বিবিধ : ৪৫.০০ ● ১৪. বিবিধ প্রবন্ধ : ৫৫.০০ ● ১৫. বিঘবৃক্ষ : ২০.০০
● ১৬. মৃণালিনী : ২০.০০ ● ১৭. মুচিরাম শুভের জীবনচরিত : ৬.০০ ● ১৮. যুগলাঙ্গুরায় : ৬.০০ ● ১৯.
রত্না : ১৫.০০ ● ২০. রাজসিংহ : ১২৫.০০ ● ২১. রাধারাণী : ৬.০০ ● ২২. লোকরহস্য : ১৫.০০ ● ২৩.
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা : ২৫.০০ ● ২৪. সীতারাম : ২৭.০০ ● ২৫. সাম্য : ১৫.০০।

বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী (এক খণ্ডে), বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৭০.০০

ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজ্ঞনীকান্ত দাস সম্পাদিত ১২৫.০০।

মধুসূদন গ্রন্থাবলী, ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সঞ্জীকান্ত দাস সম্পাদিত
 ১. একেই কি বলে সভ্যতা? বুড় শালিকের ঘাড়ে রৌ : ৩০.০০ ● ২. কৃষ্ণকুমারী নাটক : ২০.০০
 ● ৩. চতুর্দশপদী কবিতা : ২০.০০ ● ৪. তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য (৫ম মুদ্রণ) : ৮.০০ ● ৫. পদ্মাবতী
 নাটক : ১০.০০ ● ৬. বিবিধ কাব্য (৫ম সং) : ৮.০০ ● ৭. বীরাক্ষনা কাব্য : ২০.০০ ● ৮. ব্রজাক্ষনা
 কাব্য : ৮০.০০ ● ৯. মারাক্ষনন : ১০.০০ ● ১০. মেঘনাদবধ কাব্য : ৮০.০০ ● ১১. শর্মিষ্ঠা
 নাটক : ২০.০০ ● ১২. হেক্টর বধ (৫ম মুদ্রণ) : ১৫.০০।

রামেন্দ্র রচনাবলী (৬ খণ্ডে কগজে বাঁধাই একত্রে) ৩০০.০০
 ১ম খণ্ড : প্রকৃতি, জিজ্ঞাসা, বঙ্গলক্ষীর ব্রতকথা : ৫৫.০০ ● ৩য় খণ্ড : শব্দকথা, বিচিত্রজগৎ,
 যজ্ঞকথা : ৫৫.০০ ● ৫ম খণ্ড : ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৫৫.০০ ●
 ৬ষ্ঠ খণ্ড : বিবিধ রচনা : ৫৫.০০।

রামেন্দ্র রচনা সংগ্রহ (শতবার্ষিকী সংস্করণ) ৭০.০০
 সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও অনিলকুমার কাঞ্জিলাল দাস সম্পাদিত,
 (৪০টি মূল্যবান প্রবন্ধ, রামেন্দ্রসুন্দরের জীবনী এবং তথ্যপূর্ণ ভূমিকা সহ সুদৃশ্য বাঁধাই)

হেমচন্দ্র গ্রন্থাবলী, সঞ্জীকান্ত দাস সম্পাদিত
 ১. আশাক্ষনন : ১৫.০০ ● ২. কবিতাবলী (১ম ও ২য়) : ২৫.০০ ● ৩. চিত্তবিকাশ : ১৫.০০ ●
 ৪. চিত্তান্তরঙ্গিণী : ৬.০০ ● ৫. দশমহাবিদ্যা : ৬.০০ ● ৬. বিবিধ : ২০.০০ ●
 ৭. কৃত্তসংহার কাব্য : ৩০.০০।

চৈতন্য প্রসঙ্গ, জগদীশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত ৭০.০০
 বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস (১৭৯৫-১৮৭৬) ৬ষ্ঠ সং ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : ১০০.০০

(১৭৯৫ হইতে ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলা দেশের শব্দের ও সাধারণ নাট্যশালার ইতিহাস।
 সচিত্র। নাট্যসাহিত্যের নির্ভরযোগ্য পুস্তক। রবীন্দ্র-পুরস্কার প্রাপ্ত।)

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ইতিহাস : প্রথম পর্ব (১৩০০-১৩০১) মদনমোহনকুমার
 সংকলিত

সংবাদপত্রে সেকালের কথা (সচিত্র), ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

১ম খণ্ড : ২৫০.০০ ● ২য় খণ্ড : ১৮৩১-৪০ (৫ম মুদ্রণ) : ১৭৫.০০

পদকল্পতরু সতীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত ১ম খণ্ড ৩০০.০০

নতুন সংস্করণের ভূমিকা : অধ্যাপক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতকোষ (বাংলা কোষগ্রন্থ)

(সম্পূর্ণ ৫ খণ্ড। সেট ৯০০.০০)

১ম খণ্ড : (২য় মুদ্রণ) ২৫০.০০ ● ২য় খণ্ড : ১৭৫.০০ ●

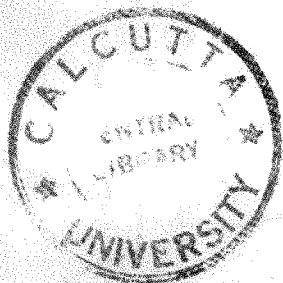
৩য় খণ্ড : ১৭৫.০০ ● ৪র্থ খণ্ড : ১৫০.০০ ●

৫ম খণ্ড : ২০০.০০

০৭/০৫/০৩
CALCUTTA UNIVERSITY

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

১১৩ বর্ষ ৩-য় সংখ্যা • কার্তিক-পৌষ ১৪১৩



পত্রিকাধ্যক্ষ
প্রভাতকুমার দাস



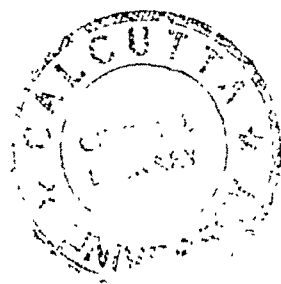
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

২৪৩/১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড

কলকাতা ৭০০ ০০৬

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

১১৩ বর্ষ ৩-য় সংখ্যা • কার্তিক-পৌষ ১৪১৩



পত্রিকাধ্যক্ষ
প্রভাতকুমার দাস



বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩/১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড,
কলকাতা ৭০০ ০০৬

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

১১৩ বর্ষ ৩-য় সংখ্যা কার্তিক-পৌষ ১৪১৩

Sahitya-Parisat-Patrika

Vol. 113. No. 3 Kartik-Pous 1413

(Published on Pous 1413, January 2007)

প্রকাশ : পৌষ ১৪১৩

প্রকাশক :

শ্রীরমাকান্ত চন্দ্রবর্তী

সম্পাদক, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

২৪৩/১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা ৭০০ ০০৬

বণিকিন্যাস ও মুদ্রণ :

সার্ভিস প্রিন্টার্স

৫৫/৬৪ কালীচরণ ঘোষ রোড, কলকাতা-৭০০ ০৫০

দাম : ৫০.০০ টাকা

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

১১৩ বর্ষ ৩-য় সংখ্যা • কার্তিক-পৌষ ১৪১৩

সূচিপত্র

লেখক পরিচিতি

পত্রিকা প্রসঙ্গ • প্রভাতকুমার দাস

বাংলা সাহিত্য : ভবিষ্যতের ভাবনা • অশুকুমার সিকদার ১

যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য : বাংলা পুথির তালিকা সম্বন্ধে • রমাকান্ত চক্রবর্তী ১২

ক্যাটালোগোরাম ও যতীন্দ্রমোহন • অমিয়শঙ্কর চৌধুরী ১৭

জীবক-চরকদের ঐতিহ্যের ধারায় • জ্যোতিষ্ময়ণ চাকী ৩১

সঞ্জয়নী ধনিসন্নিবেশ ও বাংলা অর্ধস্বর [য়] • মীনা দী ৩৪

প্রাক-স্বাধীনতা পূর্বে মহিলা সম্পাদিত সাময়িকপত্র • গীতা চট্টোপাধ্যায় ৫১

রাধারানী দেবীর শরৎচন্দ্র • অমিয় দেব ৬৩

ছন্দোয়ন কবির : প্রসঙ্গ রাজনীতি, ভারতীয়ত্ব এবং বাঙালিত্ব • আবদুর রাউফ ৭০

বাংলা ভাষার আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চা • শ্যামলী সুর ৭৮

ফকির বিদ্রোহের চার নায়ক • আনন্দ ভট্টাচার্য ৮৪

পরিষৎ-সংবাদ • প্র. ৯৩

লেখক পরিচিতি

অমিয় দেব (১৯৩৪-) বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি থেকে পূর্বে প্রকাশিত হয়েছে *সুধীন্দ্রনাথ দত্ত*, গত বছর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সাহিত্য-সাধক-চরিতমালার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে *বুদ্ধদেব বসু*।

অমিয়শঙ্কর চৌধুরী (১৯৪০-) ভারত সরকারের কোম্পানি আইন দপ্তরে চাকরি করে বর্তমানে অবসর প্রাপ্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ : *মুসলিম কবিদের শ্যামসংগীত*; *হাসন রাজার সংগীতমালা*; *বাংলা শাক্ত ভাবনায় মুসলমান কবি*।

অশুকুমার সিকদার (১৯৩২-) উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন প্রধান অধ্যাপক। প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে কয়েকটি : *চোখের দুই তারা*; *ভাঙ্গা বাংলা ও বাংলা সাহিত্য*।

আনন্দ ভট্টাচার্য (১৯৬১-) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লেখাগারের মুখ্য লেখাগারিক। বর্তমানে আঠারো শতকের সম্মাসী ফকির বিদ্রোহ ও সর্ব ভারতীয় প্রেক্ষাপটে মাদারি সুফি সিলসিলার বিষয়ে দুটি গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করছেন।

আবদুর রাউফ (১৯৪৭-) চতুর্ভুজ পত্রিকার সম্পাদক। প্রকাশিত গ্রন্থ : *মুক্তমনের সংকট*; *গণতন্ত্র ও সংখ্যালঘু সমস্যা*; *বিভাগোত্তর পর্যায়ে ভারতবর্ষের মুসলমান*।

গীতা চট্টোপাধ্যায় (১৯৩৫-) যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের অবসরপ্রাপ্ত বরিষ্ঠ সহযোগী গ্রন্থাগারিক। *গ্রন্থাগারিক পত্রিকায়* প্রাক্তন সহ সম্পাদক। তিন খণ্ডে *বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জি* ছাড়াও প্রীতি মিত্রর সঙ্গে *প্রবাসী-র সম্মিলিত সূচি* (১৩০৮-১৩৩৩) প্রকাশিত হয়েছে।

জ্যোতিভূষণ চাকী (১৯২৫-) সম্প্রতি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সাম্মানিক ডি.লিট. উপাধি প্রদান করেছে। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির প্রস্তুতমান চারটি ভাষার একটি অভিধান প্রণয়নে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ*; *বাগর্থ কৌতুকী* তাঁর দুটি উল্লেখ্য গ্রন্থ। পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রদত্ত — বিদ্যাসাগর পুরস্কার পেয়েছেন।

মীনা দী (১৯৫৮-) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষাতাত্ত্বিক বিভাগের রিডার। প্রকাশিত গ্রন্থ : *দ্য ফোনীমিক এন্ড ফ্রিকোয়েন্সিজ অফ দ্য বেঙ্গলি ল্যাঙ্গোয়েজ*; *সাম ইস্যুজ ইন মেট্রিক্যাল ফোনোলজি অব বাংলা : দ্য ইন্ডিজিনাস রিসার্চ ট্রাডিশন*।

রমাকান্ত চক্রবর্তী (১৯৩২-) এশিয়াটিক সোসাইটি ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক। *বঙ্গে সমাজ ও ধর্ম* তাঁর সর্ব শেষ প্রকাশিত গ্রন্থ।

শ্যামলী সুর (১৯৫০-) বেথুন কলেজের ইতিহাস বিভাগের প্রধান। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'বাজালির ইতিহাস চিন্তার বিকাশ ও জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ১৮৭১-১৯১২' বিষয়ে গবেষণা করে পি. এইচ. ডি. পেয়েছেন।

পত্রিকা প্রসঙ্গ

১৩

সময়ের কাছে এসে সাক্ষ্য দিয়ে চলে যেতে হয়
কী কাজ করেছি আর কী কথা ভেবেছি।

—জীবনানন্দ দাশ

পাঁচ বছর আগে যখন বর্তমান পত্রিকার অধ্যক্ষ পদে দায়িত্বভার গ্রহণ করার সুযোগ হয়, তখন মুদ্রাণাধীন ‘আচার্য সুকুমার সেন জন্মশতবর্ষপূর্তি সংখ্যা’ প্রকাশ করার পাশাপাশি যে বড়ো কর্তব্যটি সম্পাদনের বিষয়টি মাথা পেতে নিতে হয়েছিল— তা হল পত্রিকার পিছিয়ে পড়া তিনটে বছর পূরণ করা। পূর্বোক্ত বিশেষ সংখ্যাটি ১০৬ বর্ষের অখণ্ড সংখ্যা ধরে, ১৪০৯ বঙ্গাব্দেই যথাক্রমে ১০৭ এবং ১০৮ বর্ষের জন্য একটি করে অখণ্ড সংখ্যা প্রকাশের মধ্য দিয়ে পুরোনো বছর পূর্ণ করা সম্ভব হয়েছিল এক বছরেই। ১৪১০-এ পৌছেও ১০৯ বর্ষ পূরণ করা হয়েছে দুটি যুগ্ম সংখ্যা প্রকাশ করে, কিন্তু একই চলতি বছরের আরো দুটি সংখ্যাও প্রস্তুত করা গিয়েছিল যার প্রথমটি ১-২ যুগ্ম, কিন্তু ৩-য়টি স্বতন্ত্র সংখ্যা হিসেবে। আলোচ্য বর্ষের ৪র্থ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল পাঁচ মাসের ব্যবধানে। তারপর থেকে একেবারে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই হয়তো সংখ্যাগুলি প্রকাশ করা যায়নি। কিন্তু একটি করে যুগ্ম সংখ্যা নিয়ে হলেও ১১১ এবং ১১২ বর্ষ পূর্ণ হয়েছে। ১১৩ বর্ষও যুগ্ম হিসেবে শুরু করেও, নির্দিষ্ট সীমার মধ্যেই ৩-য় সংখ্যা প্রকাশ করা সম্ভব হল। এই সংখ্যার পর থেকে দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন নতুন অধ্যক্ষ শ্রীসুবিমল মিশ্র, বিদায় লগ্নে তাঁকে স্বাগত জানাই।

তারপর মোট ষোলোটি সংখ্যা প্রকাশ করা কিংবা পাঁচ বছর কর্মকালের সীমা অতিক্রম করা যে কোনো অধ্যক্ষের পক্ষেই অত্যন্ত গৌরবের। তবে একথাও উল্লেখ করতে হয়, এরকম ধারাবাহিক কাজ সবসময় সকলের পক্ষেই সবটাই সুখের হয় না। তবু অস্বীকার করা যায় না, নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছে এই সময়-পর্বটির বেশির ভাগটাই আনন্দের কেননা, যে কোনো মানুষের জীবনচক্রে কাজের পরিচয়টাই খেঁচে থাকে—দুঃখিত মুহূর্তেও সেটাই একমাত্র সাধনা হয়ে দেখা দেয়। কৃতবিদ্য লেখক, উৎসাহদাতা প্রবীণ কিংবা সহমর্মী সমসাময়িক এবং প্রতিশ্রুতিবান নবীনদের সহযোগ—সবদিক থেকেই, সফলপ্রসূ হয়েছে বলেই এ-কাজে লগ্ন থাকা সহজ হয়েছে। সর্বোপরি

স্বীকার করতেই হয় পরিষদের কার্যকরী সমিতির আনুকূল্য না পেলে এই কার্যকাল সম্পূর্ণ করা অসম্ভব হত। এঁদের প্রশংসাময় সাহচর্যের পাশাপাশি একথাও সবিনয়ে উল্লেখ করতে হয়, পত্রিকার গুণগত মানের প্রসঙ্গ তুলে যারা নিজেদের অসন্তোষের কথা বলেছেন, তাঁদের কাছেও আমি কৃতজ্ঞ। এই উপলক্ষে এই পর্যায়ের পত্রিকার কর্মধারার প্রতি সন্তুষ্ট আর অসন্তুষ্ট উভয় পক্ষকেই আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাই।



বিগত সংখ্যা প্রকাশের পর সাহিত্যজগতে যে-কটি দুঃখের প্রমাণ ঘটেছে তার কয়েকটি উল্লেখের সূত্রে প্রথমেই মনে পড়ছে বরা বসুকে। তদনীন্তন পূর্ববঙ্গের ঢাকার নারায়ণগঞ্জে ১৯৩৮-এর ৫ সেপ্টেম্বর তাঁর জন্ম। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের ছাত্রী ‘কেশবচন্দ্র সেন ও তৎকালীন বঙ্গ সাহিত্য’ বিষয়ে গবেষণা করে পি. এইচডি ডিগ্রি পেয়েছেন ১৯৭৬-এ। ১৯৬১ থেকে তিনি কলকাতার সরোজিনী নাইডু কলেজে অধ্যাপনা করেছেন। রুশ ভাষাতে ডিপ্লোমা অর্জন করেছিলেন ১৯৬৪-তে। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে কয়েকটি উল্লেখ : *উনিশ শতকে বাংলা সাহিত্যে কেশবচন্দ্র সেন* ; *বাংলা সাহিত্যের কালান্তর* ; *কবি নজরুল সমকালের ও চিরকালের* ; *ভারত পথিক লিও টলস্টয়* ; *কেশবচন্দ্র সেন ও তৎকালীন ব্রাহ্ম সমাজ* । বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সাহিত্য-সাধক-চরিতমালার জন্য লিখেছিলেন *ক্ষিতিমোহন সেন* । তাঁর সম্পাদিত ও অনূদিত গ্রন্থগুলির জন্যও তিনি বিশেষ পরিচিতি লাভ করেছেন। দূরদর্শনের জন্য টলস্টয়ের উপর একটি তথ্যচিত্রের চিত্রনাট্য রচনা করেছিলেন। দীর্ঘ রোগভোগের পর কলকাতায় তিনি প্রয়াত হয়েছেন ৬ নভেম্বর ২০০৬।

গত শতকের পঞ্চাশের দশকে বাংলা কাব্যজগতে নিষ্ঠুতচারী নিম্নকণ্ঠের কবি হিসেবে খ্যাতি পেয়েছিলেন বিনয় মজুমদার। জীবনানন্দ দাশের পরে বাংলা কবিতায় তাঁর স্বর পাঠকের মনে নতুন অভিজ্ঞতা বহন করে এনেছিল। অনেকটা স্বগতোক্তির ধরনে লেখা কবিতার মতোই রহস্যাবৃত ছিল তাঁর ব্যক্তিগত জীবনচরিত। ‘এ জীবন’ নামের একটি কবিতায় তিনি লিখেছিলেন : ‘পৃথিবীর ঘাস, মাটি, মানুষ, পশু ও পাখি—সবার জীবনী লেখা হলে/আমার একার আর আলাদা জীবনী লেখা না হলেও চলে যেত বেশ।’ ১৯৩৪-এর ১৭ সেপ্টেম্বর ব্রহ্মদেশে (বর্তমান মায়ানমারের) মিকটিলা জেলার তেডো শহরে বিনয় জন্মেছিলেন। শৈশব অতিবাহিত হয়েছে অবিভক্ত বাংলার ফরিদপুরে। সেই মহকুমা শহরে গোপালগঞ্জের কাছে বৌলতলী উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে ছাত্রদের সাহিত্য পত্রিকায়, তাঁর কবিতা প্রথম মুদ্রিত হয়। ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে বাবা-মা বিপিনবিহারী-বিনোদিনীর সঙ্গে ঠাকুরনগরে এসে বসবাসের শুরু। মেধাবী বিনয় প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে আই এসসি পাশ করে শিবপুর বি ই কলেজ থেকে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হয়েছিলেন। কিছুদিন চাকরিও করেছেন নানা সংস্থায়, অধ্যাপনা করেছেন অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব পাবলিক হেলথ অ্যান্ড হাইজিন-এ, পরে আই এস আই-এ ডেভলপমেন্ট ইঞ্জিনিয়ার হন, তারপর চলে যান, ত্রিপুরায় সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়াতে—সে চাকরি বিরক্তিকর মনে হওয়ায় দুর্গাপুরে অন্য একটি কাজ নেন। রুশ ভাষার অনেক সাহিত্য বাংলায় অনুবাদ করেছেন। কবিতার মতো গণিতেও তাঁর পারদর্শিতা ও আগ্রহ ছিল অকৈশোর, কবিতার

পঙক্তিতে অঙ্কের কোনো সূত্র বা প্রসঙ্গ স্বতঃস্ফূর্তভাবে উচ্চারণ করেছেন বারবার। তাঁর একটি কাব্যগ্রন্থের নাম *আমিই গণিতের শূন্য*। পঞ্চাশের দশকের শেষের দিকে প্রথম কবিতার বই *নক্ষত্রের আলোয়* প্রকাশিত হলেও, ১৯৬১-তে *গায়ত্রীকে* এবং ১৯৬২-তে *ফিরে এসো ঢাকা* তাঁকে আধুনিক কবি সমাজে দ্রুত প্রতিষ্ঠা এনে দেয়। একসময় কলেজ স্ট্রিট কফি হাউস তাঁর ঠিকানা হিসেবে প্রচারিত হত। জটিল মানসিক ব্যাধিতে মাঝে মাঝে অসুস্থ থাকলেও তাঁর কবিতার বই প্রকাশিত হয়েছে ধারাবাহিক ভাবে—*ঈশ্বরীর কবিতাবলি*; *অদ্বানের অনুভূতিমালা*; *বাস্মীকির কবিতা*; *আমাদের বাগানে*; *আমাকেও মনে রেখো*; *এখন দ্বিতীয় শৈশব*, *কবিতা বুঝিনি আমি*; *শিমূলপুরে লেখা কবিতা*; *একা একা কথা বলি*; *পৃথিবীর মানচিত্র*। *কাব্যসমগ্র*-র জন্য রবীন্দ্র পুরস্কার (২০০৫) এবং *হাসপাতালে লেখা কবিতাগুলি* গ্রন্থের জন্য পেয়েছেন সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার (২০০৫)। কোনো পুরস্কারই তিনি নিজ হাতে গ্রহণ করেননি। কাব্যগ্রন্থের বাইরে তাঁর *ঈশ্বরীর স্বরচিত নিবন্ধ ও অন্যান্য*; *নির্বাচিত প্রবন্ধ*; *ধূসর জীবনানন্দ* ছাড়াও *ছোটগল্প* এবং *ডায়েরি* প্রকাশিত হয়েছে পৃথকভাবে। ‘একদিন পালকের মতো ঝরে যাবে’—সাতাশ বছর বয়সে লেখা সেই ভয় সত্য হল, তাঁর বাহান্তর বছরে পৌঁছে। বিশেষ করে তরুণ কবিমহলে আদৃত বিনয় মজুমদার অর্ধকণ্ঠে এবং স্নায়ুরোগে আক্রান্ত হয়ে নিজের উত্তর চব্বিশ পরগনার ঠাকুরনগরের বাড়িতে প্রয়াত হয়েছেন গত ১১ ডিসেম্বর ২০০৬-এ।

কয়েকদিন পরে ১৩ ডিসেম্বর ২০০৬-এ ছিয়াশি বছর বয়সে চলে গেলেন কবি গোলাম কুদ্দুস, যিনি *ইলা মিত্র* নামে কবিতা লিখে দীর্ঘস্থায়ী জনপ্রিয়তার অধিকারী হয়েছিলেন। সে সময় লোকের মুখে মুখে ফিরত তাঁর কবিতার পঙক্তি : ‘ইলা মিত্র স্টালিন নন্দিনী/ইলা মিত্র তোমার আমার/সংগ্রামের সূতীক্ষ্ণ বিবেক।’ ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের ২০ জানুয়ারি তিনি জন্মেছিলেন বর্তমান বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার গাট্টি গ্রামে। পৈতৃক নিবাস কুষ্টিয়ার ধলনগরে। প্রেসিডেন্সি কলেজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের মেধাবী ছাত্র কুদ্দুস সাহেব, নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনে যোগ দিয়ে স্বাধীনতা আন্দোলনে এবং ফ্যাসি বিরোধী আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন প্রথম যৌবনে। ট্রেড ইউনিয়ন ও কৃষকসভার পাশাপাশি প্রগতি লেখক সঙ্ঘ এবং রুশ ভারত মৈত্রী সমিতির নানা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র *স্বাধীনতা* পত্রিকার সাংবাদিকতায় হাতে খড়ি হয়েছিল, *পরিচয়* এবং *কালান্তর* পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ছিলেন দীর্ঘদিন। তাঁর কাব্যগ্রন্থ : *বিদীর্ণ*; *ইলা মিত্র*; *নাচে মন ময়ূর*; *স্বচ্ছাবন্দী* এবং উপন্যাস : *মরিয়ম*; *বাদী*; *লেখা নেই স্বর্গাঙ্করে*; *ইরাকে ঈগল*; *উজানিয়া*; *জগৎজয়ের যাত্রী*; *নব রামায়ণ*; *যুগ সন্ধিক্ষণ*; *সম্বোধন*; *সুরের আগুন*। সাহিত্যকৃতির জন্য *মুজফ্ফর আহমেদ স্মৃতি পুরস্কার* (২০০৩) এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বঙ্গিকম পুরস্কার (১৯৮৮), নজরুল পুরস্কার (২০০৪) পেয়েছেন।



স্থানাভাবে প্রাপ্ত অনেক লেখাই এ-সংখ্যায় দেওয়া সম্ভব হয়নি। আশা করি প্রেরিত অমুদ্রিত রচনার সংশ্লিষ্ট লেখকরা নতুন অধ্যক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে সে-বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারবেন।

পরিশেষে আনন্দের সঙ্গে উল্লেখ করছি, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচ্চ শিক্ষা দপ্তর বর্তমানে

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অনেক ব্যাপারেই আগ্রহ দেখাচ্ছেন, বিশেষ করে পত্রিকা প্রকাশ যাতে কোনোভাবে ব্যাহত না হয় সে বিষয়ে তাঁরা আমাদের আবেদনে সানুগ্রহ সাড়া দিয়ে আর্থিক অনুদান দিচ্ছেন— এ জন্য তাঁদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। বিদ্যায়ী অধ্যক্ষের কাছে সবচেয়ে সাফল্যময় আনন্দের স্মৃতি, মান কিংবা পরিসর দেখেই পত্রিকাটিকে নিয়মিত রাখার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয়ভার তাঁরা অনুমোদন করেছিলেন। এর বাইরে পত্রিকার বিশেষ একটি সংখ্যা এবং পুরোনো রচনার পৃথক সংকলন গ্রন্থ প্রকাশের ব্যাপারেও তাঁদের উৎসাহ ও আর্থিক সহায়তার কথা নিঃসন্দেহে বিশেষ উল্লেখ্য ঘটনা। তাছাড়া পত্রিকার আর্থিক সাশ্রয় হবে ভেবে বিভিন্ন সংস্থাও বিজ্ঞাপন দিয়েছেন নানা সময়ে, সেই সাময়িক উপকারের কথাও আমরা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি।



চলার পথে যাঁরা এতদিন সঙ্গে থেকেছেন, উৎসাহ দিয়েছেন, আমার যাবতীয় অসম্পূর্ণতা ও ব্যর্থতা সহমর্মিতার সঙ্গে বিবেচনা করেছেন, পরামর্শ দিয়েছেন— তাঁদের সকলকেই আমার সকৃতজ্ঞ নমস্কার জানাই।

২৫ পৌষ ১৪১৩

প্রভাতকুমার দাস
পত্রিকাধ্যক্ষ

বাংলা সাহিত্য : ভবিষ্যতের ভাবনা

অশুকুমার সিকদার

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সংবিধান অনুসারে এই মহৎ প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ‘বঙ্গভাষার ও বঙ্গসাহিত্যের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধন।’ মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী একবার প্রতিষ্ঠা দিবসের বক্তৃতায় বলেছিলেন, ‘বাংলাদেশবাসী দশজন লোক একত্র হইয়া, বাংলা-সাহিত্যের আলোচনা যেখানে করে, তাহার নাম বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ।’ দশজন বাঙালি যাতে একত্র হয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিষয়ে আলোচনা করতে পারে, রাজনারায়ণ বসুর ভাষায় বাঙালি যাতে ‘মাতৃভাষার অনুশীলন’ করতে পারে, সেইজন্য বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীতে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ সব সময়ে চেয়েছিল তাদের শাসনাধীন উপনিবেশগুলির মানুষেরা তাদের নিজস্ব ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি ভুলে যাক। যে-সব দেশের মানুষ নিজেদের ভাষা ও পরম্পরা তথা আত্মপরিচয় ভুলে যায়, তাদের শাসন করা সহজ হয়। ইংরেজের দাপটে ও ইংরেজির প্রভাবে আয়ারল্যান্ডের মানুষ উনবিংশ শতাব্দী নাগাদ তাদের নিজস্ব ভাষা ভুলে যেতে বাধ্য হয়। একই পরিস্থিতি হয়েছিল পরবর্তীকালে লেবানন, আলজিরিয়া, টিউনিসিয়া, সেনেগাল, মরক্কোর। আফ্রিকার অধিকাংশ মৌখিক ভাষার যেহেতু কোনো লিপি ছিল না, ছিল না কোনো লিখিত সাহিত্য, সেই কারণে এইসব লিপিবহীন ভাষাগুলিকে ধ্বংস করা, ধ্বংস করা সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের পক্ষে খুব সহজ হয়েছিল। সেইসব দেশের শিক্ষিত মানুষের ভাষা হয়ে গিয়েছিল আধিপত্যকারী প্রভুদের ভাষা— ইংরেজি, ফরাসি অথবা জার্মানি। দীর্ঘ দিনের Great Tradition ও Little Tradition-এ সমৃদ্ধ ভারতবর্ষে সাম্রাজ্যবাদী প্রভুদের এই উদ্যোগ সফল হয় নি, মেকলেদের আগ্রহ ও উদ্যোগ সত্ত্বেও। ইংরেজি ভাষার প্রসারকে উপনিবেশ-বিস্তারের দিনগুলিতে মনে করা হয়েছিল সভ্যতারই বিস্তার। ভারতবর্ষের ইংরেজিশিক্ষিত মানুষ কিন্তু এই চেষ্টার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ রচনা করেছিলেন। ১৮৩৮ সালের জুন মাসে সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভায় উদয়চন্দ্র আঢ্য বলেন, ‘মনুষ্যের কর্মদক্ষতাই প্রাধান্যের কারণ.... এমত জ্ঞানিবেন যে, দেশের মনুষ্য সেই দেশের ভাষায় কর্মদক্ষ হইলে পরাধীন দাসত্বের কারণচ্যুত হইয়া স্ব স্ব প্রধান হইতে পারেন....।’ রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের সঙ্গে ভাষার স্বাধিকার অর্জন যে সম্পর্কযুক্ত, এই কথা উদয়চন্দ্র উপলব্ধি করেছিলেন; বুঝেছিলেন ভাষার স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামও এক রাজনৈতিক সংগ্রাম। উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা ভাষাসাহিত্য বাঁচানোর ও তার শ্রীবৃদ্ধির

আন্দোলন ছিল স্বাধীনতাযুদ্ধের আন্দোলনের অংশ। তারই প্রেরণায় মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজি বর্জন করে বাংলায় সৃজনশীল সাহিত্য রচনায় ব্রতী হন। সেই আন্দোলনেরই পরিণামে প্রতিষ্ঠিত হয় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ।

যে-স্বাদেশিকতার প্রেরণায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠা ও বিকাশ, স্বাধীনতালাভের পর সেই স্বাদেশিকতার প্রয়োজন আর নেই বলেই কি রাজনৈতিক স্বাধীনতালাভের পর সেই প্রেরণা নিষ্প্রাণ স্তিমিত হয়ে গেল? পরিষদের অশীতিতম প্রতিষ্ঠাদিবস উৎসবে, স্বাধীনতার পঁচিশ বছর পরে, আমাদের মাস্টারমশাই অধ্যাপক সুকুমার সেন ‘পরিষদের বর্তমান হীনাবস্থা’ নিয়ে আক্ষেপ করেছিলেন। এই ‘অন্ধকারের কথা’ বলতে গিয়ে তিনি যেন বাড়তি জোর দিয়ে বলেছিলেন, ‘বাঙালির বাঙালিত্ব কখনও লুপ্ত হবে না। যেদিন হবে সেদিন বাঙালি জাতি লোপ পাবে। সেদিন সাহিত্য পরিষদের প্রয়োজন থাকবে না।’ এমন কথা কেন বলেছিলেন আচার্য সুকুমার সেন? বাঙালির বাঙালিত্ব, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, তার সঙ্গে বাঙালির সারস্বত প্রতিষ্ঠান বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অস্তিত্ব-সংকটাপন্ন হতেও পারে এমন ভবিষ্যতের ভাবনা কি তাঁর মনে উঁকি দিচ্ছিল?

বাঙালির বাঙালিত্বের প্রধান উপাদান বাংলা ভাষা। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন নানা খণ্ডতার মধ্যেও বাংলার ইতিহাসে যে ‘এক ঐক্যের ধারা চলে এসেছে সে ভাষার ঐক্য নিয়ে। আমাদের যে বাঙালি বলা হয়েছে তার সংজ্ঞা হচ্ছে, আমরা বাংলা বলে থাকি।’ আর ভাষা দিয়েই তো গড়া হয় সাহিত্য। সেই বাঙালির ভাষা তথা তার সাহিত্য সম্বন্ধে কিছু উদ্বেগের কারণ আমাদের মনে ইদানীং জন্মেছে। বাংলার বাইরে, ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলে যে-সব বাঙালি বাস করতেন তাঁদের প্রবাসী বাঙালি বলা হতো। বিহারে, ওড়িশায়, উত্তরপ্রদেশে, দিল্লিতে বসবাসকারী সেই বাঙালিদের মধ্যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ব্যাপক চর্চা ছিল। উত্তর প্রদেশের বিহারের কিছু কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগ আছে, কিন্তু এখন নামমাত্র আছে। বিভাগগুলি এখন আর সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা পায় না, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের আনুকূল্য পায় না। ছাত্ররাও বাংলা পড়তে আসছে না। ওইসব রাজ্যে জীবিকার ক্ষেত্রে বাংলা কোনো কাজে লাগে না। হিন্দিবলয়ে জীবিকার প্রয়োজনে বাঙালি হয় হিন্দিতে অথবা ইংরেজিতে পড়াশুনো করে। বিহারে বাংলার প্রচলন আজ স্তিমিত। পাটনাতে, দিল্লিতে বাংলা মাধ্যম বেশকিছু মাধ্যমিক ইন্সকুল বাঙালিরা এক সময়ে গড়ে তুলেছিলেন, কিন্তু এখন সেইসব শহরে বাংলা মাধ্যম বিদ্যালয় একটাও নেই। ঝাড়খণ্ডে সম্প্রতি বাংলাকে দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে স্বীকৃতির কথা হয়েছে বটে, কিন্তু সেই প্রস্তাব এখনও বিধানসভায় অনুমোদিত হয় নি। আর উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তকের অভাবে সেই সিদ্ধি বাস্তবে রূপায়িত করা কঠিন হতে পারে। অন্যদিকে রাঁচি, চাইবাসা, হাজারিবাগের পুরোনো পাঁচটি বাঙালি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আর্থিক সংকটে জেরবার। এইভাবে মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, ঝাড়খণ্ডে, বিহারে, উত্তরপ্রদেশে, দিল্লিতে যে বিপুল সংখ্যক বাঙালি বাস করেন, তাঁরা ভাষাগত পরিবেশের কারণে, বাড়িতে ভাষা বাংলা বললেও, কার্যত হিন্দিভাষী হয়ে যাচ্ছেন। তাঁদের বর্তমান প্রজন্মের মানুষ বেশির ভাগ ক্ষেত্রে, অভিনেতা রাহুল বসুর মতো, বাংলা বলতে পারলেও বাংলা পড়তে বা লিখতে পারে না। বাংলা ভাষা যেহেতু তারা গড়তেই পারে না, সেই কারণে বাংলা সাহিত্য নিয়ে তাদের শিরঃপীড়া নেই।

দেশভাগের পরবর্তী সময়ে বহু ছিন্নমূল উদ্বাস্তু বাঙালিকে ভারতবর্ষের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে

দেওয়া হয়েছিল। এই মানুষগলি হতে পারতো বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ধারক ও বাহক। কিন্তু ১৯৫৮ সালের ১৯ মার্চ তারিখের লোকসেবক পত্রিকায় উদ্বেগ প্রকাশ করে যে-কথা বলা হয়েছিল, এইসব ছিন্নমূল মানুষকে অন্যভাষাভাষী অঞ্চলে পুনর্বাসন দিলে 'ক্রমে ইহারা বাংলা ভাষাও ভুলিয়া যাইবে', এই কথাটাই সত্য হয়ে গেল। ছত্তিশগড়ে, ওড়িশায়, বিহারে, উত্তরাঞ্চলে যাদের পুনর্বাসিত করা হয়েছিল, ভাষাগত পরিবেশের বিরুদ্ধতায় তাদের উত্তরপুরুষেরা বাংলা ভাষা ভুলে যেতে বসেছে। আন্দামানে পুনর্বাসিত বাঙালির আগামী প্রজন্মের বড়ো অংশই মাতৃভাষা হারিয়ে আত্মপরিচয়হীন, যেন অনিকেত জাতিতে পরিণত হতে পারে। যদি দেশভাগ না হতো, এইসব বাঙালি যদি থেকে যেতে পারত পূর্ব বাংলার নিজস্ব ভিটেমাটিতে, তাহলে তারা থেকে যেতো বাংলা ভাষার মানচিত্রের মধ্যে। তারা হয়ে উঠতো একদিন বাংলা সাহিত্যের পাঠক, দু-চারজন হয়তো বাংলা সাহিত্যের লেখক। কিন্তু দেশভাগের ফলে তারা শুধু বাত্মভিটে হারালো না, হারালো না শুধু তাদের নদী-নৌকা-ধানখেতের দৃশ্যপট, হারালো তাদের মাতৃভাষাও। বাংলা সাহিত্য এই বিপুল সংখ্যক বাঙালিকে তার পাঠক হিসেবে পেল না।

পশ্চিম বাংলায় এখন প্রায় শতকরা সত্তরজন সাক্ষর। স্বাধীনতার সময় এই সাক্ষরের সংখ্যা ছিল চারভাগের এক ভাগ। চারগুণ সাক্ষর বেড়ে যাওয়ায়, ইন্সকুল কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা অনেকগুণ বেড়ে যাওয়ায় প্রত্যাশিত ছিল বইপড়ুয়ার সংখ্যা বহুগুণ বেড়ে যাবে। সাক্ষর বা তথাকথিত শিক্ষকের সংখ্যা বাড়লেও বইপড়ুয়ার সংখ্যা যে সমান তালে বাড়েনি তার প্রমাণ প্রকাশকদের অভিজ্ঞতা। আর বই বিক্রি কম বলে বইয়ের দাম বাড়ে, আবার বইয়ের দাম বাড়ে বলে বইয়ের বিক্রি কমে। বইকে এমন অপরিহার্য বস্তু মনে করা হয় না যে, অন্য খরচ কমিয়ে বই কেনা হবে। ফোটোকপির দৌলতে বই না কিনলেও কাজ চলে যায়। শিক্ষাবিস্তারের ফলে সংগতভাবে শিক্ষার অঙ্গনে প্রবেশের সুযোগ পেয়েছে অনগ্রসর সম্প্রদায়ের প্রথম প্রজন্মের বিদ্যার্থীরা। যে মান্য-বাংলায় বাংলা সাহিত্য রচিত হয় তাদের কাছে সেই বাংলাভাষা এক দ্বিতীয় ভাষা। তাদের মুখের আঞ্চলিক বাংলায় বাংলা সাহিত্য রচিত হয় না বলে, সেই সাহিত্যের সঙ্গে তাদের আঞ্চলিক যোগ গড়ে ওঠে না। পূর্ব বাংলায় একসময় ঢাকাই বাংলায় সাহিত্য রচনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। সেই উদ্যোগ সফল হয় নি, সেই প্রচেষ্টাকে অধ্যাপক মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বাতুলতা বলেছিলেন। পশ্চিম বাংলাতেও যে-সব অনগ্রসর সম্প্রদায়ের আঞ্চলিক বাংলা ব্যবহারকারী ছেলেমেয়ে এখন মান্য-বাংলায় পড়াশুনো করছে তারাও কালে-কালে বাংলা সাহিত্যের পাঠক, একদিন হয়তো বাংলা সাহিত্যের লেখক হয়ে উঠবে। মান্য-বাংলা আত্মস্থ করবার জন্যে, মান্য বাংলা সাহিত্যের পাঠক ও লেখক হওয়ার জন্যে তাদের আরও অনেক সময় দিতে হবে। অন্যদিকে দেখছি, আঞ্চলিক বাংলায় কথা-বলা কোনো-কোনো জনগোষ্ঠী দাবি করছেন তাঁদের ভাষা আদৌ বাংলা নয়। তাঁরা বাংলাভাষার মানচিত্র থেকে বেরিয়ে যেতে চাইছেন।

অন্যদিকে যাঁরাও-বা বাংলা সাহিত্যের পাঠক ছিলেন তাঁরাও আর বাংলা সাহিত্যের পাঠক থাকছেন না। স্বাধীনতার আগে অবসর যাপনের একমাত্র উপায় ছিল বইপড়া। মহিলারা বিশেষ করে, দুপুরবেলায় সংসারের যাবতীয় কাজ সেরে বিশ্রামের সময় যাপন করতেন বই পড়ে। আমার মায়ের মৃত্যু হয় ৯২ বছর বয়সে, নব্বুই বয়স পর্যন্ত তিনি ছিলেন বাংলা বইয়ের এক

নিষ্ঠাবতী পাঠক। প্রতিমা ঘোষ তাঁর 'মাতৃমঙ্গল' নামের স্মৃতিকথায় তাঁর নিজের মা ও শাশুড়ি-মায়ের বইয়ের প্রতি ভালোবাসার কথা উল্লেখ করেছেন। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের মা আনোয়ারা বেগমও ছিলেন একাগ্র বইপড়ুয়া। এইসব মহিলা কিন্তু সমাজে ব্যতিক্রম ছিলেন না, তাঁদের ঘরে-ঘরে দেখা যেতো। তাঁরা হয়তো ইস্কুল কলেজে পড়েন নি, কিন্তু বইপড়ায় তাঁদের আগ্রহ ছিল গভীর। তারপরে বইপড়ার ঘণ্টাগুলিতে ভাগ বসালো বেতারযন্ত্র, তার অনুরোধের আসর নিয়ে, বেতার নাটক নিয়ে। কিন্তু গোড়ায় রেডিও ছিল অত্যন্ত বিরল ব্যাপার। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'কাল মধুমাস' কবিতায় পড়েছি কতোটা দুর্লভ ছিল রেডিও ব্যাপারটা। পরে রেডিও ছড়িয়ে পড়েছিল, ট্রানজিস্টরের দৌলতে ঘুরছিল হাতে-হাতে। বইপড়ার সময় কমে গেল। আর এখন গৃহস্থ বাড়িতে চব্বিশ ঘণ্টার বাসিন্দা টিভি। তার নিষ্ক্রিয় বিনোদন কেড়ে নিল বইপড়ার সময়। গৃহিণীরা আর দুপুরবেলায় বইপড়ার সময় পান না। আগে লোকাল ট্রেনে, দূরপাল্লার ট্রেনে, বাসে, ট্রামে আকচার মানুষ দেখা যেতো নিবিষ্ট মনে বই পড়তে-পড়তে গন্তব্যের দিকে চলেছেন। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলি। আমার এক তরুণ আত্মীয় বই পড়তে-পড়তে মেট্রোয় অফিসে যায় এবং অফিস থেকে ফেরে। সে বই পড়ছে দেখে একদিন ধুতিপানজাবিপরা এক মাঝবয়সী মানুষ উত্তেজিত হয়ে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ান। এবং জানতে চান কী বই সে পড়ছে। সৈয়দ মুজতবা আলির *দেশে-বিদেশে* পড়ছে জেনে তিনি জানতে চান, প্রথমবার সে এই বই পড়ছে কী না এবং ইতিমধ্যে ওই-ওই সরস জায়গাগুলি সে পড়ে ফেলেছে কী না। এবং তিনি নিজের কথা বলতে থাকেন। শ্যামবাজার এলাকার একটি ছোটো দোকানের মালিক তিনি। ইংরেজি বই পড়তে পারেন না, কিন্তু বাংলা বই প্রচুর পড়েন। ঘাটশিলায় গিয়েছিলেন এবং বিভূতিভূষণের স্মৃতিজড়িত জায়গাগুলি ঘুরে ঘুরে দেখেছেন। আমার তরুণ আত্মীয়কে সেই সহযাত্রী পরামর্শ দিলেন *গীতবিতান* মাথার কাছে রাখার, গভীর অনুভূতির মুহূর্তে এমন পরম আশ্রম আর হয় না। ইতিমধ্যে পাতালরেস তাঁর গন্তব্যে পৌছে যাওয়ায় তিনি নাটকীয়ভাবে আমার আত্মীয়ের কাছ থেকে বিদায় নেন। মাথা নত করে কুর্নিশ করেন তিনি আর বলেন, 'খুদা হাফেজ, আমরা তো মাইনরিটি!'

বইপড়ুয়ারা আজ যে মাইনরিটি তার অনেক কারণ। ইস্কুল-কলেজের পড়াশুনায় সাহিত্য অধ্যয়ন এখন গুরুত্ব হারিয়েছে। মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিকে এখন জোরটা বিজ্ঞানশিক্ষার উপর। বিজ্ঞান পড়ায় জোর দেওয়া হয় যাতে সে প্রযুক্তিবিদ হয়ে উঠতে পারে এবং অচিরেই বড়ো বেতনের চাকরি বগলদাবা করতে পারে। তাই এখন দর্শন, ইতিহাস, সাহিত্য অধ্যয়নে উৎসাহী হয় না উজ্জ্বল ছাত্রেরা। ফলে ওইসব বিষয়ে যোগ্য শিক্ষকের অভাব আজ কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ে। ওইসব বিষয় হয়ে দাঁড়াচ্ছে নিম্নমেধার লীলাক্ষেত্র। আমাদের সময়ে বিজ্ঞানের ছাত্রও ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত ইংরেজি ও বাংলা সাহিত্য সমানভাবে পড়তো। *Rime of the Ancient Mariner*, *Lord of Chatean Noir*, *Riders to the Sea*-র মতো উচ্চমানের রচনা পড়তে পড়তে বিজ্ঞানের ছাত্রের মনেও সাহিত্যের প্রতি গভীর অনুরাগ জন্মে যেত। তাই পদার্থবিজ্ঞানের নামজাদা ছাত্র মনোজ পাল, অমৃতাদ দাশগুপ্ত, চঞ্চল মজুমদারেরা সাহিত্যপ্রেমিক মানুষ। স্বাধীনতার পর পর উন্নয়নের লক্ষ্যে ইন্জিনিয়াররা হয়ে উঠেছিলেন যেন নতুন ভারতবর্ষ নির্মাণের স্বপ্নের প্রতীক। সেই উদ্দীপনায় এবং দ্রুত চাকরি পাওয়ার লক্ষ্যে, ইন্জিনিয়ারিং পড়তে চলে গেলেও, ওই ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত সাহিত্যপাঠের প্রেরণায়

তাদের অনেকের মনেই থেকে গিয়েছিল সাহিত্যানুরাগ। সেই অনুরাগ মনের মধ্যে ছিল বলেই মেকানিকাল ইন্জিনিয়ার সরোদশিল্পী-বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত লিখে ফেলতে পারেন *বামনের চন্দ্রস্পর্শাভিলাষ* নামের চমৎকার সরস স্মৃতিকথা, ইন্জিনিয়ারিঙের ছাত্র বিনয় মজুমদার হয়ে উঠতে পারেন বাংলার এক অগ্রণী কবি, ইলেক্ট্রিকাল ইন্জিনিয়ার শ্যামল ধর হয়ে উঠতে পারেন লেখক অতীন্দ্রিয় পাঠক। *পাঠসংকলন*-এ *মেঘনাদবধ কাব্য*-এর নির্বাচিত অংশ পড়ে এমনই ভালো লেগে যায় যে মাস্টারমশাইয়ের কাছ থেকে টাকা ধার করে বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত কিনে ফেলেন সমগ্র *মেঘনাদবধকাব্য* বইটি। আর অধ্যাপক জ্ঞানার্দন চক্রবর্তী ছাত্রের সাহিত্যানুরাগের পরিচয় পেয়ে, টাকা ফেরৎ না নিয়ে বুদ্ধদেবকে উপহার দিয়ে দেন বইটি। কলেজের পরিবেশ ও পাঠক্রম এখন সাহিত্যের প্রতি ভালোবাসা জাগায় না। বাড়ির পরিবেশও বিরুদ্ধে। অভিভাবকেরা আজ চান না ছেলেমেয়ে বাইরের বই পড়ুক। নম্বরের তীব্র দৌড়-প্রতিযোগিতায় তেমন পড়ার অর্থ সময়ের অপচয় করা। সাত-আটজন শিক্ষকের দ্বারা দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে কোচিং নিতে নিতে তেমন বাইরের বই পড়ার সময়ও থাকে না। যেটুকু সময় থাকে সেই সময়টা ক্লাস্ত তবুণের মন আত্মসমর্পণ করে টিভি আর মিউজিক সিস্টেমের নিষ্ক্রিয় প্রমোদের কাছে।

বাংলা ভাষা আর সাহিত্য আজ আক্রান্ত অন্য এক পরাক্রমশালীর আক্রমণে। আজীবন বাংলা সাহিত্যের সেবক ছিলেন বুদ্ধদেব বসু—(*বন্দীর বন্দনা* থেকে *মহাভারতের কথা*-য় অক্লান্ত) নিজের দুই মেয়েকে তিনি বাংলা মাধ্যমেই লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন। সুকুমার রায়ের অসামান্য রচনাগুলি ইংরেজিবিদ নাভনি পড়ছে কিনা তাই নিয়ে বুদ্ধদেব বসুর গভীর উদ্বেগ। তাঁর কোনো নাভনি আজ বাঙালির সঙ্গে কথা বলতে, বা বাঙালিকে চিঠি লিখতে ইংরেজিই ব্যবহার করে জেনে তিনি বিমূঢ়। তিনি ব্যক্তিগত চিঠিতে লিখছেন, ‘আমার নাভনিরা সবাই ইন্দো-অ্যাংলিয়ান হয়ে যায় এই আমার এক দুশ্চিন্তা....’। আমাদেরও ঘরে ঘরে আজ এই সংকট দেখা দিয়েছে। প্রায় দেড়শো বছর আগে ভার্য্যা বাংলা বই পড়ায় ইংরেজিতে-অনন্যমনা উচ্চশিক্ষিত বাঙালি স্বামী বউকে তিরস্কার করে বলেছিল, ‘ছাইডম্ম বাঙালীগুলো পড়ো কেন?’ বঙ্কিমচন্দ্রের সেই ইংরেজি-শিক্ষিতের মতে, ‘বাঙালা-ফাঙলা পড়ে নিতান্ত ছোটোলোকে। বঙ্কিমচন্দ্রের ইংরেজিবিদ বাঙালি সাহেবদের ডেকে বলেছিল, ‘আমি মাতৃভাষা ত্যাগ করিয়া তোমার ভাষা কহিব।’ এই মহান লেখক তাঁর ঋষিদৃষ্টি দিয়ে দেখেছিলেন, ‘অগৌণে দুর্গোৎসবের মন্তাদি ইংরাজিতে পঠিত হইবে।’

উনবিংশ শতাব্দীতে একদিকে যেমন এই ইংরেজিয়ানার হ্যাংলামি ছিল, তেমনি ছিল স্বাদেশিকতা-উদ্ভুদ্ধ বুদ্ধিজীবীদের প্রতিরোধ। তাঁদের মনে আন্তর্জাতিকতা ও স্বাদেশিকতা মিলে গিয়েছিল। আন্তর্জাতিক হতে গিয়ে তাঁরা স্বাদেশিক সন্তাকে বিস্মৃত হননি। তাঁদের প্রতিরোধের ফলে, ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের দাপটে যা হতে পারেনি, Globalisation-এর দৌলতে আজ তাই হচ্ছে। প্রথমে, সূর্যাস্ত-হয়-না এমন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবিস্তারের কারণে, পরে মার্কিন অর্থনৈতিক রাজনৈতিক দাপটে ইংরেজি যেন একচ্ছত্র ভাষা হওয়ার দিকে এগিয়ে চলেছে। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, বাণিজ্য, রাজনীতি, গণমাধ্যম, সংযোগব্যবস্থায় ইংরেজির অপ্রতিহত প্রভাব। ক্যানাডিয়ান ইংরেজি, অস্ট্রেলীয় ইংরেজি, ভারতীয় ইংরেজি, ক্যারিবিয়ান দ্বীপসমূহের ইংরেজি—এইসব স্থানিক তারতম্য নিয়ে ইংরেজিও হয়ে উঠতে চলেছে যেন দুনিয়ার একমাত্র ভাষা।

এমন ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে যে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সোপান গড়তে গেলে শাদা চামড়ার ভাষা ইংরেজি চাই-ই চাই। ইংরেজি এখন 'part of the identity of a new Asian middle class'। আমাদের সন্তানেরাও এই এশীয় মধ্যশ্রেণির অন্তর্গত। তারা মনে করে আধুনিক বিশ্বে তাদের উচ্চাশা পূরণের উপায় ইংরেজিতে সাবলীল হওয়া। চিনেদের ইংরেজি শেখানোর ব্যবসায় প্রধান উদ্যোগপতি লি ইয়াং বলেন, চিনেরা দলে দলে ইংরেজি শিখছে, কারণ "Coca-cola and Microsoft rule the world." ২০০৮ সালে বেজিংয়ে অলিম্পিকের আসর বসার আগে সরকারিভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ওই নগরের নাগরিকদের ইংরেজিতে সড়গড় হতে হবে 'if they wanted to keep their jobs'। জোহানেসবার্গের এক ট্যাকসিচালকের কথা পড়েছি। সে নিজের দেশের এগারোটি ভাষা কাজ-চালানোর মতো জানে, কিন্তু তার উৎকর্ষা সন্তানদের ভবিষ্যৎ নিয়ে। সে এতো বেশি অর্জন করতে চায় যাতে তার সব সন্তান ভালোভাবে ইংরেজি শিখতে পারে এবং তার জোরে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে। দক্ষিণ কোরিয়ার ধনাঢ্য মানুষেরা নাকি সন্তানদের প্লাস্টিক সার্জনদের হাতে সঁপে দেয় তাদের জিভ লম্বা করবার জন্য, যাতে তারা সাবলীলভাবে ইংরেজি উচ্চারণ করতে পারে। রুটির কোনদিকে মাখন মাখানো তা বুঝতে পারার ক্ষমতার ভাষা ইংরেজির অনুশীলন আমাদের দেশে অনেক বেড়ে গেছে। শহরে বাংলা-মাধ্যম সরকারি/আধা-সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ছাত্রের অভাবে উঠে যাচ্ছে। উচ্চবিত্ত পরিবারের সন্তানেরা তো বটেই, উচ্চাশী মধ্যবিত্তের সন্তানেরাও আজ ইংরেজি-মাধ্যম ইস্কুল-কলেজে পড়াশুনো করে। দু-তিন বছর আগেও ইংরেজি মাধ্যম ইস্কুলসমূহের দশ ক্লাস বারো ক্লাসের সর্বভারতীয় ফলাফল নিয়ে তেমন হইচই হতো না। ইদানীং হচ্ছে। বারো ক্লাসের শেষে এখন অধিকাংশ উজ্জ্বল ছাত্র উচ্চশিক্ষা লাভ করে Electronics, Computer, Tele-Communication, Management ইত্যাদি বিষয়ে এবং এইসব উজ্জ্বল ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষান্তে হারিয়ে যায় দুনিয়া-জোড়া MNC-র গোলকর্ধাখায়। তারা বড়জোর Time অথবা Newsweek পত্রিকার পাতা ওলটায়, খুব বেশি হলে The Da Vinci Code-এর মতো কোনো bestseller পড়ে। সাহিত্য তাদের আগ্রহের বিষয় নয়, বাংলা সাহিত্য আদৌ নয়। কোনো কাজে লাগে না বলে কোনো কোনো রাজ্যে ইতিহাস না পড়ানোর প্রস্তাব এসেছে, তেমনি কোনো কাজে লাগে না বলে হয়তো সাহিত্য পড়ানো বন্ধ হয়ে যাবে অচির ভবিষ্যতে। ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যয়ন খানিকটা টিকে থাকবে, ক্ষমতার ও উন্নয়নের ভাষা যেহেতু ইংরেজি। কাজের বিদ্যা, উপার্জনের বিদ্যাল্যাভের পথ করে দিতে হবে, তাই বিশ্ববিদ্যালয়গুলিও এখন সরে যাচ্ছে Management, Tourism, Journalism & Mass Communication, IT ইত্যাদি শেখানোর দিকে। বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে যাচ্ছে সৌরবাসিত Vocational Training Centre।

ইংরেজির এই দাপটের দরুন ইংরেজি ভাষায় লেখেন যে ভারতীয় লেখকেরা আজ তাদেরই রমরমা। মুলকরাজ আনন্দ, সদ্যপ্রয়াত রাজা রাও, আর. কে. নারায়ণরা ভারতীয় ভাষার লেখকদের প্রতাপে আড়ালেই থাকতেন খানিকটা। এখন অবস্থা বদলে গেছে। এখন ইংরেজিতে লেখা ভারতীয় সাহিত্যই একমাত্র ভারতীয় সাহিত্য বলে গণ্য হয়। এখন অনিতা দেশাই, বিক্রম শেঠ, ভারতী মুখার্জি, অমিতাভ ঘোষ, গীতা হরিহরন, অরুন্ধতী রায়, ঝুমা লাহিড়ি ভারতীয় সাহিত্যের নক্ষত্র। সেই নক্ষত্রলোকে স্থান করে নেবার অত্যাৎসাহে কোনো

কোনো বেচারার পদস্বলনও ঘটে। তাঁদের ইংরেজিতে সাহিত্য রচনার যুক্তি আমরা পেয়ে যাব কবি কমলা দাসের কবিতায়। এই ভাষা এমনই তাঁদের আয়ত্ত হয়েছে যে, এই ভাষাতেই তাঁরা তাঁদের joys, longings এবং hopes প্রকাশ করেন। কাকের পক্ষে কা-কা ডাক যেমন, সিংহের পক্ষে গর্জন যেমন স্বাভাবিক, তেমনি ইংরেজিতে আত্মপ্রকাশও নাকি তাঁদের পক্ষে তেমন স্বাভাবিক। হতে পারে এই ভাষায় 'distortions' আছে, 'queerness' আছে, তবু এই আধা-ইংরেজি আধা-ভারতীয় ইংরেজি ভাষাই তাঁর নিজস্ব। তাই এই ইংরেজি তাঁর মাতৃভাষা না হলেও এই ভাষাতেই তিনি লিখবেন, বারণ শুনবেন না কোনো 'critics, friends, visiting cousins'-এর। এই যুক্তিতে, আর হয়তো বাজারের হাতছানিতে বহু ভারতীয় আজ ইংরেজিতে সাহিত্য রচনায় ধাবমান। ভারতীয় ভাষায় যীরা লেখেন সেই শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়দের, নীলমণি ফুকন, হীরেন ভট্টাচার্যদের, নির্মল বর্মা, দিলীপ চিত্রে, অজিত কৌর, অশোক মিত্রগণদের, অমর মিত্র, জয় গোস্বামীদের খবর কে রাখে? ইংরেজিতে লেখা জনৈক ভারতীয়ের বই রিভিউ করতে গিয়ে সম্প্রতি অশোক মিত্র লিখেছেন, 'গত এক দুই দশকে, ভারতে বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায়, সম-উৎকর্ষের সম-গুণসম্পন্ন সম-ধর্মী গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে; যেহেতু সে-সব গ্রন্থ ইংরেজিতে লেখা নয়, প্রচারের আলোয় আসার সুযোগ তাদের ঘটেনি, তাদের নিয়ে আগ্রহ আলোচনাও, মরুপথে-গতি-হারানো নদীর মতো, দ্রুত সমাপ্ত।' প্রাদেশিক ভাষায় লেখা সম 'আকর্ষক যে-সব গ্রন্থ খ্যাতির মুখ দেখল না' তাঁদের জন্য অশোক মিত্র দু'ফোঁটা চোখের জল ফেলেছেন। এইসব বই ইংরেজিতে অনূদিত হলে তবু খানিকটা নজর বাড়ে।

সর্বত্র এখন আওয়াজ শুনতে পাই— উন্নয়ন, উন্নয়ন। আমাদের উন্নয়ন করতে হবে, উন্নয়নের লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে হবে, উন্নয়ন বিনে গতি নেই। যে-পত্রিকায় লেখা ছাপা না হলে নাকি বাঙালি লেখকের স্বীকৃতিই মেলে না, সেই পত্রিকায় বছর চারেক আগে লেখা হয়েছিল, 'দরকার হলে বাঙালি তার বাঙালিত্ব ঘুচিয়েই এগিয়ে যাবে।' প্রায় যেন এগিয়ে যাওয়ার শর্তই হচ্ছে বাঙালিত্ব ভুলে যাওয়া। আচার্য সুকুমার সেন বলেছিলেন, 'বাঙালির বাঙালিত্ব কখনও লুপ্ত হবে না।' আর, এখন বলা হচ্ছে বাঙালি বাঙালিত্ব ঘুচিয়েই উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাবে। জনপ্রিয় হিন্দি চলচ্চিত্রের গান শুন, মুঝকো ডি থোড়া লিফ্ট করা দে....। হিন্দি গানের মধ্যে এই ইংরেজি লিফ্ট কথাটা খেয়াল করবেন। লিফ্ট বা উন্নয়ন মানেই ইংরেজি। এখন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ভবিষ্যৎ নিয়ে যখন ভাবি, তখন উন্নয়নের আক্রমণ নিয়ে না ভেবে পারি না। বিশ্বব্যাপী উন্নয়নের জোয়ারের ভাষা ইংরেজি; উন্নয়নের আক্রমণ আর ইংরেজির আক্রমণ আজ সমার্থক। সেই আক্রমণ থেকে আমাদের পলিমাটির নরম দেশের অনুন্নত মানুষের ভাষা বাংলা আত্মরক্ষা করতে পারবে তো? যতোদিন গরিব মানুষ আছে ততোদিন বাংলাভাষা থাকবে, কারণ বাংলা এখন গরিব মানুষের ভাষা। আমরা তো উন্নয়ন হোক চাই, মানুষ গরিব থাকুক, বেকার থাকুক এমনটি চাই না। আজ যা অবাস্তব সত্যিই তা যদি বাস্তব হয়ে ওঠে, উন্নত পশ্চিম বাংলায় যদি গরিবি ঘুচে যায়, যদি না থাকে বেকার, অর্থ বেকার, তাহলে স্টিল ম্যাগাজিন কে করবে বাংলায় এতো কবি কি কবিতা লিখবে বাংলা ভাষায়? খুচরো ব্যবসায় MNC ঢুকলে যেমন ঝাঁচকচকে মল বা মার্ট গড়ে উঠবে, পাড়ার মলিন ছোটো ছোটো দোকানগুলি উঠে যাবে, তেমনই হবে কি বাংলা ভাষার অবস্থা। অনেক বাড়িতে এখনও বাইরের ঘরে মান্য-বাংলায় কথা বলে এসে ভিতরের ঘরে আঞ্চলিক বাংলায় কথা বলা হয়। তেমনি

আমরা বহির্জগতের যাবতীয় কাজকর্ম করবো ইংরেজিতে, বড়জোর বাড়িতে কথা বলবো বাংলায়। বাংলা পড়ার বা লেখার ভাষা থাকবে না, হয়ে যাবে কথা বলবার ভাষা মাত্র।

বঙ্কিমচন্দ্র ষষ্ঠদর্শন পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছিলেন বাংলা ভাষায় জ্ঞানচর্চার দরজা খুলে দেবার জন্য। কারণ তিনি জানতেন, দেশের উচ্চ আর নিম্নশ্রেণির মধ্যে যদি ভাষাগত ভেদ থাকে তাহলে দুই শ্রেণিতে সহৃদয়তা জন্মাবে না। সেই কারণে তিনি জানিয়েছিলেন, 'we ought to disanglicise ourselves'। ইংরেজি-জানা আর না-জানা মানুষের মধ্যে ভেদকেই রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন আমাদের দেশের সবচেয়ে বড়ো জাতিভেদ। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীও অনুরূপ ভাবনার অংশীদার ছিলেন। অথচ উদারীকরণ, ভুবনায়নের দৌলতে আমাদের দেশে অর্থনৈতিক বৈষম্য ভীষণভাবে বেড়ে চলেছে। সঙ্গে-সঙ্গে বেড়ে চলেছে ইংরেজি-জানা আর না-জানা মানুষের মধ্যে দূরত্ব। ইংরেজি ফরফরিয়ে বলতে না-পারা মানুষ আজ হীনম্মন্যতায়, ব্যর্থতাবোধে ভোগে।

স্বাধীনতার পর সভায়-সমিতিতে বুদ্ধিজীবীদের ক্রমাগত দাবির প্রেক্ষিতে ১৯৬১ সালে পশ্চিমবঙ্গে সরকারি কাজকর্ম বাংলাভাষায় করার আইন প্রবর্তিত হয়। যে ভাষায় রাজ্যের গরিষ্ঠ সংখ্যক মানুষ কথা বলে, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সেই ভাষাকেই তো সরকারি কাজকর্মের ভাষা করাটা স্বাভাবিক। কিন্তু এখনও বহু সরকারি দপ্তর এই রাজ্যে মিলবে যেখানে দপ্তরের নাম পর্যন্ত বাংলায় লেখা হয় না, কাজকর্ম তো হয়ই না। পরিস্থিতি আজ এমনই যে বাঙালি অধ্যুষিত পশ্চিমবঙ্গে বাংলাভাষাকে সরকারি-আধাসরকারি-বেসরকারি কাজকর্মের ভাষা হিসাবে প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন করতে হচ্ছে। প্রতি বছর একুশে ফেব্রুয়ারি সরকারি কাজকর্ম বাংলাভাষা চালু করবার বাৎসরিক সাধু সংকল্প ঘোষণা করা হয়। বক্তা-শ্রোতা দুই পক্ষই জানে, এসব কথার-কথা মাত্র। পশ্চিমবঙ্গ আজ যখন সালিম, মিতশুবিশি, টাটা, আব্বানিদের হাত ধরে উন্নয়নের দিকে ধাবমান, তখন অনুন্নয়নের ভাষা বাংলা সত্যিকারের সরকারি ভাষা হয়ে উঠবে এই কথা ভাবা কঠিন। তাঁর গবেষণা উচ্চমানের হলেও ইতিহাসের অধ্যাপকের পক্ষে প্রফেসরপদে উন্নীত হওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়ায়, যেহেতু তাঁর ইতিহাস গবেষণার গ্রন্থগুলি বাংলায় লেখা। বাংলাভাষায় মাত্র কথা বলতে পারেন যাঁরা তাঁরা বাংলার প্রতিনিধিত্ব করবার অধিকারও আজ হারিয়েছেন। তাই অনর্গল ইংরেজি বলিয়ে সীতারাম ইয়েচুরি ও বৃন্দা কারাতকে রাজ্যসভায় বাংলার প্রতিনিধিত্ব করবার দায়িত্ব দেওয়া হয়। অবস্থা বাংলাদেশে তুলনায় অনেক ভালো। সেখানে রাষ্ট্রভাষা সত্যিই বাংলা। সেখানে প্রধান মন্ত্রী থেকে থানার দারোগা, উচ্চারণ আঞ্চলিক হতেও পারে, কিন্তু মোটামুটি শুদ্ধ বাংলায় কথা বলতে পারেন। পশ্চিমবঙ্গে এই কাজটা পারেন অর্থমন্ত্রী অসীম দাশগুপ্ত। কিন্তু সেই বাংলাদেশেও আজ উন্নয়নের অক্রমণে বাংলা ভাষা আক্রান্ত। আজ থেকে পনেরো-ষোলো বছর আগে নীলিমা ইব্রাহিম লিখেছিলেন, বাংলা কার্যত 'বুয়া' বা পরিচারিকার ভাষায় পর্যবসিত। যেমন ছিল বুশ ভাষা নবেম্বের বিপ্লবের আগে। অভিজাতেরা তখন নিজেদের মধ্যে কথা বলতেন ফরাসিতে, তাঁরা অনুগ্রহ করে মাতৃভাষা রুশভাষায় কথা বলতেন ঝি-চাকরদের সঙ্গে, ফরাসি-না-জানা ঠাকুমা-দিদিমাদের সঙ্গে। ইংরেজি ভাষার রমরমা আজ বাংলাদেশেও। 'Asian middle class'-এর অন্তর্গত বাংলাদেশের মধ্যশ্রেণির হাজার হাজার সন্তান এখন মাধ্যমিক স্তরে ইংরেজি-মাধ্যমে লেখাপড়া করতে দেশের বাইরেও দেৱাদুনে, দাঙ্গিলি, কাশিয়াঙে, কালিম্পঙে

ভিড় করে। তাই তুলনায় বাংলাভাষা এখনও বাংলাদেশে খানিকটা সুখে আছে বটে, কিন্তু সেই সুখ তার কপালে কতদিন সুইবে তা জানি না।

রঙ্গলাল থেকে শুরু করে পরবর্তীকালের বাঙালি লেখকেরা ছিলেন ইংরেজি-জানা মানুষ। তাঁরা 'ইংলন্ডীয় বিশুদ্ধ প্রণালী'-তে সাহিত্য রচনা করতে চেয়েছিলেন। মধুসূদনের সামনে ঘোষিতভাবে আদর্শ ছিল মিলটনের, বঙ্কিমচন্দ্রের সামনে হয়তো অঘোষিতভাবে আদর্শ ছিল স্কটের। নাট্যকারেরা দীর্ঘ দিন সেক্ষপীরকে সামনে নজির হিসেবে রেখে নাটক রচনা করতেন। যেমন গিরিশচন্দ্র, তেমনি দ্বিজেন্দ্রলাল। এইসব বিদেশাগত মডেল অনেকটাই অবশ্য রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল চিরাগত দেশজ নিজস্ব ঐতিহ্যের রসায়নে। কবিতার ক্ষেত্রেও আমাদের কবিরা এই সেদিন পর্যন্ত মুখাপেক্ষী থেকেছেন বোদলেয়ার, এলিয়ট, মায়াকোভস্কি, এলুয়ারের। কিন্তু স্বাধীনতার পর থেকে বদল শুরু হয়েছিল পরিস্থিতির, প্রেরণা ছিল উত্তর-ঔপনিবেশিকতার তত্ত্বের। আগেই বলেছি, আমাদের সময়ে বিদ্যালয় শিক্ষায় বিজ্ঞান ছিল উপেক্ষিত, প্রধান জোর ছিল ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার উপর। সেই অধ্যয়ন বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধেও বুচি তৈরি করে দিত। এখন বাংলা-ইস্কুলে ইংরেজি পড়ানোর সময় তাকে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে শেখানো হয়, জোর দেওয়া হয় না সাহিত্যরচি গড়ার দিকে। এখন বাংলা বিদ্যালয়ে যারা পড়ে তারা মাধ্যমিকের শেষে সাবলম্বীভাবে কোনো ইংরেজি বই পড়তে পারে না। তাছাড়া বাংলা ইস্কুলে-পড়া ছেলেমেয়েরা বেশির ভাগ অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল বলে কিনতে পারে না ইংরেজি বই। সুতরাং তাদের পক্ষে ইংরেজি বই পড়ে বা ইংরেজি তর্জমার মাধ্যমে অন্য বিদেশি বই পড়ে তার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বাংলায় সাহিত্য রচনা আজ আর সম্ভব নয়। আর যারা ইংরেজি মাধ্যমে পড়াশুনা করে তাদের মাত করা নব্বই জন বাংলা বই ছুঁয়ে দেখে না। বাংলায় তো লেখে না কখনোই।

তাই একসময় মনে হয়েছিল ইংরেজি না-জানাদের হাতে বিদেশি প্রভাবমুক্ত এক সাবলম্বী বাংলা সাহিত্য গড়ে উঠতে চলেছে পূর্ব ও পশ্চিম বাংলায়। মনে হয়েছিল, চণ্ডীদাস যেমন ইংরেজি না জেনে বাংলায় অমর পদাবলী লিখেছিলেন, তেমনি লিখবেন এখন থেকে ভারতের আর বাংলাদেশের বাংলাভাষী যুবক-যুবতীরা। মনে হয়েছিল এখন থেকে হয়তো মফস্সলের গ্রামাঞ্চলে গঞ্জে বসবাসকারী নিম্নবর্গের মানুষ, অসচ্ছল মানুষের ইংরেজি না-জানা ছেলেমেয়েরা গড়ে তুলবে এক বিদেশিপ্রভাবমুক্ত নিজের-পায়ে-দাঁড়ানো বাংলা সাহিত্য। মধ্যবর্তী সময়ের পশ্চিম অনুসরণের দিনগুলির তোয়াক্কা না করে উত্তর-ঔপনিবেশিক সেই সাহিত্য হাত ধরবে রামপ্রসাদের অথবা নিধুবাবুর। ইংরেজি-জানাদের হাতে ক্ষমতা; ভেবেছিলাম, এখন থেকে ইংরেজি-না-জানাদের দায় হবে ক্ষমতাহীনের আত্মপ্রকাশের ক্ষেত্র বাংলা সাহিত্যের পতাকা সুপবনে উড়িয়ে দেবার। ইসলামের অভিঘাতে ঘটেছিল ষোড়শ শতাব্দীর চৈতন্য-রিনেশাঁস, ইংরেজের অভিঘাতে ঊনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গীয় রিনেশাঁস। স্বাধীনতার কিছু পরে মনে হয়েছিল আমরা এক নতুন আরম্ভের দিকে এগিয়ে চলেছি, আমরা বুঝি এক সাবলম্বী সাহিত্যিক নবজন্মের অপেক্ষায়।

কিন্তু এখন সেই নবজন্মের আশা করতে সাহস করি না। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজি সাহিত্য বাংলা সাহিত্যকে অনুপ্রাণিত করেছিল। বিংশ শতাব্দীর শেষে, একবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজি ভাষা অনুপ্রাণিত করছে না, বাংলা ভাষাকে সে যেন গ্রাস করতে উদ্যত। ইংরেজের

সাম্রাজ্যবিস্তারের সঙ্গে-সঙ্গে যে ইংরেজি ভাষা-সাহিত্য এসেছিল, তাকে বাঙালি যেমন আত্মসাৎ করেছিল, তেমনি তার বিরুদ্ধে, আগেই বলেছি, প্রতিরোধও ছিল। আজ বাজার বিস্তারের দিনে, বিশ্বায়নের দিনে, নতুন করে যেন উপনিবেশের বিস্তার হচ্ছে। এই নতুন উপনিবেশ বিস্তারের দিনে ইংরেজি ভাষার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আর নেই, ইংরেজি এখন মালা-চন্দনে অভ্যর্থিত। উন্নত থেকে ক্রমাগত উন্নততর হওয়ার দৌড়পাল্লায় ইংরেজির হাত ধরে এগোন ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নেই, এই সিদ্ধান্ত যেন স্বতঃসিদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে চণ্ডীদাস বেঁচে থাকলে তিনিও হীনম্রন্যতায় ভুগতেন। আর ইংরেজির সর্বগ্রাসী আধিপত্য যে-উন্নয়নের কারণে, সেই উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জনের জন্য ইদানীং জীবনযাপনের ধরন একেবারে পালটে যাচ্ছে। এই জীবন যাপনের ধরন শিল্পসাহিত্য সৃষ্টির পথে প্রতিবন্ধকতা রচনা করে। অবকাশহীন জীবনে শিল্প বা সাহিত্য সৃষ্টি হয় না। তাই রবীন্দ্রনাথ অনেকবার গদ্যে পদ্যে অবসরের গান রচনা করেছেন। জীবন এখন ছুটুস্ত, যেহেতু বিনিয়োগকারীরা চায়। আর ছুটুস্ত জীবনে দর্শন নেই, আত্মদর্শন নেই। শিল্পসাহিত্যের বেঁচে থাকা কঠিন যখন বেঁচে থাকার জন্য সকাল ৮টা থেকে রাত্রি ৮টা কাজ করতে হয়। আট ঘণ্টা কাজের সময় নির্দিষ্ট করার দাবিতে শ্রমিক আন্দোলন আজ ফিকে স্মৃতি হয়ে যাচ্ছে। একদিকে বেকার মানুষ হয়ে যাচ্ছে কাজ খুঁজছে, অন্যদিকে মোটা মাইনের কাজের লোকেরা হন্যে হয়ে কাজ করে যাচ্ছে। মাঝারি বেতনের লোকেরা বাড়তি কাজ করছে উপার্জন বাড়াবার লক্ষ্যে। উপার্জন বাড়তেই হবে কারণ ভোগ্যপণ্য হাতছানি দিচ্ছে। বেসরকারি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানই শুধু কাজ আর উৎপাদন চায় না, সরকারিভাবেও মনে করা হয় ছুটি কমাতেই ইস্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনার মানের উন্নতি হবে। একদিকে ধনার্জনের দঙ্কুর প্রতিযোগিতা, অন্যদিকে ক্রমাগত ভোগ। আমরা মানুষ নই, consumer। ভোগের দৌড়ে খেলায় থাকে না consumption-এর আদি অর্থ ক্ষয়; consumptive ক্ষয়রোগী। ক্রমাগত ভোগের দিকে এগিয়ে যাওয়া সভ্যতা, এগিয়ে যাচ্ছে মূল্যবোধের অবক্ষয়ের দিকে। সংযোগব্যবস্থার অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছে, কিন্তু মানবিক সংযোগ কমে যাচ্ছে। ফ্ল্যাটের বাসিন্দা আড়াই জন মানুষ। দুজন কাজে বেরিয়ে যায়। বালক বা বালিকাটি কাজের লোকের হেফাজতে থাকে অথবা ইস্কুল থেকে এসে ফাঁকা ফ্ল্যাটে শুকনো মুখে ঘুরে বেড়ায়। অক্লান সংসারে কোনো বৃদ্ধ-বৃদ্ধা নেই যে তাকে ভালোবেসে সঙ্গ দিতে পারে, গল্প শোনাতে পারে। নিঃসঙ্গ মানুষ যন্ত্র থেকে যন্ত্রে ভেসে বেড়ায়— টিভি খুলে রাখে, গাঁকগাঁক করে মিউজিক সিস্টেম ঘর কাঁপিয়ে দেয়, অনর্গল টেলিফোনে সেলফোনে কথাচালাচালি হয়। প্রত্যেক মানুষ অতীতে অন্তত একটি কারণে লেখার কাজ করতে বাধ্য হতো— প্রত্যেক মানুষই বছরে দু-চারটে চিঠি লিখতো। টেলিফোনের বহুল ব্যবহারে সেই ন্যূনতম লেখবার দায়টুকুও আজ লুপ্ত। এই জীবনযাপনে, মানবিক সম্পর্কহীনতায় সমাজ যেন থেকেও নেই। সমাজ না থাকলে ভাষা আর সাহিত্যের ভিত দুর্বল হয়ে যায়। এই পরিস্থিতিতে ভবিষ্যতে বাংলা সাহিত্য নিয়ে গবেষণা চলবে হয়তো, হয়তো বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সমৃদ্ধ গ্রন্থাগারে গবেষকেরা ভিড় জমাতেই থাকবেন, কিন্তু জীবন্ত বাংলা সাহিত্য সেই ভবিষ্যতে রচিত হবে কিনা সেই বিষয়ে সংশয় থেকেই যায়। মানুষের এই প্রায়-সমাজহীন সমাজে, ইংরেজির উন্নয়নের আক্রমণে আক্রান্ত বাংলা ভাষা ও তার সাহিত্য কি নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবে?

মনে হতে পারে এইসব দুর্ভাবনার কোনো কারণ নেই এখনও। মনে হতে পারে শহরবাসী মধ্যবিত্তের জগৎটাকেই মাত্র দেখছি বলে এতো দুশ্চিন্তা। শহরের বাইরে বিপুল সংখ্যক গ্রাম ছড়িয়ে আছে, সেইসব গ্রামের দিকে তাকালে দুর্ভাবনার অন্তত আশু কারণ থাকে না। কিন্তু মনে করিয়ে দিচ্ছি ১৮৪৮ সালে প্রকাশিত একটি ইংরেজি ভবিষ্যৎবাণী। সেই ইংরেজি দুই মনীষী বলেছিলেন, "The bourgeoisie has subjected the country to the rule of the towns." উন্নয়নের পরিণামে যদি শহরের শাসন গ্রামাঞ্চলের উপর চেপে বসে তাহলে এই দুর্ভাবনা বোধ হয় অকারণ থাকে না। উন্নয়নের শর্ত হিসাবে পরিকাঠামো গড়ে উঠছে, গ্রাম শহরের সঙ্গে গাঁথা হয়ে যাচ্ছে সড়কে সেতুতে বহুজাতিক পণ্যজাল বদলে দিচ্ছে গ্রামের মানুষেরও চাওয়া ও পাওয়া। যেখানে বিশুদ্ধ পানীয় জল মেলে না, সেখানে মিলছে পেপসি ও কোকাকোলা। তাই দুর্ভাবনা থেকে মুক্তি পাই না। এই দুর্ভাবনা মিথ্যা প্রমাণ হলে বুক থেকে ভার নেমে যাবে। যতোদিন ভার নেমে না যায়, ততোদিন কষ্টে থাকি। উন্নয়ন মানেই কি বসতি থেকে, বুজিরোজ্জগার থেকে, নিজের জ্বান থেকে উৎখাত হওয়া? উন্নয়ন=উৎখাত, এই কি এখনকার সমীকরণ? উন্নয়নের সঙ্গে আমাদের জীবন যাপনের, বসবাসের, মুখের জ্বানের সামঞ্জস্য করাটাই এখন চ্যালেঞ্জ। সেই উত্তর-আধুনিক চ্যালেঞ্জের দিকে আশা নিয়ে তাকিয়ে থাকি। বিশ্বব্যাপী চলেছে Global দাপটের বিরুদ্ধে Local সত্তার অসম লড়াই। এই লড়াই অসম বলেই বাংলার ভবিষ্যৎ নিয়ে দুর্ভাবনা মন থেকে সরাতে পারি না।

যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য : বাংলা পুথির তালিকা সমন্বয়

রমাকান্ত চক্রবর্তী

১৯৪৩-এ মে মাসের দুঃসহ গ্রীষ্মে একদিন একটি পুথি দেখার জন্য বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এর পুথিঘরে গিয়েছিলাম। সেখানে তখন অধ্যাপক যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য কাজ করছিলেন। টেবিল-এ বিছানো ছিল দু তিনটি পুথি। সৌম্য দর্শন অধ্যাপক ভট্টাচার্য পুথি পড়ছিলেন। আমি তাঁকে প্রণাম করতেই তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হ'ল। তখন নিধুবাবুর টপ্পার সংকলন গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল। টপ্পা গানের সামাজিক ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত সম্বন্ধে আমি যে বিস্তৃত আলোচনা করেছিলাম, তিনি তাঁর প্রশংসা করলেন। আমি তাঁকে জানিয়েছিলাম যে, অধ্যাপক ড. নীহাররঞ্জন রায় আমার দ্বারা সম্পাদিত নিধুবাবুর টপ্পার ভূমসী প্রশংসা করেছেন। তখনই তিনি বললেন যে, মুরারিচাঁদ কলেজে তিনি নীহাররঞ্জনর সহপাঠী ছিলেন। প্রসঙ্গত গৌহাটি কটন কলেজের কথা উঠল। আমার বাবা শ্যামাচরণ চক্রবর্তী সে-কলেজে বেশ কিছুকাল সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন। যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য আমার বাবার সঙ্গেও পরিচিত ছিলেন। এইসব প্রসঙ্গ নিয়ে যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য অনেকক্ষণ আমার সঙ্গে কথা বললেন। তাঁর সুমধুর কথা, এবং প্রকৃত অধ্যাপকের মতো স্নেহ ব্যবহার ছিল অবিস্মরণীয়। ১৯৭৩-এ অগস্ট মাসে আমি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে 'লেকচারার'-এর কাজ পেয়েছিলাম। ফলত যতীন্দ্রমোহনের সঙ্গে আমার আর দেখা সাক্ষাৎ হয়নি। কিন্তু আমি তাঁর বাংলার বৈষ্ণবভাবাপন্ন মুসলমান কবি (১৯৬২), হালিরাম ঢেকিয়াল ফুকন-রচিত (১৮২৯) এবং তাঁর দ্বারা সম্পাদিত *আসম বুঝুঞ্জি* গ্রন্থ দুটি সংগ্রহ করেছিলাম। যতীন্দ্রমোহন সম্পাদিত *আসম বুঝুঞ্জি* বাংলা সন ১৩৬৯-এ প্রকাশিত হয়। এই দুইটি গ্রন্থই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বহু বহু মুসলমান কবি যে চৈতন্য প্রচারিত বৈষ্ণবধর্মের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, প্রধানত যতীন্দ্রমোহনই তা বহু দৃষ্টান্তসহ প্রতিপন্ন করেছিলেন, এবং এই কাজ করে তিনি বাঙালি সংস্কৃতির মৌল লৌকিক বা Secular চরিত্র পরিস্ফুট করেছিলেন। *আসম বুঝুঞ্জি* আসমের ইতিহাস প্রসঙ্গে একটি অপরিহার্য গ্রন্থ। যতীন্দ্রমোহনের সম্পাদনায় এই বিখ্যাত গ্রন্থ সমগ্র পূর্বাঞ্চলের ইতিহাসই সুস্পষ্ট করে তুলল। "বুঝুঞ্জি"-কে ঠিক ইতিহাস না বলে "Annai" বললেও এই গ্রন্থের গুরুত্ব কমে যায় না। উড়িষ্যার *মাদলা পঞ্জী*-র সঙ্গে "বুঝুঞ্জি" তুলনীয় হতে পারে, তুলনীয় হতে পারে দুর্গাচন্দ্র সান্যাল রচিত *বাংলার সামাজিক ইতিহাস* (কলকাতা, ১৯১০)।

ইতিহাসের এইসব নিগূঢ় দুর্গম পথ ধরেই যতীন্দ্রমোহন সংগ্রহ করেন সংখ্যাভীত পত্র-

পত্রিকা। আবার বলি, ইতিহাসের এই সব দুর্গম কণ্টকাকীর্ণ অঙ্ককার পথে পথে ঘুরে যতীন্দ্রমোহন চলে আসেন প্রাচীন বাংলা পুথির পুরাতন জগতে। ১৯৭৮-এ এসিয়াটিক সোসাইটি থেকে তাঁর দ্বারা সম্পাদিত *Catalogus Catalogorum of Bengali Manuscripts*, Volume-I, প্রকাশিত হ'ল। তিনি এসিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত বাংলা পুথির তালিকা প্রস্তুত করেছিলেন।

এই *Catalogus Catalogorum* আমার হাতের কাছেই আছে। অসামান্য বই। কেউ কেউ এই বইয়ের ভুলত্রুটি দেখাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। তাঁরা এটা ভেবে দেখেননি যে, তাঁদের কাবুপক্ষেই, একক প্রচেষ্টায়, এমন একটি বাংলা পুথির তালিকা প্রকাশ করা সম্ভব ছিল না। কারণ যখন যতীন্দ্রমোহন এই *Catalogus Catalogorum* লেখেন, তখন দি এসিয়াটিক সোসাইটি ছিল অত্যন্ত দুর্গত, শীততাপ যন্ত্র বিহীন, এবং নিঃসঙ্গ। যতীন্দ্রমোহন যে কী ভয়ঙ্কর পরিশ্রম করেছিলেন, তা পৃষ্ঠা ১০ থেকে ১৩ পর্যন্ত বিভিন্ন গ্রন্থাগারের এবং ব্যক্তির নাম উল্লেখে সুস্পষ্ট।

অথচ, বিদ্বান ব্যক্তিগণ যতোটা কথায় কথায় থিয়োডোর আউফ্রেস্ট-কৃত *Catalogus Catalogorum – An Alphabetical Register of Sanskrit works and Author* (১৮৯১-১৯০৩)-এর নাম করেন, ততোটা যতীন্দ্রমোহন কৃত বাংলা পুথির সম্বন্ধের নাম করেন না। এর কারণ কী এই যে, তাঁদের বিচারে প্রাগাধুনিক ভারতের গৌরবের অভিজ্ঞান স্বরূপ সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য, এবং তদ্বিষয়ক পুথিপত্র অর্বাচীন বাংলা পুথির চেয়ে বেশি গুরুত্ববহ বিবেচিত হয়? যদি গুরুত্বের প্রশ্ন ওঠে, তবে একথা বলাই সমীচীন যে, বাংলা পুথি না পড়লে, না জানলে বাংলার প্রাগাধুনিক সভ্যতার ও সংস্কৃতির পরিচয় অজ্ঞাত থেকে যায়।

এখানেই যতীন্দ্রমোহনের অসামান্য গবেষণার গুরুত্ব। তিনি উল্লিখিত সম্বন্ধে বর্ণানুক্রমিক পুথিসূচি, বর্ণানুক্রমিক পুথিরচয়িতাসূচি, এবং বিষয়সূচি লিখেছেন। পুথির তালিকা প্রস্তুতকরণে আমার যে অভিজ্ঞতা আছে, তা থেকেই বুঝতে পারি, যতীন্দ্রমোহন অত্যন্ত হয়ে, ঘাম ঝরিয়ে, এই পুথি থেকে সেই পুথিতে দৃষ্টি দিয়ে কীভাবে কাজ করেছেন। এই অভাবনীয় কর্মের জন্য তাঁকে কোনও বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল কী না, আমার জানা নেই। যে Methodology যতীন্দ্রমোহন নিজেই ঠিক করেছিলেন, তার বিস্তৃত বিবরণ ও ব্যাখ্যা তাঁর *Catalogus Catalogorum*-এর ভূমিকায় ১৭ পৃষ্ঠা থেকে ১৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। আমার মনে হয়েছে যে, এই Methodology নির্দোষ এবং বাংলা পুথির তালিকা প্রণয়নকারীদের পক্ষে যৎপরোনাস্তি সহায়ক। এখন ভারত সরকারের দ্বারা পৃষ্ঠপোষিত MRC-নামক সংস্থা যে আধুনিক পদ্ধতি অনুসরণ করেন, তা কোনও ভাবে যতীন্দ্রমোহন অবলম্বিত পদ্ধতির চেয়ে উন্নততর মনে হয় না। ইউরোপে জার্মান ও ফরাসি পণ্ডিতগণ প্রধানত *Bible*-এর বিভিন্ন পুথির আলোচনা প্রসঙ্গে যে Manuscriptology-র উদ্ভাবন করেছিলেন, তাতে লিপিতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, ইতিহাস ইত্যাদি বিষয় প্রসঙ্গত আলোচিত হয়েছিল। আমাদের দেশে, বিশেষত বাংলা পুথির সম্বন্ধে প্রস্তুতিকরণে, লিপিতত্ত্ব ও ভাষাতত্ত্ব যথেষ্ট মূল্যবান বিবেচিত হলেও, ঐতিহাসিক যথার্থ বহুক্ষেত্রেই দুর্বল। এই বিশেষ অবস্থায় বাংলা পুথির সম্বন্ধে ঐতিহাসিক তথ্যের বিশেষ প্রাধান্য থাকে না।

তবুও, যতীন্দ্রমোহন তাঁর *Catalogus Catalogorum*-এ দিয়েছেন

- ১ পুস্তকাকারে মুদ্রিত বাংলা পুথির তালিকা
- ২ প্রবন্ধাকারে মুদ্রিত বাংলা পুথির তালিকা
- ৩ বাংলা পুথির লিপিকাল, এবং
- ৪ বাংলা পুথির লিপি বৈচিত্র্য। (পৃ. ৩৬৪-৩৮২)

এইসব বিষয় সম্বন্ধে সুদীর্ঘ এই আলোচনা অত্যন্ত মূল্যবান।

এখন একটি বিষয় সামান্যভাবে আলোচনা করি। যতীন্দ্রমোহনের *Catalogus Catalogorum* গ্রন্থে যে পুথি উল্লিখিত হয়েছে, তাদের মধ্যে, আমাদের বিচারে, শতকরা ৯৯ ভাগ পুথির বিষয় পৌরাণিক ধর্ম, মঙ্গলকাব্য, গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম, সহজিয়া বৈষ্ণব, আউল বাউল ধর্ম, এককথায় ধর্ম। রামায়ণ এবং মহাভারতের পূর্ণ ও খণ্ড পুথিও বিস্তার আছে। লিপি প্রসঙ্গে যতীন্দ্রমোহন লিখেছেন (পৃ. ৩৮১) :

আরবী লিপিতে রচিত বহু বাংলা পুথির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। আরবী লিপি রীতির প্রভাবে বহু বাংলা পুথি ডানদিক হইতে বাম দিকে লিখিত হইয়াছে। ওড়িয়া অক্ষরে লিখিত বহু বাংলা পুথি উড়িয়া রাজ্য প্রদর্শনালা ভুবনেশ্বরে রক্ষিত আছে। বঙ্গাক্ষর ব্যতীত কৈথী, দেবনাগরী, নেওয়ারী, রোমান, সেলেটী নাগরী অক্ষরে লিখিত পুথির সন্ধানও পাওয়া গিয়াছে।

এইসব তথ্য ঐতিহাসিক গুরুত্বসম্পন্ন। কার্লমার্কস্ ভারতে “গ্রাম্য সমাজ” সম্বন্ধে কতগুলো নেতিবাচক কথা লিখেছিলেন। এখন বিখ্যাত ঐতিহাসিক ইরফান হাবিব এবং অন্যান্য মারক্সবাদী ঐতিহাসিকগণ এই স্বপ্ন মূল্যায়নের অসারতা প্রমাণ করেছেন বটে; তবে প্রাগাধুনিক সমাজ ব্যবস্থায়, অথবা পারিবারিক ক্ষেত্রে ধর্মের ও ঐতিহ্যের যে দূরতক্রম্য প্রভাব ছিল, যতীন্দ্রমোহনের *Catalogus Catalogorum* পড়লে তাতে সন্দেহ থাকে না। তবে এর সঙ্গে সঙ্গে বোধ হয় এই মন্তব্যও করা যায় যে, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য পূর্বভারতে ক্রমশ যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। তার প্রমাণ, বিভিন্ন লিপিতে বাংলা পুথি লেখা। আরবি অক্ষরে লেখা হল (পরিশিষ্ট) :

বিবি আয়েশার আগে পুজিত লাগিলা।
কি কারণে শুনিতেন কান্দনের রোল।
কোন হেতু লোক সবে করে কোলাহল॥
তবে আয়েশায় শুনি কহিতে লাগিল।
তোমার কারণে সবে কান্দিত লাগিল।
সমাজে ত নামাজ করিতে না পারিলা
অধিক ব্যাধি হেন সকলে জানিলা॥
তে কারণে উচ্চৈশ্বরে কান্দে সর্বজন।
উদ্ভাস হইয়া সবে করেন ত রোদন॥

এখানে তৎসম ও তদ্ভব শব্দের ব্যবহার লক্ষণীয়। এর রচয়িতা ছিলেন খ্যাতনামা কবি সৈয়দ সুলতান।

যতীন্দ্রমোহন সুনিশ্চিত ভাবেই অবহিত ছিলেন যে বাংলা ভাষার পরিবর্তন হয়েছিল। কী ধরনের পরিবর্তন হয়েছিল, আলোচ্য বিষয়ের কীরূপ বৈচিত্র্য বৃদ্ধি পাচ্ছিল, তা জানতে হলে

যতীন্দ্রমোহন বিরচিত *বাংলা মুদ্রিত গ্রন্থাদির তালিকা* ১৭৪৩-১৮৫২ (১৯৯০) পড়তে হয়। এখানে পাদ্রি জেমস্ লঙ্ সংকলিত ১৪০০ বাংলা মুদ্রিত গ্রন্থের তালিকা আছে। ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে এই তালিকার পুনঃপ্রকাশক ছিলেন দীনেশচন্দ্র সেন; অবশ্য আরও অনেক আগে *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা*র ১৩০১ সালের তৃতীয় সংখ্যায় ১৩০২ সালের প্রথম সংখ্যায়, এবং তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যায় লঙ্-এর তালিকার প্রথম ভাগ বঙ্গাক্ষরে লিপ্যন্তর সহ প্রকাশিত হয়। সংকলন করেছিলেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। লঙ্-এর *Granthavali : An Alphabetical List of Works Published in Bengali* গ্রন্থের প্রথম প্রকাশ কাল ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দ।

যতীন্দ্রমোহন এই গ্রন্থের তথ্যপূর্ণ ভূমিকাতে লঙ্-এর বঙ্গ ভাষা প্রীতি সম্বন্ধে বহু তথ্য দিয়েছেন। তিনটি পরিশিষ্টে যতীন্দ্রমোহন তিন বিষয়ে তথ্য দিয়েছেন। যথা :

পরিশিষ্ট ক : বর্ণানুক্রমিক গ্রন্থনাম সূচী

পরিশিষ্ট খ : বর্ণানুক্রমিক এদেশীয় গ্রন্থকার সূচী

পরিশিষ্ট গ : বর্ণানুক্রমিক বিদেশীয় গ্রন্থকার সূচী

এই তিনটি পরিশিষ্ট আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনায় অপরিহার্য।

বিশেষত যাঁরা বাংলা গদ্যের ইতিহাস বিষয়ে গবেষণা করতে চান, তাঁদের জন্য যতীন্দ্রমোহন কৃত মুদ্রিত গ্রন্থের তালিকা দেখা আবশ্যিক কর্তব্য। এই তালিকায় উদ্ধৃত বহু বই খোঁজ করলে এখনও পাওয়া যেতে পারে। আমি মনে করি, যতীন্দ্রমোহনের তালিকার সঙ্গে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক পুরাতন বা দুষ্প্রাপ্য পুস্তকের তালিকা, বা চৈতন্য লাইব্রেরির পুস্তকের তালিকা মিলিয়ে পড়লে যে বহু তথ্য জানা যাবে — অর্থাৎ এখনও কোন বই আছে — কোন বই নেই — তা জানা যাবে — তাতে সন্দেহ নেই।

বিশেষভাবে “পরিশিষ্ট-গ”, অর্থাৎ বিদেশীয় গ্রন্থকার সূচি (পৃ. ১৪৪-১৫৮) নিবিষ্ট ভাবে পড়ে এই ধারণা হয় যে, বঙ্গে ভাষাচর্চার বৈজ্ঞানিক ধারার সূত্রপাত সাহেবরা করেছিলেন; ইতিহাসচর্চার ও বিজ্ঞানচর্চারও সূত্রপাত তাঁরা করেছিলেন। কিন্তু বিতর্কিত বঙ্গীয় রেনেসাঁস-এ তাঁদের এই অবদানের বিষয়টি অদ্যাবধি অনধীত বা অপরীক্ষিত। শুধু W. D. D. Carey, Felix Carey, Nathaniel Halhead, Herasim Lebedeff, Jown Clark Marshman — এইরকম কিছু সাহেবের অবদান প্রাধান্য পায়। James Long-এর আগে William Marton লিখেছিলেন *Collection of Proverbs Bengali and Sanskrit* (1832)। সাহেবদের অবদানের বিষয়টি এখন একটি বড়ো গবেষণার বিষয় হলে তার অর্থ নিশ্চয় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে সমর্থন বোঝায় না।

যা বিশেষভাবে উল্লেখ্য, তা হল ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে মুসলমান লেখকদের রচনাবলির উল্লেখ। মৌলবী আলীম উল্লা শেখ ১৮৩০ থেকে *সমাচার সভারাজেন্দ্র* নামক সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। এ তথ্য অজ্ঞাত নয়। কিন্তু মহম্মদ ফেরাজুদ্দীন (রচয়িতা, *জ্ঞানানামার পুথি* — ১৮৫১), মহম্মদ ফজলুল্লা (দেওয়ানি আইন সংগ্রহ ১৮৪১), মুনসী এবাদোৎ (কুরনাদানু, ১৮৫২)। মৌলবী ইসমাইল (পরীক্ষা উপদেশ ১৮৫২)। সাদি সিরাজি (গুলেস্তান-এর বঙ্গানুবাদ ১৮৫২)। হায়দর বকস্ (তোতা ইতিহাস, ১৮০৬, ১৮২৫)। লং উল্লিখিত এসব মুসলমান লেখকদের নাম এখন বিস্মৃত। এ তথ্য অবশ্য উল্লেখ্য যে, আবদুল গফুর সিদ্দিকী ১৯১৬-র *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা*-র প্রথম সংখ্যায় বহু মুসলমান লেখকদের

নাম ও তাঁদের রচনার বিবরণ প্রকাশ করেছিলেন। এই রচনাটি সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা-তে সাম্প্রতিক কালে পুনঃপ্রকাশিত হয়েছে।

যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য লিখেছিলেন বাংলার বৈষ্ণব ডাবাপন্ন মুসলমান কবির পদমঞ্জুষা বাংলা অভিধান গ্রন্থের পরিচয়, এবং তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল — শ্রীহট্টের ভট্ট-সঙ্গীত, এবং অসমীয়া পুথির তালিকা, বাংলা অভিধান গ্রন্থের পরিচয়। যতীন্দ্রমোহন বাংলা অভিধান গ্রন্থ সম্বন্ধে ইংরাজিতে বিস্তৃত বিবরণ লিখেছিলেন, তা ঢাকা থেকে প্রকাশিত Muhammad Sahidullah Commemoration Volume-এ প্রকাশিত হয়েছিল। এই বিষয়টি সম্বন্ধে বিস্তারিত এবং বৈচারিক গবেষণা যেভাবে যতীন্দ্রমোহন করেছিলেন, তা একটা দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

আমি যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য সম্বন্ধে যা জানি, তাই বললাম। তাঁর সম্বন্ধে আরও অনেক কথা আছে, বিশেষভাবে তাঁর Catalogus Catalogorum of Bengali Manuscripts-এর প্রথম খণ্ড। এখন অন্য কোনো সুযোগ্য গবেষককৃত দ্বিতীয় খণ্ডের জন্য অপেক্ষা করছেন। এসিয়াটিক সোসাইটি সহ অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থাগারে পুথির সংগ্রহ ক্রমবর্ধমান। নানাবিধ ঘটনা প্রবাহে আজ যখন বাংলার প্রাগাধুনিক সাহিত্যের ইতিহাসচর্চা কতগুলো Tradition-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ, বা ধারানিবদ্ধ, তখনই তো নতুন ভাবে বাংলা পুথির সম্বন্ধনের এবং বিস্তৃত বিবরণের কাজ প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে। তবে, পূর্বেও বলেছি, আবার বলি যে, যাকে পুথির কাজ বলা হয়, তা অত্যন্ত কঠিন; এই পথ অজ্ঞাত, দুস্তর, দুর্গম; এবং বিচার বুদ্ধির চূড়ান্ত পরীক্ষা ছাড়া পুথির কাজ হয় না। আমি আশা করব যে, তরুণ গবেষকগণ যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্যের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করবেন।

তাকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানিয়ে আমার কথা শেষ করি।

ক্যাটালোগোরাম এবং যতীন্দ্রমোহন

অমিয়শঙ্কর চৌধুরী

একদা বাঙালির মনীষা, এক বাঙালি গবেষকের গবেষণাকর্মের মধ্যে দিয়ে উজ্জ্বলতর রূপে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। সে গবেষণা ছিল বাংলা পুঁথি ভিত্তিক সর্বেক্ষণ। এই সর্বেক্ষণের আইডিয়া যদিও ছিল বিদেশ থেকে আগত, তবুও সেই আইডিয়াকে সম্প্রসারিত ও বিকশিত করার ক্ষেত্রে সেই বাঙালি মনীষীর বিশেষ অবদান আছে।

“ক্যাটালোগোরাম” কী

“ক্যাটালোগোরাম” শব্দটার প্রয়োগ আমরা পেয়েছি এক গ্রন্থ নামে। সেই গ্রন্থ হচ্ছে *Catalogus Catalogorum – An Alphabetical Register of Sanskrit Works and Authors*। “Catalogus” শব্দটা ল্যাটিন। এসেছে গ্রিক শব্দ “Katalogos” থেকে। গ্রিক ভাষায় “Kata” শব্দের অর্থ হচ্ছে “Through”, “Form”, “Of” ইত্যাদি। আর “Logos”-এর অর্থ হচ্ছে “Knowledge”, “Wisdom” ইত্যাদি। ল্যাটিন শব্দ “Catalogus” ইংরাজিতে হয়েছে “Catalogue”। যার মূল অর্থ “তালিকা”। ইংরাজি অভিধান বলছে, “Catalogue” শব্দের অর্থ হচ্ছে “A Complete enumeration of items arranged systematically with descriptive details” (দ্রষ্টব্য : *Webster's Seventh New Collegiate Dictionary*, Calcutta, 1969, Page-130)। বাংলা ভাষায় আমরা বলতে পারি, “কোন বিষয়কে বিশেষ প্রণালীতে ক্রিয়ান্ত করে প্রকাশ করাকে, তালিকাবদ্ধ করা বলে।” ল্যাটিনে বহু বচন বোঝাতে “um” ব্যবহৃত হয়। “Catalogus” শব্দের বহু বচনে “Catalogorum” অর্থাৎ “তালিকা সমূহ”।

সংস্কৃত অনুরাগী এক জার্মান পণ্ডিত থিওডোর আউফ্রেচ্ট উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে সংস্কৃত পুঁথিচর্চার সুবিধা হবে মনে করে, কোনো সংস্কৃত পুঁথি গ্রন্থাগারে আছে তার নম্বর কত, ইত্যাদি নানা তথ্য জ্ঞানার উদ্দেশ্যে, সংস্কৃত পুঁথি সমূহের তৎকাল পর্যন্ত প্রকাশিত ও মুদ্রিত তালিকা সমূহ একত্রিত করে এক সমন্বয়গ্রন্থ সংকলন করেন। সেই গ্রন্থের Volume-I-এর আখ্যাপত্র এইরকম : *Catalogus Catalogorum An Alphabetical Register/of/Sanskrit works And Authors/ByTheodor Aufrecht/Late Professor of Sanskrit and Comparative philology in the/Universities of Edinburgh/and Bonn/Printed for the German Oriental Society/Leipzig 1891/Sold by F.A. Brockhaus/Printed by G. Kreysing.*

খিওডোর আউফ্রেস্ট-এর পরিচয়

ড. খিওডোর আউফ্রেস্ট (জন্ম : ৭ জানুয়ারি ১৮২২ খ্রিস্টাব্দ, সাইলেশিয়া, জার্মানি। মৃত্যু : বন, ৩ এপ্রিল ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দ) ছিলেন এডিনবরা ও বন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ও তুলনা মূলক ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপক। বিশ্বের সর্বত্র বিভিন্ন গ্রন্থাগারে রক্ষিত সংস্কৃত পুঁথি সমূহের তালিকার সমন্বয় সাধন করে তিনি যে সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন, তার আখ্যাপত্রের উল্লেখ আগেই করেছি। এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ড. আউফ্রেস্ট বলেছেন : 'To attempt, however, to give an account of the whole of sanskrit literature as contained in Manuscripts deposited in India as well as in Europe, was to be made and it fell to my lot to undertake this work'। তিনি আরো জানাচ্ছেন, "The present work is the result of a labour of nearly thirty years"। ড. আউফ্রেস্ট ৫৬টি মুদ্রিত/অমুদ্রিত তালিকা থেকে তথ্য সংগ্রহ করে ব্রিটিশ সরকারের আর্থিক সাহায্যে এই গ্রন্থ সংকলন করেন। গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি উল্লেখ করেছেন, "The Secretary of State for India, has supported the present Undertaking by a grant of £120" (দ্রষ্টব্য : ওই গ্রন্থের ভূমিকা, তারিখ হাইডেলবার্গ, ৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৯১)।

পুঁথি কী, ও তার গুরুত্ব

ছাপার যুগের আগে আমাদের দেশসহ সব দেশেই হাতেই বই লেখা হত। তালপাতা, গাছের ছাল, চামড়া, হাতে তৈরি কাগজ প্রভৃতিতে এইসব বই লেখা হত। একে আমরা বলি পুঁথি। প্রাচীন যুগের বিভিন্ন কবি ও সাহিত্যিক তাঁদের অমূল্য চিন্তাধারা এইসব পুঁথির পাতায় লিপিবদ্ধ করে গেছেন। সেই পুঁথির কোনো কোনোটা কালবাহিত হয়ে আধুনিক মুদ্রণের সাহায্য আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। কোনওটা বা এখনও লুকিয়ে আছে নিরাপদ অন্ধকারে; অপেক্ষা করে আছে নবীন কোনো গবেষকের দ্বারা আবিষ্কৃত হবার সম্ভাবনায়। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লিপিকর কর্তৃক সেইসব পুঁথি লিপিকৃত হয়েছে। আমাদের প্রাচীন সাহিত্যের কত অমূল্য সম্পদ, ইতিহাসের তথ্য সমাজ বিজ্ঞানের কত অমূল্য তথ্য এখনও এইসব পুঁথির পাতার আড়ালে লুকিয়ে আছে। সেই সব পুঁথি ছড়িয়ে আছে বাংলার (উভয় বাংলার) বিভিন্ন প্রান্তে, দেশে বিদেশে, ভারতের বাইরের অনেক সংগ্রহ শালায়।

সমাজ বিজ্ঞানের উপকরণ

পুঁথির মাধ্যমে প্রতিফলিত ইতিহাস ও সমাজ বিজ্ঞানের উপাদান ও উপকরণ সমূহ সংগ্রহ ও সময়ে সংরক্ষণ জাতীয় দাবি। এগুলির মধ্যে দিয়ে ইতিহাসের ছিন্ন ও লুপ্ত সূত্রের উদ্ধার কিংবা আবিষ্কার সম্ভব। এই সমস্ত উপাদান অনাদরে লোপ পেলে অথবা আমাদের আয়ত্তের বাইরে চলে গেলে সেটা হবে আমাদের সংস্কৃতির বিষম ক্ষতি। এই সমস্ত উপাদান অতীতের বিস্তৃত ও বিলুপ্ত জীবনের অঙ্গ, যা বিনাশ পেলে ক্ষতি হবে অপূরণীয়। ভাষাতত্ত্ব ও লিপিতত্ত্ব প্রভৃতির ক্ষেত্র থেকেও এই সব উপাদানগুলো সুরক্ষার দাবি রাখে। কেননা, এতে সেই সময়কার ভাষার লিখন শৈলীর ও লিখন প্রযুক্তির বিভিন্ন সাক্ষ্য সমুপস্থিত।

সংস্কৃত পুথি সংগ্রহের গোড়ার কথা

ভাস্কো-ডা-গামা যখন এদেশে এলেন (১৪৯৮ খ্রি) এবং তার পর পর বিদেশিরা যখন আমাদের দেশে আসতে থাকেন, তখন এদেশে মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলন ছিল না। হাতে লেখা পুথির চল ছিল। সংস্কৃত ও প্রাদেশিক ভাষা সমূহের শত শত পুথি সেই সব বিদেশিদের অনেকেই সংগ্রহ করে লন্ডন, প্যারিস, ইত্যাদি শহরের নানা সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত করেন। প্রাদেশিক ভাষা গুলোর চাইতে সংস্কৃত ভাষার পুথিতে তাদের আগ্রহ বেশি ছিল। প্রধানত সংস্কৃত ভাষার পুথি দেশি বিদেশি বিভিন্ন সংগ্রহ শালায় সংরক্ষিত হতে থাকে। তাঁরা (বিদেশিরা) যেমন সংস্কৃত পুথি সংগ্রহ করেছেন সেই রকম যত্ন সহকারে সেই সব সংস্কৃত পুথির তালিকা প্রস্তুত করেছেন। লন্ডনের ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে সংস্কৃত পুথি সংগৃহীত হয়েছিল। ইংরেজিতে সংকলিত সেই সব পুথির তালিকা ড. জুলিয়াস এগলিং সংকলন করেন (দ্রষ্টব্য : *Catalogue of the Sanskrit Manuscripts in the Library of the India Office, Part-I, Vedic Manuscripts, Julius Eggeling, Ph.D., Professor of sanskrit and comparative philology in the University of Edinburgh, Printed by order of the Secretary of State for India in Council, London, 1887 A.D.*)। সেই রকম ফরাসি ভাষায় সংকলিত ভারতীয় পুথির তালিকা আমরা পেয়েছি। এই তালিকা রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবার্গ থেকে ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল (দ্রষ্টব্য : *Catalogue Des Manuscripts Et Xylographes Orientaux De la Bibliotheque Imperiale Publique De St. Petersbourg, St. Petersbourg, 1852 A.D.*)।

পুথির তালিকা নির্মাণের উপযোগিতা

মস্কো থেকে প্রকাশিত ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান ইত্যাদি আলোচনার ত্রৈমাসিক সাময়িক পত্র *সমাজ বিজ্ঞান*-এর এক সংখ্যায় (এই সমাজ বিজ্ঞানের বাংলা সংস্করণের প্রকাশক কলকাতাস্থ পার্ক স্ট্রিটের “বিশ্ব শতাব্দী” নামে এক প্রকাশন সংস্থা) দেখছি সোভিয়েট ইউনিয়ানে (বর্তমান রাশিয়া এবং সংযুক্ত স্বাধীন রাষ্ট্র সমূহের) বিভিন্ন সংগ্রহশালা ও গবেষণাগারে রক্ষিত শ্রাব্য পুথির বিবরণ সহ তালিকা। সমাজ বিজ্ঞানের গবেষণার পুথির তালিকা এক অপরিহার্য উপাদান। কেবল সাহিত্যের ইতিহাসের উপকরণ রূপে পুথির তালিকাকে দেখলে একদেশদর্শিতা হবে। সমাজবিজ্ঞানের অনেক মূল্যবান সূত্রের সন্ধান পান এই সব তালিকা থেকে ঐতিহাসিকেরা, সমাজবিজ্ঞানীরা। তাই এই গবেষণার উপকরণকে অবহেলা করা চলে না। পুথি সম্পর্কে বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ— এই দুই তরফের তথ্য সাহিত্যের ইতিহাস, সমাজ বিজ্ঞান তথা সামাজিক ইতিহাসের ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

পুথির তালিকার গুরুত্ব

পুথির তালিকার সঙ্গে ভূতাত্ত্বিক মানচিত্রের তুলনা চলতে পারে। ভূতাত্ত্বিকেরা কোথায় কোন খনিজ সম্পদ আছে তা নির্ণয় করে দেশের বা প্রদেশের ভূতাত্ত্বিক মানচিত্র অঙ্কন করেন। সেই ভূতাত্ত্বিক মানচিত্র দেখে দেশের সরকার সেই খনিজ সম্পদ উন্মোচন করে দেশকে সম্পদশালী করেন। সেইরকম কোথায় কোন পুথি আছে, তার বিস্তৃত তালিকা আমাদের

সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করবার জন্য বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়। এবং শেষ পর্যন্ত প্রয়োজনীয়তা এসে যায়, পুথির তালিকা গুলোর সমন্বয়সাধন কর্মের উপর; কেননা জ্ঞানের উৎসকে জানলেই জয় হয় জ্ঞানের অর্থ রাজ্য।

আউফ্রেস্টের ক্যাটালোগোরামের পরিচয়

আমরা আগে ড. আউফ্রেস্ট-এর কথা বলেছি। এখন তাঁর বইয়ের পরিচয় দেবার চেষ্টা করব। সমস্ত পুথির তালিকাগুলোকে সমন্বয় করে মিলিয়ে নিয়ে, একটা বড়ো তালিকা প্রস্তুত করাকে আমরা তালিকা সমন্বয় বা Catalogorum বলেছি। এই তালিকা হাতে পেলে কোন পুথি কোন গ্রন্থাগারে বা সংগ্রহশালায় রক্ষিত আছে তা চট করে বোঝা যায়। আউফ্রেস্ট যে সংস্কৃত পুথির তালিকা সমন্বয় সংকলন করেছিলেন, যার কথা আমরা আগে বলেছি, সেই বইয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড জার্মান ওরিয়েন্টাল সোসাইটি দ্বারা যথাক্রমে ১৮৯১ ও ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে, তৃতীয় খণ্ড গ্যাটিংগেন, লাইপজিগ, মিউনিক ও ভিয়েনার “একাডেমী” নামে বিদ্বৎ প্রতিষ্ঠান সমূহের দ্বারা একত্রে ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। আউফ্রেস্ট সাহেব এমন একটা কীর্তি স্থাপন করে গেলেন, যার জন্যে পরবর্তীকালে সব প্রাচ্যবিদ এই কাজ কে "Monumental Work" বলে স্বীকার করে নিয়েছেন। তারা আরো বলেছেন : "The Catalogus Catalogorum is an indispensable piece of apparatus for oriental research." আউফ্রেস্ট তাঁর তালিকায় বর্ণানুক্রমিক ভাবে গ্রন্থ নাম ও গ্রন্থকারের নাম দিয়েছেন। সংস্কৃতে অধিকাংশ গ্রন্থের টীকা রচিত হয়েছিল। টীকা রচনা করা সংস্কৃত সাহিত্যের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য। তাই কোনো গ্রন্থের টীকা পাওয়া গেলে, সেই টীকা ও টীকারের নাম, ওই মূল গ্রন্থের সঙ্গে সেই টীকার পুথি কোন কোন সংগ্রহ শালায় আছে তার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আউফ্রেস্টের গ্রন্থে।

New Catalogus Catalogorum-এর পরিচয়

ড. থিয়োডোর আউফ্রেস্ট-এর গ্রন্থের তৃতীয় ও শেষ খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে। এর পর বহু সংস্কৃত পুথি আবিষ্কৃত হয়েছে। তালিকা প্রকাশিত হয়েছে। তাই প্রয়োজন হয়ে পড়ে ড. আউফ্রেস্টের গ্রন্থের পুনঃসম্পাদনার। সেই ভার ভারত রাষ্ট্রের মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়, চেম্বাই-এর সংস্কৃত বিভাগ গ্রহণ করে। এস. কুম্বাস্বামী শাস্ত্রীকে প্রধান সম্পাদক নির্বাচিত করে এক বিদ্বৎমণ্ডলী এই মহতী গবেষণাকর্মে আত্মনিয়োগ করেন এবং আউফ্রেস্টের বইয়ের এক পরিবর্ধিত সংস্করণ প্রকাশের ব্যবস্থা করেন।

এই পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণের নাম দেওয়া হয়— *New Catalogus Catalogorum – A complete and up to date Alphabetical Register of Sanskrit and Allied works and Authors*। এই বইয়ের "Provisional Fasciculus" ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত হয়। এর পর বারো বছর বাদে ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে এই বইয়ের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। প্রথম খণ্ড মুদ্রণের সতেরো বছর পরে ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে এই বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়। এই ভাবে তৃতীয় খণ্ড ১৯৬৭, চতুর্থ খণ্ড ১৯৬৮, পঞ্চম খণ্ড ১৯৬৯, ষষ্ঠ খণ্ড ১৯৭১, সপ্তম খণ্ড ১৯৭৩, অষ্টম খণ্ড ১৯৭৪-এ প্রকাশিত হয়।

এই বইয়ের প্রথম খণ্ডের এক "Second Revised edition" ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। এই গ্রন্থ সম্পাদনা করেন Dr. V. Raghavan, M.A., Ph.D., Prof. and Head of Department of Sanskrit, University of Madras. এই প্রথম খণ্ডে সম্পূর্ণ হয়েছে কেবলমাত্র স্বরবর্ণ "অ"।

আগাগোড়া সরকারি অর্থানুকূলে এই গ্রন্থ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ পাচ্ছে। সংস্কৃতির মতো বিপুলতম সাহিত্যে সমৃদ্ধ ভাষার পুথির তালিকা সমন্বয় বহু খণ্ডে প্রকাশ পাবে, তাতে আর আশ্চর্যের কী আছে। দেখা যাচ্ছে এক এক খণ্ডে এক এক বর্ণ সম্পূর্ণ হচ্ছে না। যেমন Volume Four চতুর্থ খণ্ডে দেখছি, শুরু হয়েছে "কার্ত বীর্ষার্জুন"-কে দিয়ে আর শেষ হয়েছে "কৃষ্ণ সরস্বতী"-কে নিয়ে।

জার্মান পণ্ডিতের আদর্শের অনুসরণকারী — বাঙালি মনীষী

একজন বাঙালি মনীষী এই জার্মান পণ্ডিতের আদর্শে বাংলা পুথির তালিকা সমন্বয় সংকলন করেছিলেন। তিনি জার্মান পণ্ডিতকে কেবল অনুসরণ করেই ক্ষান্ত থাকেননি। তিনি জার্মান পণ্ডিতের আদর্শকে অতিক্রম করে, আরো অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছেন। এইভাবে তিনি বাঙালি মনীষীর এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। সেই বাঙালি মনীষী হচ্ছেন প্রয়াত বাংলাবিদ্যাবিদ অধ্যাপক যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য।

যতীন্দ্রমোহনের পরিচয়

বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক তথা গবেষক যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য (১৯০৫-১৯৯০) মহাশয়ের নাম আজ বঙ্গীয় সাহিত্যসেবী সমাজে সুপরিচিত। যে সমস্ত গবেষকদের নিরলস এবং ঐকান্তিক সাধনায় বাংলা সাহিত্যের গবেষণা তথা বাংলা বিদ্যাচর্চার ধারা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, তাদের মধ্যে তিনি অন্যতম। সুশৃঙ্খল এবং বৈজ্ঞানিক মননের অধিকারী যতীন্দ্রমোহন বাংলা সাহিত্যের একজন সুদক্ষ গবেষক, প্রাবন্ধিক এবং সূলেখক। প্রাচীন পুথি ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ সম্পাদনার ক্ষেত্রে তাঁর খ্যাতি সুপ্রতিষ্ঠিত।

আচার্য দীনেশচন্দ্র সেনের প্রিয়তম ছাত্রদের অন্যতম যতীন্দ্রমোহনের গবেষণা কর্ম বাংলা বিদ্যাচর্চায় এক উজ্জ্বলতম সংযোজন। মধ্যযুগ এবং বাংলা মুদ্রণের আদি পর্বের গবেষণার ক্ষেত্রে, তথ্য সংগ্রহ ও বিন্যাসে তিনি অতুলনীয় দক্ষতা, বৈজ্ঞানিক মন ও সেরা অনুসন্ধিৎসার পরিচয় রেখেছেন। পূর্ণতার সাধনাই তাঁর লক্ষ্য। ইস্তেরোপীয় রেনেসাঁসের (১৪৫৩) জ্ঞানদীপ্ত ঐতিহ্যের উত্তর পুরুষ জার্মান পণ্ডিতদের সঙ্গে চলতে পারে, যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্যের গবেষণা কর্মের তুলনা। পুথি ভিত্তিক সাহিত্য গবেষণার ক্ষেত্রে তিনি যে মনন ও দক্ষতার পরিচয় দিয়ে গেছেন, তা আমাদের মুগ্ধ ও বিস্মিত করে। দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ সম্পাদনার ক্ষেত্রে তিনি যে উন্নত আদর্শ রেখে গেছেন, তা সর্বোত্তমভাবে অনুকরণীয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা এবং অসমীয়া সংস্কৃতির বহু দুষ্প্রাপ্য রত্ন পুনরুদ্ধারিত হয়েছে তাঁর গবেষণা ও গ্রন্থ সম্পাদনার মধ্যে দিয়ে। তাঁর শ্রেষ্ঠ গবেষণা কর্ম বাংলা পুথির তালিকা সমন্বয় সম্পূর্ণ আঙ্গিক নিয়মে ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সুপরিকল্পিত ভাবে সঙ্কলিত। এই গবেষণা কর্মের মধ্যে দিয়ে তিনি বাংলায় গবেষণার মান উন্নীত করেছেন। এই বিষয়ের গবেষণায় তিনি ভারতে পথিকৃতির

সম্মান অর্জন করেছেন।

দীর্ঘ চল্লিশ বছরের একক চেষ্টার ও নিরলস সাধনার ফল বাংলা পুথির তালিকা সমন্বয় গ্রন্থের প্রথম খণ্ড কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। যদিও জার্মান পণ্ডিত থিওডোর আউফ্রেস্ট-এর আদর্শে বাংলা পুথির তালিকা সমন্বয়, সংকলিত; কিন্তু জার্মান পণ্ডিতের আদর্শকে অতিক্রম করে তিনি আরো এগিয়ে গিয়েছেন।

গবেষণার ক্ষেত্রে ‘তালিকা সমন্বয়’-এর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য এবং অপরিহার্য। অথচ সাহিত্যের গবেষকদের কাছে ‘তালিকা প্রণয়ন’ বা ‘তালিকা সমন্বয়’ সংকলন বরাবরই নীরস এবং আগ্রহ অনুদ্রেককারী কাজ। বিপুল নিষ্ঠা, ধৈর্য এবং ঐকান্তিক আগ্রহ না থাকলে এই কর্মে সাফল্য অর্জন দুষ্কর। সংস্কৃত ব্যতীত আর কোনো ভারতীয় ভাষায় পুথির তালিকা সমন্বয় এ্যাবং প্রকাশিত হয় নি।

ভারত ও বহির্ভারতের ১১২টি গ্রন্থাগার ও ব্যক্তিগত সংগ্রহে রক্ষিত প্রায় চল্লিশ হাজার বাংলা পুথি সম্পর্কিত তথ্যাদি নিয়ে সংকলিত হয়েছে এই মহাগ্রন্থ বাংলা পুথির তালিকা সমন্বয়। এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে আছে বর্ণানুক্রমিক পুথিসূচি (পৃথক সংযোজন সমেত)। এছাড়া প্রথম খণ্ডে চারটে মূল্যবান পরিশিষ্ট সংযোজিত হয়েছে। প্রথম পরিশিষ্ট “মুদ্রণ কালানুক্রমিক বিন্যস্ত বাংলা পুথির তালিকা”— যে তালিকার শুরু ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে আর শেষে ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে। এই সময় সীমার মধ্যে মুদ্রিত বিয়াল্লিশটা বাংলা পুথির তালিকা-পুস্তকের আখ্যাপত্র সহ সমৃদ্ধ এই পরিশিষ্ট। দ্বিতীয় পরিশিষ্ট হচ্ছে, “প্রবন্ধাকারে মুদ্রিত বাংলা পুথির তালিকা”। অনুসন্ধিৎসু মনের নিরন্তর জিজ্ঞাসা আর ব্যাপক অধ্যয়নের সাক্ষ্য ছোট্ট এই পরিশিষ্ট। সমগ্রের সাধনায় নিয়োজিত যে প্রাণ, তা যে কোনো সাধারণ প্রবন্ধকে তুচ্ছ মনে করে উপেক্ষা করতে পারে না। তৃতীয় পরিশিষ্ট হচ্ছে “বাংলা পুথির লিপিকাল”। ভবিষ্যৎ গবেষক এই জাতীয় সূত্র থেকে যথেষ্ট উপকৃত হবেন। সর্বশেষ পরিশিষ্ট “বাংলা পুথির লিপি বৈচিত্র্য”। গ্রন্থকার এখানে সাত রকমের লিপির উল্লেখ করেছেন, তার মধ্যে আরবি ও উর্দুয়া আছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগের ছাত্র অবস্থা থেকেই তিনি পুথি সংগ্রহে নিরত ছিলেন। তাঁর নিম্নস্ব পুথি সংগ্রহকে অতি শৈশবে হারানো মায়ের নামে (মোক্ষদা সংগ্রহ) নামাঙ্কিত করে মাতৃভাষা, মাতৃভূমি ও গর্ভধারিণী জননীকে একাসনে বসিয়ে গৌরবাধিত করে গেছেন। প্রায় চল্লিশ বছরের চেষ্টায় তিনি গড়ে তোলেন এক বিরাট ব্যক্তিগত পুথি সংগ্রহ। সংস্কৃত, বাংলা, অসমিয়া, হিন্দি, মণিপুরী, সিন্ধি, ফার্সি ইত্যাদি ভাষায় প্রায় আট হাজার পুথি সংগৃহীত হয়। বর্তমানকালে ব্যক্তিগত সংগ্রহে এত অধিক সংখ্যক পুথি খুব কম লোকেরই আছে। আমাদের সৌভাগ্য যে, এই বিরাট সংগ্রহ তিনি ‘বহুজন হিতায়’ বিগত ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে ১০ মে তারিখে যাদবপুরের বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদে (National Council of Education, Bengal) দান করেন। এই দানের তালিকায় উপরোক্ত আট হাজার পুথি ছাড়া, আছে বাংলা, ইংরেজি, অসমিয়া, হিন্দি, মণিপুরী, ডিমাছা, খাম্বী ইত্যাদি ভাষায় প্রকাশিত প্রায় চোদ্দশত রকমের পত্রিকা। বর্তমান বাংলাদেশ রাষ্ট্র থেকে প্রকাশিত (১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত) নয়শো রকমের বেশি পত্রিকার নিদর্শন সযত্নে এই সংগ্রহে রক্ষিত আছে। এছাড়া বাংলার বিভিন্ন মনীষীদের পত্রাবলি, রবীন্দ্রনাথের আঁকা কয়েকটা চিত্র ইত্যাদিও রয়েছে। এইসব পুথি ও গ্রন্থ সম্ভার নিয়ে তাঁরই নামে নামাঙ্কিত হয়ে

গড়ে উঠেছে জাতীয় শিক্ষা পরিষদের অভ্যন্তরে 'যতীন্দ্রমোহন সংগ্রহ শালা' নামে এক রিসার্চ লাইব্রেরি। এই লাইব্রেরির পরিচালনার জন্য তিনি পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে গিয়েছেন। রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিক (১৮৭৯-১৯২০)-এর পরে যে সমস্ত মহান পুরুষের দানে বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে, যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য তাদের অন্যতম।

বাংলা পুথির তালিকা সমন্বয় গ্রন্থের পরিচয়

ভারতবর্ষে তথা পশ্চিমবঙ্গে কমপিউটার যুগ শুরু হওয়ার বহু আগে বাংলা বিদ্যাবিদ যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য জার্মান পণ্ডিত থিওডোর আউফ্রেস্ট-এর আদর্শে বাংলা পুথির তালিকা সমন্বয় বা Catalogus Catalogorum of Bengali manuscripts-এর সংকলনের কাজ শুরু করেন সেই ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে। মূল কাজের খসড়া শুরু হয় তারও বহু আগে ১৯৩১-এ, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিগত সংগ্রহে রক্ষিত বাংলা পুথির তালিকা সংগ্রহের মধ্যে দিয়ে।

তালিকা সমন্বয়ে কী আছে

এই বইতে পাওয়া যাবে বাংলা ভাষায় লেখা বিভিন্ন গ্রন্থাগারে তথা সংগ্রহ শালায় এবং ব্যক্তিগত সংগ্রহে রক্ষিত বাংলা পুথির এক সমন্বিত তালিকা। এই গ্রন্থে প্রদত্ত তালিকায় বাংলা ভাষায় রচিত যে কোনো লিপিতে অনুলিখিত বাংলা পুথির সম্ভাবন পাওয়া যাবে। পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশ রাষ্ট্র, ভারত রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চল, এমনকি ভারতের বাইরে ইউরোপ, আমেরিকা, প্রভৃতি দেশের বিভিন্ন সংগ্রহশালায় রক্ষিত বাংলা পুথির উল্লেখ আছে এই বাংলা পুথির তালিকা সমন্বয় গ্রন্থে। ভারতের প্রাদেশিক ভাষাসমূহের মধ্যে একমাত্র বাংলা ভাষাতেই এইরকম 'তালিকা সমন্বয়' সংকলন করা হয়েছে। এত যে ঐশ্বর্যময়ী ও প্রতাপশালী ভাষা হিন্দি, সেই ভাষাতেও হিন্দি পুথির কোনো তালিকা সমন্বয় আজ পর্যন্ত সঙ্কলিত হয়নি। এই কাজের ফাঁকে ফাঁকে তিনি অসমীয়া পুথির তালিকা সমন্বয় সংকলন করেছেন, কেননা বহু বছর তিনি অসমে ছিলেন। গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের তিনি ছিলেন বিভাগীয় প্রধান। অসমের প্রতিও তিনি তাঁর কৃতজ্ঞতার চিহ্ন রেখে গিয়েছেন।

বাংলা পুথির তালিকা সমন্বয়-এর বৈশিষ্ট্য তথা যতীন্দ্রমোহনের কৃতিত্ব

বাংলা পুথির তালিকা সমন্বয়ের ক্ষেত্রে যতীন্দ্রমোহনের কৃতিত্ব দুইভাবে প্রকাশ পেয়েছে প্রথমত ব্যাপকতায় দ্বিতীয়ত গভীরতায়।

ব্যাপকতা অর্থে বোঝাচ্ছি কেবল কোন পুথি কোথায় আছে তা বলা নয়, সমস্ত পুথি সংগ্রহকে এই গ্রন্থে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এইরকম বিভাগ ড. আউফ্রেস্ট করেন নি কিংবা পরবর্তী কালে ড. রায়বন-ও করেন নি। বিভাগ সম্বন্ধে জানাই যে, প্রথমে পুথি সমূহকে দুইভাগে ভাগ করা হয়। (১) লিপিকালের উল্লেখযুক্ত পুথি (২) লিপিকালের উল্লেখহীন পুথি। লিপিকালের উল্লেখযুক্ত পুথিকে আবার দুইভাগে ভাগ করা হল। (১) লিপিকালের উল্লেখযুক্ত সম্পূর্ণ পুথি (২) লিপিকালের উল্লেখযুক্ত অসম্পূর্ণ পুথি। ঠিক এইভাবে লিপিকালের উল্লেখহীন পুথি সমূহকে দুইভাগে ভাগ করা হল। (১) লিপিকালের উল্লেখহীন সম্পূর্ণ পুথি। (২) লিপিকালের উল্লেখহীন অসম্পূর্ণ পুথি। বিষয়টা সাজিয়ে প্রকাশ করছি:

- ১ লিপিকালের উল্লেখযুক্ত সম্পূর্ণ পুথি = ক শ্রেণির পুথি।
- ২ লিপিকালের উল্লেখযুক্ত অসম্পূর্ণ পুথি = খ শ্রেণির পুথি।
- ৩ লিপিকালের উল্লেখহীন সম্পূর্ণ পুথি = গ শ্রেণির পুথি।
- ৪ লিপিকালের উল্লেখহীন অসম্পূর্ণ পুথি = ঘ শ্রেণির পুথি।

এইভাবে পুথির শ্রেণিবিভাগ করার ফলে গবেষকদের কাজে প্রচুর সুবিধা হয়েছে।

যতীন্দ্রমোহন এইখানেই থেমে থাকেন নি। তিনি আবার সমস্ত পুথির ক্ষেত্রে লিপিকালের উল্লেখ করেছেন। ড. আউফ্রেস্ট কিংবা ড. রাঘবন এইভাবে চিন্তা করেননি। আরো আলোচনার বিষয় হচ্ছে এই যে, সব পুথিতে বঙ্গাঙ্গে লিপিকালের উল্লেখ থাকে না। যতীন্দ্রমোহন সব লিপিকালকে বঙ্গাঙ্গে বুপান্তরিত করেছেন। আমরা আগেই বলেছি, বাংলা পুথিতে বঙ্গাব্দ ছাড়া বহুরকমের ‘অব্দ’ বা ‘সন’-এর উল্লেখ পাই। সব পুথিতে বঙ্গাব্দের উল্লেখ থাকে না। বাংলা পুথির লিপিকাল নির্দেশ করতে গিয়ে লিপিকরেরা কয়েক প্রকার ‘অব্দ’ বা ‘সন’-এর উল্লেখ করেছেন। যেমন— (১) অমলি সন, (২) খ্রিস্টীয়সন বা খ্রিস্টাব্দ, (৩) জমিদারিসন, (৪) ত্রিপুরাব্দ, (৫) দানিশাব্দ, (৬) নসরৎশাহীসন, (৭) নেপাল সংবত, (৮) নৃপ শক, (৯) পরগনাতি, (১০) বঙ্গাব্দ, (১১) বিশ্বসিংহ শক, (১২) বিষ্ণুপুরী সন, (১৩) মঘীসন, (১৪) মন্দারগ সন, (১৫) মল্লাব্দ, (১৬) যবন নৃপতে শকাব্দ, (১৭) রত্নপীঠসন নৃপতে শকাব্দ, (১৮) রাজরা সন, (১৯) রাজসন, (২০) শকাব্দ, (২১) সদরসন, (২২) সংবৎ, (২৩) হিজরি। এতগুলি ‘অব্দ’ বা ‘সন’-এর মধ্যে একটা বা দুটো সনে বাংলা পুথির লিপিকাল উল্লিখিত হয়। যেখানে শকাব্দ বা মল্লাব্দ বা অন্য কোনো অব্দের উল্লেখ আছে, সেই ‘অব্দ’-কে বঙ্গাঙ্গে বুপান্তরিত করে যতীন্দ্রমোহন সেই পুথির বিবরণ আমাদের কাছে প্রকাশ করেছেন। লিপিকালের উল্লেখ যুক্ত সম্পূর্ণ পুথি কিংবা অসম্পূর্ণ পুথি, সমস্ত পুথিগুলোকে আবার কালানুক্রমিক ভাবে সাজিয়ে তালিকা সমন্বয় প্রণয়ন করেছেন। লিপিকালের উল্লেখ নেই সেইসব সম্পূর্ণ বা অসম্পূর্ণ পুথির ক্ষেত্রে, যতীন্দ্রমোহন সেগুলোকে অর্থাৎ সেই তথ্য সম্ভার আবার বর্ণানুক্রমিক ভাবে ক্রিয়াক্ত করে প্রকাশ করেছেন। এইখানেই তাঁর গবেষণা কর্মের গভীরতা, যা আমাদের চমৎকৃত, বিস্মিত, ও মুগ্ধ করে।

বাংলা পুথির তালিকা সমন্বয় গ্রন্থের পরবর্তী খণ্ডের পরিচয় ও সমালোচনা

বাংলা পুথির তালিকা সমন্বয় গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড মুদ্রণের ইচ্ছা ছিল গ্রন্থকারের। কিন্তু ইতিমধ্যে গ্রন্থকারের জীবনাবসানের ফলে সব কেমন যেন এলোমেলো হয়ে গেল। বিশৃঙ্খলার চরম নিদর্শন দেখা গেল পরবর্তী খণ্ডে।

প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় তিনি উল্লেখ করেছেন, ‘প্রস্তাবিত দ্বিতীয় খণ্ডে নিম্নোক্ত কয়টি বিষয় থাকিবে। (১) বর্ণানুক্রমিক পুথি রচয়িতা সূচী, (২) বর্ণানুক্রমিক বিষয়সূচী। এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত কয়টি পরিশিষ্ট থাকিবে। (ক) এ পর্যন্ত সম্পাদিত ও গ্রন্থাকারে প্রকাশিত কতিপয় বাংলা পুথি। (খ) এ পর্যন্ত প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত কতিপয় বাংলা পুথি। (গ) যে সকল গ্রন্থাগারে বাংলা পুথি আছে তাহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। (ঘ) বাংলা পুথির তালিকা কারকদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। (ঙ) বাংলা পুথি সংগ্রাহকদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ইত্যাদি।

প্রস্তাবিত দ্বিতীয় খণ্ড, গ্রন্থকার যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্যের মৃত্যুর আট বছর পরে ও প্রথম খণ্ড

প্রকাশের কুড়ি বছর পরে এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত হয়। যারা বাংলা পুঁথি নিয়ে কিংবা বাংলা পুঁথির তালিকা নিয়ে নাড়াচাড়া করেন, তাদের কাছে এই গ্রন্থের প্রকাশ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। কেননা প্রয়াত বাংলা বিদ্যাবিদ যতীন্দ্রমোহনের সমগ্র জীবনব্যাপী সাধনার ধন এই গ্রন্থে সঞ্চিত। আলোচ্য গ্রন্থের আখ্যাপত্র এইরকম : বাংলা পুঁথির তালিকা সমন্বয়/(বর্ণানুক্রমিক পুঁথি রচয়িতা সূচী)/যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য/এশিয়াটিক সোসাইটি/১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দ। পৃষ্ঠা ৪+৪২৩। চিত্র নেই।

আলোচ্য গ্রন্থের প্রথমে আছে বর্ণানুক্রমিক পুঁথি রচয়িতা সূচি। এখানে আমরা পাচ্ছি যারা বাংলা পুঁথি রচনা করেছিলেন, তাদের প্রায় সবাইকে। সেই সঙ্গে আছে তাঁদের রচিত পুঁথিগুলোর উল্লেখ এবং বাংলা পুঁথির তালিকা সমন্বয় প্রথম খণ্ড গ্রন্থের কত পৃষ্ঠায় সেই সব পুঁথির বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে, তার নির্দেশ। এই সূচি গবেষকদের প্রভূত উপকার সাধন করবে।

এরপর শুরু হয়েছে, প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় যেমন বলা হয়েছে, “বর্ণানুক্রমিক বিষয় সূচী”। এটা শুরু হয়েছে পৃষ্ঠা ১৯৪ থেকে কিন্তু শিরোনামহীন ভাবে। এই অধ্যায় থেকে এলোমেলো ভাব শুরু। “বিবিধ” শেষ হলে পেলাম “অন্ত্যবর্ণানুক্রমিক সমজাতীয় নাম সূচী”। এই বিষয়টা খুবই চিন্তাকরক। না দেখলে এর মজা বোঝা যাবে না। এই “অন্ত্যবর্ণানুক্রমিক সমজাতীয় নাম সূচী” শেষ হওয়ার পর আবার শিরোনামহীন ভাবে আর একটা অধ্যায় এসে গেল (পৃষ্ঠা ৩০৬)। এই সামগ্রীর উল্লেখ বাংলা পুঁথির তালিকা সমন্বয়, প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় ছিল না। এই জিনিসটা কী, তা সনাক্ত করা কঠিন। এইরকম চলল ৩৫৩ পৃষ্ঠা পর্যন্ত। তারপর ৩৫৪ পৃষ্ঠার শুরু হল “সংযোজন (দ্বিতীয়)”। যারা বাংলা পুঁথির তালিকা সমন্বয় প্রথম খণ্ড নিয়ে নাড়াচাড়া করেছেন, তাদের পক্ষে “সংযোজন (দ্বিতীয়)” ব্যবহার করা সহজ। ৪২৩ পৃষ্ঠাতে এই “সংযোজন (দ্বিতীয়)” শেষ হয়েছে। এইখানেই গ্রন্থ সমাপ্ত হয়েছে।

বইটা এত অগোছালো, এলোমেলো ও অসম্পাদিত রূপে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছে যে, আলোচনা কালে মনে বিক্ষোভ না এসে পারে না। গ্রন্থকার যখন বহুপূর্বে প্রয়াত তখন প্রকাশকের উচিত ছিল উপযুক্ত কোনো পুঁথি বিশেষজ্ঞ অথবা পুঁথি রসিক ব্যক্তিকে দিয়ে সম্পাদিত করে গ্রন্থটি প্রকাশ করা। বর্তমান গ্রন্থ অসম্পাদিত তাই অসম্পূর্ণ। আলোচনা কালে গ্রন্থটির যে সব ত্রুটি আমাদের নজরে এসেছে তার উল্লেখ করছি। প্রকাশ থাকে যেন, এই সব ত্রুটির জন্য গ্রন্থকার মোটেই দায়ী নন। কেননা, মৃত্যুর বহুপূর্বে তিনি বহু উপকরণ সংগ্রহ করে দিয়ে গেছেন। কিন্তু সেই সব উপকরণ সমূহ আমরা সাজিয়ে গুছিয়ে কাজে লাগাতে পারিনি, এ আমাদেরই অক্ষমতা।

প্রথমত গ্রন্থটির নামে ত্রুটি লক্ষ করা যায়। গ্রন্থ নাম হওয়া উচিত ছিল ‘বাংলা পুঁথির তালিকা সমন্বয়, দ্বিতীয় খণ্ড’। গ্রন্থকার প্রথম খণ্ডের ভূমিকার দ্বিতীয় খণ্ডের উল্লেখ করেছিলেন, আমরা এই আলোচনার শুরুতে তা দেখিয়েছি। বর্তমান গ্রন্থনাম বিভ্রান্তিকরক।

দ্বিতীয়ত পৃষ্ঠা ১৯৪-তে “বর্ণানুক্রমিক পুঁথি রচয়িতা সূচী”-তে “হোসেন মহম্মদ”-এর পর হঠাৎ শুরু হলো “অনুবাদ”, তারপর “বিবিধ” “মুসলমানী পুঁথি” “অভিধান”, “আইন”, “আয়ুর্বেদ শাস্ত্র” ইত্যাদি। এগুলো নিশ্চয় পুঁথি রচয়িতাদের নাম নয়। তবে এগুলো কী? আসলে “হোসেন মহম্মদ”-এর পরে হবে একটা শিরোনাম যুক্ত নতুন অধ্যায়। সেই শিরোনাম

হওয়া উচিত “বর্ণানুক্রমিক বিষয় সূচী”। গ্রন্থকার প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় এই শিরোনাম উল্লেখ করেছিলেন, তা আমরা আগে দেখিয়েছি।

তৃতীয়ত পৃষ্ঠা ৩০৬ থেকে যে বিষয়ের মুদ্রণ শুরু হল তার কোনো শিরোনাম নেই। এই জিনিসটাকে সনাস্করণ করা বড়ো কঠিন, আমরা এই বিষয়টা নিয়ে যে অনুমান করেছি সেটা নীচে লিপিবদ্ধ করলাম।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত বাংলা পুথির যে তালিকার প্রথম খণ্ড রোমান লিপিতে প্রকাশিত হয়েছিল (১৯৮৫), তার বাংলা লিপ্যন্তর যতীন্দ্রমোহন করেছিলেন যেটি ভারত ও বাংলাদেশ উভয়রাষ্ট্রে প্রকাশিত হয়। দ্রষ্টব্য (১) *মৈত্রায়নী*, সাময়িক পত্র, প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, শিলিগুড়ি, জেলা দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ১৩৯৬ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ক্রোড়পত্র ১-৫২। (২) *সাহিত্য পত্রিকা* সাময়িক পত্র, ৩২ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, কার্তিক ১৩৯৫ বঙ্গাব্দ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ পৃষ্ঠা ১০৮-১৫০।

আমাদের অনুমান উপরোক্ত এই বঙ্গীয় লিপ্যন্তর করা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা পুথির তালিকাটি শিরোনামহীনভাবে এখানে প্রকাশ করা হয়েছে। আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের *সাহিত্য পত্রিকা*-র সঙ্গে মিলিয়ে দেখে এই কথা লিখছি। এই প্রসঙ্গে যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য লিখেছিলেন, “ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর দুর্লভ পুঁথি সংগ্রহের প্রথম খণ্ডের তালিকা পাইয়া আনন্দিত হইয়াছিলাম। ১৯৭৮ ইং মুদ্রিত ‘বাংলা পুথির তালিকা সম্বন্ধ’ প্রথম খণ্ডের সঙ্গে ১৯৮৫ ইং মুদ্রিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা পুথির তালিকার বহু ক্ষেত্রে মিল লক্ষ্য করিলাম। ...‘বাংলা পুথির তালিকা সম্বন্ধ’ প্রথম খণ্ডে উল্লেখ নাই তেমন বহু নূতন পুঁথির সম্বন্ধ আলোচ্য ১৯৮৫ ইং তালিকায় পাইতেছি।” উপরে উল্লিখিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের *সাহিত্য পত্রিকা*-র পৃষ্ঠা ১১০ থেকে যতীন্দ্রমোহনের এই উক্তি উদ্ধৃত করা হল। দেখা যাচ্ছে ওই তালিকার বঙ্গীয় লিপ্যন্তরের মুদ্রণ, বাংলা পুঁথি রসিকদের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। কিন্তু সেই জিনিসটা এইরকম শিরোনামহীন, ভূমিকাহীন মুদ্রণ সবার কাছেই চরম বিস্ময়জনক।

আমাদের বাংলা পুঁথি ভিত্তিক সাহিত্য আলোচনার এক সমৃদ্ধ ইতিহাস আছে। সেই সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের প্রতি অনুরাগের দৃষ্টি দিয়ে যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্যের *বাংলা পুথির তালিকা সম্বন্ধ* গ্রন্থের পরবর্তী খণ্ডের মুদ্রণ ও প্রকাশন করান হয় নি। অতি অবহেলায়, হেলা ফেলা করে, কোনোরকম গুরুত্ব না দিয়ে এই পুঁথি ভিত্তিক গ্রন্থটি প্রকাশ করা হয়েছে।

বাংলা পুথির তালিকা সম্বন্ধ প্রথম খণ্ড-এর ত্রুটির বিবরণ

প্রথমত মুদ্রণ প্রমাদ। গ্রন্থকার এ বিষয় অবহিত ছিলেন। তাই তিনি লিখে গেছেন, “এই গ্রন্থ নির্ভুল মুদ্রণের যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু মুদ্রণ প্রমাদ রহিয়াছে লক্ষ্য করিয়া দুঃখবোধ করিতেছি। দ্বিতীয় খণ্ডে শুদ্ধিপত্র দিবার ইচ্ছা রহিল” (দ্র. পৃষ্ঠা ২২)।

দ্বিতীয়ত বহু ক্ষেত্রে স্বয়ং সম্পূর্ণ নির্দেশের অভাব। যেমন, “ভা. ঐ. পা.” (ভারতীয় ঐতিহাসিক রেকর্ড কমিশন, ত্রয়োদশ অধিবেশন, পাটনা)। এই “ভা. ঐ. পা.”-র উল্লেখ আছে পৃষ্ঠা এগারোতে। এই “ভা. ঐ. পা.”-র কত নং থেকে কত নং পুঁথি এই তালিকা সম্বন্ধ-এর জন্য গ্রহণ করা হয়েছে তার স্পষ্ট নির্দেশ থাকলে পরবর্তী কালের গবেষকদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজের সুবিধা হত। এই সমস্ত পুঁথি কোথায় আছে, কীভাবে আছে, দেখতে বা পরীক্ষা করতে

হলে কীভাবে এগুতে হবে তার স্পষ্ট নির্দেশ থাকা বাঞ্ছনীয়। সেইরকম ‘ময়. প্রদ’ (ময়মনসিংহ প্রদর্শনী, বাংলাদেশ) (দ্র. পৃ. ১১)। আরো উদাহরণ, “জার্মান” (দ্র. পৃ. ৩৫৪, পরবর্তী খণ্ড), (হিস্টরিক্যাল অ্যান্ড এন্টি কুরিয়ান স্টাডিজ, গৌহাটি, অসম) (দ্র. পৃ. ১২)।

তৃতীয়ত পুথির তালিকা যে সব ক্ষেত্রে মুদ্রিত হয় নি, সে সব ক্ষেত্রে উপকরণ রূপে কত নং থেকে কত নং গ্রহণ করা পরিবর্তিত, পরিবর্তিত সংস্করণ প্রকাশ করতে যাবে তাদের খুব অসুবিধা হবে। উদাহরণ রূপে উল্লেখ করছি (১) রা. কু (রামমালা গ্রন্থাগার, কুমিল্লা, বাংলাদেশ) (২) শি. ন. (শিলচর নর্ম্যাল স্কুল লাইব্রেরী, শিলচর, কাছাড়) (৩) চ. বি. (চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ)।

চতুর্থত পুঁথি পরীক্ষার ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট সহায়তার অভাব। যেমন, পল্লী (পল্লীশ্রী গ্রন্থাগার, বীরভূম), মিত্র (বীরভূমের সিউড়ির শিবরতন মিত্রের গ্রন্থাগার)। সমাজ বিজ্ঞানের গবেষণার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সংগ্রহে রক্ষিত উপকরণের গুরুত্ব আজ স্বীকৃত। কিন্তু সেই ব্যক্তিগত সংগ্রহে একজন গবেষক কীভাবে প্রবেশ করবেন সেটা দেখান আমাদের অবশ্য কর্তব্য। সেই কর্তব্য আমাদের অবশ্যই পালন করতে হবে।

পঞ্চমত নামসূচিতে অনুল্লেখ কিন্তু মূল গ্রন্থে উপস্থিত কিছু ব্যক্তিগত সংগ্রহের ও গ্রন্থাগারের নাম লক্ষ করা যায়, যাদের বিজ্ঞত বিবরণ বাঞ্ছনীয়। যেমন : (১) অজিত নাথ ভট্টাচার্য (দ্র. পৃ. ৩৫৬/২); (২) নিরঞ্জন চক্রবর্তী (দ্র. পৃ. ৩৩০/১, ৩৩২/২, ৩৩৪/২, ৩৩৫, ১/৩৩৫; (৩) প্রণব রায় (দ্র. পৃ. ৩১৯/২, ৩৫৮/১); (৪) রয়েল লাইব্রেরি, ডেনমার্ক (দ্র. পৃ. ৩৫৪/১); (৫) হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় (দ্র. পৃ. ৩৩৯/১)।

যতীন্দ্রমোহনের গ্রন্থের পরিবর্তিত সংস্করণ কেন দরকার

সংস্কৃত পুঁথির তালিকা সমন্বয়-এর ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি, মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগ এগিয়ে এসেছেন আউফ্রেস্টের গবেষণা কর্মকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য। তারা প্রকাশ করে চলেছেন খণ্ডে খণ্ডে *New Catalogus Catalogorum*। কেন্দ্রীয় সরকারের পর্যাপ্ত অর্থানুকূলে তারা সফল হয়েছেন এই গবেষণাকর্ম চালিয়ে যেতে এবং সেই গবেষণাকর্ম প্রকাশনে। আমরা কী এই মডেলটাকে সামনে রেখে কাজ করতে পারি না? বাংলা পুঁথির তালিকা সমন্বয় এর নতুন পরিবর্তিত সংস্করণ প্রকাশের জন্য কী আশা করতে পারি না?

বাংলা পুঁথির তালিকা সমন্বয়, প্রথম খণ্ড, প্রকাশের পর বহু বছর কেটে গিয়েছে। ইতিমধ্যে বহু বাংলা পুঁথি উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। বহু বাংলা পুঁথির তালিকা প্রকাশিত হয়েছে। এই সমস্ত সংগ্রহ করে, বাংলা পুঁথির তালিকা সমন্বয়-এর দুটি খণ্ড একত্র করে নতুন আকারে, নতুন এবং অত্যাধুনিক তথ্যে সমৃদ্ধ হয়ে, পরিবর্তিত ও পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত বাংলা পুঁথির তালিকা সমন্বয়-এর পুনঃ প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা আজ দেখা দিয়েছে। তাছাড়া বাংলা পুঁথির তালিকা সমন্বয় প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য মহাশয় যে সমস্ত বিষয়ের উল্লেখ করেছেন, সেই সমস্ত বিষয়ের পূর্ণ আলোচনা বাংলা পুঁথি সাহিত্যের পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। যতীন্দ্রমোহন এই সমস্ত বিষয়ের কথা বলেছেন : (১) এ পর্যন্ত সম্পাদিত ও গ্রন্থকারে প্রকাশিত কতিপয় বাংলা পুঁথি, (২) এ পর্যন্ত প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত কতিপয় বাংলা পুঁথি, (৩) যে সকল গ্রন্থাগারে বাংলা পুঁথি আছে তাহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, (৪) বাংলা পুঁথির

তালিকাকারদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, (৫) বাংলা পুঁথি সংগ্রাহকদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি। *বাংলা পুঁথির তালিকা সমন্বয়*-এর পরবর্তী খণ্ডের পাণ্ডুলিপি যখন প্রকাশের নিমিত্ত এশিয়াটিক সোসাইটির তৎকালীন সম্পাদক শ্রদ্ধেয় অশীন দাশগুপ্তের হাতে তুলে দেওয়া হয়, তখন তিনি বলেছিলেন, “এইরকম বইয়ের দরকার Continious editiong” হাল নাগাদ (up to date) তথ্যে সমৃদ্ধ এইরকম এক সংকলন গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা সব সময় আছে। অশীন দাশগুপ্তের মতো একজন বড়োমাপের ঐতিহাসিক তা স্বীকার করে গেছেন। কিন্তু কাজটা এখনো করা হয় নি। কেউ এই গবেষণা কর্ম সম্পাদনে এগিয়ে আসেন নি, কোনো উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ এ সম্পর্কে ভাবেন নি। অথচ দিনে দিনে Continious editing-এর প্রয়োজনীয়তা বেড়ে চলেছে, কেননা প্রচুর তথ্যের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। যেমন— সংস্কৃত বাংলা ইত্যাদি মিলিয়ে বাংলাদেশ রাষ্ট্রে প্রায় ৬০ হাজার পুঁথি আছে। এর মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিভাগের পাণ্ডুলিপি শাখায় সংগৃহীত ৩০ হাজার পুঁথির মধ্যে আনুমানিক ১২ হাজার পুঁথি এখনো রয়েছে সম্পূর্ণ অপরিচায়িত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফোর্ড ফাউন্ডেশনের অর্থানুকূলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চব্বিশ শোর মতো পুঁথি পরিচায়িত ও মাইক্রোফিল্ম করে রাখা রয়েছে এবং সেগুলোর তালিকা প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

পুঁথি নিয়ে বাংলাদেশ রাষ্ট্রে আগ্রহ ও দরদের অন্ত নেই। তাই সেখানে কিছু কাজের কাজ হচ্ছে। কিন্তু আমাদের পশ্চিমবঙ্গে অবস্থা বড়োই অন্ধকারাচ্ছন্ন ও শোচনীয়। ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দের পরবর্তীকালে আরো বহু বাংলা পুঁথি উদ্ধার করা হয়েছে। কিন্তু সেগুলির অধিকাংশই থেকে গেছে অপরিচায়িত। আমাদের উদাসীনতায় এইসব অমূল্য প্রত্নকীর্তি ধ্বংসের পথে। আমাদের চরম উদাসীন্য ও নিদারুণ আলস্য বাংলা পুঁথি গবেষণার প্রচণ্ড অন্তরায়।

প্রয়োজনীয় কাজের তালিকা

আকাশের গায়ে থুতু ছেটালে তা নিজের গায়ে এসে পড়ে। তাই কী হয় নি, তা নিয়ে নিন্দামন্দ থাকুক। আসুন আমরা দেখি কী কী কাজ আমাদের করণীয়।

প্রথমত ধ্বংস সাধনের পথ থেকে উদ্ধার করে প্রতিটি বাংলা পুঁথির পরিচায়ন করা দরকার। কেননা এইসব অমূল্য মিথির অন্তরালে ইতিহাসের অনেক অজানা তথ্য লুকিয়ে আছে যেগুলি প্রকাশ পেলে হয়তো অনেক সত্যই ডুল বলে প্রমাণিত হবে। আবার অনেক সৃষ্টিশীল সাহিত্য কর্ম নতুন নতুন পুঁথির মাধ্যমে প্রকাশ পাবার সম্ভাবনা দেখা দেবে।

দ্বিতীয়ত বাংলা পুঁথির পরিচায়নের সঙ্গে সঙ্গে তালিকা প্রকাশও গুরুত্বপূর্ণ। তালিকার গুরুত্ব সম্পর্কে আমরা আগে আলোচনা করছি। এখানে বাহুল্য ভয়ে তার উল্লেখ করা হল না।

তৃতীয়ত সব বাংলা পুঁথির তালিকাগুলো দিয়ে নতুন তালিকা সমন্বয় প্রস্তুত করা দরকার।

নতুন তালিকা সমন্বয় কীভাবে সম্পাদিত হবে

এই কাজের একমাত্র উপকরণ বাংলা পুঁথির তালিকা, সর্বত্র অনুসন্ধান করে, ব্যক্তিগত যোগাযোগ করে সংগ্রহ করা দরকার। তাছাড়া যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য ব্যবহৃত সমস্ত তালিকা

পুনরায় পরীক্ষা করে গ্রহণ করতে হবে।

এরপরের ধাপ হচ্ছে পুথিগুলোকে চার শ্রেণিতে বিভক্ত করতে হবে। এই চার শ্রেণির উদ্ভাবক যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য মহাশয়। শ্রেণিগুলো হচ্ছে (১) লিপিকালের উল্লেখযুক্ত সম্পূর্ণ পুথি, (২) লিপিকালের উল্লেখ যুক্ত অসম্পূর্ণ পুথি, (৩) লিপিকালের উল্লেখহীন সম্পূর্ণ পুথি, (৪) লিপিকালের উল্লেখহীন অসম্পূর্ণ পুথি, এন্ট্রিগুলো সাজাবার সময়, অর্থাৎ পুথি সংক্রান্ত তথ্য সমূহ লিপিবদ্ধ করণ করবার সময়, সাজাতে হবে (১) ও (২)-এর ক্ষেত্রে কালানুক্রমিক ভাবে। তারপর (৩) ও (৪)-এর ক্ষেত্রে বর্ণানুক্রমিক ভাবে। আবার সমগ্র পুথিভিত্তিক তথ্য সমূহ অর্থাৎ পুথির খবরাখবর পরিবেশিত হবে বর্ণানুক্রমিক ভাবে গ্রন্থাকারে।

নিমেষে হুকুম তামিলের দৈত্য

আমরা দেখেছি যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য মহাশয়ের লেগেছিল চল্লিশ বৎসর, তাঁর গ্রন্থে প্রায় ৪০ হাজার বাংলা পুথির সন্ধান আছে। সংস্কৃত পুথির ক্ষেত্রে আউফ্রেস্টের লেগেছিল ৩০ বৎসর। আর New Catalogus Catalogorum of Sanskrit Manuscripts-এর ক্ষেত্রে দেখছি, ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে শুরু হয়ে, স্বাধীনতার পরে বছরের পর বছর ধরে চলেছে সেই কর্ম ধারা।

মোটামুটি যা হিসাব পাওয়া যাচ্ছে, তাতে মনে হয় প্রায় ৮০ হাজারের কাছাকাছি হবে বাংলা পুথির সংখ্যা। আমাদের পূর্বসূরীদের বহুবছর লেগেছে তালিকা সমন্বয় সঞ্চালনে। কিন্তু আজ আমরা নিমেষে সেই কাজ সম্পূর্ণ পরতে পারি, কেননা আমাদের হাতে আছে নিমেষে হুকুম তামিল করার দৈত্য — কমপিউটার। কমপিউটারের সাহায্যে আমরা তালিকা সমন্বয় সংকলনের কাজটা দ্রুত সম্পাদিত করতে পারি। বাংলা প্যাকেজ সমন্বিত কমপিউটারকে ঠিকমত প্রোগ্রামিং করে দিলে, নিমেষে কর্ম সম্পাদনের সম্ভাবনা। এই বিষয়ে আমাদের বাঙালি কমপিউটার বিশেষজ্ঞরা সাহায্য করবার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছেন। আমাদের কাজ শুধু তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করা, এবং বাংলা পুথি সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করা।

কাজটা করা করবেন

সংস্কৃত পুথির ক্ষেত্রে যেমন আমরা দেখেছি মাস্টারজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগ দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন, সেইরকম বাংলা পুথির ক্ষেত্রে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-এর বাংলা বিভাগ এই দায়িত্ব গ্রহণ করুক। কেননা, উচ্চস্তরের বিদ্যাচর্চা তথা বিশুদ্ধ জ্ঞানচর্চা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সম্পাদিত হবে এইটেই জনগণের স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ, এই ব্যাপারে বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদের অন্তর্গত যতীন্দ্রমোহন সংগ্রহ শালার সহায়তা গ্রহণ করতে পারে, আর সহায়তা নিতে পারে এশিয়াটিক সোসাইটির।

আশায় মরে চায়া

কাজটা করা করবেন সে কথা আমরা বললাম। কিন্তু কেন করবেন? বাংলা পুথির তো বাজার নেই। অর্থাৎ বাংলা পুথি সম্পাদিত করে প্রকাশ করলে তা কেনার লোক পাওয়া যায় না আর পুথির তালিকা তো আরো দূরস্থান।

আধুনিক ধনতন্ত্রে বাজার অর্থনীতি ইদানীং সমস্ত কিছুকে সেলেবেল কামোডিটি-তে অর্থাৎ

বিক্রয়যোগ্য পণ্যে রূপান্তরিত করেছে। যে সমস্ত বিষয় বিশুদ্ধ জ্ঞানচর্চা রূপে বিরাজ করত এককালে, আজ সেগুলোকে আধুনিক ধনতন্ত্র বিক্রয়যোগ্য পণ্যে রূপান্তরিত করেছে। তাই সেই সব বিষয় সম্পর্কে বই পত্র প্রকাশিত হলে ভালই বিক্রি হয়, অর্থাৎ বাজার অর্থনীতির ভাষায় যাকে বলে “পাবলিক ভালই খাচ্ছে”। সেই বিচারে বাংলা পুঁথি সংক্রান্ত কোনো গবেষণা কর্ম বা তৎ সংক্রান্ত প্রকাশন পর্ব বড়োই অবহেলার বস্তু। এই বিষয় সম্পর্কে কোনো বই প্রকাশিত হলে তা “পাবলিক খায় না”। শেষ পর্যন্ত খায় উই পোকা, আরশুলা আর ইন্দুরে। তবুও আশায় মরে চাষা। বাংলা পুঁথি চর্চা এখনো সেলেবেল কমোডিটি অর্থাৎ বিক্রয় যোগ্য পণ্যে রূপান্তরিত হয় নি। তাই বিশুদ্ধ জ্ঞানচর্চা যাদের লক্ষ্য, বাজার অর্থনীতির যারা পরোয়া করেনা, সেই সব বাংলা পুঁথি রসিক সুধী মণ্ডলীর প্রতি পূর্ণ আস্থা স্থাপন করে, আমরা আশায় বুক বাঁধি।

জীবক-চরকদের ঐতিহ্যের ধারায়

জ্যোতিভূষণ চাকী

আদিকালের মানুষ শিশুর জন্ম দেখেছে, মৃত্যুও দেখেছে নানা বয়সের মানুষের। জন্মমৃত্যু থেকেই জীবনের একটা আভাস তারা পেয়েছে। বুঝেছে, জীবনকে রক্ষা করতে হবে। যতদিন বাঁচা যায় তার জন্যে চেষ্টা করতে হবে। রোগকে তারা নিজেরই কোনো দোষের ফল বলে মনে করেছে, এবং তার জন্যে নানারকম কল্পিত শক্তির শরণ নিয়েছে। দীর্ঘকাল পরে বৈদিক যুগ যখন এল, দেবতারা স্পষ্টত চিহ্নিত হলেন। তখন তাঁদের অমর বলে তকমা দিলেও রোগের হাত থেকে যে দেবতাদেরও পরিত্রাণ নেই তা বোঝা গেল। সেই পরিত্রাণের বাসনা থেকেই অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের কল্পনা। এঁরা হলেন স্বর্বেদ্য, অর্থাৎ স্বর্গের চিকিৎসক। যৌথ বৈদ্যের কল্পনা পুরাণ যেভাবেই ব্যাখ্যা করুক আসলে দুজনে পরামর্শ করে রোগের বিধান দিলে তা ফলপ্রসূ হবার সম্ভাবনাকে অনেকটা নিশ্চিত করে তোলে। ঋগ্বেদে স্বাস্থ্যরক্ষার আবশ্যিকতার জন্যে বায়ু, পিত্ত ও কফের সমতাবিধানের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। অথর্ববেদেই ভেষজ-চিকিৎসার কিছু বিধান দেখা যায়। তবে, সেখানেও তন্ত্রমন্ত্রেরই আধিক্য। বৈদিক মন্ত্রে ‘ওষধি মধুময় হোক’ এই প্রার্থনা থেকে বোঝা যায়, ওষধির প্রয়োগ ঋষিরা জানতেন এবং বেদোক্তর সাহিত্যে ইঞ্জুদি-আদির প্রয়োগ ক্ষত আরোগ্যে যে প্রয়োজন হত তার উল্লেখ আছে।

বৌদ্ধ যুগে জাতককথাগুলোতে রোগ এবং তার নিরাময়ের উপকরণ সম্পর্কে আরও কিছু জানা যায়। তখন তক্ষশিলা স্ত্রানচর্চার একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল, বিশেষ করে চিকিৎসাশাস্ত্রে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা উচ্চমানের ছিল। এই বিশ্ববিদ্যালয়েরই ছাত্র ছিলেন জীবক। জীবকের জন্মবৃত্তান্ত রহস্যে ঢাকা। কিংবদন্তি থেকে জানা যায়, তিনি ছিলেন শালবতী নামে এক বারবনিতার সন্তান। নিষ্কিপ্ত হয়েছিলেন আবর্জনায়। বিম্বিসারের পুত্র অথবা বিম্বিসার নিজেই এই শিশুকে লালনপালন করেন। বিম্বিসারের পুত্রই শিশুটিকে আবর্জনা থেকে উদ্ধার করেন— এই মতটিই প্রবল হওয়ায় তাঁর নাম হয় ‘কুমারভূত্যক’ (কোমারভচ্চ)। স্নাতক হবার আগে তক্ষশিলার তৎকালীন গুরু আত্রেয় তাঁকে বলেন, ‘তক্ষশিলার চারদিকে এক যোজন ভ্রমণ করো। উদ্ভিদ ও ওষধি নিরীক্ষণ করো। ভ্রমণ শেষ হলে আমাকে এসে বলবে, এমন কোনো উদ্ভিদ দেখলে কি না যা কোনো কাজে লাগে না।’ জীবক নিরীক্ষা শেষ করে ফিরে এলে মাথা নত করে গুরুদেবকে বললেন, ‘ক্ষমা করুন, আমি এমন উদ্ভিদ কিছু দেখতে পেলাম না যা কোনো-না-কোনোভাবে মানুষের কাজে লাগে না।’ গুরু প্রসন্ন হয়ে বললেন, ‘তোমার শিক্ষা সম্পূর্ণ হল।’ এইসব প্রত্যক্ষদর্শীদের অভিজ্ঞতার অনুকরণেই চরক-সুশ্রুতেরা একই কথা বলেছেন :

নাস্তি অনৌষধং কিঞ্চিৎ (চরক),

ন অনৌষধিভূতং জগতি কিঞ্চিদস্তি।

জীবকই বুদ্ধদেবের পীটারোগ এবং পাদক্ষত সারিয়েছিলেন। জীবক পরে অজ্ঞাতশত্রুর মন্ত্রী হয়েছিলেন। শুধু চিকিৎসক হিসেবে নয়, বহু গুণের অধিকারী ছিলেন তিনি। বৌদ্ধ সাহিত্যে অনেক ক্ষেত্রেই তাঁর নাম-উল্লেখ পাওয়া যায়। জীবককে তাই ঐতিহাসিক ব্যক্তি বলতে বাধে না। এ কথা বলছি এই কারণে, প্রাচীনকালের অনেক গুণীজনকে পৌরাণিক ব্যক্তি করে নেওয়া হয়েছে দেবত্ব আরোপ করে।

সুচিকিৎসক বলে খ্যাত ধম্মন্তরি অবশ্য পূর্ণত পৌরাণিক ব্যক্তি। দেবদানবের যুদ্ধে সাগর মণ্ডিত হলে যেসব বস্তু উঠল তাদের সঙ্গে কিছু দেবতাস্থানীয় ব্যক্তিও উঠেছিলেন। তাঁদের মধ্যে ধম্মন্তরি এক জন। ধম্মন্তরি চিকিৎসাবিদ্যায় তাঁর অমিত জ্ঞান ইন্দ্রকে নিবেদন করেন। দেব-বৈদ্য হিসেবে তিনিও সুপ্রসিদ্ধ হয়ে ওঠেন। তাঁর নামটি তাই সুচিকিৎসক বোঝাতে প্রতিশব্দ হয়ে ওঠে। এই ধম্মন্তরি স্বার্থত্যাগী এবং পরোপচিকীর্ষু বলে চিহ্নিত হন। চরক ও সুশ্রুত তাঁরই ঐতিহ্যবাহী। এঁরা দুজনেই অবশ্য ঐতিহাসিক ব্যক্তি। ‘চরক’ কথাটি ব্যক্তিবিশেষের নাম হলেও অনেকে এর অর্থ করেন ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসক যারা স্বৈচ্ছায় বা রাজাদেশে বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ করে প্রয়োজনীয় চিকিৎসাবিধান করতেন। এই চরক-সুশ্রুতই চিকিৎসকের আদর্শের নির্দেশ দিয়েছে।

ন অর্থার্থং ন অপি কামার্থম্ অথ ভূতদয়াং প্রতি।

বর্ততে যঃ চিকিৎসায়াম্ স সর্বম্ অতিবর্ততে ॥

কুর্বতে যে তু বৃত্ত্যর্থং চিকিৎসাপণ্যবিক্রয়ম্।

তে হিত্বা কাঞ্চনং রাশিং পাশুরাশিম্ উপাসতে ॥

—চরকসংহিতা ৬

অর্থার্থ, অর্থলাভের জন্যে নয়, স্বার্থসিদ্ধির জন্যে নয়, প্রাণীদের প্রতি কেবল দয়াভাব নিয়ে যাঁরা চিকিৎসা করেন তাঁদের স্থান সর্বোচ্চে। আবার যারা বৃত্তির জন্যে চিকিৎসাকে পণ্য করে তোলেন তারা কাঞ্চনরাশিকে পরিত্যাগ করে বালুকারাশির সেবা করে। তাঁর প্রায় সমসাময়িক হিপোক্রিটাস চিকিৎসকদের জন্যে অবশ্যপালনীয় যে-বিধি ঘোষণা করেন, মূলত চরকের বাণীর সঙ্গে তা অভিন্ন। সুশ্রুত মূলত শল্য-চিকিৎসক ছিলেন। তিনি শতাধিক যন্ত্রের নাম করেন যাদের প্রয়োগ আপাত-যন্ত্রণাদায়ক হলেও পরিণামে শান্তিপ্রদ। এই দুজন চিকিৎসকই মনে করতেন, রোগের উপশম-সাধন ছাড়া চিকিৎসকের অন্য কর্তব্য নেই। আজ যাকে আমরা প্লাস্টিক সার্জারি বলি, বা ট্রান্সপ্লান্টেশন বলি তখনকার কালে তা অসম্ভব ছিল না। পঞ্চতন্ত্রের কাহিনিতে আমরা চক্ষুঃসংযোজনের যে কাহিনি পাই তা নিছক কল্পনা নয়। চরক-সুশ্রুতের সময়ে ভেষজ গ্রহণে রোগীদের প্রবল অনিচ্ছার সঙ্গে তাঁদের সংগ্রাম করতে হত। দেবাদির কৃপাকেই তাঁরা রোগ প্রশমনের একমাত্র উপায় বলে মনে করতেন। তাঁদের সংস্কারে কোনোরকম আঘাত না দিয়ে এঁরা গণেশাদি পূজার আয়োজন করতেন, এবং সেই সুযোগে রোগীকে ভেষজ ও নিষিদ্ধ পথ্য দিতেন। গোমাংস রাজ্যযক্ষ্মার অব্যর্থ পথ্য বলে তাঁরা রোগীর অজ্ঞান্তে কুক্কটমাংসের ছলনায় তা রোগীকে খাওয়াতেন। একে তাঁরা চিকিৎসকের ধর্ম বলে মনে করতেন। শবব্যবচ্ছেদের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদের সঙ্গেও তাঁদের সংগ্রাম করতে হয়েছে। সংগ্রামের মধ্যে দিয়েই তাঁদেরকে আধুনিক চিকিৎসার ভিত্তি স্থাপন করতে হয়েছে।

আয়ুর্বেদের কায়াদি অষ্টাঙ্গিক পদ্ধতিকে যদি প্রাক্‌বিজ্ঞান বা প্রায়-বিজ্ঞান বলি তাহলে এই

পদ্ধতিরই ধারানুসারী চরক-সুশ্রুত সংহিতাকে বিজ্ঞান না বললেও বিজ্ঞানকল্প বলা যেতে পারে। অবশ্য চরক স্পষ্টত নির্দেশ করেছেন, কতকগুলো ব্যাপার তাঁদের অনিচ্ছাসত্ত্বেও মেনে নিতে হচ্ছে। বাকিগুলো ‘প্রত্যক্ষফললক্ষণাঃ’। চরকের সময়কে যদি কণিষ্ককালীন ধরা যায় তাহলে তার পর থেকে আমরা দু-হাজার বছর পার হয়ে চিকিৎসার ক্ষেত্রে পুরোপুরি বৈজ্ঞানিক যুগে এসেছি। ধর্মাদি শাস্ত্রের সঙ্গে অনেক লড়াই করে বিজ্ঞানকে জয়পতাকা উড্ডীন করতে হয়েছে। সেইসব দিনের বিজ্ঞান-বিশ্বেষী সংস্কারের সঙ্গে বাস্তবজ্ঞাননিষ্ঠ যথার্থ চিকিৎসকদের সংগ্রামের কাহিনি অল্প পরিসরে তুলে ধরেছেন প্রখ্যাত দার্শনিক-গবেষক দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, যা আজও সর্বজনপঠনীয়।

কিন্তু বিজ্ঞানযুগে পৌঁছেও চিকিৎসাক্ষেত্রে কি বিজ্ঞানীদের এবং চিকিৎসকদের সংগ্রাম শেষ হয়েছে? আদৌ নয়, সংগ্রাম বেড়েছে বই কমেনি। বহু যন্ত্র ও দেহান্তঃসমীক্ষার নানা আয়োজন থাকতেও বহুক্ষেত্রেই যন্ত্রসর্বস্বতাকে মেনে নেওয়া যাচ্ছে না। চিকিৎসকের তৃতীয় নয়নের প্রয়োজন হয়ে পড়ছে। যন্ত্র যখন ঈজিত ফল দেয় না তখন যন্ত্র হয়ে পড়ে যন্ত্রণা। তা ছাড়া নিতানূতন রোগের হামলায় চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা অনেকসময়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যাচ্ছেন। খুদে শয়তানের রাজত্ব (ভাইরাস ইত্যাদি) তো আছেই, আবার খুদে জন্তুদের রাজত্বও আছে। এক মশা-ই বহু রোগের অমোঘশস্তা। মশা মারতে সত্যিই কামান দাগানোর দরকার হয়ে পড়েছে। সে-কামানের প্রকৃতি ঠিক কীরকম হবে তা নিয়েও সংশয় কাটেনি। তা-ছাড়া পুরোনো রোগও ঘুরেফিরে আসছে। যা নির্মূল হয়ে গিয়েছিল তা সগৌরবে জানান দিচ্ছে। ক্যানসার-এড্‌স-এর মতো দুরারোগ্য রোগ ছাড়াও আরও মারাত্মক অন্যান্য রোগ রক্তচক্ষু দেখাচ্ছে।

মানুষ একদিন বলেছিল ‘জীবম শরদঃ শতং’ তার সঙ্গেই ছিল ‘অদীনা স্যাম শরদঃ শতম্’। ‘অদীনাঃ’ মানে ‘নীরোগাঃ’। দীর্ঘজীবন দিয়ে কী হবে যদি তা রোগজরুর হয়। পৃথিবীর সব ভাষার চিকিৎসকবাচক শব্দগুলোর অর্থ জ্ঞানী, অসামান্য (doctor, তবীব, হেকিম, বৈদ্য < বিদ্যা ইত্যাদি)।

আমরা আশা করব, তাঁরা তাঁদের সাধ্যমতো যতটা সম্ভব ততটা নিশ্চয় করবেন। নবজীবনের নকিব তো তাঁরাই। নবজীবনের গান লিখেছিলেন জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র :

মরে যেতে দেব না

দেব না দেব না।

আমরা চিকিৎসক

ফুটো আয়ু মোরা জোড়া দিই

আর হেঁড়া দেহে জুড়ি দ্বক।

আহত বৃগুণ জীর্ণ ভয়

সকলেরে দিই আশা

আবার ফোটাব প্রাণের উপনিবেশ

নবজীবনের ভাষা।

সমবেতকণ্ঠে এ-গান একদিন ধ্বনিত হয়েছিল কলকাতার বুকে। এখন সে-গানের মিছিলে शामिल না হলেও সকলের আশাভরসার পাত্র চিকিৎসকেরা নিশ্চয় স্মরণে রাখবেন, তাঁরা জীবক-পদ্ধতির-চরক-সুশ্রুতের ঐতিহ্যবাহী।

সঞ্জননী ধ্বনিসন্নিবেশ ও বাংলা অর্ধস্বর [য়]

মীনা দাঁ

১ প্রস্তাবনা

ব্যাকরণের চৌহদ্দিতে তর্ক কিন্তু চলছেই। কিছু তর্ক মাথা খামায় ভাষার চেহারাটা কেমন হওয়া উচিত তা নিয়ে আর কিছুর মাথা ব্যথা ভাষার চেহারাটা আসলে কেমন তা নিয়ে। প্রথম ধরনের তর্কগুলো মূলত নির্দেশমূলক — বানান কেমন লিখব, ভাষাবর্ণনার ক্ষেত্রে ব্যাকরণের পরিভাষা কি হবে — উত্তম পুরুষ-মধ্যম পুরুষ নাকি আমি পক্ষ-তুমি পক্ষ ইত্যাদি। এই ধরনের তর্কের অবতারণা হয় এক সচেতন ভাষা পরিকল্পনার সদিচ্ছা থেকে। আর দ্বিতীয় ধরনের তর্কগুলো নিছকই তাত্ত্বিক। ভাষা, যে ভাষা ঘুমে-জাগরণে প্রতিনিয়ত আমাদের অস্তিত্বের অবিচ্ছেদ্য অংশ, তার আসল চেহারাটা যে কেমন তা জ্ঞানার কোনো সোজাসুজি উপায় নেই। বক্তা বলে, শ্রোতা শোনে। এই বলা-শোনার আড়ালে ভাষার বাসা বক্তা ও শ্রোতার মগজে। এই মগজে কথা তৈরি হয়, আবার তৈরি করে বলা কথারাও এই মগজেই ঢোকে। এই মগজে কথা তৈরির সাজসরঞ্জামগুলো কেমন? কেমন করে ভাষার ধ্বনিগুলো সাজিয়ে শব্দ তৈরি করে আর শব্দ সাজিয়ে বাক্য তৈরি করে আমরা কথা বলি? অর্থাৎ মেসেজ এনকোড করি? আর কেমন করেই বা শোনা কথা বিশ্লেষণ করে তা থেকে মেসেজ ডিকোড করি? বলা বাহুল্য, এ খবরগুলো সোজাসুজি পাওয়া যায় না, কিন্তু প্রশ্নগুলো নেহাতই নাছোড়বান্দা। তাই তাত্ত্বিকেরা, বিশেষত ভাষাতাত্ত্বিকেরা, ভাষা থেকেই নানান সাক্ষ্য প্রমাণ জোগাড় করে এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে চেষ্টা করেন, আর অবতারণা করেন বিভিন্ন তত্ত্বের। এক একটি তত্ত্ব সৃষ্টি করে ব্যাকরণের এক একটি ধারার। আর বিভিন্ন ধরনের ব্যাকরণের আমদানীতে জমে ওঠে তর্ক। বর্তমান প্রবন্ধটির উদ্দেশ্য এই দ্বিতীয় ধরনের তর্ককে একটু উল্লেখ দেওয়া।

প্রথাগত, তুলনামূলক, ঐতিহাসিক, গঠনবাদী, সঞ্জননী ইত্যাদি উনিশ-বিশ শতকের অনেক পরিচিত ধাপ পেরিয়ে বর্তমানের ব্যাকরণভূমিতে যে তর্কটা আন্তে আন্তে জমে উঠছে তার দুই প্রতিপক্ষের নাম আকরণপক্ষ ও কায়াপক্ষ। আকরণবাদ বা ফর্মালিস্ট থিওরি ব্যাকরণের প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ব। এই তত্ত্বকে চ্যালেঞ্জ জানাতে বাজারে হাজির কায়াবাদ বা সাবস্ট্যান্টিভিস্ট থিওরি তার ব্যাকরণের বিভিন্ন এলাকায় কাজ করার উপযোগী নানান যন্ত্রপাতি নিয়ে। পদাণুতত্ত্ব বা মর্ফলজির এলাকায় এই কায়াবাদ কি রকম যন্ত্রপাতি নিয়ে কেমন ভাবে কাজ করে এবং সে কাজ কেন আকরণবাদী কাজের তুলনায় বেশি সন্তোষজনক তা নিয়ে আলোচনা করেছেন প্রবাল দাশগুপ্ত (২০০৬) তাঁর বিকিরণ, আকরণপক্ষ আর কায়াপক্ষ প্রবন্ধে। কায়াবাদের

পদাণুতাত্ত্বিক প্রযুক্তির নাম অখণ্ডপদবাদ বা হোল্ড ওয়ার্ড মর্যলজি, সংক্ষেপে ডবল্যু ডবল্যু এম। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা ধ্বনিতত্ত্বের এলাকায় কায়াবাদী কাজকর্মের একটা পরিচয় দেব। কায়াবাদের ধ্বনিতাত্ত্বিক প্রযুক্তির নাম সঙ্গননী ধ্বনিসমিবেশ বা জেনারেটিভ ফোনোট্যাক্টিক্স, সংক্ষেপে জিপি। কায়াবাদ ও অখণ্ডপদবাদের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে একে সঙ্গননী ধ্বনিসমিবেশবাদও বলা যেতে পারে।

এবার ধ্বনিসমিবেশ, সঙ্গননী ধ্বনিসমিবেশ ও সঙ্গননী ধ্বনিতত্ত্ব — এই তিনটি প্রয়োজনীয় ধারণাকে একটু স্পষ্ট করা যাক।

ধ্বনিসমিবেশ বনাম সঙ্গননী ধ্বনিসমিবেশ

ধ্বনিসমিবেশ বা ফোনোট্যাক্টিক্স হল ভাষার সেই সমস্ত রীতিনীতি যা বলে দেয় ভাষায় কোন ধ্বনির পর কোন ধ্বনির উচ্চারণ সম্ভব বা অসম্ভব। এই সব রীতিনীতি কাজ করে বলেই কোনো ভাষাকে কানে শুনে ঠিক সেই ভাষা বলে চেনা যায়। এই রীতিনীতি বাড়ির ভিতরে মতো আড়ালে থেকে যে কোনো ভাষীর অজান্তেই তার ভাষার ধ্বনিক বিন্যাসের সম্ভব-অসম্ভবের সম্পূর্ণ অভ্যাসটা গড়ে তোলে। ভাষার এই দিকটা এতটাই আমাদের অগোচরে গভীর গোপনে কাজ করে যে উদাহরণ দিয়ে স্পষ্ট করে দেখিয়ে না দিলে এদিকে নজর যায় না ফলে কি নিয়ে কথা বলা হচ্ছে তাও ধরা যায় না। বাংলা শব্দ *মৃ* বা *ম্ল* দিয়ে শুরু হতে পারে, যেমন *মৃত্তিকা*, *মৃত্যু*, *মৃদু*, *মৃগয়া* বা *ম্লান*, *ম্লচ্ছ* ইত্যাদি। আবার *নৃত্য*, *নৃপতি*, *নৃসিংহ* ইত্যাদির শুরুতে *নৃ* সম্ভব হলেও *ন-এ ল-ফলা* জোড়া অসম্ভব। *অম্লান* শব্দের আদি *অ* বাদ দিলে বাকিটুকু অর্থাৎ *ম্লান* উচ্চারণ বাঙালি জিভে আটকায় না। কিন্তু *ডল্লপ*-এর গোড়ার *ডা* বাদ দিয়ে বাকিটুকু অর্থাৎ *ল্লপ* উচ্চারণের চেষ্টা করে দেখুন। পারবেন না। এই অভ্যাস বা অনভ্যাসটা এতই পাকা যে এই অদ্ভুত বিন্যাসে চোখ-কান-জিভ-মন কেউই সায় দেবে না। আবার ইংরেজির ধ্বনিসমিবেশের রীতি এইসব ক্ষেত্রে বাংলার চেয়ে কম উদার। ওরা শব্দের শুরুতে *ল্ল* তো বলেই না, *মৃ*, *নৃ* বা *ম্ল*-ও কখনও বলে না। উলটোদিকে দেখা যায় বাংলায় শব্দের শুরুতে আসল তালব্য *শ*-এর পর *র* হয় না। বাংলা বানানে *শ্রী*, *শ্রম*, *শ্রান্ত* ইত্যাদি তালব্য *শ* দিয়ে লেখা হলেও আমরা সবাই জানি যে এদের উচ্চারণ *শান্ত্র*-র *শ*-এর মতো নয়, এদের উচ্চারণ *ক্রোত*, *সৃষ্টির* গোড়ার দন্ত্য *স*-এর মতই। অথচ *শ-রীক* (shriek), *শ-রাউড* (shroud), *শ-রিস্প* (shrimp), *শ-রাইন* (shrine), *শ-রাগ* (shrug) বা *শ-স্রিংক* (shrink) বলতে ইংরেজি জিভে আটকায় না।

ধ্বনিসমিবেশ রীতির কিছু রকমফের আছে। শব্দের গোড়ায় যে *ল্ল* বলা যাচ্ছে না এটা মানবজাতির সামগ্রিক অপারগতা। কোনো ভাষাতেই *ল্ল* দিয়ে কথা শুরু হয় না। ধ্বনিসমিবেশের কিছু রীতিনীতি তাই ভাষা নির্বিশেষে সর্বত্র খাটে। অর্থাৎ তারা হল নির্বিশেষ বিধান, যেমন শব্দের আরম্ভে *ল্ল* অচল বা ধ্বনিতত্ত্বের সংকেতে **#ল্ল*। আর কিছু বিধান একেকটা ভাষার নিজস্ব, যেমন বাংলা বা ইংরেজিতে ধ্বনিসমিবেশের অন্যতম বিধান — বাংলায় শব্দের আরম্ভে *শ-র* অচল বা **#শ-র*, ইংরেজিতে শব্দের আরম্ভে *ম্ল* অচল বা **#ম্ল*।

ধ্বনির যে কোনো তত্ত্বই ধ্বনিসমিবেশের এই মূল কথাগুলোকে স্বীকৃতি দেয়। তবে তত্ত্বের সঙ্গে তত্ত্বের তফাৎ বুঝতে চাইলে আর একটু এগিয়ে যেতে হবে।

বাংলা ধ্বনিসমিবেশ শব্দের আরম্ভে, মাঝে বা শেষে কোথাওই র্-ং-গ উচ্চারণ করতে দেয় না। অথচ বাঙালির প্রাণে বড় সাধ *শার্গরব* বলবে। কি উপায়ে? বলতে গিয়ে আটকাচ্ছে দেখে একটা কায়দা বেছে নেয়, র্-এর পর চট করে একটা ও ঢুকিয়ে দেয়, বলে *শারোঙ্গোরব*। ঐ প্রক্ষিপ্ত ও ধ্বনিটা মেরামতি কৌশলজাত। একইভাবে বেশিভাগ বাঙালিই সংস্কৃত বা সংস্কার-কে বলে *সঙ্গেস্কৃত*, *সঙ্গেস্কার*। যা বলা দরকার অথচ উচ্চারণ করতে পারি না তাকে বাঁচানোর এই সব উপায় বা মেরামতি কৌশল সব ভাষাতেই ব্যবহৃত হয়। সব ভাষাতেই প্রক্ষিপ্ত স্বরধ্বনি থাকে, যদিও তার ও চেহারাটা বাংলার নিজস্ব।

অতএব দেখা যাচ্ছে ধ্বনিসমিবেশের বিধিনিষেধের সঙ্গে সঙ্গে মেরামতি কৌশলকেও ধ্বনিতত্ত্বে স্বীকৃতি দিতে হচ্ছে।

সঞ্জ্ঞানী ধ্বনিসমিবেশ বনাম সঞ্জ্ঞানী ধ্বনিতত্ত্ব

আগেই বলেছি কায়াদাদের ধ্বনিতাত্ত্বিক প্রযুক্তির নাম সঞ্জ্ঞানী ধ্বনিসমিবেশ। যারা সঞ্জ্ঞানী ধ্বনিসমিবেশের পক্ষে, সেই ব্যাকরণবিদদের মতে কোনো ভাষার ধ্বনিতত্ত্বের কাজকর্ম যথাযথভাবে করার জন্য ধ্বনিসমিবেশ-বিধান ও মেরামতি কৌশল ছাড়া আর কোনো সরঞ্জামের প্রয়োজন হয় না।

তত্ত্বের ভূমিতে এরই বিপরীতে দাঁড়িয়ে সঞ্জ্ঞানী ধ্বনিতত্ত্ব বা জেনারেটিভ ফোনোলজির গবেষকরা। এদের মতে ধ্বনিসমিবেশের বিধিনিষেধ ও মেরামতি কৌশল ছাড়াও তৃতীয় একটি সরঞ্জাম থাকা দরকার গবেষকের পুঞ্জিতে — থাকা দরকার ধ্বনিতাত্ত্বিক সূত্র। সেটা কি? উদাহরণ দিই।

বাংলায় *কাটা* ক্রিয়ার অনুজ্ঞা ভাবের গুরু আকৃতি *কাটুন*, *আনা* ক্রিয়ার *আনুন*, অথচ *পাওয়া*, *খাওয়া* ক্রিয়ার বেলায় *পাউন*, *খাউন* না হয়ে হয় *পান*, *খান* — এই তথ্যটা দেখে সঞ্জ্ঞানী ধ্বনিতত্ত্বের অনুসারীরা বলে, আসলে কথটা তলে তলে *পাউন*, *খাউন*; স্বরান্ত ক্রিয়া-ধাতুর বেলায় ব্যঞ্জনান্ত বিভক্তির স্বরধ্বনি লুপ্ত হবে — এই ধরনের একটি ধ্বনিসূত্র প্রয়োগ করে *পাউন*, *খাউন* থেকে উ ধ্বনি লোপ করে উচ্চারণ বাজারে চালু *পান*, *খান* আকৃতিগুলো পাওয়া গেছে।

ব্যাকরণের পেটে *পাউন-খাউন* আর মুখে *পান-খান*, এই পেটে এক আর মুখে আরের বাণী সঞ্জ্ঞানী ধ্বনিসমিবেশের গবেষকদের নেহাতই অপছন্দ। ধ্বনি বিষয়ে তাদের বক্তব্যটা বোঝার চেষ্টা করা যাক। তারা বলছে বাংলায় যখন *আউশ*, *বাউল*, *ঢাউস* উচ্চারণ করা যাচ্ছে তখন *পাউন*, *খাউন* বলার বাধাটা নিশ্চয়ই উচ্চারণের সাধ্য-অসাধ্য বা সম্ভব-অসম্ভবের বিধিনিষেধজাত নয়। কই, ইংরেজি *ডাউন*-তো আমাদের ভাষায় ঢুকে *ডন* হয়ে যায় না, বা *পাউন্ড*-কে তো *পাণ্ড* বলি না। আমরা তাহলে *পাউন*, *খাউন* বলতে গিয়ে *পান*, *খান* বলছি — এ ভাবে ভাববার কোনো যুক্তি নেই। ব্যাকরণে স্বীকার করা দরকার যে আমরা *পান*, *খান* বলতে চাই বলেই *পান*, *খান* বলছি, কোনো ধ্বনিক বাধ্যবাধকতায় বলছি না। কায়াদাদ এই ধ্বনিক বাধ্যবাধকতার বাইরের উচ্চারণের ঐচ্ছিক হেরফেরগুলোকে পদাণুতত্ত্বের এলাকাভুক্ত করে ব্যাকরণের দায়িত্বের এলাকা আলাদা রাখে। আর সঞ্জ্ঞানী ধ্বনিতত্ত্ব এই ঐচ্ছিক হেরফেরগুলো ব্যাখ্যা করে পদাণুধ্বনিতত্ত্বে যা সঞ্জ্ঞানী ধ্বনিতত্ত্বেরই একটি উপ-এলাকা। দুটো ধরনকেই

ধ্বনিতত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত করার ফলে সঙ্গননী ব্যাকরণ এই ঐচ্ছিক ও বাধ্যবাধকতার মধ্যে তফাৎ স্বীকার করার দায় মেটাতে পারে না। পদাণুধ্বনিতত্ত্বের গরজ এসে পড়ে বলে সঙ্গননী ধ্বনিতাত্ত্বিক বলতে বাধ্য হন যে ভাষার অন্দরমহলের *পাউন ষাউন*-কে সদরমহলে *পান খান*-এ রূপান্তরিত করার জন্যে ভাষা বিশেষ ফতোয়া জারি করে। সেই ফতোয়া হচ্ছে ধ্বনিতাত্ত্বিক সূত্র। যেমন, বাঁদিকে স্বর আর ডানদিকে ব্যঞ্জন থাকলে ক্রিয়া বিভক্তির শুরুরূপে উ লোপ পায়, যে সূত্রের আকৃত চেহারা [উ—>০/স্ব]ক্রি—ব্য।

একবার ফতোয়া জারি করার বন্দোবস্ত করলে তখন অভোসবশত উচ্চাৰ্য-অনুচ্চাৰ্যের স্বাভাবিক তফাতগুলোর ফলে যেসব মেরামতি কৌশল কাজ করে সেগুলোকেও তাত্ত্বিক ‘ওই হলো’ বলে সূত্রের আকারে লিখে ফেলেন। সূত্রের সাহায্যেই *শাঙ্গোরব্*-কে পালটে *শারোগোরব্* করে দেন। এই দুই প্রযুক্তি একাকার হয়ে যাওয়ায় সঙ্গননী ধ্বনিতত্ত্বের কার্যধারা ভাষার গতি-প্রকৃতির একটা জরুরি দিককে চাপা দিয়ে দেয়। বাংলায় যে *শাঙ্গোরব্* না বলে আমরা *শারোগোরব্* বলি তার কারণ বাংলার ধ্বনিসমিবেশ রীতিতে *শাঙ্গোরব্* অনুচ্চাৰ্য। কিন্তু *পাউন ষাউন*-এর বদলে যে *পান খান* বলি সেটা কোনো বাধ্যবাধকতার ফল নয়, নিছকই বাংলার খেয়ালখুশি। তাই সবকিছুতে সূত্র জারি হলে মুশকিলটা এই যে *শাঙ্গোরব্*-কে *শারোগোরব্* বলাটাকেও তখন খেয়ালখুশির মতো দেখায়।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে সঙ্গননী ধ্বনিতত্ত্ব বলে স্বরাস্ত্র ধাতু *খা*, *পা*-র পর ব্যঞ্জনাস্ত্র বিভক্তির আরম্ভের স্বর কেটে বাদ দিতে হবে সূত্রের নির্দেশে, আর সঙ্গননী ধ্বনিসমিবেশ-পক্ষ *পান খান*-এর চেহারা ঠিক রাখার কাজটা ধ্বনিতত্ত্বের এলাকায় এনে না ফেলে পদাণুতত্ত্বের ওপর সেই দায়িত্ব অর্পণ করে। প্রযুক্তি বিষয়ক এই সিদ্ধান্তের পিছনে অবশ্য শুধু বর্তমান প্রবন্ধে উল্লিখিত ধ্বনিতাত্ত্বিক যুক্তি ছাড়া পদাণুতাত্ত্বিক যুক্তিও আছে। আগেই বলেছি যে সঙ্গননী ধ্বনিসমিবেশ হল ধ্বনিতত্ত্বে কায়াবাদের রূপায়ণ। কায়াবাদীরা শব্দকে কেটে ছিঁড়ে ধাতু বা বিভক্তির মত বিমূর্ত বস্তুর অস্তিত্ব কল্পনা করার বিরুদ্ধে। তাঁর পদাণুতত্ত্ব বিষয়ক প্রবন্ধে প্রবাল দাশগুপ্ত (২০০৬) দেখিয়েছেন এইসব বিমূর্ত-ধারণাকে বাদ দিয়ে কায়াবাদীরা কিভাবে আরও বাস্তবসম্মত উপায়ে তাদের পদাণুতাত্ত্বিক প্রযুক্তিকে ঢেলে সাজায়। সূত্রাং এই সব বাতিল ধারণা যে সঙ্গননী ধ্বনিসমিবেশের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না তা বলাই বাহুল্য।

সঙ্গননী ধ্বনিতত্ত্ব ব্যবহৃত ‘ছিল-ওই হল এই’ ধরনের গাণিতিক ধ্বনিসূত্রগুলো একধরনের আকরণ। শুধু ধ্বনিতত্ত্ব নয়, সঙ্গননী ধারার ব্যাকরণের অবয়ব জুড়েই এমনসব আকরণের সমারোহ যাকে ভাষা হচ্ছে একেকটা ভাষার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। এই অর্থে সঙ্গননী ধ্বনিতত্ত্ব-ভিত্তিক যে ব্যাকরণ তা আকরণবাদী। আমরা যে কায়াবাদের পক্ষে সেই আদলের সঙ্গননী ব্যাকরণ প্রত্যেক ভাষার নিজস্বতার আসল ঠিকানা হিসেবে তার শব্দকোষকেই চরম গুরুত্ব দেয়। কোষস্থ শব্দশরীর বা শব্দকায়াদের দায়িত্ব পালনের সহায়কের ভূমিকায় কিছু কিছু আকরণ নামে বইকি। কিন্তু কায়াবাদে সেই আকরণ সচরাচর ভাষা নির্বিশেষে ক্রিয়াশীল; খুব কম প্রযুক্তিই ভাষাবিশেষে প্রযোজ্য। দুই পক্ষের মূল তফাতের জায়গাটা এইখানে।

উপরোক্ত জরুরি আলোচনাটা মাধ্যম রেখে এবার আমাদের আলোচ্য সমস্যার দিকে তাকাবো। সঙ্গননী ধ্বনিসমিবেশবাদের সরঞ্জাম কিছু ধ্বনিসমিবেশ বিধান, যার পোশাকী নাম আকল্প বজ্র বিধান বা ওয়েল ফরমেডেনেস কনডিশন সংক্ষেপে ডবল্যু এফ সি এবং কিছু

মেরামতি কৌশল বা রিপেয়ার স্ট্র্যাটেজি, সংক্ষেপে আর এস। এই সঙ্জননী ধ্বনিসম্মিবেশ ও অশব্দপদবাদের সরঞ্জাম ব্যবহার করে কায়াবাদী ব্যাকরণ ধারায় ভাষায় বাংলা অর্ধস্বর [য়]-র ধ্বনিকল্পী বা ধ্বনিবিকল্পী অবস্থান বিশ্লেষণ করব।

২ সমস্যা

বাংলায় স্বরধ্বনি ও অর্ধস্বরধ্বনির অবস্থান ঘিরে কিছু বিতর্ক আছে। তত্ত্ব, উপাত্ত ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক খুঁটিনাটি সহযোগে এই স্বর অর্ধস্বরের সমস্যাটির বর্ণনা করা যাক।

বাংলার সাতটি স্বরধ্বনি, ই, উ, এ, ও, ঐ, অ এবং আ সাতটি ধ্বনিকল্প — এই মত নিয়ে ব্যাকরণের কোনো ধারাতেই যেমন কোনো বিতর্কের অবকাশ নেই, ঠিক তেমনই বাংলার চারটি অর্ধস্বরধ্বনি চারটি স্বতন্ত্র ধ্বনিকল্প না তাদের জুটি চারটি স্বরধ্বনির ধ্বনিবিকল্প তা নিয়ে বিতর্কের অন্তও নেই। এই বিতর্কের প্রচলিত দুটি ধারা আলোচনার আগে একটু বুঝে নেওয়া যাক বাংলা অর্ধস্বরের নিজস্ব কিছু অসুবিধেকে।

ই, উ, এ এবং ও স্বরধ্বনির সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধা চারটি অর্ধস্বর বাংলায়, যাদের আন্তর্জাতিক ধ্বনিলিপিতে চেহারা যথাক্রমে [y, w, Y, W]। কিন্তু বাংলা লিপিতে এই চারটির জন্য কোনো সুস্পষ্ট স্বচ্ছ ব্যবস্থা নেই। যেমন, দই বা দৈ, কই বা কৈ, বউ বা বৌ, মউ বা মৌ — দুরকমই লেখার চল, কিন্তু মউমাছি বা কইকেয়ী চলে না; বই-এর জায়গায় বৈ চলে না; তুমি কৈ লিখলে তার অর্থ ‘তুমি কোথায়’, ‘তুমি কে’-র সঙ্গে এক শ্রেণিভুক্ত না হয়ে ‘তুমি বাদর’, ‘তুমি ইঁদুর’-এর সঙ্গে দল বাঁধে। আবার উচ্চারণে অর্ধস্বর থাকে সন্তোষ লেখায় শ্যাওলা, পাওনা, ন্যাওটা, মওকা ইত্যাদিতে অর্ধস্বরের উপস্থিতি দেখানোর কোনো পছন্দ নেই। গয়না, বায়না, ময়না ইত্যাদিতে য়-কে এ স্বরের জুটি অর্ধস্বর বলে চেনা গেলেও সেয়ানা, কায়িক, খাওয়া, গোয়াল ইত্যাদির উচ্চারণে এ-র নামগন্ধও নেই।

অতএব দেখা যাচ্ছে ভাষায় অর্ধস্বরের উপস্থিতির ব্যাপারে চোখ নয়, কানের সাক্ষ্যই অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য। লেখা চোখে দেখে উচ্চারণে কোন অর্ধস্বরটি আসবে তা সাক্ষর মাতৃভাষীরা একটা চালু দস্তুর অনুযায়ী বুঝে নেয় ঠিকই কিন্তু কানে শুনে ঠিক অর্ধস্বরটি চেনা তুলনায় অনেক সহজ ব্যাপার। যেমন, বউ, ঢেউ, পিউ, লাউ শেষ হচ্ছে উ স্বরের জুটি অর্ধস্বরে; শ্যাওলা, পাওনা, ন্যাওটা, মওকা-র মাঝে রয়েছে ও-এর জুটি অর্ধস্বরটি; বই, নেই, রাই, দুই, তুমিই শেষ হচ্ছে ই-র জুটি অর্ধস্বরে আর আয়ু, ব্যয়, জয়, শোয় শেষ হচ্ছে এ-র জুটি অর্ধস্বরে — কানে শুনে এই তফাতটা নির্ভুলভাবে চেনা যায়। তাই বাংলা অর্ধস্বর চেনার ক্ষেত্রে লেখাকে সরিয়ে রেখে কানে শোনানোই বেশি জরুরি।

এই অসুবিধের জন্যে প্রবন্ধে অর্ধস্বরের উল্লেখ করার উপযুক্ত পছন্দ হল আন্তর্জাতিক ধ্বনিলিপি ব্যবহার করা। তবে আলোচ্য প্রবন্ধ যেহেতু শুধুমাত্র এ স্বরধ্বনি ও তার জুটি য় অর্ধস্বরকে নিয়ে মাথা ঘামাবে এবং যেহেতু এ অথবা য় ধ্বনির অভিপ্রেত উচ্চারণ খুব অস্পষ্ট নয় তাই এখানে আন্তর্জাতিক ধ্বনিলিপির জটিলতায় না গিয়ে প্রথাগত বানানই ব্যবহার করছি এবং আশা করছি পাঠক উচ্চারণের দস্তুর মাথায় রেখেই বানানের দিকে মনোনিবেশ করবেন।

এবার ফিরে আসি পূর্বোদ্ধৃতিত বিতর্কের দুটি ধারা প্রসঙ্গে। গঠনবাদী বা স্ট্রাকচারালিস্ট

ভাষাতত্ত্বের সীমানাতেই বাংলা অর্ধস্বরের দু-ধরনের মূল্যায়ন দেখা যায় — এক মতে অর্ধস্বর ধ্বনিকল্প, অন্য মতে অর্ধস্বর ধ্বনিবিকল্প।

চ্যাটার্জী (১৯৬২:২৫)-এর মতে বাংলা অর্ধস্বরগুলো স্বরধ্বনির সঙ্গে পরিপূরক সম্পর্কে আবদ্ধ থাকে এবং এগুলো স্বরধ্বনিরই ধ্বনিবিকল্প মাত্র। বিপরীতে রায় ও অন্যান্য (১৯৬৬: ৪)-র মতে বাংলা অর্ধস্বরগুলো তাদের স্বরধ্বনি জুটির মতই ধ্বনিকল্প। তবে উভয় মতেই বাংলা অর্ধস্বরের দলশীর্ষ হয়ে দল নির্মাণ করার যোগ্যতা নেই।

কৃষ্ণ ভট্টাচার্য (১৯৯৩) ও সুমিত্রা ভট্টাচার্য (২০০৫) চ্যাটার্জী (১৯৬২)-কে সমর্থন করে তথ্য যুক্তি সহযোগে দেখিয়েছেন যে বাংলা ধ্বনিতত্ত্বে অর্ধস্বরের অবস্থান ধ্বনিবিকল্প হিসেবেই।

যে তথ্যের ভিত্তিতে এই প্রবন্ধের অবতারণা তার দাবিতে আমরা গঠনবাদী তত্ত্বের সীমানা পেরিয়ে কায়াবাদী তত্ত্বের আশ্রয়ে সমস্যার সমাধান খুঁজব এবং এই দুই দৃষ্টিকোণের চেয়ে সামান্য পৃথক এক দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলা অর্ধস্বরের মূল্যায়ন করব। আমরা শুরু করব চ্যাটার্জী (১৯৬২)-র সূত্র ধরে — শব্দকোষ বা লেক্সিকনে শব্দের বিস্থানে থাকে শুধুই স্বরধ্বনি; অর্ধস্বরধ্বনি সৃষ্টি হয় কিছু প্রক্রিয়া বা প্রসেস প্রয়োগের ফলস্বরূপ। আগেই বলেছি আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকবে *এ-য়* এই স্বর-অর্ধস্বর জুটিতে এবং বিশ্লেষণের তাত্ত্বিক সরঞ্জাম সংগ্রহ করব কায়াবাদের অখণ্ডপদবাদ ও সঙ্গননী ধ্বনিসম্মিবেশবাদ থেকে।

এই প্রবন্ধের প্রস্তাব অনুসারে বাংলা অর্ধস্বর [য়] মূলত স্বরধ্বনি /এ/-র একটি প্রতিস্থাপিত আকৃতি; স্বরধ্বনির অব্যবহিত পরবর্তী /এ/, ধ্বনিতাত্ত্বিক প্রতিস্থাপন মেরামতি কৌশল প্রয়োগের ফলে [য়]-তে পরিবর্তিত হয়, অর্থাৎ [য়] হল ধ্বনিবিকল্প; তবে কিছু সীমিত ক্ষেত্রে ধ্বনিকল্প হিসেবেও /য়/-কে পাওয়া যায়। এই /য়/-কে শব্দকোষে শব্দ তৈরির সরঞ্জাম 'প্রতিরূপ ছক' প্রয়োগের ফলস্বরূপ পাওয়া যায়।

এবার তাকানো যাক সমস্যা সঙ্কুল উপাস্তের দিকে।

১। ক) সর্দার সরোবর বাঁধের পুনর্বাসন প্রসঙ্গে সরকার গা করছে না।

চার কিলোমিটার হেঁটে তার পা ফুলে ঢোল।

খ) গায়ে হাত তুললে দেখে নেব কিম্বদ।

কাটল কোন পায়ে — ডান না বাঁ?

২। ক) এবার গাছে নতুন পাতা আসবে।

কেন যে এই ভুতের বোকা বইছে।

খ) তুমি চল ডালে ডালে আমি চলি পাতায় পাতায়।

আমার তিনখানা বই তোমার বোকায়া পুরে দিয়েছি।

৩। ক) প্রথমে একটা রবীন্দ্রসঙ্গীত গা।

আগে মাইনেটা হাতে পা, তারপর কেনা কাটা কর।

খ) বীধি কি নজরুল গীতি গায়?

কাজল অঙ্কে বরাবরই ভাল নম্বর পায়।

৪। ক) প্রথমে তো আকাশের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতা।

তোরা নীলকে একটু বোঝা।

খ) জোনাক প্রথম দিনেই ক্লাসের ছেলেদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতায়।

সুমন্ত অঙ্কটা বোঝায় ভাল।

প্রাসঙ্গিক আকৃতিগুলো হল—

৫। ক) একদল বিশেষ্য : গা, পা

খ) তজ্জাত অধিকরণ : গায়ে, পায়ে

৬। ক) দ্বিদল বিশেষ্য : পাতা, বোঝা

খ) তজ্জাত অধিকরণ : পাতায়, বোঝায়

৭। ক) একদল ক্রিয়া : গা, পা

খ) তজ্জাত প্রথম পুরুষ বর্তমান ক্রিয়া : গায়, পায়

৮। ক) দ্বিদল ক্রিয়া : পাতা, বোঝা

খ) তজ্জাত প্রথম পুরুষ বর্তমান ক্রিয়া : পাতায়, বোঝায়

৫ক ও ৭ক-এর আকৃতিগুলো যথাক্রমে বিশেষ্য ও ক্রিয়া হলেও সমোচ্চারিত; এদের প্রত্যয়ান্ত আকৃতি ৫খ ও ৭খ কিন্তু সমোচ্চারিত নয় — ৫ক-এর গায়ে যে লাগিয়ে হয়েছে ৫খ, কিন্তু ৭ক-এর গায়ে য় লাগিয়ে হয়েছে ৭খ। ৬ক ও ৮ক যথাক্রমে বিশেষ্য ও ক্রিয়া হলেও সমোচ্চারিত; এদের প্রত্যয়ান্ত আকৃতি ৬খ ও ৮খও সমোচ্চারিত — সবেরই অন্তে রয়েছে য়। আবার ৫খ ও ৬খ উভয়েই স্বরান্ত, বিশেষ্য, ও অধিকরণ হলেও ৬খ-এর অন্তে য়, কিন্তু ৫খ-এর অন্তে য়ে, যদিও এদের সমান্তরাল ৭খ ও ৮খ-এর আকৃতির অন্তে কোনো পার্থক্য নেই — উভয়ই য়।

সংক্ষেপে বলা যায়, ৬খ, ৭খ ও ৮খ-এর অন্তে রয়েছে অর্থস্বর য়, কিন্তু ৫খ-এর অন্তে রয়েছে স্বর-এ। স্বর-অর্থস্বরের এই পর্যায়ক্রমিক বিন্যাস সমস্যার সমাধান ও বিশ্লেষণই এই প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য। প্রবন্ধে সমস্যার কিছু অংশের পদাণুতাত্ত্বিক সমাধান ও বাকি অংশের ধ্বনিতাত্ত্বিক সমাধানের প্রস্তাব করা হয়েছে। ৭ক ও ৮খ-এর সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা হয়েছে পদাণুতত্ত্বের প্রতিরূপ ছকের সাহায্যে, অন্যপক্ষে ৫, ৬ ও ৮-এর ক ও খ-এর সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা হয়েছে প্রতিরূপ ছক ছাড়াও ধ্বনিতত্ত্বের সরঞ্জাম আকল্প বর্জন বিধান ও মেরামতি কৌশলের সাহায্যে।

আশা করি পাঠকের কাছে এতক্ষণে অন্তত এইটুকু স্পষ্ট হয়েছে যে ওপরের উপাত্তে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ জোড় হল ৫খ ও ৭খ, অর্থাৎ গায়ে বনাম গায়, পায়ে বনাম পায়। এই বিশেষ্য-ক্রিয়া জোড়গুলোর উচ্চারণের ক্ষেত্রে বাংলাভাষীদের মধ্যে অনেক সময়ে মতানৈক্য দেখা যায়। একদল ভাষীর বিচারে এই জোড়গুলো সমোচ্চারিত, অর্থাৎ উভয়েই একদল। আবার অন্যদের বিচারে বাস্তবিকই এদের মধ্যে একদল, দ্বিদলের পার্থক্য বর্তমান। বলা বাহুল্য, এ রকম দ্বিবিধ বিচার উপাত্তকে বিতর্কিত করে তোলে। এই বিতর্কে আমার বস্তু হল :

প্রথমত, কোনো মাতৃভাষীই ৫খ-এর দ্বিদল উচ্চারণকে ভাষায় অগ্রহণযোগ্য বলে নস্যাৎ করেন না। একদলের সমর্থকরা খুব জোর দাবি করেন যে ‘আমার উচ্চারণে ৫খও একদল’।

দ্বিতীয়ত, লেখার রীতিতে যেভাবে একদলের থেকে দ্বিদলকে আলাদা করা হয় ঠিক সেভাবেই ৭খ-এর থেকে ৫খ-কে আলাদা করে লেখা হয়। অর্থাৎ লেখার সাক্ষ্যে ৫খ প্রস্তাভীতভাবে দ্বিদল।

তৃতীয়ত, একশাব্দিক বাক্যে সকল বাংলাভাবীর মুখেই ৫খ সন্দেহাতীতভাবে দ্বিদল। যেমন, 'চিনি কিসে দেবো?' এই প্রশ্নের একশাব্দিক উত্তরে প্রত্যেক ভাবীই স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করেন 'চায়ে'।

চতুর্থত, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৯২৮/১৯৮৬:২০) ৫খ-এর দ্বিদল উচ্চারণের পক্ষে বলেছেন— "In slow, deliberate speech the vowels may generally be pronounced as distinct syllables; but sometimes when two vowels form separate syllables and not a diphthong, there is difference in meaning : e.g... নায় 'bathes', নায়ে 'by boat', সয় 'endures', শয়ে 'per hundred'."

পঞ্চমত, দ্রুত গতিতে বলা কথায় দ্বিদলের একদল হয়ে যাবার প্রবণতা থাকলেও কথার স্বাভাবিক গতিতে ৫খ দ্বিদলই। আর আমরা তো এ প্রবন্ধে অতিদ্রুত কথার ধরন নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি না।

ষষ্ঠত, আ-অন্ত বিশেষ্য ছাড়াও অন্যান্য বিশেষ্য অধিকরণের দ্বিদলত্বও ৫খ-এর দ্বিদলত্বের পক্ষেই সাক্ষ্য দেয়। যেমন, হাতি দিয়ে পড়েছে; উদ্ধৃতিটা তুমি শয়ে পাবে; কোন শোয়ে ফিল্মটা দেখবে? ইত্যাদি।

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে ৫খ ও ৭খ জোড় যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ সমস্যাকে তুলে ধরেছে এবং এর সমাধান ও বিশ্লেষণও জরুরি।

এখানে একটু বলে রাখা ভাল যে এই প্রত্যয়, প্রত্যয়ান্ত, প্রত্যয়বিহীন ইত্যাদি পরিভাষা হল আকরণবাদী ব্যাকরণের পরিভাষা এবং এর ব্যবহার সতর্ক কায়াবাদী ব্যাকরণচর্চায় একেবারেই অচল। তা সত্ত্বেও এইসব ধারণার সঙ্গে পাঠকের পূর্বপরিচিতির সুযোগটুকু সদ্যবহারের জন্য আমাদের বর্তমান (ঈষৎ শিথিল) কায়াবাদী আলোচনায় আমরা এইসব পরিভাষার সাহায্য মাঝে মধ্যেই নেব এবং সঙ্গননী ধ্বনিসমিবেশ অর্থেই ধ্বনিতত্ত্ব শব্দটি ব্যবহার করব।

৩ বিশ্লেষণ

উদাহরণ ৫, ৬, ৭ ও ৮-এর প্রত্যেকটির ক ও খ আকৃতিগুলো পরস্পরের সঙ্গে পদাণুতাত্ত্বিক সম্পর্কে আবদ্ধ। অখণ্ডপদবাদ এই পারস্পরিক সম্পর্ককে প্রকাশ করে প্রতিরূপ ছকের মাধ্যমে।

প্রতিরূপ ছকের সাহায্যে তৈরি শব্দদের অবস্থান শব্দকোষ বা লেক্সিকনে। শব্দকোষে প্রতিটি শব্দের বহুমুখী পরিচয় নথীবদ্ধ থাকে। যেমন, শব্দটির অর্থ, তার পদাণুতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, ব্যাকরণিক বর্গ ইত্যাদি। এই বহুমুখী পরিচয়ের অন্যতম হল শব্দটির ধ্বনিক আকৃতি। শব্দকোষে শব্দশরীর তৈরি হয় ধ্বনিকল্প দিয়ে। ধ্বনিকল্প এখানে স্থান পায় না।

শব্দকোষের শব্দদের কোনো কোনোটির উচ্চারণ ভাষায় গ্রহণযোগ্য, কারণ তা ভাষার ধ্বনিতত্ত্বের ধ্বনিসমিবেশ বিধানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, কোনো কোনোটির আবার তা নয়। অর্থাৎ কোনোটির চেহারা ধ্বনিসমিবেশ বিধানের সঙ্গে খাপ খায়, কোনোটির খায় না।

এই শব্দকোষ থেকে বেরিয়ে মুখের উচ্চারণে ধ্বনিত হবার আগে প্রতিটি শব্দকে

ধ্বনিতত্ত্বের ছাড়পত্র পেতে হয়। এটা যেন শব্দকোষের দরজার চৌকাঠ ডিঙোনো। চৌকাঠের একপারে শব্দকোষ আর অন্য পারে উচ্চারণ বাজার। যে শব্দের ধ্বনিসম্ভব ধ্বনিতত্ত্বের নির্দিষ্ট ধ্বনিসম্ভবের সঙ্গে খাপ খায় সেই শব্দকে ধ্বনিতত্ত্ব একবাক্যে চৌকাঠ ডিঙোনোর ছাড়পত্র দেয়। আর যার ধ্বনিসম্ভব খাপ খায় না তাকে ধ্বনিতত্ত্ব প্রয়োজনীয় মাজাঘষা করে, খাপ-খাওয়ানো সম্ভবেরে সুপ্তরিত করে তবেই ছাড়পত্র দেয়।

এই চৌকাঠ ডিঙোনোর আগে অবধি অর্থাৎ শব্দকোষের শব্দের ধ্বনিক চেহারাকে বলা হয় ধ্বনিকল্পী বিশ্বন বা ফোনিমিক রেপ্রেজেন্টেশন, আর চৌকাঠ ডিঙোনোর পরের অর্থাৎ উচ্চারণ বাজারের শব্দের ধ্বনিক চেহারাকে বলা হয় ধ্বনি বিশ্বন বা ফোনেটিক রেপ্রেজেন্টেশন।

এই চিত্রকল্প থেকে একটা কথা স্পষ্ট হওয়া দরকার যে যে শব্দরা একবাক্যে ধ্বনিতাত্ত্বিক ছাড়পত্র পায় তাদের ধ্বনিকল্পী বিশ্বন ও ধ্বনি বিশ্বনে কোনো ফারাক থাকে না; আর যারা ছাড়পত্র পায় না তাদের এই দুই বিশ্বনে ফারাক পূরণ হয় ধ্বনিতত্ত্বের বিভিন্ন কারিকুরিতে। এইভাবে ফারাক পূরণ হলে তবেই তারা উচ্চারণ বাজারে ছাড়পত্র পায়।

এবার পদাণুতত্ত্বের সরঞ্জাম প্রতিরূপ ছক, ধ্বনিতত্ত্বের কারিকুরি, এবং পদাণুতত্ত্ব ও ধ্বনিতত্ত্বের সীমারেখার পরিপ্রেক্ষিতে উদাহরণ ৫, ৬, ৭, ৮-এর আকৃতিগুলোর বিভিন্ন সমীকরণ বিশ্লেষণ করা যাক।

৯। গায়
পায়
যায়
সয়
চায়

৯-এর আকৃতিগুলো ৭খ-এর তুল্য — অর্ধস্বরাস্ত একদল ক্রিয়া। ৯-এর আকৃতির সঙ্গে ৭ক-এর মুক্তদল আকৃতির (অর্থাৎ গা, পা ইত্যাদি) পদাণুতাত্ত্বিক সম্পর্ক বিশ্লেষণের জন্য উপাস্তের পরিধি বাড়ানো যাক ১০-এ:

১০। গা ‘মধ্যম পুরুষ, তুচ্ছ গৌরব, অনুজ্ঞা’/গায় ‘প্রথম পুরুষ, সামান্য গৌরব, বর্তমান’
পাত ‘ঐ’ /পাতে ‘ঐ’

পাতে ও গায় দুটিই বর্তমান কালের আকৃতি হলেও দেখা যাচ্ছে পাতে শেষ হয় এ স্বরে কিন্তু গায় শেষ হয় ঐ অর্ধস্বরে। এই পার্থক্যের ব্যাখ্যা কি?

এবার তাকানো যাক ৫খ-এর তুল্য আরও কিছু আকৃতির দিকে।

১১। গায়ে
পায়ে
জায়ে
শায়ে
চায়ে

বলা বাহুল্য, শব্দাস্ত ঞ্-কে গুরুত্ব না দিয়ে যে ১১-র পদাণুতাত্ত্বিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা

যায় না তা দেখা যায় ১২-তে—

১২। গা/গায়ে ‘অধিকরণ’

পা/পায়ে ‘ঐ’

জা/জায়ে ‘ঐ’

শ/শয়ে ‘ঐ’

চা/চায়ে ‘ঐ’

১২-র প্রাসঙ্গিক পদাণুতাত্ত্বিক সম্পর্কটা বোঝানোর জন্য উপাস্তের পরিধি বাড়িয়ে ১৩-র সঙ্গে তুলনা করা প্রয়োজন—

১৩। ঘর/ঘরে ‘অধিকরণ’

দিন/দিনে ‘ঐ’

রাত/রাতে ‘ঐ’

ভয়/ভয়ে ‘ঐ’

লয়/লয়ে ‘ঐ’

তুলনায় দেখা যাচ্ছে ১২-র গা ইত্যাদি স্বরাস্ত এবং ১৩-র ঘর ইত্যাদি ব্যঞ্জনাস্ত উভয় প্রকার আকৃতির অন্তর্গত অধিকরণে -এ থাকলেও ১২-র আকৃতিতে -এর অব্যবহিত পূর্বেই রয়েছে একটি অর্থস্বর য়, যার ব্যাখ্যা দেওয়া প্রয়োজন।

এবার তাকানো যাক ১৩-র সঙ্গে তুলনীয় ক্রিয়ার দিকে যার প্রত্যয়বিহীন আকৃতি ব্যঞ্জনাস্ত ও একদল—

১৪। কর ‘মধ্যম পুরুষ, তুচ্ছ গৌরব, অনুজ্ঞা’ / করে ‘প্রথম পুরুষ, সামান্য গৌরব, বর্তমান’

লেখ ‘ঐ’ / লেখে ‘ঐ’

গোন ‘ঐ’ / গোনে ‘ঐ’

পাত ‘ঐ’ / পাতে ‘ঐ’

কাঁদ ‘ঐ’ / কাঁদে ‘ঐ’

১৩-র মতই ১৪-র আকৃতিগুলোতেও পদাণুতাত্ত্বিক সম্পর্ক নির্ধারিত হয়েছে প্রত্যয়বিহীন ক্রিয়া আকৃতির অন্তর্গত -এ যোগ করে।

এই উপাস্তের ভিত্তিতে অখণ্ডপদবাদ নির্মাণ করবে দুটি প্রতিরূপ হক ১৫ ও ১৬, ঠিক নিচের মতো—

১৫। [ক্ষ] হি <—> [ক্ষএ] হি অধি

১৬। [ক্ষব্য] ক্রি, মণু, তু, অ <—> [ক্ষব্যএ] ক্রি, মণু, সা, ব

১৫-র পাঠ : বিশেষ্যের সঙ্গে এ জুড়লে তা বিশেষ্য অধিকরণ হয়; অথবা দুমুখো তীরের সৌজন্যে ১৫-কে বিপরীত দিক থেকেও এইভাবে পাঠ করা যায় যে অধিকরণ বিশেষ্য যার অন্তর্গত রয়েছে -এ তা থেকে -এ বাদ দিলে প্রত্যয়বিহীন বিশেষ্য পাওয়া যায়।

১৬-র পাঠ : ব্যঞ্জনাস্ত (ব্য), মধ্যম পুরুষ (মণু), তুচ্ছ গৌরব (তু), অনুজ্ঞা (অ) ক্রিয়ার সঙ্গে -এ জুড়লে তা প্রথম পুরুষ (প্রণু), সামান্য গৌরব (সা), বর্তমান (ব) ক্রিয়া

আকৃতি হয়; অথবা এর বিপরীত পাঠ — প্রথম পুরুষ, সামান্য গৌরব, বর্তমান ক্রিয়া, যার অন্তে -এ, তা থেকে -এ বাদ দিলে মধ্যম পুরুষ, তুচ্ছ গৌরব, অনুজ্ঞা ক্রিয়া আকৃতি পাওয়া যায়।

‘ক্ষ’ হল গণিতের X-এর তুল্য।

১৫ সরাসরি ব্যাখ্যা করবে ১৩-র। ১২-র ব্যাখ্যাও ১৫ করবে, তবে ঐ বাড়তি অর্ধস্বরটুকু বাদে। অবশ্য এই অব্যাক্ষাত য় নিয়ে মাথাব্যথার তেমন কারণ নাই, কারণ আমরা এখুনি দেখব ভাষায় এই প্রতিবেশে সঞ্জননী ধ্বনিসম্মিবেশের বিধানে অবধারিত ভাবে একটি অর্ধস্বরাগম হয়ে থাকে। যেহেতু এটা শব্দকোষের বাইরের ব্যাপার তাই স্বাভাবিক ভাবেই প্রতিরূপ ছক এ খবর দেবে না।

এবার দেখা যাক ১৬-র কার্যকারিতা কতটা যথেষ্ট। সূত্রায়ণ যেভাবে হয়েছে ১৬ তাতে ১৪-কে ব্যাখ্যা করতে পারলেও ১-কে পারে না। এইরকম জায়গায় পৌঁছে এবার আমাদের মনস্থির করতে হবে যে বাংলা ধ্বনিতত্ত্বের এই অবধারিত প্রক্রিয়াগুলোর কাছ থেকে আমরা কিরকম কার্যকলাপ আশা করব।

তারা কি/আএ/সম্মিবেশ দেখলেই আগম প্রক্রিয়ায় এই দুই ধ্বনির মাঝে [য়] এনে /আএ/-কে অবধারিত ভাবে [আয়ে]-তে পরিবর্তিত করবে, যা আমরা এযাবৎ প্রদাব করে এসেছি এবং যার ফলস্বরূপ ১৬ কিনু৯-এর ব্যাখ্যা করবে না। না কি তারা /আএ/-র এ-র দলশীর্ষ হবার যোগ্যতা কেড়ে নিয়ে /আএ/-কে পরিবর্তিত করবে [আয়]-তে, যার ফলস্বরূপ ১৫ আর ১২-র ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।

আমাদের পছন্দ ধ্বনিতাত্ত্বিক আগম, যা /আএ/-কে পরিবর্তিত করবে [আয়ে]-তে। আগম পছন্দ করার যুক্তি এই যে বাংলায় আগম, বা আরও নির্দিষ্ট করে বলা যায় দুটি স্বরের মাঝখানে অর্ধস্বরের আগম, বাংলা ধ্বনিতত্ত্বের একটি অত্যন্ত নিয়মিত প্রক্রিয়া। এমন কি বাংলা ক্রিয়ার ক্ষেত্রেও পর পর দুটি স্বরধ্বনি সম্মিবেশের মাঝে অর্ধস্বরাগম খুব পরিচিত প্রক্রিয়া। যেমন নিচে ১৯-এর প্রত্যয়বিহীন ক্রিয়া আকৃতি থেকে প্রতিরূপ ছক ১৭ নির্মাণ করেছে ১৮-র ল্যবর্থক (যার বিভক্তির ধ্বনিবিদ্বন এ) অসমাপিকা ক্রিয়া আকৃতিগুলো।

১৭। [ব্য {অ, এ্যা, ও, এ} (ব্য)] ক্রি. মপ্ত, ত, অ <—> [ব্য {ও, এ, উ, ই} (ব্য) এ] ক্রি. অসমাপিকা
১৭-র পাঠ : একদল, অ, এ্যা, ও বা এ স্বরধ্বনি যুক্ত, মধ্যম পুরুষ, তুচ্ছ গৌরব, অনুজ্ঞা ক্রিয়ায় এ যোগ করলে ক্রিয়ার স্বরধ্বনি যথাক্রমে ও, এ, উ বা ই-তে পরিবর্তিত হয় ও আকৃতিটি ল্যবর্থক অসমাপিকা ক্রিয়ায় পরিণত হয়; অথবা দুমুখো তীরের সৌজন্যে এর বিপরীত পাঠ।

১৮। ব (বো) এ —> বয়ে (বেলা বয়ে যায়)

দি এ —> দিয়ে (কি দিয়ে খাব?)

শু এ —> শূয়ে (দীপ শূয়ে পড়েছে)

দেখে (মেলা দেখে এলাম)

লিখে (নামটা লিখে রাখ)

১৯। ব 'মধ্যম পুরুষ, তুচ্ছ গৌরব, অনুজ্ঞা'

দে	'ঐ'
শো	'ঐ'
দেখ (দ্যাখ)	'ঐ'
লেখ	'ঐ'

১৮-র দেখে আর লিখে — এই দুই ব্যঞ্জনান্ত আকৃতির ক্ষেত্রে খুব স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে যে প্রতিরূপ ছক প্রত্যয়বিহীন ক্রিয়ার সঙ্গে এ যোগ করে অসমাপিকা নির্মাণ করেছে, অথবা বিপরীত ভাবে বলা যায় অসমাপিকা ক্রিয়ার গা থেকে এ খসিয়ে প্রত্যয়বিহীন অনুজ্ঞা ক্রিয়া নির্মাণ করেছে। তাহলে এই সিদ্ধান্তে আসাই যায় যে ১৮-র অন্যান্য স্বরান্ত আকৃতিগুলোর অন্ত এর আগে যে একটা বাড়তি -য় দেখা যাচ্ছে তা নিশ্চয়ই বাংলা ধ্বনিতত্ত্বের অবধারিত কোনো প্রক্রিয়ার ফলাফল। এই একই প্রক্রিয়া আমরা আগে দেখেছি বিশেষ্যের ক্ষেত্রে এখন দেখছি ক্রিয়ার ক্ষেত্রে। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে একই প্রক্রিয়া পদাণুতাত্ত্বিক শ্রেণি নির্বিশেষে কাজ করেছে।

এই সিদ্ধান্তের পক্ষে আরও জোরালো সওয়াল জোগান দেয় ২০-র উদাহরণগুলো। ২০-তে দেখা যাচ্ছে শুধু শব্দের ভেতরেই নয় শব্দসীমা অতিক্রম করেও এই অর্ধস্বরাগম কাজ করতে পারে। অর্থাৎ একটানা মুখের কথায় দুটি স্বরধ্বনি সম্মিবেশের মাঝে যদি শব্দসীমা থাকে তাহলেও এই প্রক্রিয়ায় দুই স্বরের মাঝখানে -য় অর্ধস্বরের আগম হতে পারে।

২০। ছুটে আয় বা ছুটেয়ায়

মা আমার বা মায়ামার

উপরোক্ত দু-রকম উচ্চারণই চালু।

যদি ১৮ ও ২০ বাংলা মাতৃভাষীর এক অবধারিত ধ্বনিতাত্ত্বিক অভ্যেসের প্রতিফলন হয় তবে এই -য় অর্ধস্বরের আগমকে ধ্বনিতত্ত্বের এলাকাভুক্ত করাই যুক্তিসংগত। সেক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করা হবে সঙ্জননী ধ্বনিসম্মিবেশের সরঞ্জাম (ধ্বনিগত) আকল্প বর্জন বিধান ও মেরামতি কৌশলের সাহায্যে।

আকল্প বর্জন বিধান নির্দিষ্ট ভাষার সেই ধ্বনি সম্মিবেশগুলোকে শনাক্ত করে যাদের বাতিল করতেই হবে যেহেতু তারা সেই ভাষায় অনুচ্চার্য। ১১-র আকৃতিগুলোর আকল্প বর্জন বিধান ২১ শব্দকোষের /আএ/ ধ্বনিকল্পী বিশ্বনকে উচ্চারণ বাজারে প্রবেশের ছাড়পত্র দেয়নি।

২১। *আএ

২১-এর পাঠ : বাংলা উচ্চারণে [আএ] স্বরসম্মিবেশ বাতিল।

কিন্তু শুধু বাতিল চিহ্নিত করণেই সঙ্জননী ধ্বনিসম্মিবেশের কাজ শেষ নয়। এই বাতিলকে মেরামত করে বাজারে ছাড়ার দায়িত্বও তার। এই কাজের জন্যে রয়েছে বিভিন্ন মেরামতি কৌশল। ১১-র আকৃতিতে আগম মেরামতি কৌশল প্রয়োগের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। আগম কৌশল হয় সম্মিহিত ধ্বনিটির একটি হুবহু নকল বা প্রায় হুবহু নকল তৈরি করে, নয়তো ভাষার নিজের বাছাই করা কোনো ধ্বনি সরবরাহ করে। বাংলার ক্ষেত্রে আগম এই দ্বিতীয় ধরনের বাছাই অর্ধস্বর সরবরাহ করে। বাংলার বাছাই অর্ধস্বরটি হল -য়। অতএব :

২২। /গা-এ/->*[গাএ]->[গায়ে]

এবার ৯-এর আকৃতিগুলোর বিধিসম্মত বিবরণ কি হতে পারে তা দেখা যাক। যেহেতু এই অর্ধস্বরাস্ত বুদ্ধদলগুলো একটি নির্দিষ্ট শ্রেণির ক্রিয়াতেই লভ্য তাই এদের পদাণুতন্ত্রের জমিতে, পদাণুতাত্ত্বিক সরঞ্জাম প্রতিরূপ ছকের সাহায্যে ব্যাখ্যা করাই অধিক যুক্তিযুক্ত। প্রয়োজনীয় প্রতিরূপ ছকটি ২৩:

২৩। [(ব্য) স্ব] ক্রি. মপ, তু, অ <—> [(ব্য) স্বয়] ক্রি. প্রপ, সা, ব

২৩-এর পাঠ : একদল, স্বরাস্ত, মধ্যম পুরুষ, তুচ্ছ গৌরব, অনুজ্ঞা ক্রিয়ার গায়ে -য় জুড়লে তা প্রথম পুরুষ, সামান্য গৌরব, বর্তমান ক্রিয়ায় পরিবর্তিত হয়; অথবা দুমুখো তীরের সৌজন্যে এর বিপরীত পাঠ।

এই বিশ্লেষণ থেকে এটা স্পষ্ট হচ্ছে যে ৯-এর আকৃতিগুলো পদাণুতন্ত্রে ব্যাখ্যাত হচ্ছে কারণ (ক) এগুলির অন্তে যেখানে স্বরধ্বনি অভিপ্রেত সেখানে রয়েছে অর্ধস্বরধ্বনি এবং (খ) এই বিচ্যুতি কেবলমাত্র একটি নির্দিষ্ট শব্দশ্রেণিতেই লভ্য। অপরপক্ষে ১১-র আকৃতিগুলো বিশুদ্ধ ধ্বনিতন্ত্রের ফলশ্রুতি।

এযাবৎ তো ৫ আর ৭-এর ক ও খ-এর আকৃতি নিয়ে আলোচনা করা হল। এবার নেওয়া যাক ৬ ও ৮-এর ক ও খ-এর নিয়মিত দ্বিদল আকৃতিগুলোকে। আলোচনার সুবিধের জন্য প্রাসঙ্গিক আকৃতিগুলোর পুনরাবৃত্তি করা যাক—

৬। ক) দ্বিদল বিশেষ্য : পাতা, বোঝা

খ) তজ্জাত অধিকরণ : পাতায়, বোঝায়

৮। ক) দ্বিদল ক্রিয়া : পাতা, বোঝা

খ) তজ্জাত প্রথম পুরুষ বর্তমান ক্রিয়া : পাতায়, বোঝায়

নিচের ২৪ আর ২৫ হল যথাক্রমে ৮-এর খ ও ৬-এর খ ধরনের আকৃতি—

২৪। পাতায় (বন্ধুত্ব পাতায়)

চালায় (গাড়ি চালায়)

ঝোলায় (মালা ঝোলায়)

পালায় (চোর পালায়)

গলায় (হাত গলায়)

২৫। পাতায় (কলা পাতায় ভাত খাবো)

চালায় (চালায় খড় দিতে হবে)

ঝোলায় (ঝোলায় পোরো)

পালায় (কার পালায় চুরি হল?)

গলায় (গলায় গলায় বন্ধুত্ব)

২৪ ও ২৫ যথাক্রমে ক্রিয়া ও বিশেষ্যের সমোচ্চারিত দ্বিদল আকৃতি। ২৪-এর গায়ে প্রথম পুরুষ, সামান্য গৌরব, বর্তমান কালের আর ২৫-এর গায়ে অধিকরণের প্রত্যয়। ২৪ ও ২৫-এর সঙ্গে সম্পর্কিত প্রত্যয়বিহীন আকৃতি যথাক্রমে মধ্যম পুরুষ, তুচ্ছ গৌরব, অনুজ্ঞা ক্রিয়া ও একবচন, কর্তৃ-বিশেষ্য। বলা বাহুল্য, এই প্রত্যয়বিহীন আকৃতিগুলোও সমোচ্চারিত পাতা, চালা, ঝোলা ইত্যাদি।

আগের আলোচনার সূত্র ধরে সিদ্ধান্তে আসা যায় যে শব্দকোষে ২৪, ২৫-এর আকৃতির শেষে আছে দ্বিস্বর সমিবেশ /আএ/। এই /আএ/ ২৫-এর ক্ষেত্রে প্রতিরূপ ছক ১৫ এবং ২৪-এর ক্ষেত্রে অনুরূপ কোনো প্রতিরূপ ছক প্রয়োগের ফলশ্রুতি। উভয়েরই শব্দকোষস্থিত আকৃতি তাহলে ২৬:

- ২৬। পাতা-এ
চালা-এ
ঝোলা-এ
পালা-এ
গলা-এ

ধরা যাক ২৪-এ প্রযুক্ত হয়েছে প্রতিরূপ ছক ২৭:

২৭। [দক্ষ]ক্রি, মপ, তু, অ <—> [দক্ষএ]ক্রি, প্রপ, সা, ব

২৭-এর পাঠ : দ্বিদল, মধ্যম পুরুষ, তুচ্ছ গৌরব, অনুজ্ঞা ক্রিয়ায় -এ জুড়লে তা হয় প্রথম পুরুষ, সামান্য গৌরব, বর্তমান কালের ক্রিয়া; অথবা এর বিপরীত পাঠ — প্রথম পুরুষ, সামান্য গৌরব, বর্তমান কালের দ্বিদল ক্রিয়ার গা থেকে -এ তুলে নিলে তা হয় মধ্যম পুরুষ, তুচ্ছ গৌরব, অনুজ্ঞা ক্রিয়া।

তাহলে দেখা যাচ্ছে ১৫ ও ২৭ — এই দুই প্রতিরূপ ছক থেকে প্রাপ্ত বিশেষ্য ও ক্রিয়া দুইয়েরই আকৃতি (২৬) শেষ হচ্ছে /আএ/ সমিবেশে। অর্থাৎ ২৬-এর আকৃতি আকল্প বর্জন বিধান ২১ লঙ্ঘন করে। অতএব এই লঙ্ঘনদোষ সামাল দেবার জন্য প্রয়োজন মেরামতি কৌশলের হস্তক্ষেপ।

২৪ ও ২৫-এর উদাহরণে ১৮-র একদল ক্রিয়ার মত আগম কৌশল প্রয়োগের চিহ্ন নাই। এই দ্বিদল আকৃতিগুলোতে ভিন্ন এক মেরামতি কৌশল, প্রতিস্থাপন কৌশল, প্রযুক্ত হয়েছে। প্রতিস্থাপন সমিবেশের দ্বিতীয় স্বরটিকে তাক করে সেটিকে তার অর্থস্বর জুটি দিয়ে প্রতিস্থাপিত করে, অর্থাৎ /এ/—>[য়]:

২৮। চালাএ —> চালায়

আকল্প বর্জন বিধান ও মেরামতি কৌশল — সঞ্জ্ঞানী ধ্বনিসমীবেশের এই সরঞ্জামের ব্যবহার ২৪ ও ২৫-এর ক্ষেত্রে সম্ভব হল এই কারণে যে ২৪ ক্রিয়া ও ২৫ বিশেষ্য হলেও এই দুটি শ্রেণিরই ধ্বনিতাত্ত্বিক আচরণ অবিকল একরকম। অর্থাৎ এরা একই প্রক্রিয়ায় শব্দকোষ থেকে উচ্চারণ বাজারে প্রবেশের ছাড়পত্র পায়। আর যে প্রক্রিয়া অনিবার্য ভাবে ভাষার পুরোটা জুড়ে প্রযুক্ত হয় তা তো প্রসঙ্গীভবুরে ধ্বনিতাত্ত্বিক।

দেখা যাচ্ছে আচরণের এই ঐক্য যথেষ্ট সুবিধেজনক। এবারে দেখা দরকার এই বিশ্লেষণের কোনো অসুবিধেজনক দিক আছে কিনা। আমাদের বর্ণনায় দু ধরনের ক্রিয়ার জন্য দুটি ভিন্ন প্রতিরূপ ছক ব্যবহারের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে — ৯-এর ক্রিয়ার জন্য ২৩ ও ২৪-এর ক্রিয়ার জন্য ২৭। এর অর্থ ৯-এর আকৃতির অন্ত্য অর্থস্বরটি প্রতিরূপ ছক প্রয়োগের ফলশ্রুতি, এই অর্থস্বর শব্দকোষের ধ্বনিকল্পী বিশ্বন থেকে সরাসরি আসছে। কিন্তু ২৪-এর ক্রিয়াতে প্রতিরূপ ছকেরও পরে প্রযুক্ত হয়েছে ধ্বনিতাত্ত্বিক সরঞ্জাম'য়ার ফলশ্রুতি অন্ত্য অর্থস্বর। এই অন্ত্য

অর্ধস্বর শব্দকোষের ধ্বনিকল্পী বিশ্বনের স্বরধ্বনি এ-কে প্রতিস্থাপিত করেছে। এখন প্রশ্ন : ৯ ও ২৪ উভয়েই ক্রিয়া হওয়া সত্ত্বেও আমরা দু ধরনের বিশ্লেষণী প্রস্তাব দিচ্ছি। এর ফলে আমরা কোনো জরুরি ভাষাতাত্ত্বিক সামান্যীকরণকে অবজ্ঞা করছি না তো?

তবে আর একটু বিস্তৃত পরিসরে বাংলা ক্রিয়ার অন্যান্য তথ্যের দিকে নজর দিলে মনে হয় না সামান্যীকরণ অবজ্ঞা করার মত কোনো দোষ ঘটছে। সমর্থনের জন্য তাকানো যাক ক্রিয়া বিশেষ্যের এলাকায়। বাংলা প্রত্যয়বিহীন দ্বিদল ক্রিয়া নানান ক্ষেত্রেই প্রত্যয়বিহীন একদল ক্রিয়ার চেয়ে ভিন্ন ধরনের আচরণ করে। যেমন, এই দু ধরনের ক্রিয়ার ক্রিয়া বিশেষ্যের আকৃতিও ভিন্ন হয়—

- ২৯। পাওয়া
গোনা
লেখা
পড়া
পালানো
চালানো
তাকানো

২৯-এর আকৃতিগুলোর ব্যাখ্যা দেবার জন্য তিন ধরনের প্রতিরূপ ছক প্রয়োজন — স্বরান্ত একদল ক্রিয়ার (পা <—> পাওয়া ইত্যাদি) জন্য একটি, ব্যঞ্জনান্ত একদল ক্রিয়ার (গোনা <—> গোনা ইত্যাদি) জন্য একটি ও দ্বিদল ক্রিয়ার (পালানো <—> পালানো ইত্যাদি) জন্য একটি।

আরও লক্ষ্য করা দরকার যে পাওয়া-র অর্ধস্বরধ্বনিটি কিন্তু আমরা এযাবৎ বাংলায় আগমের যে বাছাই অর্ধস্বরটি নিয়ে আলোচনা করছি, যেটির স্বরধ্বনি জুটি /এ/, সেটি নয়, ভিন্ন একটি অর্ধস্বর [W]। এই অর্ধস্বরটির স্বরধ্বনি জুটি /ও/। এটি বাছাই স্বরধ্বনিটি নয় বলেই এর ব্যাখ্যা আগম দিয়ে হবে না, হবে পদাণুতত্ত্বের প্রতিরূপ ছক দিয়ে।

ক্রিয়া বিশেষ্যের পদাণুতাত্ত্বিক বিভিন্নতা খুব স্পষ্টতই নির্ভর করছে ক্রিয়ার দলীয় ছাঁদের ওপর। এর ভিত্তিতে খুব স্বাভাবিক ভাবেই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে প্রথম পুরুষ, সামান্য গৌরব, বর্তমান কালের ক্রিয়ার ক্ষেত্রেও একই কারণ, অর্থাৎ ক্রিয়ার দলীয় ছাঁদই নির্ধারিত করছে তাদের পদাণুতাত্ত্বিক বিভিন্নতা।

এবার এক দ্বিতীয় ধরনের সম্ভাব্য অসুবিধের কথা বিবেচনা করা যাক।

- ৩০। কুলায়ে (সাঁঝের পাখিরা ফিরিল কুলায়ে)
উপায়ে (কি উপায়ে গ্রাসাচ্ছাদন করে সে?)

৩০-এর আকৃতিগুলো আমাদের বিশ্লেষণের পক্ষে সরাসরি কোনো সমস্যার সৃষ্টি না করলেও সম্ভাব্য সমস্যার প্রকৃতিটা প্রণিধানযোগ্য।

৩০-এর আকৃতি থেকে এটা স্পষ্ট যে বাংলায় /দব্য+আয়+এ/, অর্থাৎ প্রথম উপাদানটি দল (দ), দ্বিতীয়টি ব্যঞ্জন, যার পর আ, চতুর্থ উপাদান অর্ধস্বর য়, যার ঠিক পরেই এ — এই দলীয় ছাঁদটি একটি গ্রহণযোগ্য সমীকরণ। কোনো আকল্প বর্জন বিধান এই সমীকরণকে বাতিল

করে না। তাহলে এটাও সম্ভব যে ভাষার কোনো বাতিলযোগ্য সম্মিলেবশে কোনো মেরামতি কৌশল উপরোক্ত সম্মিলেবশে পরিবর্তিত করে তা গ্রহণযোগ্য করে তুলতেই পারে।

এইখানে প্রশ্ন ওঠে যে সেক্ষেত্রে প্রতিরূপ ছক ২৭ থেকে পাওয়া ২৪-এর আকৃতিগুলোতে কেন প্রতিস্থাপন মেরামতি কৌশল প্রযুক্ত হয়ে শব্দান্ত /আএ/-কে [আয়]-তে পরিবর্তিত করে? কেনই বা এখানে অর্থস্বরগম-মেরামতি কৌশল প্রযুক্ত হয়ে/আএ/-কে বাংলায় সমান গ্রহণযোগ্য/আয়ে/-তে পরিবর্তিত করেছে না? প্রশ্নটিকে অন্যভাবে বলা যায় যে ২৪-এর আকৃতিতে আগম মেরামতি কৌশলের প্রয়োগ আটকানো হচ্ছে কোন যুক্তিতে?

তথ্য পর্যবেক্ষণ স্তরে এ প্রশ্নের যথার্থ উত্তর এই যে ৩০-র আকৃতির প্রত্যয়বিহীন জুটি হল ৩১-এর আকৃতি, যেগুলির অন্ত্য ধ্বনিটি শব্দকোষেই /য়/:

৩১। কুলায়

উপায়

আরও একটি সাধারণ ভাবে বলা যায়; প্রথমত, ভাষায় কোথাও দেখা যায় না যে কোনো মেরামতি কৌশল /দ(ব্য)আএ/ সম্মিলেবশে [দ(ব্য) আয়ে]-তে পরিবর্তিত করেছে, এবং দ্বিতীয়ত, [দ(ব্য)আয়ে] — এই সম্মিলেবশ এমন কোনো আকৃতিতে দেখা যায় না যা পদাণুতাত্ত্বিক গঠনে কোনো সরলতর আকৃতির সঙ্গে সম্পর্কহীন। অথবা অন্যভাবে বলা যায়, পদাণুতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে সরল গঠনের কোনো আকৃতিতে এই সম্মিলেবশ লভ্য নয়।

বিশ্লেষণের স্তরে যথার্থ বিধানের জন্য আমাদের আরেকটি বিস্তৃত পরিসরের খুঁটিনাটি লক্ষ্য করতে হবে। যেমন এ ক্ষেত্রে মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে যে মানানসই মেরামতি কৌশল ঠিক করার রাশটা থাকে মুখের ভাষার ছন্দের হাতে। ছন্দের পদগঠন বা ফুট ফর্মেশন রীতিই এইসব নিয়ন্ত্রণ করে। বাংলার সবচেয়ে মনপসন্দ পদ হল দ্বিদল পদ। পদ পছন্দের রীতি ও ভাষার আকর্ষণ বর্জন বিধান — এই দুয়ের প্রকৃতি ভিন্ন। ৩০-এর আকৃতি ভাষার কোনো নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করে না, তাই তাদের পরিবর্তন করারও প্রয়োজন হয় না। অপরপক্ষে দ্বিদল পদের প্রতি এই পক্ষপাতই ৯-এর আকৃতিতে আগম এবং ২৪ ও ২৫-এর আকৃতিতে প্রতিস্থাপন মেরামতি কৌশলের প্রয়োগ নির্দিষ্ট করে। এর ফলে ৯, ২৪ ও ২৫ সব ক্ষেত্রেই নির্মিত হয় মনপসন্দ দ্বিদল আকৃতি।

উল্লেখ করা ভাল যে এই ছন্দের কারিকুরির খবরটা কিন্তু এখনও অবধি নেহাতই একটা আন্দাজী বিশ্লেষণ, কোনো কেতাদুরস্ত আঁটোসাটো প্রস্তাব নয়, কারণ এ বিষয়ে গবেষণা যথেষ্ট অপ্রতুল।

৪ উপসংহার

বাংলা অর্থস্বর [য়]-এর উৎস দুটি (১) মেরামতি কৌশলজাত [য়], যা একটি ধ্বনিকল্প এবং যা ভাষার পুরোটা জুড়ে রাজত্ব করে, আর (২) প্রতিরূপ ছকজাত /য়/, যা ধ্বনিকল্প এবং যা কোনো কোনো ব্যাকরণিক শ্রেণিতে উঁকি মারে। কায়াবাদী ব্যাকরণ এই সত্যটা যত স্পষ্ট ও সাবলীল ভাবে উচ্চারণ করতে পারে কোনো আকরণবাদী ব্যাকরণ কিন্তু তা পারে না। নির্দিষ্টভাবে ৫খ, ৬খ, ৭খ ও ৮খ-এর আকৃতির ওপর আলোকপাত করা কোনো আকরণবাদী আলোচনা না থাকলেও অথবা উপরোক্ত কায়াবাদী বিশ্লেষণের প্রাশাপাশি কোনো আকরণবাদী

বিশ্লেষণের সঙ্গে দস্তুরমতো তুলনামূলক বিচার না করেও এই উপাস্তের পরিপ্রেক্ষিতে আকরণবাদী ব্যাকরণের অন্তত দুটি সীমাবদ্ধতা এক নজরেই নির্দেশ করা যায় :

প্রথমত, আকরণবাদী ব্যাকরণ বাংলা অর্ধস্বরকে হয় ধ্বনিকল্পের স্বীকৃতি দেয় (চ্যাটার্জী, ১৯৬২; ভট্টাচার্য, ১৯৯৩ এবং ভট্টাচার্য, ২০০৫) নয়তো ধ্বনিকল্পের স্বীকৃতি দেয় (রায় ও অন্যান্য, ১৯৬৬)। কিন্তু এই একমুখী স্বীকৃতি যে বাংলা অর্ধস্বর, অন্তত অর্ধস্বর [য়]-এর ক্ষেত্রে যথেষ্ট নয় তা তো উপরোক্ত বিশ্লেষণ থেকেই স্বচ্ছ। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে আকরণবাদী সিদ্ধান্ত দুটি স্পষ্টতই অতি সামান্যীকরণ দোষদুষ্ট।

দ্বিতীয়ত, আকরণবাদী ব্যাকরণ ৫খ ও ৭খ উভয়েরই বিশ্লেষণ করবে ধ্বনিতত্ত্বে ধ্বনিতত্ত্বেরই দুটি ভিন্ন উপ-এলাকায়। ৭খ হবে পদাণুধ্বনিতত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত, ৫খ ধ্বনিসম্মিবেশের। এই উপ-এলাকার ভিন্নতা ৫খ-এর থেকে ৭খ যে পৃথক তার একটা পরোক্ষ ইঙ্গিত দিলেও দুইয়ের মধ্যে মৌলিক পার্থক্যটা যে কি তার কোনো স্পষ্ট ব্যাখ্যা দিতে পারবে না। এর কারণ আকরণবাদী ব্যাকরণ পদাণুধ্বনিতত্ত্ব ও ধ্বনিসম্মিবেশের মধ্যের মৌলিক পার্থক্যটা নিজেই স্বীকার করে না। আকরণবাদে এ দুটি পরস্পরের সঙ্গে জড়িয়ে-জাপ্টে থাকা ধ্বনিতত্ত্বের দুটি উপ-এলাকা। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে ৫খ ও ৭খ-এর পার্থক্য প্রকাশ করতে পারার এই অক্ষমতাটা আদতে আকরণবাদী ফ্রেমওয়ার্কেরই দুর্বলতা বা সীমাবদ্ধতা।

শুধুমাত্র এই দু ধরনের সীমাবদ্ধতার নিরিখেই বোঝা যায় বিশ্লেষণের সূক্ষ্মতা ও যথার্থতার প্রতিযোগিতায় আকরণবাদের তুলনায় কায়াবাদী ভাবনা চিন্তা কত বেশি সম্ভাবনা পূর্ণ।

তথ্যপঞ্জি :

১. Bhattacharya Krishna, 1993. *Bengali-Oriya Verb Morphology : A Contrastive Study*. Das Gupta & Co. Pvt. Ltd. Calcutta.
২. Bhattacharya (Bhaduri), S. 2005. Some words about Bengali [e] and <ya>. In *Bulletin of the Department of Linguistics*. No 14, University of Calcutta, Kolkata. 25-30.
৩. Chatterjee, S. 1962. *A Study of the Relationship between Written and Colloquial Bengali*. Unpublished Ph.D. dissertation. The Hartford Seminary Foundation. Hartford. Connecticut.
৪. Chatterji, S. K. 1986. *A Bengali Phonetic Reader*, Rupa & Co. Calcutta.
৫. দাশগুপ্ত, প্রবাল ২০০৬, বিষ্ণুগণ, আকরণপক্ষ আর কায়াপক্ষ, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১১৩ বর্ষ, ১ম-২য় সংখ্যা, বৈশাখ-আশ্বিন, ১৪৭-৫৭।
৬. Dasgupta, Probal; Ford, Alan; Singh, Rajendra. 2000. *After Etymology : towards a substantivist linguistics*. Lincom Europa, Muenchen.
৭. Ray P. S., Hai, M.A., & Ray, L. 1966. *Bengali Language Handbook*. Center of Applied Linguistics. Washington D.C.
৮. Singh, Rajendra. 1987. Well-formedness conditions and phonological theory. In Wolfgang U. Dressler, Hans Luschuetzky, Oskar Pfeiffer, & John Rennison (eds.) *Phonologica 1984*. Cambridge University Press, Cambridge. 273-85.

প্রাক-স্বাধীনতা পর্বে মহিলা সম্পাদিত সাময়িকপত্র

গীতা চট্টোপাধ্যায়

যে কোনো দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ইতিহাস জানতে হলে আমাদের সেই দেশের সেই সময়ের প্রচলিত সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রগুলি অনুসন্ধান ও অনুধাবন করা প্রয়োজন। যে কোনো দেশের একটি বিশেষ সমকালে মেয়েদের পারিবারিক, সামাজিক জীবন, তাদের শিক্ষা ব্যবস্থা, তাদের নানা সমস্যা, অভাব-অভিযোগ এবং নিজেদের অবস্থার পরিবর্তনের জন্য মেয়েদের আন্দোলন ইত্যাদি বিষয়ে জানতে হলে সেই দেশের সমকালীন প্রচলিত সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রের উপর আমাদের নির্ভর করতে হয়। মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত, সম্পাদিত পত্রিকায় আরও বিস্তারিতভাবে মহিলা সমাজের কথা জানা যায়।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর *সাময়িকপত্র সম্পাদনে বঙ্গনারী* এই ছোটো বইটিতে ঊনবিংশ শতাব্দীতে তেরোটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে বলে জানিয়েছেন। তার মধ্যে ভারতী, পরিচারিকা, অন্তঃপুর ও মুকুল বিংশ শতাব্দীতেও চালু ছিল। আমি তিনখণ্ডে প্রকাশিত *বাংলা সাময়িক পত্রিকা পঞ্জী*-তে ১৯০০-১৯৪৭ পর্যন্ত একাশ্রমি মহিলা সম্পাদিত সাময়িকীর উল্লেখ করেছি। এর মধ্যে চৌদ্দটি পত্রিকার সন্ধান আমি পাইনি। আলোচ্য প্রবন্ধে যে পত্রিকাগুলি পাওয়া গেছে সেই পত্রিকাগুলির সংক্ষিপ্ত কিছু পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করছি।

মহিলা সম্পাদিত পত্রিকা নিয়ে আলোচনার সুবিধার জন্য পত্রিকাগুলিকে কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করে আলোচনা করছি। এক, যে সব পত্রিকা মহিলাদের জন্যই প্রচারিত। মহিলাদের কল্যাণ সাধনই যাদের মূল লক্ষ্য; দুই, যে সব পত্রিকা সমকালীন রাজনৈতিক ঘটনাবলিকে প্রাধান্য দিয়ে, সমকালীন রাজনীতির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে রাজনীতিচর্চাকে গুরুত্ব দিয়েছে; তিন, যে সব পত্রিকা সাহিত্য সেবাকেই মূল মন্ত্র করেছে। চার, মহিলা সম্পাদিত শিশুদের জন্য পত্রিকা এবং কয়েকটি বিশেষ বিষয়ের পত্রিকা।

যে সামাজিক প্রেক্ষাপটে মহিলা সম্পাদিত পত্রিকার প্রকাশ সেই সমাজ ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া প্রয়োজন। আমাদের সমাজে যুগ যুগ ধরেই মহিলারা নানা বঞ্চনা, শোষণ-নিপীড়নে দুর্বিষহ এক মনুষ্যত্বহীন জীবন যাপনে বাধ্য হয়েছে। সতীদাহ, বাল্য বিবাহ, কৌলিন্য প্রথা, অবরোধ প্রথা, ধর্মের নামে নানা সামাজিক অনুজ্ঞা ও কুসংস্কার, মহিলাদের শিক্ষা ও সর্বাঙ্গীণ উন্নতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে রামমোহন রায়,

বিদ্যাসাগর, রামগোপাল ঘোষ, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্যারীচাঁদ মিত্র, অক্ষয়কুমার দত্ত, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ সমাজ সংস্কারকগণ স্ত্রীশিক্ষার স্বপক্ষে এবং সমাজের নানা কুপ্রথার বিরুদ্ধে সামাজিক সংস্কার আন্দোলন শুরু করেন। মহিলারা বিশেষ করে শিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত ব্রাহ্মণ সমাজের মহিলারাও এই আন্দোলনের সামিল। এই প্রসঙ্গে কাদম্বিনী দেবী, স্বর্ণপ্রভা বসু, স্বর্ণকুমারী দেবী, অবলা বসু, প্রমুখের সঙ্গে সিস্টার নিবেদিতা, সরোজিনী নাইডু, এ্যানি বেসান্ত — এঁদের নামও উল্লেখযোগ্য। মহিলারা আর্থ মহিলা সমিতি, ব্রাহ্মমহিলা সমিতি, ব্রাহ্মিকা সমিতি, জাতীয় মহিলা সমিতি, Indian Ladies Association ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মহিলাদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধনে এবং সমাজ সংস্কারের জন্য জোরদার আন্দোলন শুরু করেন। প্রবল সামাজিক সংস্কার আন্দোলনের ফলে কয়েকটি সামাজিক প্রথার অবসানের জন্য ইংরাজ সংস্কার আইন প্রবর্তন করেন। ১৮২৯-এ সতীদাহ প্রথা নিরোধ বিল, ১৮৫৬ বাল্য বিধবাদের পুনর্বিবাহ এবং হিন্দু বিবাহ আইন (১৮৭২) প্রবর্তিত হয়। হিন্দু বিবাহ আইনে বলা হয়েছে বিবাহের সময় মেয়েদের বয়স চৌদ্দ এবং ছেলেদের বয়স আঠারো হতে হবে। এই আইনে মেয়েদের বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকারও দেওয়া হয়। এই আইনের ফলে বাল্যবিবাহ প্রথা বন্ধের কিছু সুবিধা হয়। সমাজ সংস্কার আন্দোলনের সাফল্য হিসাবে এই আইনগুলি উল্লেখযোগ্য হলেও সমাজে নারীপুরুষের চেতনা বৃদ্ধির দিক থেকে এই আইন কার্যকরী হয়নি। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে বা বিংশ শতাব্দীর শুরুতে বাঙালি মেয়েদের পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থানের খুব বেশি পরিবর্তন হয় নি। মেয়েরা ঘরে বা বাইরে কিছুটা শিক্ষার আলো পেলেও তাদের সংখ্যা ছিল খুবই কম। সেদিনের সমাজসংস্কারকগণ বুঝেছিলেন যে শুধু সভা সমিতি বা আইন করে নয় সমাজে নারী পুরুষের কুসংস্কারবিরোধী মানসিকতা গড়ে তুলতে চাই প্রচারযন্ত্র। সেই প্রচারযন্ত্রটি হল সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র। ঊনবিংশ শতাব্দীতে *বামাবোধিনী*, *অবলা বাস্কব*, ইত্যাদি সাময়িকপত্র সমাজ-সংস্কারের জন্য অনবরত প্রচার চালায়। পরবর্তী পর্যায়ে মেয়েরা উদ্যোগী হয়ে নিজেদের কথা জনসমক্ষে তুলে ধরতে পত্রিকা প্রকাশ করে।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রকাশিত সাময়িকী *পরিচারিকা*, *অস্তঃপুর*, *ভারতী* বিংশ শতাব্দীতেও চালু থাকায় তাদের নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের সহধর্মিণী জগমোহিনী দেবীর উদ্যোগে ১৮৭৮ সালে *পরিচারিকা* পত্রিকা প্রকাশিত হয়। বিংশ শতাব্দীতে ১৯০৬ সাল পর্যন্ত প্রথমে সুচারু দেবী পরে মণিকাদেম্বী *পরিচারিকা* সম্পাদনা করেন। *অস্তঃপুর* ১৮৯৮-তে প্রকাশিত এবং বনলতা দেবী সম্পাদিত। পরে *অস্তঃপুর* পর্যায়ক্রমে হেমন্তকুমারী চৌধুরী, কুমুদিনী মিত্র, লীলাবতী মিত্র প্রমুখের সম্পাদনায় ১৯০৬ পর্যন্ত প্রচারিত হয়। *ভারতী* বিংশ শতাব্দীতে ১৩০৬-১৪ ও ১৩২৩-২৬ দুবার সরলা দেবী এবং ১৩১৫-২১ পর্যন্ত স্বর্ণকুমারী দেবীর সম্পাদনায় প্রচারিত হয়। *ভারতী*তে মহিলাদের প্রয়োজনে রামা-বামা, সেলাই-বোনা, ঘর গৃহস্থালীর কথা ছিল না। *পরিচারিকা*, *অস্তঃপুর* স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের জন্য এবং সমাজকে মেয়েদের অবহেলিত অবস্থা সম্পর্কে সচেতন করতে নিরবচ্ছিন্নভাবে চেষ্টা চালিয়েছে।

বিংশ শতাব্দীতে প্রকাশিত *গৃহলক্ষ্মী*, *পরিচারিকা*, *বঙ্গলক্ষ্মী* ইত্যাদি পত্রিকা তাঁদের পূর্বসূরিদের আদর্শ ও নীতি অনুযায়ী পত্রিকা পরিচালনা করেন। এইসব পত্রিকা *অস্তঃপুর*, *পরিচারিকা* ইত্যাদির অনুসরণে নীতিশিক্ষা, পারিবারিক চিকিৎসা, ঘর গৃহস্থালীর কাজ, রামা-

বালা, সেলাই বোনা ইত্যাদি মেয়েদের দৈনন্দিন জীবনে যা কিছু প্রয়োজন তার আলোচনা করে। এইসব পত্রিকায় প্রায় প্রতি সংখ্যায় ইতিহাস প্রসিদ্ধ রমণীদের এবং যে সব মহিলারা নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে খ্যাতিলাভ করেছেন তাদের জীবনী প্রকাশিত হয়েছে। মেয়েদের সমাজ জীবনের প্রকৃত চিত্র এই সব পত্রিকায় সুস্পষ্টভাবে চিত্রায়িত হয়।

আশ্বিন ১৩১৪ / ১৯০৭-এ শান্তিময়ী সেন *গৃহলক্ষ্মী* পত্রিকা সম্পাদনা করেন, এই পত্রিকায় *অন্তঃপুর*-এর মতন মহিলারাই শুধু লিখতেন। প্রথম সংখ্যার দুটি প্রবন্ধ উল্লেখ করা যায়। মহামায়া গুপ্তার স্ত্রীশিক্ষা, যোয়ান অব আর্ক স্মরণে কবিতা ‘অমর মরণ’। *কৃষ্ণভাবিনী* বিশ্বাস প্রকাশ করেন মাহিষ্য সমাজের মহিলাদের জন্য *মাহিষ্য-মহিলা*। বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে পত্রিকা প্রকাশিত হলেও মাহিষ্য সমাজের মহিলারাই, তাদের কথা জন সমক্ষে জানাতে সাময়িক পত্রের সাহায্য নেন। পত্রিকার মুখবন্ধে লেখা হয়েছে : ‘মাহিষ্য সমাজের অসাড় দেহে শক্তি সঞ্চারণ করিবার নিমিত্তই এই পুস্তক প্রকাশিত হইল।’

পরিচারিকা অগ্রহায়ণ ১৩২৩/১৯১৬-তে কোচবিহার থেকে নিরুপমা দেবীর সম্পাদনায় নব পর্যায়ে প্রকাশিত হয়। নিরুপমা দেবী স্ত্রীশিক্ষা প্রচারকেই পত্রিকা সম্পাদনের মূলমন্ত্র বলে গ্রহণ করেছেন। *পরিচারিকা*-র বিশেষ দিক হল এই পত্রিকা অন্যান্য সাময়িকীতে প্রকাশিত কবিতার এবং সদ্য প্রকাশিত কবিতার বই-এর সমালোচনা করেছে। পত্রিকাটি দীর্ঘস্থায়ী হয়ে ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত চালু থাকে। এই সময় মহিলা সম্পাদিত সাময়িকীর ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল মুসলিম মহিলাদের দ্বারা সম্পাদিত প্রথম সামাজিক পত্র *অষেষা*-র প্রকাশ। বেগম সোফিয়া খাতুন সম্পাদিত *অষেষা* বৈশাখ ১৩২৮/১৯২১-এ প্রকাশিত হয়। সমাজে মুসলিম মহিলাদের অবস্থা তাদের আশা আকাঙ্ক্ষা, তাদের মধ্যে শিক্ষার কতদূর প্রসার হয়েছে ইত্যাদি পত্রিকার আলোচ্য বিষয়। *কোরাণ-ই-শরীফ* থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে পত্রিকাটি একটি সার্বজনীন সত্যকে প্রচার করেছে। উদ্ধৃতিটি এইরকম : ‘নিশ্চয় আল্লাহ কোন জাতির অবস্থার পরিবর্তন করেন না, যে পর্যন্ত সেই জাতি তাহাদের অবস্থার পরিবর্তন সাধনে মনোনিবেশ না করে।’ *অষেষা*-র প্রথম সংখ্যার কয়েকটি রচনার উল্লেখ করলে বোঝা যাবে পত্রিকাটি কী ধরনের। বেগম সোফিয়া খাতুনের ‘শরীর ব্যথা’, গৌরাঙ্গনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘মেয়েদের শিক্ষা’, তরিকুল আলমের ধারাবাহিক ‘বিবাহ ও নারী’।

বাংলার পশ্চিমে পশ্চিমে মেয়েদের উন্নতির জন্য নারী মঙ্গল সমিতি প্রতিষ্ঠায় মেয়েদেব উৎসাহ দানে *বঙ্গলক্ষ্মী* পত্রিকা প্রচারিত হয়। সরোজনলিনী দত্ত মেমোরিয়াল সমিতির মুখপত্র হিসাবে *বঙ্গলক্ষ্মী* অগ্রহায়ণ ১৩৩২/১৯২৫-এ কুমুদিনী বসুর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। বিভিন্ন জেলায় নারীমঙ্গল সমিতির যে সব শাখা আছে — তার কার্যবিবরণী প্রতি সংখ্যায় নিয়মিত *বঙ্গলক্ষ্মী*-তে মুদ্রিত হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর *বঙ্গলক্ষ্মী*-র জন্মলগ্নে যে চোদ লাইনের আশীর্বাদ-বাণী পাঠিয়েছেন, তার প্রথম চার লাইন এখানে উদ্ধৃত করা হল :

লক্ষ্মী, তুমি এসো এসো
আনো আনো আলো
দুঃখে সুখে ঘরে ঘরে
পুষ্পদীপ জ্বালো।

রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ বাণীকে ব্রত হিসাবে গ্রহণ করে সম্পাদকীয়তে লেখা হয়েছে : 'কবির আশীর্বচন সত্য হউক। বিধাতা করুন বঙ্গলক্ষ্মী যেন বাংলার নারী সমাজের মধ্যে শক্তির উন্মেষ করিয়া দিতে পারে, শান্তিধারা বর্ষণ করিতে পারে। নবজাগরণের উন্মাদনায় তাহাকে উদ্দীপিত করিতে পারে। বঙ্গলক্ষ্মী যেন বাংলার নারী সমাজের প্রকৃত সেবিকা হইয়া জন্ম সার্থক করিতে পারে।'

মাতৃমন্দির পত্রিকা মহিলাদের আর্থ-সামাজিক উন্নতির জন্য মহিলা শিক্ষাশ্রমের মুখপত্র রূপে প্রচারিত। সুরবালা দত্ত ও অক্ষয়কুমার নন্দী সম্পাদিত মাতৃমন্দির আষাঢ় ১৩৩০/১৯২৩ সালে প্রচারিত। দেশের বিভিন্ন স্থানে মেয়েদের স্কুল প্রতিষ্ঠার প্রচার ছাড়াও সমাজে অবহেলিত অত্যাচারিত মেয়েদের দুঃখ দুর্দশার কাহিনি বিশেষত বিধবাদের করুণ বৈধব্য জীবনের বিবরণ এই পত্রিকায় বিভিন্ন রচনার মাধ্যমে জন সমক্ষে তুলে ধরা হয়েছে। দেশবিদেশে মেয়েদের গৌরবময় কৃতি ও কল্যাণকর কাজের সংবাদের পাশাপাশি মেয়েদের স্বাবলম্বী করতে অর্থকরী শিক্ষা দানের জন্য এই পত্রিকায় আবেদন করা হয়েছে।

মহিলাদের উন্নতি সাধনে এই সময় বহির্বঙ্গে দুটি পত্রিকার সম্মান পাওয়া যায় গৃহলক্ষ্মী ও বিজয়িনী। বাংলা ও আসামের নারী সমাজের কথা প্রচার করার জন্য ১৩৪৪/১৯৩৭-এর আশ্বিন মাসে গৃহলক্ষ্মী পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। কণকপ্রভা দেবের সম্পাদনায় গৃহলক্ষ্মী আসামের প্রথম মহিলা সম্পাদিত পত্রিকা। ১৩৪৩ থেকে পত্রিকাটি জাগৃহি নামে প্রচারিত হয়। প্রগতিশীল নারী আন্দোলনের রূপটি জাগৃহি নামের মধ্যে দিয়ে সার্থক হবে মনে করে পত্রিকার নামের পরিবর্তন হয়। নারী জাতিকে শিক্ষায় ও সংস্কৃতিতে গড়ে তোলা ছিল জাগৃহির উদ্দেশ্য।

বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক পর্যন্ত মহিলা সম্পাদিত পত্রিকাগুলি মূলত পণপ্রথা, বাল্যবিবাহ, বৈধব্য জনিত নানা নিয়ম কানুন ইত্যাদি সামাজিক কুপ্রথা, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে এবং স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের পক্ষে আন্দোলন করেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মারণবজ্র এবং বিশ্ববাসী কর্মকাণ্ডের ফলে বাঙালির সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে আসে বিপুল পরিবর্তন। অর্থনৈতিক ভারসাম্যের টানাপোড়েনে পারিবারিক কাঠামো হয় চূর্ণ বিচূর্ণ। অতীতের ধ্যান ধারণার ভাঙনুপে পরিবারে মেয়েদের জীবনেই আসে অনিশ্চয়তা অসহায়তা। এই সামাজিক অর্থনৈতিক ঘাত প্রতিঘাতে বাঙালি মহিলাদের জীবনযাত্রায়, মানসিকতায় এবং চিন্তা চেতনায় আসে ব্যাপক পরিবর্তন। মেয়েরা এই অবস্থায় শুধু সামাজিক অন্যায় অবিচার থেকে মুক্তি চায় না, তারা চায় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, সামাজিক প্রতিষ্ঠা।

বহির্বঙ্গে প্রকাশিত বিজয়িনী আশ্বিন ১৩৪৭/১৯৪০-এ শিলচর থেকে প্রকাশিত। নারী কল্যাণ সমিতির উদ্যোগে জ্যোৎস্না চন্দ সম্পাদিত বিজয়িনী পত্রিকায় সম্পাদিকা জানিয়েছেন— নারীজাতি ও নারী আন্দোলন সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ ও সংবাদটি বিশেষভাবে মহিলা লেখিকাগণের লেখা এবং পৌরাণিক কথা, প্রাচীন গীতাবলী, মেয়েলী ব্রতকথা, গ্রাম্যগান ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া পাঠাইলে সাদরে প্রকাশ করা হইবে। পত্রিকায় নানা উল্লেখযোগ্য সমকালীন ঘটনার উপর সম্পাদকীয় মন্তব্যগুলি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। মহিলাদের কাজকর্মের উৎকর্ষ, দক্ষতা ও যোগ্যতার খবর পত্রিকায় পাওয়া যায়। বিজয়িনীর নামকরণ করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পত্রিকায় কাব্যশিস তিনি পাঠান।

বৈশাখ ১৩৪৮/১৯৪১-এ কল্যাণী সেন সম্পাদনা করেন *মেয়েদের কথা* পত্রিকা। স্বদেশে ও বিদেশে নারী সমাজের কর্মকাণ্ডের খবরাখবর *মেয়েদের কথা*-য় পাওয়া যায়। মেয়েদের প্রয়োজনে রামাবান্না, সেলাই বোনা, সাজ পোশাক ইত্যাদি যেমন আছে পত্রিকায়, আর একদিকে মেয়েদের সাধারণ জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য বাইরের জগতের নানা ঘটনার কথাও আছে। বঙ্গবাসী ও প্রবাসী বাঙালি মহিলাদের পরস্পরের সঙ্গে যোগ স্থাপন ও পরস্পরের সহায়তায় আদর্শ ও কল্পনার উন্নতি— এই আদর্শ পত্রিকায় প্রচার করা পত্রিকার নীতি বলে পত্রিকায় ঘোষণা করা হয়েছে।

১৯৪৭-এ ভারতের স্বাধীনতা লাভের সময়কালে আমরা তিনটি জনপ্রিয় মহিলা পত্রিকা পাই : বীণা গৃহ সম্পাদিত *মহিলা* আষাঢ় ১৩৫৪, অঞ্জলি সরকার, কমলা মথোপাধ্যায় ও গীতা বসু সম্পাদিত *মহিলা-মহল*, আষাঢ় ১৩৫৪, নুরজাহান বেগম সম্পাদিত *বেগম* শ্রাবণ ১৩৫৪। *মহিলা*-র সম্পাদিকার মতে মেয়েদের মনের কথা জানার ও বলার সুযোগ সুবিধা দেওয়ার জন্য পৃথক মাধ্যম থাকা দরকার। সেই মাধ্যম হল *মহিলা*, মহিলাদের বেশি করে লেখার সুযোগ দেওয়ার জন্য সম্পাদিকা ঘোষণা কত্নেন ‘মহিলা-তে কোনো পুরুষের রচনা প্রকাশিত হইবে না।’ একাধিক ভিন্ন ভিন্ন শিরোনামে *মহিলা*-তে বিভাগীয় কলামে নানা ধরনের বিষয় আলোচিত হয়েছে এবং নানা প্রয়োজনীয় তথ্য দেওয়া হয়েছে। মেয়েদের সাধারণ জ্ঞান বৃদ্ধির উদ্দেশ্যেই এই সব বিভাগীয় আলোচনা করা হয়। *মহিলা-মহল* প্রথমে পাক্ষিক পরে মাসিক হয়। *মহিলা-মহল*-এ জানানো হয়েছে পুরুষদের *মহিলা-মহল* থেকে বিভাজিত করার জন্য পত্রিকার নাম *মহিলা-মহল* করা হয় নি। সম্পাদকীয়তে লেখা হয়েছে শুধু সাহিত্যের পসরা নিয়ে তারতম্যে বিচরণ করার জন্যে *মহিলা-মহল*-এর আবির্ভাব নয়। মেয়েদের জীবনের সত্যিকারের যে সব সমস্যা ক্রমশ জটিল হয়ে ক্ষয় রোগের মতো মানসিক স্বাস্থ্য, পারিবারিক শান্তি ও দাম্পত্য জীবনকে নষ্ট করছে তার সমাধান করা এবং সমাজ জীবন থেকে নানাবিধ কু-আচার ও কুনীতিকে বিদেয় করতে *মহিলা-মহল* কৃতসঙ্কল্প। *বেগম* মুসলিম মহিলাদের সাহিত্যচর্চায় উদ্বুদ্ধ করার জন্য প্রচারিত হয়। জাতি গঠনের দায়িত্ব প্রধানত নারীসমাজের, এটা স্বীকার করে *বেগম*-এর সম্পাদিকা লিখেছেন শিল্প বিজ্ঞান থেকে আরম্ভ করে গৃহকার্য ও সন্তান পালন সর্বক্ষেত্রে আমরা সত্যিকারের নারীবূপে গড়ে উঠতে চাই — এই কাজ করবে *বেগম*। নূতন সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের জন্য নারী সমাজকে দায়িত্ব গ্রহণের জন্য আহ্বান জানিয়ে *বেগম*-এ লেখা হয় — নারী সমাজকে এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে যাতে করে তারা সেই স্বাধীন সার্বভৌম আদর্শ রাষ্ট্রের সত্যিকারের দাবীদার হতে পারে সগৌরবে। পত্রিকায় ‘কৃত্রিম বিচ্ছেদ আমরা স্বীকার করিব না’ — এই শিরোনামে *বঙ্গদর্শন* থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বঙ্গ বিভাজনের উপর কিছু বক্তব্য মুদ্রিত হয়েছে। অবশ্য স্বাধীনতার পরে বাংলা ভাগ হওয়ার জন্য *বেগম*-কে বিচ্ছেদ স্বীকার করে নিয়ে বাংলাদেশে চলে যেতে হয় এবং সেখান থেকেই প্রকাশিত হতে থাকে।

সশস্ত্র বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে ইংরাজ শাসনের শৃঙ্খল থেকে দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য বাংলায় যুবকরা মরণপণ সংগ্রাম শুরু করে। দেশের রাজনীতিতে দেখা দেয় নরমপন্থী ও চরমপন্থী রাজনৈতিক মতাদর্শে বিরোধ। এই রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে সরলা দেবী ১৩০৬ বঙ্গাব্দে ভারতী পত্রিকার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি ১৩১৪- ১৯০৭ ভারতী-র সম্পাদিকা ছিলেন। সরলা দেবী

‘সাহস, বল, বিদ্যা, একতা, স্বাবলম্বন, স্বায়ত্তশাসন’ এই ষড় আদর্শ অবলম্বন করে ভারতী পরিচালনা করেন। সরলা দেবী বিপ্লবী আন্দোলনকে জোরালো সমর্থন করেন এবং যুবকগণকে সশস্ত্র সংগ্রামে উৎসাহিত করেন। সরলা দেবীর হাতে ভারতী ‘সাহিত্যের রক্তভূমি ছিল না, বাহন হয়েছিল জাতীয়তার।’ স্বদেশি আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রকাশিত সুপ্রভাত ও ভারত মহিলা সরলা দেবী প্রদর্শিত পথকেই অনুসরণ করে।

ভাদ্র ১৩১২/১৯০৫-এ সরযুবালা দত্তের ভারত মহিলা প্রকাশিত হয়। সম্পাদকীয়তে লেখা হয়েছে : “রাজনীতি হউক আর শিল্প বিজ্ঞানই হউক, পুরুষের পার্শ্বে নারী দণ্ডায়মান না হইলে পুরুষের শক্তি কখনও সম্যক বিকাশ হইতে পারে না।... নারীকে উন্নত করিয়া নারীকে সঙ্গে লইয়াই পুরুষকে অগ্রসর হইতে হইবে। এই সুমহৎ দৃষ্টির কর্মের কথঞ্চিৎ সাহায্য করিবার জন্য ভারত মহিলার জন্ম।” মেয়েদের রাজনৈতিক ভাবে সচেতন করা এবং স্বদেশি ভাবধারা প্রচার পত্রিকার উদ্দেশ্য ছিল। পত্রিকার প্রথম সংখ্যার দু-একটি রচনার উল্লেখ করা যায় : কুমুদিনী মিত্রের ‘মাতৃভূমির দুর্দিনে মহিলাগণের কর্তব্য’, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর স্বরলিপি সহ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘সোনার বাংলা’ গান। কুমুদিনী মিত্র সম্পাদিত সুপ্রভাত শ্রাবণ ১৩১৩/১৯০৭-এ প্রকাশিত। সুপ্রভাত-এ সম্পাদিকা ইংরাজ শাসকের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে যথেষ্ট সাহসিকতার সঙ্গে পত্রিকায় সশস্ত্র বিপ্লবের সমর্থনে রচনা প্রকাশ করেছে। ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী প্রমুখ শহীদদের চিত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। শ্রী অরবিন্দের ‘কারা কাহিনী’ ধারাবাহিক ভাবে পত্রিকায় মুদ্রিত হয়। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কবিতার কয়েকটি চরণ পত্রিকার প্রারম্ভিক পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হয় :

‘যদিও মা তোর দিব্য আলোকে
ঘিরে আছে আজ আঁধার ঘোর,
কেটে যাবে মেঘ। নবীন গরিমা
ভাতিবে আবার ললাটে তোর।’

ইংরাজ শাসকরা বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা থেকে বিরত হলে এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে স্বদেশি আন্দোলন স্তিমিত হয়ে আসে। পরবর্তীকালে ভারতের রাজনীতিতে গান্ধীজির আবির্ভাব। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের হাতিয়ার হিসাবে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের শুরু হয়। স্বদেশি কুটির শিল্পের উৎসাহ দান এবং উন্নতমানের জাতি গঠনের আদর্শ মহিলা সম্পাদিত পত্রিকাগুলিকেও প্রভাবিত করে। ১৩৩১/১৯২৩-এ সরলা দেবী পুনরায় যখন ভারতীর সম্পাদিকা হন তখন তিনি সশস্ত্র বিপ্লবের নীতিকে সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়ে গান্ধীজির অহিংস আন্দোলনে সম্পূর্ণ বিশ্বাসী হন — এবং সেই আদর্শে পত্রিকা পরিচালনা করেন। কিন্তু সেই সময়কার অন্যান্য পত্রিকা ভারতী-কে অনুসরণ করে নি এবং গান্ধীজির রাজনৈতিক আদর্শকে গ্রহণ করেনি। বিংশ শতাব্দীর ত্রিশ ও চল্লিশ দশক সমাজে, রাজনীতিতে, বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত মহিলাদের ক্ষেত্রে সর্বত্র নারী পুরুষের সমানাধিকারের দাবিতে বিশ্বের দিকে দিকে নারী মুক্তি আন্দোলন সংগঠিত হয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলে সমাজে রাষ্ট্রে বিশেষ করে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে যুগান্তকারী পরিবর্তন সূচিত হয়, সেই পরিবর্তনের ফলে নারী আন্দোলন আরও জোরদার হয়। মেয়েদের ভোটদানের ও নির্বাচনে প্রার্থী হবার অধিকার, শ্রমিকদের মজুরিতে ছেলে মেয়ের সমানাধিকার, পৈতৃক সম্পত্তির অংশীদারত্ব ইত্যাদি দাবিতে এ দেশে

নারী আন্দোলন তীব্র হয়ে উঠে। আন্দোলনের ফলে একে একে মেয়েদের নানা দাবির আইনগত স্বীকৃতি পাওয়া যায়। বাংলায় ১৯২৫-এ মেয়েদের ভোটাধিকার, ১৯৩৫-এ ভোট প্রার্থী হওয়া, ১৯৩৭-এ পৈতৃক সম্পত্তিতে মেয়েদের অধিকার, ১৯৩৭-এ বাল্যবিবাহ রোধ ইত্যাদি আইন, আইন সভায় গৃহীত হয়। এই সময়ের রাজনৈতিক পরিবেশে 'শ্রমিক, জয়শ্রী, মন্দিরা' ইত্যাদি পত্রিকার অবদান উল্লেখযোগ্য।

১৩৩১/১৯২৪ সন্তোষকুমারী গুপ্তার সম্পাদনায় সাপ্তাহিক 'শ্রমিক' পত্রিকা হিন্দি, উর্দু ও বাংলা এই তিন ভাষায় প্রচারিত হয়। উদ্দেশ্য, পুরুষ মহিলা উভয় শ্রেণির শ্রমিকদের নিজেদের সম্বন্ধে সচেতন করা এবং বিভিন্ন বিষয়ে তাদের জ্ঞান বৃদ্ধি করা। দেশ বিদেশে শ্রমিক আন্দোলন, মেয়ে ও পুরুষ শ্রমিকদের সমান মজুরির জন্য ও অন্যান্য কারণে যে সব ধর্মঘট সংগঠিত হয়েছে তার বিবরণ এই পত্রিকায় পাওয়া যায়। শ্রমজীবীদের জন্য মহিলা পরিচালিত একমাত্র পত্রিকা 'শ্রমিক' স্বল্পস্থায়ী হলেও সাময়িকীর ইতিহাসে বিশেষ স্থান অধিকার করেছে।

বৈশাখ ১৩৩৮/১৯৩১ সালে ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'জয়শ্রী' মহিলাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও সম্পাদিত এবং মহিলাদের লেখনীতেই পূর্ণ। মহিলাদের মুখপত্র। সম্পাদিকা লীলা নাগ, সহ সম্পাদিকা রেণুকা সেন ও শকুন্তলা রায়। পরিচালিকারা মনে করতেন পুরুষদের তুলনায় শিক্ষিতা নারীর সংখ্যা কম তাই প্রথম দিকে 'জয়শ্রী'-তে শুধু মেয়েদের রচনাই প্রকাশিত হয়। উদ্দেশ্য দেশ সেবা, সম্পাদকীয়তে লেখা হয়েছে মেয়েদের মধ্যে দেশাত্মবোধ ও শক্তাহীন দেশসেবার ভাব জাগ্রতকরার জন্যই পত্রিকার আত্মপ্রকাশ। বিপ্লবী আন্দোলনের আদর্শে মেয়েদের উদ্বুদ্ধ করার কাজে 'জয়শ্রী' ব্রতী হয়, রাজনৈতিক ভাবে সুভাষচন্দ্র বসুর মতাদর্শকে অনুসরণ করে। পত্রিকার নামকরণ করেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর প্রেরিত আশীর্বাদ বাণী উদ্ধৃত করা হল :

বিজয়িনী নাই তব ডয়
দুঃখে ও ব্যথায় তব জয়
অন্যায়ের অপমান
সম্মান করিবে দান
জয়শ্রীর এই পরিচয়।

সশস্ত্র সংগ্রামকে সমর্থন এবং ইংরাজ শাসকদের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ স্বাধীন মতামত প্রকাশের জন্য 'জয়শ্রী' সরকারের বিরাগভাজন হয়, সম্পাদিকা ও সহ সম্পাদিকাকে কারাবরণ করতে হয়। ১৯৩৫ প্রকাশনা বন্ধ হয়ে ১৯৩৮-এ পুনরায় প্রকাশিত হয়। ১৯৪২-এ প্রকাশনা বন্ধ হয়, পুনরায় ১৯৪৭-এ প্রকাশিত হয়ে আজও চালু আছে। 'জয়শ্রী'-র দ্বিতীয় পর্বেও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্যশিষ সহ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, সুভাষচন্দ্র বসু, জহরলাল নেহরু, সরোজিনী নাইডু প্রমুখ বহু বিশিষ্ট জনের আশীর্বাদ ও অভিনন্দন লাভ করে। সমকালীন রাজনীতিতে 'জয়শ্রী'-র বিভাগীয় খবরাখবর আলোচনা ও সম্পাদকীয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

কমলা চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'মন্দিরা' বৈশাখ ১৩৪৫/১৯৩৮-এ প্রকাশিত হয়। অগ্রহায়ণ থেকে সম্পাদিকা হন কমলা দাশগুপ্তা। রাষ্ট্রনৈতিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি অভিযানে অংশগ্রহণ করে সার্থক করা হল 'মন্দিরা'-র উদ্দেশ্য। এই পত্রিকাতেও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুভাষচন্দ্র বসু প্রমুখ সম্মাননীয় ব্যক্তির আশীর্বাদ পাঠিয়েছেন। 'মন্দিরা'-র প্রথম সংখ্যায় চিত্তরঞ্জন বিশ্বাসের 'নারী আন্দোলন', কল্যাণী দেবীর 'কারাগৃহে কয়েক বৎসর', প্রীতি

সেনগুপ্তার 'রাজনীতি ও মেয়েদের কর্তব্য' প্রকাশিত হয়। মহিলা রাজবন্দিদের স্মরণে কবিতা এবং রাজবন্দি বীণা দাশের একটি চিঠি পত্রিকায় মুদ্রিত হয়। এই পত্রিকাটিও রাজরোষে পড়ে। ১৯৩৯-এ ২ জুন 'মজুর' কবিতা প্রকাশের জন্য জরিমানা হয়।

বাংলার রাজনৈতিক অবস্থার মতনই বিংশ শতাব্দীর চার দশকে সাহিত্যক্ষেত্রে দেখা দিয়েছে নানা বিপরীতমুখী সাহিত্যিক আদর্শের ও নীতির বিরোধ। সাহিত্যচর্চায় শ্রীল ও অশ্রীলতার দ্বন্দ্ব, চলিত ও সাধু ভাষার বিরোধ দেখা দেয়। এই সময় সাহিত্যিকদের মধ্যে এসেছে সংস্কারমুক্ত যুক্তিবাদী বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি। সাহিত্যের এই বিবর্তনের সময়ে নিছক সাহিত্য সেবাকে মূলধন করে খুব কম মহিলারাই পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। এই শতাব্দীতে অন্যতম সাহিত্য পত্রিকা ভারতী। ১৩১৫-১৩২১/১৯০৮-১৯১৫ পর্যন্ত স্বর্ণকুমারী পুনরায় ভারতী পত্রিকার সম্পাদিকা হন। বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও নব্য লেখক তৈরিতে পরিশ্রম— বলিষ্ঠ, নিরপেক্ষ, উদার মানবতাবাদী মানসিকতা — সম্পাদিকা হিসাবে স্বর্ণকুমারীকে গৌরবজনক স্থানে অধিষ্ঠিত করেছে। স্বর্ণকুমারী দেবী নিজেই সার্থক সম্পাদনা কাজ কি সে সম্পর্কে বলেছেন : 'সম্পাদনার অর্থই পাঁচজনকে নিয়ে পাঁচজনের হয়ে কাজ করা। সম্পাদক শুধু একজন মাধ্যম, তার কাজ পারম্পরিক মত বিনিময়।'

বৈশাখ ১৩২৯/১৯২২ শান্তিনিকেতন থেকে শান্তিনিকেতন আশ্রমের মহিলাদের প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যসভার মুখপত্র হিসাবে হাতে লেখা শ্রেয়সী পত্রিকাটি প্রচারিত হয়। পরে প্রতিমা দেবীর প্রতিষ্ঠিত 'আলাপনী' সভার মুখপত্র হিসাবে মুদ্রিত হয়। মুখবন্ধে লেখা হয়েছে 'সকলের শ্রেয় বৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা — শ্রেয়সীর সম্বল।' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অঙ্কন লেখায় শ্রেয়সী একটি উঁচু মানের সাহিত্য পত্রিকা হয়ে উঠে। পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনূদিত উপনিষদ থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে :

শ্রেয় প্রেয় সবাই চায়
দেখে বেছে যে যেটা পায়
যে, নয় শ্রেয় সে পায় কুল
যে নেয় প্রেয় সে পায় মূল।

আলোক নামে সাহিত্য পত্রিকাটি কার্তিক ১৩৩৬/১৯২৯-এ প্রভাতরঞ্জন বিশ্বাস ও আরতি দেবীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। সম্পাদকদ্বয়ের মতে বর্তমানে সাহিত্যিকরা অতি আধুনিকতার নামে যে পথে যাত্রা করেছে, তাঁদের সেই পথ থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য বৃথা চেষ্টা না করে, সাহিত্য সেবার জন্য নূতন পথের সন্ধান করা দরকার। 'আলোক ধারা' নামে এক নিবন্ধে লেখা হয় : 'একথাটি মনে রাখা উচিত যে কাউকে কোন পথ হতে ফিরবার কথা না বলে, নূতন পথের জন্য নূতন যাত্রী তৈয়ার করে তোলাই ভাল। সাহিত্য জগতে এই পরিস্থিতিতে আলোক-এর চেষ্টা সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট বা নূতন পথকে লেখক ও পাঠক সমাজে সুপরিচিত করে তোলা।'

একটি বার্ষিক সাহিত্য পত্রিকাও মহিলারা প্রকাশ করেন। পত্রিকার নাম রূপরেখা, সম্পাদিকা জাহানারা চৌধুরী, প্রকাশকাল অগ্রহায়ণ ১৩৩৯, উদ্দেশ্য সাহিত্যচর্চাকে মাধ্যম করে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির বাতাবরণ তৈরি। দুই সম্প্রদায়ের মহিলাদের সম্প্রীতির সম্পর্কে সচেতন করা। সমকালীন হিন্দু-মুসলিম সমস্ত খ্যাতিনামা লেখক লেখিকা এই পত্রিকায় লিখেছেন।

লেখক লেখিকাদের ছবি এবং আরও অন্যান্য অনেক ছবি দিয়ে পত্রিকাটি সুসজ্জিত করা হয়েছে। *রূপরেখা* ১৩৪৪ বঙ্গাব্দ থেকে *বর্ষাবাহী* নামে প্রচারিত হয়। *বুলবুল* বৈশাখ ১৩৪০/১৯২৩-এ প্রকাশিত। হিন্দু-মুসলিম খ্যাতনামা সাহিত্যিকদের রচনায় পুষ্ট *বুলবুল* একটি জনপ্রিয় পত্রিকা। মহম্মদ হবিবুল্লাহ বাহার ও বেগম শামসুন নাহারের সম্পাদনায় *বুলবুল* চতুর্মাসিক পত্রিকা হিসাবে প্রচারিত মুক্তবুদ্ধি সম্পন্ন, সমস্ত প্রকার অঙ্ক সংস্কার বর্জিত সম্পাদকদ্বয়ের সম্পাদনায় *বুলবুল*-এর সাহিত্যচর্চা তৎকালীন অন্যান্য সাহিত্যিকদের প্রেরণা দিয়েছে। ‘বুলবুলের কথা’ নামে মুখবন্ধে বুলবুলের মর্মকথা ব্যক্ত হয়েছে এইভাবে:

সমাজকে নিত্রা থেকে জাগানোই বুলবুলের গান গাওয়া। বুলবুলের মধুর কণ্ঠের গান, সবুজ বাণীর বৃকে ফুলের কুঁড়িতে কামনা করে নবজন্ম। যে নবজন্ম আনবে নব চিন্তাধারার নব উদ্দীপনা।

বিংশ শতাব্দীতে প্রায় একশোটি ছোটোদের জন্য পত্রিকা প্রকাশিত হলেও মহিলারা ছোটোদের পত্রিকা প্রকাশে আগ্রহী হয়নি। মাত্র ছটি পত্রিকার নাম পাওয়া যায় যেগুলি মহিলারা পরিচালনা করেছেন। এর মধ্যে *মুকুল*, *পাপিয়া*, *মকতব* এবং *সঙ্ঘসাধী* এই চারটির সন্ধান পাওয়া গেছে। ঊনবিংশ শতাব্দী শেষে শিবনাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত *মুকুল* শকুন্তলা দেবীর সম্পাদনায় বৈশাখ ১৩৩৫/১৯২৮-এ পুনঃপ্রচারিত হয়। পত্রিকায় ছোটোদের উপযোগী কবিতা, প্রবন্ধ, জীবনী ইত্যাদি লিখেছেন হিরণ্ময়ী দেবী, কামিনী রায়, বাসন্তী চক্রবর্তী, অমৃতলাল গুপ্ত, বিপিনবিহারী চক্রবর্তী প্রমুখ। বিভাবতী সেনের *পাপিয়া* ত্রৈমাসিক পত্রিকাটি বৈশাখ ১৩৩৪/১৯২৭-এ প্রকাশিত। এই পত্রিকায় গল্প কবিতার সঙ্গে কিশোর কিশোরীদের জন্য শিক্ষামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। বৈশাখ ১৩৩৭/১৯৩০-এ সাখাওয়াত হোসেন প্রকাশ করেন *মকতব*। *মকতব*-এ প্রতিটি রচনার সঙ্গে সুন্দর অলঙ্করণ করা হয়েছে। সত্যাশ্রম শিশু সঙ্ঘ থেকে বৈশাখ ১৩৪৬/১৯৩৯-এ কমলা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় *সঙ্ঘ-সাধী*। আশ্রমের ছোটো ছোটো ছেলে মেয়েরাই পত্রিকায় লিখত। পরবর্তীকালে এটি আর ছোটোদের পত্রিকা থাকেনি, আশ্রমের মুখপত্র হিসাবে প্রচারিত হয়।

বিশেষ একটি বিষয় নিয়েও মহিলারা পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। যেমন *আনন্দ সংগীত* পত্রিকা শুধু সংগীত বিষয়ক। *শিক্ষা*, *শুধুই শিক্ষা* সম্পাদকীয়, *ললিতা* শুধু শিল্পকলা বিষয়ক। ঠাকুরবাড়ির মেয়েরাই *আনন্দ সংগীত* পত্রিকা প্রকাশ করেন। আশ্রম ১৩২০/১৯১৩-তে পত্রিকাটির প্রকাশ। স্বরলিপির মধ্যে দিয়ে সহজে গান শেখানোর জন্যই পত্রিকাটির প্রতিষ্ঠা। ১৩৩১-এ পত্রিকাটি *সারদা* পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হয়। *শিক্ষা* সঙ্ঘের মুখপত্র *শিক্ষা* আশ্বিন ১৩৪৭/১৯৪০-এ প্রকাশিত; সম্পাদিকা ছিলেন স্বর্ণপ্রভা সেন। সম্পাদকীয়তে জানানো হয়েছে: ‘বঙ্গদেশে শারীরিক মানসিক ও নৈতিক সর্ববিধ উন্নতির জন্য ‘শিক্ষার’ প্রচার।’ প্রিয়রঞ্জন সেন এই সম্পাদকীয়তে আরও লিখেছেন: ‘আমাদের জীবনে কর্মজীবনে ও চিন্তায় যে সকল অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছি তা দিয়া শিশু ও কিশোরের সেবা করা, সাহায্য করা — ইহা অবশ্যই করণীয়।’ এই সেবার উদ্দেশ্যে *শিক্ষা*-র প্রকাশ। মুরারি দত্তের সহযোগী অরুণা বসু ললিতকলা বিষয়ক *ললিতা* প্রকাশ করেন। আশ্বিন ১৩৪৯/১৯৪২-এ ত্রৈমাসিক *ললিতা* প্রকাশ করেন। বিখ্যাত চিত্রশিল্পীদের আঁকা ছবি, চারুকলা বিষয়ক নানা আলোচনা, শিল্পী মহলের নানা খবরাখবর এই পত্রিকায় থাকত। অনুরূপা দেবীর ছোট্ট একটি কবিতা দিয়ে পত্রিকার উদ্বোধন হয়েছে:

ললিত ভাষায় ললিত কলার কাহিনী কহি,
মৃত্যু আঁধারে নব জীবনের বারতা বহি,
প্রতি দিবসের রোগ শোক শ্রানি বেদনা হতে,
নিয়ে চলো তারে আনন্দলোকে মুক্তিপথে।

আরও কয়েকটি মহিলা পরিচালিত পত্রিকার সম্মান পাওয়া যায়। *ত্রিপুরা গাইড*— ত্রিপুরা থেকে ১৩২৬/১৯১৯-এ সাপ্তাহিক সংবাদ সাময়িকী রূপে প্রকাশিত। এই পত্রিকার সম্পাদিকা কাদম্বিনী গুপ্ত। পরে ননীগোপাল চট্টোপাধ্যায় এর সম্পাদক হন। চার পাতার এই পত্রিকার প্রথম পাতা ইংরাজিতে দ্বিতীয় পাতা বাংলায় খবরাখবর লেখা হয়। তৃতীয় পাতায় নিলামী ইস্তাহার এবং শেষ বা চতুর্থ পাতায় শুধু বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হয়। অবশ্য প্রত্যেক মাসে এই নিয়মের পরিবর্তন হত। পরবর্তীকালে পত্রিকার চরিত্রের পরিবর্তন হয়। সংবাদের সঙ্গে কিছু প্রবন্ধ ও ব্যঙ্গাত্মক রচনা প্রকাশিত হয়। ব্যঙ্গাত্মক রচনা লিখতেন চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ।

ধর্মীয় প্রচারের মুখপত্রের সম্পাদিকা পদে মহিলাদের দেখা যায়। খ্রিস্টীয় প্রচারের জন্য শ্রীমতী পরিমল মিত্রের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় *আগন্তুক*। *আগন্তুক* খ্রিস্টীয় ধর্মের প্রচারক হলেও হিন্দু মুসলিম সব ধর্মের লেখকরাই এখানে লিখতেন। পত্রিকার উদ্দেশ্য হল খ্রিস্টীয় সমাজের সংস্কার, জাতীয় আন্দোলনের আলোচনা এবং সাহিত্যচর্চা।

মুক্ত — এই সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকাটি ফাঙ্কুন ১৩৩৭-এ প্রকাশিত হয়। এর সম্পাদক যদিও নগিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায় কিন্তু পত্রিকাটির পরিচালিকা ছিলেন তরুবালা সেন। স্বদেশি আন্দোলনের ভাবধারা ও বিপ্লবীদের কার্যকলাপ প্রচার করাই ছিল পত্রিকার মূল উদ্দেশ্য। বিশ্বের দিকে দিকে অধিকার রক্ষার ও স্বাধীনতা অর্জনের যে সংগ্রাম তার কাহিনি প্রচারই ছিল পত্রিকাটির মুখ্য উদ্দেশ্য। দেশবিদেশের মহিলা সমিতির বিবরণ, মহিলা সম্মেলনের প্রতিবেদন, স্বনামধন্য সমাজসেবিকাদের উন্নতি মূলক সেবাকর্মের চিত্র সহ বিস্তারিত বিবরণ পত্রিকায় আছে। পত্রিকাটিতে প্রথমে খবরাখবর বেশি থাকত, পরবর্তীকালে অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। বিজ্ঞাপনের চমকে মুক্ত একটি ব্যতিক্রমী পত্রিকা।

রাজনীতির জগতের সংবাদ মাধ্যম রূপে বারীন্দ্রকুমার ঘোষের *বিজ্ঞানী* একটি বিখ্যাত পত্রিকা। *বিজ্ঞানী* বৈশাখ ১৩৩৭ থেকে প্রতি সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। এই রাজনীতিধর্মী *বিজ্ঞানী*-র সহ সম্পাদক ছিলেন লতিকা ঘোষ। তিনি বিভাগীয় কলামে সংবাদাদি লিখতেন।

যেসব পত্রিকার সম্মান পাইনি তার তালিকা

অনুভব ও সাহিত্য :	শ্রাবণ ১৩৪৩/১৯৩৬, সম্পাদিকা জ্যোৎস্নাহাসি সেনগুপ্ত। মাসিক।
অর্ঘ্য :	ফাঙ্কুন-বৈশাখ ১৩৩৫/১৯২৯, সম্পাদিকা, প্রভাবতী পাইন, যুগ্ম সম্পাদক অনিল ধর। ত্রৈমাসিক।
আশ্রমী :	মাঘ ১৩৪৭/১৯৪১ সম্পাদক কেশবলাল বসু, সহ-সম্পাদিকা কমলবাসিনী দেবী। পাক্ষিক।
কিশোরী :	১৩৩৮/১৯৩০, সম্পাদক সুধা সেন। বার্ষিক।
ছাত্রী :	১৩৪৯/১৯৪২, সম্পাদিকা পারুল দত্ত। মাসিক।
হেলোবেলা :	১৩৪৬/১৯৩৯, সম্পাদিকা বাণী দেবী ও মিনতি ঘোষ। মাসিক।

জাগরণ	: আষাঢ় ১৩৪৯/১৯৪২, সম্পাদিকা সুলতানা বেগম। ত্রৈমাসিক।
নটরাজ	: বৈশাখ ১৩৪৪/১৯৩৭, সম্পাদিকা গৌরপ্রিয়া দাশগুপ্তা। মাসিক।
পরিক্রমা	: বৈশাখ ১৩৫৩/১৯৪৬ সম্পাদিকা কল্যাণী মুখোপাধ্যায়। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত এই চারটি ঋতুতে প্রকাশিত।
প্রভাতী	: বৈশাখ ১৩৪৯/১৯৪২, সম্পাদিকা সুধা ঘোষ। ত্রৈমাসিক।
প্রেম ও জীবন	: শ্রাবণ ১৩১৯/১৯১২, সম্পাদিকা হেমলতা দেবী। মাসিক।
বঙ্গনারী	: আশ্বিন ১৩৩০/১৯২৩, সম্পাদিকা চিন্ময়ী দেবী। মাসিক।
ভারতলক্ষ্মী	: চৈত্র (?) ১৩১৭/১৯১৯ সম্পাদিকা যোগমায়া মাঝি তপস্বিনী। মাসিক।
রূপসী	: কার্তিক ১৩৪১/১৯৩৪, সম্পাদিকা বেলা ঘোষ। দ্বিমাসিক।

বাংলা ভাষায় প্রকাশিত সাময়িকপত্রের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় মহিলাদের দ্বারা সম্পাদিত সাময়িকীগুলি গৌরবজ্বল ভূমিকা পালন করেছে। স্বর্ণকুমারী দেবী সম্পাদিত ভারতী পত্রিকা প্রকাশের সময় থেকেই মহিলা সম্পাদিত পত্রিকার জয়যাত্রা। পত্রিকা পরিচালনা ক্ষেত্রে স্বর্ণকুমারী দেবীর আদর্শ ও নীতিকেই মূলত বিংশ শতাব্দীর পত্রিকার সম্পাদিকারা অনুসরণ করেন। স্বর্ণকুমারী দেবীর আধুনিক, নিরপেক্ষ, বলিষ্ঠ, যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় বিংশ শতাব্দীতেও পত্রিকার মধ্যে পাওয়া যায়। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক বিবর্তনের পরিবর্তিত ঘটনা প্রবাহ যেভাবে জনজীবনে প্রতিফলিত হয়েছে তার প্রতিচ্ছবি এই সব পত্রিকার মধ্যে দেখতে পাই। সমকালীন ঘটনা প্রবাহে প্রভাবিত পত্রিকাগুলি সেই কারণে সব ক্ষেত্রে স্বর্ণকুমারী দেবীর পথে অনুগামী হয় নি। যেমন অনেক পত্রিকা বিপ্লবী আন্দোলন সমর্থন করেছে যা ভারতী-তে সমর্থন করা হয় নি। ঊনবিংশ শতাব্দীতে অনেক পত্রিকাই মেয়েদের রাজনীতিচর্চা বা রাজনীতিতে যোগদান সমর্থন করেনি। বিংশ শতাব্দীতে মহিলাদের প্রায় সব পত্রিকাই রাজনীতি সম্পর্কে মেয়েদের উদাসীন থাকা মেনে নেয়নি। সাময়িক পত্রিকাগুলি রাজনীতি বা সাহিত্যসেবা যাকেই গুরুত্ব দিক না কেন তাদের মূল লক্ষ্য মহিলাদের সুশিক্ষা দান। মহিলাদের সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন এবং সামগ্রিকভাবে তাদের উন্নয়ন। পত্রিকার সম্পাদকের কর্তব্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের একটি কাব্যবাণী এখানে উদ্ধৃত করি:

তোমার লেখনী যেন ন্যায়দণ্ড ধরে
শত্রুমিত্র নির্বিভেদে সকলের পরে।
স্বজাতির সিংহাসন উচ্চ করি গড়ো
সেই সঙ্গে মনে রেখো সত্য আরও বড়ো।
স্বদেশেতে চাও যদি তারো উর্ধ্বে গঠো
কোর না দেশের কাছে মানুষেরে ছোটো!*

বিংশ শতাব্দীর মহিলা সাংবাদিকরা রবীন্দ্রনাথের এই অভিমত যথাসাধ্য পালন করতে চেষ্টা করেছেন। এই প্রসঙ্গে সুপ্রভাত, জয়শ্রী, মন্দিরা ইত্যাদি পত্রিকার নাম উল্লেখ করা যায়। কোনোবোম্ব ব্যবসায়িক মনোভাব নিয়ে পত্রিকাগুলি পরিচালিত হয়নি। সম্পাদিকারা ও তার

* প্রখ্যাত সাংবাদিক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের *আনন্দবাজার পত্রিকা*-য় যোগদান উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্যশিলা। কৃষ্ণ ধর — *সাংবাদিকের সম্পাদকের ভূমিকা* সেকাল ও একাল পৃ. ১৬১-৬২ — ‘শতাব্দীর সৈনিক’, ২০০৪।

সহযোগীরা পারস্পরিক আলোচনার মধ্যে দিয়েই পত্রিকা পরিচালনা করতেন। বিংশ শতাব্দীতে পুরুষ পরিচালিত পত্রিকাগুলির মধ্যে যে রেষা-রেবি, পরস্পরের প্রতি আক্রমণাত্মক সমালোচনা হত, মহিলাদের পত্রিকাগুলি সাহিত্যক্ষেত্রে এই দলাদলির পরিবেশ থেকে নিজেদের মুক্ত রাখে। এখানে সরলা দেবীর একটি উক্তি স্মরণ করা যেতে পারে (সরলা দেবী চৌধুরাণী, *জীবনের ঝরাপাতা*, পৃ.১৫৭ ১৩৮৮) : ‘...যারাই সাহিত্যকে জীবিকা অর্জনের একটি মুখ্য উপায় রূপে আঁকড়ে ধরেছে তারাই অন্য সমব্যবসায়ীদের প্রতি বিবুদ্ধাভাব পোষণ করে।’ মহিলাদের পত্রিকার সম্পাদিকারা নারীমুক্তি আন্দোলনের সহযোদ্ধা। একই পথের পথিক। তাই তাদের মধ্যে গড়ে উঠে বন্ধুত্বপূর্ণ প্রীতি সম্পর্ক। অসীম সহনশীলতা-সম্পন্ন অসহায় নির্ধারিত নারীদের নীরবতাকে মুখর করে জনসমক্ষে প্রচারের মুখপত্র এই সব মহিলা সম্পাদিত পত্রিকার মর্মবাণী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্যের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করে আলোচনা শেষ করছি :

হে বিধাতা, আমারে রেখোনা বাক্যহীনা—

রক্তে মোর জাগে বুদ্রা বীণা।

উত্তরিয়া জীবনের সর্বোন্নত মূর্তির প’রে

জীবনের সর্বোত্তম কণ্ঠ হতে বাণী যেন ব’রে

নির্ব্যাহিত স্রোতে।

(‘সবলা’, *মহুয়া*)

নির্দেশিকা :

গীতা চট্টোপাধ্যায়, *বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী* (১৯০০-১৯১৪), ১৯৯০।

গীতা চট্টোপাধ্যায়, *বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী* (১৯১৫-১৯৩০), ১৯৯৪।

গীতা চট্টোপাধ্যায়, *বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী* (১৯৩১-১৯৪৭), ২০০১।

সরলা দেবী চৌধুরাণী, *জীবনের ঝরাপাতা*, ১৯৮১।

প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, *বাংলার নারী জাগরণ*, ১৩৫২।

কণক মুখোপাধ্যায়, *ভারতের নারী আন্দোলনের ধারা*, ১৯৯৫।

সোমেন দাশগুপ্ত, *ভারতের নারী মুক্তি আন্দোলনের ঐতিহ্য*, ১৯৯৪।

রাধারাণী দেবীর শরৎচন্দ্র

অমিয় দেব

কিছু ঋণ কোনোদিনই শোধ হয় না। রাধারাণী দেবীর কাছে যে অপাব স্নেহ পেয়েছি তা শুধু স্মরণই করা যায়। তাঁর জন্মশতবর্ষে আমি সেই প্রয়াসই করছি। এই ক্ষুদ্র নিবন্ধ তার সাক্ষ্য মাত্র।

রাধারাণী দেবী তাঁর শরৎদা বা বড়দাকে কতটা শ্রদ্ধা ও স্নেহ করতেন ও শরৎচন্দ্রের কাছে তিনি, রাধু, কতটা স্নেহ ভালোবাসা পেয়েছিলেন তা নিয়ে আমি নতুন করে লিখতে বসিনি। আমি লিখতে বলেছি তাঁর পরিণত মননে তিনি শরৎচন্দ্র বিষয়ে কী ভেবেছিলেন তা নিয়ে। অর্থাৎ ১৯৭৫-এ তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে তিনটি শরৎচন্দ্র স্মারক বক্তৃতা দেন আর যা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দেশ পত্রিকায় ‘শরৎচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্য’ নামে ধারাবাহিক ছাপা হয় এবং স্থানিক পরেই, ১৯৭৬-এ, শরৎচন্দ্র : মানুষ এবং শিল্প নামের বই হয়ে বেরোয়, তা নিয়ে লিখতে বসেছি। লিখতে বসেছি মানে কেবল এই নয় যে এতদিন পরে আবার বইটির গুরুকীর্তন করতে চাই। গুরুকীর্তন তো করবই, সেই সঙ্গে তাতে তাঁর মনন কীভাবে প্রতিভাত হয়েছে তাও দেখবার চেষ্টা করব। রাধারাণী দেবী কবি, কথাকার ও প্রবন্ধকার, শরৎচন্দ্রের একটি অসমাপ্ত উপন্যাস তিনি শেষ করেছিলেন; রাধারাণী দেবী বিদূষী, রাধারাণী দেবী মনস্থিনীও। তাঁর মনস্থিতার পরিচয় আমি একসময় প্রায় প্রত্যহ পেয়েছি। কোথাও কিছু একটা ঘটেছে, সেদিনের কাগজে তা পড়েছেন, সেই বিষয়ে আমার তদাতরুণ মনের প্রতিক্রিয়া জানতে জানতে তাঁর সদাতরুণ মনের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করছেন। আমি অবাক হয়ে শুনতাম। মহিলা-পুরুষের মনস্থিতার অভেদে তখনও আমরা অভ্যস্ত হইনি — বলছি বাটের গোড়ার দিকের কথা। কী নিয়ে যে তিনি ভাবতে পারতেন না জানি না। আধুনিক মন, গ্রহণোন্মুখ, তবে ঐতিহ্যেরও ঈষৎ টান আছে। বোঝা যেত তিনি যত লিখেছেন তার চেয়ে কম বলেননি। আমার ডায়েরি লেখার অভ্যাস ছিল না, নয়তো তাঁর সেইসব কথা লিপিবদ্ধ করে রাখা যেত। এখন কেবল স্মৃতি। আমার আপন সম্পদ।

শরৎচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্য যখন দেশ-এ বেরোয় তখন তা নিয়ে ডের বিতর্ক হয়েছিল, যদিও তার মূল বিবন্ধা ছিল একটিই, তাঁর স্ত্রী হিরণ্ময়ী দেবীকে শরৎচন্দ্র শাস্ত্রমতে বিয়ে করেছিলেন কিনা। আটশ বছর পরে দেশ-এ ছাপা ওই চিঠিগুলি আবার পড়তে গিয়ে মনে হল, রাধারাণী দেবীর কথায় (শাস্ত্রমতে বিয়ে হয়নি, যদিও হিরণ্ময়ী দেবীকে আগাগোড়া স্ত্রীর মর্যাদা ও অধিকার দিয়েছিলেন শরৎচন্দ্র) যাঁরা আপত্তি করেছিলেন তাঁদের অনেকেরই উদ্বেগের প্রধান কারণ ছিল শরৎচন্দ্রের ভাবমূর্তি। তাঁর জন্মশতবর্ষ চলছে, তখন কি এমন

সংশয় অভিপ্রেত? অথচ রাধারাণী দেবীর উদ্দেশ্য ছিল মানুষ শরৎচন্দ্রের সত্য প্রতিষ্ঠা যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তাঁর শিল্পের সত্য সন্দর্শন করতে পারে। শাস্ত্রের অনুশাসন না মেনেও যে আবরণ এক নারীকে তাঁর স্ত্রীর সম্মান দিয়েছিলেন এতে তিনি শরৎচন্দ্রের মহত্ত্বই দেখতে পেয়েছিলেন। বিবাহ বহির্ভূত দাম্পত্য নিয়ে এই আটাশ বছরে আমাদের সহনশীলতা হয়তো ঈষৎ বেড়েছে এবং এই সম্পর্কের নজির হিসেবে কেবল জ্ঞা পল সার্জ ও সিমোন দ্য বোভোয়ারের কথাই ভাবি না, আমাদের অনেক কাছের রামকিঙ্কর-রাধারাণীর কথাও ভাবি। শূনেছি তাঁর উত্তরাধিকারী হিসেবে নোরা যাতে বৈধ প্রতিপন্ন হতে পারেন তার জন্য শেষ বয়সে সেই দীর্ঘদিনের জীবনসঙ্গিনীকে জয়েস আইনি বিবাহ করেন। কিন্তু, রাধারাণী দেবীর সাক্ষ্য অনুযায়ী, তা শরৎচন্দ্র করেননি, কেবল তাঁর উইলে হিরণ্ময়ী দেবীর পরিচয় দেন স্ত্রী বলে। শরৎচন্দ্রের জন্মশতবর্ষে এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করে যে সাহস দেখিয়েছিলেন রাধারাণী দেবী, আজ আটাশ বছর পরে, ২০০৩ খ্রিস্টাব্দে শরৎচন্দ্রের প্রথম মুদ্রিত গল্প “মন্দির” প্রকাশের শতবর্ষপূর্তিতে তা স্মরণ করে অভিভূত হচ্ছি। শরৎচন্দ্র পাঠে যে নব উদ্দীপনা তিনি সঞ্চার করতে চেয়েছিলেন তার ঋণ স্বীকারের আজ প্রকৃষ্ট ক্ষণ। আজ শরৎচন্দ্রের স্নেহদ্রব্য রাধারাণী দেবীর জন্মশতবর্ষের সূচনা।

তাঁর *শরৎচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্য* তথা *শরৎচন্দ্র : মানুষ এবং শিল্প* বেরোবার চব্বিশ বছর আগে ১৩৪৮-র শ্রাবণ সংখ্যা *ভারতবর্ষ*-এ শরৎচন্দ্র সংক্রান্ত একটি প্রবন্ধ লেখেন রাধারাণী দেবী, নাম “নিরুপমা দেবীর মৃত্যুতে শরৎচন্দ্রের শ্রাদ্ধ”। এক অর্থে তাঁর বইয়ের এক প্রধান উপগদ্যের বীজ এতে আছে। এর প্রত্যক্ষ বিষয় নিরুপমা দেবীর স্মৃতিতর্পণ উপলক্ষ্যে অনুরূপা দেবী কর্তৃক অহেতুক শরৎচন্দ্র বিদূষণ; পরোক্ষ বিষয় নিরুপমা দেবী ও শরৎচন্দ্রের পারস্পরিক পরিচয়ের মাত্রা। আর, কোনো পরিচয়ই যে অন্তঃপুরবাসিনী শূদ্ধাচারিণী বালবিধবা নিরুপমা দেবীর সঙ্গে ছন্নছাড়া ভবঘুরে শরৎচন্দ্রের থাকতে পারে না, তাই বলছেন অনুরূপা দেবী। তিনি নিরুপমা দেবীর বাগ্যসম্বী, নিরুপমা দেবীর লেখার গুণগ্রাহী, শরৎচন্দ্রই নিরুপমা দেবীর প্রাথমিক উৎসাহদাতা এই বহুল প্রচারিত অভিমতের তিনি ঘোরতর বিরোধী। অন্যপক্ষে রাধারাণী দেবী নিরুপমা দেবীর দাদা বিভূতিভূষণ ভট্টের ও নিরুপমা দেবীর নিজের স্মৃতিচারণ থেকে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁদের একদা নৈকট্য প্রতিষ্ঠা করেছেন। অনুরূপা দেবী অপেক্ষাকৃত রক্ষণশীল, তাই শরৎচন্দ্রের জীবনযাপন যেমন তেমন লেখাও তাঁর পছন্দ নয়। অতএব নিরুপমা দেবীর সুনাম রক্ষাকল্পে তাঁকে শরৎচন্দ্রের ত্রাত্যতা ও তাঁর শিল্পের অকিঞ্চিৎকরতার কথা তুলতে হয়েছিল। অথচ রাধারাণী দেবী দেখতে পাচ্ছেন নিরুপমা দেবীর সঙ্গে শরৎচন্দ্রের একদা এক সাহিত্যিক যোগ গড়ে উঠেছিল — তাঁর দাদার তো বটেই, তাঁর নিজের সাক্ষ্য মানলেও তা অস্বীকার করবার কোনো উপায় নেই। অন্য কোনো যোগ গড়ে উঠেছিল কিনা তার ইঙ্গিত এই ১৩৫৮-র প্রবন্ধে নেই, তবে চব্বিশ বছর পরের বড়ো লেখায় আছে। হিরণ্ময়ী দেবী শরৎচন্দ্রের স্ত্রী, কিন্তু তাঁর লেখার প্রেরণা বা নিয়ন্তা তিনি নন; তা, রাধারাণী দেবীর মতে, নিরুপমা দেবী। যে মর্যাদা ও স্নেহ তাঁর হিরণ্ময়ী দেবীর প্রতি ছিল, তারই তুল্য মর্যাদা ও স্নেহ তাঁর নিরুপমা দেবীর প্রতিও ছিল, যদিও তিনি সুদূর অন্তরালবাসিনী ছিলেন। ভাগলপুরের পরে তো বটেই, ভাগলপুরেও যে যোগাযোগ তাঁদের হয়েছিল তা পরোক্ষ। কিন্তু শরৎচন্দ্রের মনোভঙ্গিতে রাধারাণী দেবী প্রত্যক্ষতা দেখতে পেয়েছিলেন।

তিনি গবেষক নন — তাঁর বই লিখতে গিয়ে একথা বারবার বলেছেন রাধারাণী দেবী। কিন্তু তাঁকে আমরা গবেষক ভেবে নেবই বা কেন? তিনি লেখিকা, মনস্বিনী, শরৎচন্দ্রের আপনজন : তাঁর কাছে তো আমরা চাইব ক্ষিপ্ত বোধ ও তার দ্যুতি। তাঁর কাছে তো আমরা চাইব অন্তর্দৃষ্টি যা ভাবী গবেষকের খোরাক হয়ে উঠতে পারে, যার সূত্র ধরে সে তথ্য খুঁজে বেড়াবে। যাকে তিনি ‘অদৃশ্য তর্জনী’ বলেছেন তার বিশদ ইতিহাস লেখার দায় ভাবী গবেষকের। তাঁর কাছে আমাদের ঋণ ওই ‘অদৃশ্য তর্জনী’ দেখে উঠতে পারার মধ্যেই। শরৎচন্দ্রের যে নতুন পাঠের নির্দেশ তিনি তাতে আমাদের দিলেন সেই পাঠ নির্মাণের দায়িত্ব আমাদের। শরৎচন্দ্র পড়তে গিয়ে কি এখন আমরা কেবল সংবেদনে মগ্ন হই, বাঙালি বহিঃস্পন্দনারীর অবস্থান ও বেদনাও বুঝতে পাই? ‘নারীর মূল্য’ প্রবন্ধে তিনি নারী পুরুষের তীব্র অসাম্যের কথা বলেছিলেন তাঁর উপন্যাসে গল্পে সেই অসাম্যকে কতটা দাঁড়া বাঁধতে দেখি? কতটা সমাজ বা পুরুষশাসিত তাঁর নারীরা আর কতটাই বা আপন ভাগ্য নিয়ন্ত্রণে উদ্দীপিত? এত বিপ্লবের বীজ বয়েও কি তারা শেষ পর্যন্ত রক্ষণশীল, প্রচলিত অনুশাসনের অনুবর্তী? একটা প্রশ্ন রীতিমতো ভাবিয়ে তুলেছিল রাধারাণী দেবীকে, তা শরৎচন্দ্রের বিধবা চরিত্রচিত্রণ। শরৎচন্দ্র বিধবাবিবাহের এত বড়ো সমর্থক — রাধারাণী দেবী বাল্যবিধবা, নরেন্দ্র দেবের সঙ্গে তাঁর বিবাহে এত উৎসাহ শরৎচন্দ্রের, অথচ তাঁর বিধবা চরিত্রেরা বিবাহবিমুখ, কেউ হৃদয়ের জাগরণে ভীত, কেউ জেগে ওঠা হৃদয় নিয়ে পল্লানোন্মুখ। কেন? শরৎচন্দ্রের কাছে কি এর উদ্দেশ্যটাই প্রত্যাশিত ছিল না? জীবনে এক, লেখায় আরেক কেন? এর উত্তরই সেই ‘অদৃশ্য তর্জনী’, যার কথা তাঁর বিশ্রান্ত মানসিক মুহূর্তে শরৎচন্দ্রের কাছ থেকে জানতে পেরেছিলেন রাধারাণী দেবী। শরৎচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্য, মানুষ শরৎচন্দ্র ও শিল্পী শরৎচন্দ্র যে কতটা পরস্পর সম্পৃক্ত তা অন্তত একটি ক্ষেত্রে খুব স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল রাধারাণী দেবীর কাছে। নিরুপমা দেবী শরৎচন্দ্রকে কাতর অনুরোধ জানিয়েছিলেন তিনি যেন বালবিধবাদের নিয়ে না লেখেন। শরৎচন্দ্র বলেছিলেন বালবিধবারা যদি তাঁর আখ্যানে স্বতই উঠে আসে তিনি তাদের পরিহার করতেন না, কিন্তু এমন কিছু করাবেন না তাদের দিয়ে যাতে নিরুপমা দেবী ব্যথিত হন। শরৎচন্দ্র কথা রেখেছিলেন। বড়দিদি বা পল্লীসমাজ তার জাঙ্ঘল্যমান উদাহরণ। কিন্তু তার জন্য যে আপোশ তাঁকে করতে হয়েছিল, লেখক হিসেবে, তার একটা চাপও ছিল। এবং তিনি যে শেষে অস্থির হয়ে উঠছিলেন তার প্রমাণ তো তাঁর শেষদিকের কোনো কোনো লেখায় মেলে। শেষ প্রশ্ন-এর কমল কি ওই তর্জনী অমান্য না করে তৈরি হতে পারত, কিংবা বিধবা নীলিমার মনে প্রৌঢ় আশুবাবুর প্রতি যে অনুরাগ এনেছিল তা? নারীর ভাগ্যনিয়ন্ত্রণের যে-আদর্শ কমল প্রচার করছিল তা তো প্রায় সার্থক হয়ে উঠেছিল নীলিমার ক্ষেত্রে, সে যে নিজেকে আবিষ্কার করে খানিক স্বাধীনতা অর্জন করছিল তা স্পষ্ট। আর এই সময়কার একটি গল্পে তো সতীত্বের পোশাকি ধারণা নিয়ে রীতিমতো ব্যঙ্গ করেছিলেন শরৎচন্দ্র। ‘সতী’ কি আদৌ সেই তর্জনীর তোয়াক্কা করছে?

‘সতী’ পড়তে গিয়ে মনে হতে পারে রাধারাণী দেবীর (তখন দত্ত) একটি প্রবন্ধের সঙ্গে এর আত্মীয়তা আছে। প্রবন্ধটির নাম “সতীত্ব মনুষ্যত্বের সংকোচক না প্রসারক?”, বেরিয়েছিল ভারতবর্ষ-এ, ১৩৩১ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন সংখ্যায়, অর্থাৎ ‘সতী’-র বছর তিনেক আগে। শরৎচন্দ্রের গল্প থেকে এই-ই প্রমাণ হয় যে সতীত্ব মনুষ্যত্বের সংকোচক হয়ে উঠতে পারে।

একশ বছরের এক মহিলার লেখা এই প্রবন্ধ রীতিমতো হইচই ফেলে দেয়। ভারতবর্ষ-এর পরের দুটি সংখ্যায় (চৈত্র ১৩৩১ ও বৈশাখ ১৩৩২) প্রতিবাদ বেরোয়। প্রথম প্রতিবাদের উত্তর দেন রাধারাণী দত্ত ওই বৈশাখ ১৩৩২-এর ভারতবর্ষ-এ; দ্বিতীয় প্রতিবাদের উত্তর তার পরের সংখ্যায়, শিরোনাম “আমার শেষ কথা”। সেইসঙ্গে ভারতবর্ষ জানিয়ে দেয় এ নিয়ে আর কোনো আলোচনা ছাপা হবে না, নইলে হয়তো আরো প্রতিবাদ বেরোত। ওই প্রতিবাদ দুটির সঙ্গে মিলিয়ে যদি ‘সতী’ গল্প পড়া যায় তাহলে বুঝতে অসুবিধে হয় না শরৎচন্দ্রের তিরের অভিমুখ কী। কমলকে দিয়েও তথাকথিত সতীত্বের আদর্শ নিয়ে অনেক কথাই তিনি এই সময়েই বলতে আরম্ভ করেছেন (এবং তা যে বঙ্গ সমাজে পুরোপুরি গ্রাহ্য হয়নি তা শেষ প্রশ্ন-এর বিরূপ সমালোচনা থেকেই স্পষ্ট)। আর অনেক আগেই ‘নারীর মূল্য’ প্রবন্ধে এর অন্তর্গত প্রভুত্বকামিতা ও ধাপ্পাবাজি তিনি বিশদ করে দেখিয়েছিলেন। এবং নারীও যে এই প্রভুত্বকারী ধাপ্পায় ভুলে গিয়ে নিজেকে বঞ্চনা করে চলে তা নিয়ে কোনো সন্দেহ ছিল না তাঁর। অনিলা দেবীর ছদ্মনামে *যমুনা*-তে ছাপা এই ধারাবাহিক রচনায় তা বলতে তিনি কণ্ঠর করেন নি। পরে ত্রিশের দশকে একবার হঠাৎ করে রাধারাণী দেবীকে বলেছিলেন, ‘তোমরা, মেয়েরা, তোমাদের হাত পা মাথার চেয়েও বেশী দাম দাও, অন্য লোকে কে কী বলবে, কে কী ভাববে! সুনাম জিনিসটার জন্যে তোমরা পার না এমন কাজ নেই। এ আমি এমনই অজুতরকম দেখেছি, দেখছি জীবনভর — কিছুতেই এর মূল্যটা কোথায় খুঁজে পাই নি। মানুষ নিজের মনুষ্যত্বকে, নিজের সহজ প্রকৃতিকে, নিজের রক্তমাংসকেও এমন করে অস্বীকার করে একটা বানানো ফানুস হয়ে জীবন কাটিয়ে দিতে পারে — এটা মেয়েমানুষ জাতকে না দেখলে বিশ্বাস করতুম না।’ উদ্ধৃতি *শরৎচন্দ্র : মানুষ এবং শিল্প* থেকে (পৃ. ৫৭) — রাধারাণী দেবীর জবাবিতে শরৎচন্দ্র। পৃ. ৫২-৫৪ ও ৫৭-৫৮-র স্মৃতিনির্ভর কথোপকথন থেকে স্পষ্ট যে দুবার শরৎচন্দ্রকে নিবেদন করে পাঠিয়েছিলেন নিরুপমা দেবী। প্রথমবার এসেছিল এক চিরকুট (‘আপনি এ দেশ ছাড়িয়া অনেক দূরে চলিয়া যান। আর এখানে আসিবেন না। আমাকে এভাবে নষ্ট করিবেন না।’) যার ফলে তিনি তক্ষুনি ভাগলপুর ছেড়ে নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিলেন। দ্বিতীয়বার আরেক চিরকুট, ‘ডাকে কলকাতায়, এক নিরপরাধ চিঠির উত্তরে (‘এখানে যোগাযোগ কখনও আর রাখবেন না। আপনি অনেক দূরে চলে যান। আমাকে নিঃশ্বাস নিয়ে বাঁচতে দিন’)। যার ফল শরৎচন্দ্রের দেশত্যাগ, বর্মা যাত্রা। ‘আমাকে এভাবে নষ্ট করিবেন না’ আর ‘আমাকে নিঃশ্বাস নিয়ে বাঁচতে দিন’ এই কথাগুলি রাধারাণী দেবীর মনে গেঁথে গিয়েছিল, চারদশক পরে উদ্ধার করতে বিন্দুমাত্র বেগ পেতে হয় নি।

আসলে তিনি শরৎচন্দ্র নিয়ে কিছু লিখবেন নাই ঠিক করেছিলেন (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ১৯৭০-এর বক্তৃতার জন্য অনুরোধ করেছিল যা তিনি শেষ পর্যন্ত দেন ১৯৭৫-এ), লিখবেন না কেননা তিনি জানতেন লিখতে গেলেই তাঁকে নিরুপমা দেবীর কথা বলতে হবে, অথচ এমন তো হতেই পারে যে তিনি যাকে শরৎচন্দ্রের সত্য জেনেছেন, সুনাম-দুর্নাম ইত্যাদি ভাবনাগ্ৰস্ত কারোর কারোর কাছে তা কপোলকল্পনা বা অতিকথন মনে হবে। অনুরূপা দেবীর মতো কেউ কেউ মনে করতেই পারেন শরৎচন্দ্রের সঙ্গে নিরুপমা দেবীর নাম উড়ানো অনুচিত। এদিকে তিনি, রাধারাণী দেবী, যা সত্য বলে জানেন তা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে না জানিয়ে কী করে স্বস্তি পান! শরৎচন্দ্রের বড়ো আদরের ছিলেন তিনি, শরৎচন্দ্রও ছিলেন তাঁর বড়ো

আদরের, বড়ো শ্রদ্ধার। তাঁর চারিত্র্য তিনি যেমন বুঝেছিলেন তেমন তো সবাই বোঝেননি। অনেক ঝড়ঝাপটা বয়ে গেছে তাঁর উপর দিয়ে, জীবনকে তিনি ধুলোয় মাটিতে দাঁড়িয়ে জেনেছেন, ধুলো মাটি তাঁর গায়েও কম লাগেনি, কিন্তু কোনো মালিন্য তাঁর চিত্ত স্পর্শ করেনি। এই শরৎচন্দ্রের কথা না বলে কি তিনি ততদিনে মূর্তি হয়ে ওঠা শরৎচন্দ্রের পায়ে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করবেন। স্বামী নরেন্দ্র দেব অবশ্য শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পরে পরেই তাঁর এক সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখেছেন, কিন্তু রাধারাণী দেবীর নিজেরও তো কিছু বলবার আছে। নিরুপমা দেবীকে শরৎচন্দ্র কী চোখে দেখতেন তা তাঁর কাছে অস্পষ্ট ছিল না। তাঁদের দূরত্বাধীর্ণ নৈকট্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ হয়তো তিনি দেননি, কিন্তু মূল কথাটা তুলে ধরেছেন। তাছাড়া এও জানিয়েছেন যে অনেকদিন পর্যন্ত নিরুপমা দেবীই ছিলেন শরৎচন্দ্রের উদ্ভিষ্ট নিবিষ্ট পাঠক, গ্রহণ বর্জনর অধিকারী। হয়তো শেষদিকে তার ব্যত্যয় ঘটেছিল, হয়তো সেই অনেক আগেকার অনুশাসন আর তিনি মেনে উঠতে পারছিলেন না, হয়তো তিরিশের গোড়ার দিকের এই একান্ত স্বীকারোক্তি সেই কারণেই। *চরিত্রহীন*-এর বিধবা সাবিত্রী বা কিরণময়ীকে নিয়ে হয়তো নিরুপমা দেবীর শেষ অবধি তেমন অসুবিধে হয়নি, কিন্তু *শ্রীকান্ত* চতুর্থ পর্বের কমললতা বা অসমাপ্ত *শেষের পরিচয়*-এর সারদা? আর কুলত্যাগিনী সবিতাও কি সহজপাচ্য? কিন্তু নিরুপমা দেবীকে তো মন থেকে দূর করে দিতে পারেন না শরৎচন্দ্র, তাইতো তাঁর হঠাৎ হঠাৎ এমন সংবেদী রাধারাণী দেবীকে দরকার। অন্যদিকে, নিরুপমা দেবীর কাছে শরৎচন্দ্র শেষ পর্যন্ত কী ছিলেন তার আঁচ তো একবার পেয়েছিলেন রাধারাণী দেবী ও নরেন্দ্র দেব যখন তাঁরা সন্ধ্যা ও ভ্রমণসঙ্গী সরোজকুমার চট্টোপাধ্যায় সহ বৃন্দাবন বেড়াতে এসে তখন বৃন্দাবনবাসী বৃদ্ধা নিরুপমা দেবীর সঙ্গে দেখা করেন — হঠাৎ শরৎচন্দ্রের কথা মনে পড়ে তিনি একটুক্ষণের জন্য ভেঙে পড়েছিলেন। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ সেটা, শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর ন বছর পর।

তিনের দশকে যখন শরৎচন্দ্র অশ্বিনী দত্ত রোডের বাসিন্দা, তখন তাঁর অনেক ভাবনার প্রত্যক্ষ সাক্ষী হতে পেরেছিলেন রাধারাণী দেবী ও নরেন্দ্র দেব। *শেষের পরিচয়* শুরু হয়েও শেষ হচ্ছে না, হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের এই সন্মেল অনুযোগের উত্তরে এক সঙ্কেয় তিনি নরেন্দ্র দেব রাধারাণী দেবীর বৈঠকখানায় একটু উত্তেজিত হয়ে *শেষের পরিচয়*-এর মর্মার্থ মেলে ধরেছিলেন। সবিতার কুলত্যাগের কী রহস্য, রমণীবাবুকে তার সত্য প্রয়োজন কতখানি ছিল, কী উপটোক্ত নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল বিমল, এতৎসত্ত্বেও তার স্বামী ব্রজবাবুর কাছে সে কেন ফিরে যাবে ইত্যাদি ঘটনা বিন্যাস তাঁর শ্রোতাদের কাছে তিনি স্পষ্ট করে তুলেছিলেন। নারীর শেষের পরিচয় যে তার মাতৃত্ব, জৈবিক নয় মানবিক মাতৃত্ব, এ বিষয়ে তাঁর বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। এর আগে আরো অনেকের মধ্যে তা প্রকাশ পেয়েছে, রাজলক্ষ্মীতে তো বটেই, এবার তিনি তা আরো প্রত্যক্ষ করে তুলতে চান। সেই সঙ্কেয় তাঁর বয়ানের নিবিষ্টতম শ্রোতা বোধ করি ছিলেন রাধারাণী দেবী, হয়তো সমানুকম্পনে, নিজে নারী বলেও হয়তো। আর সেই কারণেই হরিদাস চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তাঁকে *শেষের পরিচয়* শেষ করে দিতে অনুরোধ করেছিলেন। প্রবল দ্বিধা সত্ত্বেও তিনি যে শেষ পর্যন্ত রাজি হয়েছিলেন তার কারণ হয়তো এইই যে তিনি শরৎচন্দ্রের মনের অনেকটাই দেখতে পেয়েছিলেন। এবং লিখতে বসে তিনি তাইই করেছিলেন, নিজেকে সম্পূর্ণ বিলোপ করে দিয়ে *শেষের পরিচয়*-এর লেখক হয়ে উঠতে চেষ্টা করেছিলেন। ষোড়শ পরিচ্ছেদ থেকে তা আর শরৎচন্দ্রের লেখা

নয় সত্য, — আর শতবার্ষিকী সংস্করণ ও পরবর্তী শরৎ সাহিত্যসমগ্র-তে যে শুধু অসমাপ্ত অংশই ছাপা হয়েছিল তা তো ওই পাঠসংক্রান্ত কারণেই — কিন্তু শেষের পরিচয় তো বটে। ১৯৭৫-এ তিনি তাঁর ১৯৩৮-এর এই দুঃসাহসের কথা স্মরণ করে ঈষৎ রোমাঞ্চিত, কিন্তু ১৯৩৮-এ তাঁর এছাড়া কী করবার ছিল? তিনি যদি রাজলক্ষ্মীকে বুঝে থাকতে পারেন, তাহলে তো তাঁর সবিতাকেও বুঝে উঠতে হবে। কাম ও প্রেম কি নারীর শেষ কথা, তার কি স্নেহ নেই? আর সেই স্নেহই কি একদাঙ্কলিত সার্থক প্রেমিকা সবিতাকে ফিরিয়ে আনতে পারে না অসহায় ব্রজবাবুর কাছে? একে তার উদ্ধার বলবার দরকার নেই, এই তার স্বভাব আর এই তার সত্য আকৃতি। এই কথা ১৯৩৮-এ রাধারাণী দেবীর মতো কজন বুঝে উঠতে পারছিল?

রাধারাণী দেবীর শরৎচন্দ্র তাঁর স্ত্রী হিরণ্ময়ী দেবীকে শাস্ত্র মতে বিয়ে করেন নি। রাধারাণী দেবীর শরৎচন্দ্র তাঁর একদা প্রেমাস্পদা নিবুপমা দেবীর নিষেধ শুনে অনেকদিন অবধি তাঁর তৈরি বিধবাদের বিয়ে দেননি। রাধারাণী দেবীর শরৎচন্দ্র তাঁর সেই প্রেমাস্পদার আর্ত অনুরোধে দ্রুত মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু রাধারাণী দেবীর শরৎচন্দ্র শুধু তাই নয়, তিনি নারী মনের অদ্বিতীয় অনুকম্পায়ী। তাঁর মেয়েদের স্বভাব কোমল, তারা সেবাপরায়ণা, নিয়মপালন বা আত্মবিগ্রহ তাদের পক্ষে মোটেই কঠিন নয়, অথচ তারা কেউ কেউ অনমনীয় চারিত্রিক দৃঢ়তার অধিকারী। সেই বেতস তারা নয় যে হাওয়া বইলেই নুয়ে পড়বে। সুখে তাদের অধিকার না থাকলেও দুঃখে তাদের অধিকার আছে। পুরুষশাসিত সমাজ তাদের মার্কী মেরে দিতে উদ্যত, কেউ বহুবল্লভা, কেউ কুলত্যাগিনী, কেউ পতিতা, কিন্তু সেই মার্কায় তারা হার মানে না। রাধারাণী দেবীর শরৎচন্দ্র তাঁর বিচিত্র জীবনের অভিজ্ঞতায় যে স্বরূপ দেখেছেন নারীর, তা তাঁকে শ্রদ্ধা শিখিয়েছে। তিনি বুঝেছেন মনুষ্যত্বের অধিকার নারী যতটা অর্জন করে পুরুষ ততটা করে না। সমাজ নারীকে খর্ব করে রাখতে চায়, সুনাম-দুর্নামের জালে তাকে বেঁধে রাখতে চায়, যেন 'পাপের' প্রবণতা কেবল নারীরই, পুরুষের নয়। অথচ আছে এমন নারী যে তার কামনা উত্তীর্ণ হয়ে, এমনকী তার প্রেম পেরিয়েও, তার স্নেহের জোরে শুধু পুরুষকে পেছনে ফেলেই যেতে পারে না, মনুষ্যত্বের পরাকাষ্ঠাও হয়ে উঠতে পারে। রাধারাণী দেবীর শরৎচন্দ্রের কাছে মনুষ্যত্বের চেয়ে বড়ো মূল্য আর নেই। এবং যে স্নেহকে, যে হৃদবৃত্তিতে তিনি তাঁর মনঃসমীক্ষণের বিষয় করে তুলেছিলেন তা, বলা বাহুল্য, জৈবিক নয়, মানবিক। সত্যীত্বের বা একনিষ্ঠার আদর্শ নয়, স্নেহের মানবিকতাই এই শরৎচন্দ্রের ধ্যানসামগ্রী। নারীর অবমূল্যায়ন রোধে তিনি যতটা সোচ্চার ছিলেন তাতে তাঁকে আমরা নারীবাদী বলতে পারি, কিন্তু নারীর মধ্যে কেবল স্বাধীনতার অঙ্কুরই তিনি দেখেছেন না, অসহায় পুরুষকে আশ্রয় দানের মানবিকতাও দেখেছেন। সমাজ শাসন করে এসেছে পুরুষ, সেই শক্তিমস্তায় নারীকে নরকের দ্বার বলতেও তার বাধে নি; কিন্তু সমাজ টিকে আছে নারীর স্নেহে, নারীর মনুষ্যত্বে। রাধারাণী দেবীর শরৎচন্দ্রের কাছে এই মানবিক মাতৃত্বের চালিকাশক্তির চেয়ে বড়ো শক্তি সমাজ নেই।

এই শরৎচন্দ্রকে রাধারাণী দেবী অর্জন করেছেন কেবল তাঁর একদা নৈকট্যের স্মৃতিমুদ্রন করে নয়, তাঁর মননের দ্বারাও। স্মৃতি তাঁকে কিছু উপাস্ত জুগিয়েছে, তাকে তিনি পুনঃপুনঃ পাঠের সাহায্যে যাচাই করে নিয়েছেন। কিংবা এও বলা যায় তাঁর পাঠের পথ সুগম করে দিয়েছে সেই স্মৃতি। তাঁর বইতে যে স্মৃতিচারণ তিনি মাঝেমাঝে করেছেন তাতে তিনি শুধু মানুষ শরৎচন্দ্রকেই উপস্থাপিত করেননি কখনও (কখনও কিঞ্চিৎ মূল্যায়নও করেছেন) তার

সঙ্গে শরৎচন্দ্রের শিল্পের যোগও দেখতে চেয়েছেন। এবং চেয়েছেন তাঁর মননের দ্বারা। অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি চারদশক শরৎচন্দ্র নিয়ে লেখেননি, ১৩৫৮-তে যে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন তাও মূলত অনুরূপা দেবীর গল্পের শরৎচন্দ্র বিদূষণের প্রতিবাদ। শেষের পরিচয় যিনি শেষ করেছিলেন, শরৎচন্দ্র এত মন দিয়ে যিনি পড়েছিলেন, শরৎচন্দ্রকে এত ঘনিষ্ঠ যিনি জানতেন, তিনি এতদিন কী করছিলেন, কী ভাবছিলেন শরৎচন্দ্রকে নিয়ে, তাঁর স্মৃতি ও তাঁর পাঠ তাঁর মনে সঞ্চয় করে রেখেছিলেন মাত্র, উল্টেপাল্টে দেখেননি, তাঁর মনন দিয়ে তা পুরোপুরি বুঝে উঠতে চাইছিলেন না? দেখছিলেন, চাইছিলেন। এবং দেখছিলেন আর চাইছিলেন যে তা কখনও কখনও তাঁর আলাপচারিতায় প্রকাশ পেত। তাঁর ন্নেহ যে পেয়েছে, তাঁর কথা যে শুনেছে, সেই কথায় কেউ কেউ হয়তো সাক্ষ্য দিতে পারবে। ঈষৎ অস্পষ্ট হলেও খানিক সাক্ষ্য আমি দিতে পারি। স্পষ্টতর সাক্ষ্য দেবার অধিকার আছে তাঁর কন্যা নবনীতা দেব সেনের। আমার বয়সী আরেকজনের খানিক ছিল। তিনি সুবীর রায়চৌধুরী, এখন স্মৃতি।

৩০ নভেম্বর রাধারাণী দেবীর জন্মদিন। মনে আছে তাঁর ১৯৫৮-র জন্মদিনে বুদ্ধদেব বসু তাঁকে তাঁর সদ্য প্রকাশিত ‘মেঘদূত’ অনুবাদ পাঠিয়েছিলেন। যতদূর মনে পড়ছে লেখা ছিল ‘রাধারাণী দেবীকে আমার পঞ্চাশের নমস্কার’। রাধারাণী দেবীর জন্মশতবর্ষের সূচনাতে তাঁর পঁচানব্বইয়ের নমস্কার জানাতে বুদ্ধদেব বসু আর নেই। এখন এ ভার আমাদের, আমরা যারা যাট পেরিয়ে সমুদ্রে পৌঁচছি বা সদ্য সমুদ্র উত্তীর্ণ হয়েছি। রাধারাণী দেবীর জন্মশতবর্ষে আমরা তাঁকে শ্রদ্ধা জানাব, যারা তাঁর কাছ থেকে এই মনুষ্যত্ববদ্ধ শরৎচন্দ্র আটাশ বছর আগে উপহার পেয়েছিলাম।

হুমায়ুন কবির : প্রসঙ্গ রাজনীতি, ভারতীয়ত্ব এবং বাঙালিত্ব

আবদুর রাউফ

হুমায়ুন কবির সম্প্রতি বিস্মৃত প্রায় ব্যক্তিত্ব। চতুর্ঙ্গ পত্রিকার কল্যাণে তাঁর নামটি এখনও প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে ছাপা হয় বটে, কিন্তু এই পত্রিকা বিদ্বৎ সমাজে যাদের কাছে পৌঁছায় তাঁদের সংখ্যা নিতান্তই মুষ্টিমেয়। ষাটোর্ধ ব্যক্তিদের কেউ কেউ রাজনীতিক হুমায়ুন কবিরকে হয়ত এখনও স্মরণে রেখেছেন। তবে সেই স্মৃতি উৎসাহ ব্যঞ্জক এমন কিছু নয়। কারণ, বিগত শতকের ষাটের দশকের শেষ দিকটায় রাজনীতিতে তাঁর কবুণ পরিণতির কথা ভাবলে তাঁকে বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ হিসাবে আখ্যায়িত করা চলে না। কিন্তু রাজনীতিতে তিনি যে বিশেষ ধরনের আদর্শবাদ এবং মূল্যবোধ মেনে চলার পক্ষপাতী ছিলেন, নীতি-আদর্শ-বিবর্জিত সুবিধেবাদী এবং সুযোগসন্ধানী ছিলেন না — এসব কথা রাজনীতির কারণে যারা তাঁকে স্মরণে রেখেছেন তাঁরা নিশ্চয়ই মানবেন।

কেউ বলেন, রাজনীতি না করলে হুমায়ুন কবির এদেশে মনীষীর মর্যাদা পেতেন। দলীয় রাজনীতিতে যুক্ত থাকার কারণে দলীয় গণ্ডীর সংকীর্ণতার সীমা অতিক্রম করে তাঁর অন্যান্য অসামান্য কৃতির গ্রহণ যোগ্যতা অনেকাংশে ক্ষুণ্ণ হয়েছিল। সেসব কৃতির প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে রাজনীতিক হিসাবে তাঁর অবদানের কথা কিছুটা আলোচনা করা যেতেই পারে।

হুমায়ুন কবির রাজনীতির সঙ্গে না থাকলে ভারতীয় হিসাবে এবং বিশেষ করে বাঙালি হিসাবে আমাদের কতকগুলি ব্যাপারে বঞ্চিত থেকে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। যেমন, মওলানা আবুল কালাম আজাদের ঐতিহাসিক গ্রন্থ India Wins Freedom কি লেখা হত? এই গ্রন্থের ভূমিকায় হুমায়ুন কবির লিখেছেন মওলানা আজাদ নিজের কথা লেখার ব্যাপারে মোটেই উৎসাহী ছিলেন না। এই নিরুৎসাহের একটা কারণ ভগ্নস্বাস্থ্য। যতটুকু শক্তি তাঁর তখনও অবশিষ্ট ছিল তাই দিয়ে তিনি দেশ গড়ার কাজে তার উপর ন্যস্ত দায়িত্বটুকু পালন করতে চেয়েছিলেন। কবির লিখছেন, He finally agreed on my assuring him that I would do my best to relieve him of the actual burden of writing. তারপরের ঘটনা আমরা জানি। রাজনীতির সূত্রে মওলানা আজাদ কবিরকে কাছে না পেলে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের এই অমূল্য ডকুমেন্টটি আদৌ লিখিত হত কিনা সেই সংশয় পোষণ না করে উপায় নেই।

রাজনীতিক হিসাবে হুমায়ুন কবিরের অবদান আরও বিশদ জানার জন্য জন্মশতবর্ষ

উপলক্ষ্যে কবিরকে নিয়ে চতুরঙ্গ-এ যে সংখ্যা বেরিয়েছে সেই সংখ্যার সম্পাদকীয় থেকে কিছু অংশ বাড়তি কিছু সংযোজন সহ এখানে তুলে দেওয়া হচ্ছে। রাজনৈতিক ক্ষমতা করায়ত্ত ছিল বলেই সর্বভারতীয় স্তরে সাড়স্বরে রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষ পালনে উৎসাহ যোগানো তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। তখনকার দিনে এই কাজের জন্য তিনি সরকারি তহবিল থেকে এক কোটি টাকা অনুদানের বন্দোবস্ত করতে পেরেছিলেন। ভারতের প্রত্যেক রাজ্যে রবীন্দ্রসদন প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছিল হুমায়ুন কবিরের রাজনৈতিক ক্ষমতার আনুকূল্য থাকার কারণেই। তিনি রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রে ছিলেন বলেই কেন্দ্রীয় সরকারের মর্যাদাসম্পন্ন জাতীয় সাংস্কৃতিক সংস্থাগুলি সাহিত্য অকাদেমি, সংগীত-নাটক-অকাদেমি এবং ললিতকলা অকাদেমি বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করেছিল। রাজনৈতিক ক্ষমতার সদ্যবহার করতে সক্ষম ছিলেন বলেই হুমায়ুন কবিরের পক্ষে কলকাতার গোলপার্কের রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট, চৌরঙ্গির ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম, পার্ক স্ট্রিটে এশিয়াটিক সোসাইটির নতুন ভবন নির্মাণে সহায়তা প্রদান তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। তিনি সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রী থাকা কালে বাঙালি সাহিত্যিকেরা কীরকম সরকারি আনুকূল্য পেয়েছিল তার স্বীকৃতি পাওয়া যায় বুদ্ধদেব বসুর লেখায়। সেই সময় কেন্দ্রে বাঙালি সাহিত্যিকদের প্রতি হুমায়ুন কবিরের পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ উঠেছিল। গ্রাহ্য না করে কবির বলতেন এতদিন বাঙালি লেখকেরা অবহেলিত ছিলেন তাই সেই সুবাদে তাঁদের একটু বেশি সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। অর্থাৎ তার ব্যক্তিত্ব এমনই ছিল যে প্রাদেশিকতার অভিযোগ তুলে তাঁকে দাবিয়ে দেওয়া সম্ভব ছিল না।

ব্যক্তিত্বের এই দৃঢ়তার কারণেই জগদ্বরলাল নেহেরু মন্ত্রীসভার তৎকালীন অর্থমন্ত্রী টি টি কৃষ্ণমাচারির চূড়ান্ত বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও পরিকল্পনা কমিশনের মিটিংয়ে হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যাল প্রোজেক্ট অনুমোদন করিয়ে নেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। কাজটা মোটেই সহজ হয়নি। তৎকালীন কোনও কোনও বর্ষীয়ান সাংবাদিকের সাক্ষ্য অনুসারে ওই মিটিং-এ কৃষ্ণমাচারির সঙ্গে হাতাহাতি হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। অর্থমন্ত্রী পেট্রোকেমিক্যাল প্রোজেক্ট তৎকালীন মাদ্রাজ স্টেটে নিয়ে যাওয়ার জন্য বন্ধপরিকর ছিলেন। পেট্রোলিয়াম ও রসায়ন মন্ত্রী কবিরের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তিনি সফলকাম হতে পারেন নি।

বর্তমানে বাঙালির অন্যতম গৌরব যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মূলেও তাঁর কিছু অবদান ছিল। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন পত্তনের শুরুরতেই অর্থাৎ ১৯৫০ সালে এই কমিশনের চেয়ারম্যানই নিযুক্ত হয়েছিলেন হুমায়ুন কবির। তারপর হয়েছিলেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পূর্ণ সচিব। এই সময়েই যাদবপুর জাতীয় শিক্ষা পরিষদকে বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা দেওয়ার ব্যাপারে আপত্তি তোলা হয়। আপত্তি তুলেছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের কবিরপরবর্তী চেয়ারম্যান সি ডি দেশমুখ। আপত্তির পিছনে যুক্তি ছিল, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বারো মাইলের মধ্যে আর একটা নতুন বিশ্ববিদ্যালয় প্রবর্তনের কোনও যুক্তি থাকতে পারে না। কিন্তু শিক্ষাদপ্তরের পূর্ণ সচিব হুমায়ুন কবির এবং পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়ের সম্মিলিত প্রয়াসের ফলে এই আপত্তি শেষ পর্যন্ত ধোপে টেকেনি, প্রসঙ্গটি উল্লেখ করে বর্ষীয়ান সাংবাদিক সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত চতুরঙ্গ-এ হুমায়ুন কবির জন্মশতবর্ষ সংখ্যায় লিখেছেন, ‘বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের পত্তনের গোড়া থেকে স্কটিশ

চার্ট কলেজ ও আশুতোষ কলেজের দুজন অধ্যাপক ওই সংগঠনে ডেপুটি সেক্রেটারি নিযুক্ত হয়েছিলেন। এঁদেরকে কবির সাহেবই দিল্লিতে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। এছাড়া কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্টার বিভাগ থেকে তিনজনকে তিনি অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারির মর্যাদা দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনে নিয়োগের ব্যবস্থা করেছিলেন। এর ফলে কেবল কলকাতা ও যাদবপুর নয়, পরবর্তীকালের বর্ধমান উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ও বিভিন্নভাবে উপকৃত হয়েছিল।

এইসব উদাহরণ থেকে বোঝা যায় রাজনীতিক হুমায়ুন কবিরের সাফল্য অকিঞ্চিৎকর নয়। বিশ শতকের যাটের দশকের শেষ দিকটায় পৌঁছে কংগ্রেসের এত বছরের একছত্রাধিপত্য নস্যাৎ করার রূপকারদের মধ্যেও তিনিই অগ্রগণ্য। ১৯৬৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে যে যুক্তফ্রন্ট সরকার হয় তার মূল উদ্যোক্তা ছিলেন হুমায়ুন কবির। যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠনের পর কবির কিছুকালের জন্য ইউরোপ যান। বর্ষীয়ান সাংবাদিক বরুণ সেনগুপ্ত তাঁর *পালা বদলের পালা* বইটিতে লিখেছেন ইউরোপ যাওয়ার প্রাক্কালে বঙ্কু বাস্কবদের তিনি বলেন, ‘আজ বাংলাদেশে যা করে দিয়ে গেলাম ভবিষ্যতে ভারতেও তাই হবে। এই শুরু হল যুক্তফ্রন্ট রাজনীতির যুগ, সমগ্র ভারতবর্ষ এই রাজনীতিকে অনুসরণ করবে।’ (পৃ. ১৫) কবিরের ভবিষ্যৎবাণী যে শতকরা একশো ভাগ সত্যি হয়েছে এ নিয়ে কোনও সংশয় থাকতে পারে না। কিন্তু ম্যাক্রো লেভেলে তাঁর রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি যতই স্বচ্ছ হোক মাইক্রোলেভেলে সেই স্বচ্ছতা তিনি অর্জন করতে পারেন নি। আপন রাজ্যের ভোটদাতাদের চাহিদা অনুধাবন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। সেই কারণেই একেবারে শেষ পর্যায়ে তাঁর রাজনৈতিক জীবন শোচনীয় ভাবে ব্যর্থ। হুমায়ুন কবিরের রাজনৈতিক জীবনের সাফল্য কিংবা ব্যর্থতা নিয়ে এইসব আলোচনার পরেও একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা না বলা থেকে যায়। সেটা হচ্ছে দেশভাগের পরেও নিজের জন্মস্থান তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও তাঁর ভারতে থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত সিদ্ধান্তই। ব্যক্তিগত হলেও এটাও তাঁর জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত।

এই সিদ্ধান্ত থেকেই চিন্তাবিদ হুমায়ুন কবিরকে চিনে নেওয়ার প্রয়াস শুরু করা যায়। মননশীলতা কিংবা সুশৃঙ্খল চিন্তনের অভ্যাস কবিরের মধ্যে গড়ে উঠেছিল তাঁর ছাত্রাবস্থা থেকেই। তিনি মেধাবী ছাত্র ছিলেন। কলেজে কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হওয়াটা তাঁর অনায়াস অধিকারের মধ্যে গণ্য ছিল। অনায়াস বলছি এই কারণে যে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হওয়ার জন্য তাঁকে কেউ কখনও বই মুখে নিয়ে বসে থাকতে দেখেনি। প্রেসিডেন্সি বলে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কোথাও প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হওয়ার সাধনায় লিপ্ত থাকার কারণে এক্সট্রা কারিকুলাম কর্মকাণ্ডে কখনও তাঁর উৎসাহের অভাব লক্ষ করা যায় নি। এতেই বোঝা যায় তিনি কখনই মুখস্থ বিদ্যার উপর নির্ভরশীল ছিলেন না। যা শিখতেন তার সবটাই আত্মই করে নেওয়ার প্রক্রিয়া তাঁর জানা ছিল। তাই তাঁর মনন প্রক্রিয়ায় চিন্তার মৌলিকত্ব বিকাশে খুব বেশি বিলম্ব হয়নি, মৌলিকত্বের কারণেই চোখ ধাঁধানো পাশ্চাত্য কোনো বিজ্ঞানের জৌলুস তাঁকে কখনও কক্ষুচ্যুত করতে পারেনি। আদ্যন্ত তিনি থাকতে পেরেছিলেন ভারতীয়। যে ভারতীয়ত্বের মধ্যে তাঁর মুসলমানত্ব এবং বাঙালিত্বও কখনও ক্ষুণ্ণ হয়নি। ভারতীয়ত্ব এবং বাঙালিত্বের প্রতি গভীর প্রত্যয় ছিল বলেই ‘ধর্মের

ভিত্তিতেই মুসলমানরা পৃথক জাতি' — এরকম একটি অবৈজ্ঞানিক ভাবনা তাঁকে কখনও বিপথগামী করতে পারে নি। যদিও এই ভাবনার তখন প্রবল জোয়ার বইছিল বিশেষ করে মুসলিম এলিটদের মনোজগতে। এমনকি মার্কসবাদে আস্থাশীল অনেকেই তখন এ ধরনের ভাবনাকে ভ্রান্ত ঘোষণা করতে দ্বিধাশ্রিত হয়েছিলেন। হুমায়ুন কবিরের মনে কিন্তু এ ধরনের দ্বিধা এক মুহূর্তের জন্যও প্রশ্রয় পায় নি।

তাই যে ভারতীয়ত্ব কিংবা বাঙালিত্বের প্রতি গভীর আস্থার কারণে কবির তাঁর জন্মস্থান পাকিস্তানের নাগরিকত্ব দেওয়ার কথা ভাবতে পারেন নি কবির মানসে সেই আস্থার স্বরূপ সন্ধান জরুরি। এই সন্ধান প্রয়াসে তাঁর *The Indian Heritage* এবং *বাঙলার কাব্য* বই দুটি অত্যন্ত সহায়ক। ভারতীয়ত্ব সম্পর্কে তাঁর ধারণা অভিব্যক্তি পেয়েছে প্রথমোক্ত গ্রন্থটিতে। বইখানির ভূমিকায় তিনি লিখেছেন রাজ রাজড়াদের কাহিনির (The story of the conflict of a few political personalities) তুলনায় ভারতীয় জনগণের সত্য এবং বিস্তারিত কাহিনি (true comprehensive history of the Indian people) লিখিত হওয়া অত্যন্ত জরুরি। তাঁর ধারণা এই ইতিহাস লিখিত হলে ভারতের ঐক্য ও সংহতির উৎস যে সমন্বয় বা synthesis একথাই আমাদের বোধগম্য হবে সহজেই। আসলে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ভারততীর্থ' কবিতাটিতে যে সমন্বয়ের বার্তা ঘোষণা করেছেন হুমায়ুন কবিরের *Indian Heritage* গ্রন্থের অনুসন্ধানের বিষয় ছিল সেটাই। যে কারণে এই গ্রন্থটির প্রথম পরিচ্ছেদের নাম Ariyan Synthesis। এই Synthesis যে রাজ্যবর্গের কাহিনি বর্ণনা দ্বারা অভিব্যক্তি পায় না, তারজন্য সে জনগণের আর্থ রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বৃপান্তরের ইতিহাস সন্ধানের প্রয়োজন পড়ে সে কথা সহজেই অনুমেয়। আর্থ অভিযানকারীরা যে এদেশে এসে কেবল ধ্বংস করেনি বহু কিছু গ্রহণও করেছিল সেই প্রসঙ্গে উল্লেখ করে কবির লিখেছেন, 'It was the peculiar glove at the Aryian invaders who came to this land that they could formulate a philosophical expression for this acceptance' উল্লিখিত গ্রহণ করার প্রক্রিয়ায় এই দার্শনিক প্রত্যয় গড়ে ওঠার ফল যা হয়েছিল সে সম্পর্কে কবিরের প্রকাশভঙ্গি সুন্দর; তিনি লিখেছেন '...in spite of the most baffling differences in form, there is unity, continuity and strangest of all an unanimity in Indian thought which astonishes not only foreign observers but Indian students as well.'

Synthesis বা সমন্বয় শুধু প্রাচীন ভারতেই ঘটেনি, সেটা বেশি করে ঘটেছে মধ্যযুগে। যদিও সমন্বয়ের তুলনায় এক্ষেত্রে সমজোতাটাই হয়েছে বেশি। *Indian Heritage* গ্রন্থে কবির তাই এই অধ্যায়টির অনুকরণ করেছেন Mediaval Reconciliation। এই Reconciliation বা সমঝোতার স্বরূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন, 'When two powerful currents meet, there is no question of the absorption of the one in the other. The streams join to create a new form. Their separate contributions can hardly be distinguished.' স্পষ্টতই currents বলতে এখানে হিন্দু এবং ইসলামি ভাবধারার কথা বলা হয়েছে। দুটো প্রবল ধারা ভারতীয় সমাজ সংস্কৃতিতে

কখনই পরস্পরকে আত্মসাৎ করে ফেলতে পারে নি। ফলে যা অবশ্যজ্ঞাবী ঘটেছে। স্থাপত্য, ভাস্কর্য, সাহিত্য, সংগীত, নৃত্যকলা, শিল্পকলা এমনকী ধর্মও নতুন কর্ম বা আঙ্গিকের উদ্ভব ঘটেছে। মধ্যযুগীয় সমঝোতার এটাই পরিণতি এবং এটাও আমাদের ভারতীয় ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার। এই উত্তরাধিকারের যথাযথ স্বীকৃতির অভাব ঘটেছে বলেই হিন্দু মুসলমানের মধ্যে এত ভুল বোঝাবুঝি।

প্রসঙ্গটি *বাংলার কাব্য* গ্রন্থের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে হুমায়ুন কবির অন্য প্রসঙ্গে খুব প্রাঞ্জল ভাবে উল্লেখ করেছেন। লিখেছেন, 'হিন্দুদের মধ্যে অনেকেরই বিশ্বাস যে ভারতবর্ষে সভ্যতার যেটুকু বিকাশ, হিন্দু যুগেই তার শুরু এবং সারা — ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার অর্থই তাই হিন্দু সংস্কৃতি ও সভ্যতা। অন্যপক্ষে মুসলমানেরও মনে সন্দেহ এবং অবিশ্বাস, কারণ ভারতবর্ষের ইতিহাসের সাত আটশো বৎসরে সভ্যতার বিকাশ কতটুকু? অনেক মুসলমানেরই তাই বিশ্বাস যে ভারতীয় অর্থই হিন্দুধর্মগন্ধী, সুতরাং মুসলমানের অস্পৃশ্য ভারতীয় সংস্কৃতির বিকাশে হিন্দু মুসলমানের সম্মিলিত সাধনার কথা ইতিহাসে ধরা পড়ে নাই বলেই মুসলমানের প্রতি হিন্দুর অবজ্ঞা এবং হিন্দুর প্রতি মুসলমানের অবিশ্বাস।' (*বাংলার কাব্য* পৃ. ৯) হুমায়ুন কবির প্রশ্ন তুলেছেন, 'বর্তমানেও ভারতবর্ষে সংস্কৃতির পুনর্গঠনের যে প্রবল প্রচেষ্টা, বহিরাগত ইউরোপীয় সভ্যতার সংঘাতই যে তার জন্য অনেকখানি দায়ী, সে কথা কি অস্বীকার করা যায়? পৃথিবীর সর্বত্রই সভ্যতার সংঘর্ষ ও সমন্বয়ে নতুন ও সমৃদ্ধতর সভ্যতার উদ্ভব দেখা দেয়। একমাত্র ভারতবর্ষে মধ্যযুগে তার ব্যতিক্রম হয়েছে, একথা মনে করবারই বা কারণ কি?' (*বাংলার কাব্য* পৃ. ৯)।

বস্তুত ব্যতিক্রম যে ঘটেনি বাংলাদেশে বৈষ্ণব ধর্ম, তার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। হুমায়ুন কবির ঐর *বাংলার কাব্য* গ্রন্থের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে লিখেছেন, 'বৈষ্ণব ভক্তিমার্গের প্রসার সমগ্র ভারতবর্ষেই হয়েছিল, দক্ষিণ ভারতেই তার প্রথম বিকাশ, অথচ সুদূর বাংলাদেশে এসেই তার প্রকাশ বিস্ময়ে ও বেদনায় যে রূপ নিল বিশ্বমানবের সাহিত্যের ইতিহাসে তার তুলনা বেশি নেই, কালের বিচারেও ভারতের সুদীর্ঘ ইতিহাসের প্রবাহে এতদিন পরে মধ্যযুগে কেন এ তরঙ্গ জেগে উঠল?' (পৃ. ৯) এই প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন তিনি মধ্যযুগে ইসলামের প্রভাবকে এর মুখ্য কারণ হিসাবে চিহ্নিত করে। লিখেছেন, 'সে যুগে ইসলামের প্রচণ্ড ও বিপ্লবাত্মক ক্রিয়ার ফলেই বোধ হয় এ রূপান্তর এত সহজ ও ব্যাপক হয়েছিল।' প্রসঙ্গক্রমে হিন্দু ধর্মের প্রবল প্রভাবশালী মায়াবাদের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তিনি নিজে লিখেছেন, 'জন্মান্তরবাদ যে এদেশে এত সহজে গৃহীত তারও কারণ মায়াবাদ। জন্মান্তরবাদের ফলে একদিক থেকে প্রকৃতির প্রগতিক অস্বীকার করা হয়, সর্বজীবের সাম্য বোধে অন্যদিক দিয়ে ব্যবহারিক জীবনের অপ্রিয় তথ্যগুলিকে মায়ী বলে লঘু করা সহজ হয়ে ওঠে। যেখানে তবুলতা পিপীলিকা, জীবজন্তু মানুষ সকলেরই সন্তাগত মূল্য এক, সেখানে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশ হবে কীভাবে? অন্যপক্ষে ইসলাম প্রবলভাবে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করেছে, বলেছে সৃষ্টির সমস্ত প্রদেশেই তার প্রভুত্ব অনস্বীকার্য বৈষ্ণব কবির কণ্ঠে তার প্রতিধ্বনি বেজেছে। বৌদ্ধ বিপ্লবের প্রচণ্ড আলোড়নের ব্যক্তির সত্তা এবং মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব এত প্রবল ভাবে ঘোষিত হয় নি।' (*বাংলার কাব্য* পৃ. ১৫, ১৬)। কবিরের *Indian Heritage* গ্রন্থে *Medival Reconciliation*-এর পরিচ্ছদটির

প্রতিপাদ্য বিষয় এটাই। বাংলা ভাষায় উদ্ধৃতি দেওয়ার সুবিধার জন্য এক্ষেত্রে *বাংলার কাব্য* গ্রন্থটির সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

তা না হলে *বাংলার কাব্য* আসলে তাঁর বাঙালি ভাবনার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। অবশ্য কবিরের ভারত ভাবনা এবং বাঙালিত্ব ভাবনা এই গ্রন্থটির মধ্যে মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে। ১৯৭৩ সালে শওকত ওসমান লিখেছিলেন, “‘বাংলার কাব্য’— এই একটি মাত্র পুস্তক বাংলা সাহিত্যে হুমায়ুন কবিরের অমরত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য যথেষ্ট ছিল।” (*সমুদ্র নদী সমর্পিত*, ঢাকা, পৃ. ৭১) পুস্তকটিতে সামাজিক মানসের প্রকাশ হিসাবে বাংলা কাব্যের ইতিহাস রচনার প্রয়াস হয়েছে। এই প্রয়াসে সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতই শুধু নয় ভৌগোলিক ঐতিহাসিক এবং নৃতাত্ত্বিক তথ্যও ভিত্তি হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। তাছাড়া ধর্ম বিপ্লবের প্রসঙ্গ তো আছেই। হুমায়ুন কবির মনে করেন ধর্ম বিপ্লবের মধ্যেই বাংলার কাব্যরূপ নতুনতর উপাদান পেয়েছে। বাংলায় বৌদ্ধধর্মের আগমনকে তিনি মনে করেন ধর্ম বিপ্লব। এই বিপ্লবের মূলে রয়েছে সামাজিক প্রতিক্রিয়া — আর্যের বিরুদ্ধে অনার্যের, ব্রাহ্মণ্যের বিরুদ্ধে সমাজের ব্রাহ্মণ্যের অংশের প্রতিক্রিয়া। যে প্রতিক্রিয়ার ফসল সংস্কৃত সাহিত্যের অভিজাত্যের বিরুদ্ধে দেশজ ভাষায় কাব্যসৃষ্টি। বৌদ্ধ দোহা যার নিদর্শন। যাতে দেখা গেল অভিজাতদের বদলে সাধারণ মানুষের উপস্থিতি এবং কাব্যচর্চায় বিষয় ও ভঙ্গির নতুন মাত্রার মহিমাষিত সংযোজন। বৈষ্ণব বিপ্লবের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। হুমায়ুন কবিরের মতে বৈষ্ণব কাব্যের মানবীয়তার পিছনে মুসলিম সংস্কৃতির অবদান অনস্বীকার্য।

কবির মনে করেন, মধ্যযুগে বাঙালি হিন্দুর মানস পরিচয় লাভে কোনও কোনও মুসলমান রাজার আগ্রহ লক্ষ করা গিয়েছিল। অপরদিকে বাঙালি হিন্দু চেষ্টা করেছিল মুসলিম সংস্কৃতির বর্ধিস্থ আধিপত্য থেকে আত্মরক্ষা। ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক সাহিত্যসৃষ্টির জোয়ার আত্মরক্ষার এই প্রয়াসের ফল। কিন্তু আত্মরক্ষা করতে গিয়ে পরোক্ষে মুসলিম প্রভাবকে যে মান্যতা দেওয়া হয়েছিল মধ্যযুগের সাহিত্যে ধর্মতত্ত্বের বিবর্তনই তার নিদর্শন। হিন্দুর ধর্মতত্ত্ব বিবর্তিত হয়েছিল আধুনিক যুগে এসেও। এক্ষেত্রেও ছিল আত্মরক্ষার তাগিদ। *বাংলার কাব্যে*—এ হুমায়ুন কবির লিখেছেন, ‘রামমোহন প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতীয় সংস্কৃতি এবং ইউরোপের সংস্কৃতির সমন্বয়ে নতুন জীবন দর্শন গড়তে প্রয়াসী হয়েছিলেন।’ (পৃ. ৩৬) এই জীবনদর্শন আধুনিক বাঙালি হিন্দু মধ্যবিস্তৃত মানসিকতাকে প্রভাবিত করেছিল প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে। প্রত্যক্ষভাবে যারা এই প্রভাবকে স্বীকার করেছিলেন তাঁরা তো নিজেদের মধ্যে এমন এক ধর্মীয় সম্প্রদায় গড়েছিলেন যার সাযুজ্য ছিল খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের সঙ্গে বেশি। হয়ত এই কারণে আত্মসচেতন বাঙালি হিন্দু মধ্যবিস্তৃতদের বৃহদংশের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম তেমন জনপ্রিয় হয়নি। কিন্তু রামমোহনের ধ্যান ধারণার পরোক্ষ প্রভাব হয়েছিল সুদূর প্রসারী।

রামমোহন ধর্মীয় ভাবনার মধ্যে যে সমন্বয়ী ভাবধারা এনেছিলেন, যে ভাবধারার মধ্যে প্রাচীন ভারত, মধ্যযুগের ইসলাম প্রভাবিত ভারত এবং আধুনিক কালের ইউরোপ থেকে আমদানি খ্রিস্টান ভাবধারার সমন্বয় ছিল তা নিঃসংশয়ে হিন্দুধর্মের নব ভাষ্যকারদের প্রভাবিত করেছিল পরোক্ষভাবে। যার ফলে ধর্মীয় পুনর্জাগরণের লক্ষ্যকে সামনে রেখে হিন্দুধর্মের নব অবয়ব নির্মিত হয়েছিল। তাছাড়া রামমোহনের যুক্তিবাদী ধ্যান ধারণার প্রভাব বাঙালি হিন্দু মধ্যবিস্তৃতদের

একটা ক্ষুদ্র অংশের মধ্যে পাশ্চাত্যের সেকুলার চিন্তার প্রভাবেরও (যে চিন্তার মধ্যে অতিলৌকিক সত্তার স্বীকৃতি ছিল না) উন্মেষ ঘটতে সক্ষম হয়েছিল। এই সেকুলার চিন্তাও অন্তত পার্শ্বিক ক্ষেত্রে রামমোহনের সমন্বয়ী ভাবনাকে স্বীকৃতি দিয়েই এদেশের উপযোগী কলেবর ধারণ করেছিল। এই চিন্তার প্রকৃষ্ট বাহক হিসাবে হুমায়ূন কবির চিহ্নিত করেছিলেন মাইকেল মধুসূদন দত্তকে। তিনি *বাংলার কাব্য* পুস্তকটিতে লিখেছেন, 'মাইকেল মধুসূদন বাংলা কাব্যে যে নতুন রীতির প্রবর্তন করলেন, তার সবচেয়ে লক্ষণীয় গুণ বিদ্রোহ ও গতিবেগ। পুরোনো বিশ্বাস ও প্রচারকে গ্রহণ করার মুহূর্তেও তাদের রূপ বদলে গেল — নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে নতুন আদর্শ জন্মগ্রহণ করল।... ভারতীয় হিন্দু মানসের আদর্শ রাম এবং তাঁর মিত্র ও সহায়ক বিতীষণ মাইকেলের দৃষ্টিতে পরদেশ-আক্রমণকারী এবং তাঁর স্বদেশদ্রোহী সহকারী। অত্যাচারী রাবণ দেশপ্রাণ নরপতি। এ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন যে কি বিপ্লবকারী, আজ বাঙালির পক্ষে তা উপলব্ধি করাও কঠিন, কারণ মাইকেলের বিদ্রোহ তার মানসসত্তার অন্তর্ভুক্ত। অন্য যে কোনও প্রদেশের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে তুলনা করলেই এ পরিবর্তনের পরিমাণ ধরা পড়ে।' (পৃ. ৩৭) চিন্তা করার প্রক্রিয়া অনেকাংশে সেকুলার না হয়ে উঠলে আবহমানকালের স্বতঃসিদ্ধ ধারণাগুলিকে এভাবে চ্যালেঞ্জও করা সম্ভব হত না। মাইকেল মধুসূদন দত্তের সেকুলার হয়ে ওঠাটাই এক্ষেত্রে মূল বিচার্য নয়। সমসাময়িক শিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্ত মানসিকতায় এ ধরনের সেকুলার চিন্তার যে গ্রহণযোগ্যতা তৈরি হয়েছিল তা কেমন করে তৈরি হল সেটাও ভেবে দেখার মতো একটি বিষয়। হুমায়ূন কবির উল্লিখিত গ্রন্থে লিখেছেন, 'মাইকেলের' মানস ইতিহাস গত দেড়শ বছরে হিন্দু বাঙালির সমাজ সত্তারও ইতিহাস। (পৃ. ৩১) এই 'সমাজ সত্তার ইতিহাসে' রামমোহন রায় নিঃসন্দেহে সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব।

মাইকেল পরবর্তী অধ্যায়ে হিন্দু বাঙালির সমাজসত্তার ইতিহাসের সামগ্রিক পরিচয় পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস অনুধাবন করলে। হুমায়ূন কবির উল্লিখিত গ্রন্থে লিখেছেন, 'প্রাক-বক্ষিম যুগের মধ্যবিত্ত মানস বাংলাদেশে ইউরোপের সংস্কৃতির সংস্থাপনার স্বপ্ন দেখেছিল। মাইকেলের কাব্যসাধনা সে প্রয়াসের ব্যর্থতার পরিমাপক। যে ব্যর্থতার প্রতিক্রিয়ায় কেউ কেউ ইউরোপকে একান্তভাবে বর্জন করার স্বপ্নও দেখেছেন। বক্ষিমী যুগের হিন্দু মানসের স্বপ্ন ছিল প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন। সে স্বপ্ন কোনোদিন রবীন্দ্রনাথকে টানেনি। তার পরিবর্তে তিনি দেখেছেন ভারতবর্ষে নতুন জাতীয়তার স্বপ্ন, যে স্বপ্ন একদিন আকবরের মনেও জেগেছিল। আকবরের স্বপ্নের রাষ্ট্রিক ভিত্তি স্পষ্ট এবং তার ব্যক্তিগত আবেদনও প্রকাশ। ঘটনার সংস্থানে রবীন্দ্রনাথের পক্ষে তা সম্ভব ছিল না, কিন্তু তাঁর সর্বভারতীয় আত্মনাভুতির মধ্যেও বোধ হয় পারিবারিক ও সামাজিক শক্তির ক্রীয়া লক্ষ করা যায়। পারিবারিক অথবা সামাজিক কোনো বিপর্যয়ের ফলে ঠাকুরগোষ্ঠী হিন্দুসমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়েও সমাজের সঙ্গে শিথিল সম্বন্ধ তা জ্ঞানাবার আমাদের উপায় নাই, কিন্তু কারণ যাই হোক না কেন, এই শ্লথ সম্বন্ধের ফলে ব্যক্তি ও সমাজজীবনের রবীন্দ্রনাথের লাভ বই লোকসান হয় নি। তাই রবীন্দ্রনাথ কেবল প্রাচীন ভারতীয় হিন্দু সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী নন, মোগল আমলের ভারতবর্ষে ভারতীয় ও সারাসেনিক সভ্যতার সংঘর্ষ ও সমন্বয়ে যে অপরূপ সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল, তাকেও তিনি অন্তরে গ্রহণ করতে পেরেছিলেন। সংস্কৃতির এ যুগ্ম ধারায় ইংরেজ

আমলের গোড়ায় মিলল ইউরোপীয় সভ্যতার আবেদন। রবীন্দ্রনাথের জীবনের এ তিন খারার ত্রিবেণী সঙ্গম যে তাঁর বিশ্বজয়ী প্রতিভার বিকাশে সাহায্য করেছে এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই।’ (পৃ. ৪৪) হুমায়ুন কবিরের ভারতীয়ত্বের ভাবনা এবং উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বিশ শতকের প্রথমার্ধ অবধি নব বাঙালিত্বের স্বরূপ সন্ধান এভাবেই পরিণতি লাভ করেছে রবীন্দ্রমানস ইতিহাস পরিক্রমায়। পরিক্রমা নব বাঙালিত্বের প্রতিভূ হিন্দুমধ্যবিস্ত্র শ্রেণির পরাজয়ের কথাও বলেছেন হুমায়ুন কবির। লিখেছেন, ‘মোগল সাম্রাজ্যের পতনের পরে যে রাষ্ট্রিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিপ্লব তার হয়েছিল, তার স্বাভাবিক পরিণতি ধনতন্ত্র ও স্বাভাবিক পরিণতি রাষ্ট্রিক স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা। ভারতের জাতীয় জীবনে স্বাভাবিক নিয়মে এই পরিণতি ঘটে নাই। পলাশীর যুদ্ধের অল্পদিন পরেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, ভারতীয় শিল্প বাণিজ্যের অবদমন ও ভাষা বিপ্লবের মধ্যে এ সুদূর প্রসারী বিপ্লবের সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে গেল। তবু যে সামাজিক বিপ্লব ঘটেছিল, তার ফলে হিন্দু মধ্যবিস্ত্রশ্রেণির সম্প্রসারণ বিঘ্নয়কর গতিতে শুরু হল, কিন্তু এ সম্প্রসারণের মধ্যেই পরাজয়ের বীজ নিহিত ছিল। জমিদারি এবং চাকুরির প্রতি অতিরিক্ত মোহে বর্ধনশীল সমাজে এল স্থিতিশীলতা তার ফলে জীবন চাঞ্চল্যের মধ্যেও স্থিতিশীল হিন্দু মধ্যবিস্ত্র শ্রেণির ভাগ্য বিজয়্যের পূর্বচ্ছায়া দেখা দিল। সকলের চোখে তা ধরা পড়েনি, কিন্তু সমাজসত্তার গভীর অবচেতনার পূর্ণ পরিণতির দিনেও সেদিন যে অব্যক্ত অতৃপ্তি, সমাজসত্তার শ্রেষ্ঠ প্রতীক রবীন্দ্রনাথের কাব্য যে সেই অতৃপ্তির সুরে মুখর হয়ে উঠবে, তাতে আশ্চর্য হবার কারণ নাই।’ (বাংলার কাব্য পৃ. ৪৭) রবীন্দ্র মানস পর্যালোচনার প্রভাবেই নব বাঙালিত্বের আপাত উদ্দীপনার অন্তরালে অন্তর্নিহিত গভীর সঙ্কটের স্বরূপকেও চিহ্নিত করতে পেরেছিলেন হুমায়ুন কবির।

পরিশেষে উল্লেখ করতে হয়, হুমায়ুন কবিরের সাহিত্য আলোচনা দর্শন ভাবনা, মুসলিম সমাজ সংস্কৃতি পর্যালোচনা, শিক্ষা ভাবনা ইত্যাদিও অনুরূপভাবেই আপাত বাস্তবতার আড়ালে প্রতিপাদ্য বিষয়ের গভীর স্বরূপ উদ্ঘাটনে বিশেষভাবে যত্নশীল ছিল। তাছাড়া অনুবাদক এবং বিশেষভাবে সম্পাদক হিসাবে হুমায়ুন কবিরের সুদক্ষ ভূমিকার মূল্যায়ন না করলে নিজেদেরই বঞ্চিত করা হয়। এসব ক্ষেত্রে হুমায়ুন কবিরের অবদান সম্প্রতি তাঁর জন্মশতবর্ষ উদযাপন প্রাক্কালে বিশেষভাবে মনযোগের দাবি রাখে। প্রসঙ্গক্রমে একথাও না বললেই নয়, কবি এবং ঔপন্যাসিক হুমায়ুন কবিরের অবদান ও উপেক্ষিত হলে বাংলা সাহিত্যের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসের প্রতি অবিচার করা হবে।

বাংলা ভাষার আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চা

শ্যামলী সুর

বাংলা ভাষায় আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চার ইতিহাস বয়সে নিতান্ত নবীন। এই বিষয়টি সামগ্রিকভাবে বাংলার ইতিহাসচর্চার ইতিহাসের এক খণ্ডাংশ হিসেবেই পরিচিত।^১ আঞ্চলিক সম্ভার কেন্দ্র কি মূলত ভৌগোলিক, না আর্থ-সামাজিক, জাতিগত না সাংস্কৃতিক? আদিতে অঞ্চলের ধারণা দানা বাঁধে প্রশাসনিক একককে কেন্দ্র করে। ইংরেজ শাসনাধীন বাংলায় বিভিন্ন প্রশাসনিক বিভাগ বা জেলার ভৌগোলিক বৃত্তকে কেন্দ্র করেই আঞ্চলিকতার প্রথম বোধ জাগ্রত হয়। আবার, এই প্রশাসনিক বিভাগের স্বরূপও এক এবং অপরিবর্তনীয় থাকে নি। কখনও প্রশাসনিক সুবিধার অঙ্গুহাতে, কখনও উপনিবেশিক শাসকের রাজনৈতিক স্বার্থে পরিবর্তন ঘটেছে জেলার আকৃতি, এমন কি প্রকৃতিতে। এই প্রশাসনিক বিভাগে নতুন নতুন জনগোষ্ঠী যুক্ত হয়েছে। পুরাতন জনগোষ্ঠীর সঙ্গে নতুন জনগোষ্ঠীর সংযোগ সৃষ্টি করেছে জাতিগত, সংস্কৃতিগত বা শ্রেণিবৈষম্যগত সংঘাত। এই বহুমাত্রিক সংঘাতের চাপে আঞ্চলিকতার ইতিহাসেরও রূপান্তর ঘটেছে। শুধু প্রশাসনিক পরিবর্তনই নয়, আর্থ-সামাজিক এককের গণ্ডি ভেঙে গড়ে উঠেছে বৃহত্তর আঞ্চলিক সম্ভার বোধ। এই আঞ্চলিক সম্ভা কখনও সামগ্রিক জাতীয় চেতনার খণ্ডাংশ আবার কখনও জাতীয় চেতনার বিরোধী।

ইতিহাস রচনার সঙ্গে ক্ষমতা বিস্তারের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক আজ সর্বজন স্বীকৃত। রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ বিস্তারের স্বার্থে প্রথমে কোম্পানি পরে ইংরেজ সরকার বিধিবদ্ধভাবে আঞ্চলিক তথ্য সংগ্রহ করতে আরম্ভ করে। আঞ্চলিক ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে বাঙালি লেখক ও গবেষকগণ ইংরেজ লেখকের লেখা গেজেটিয়ার বা জেলা বিবরণীকে অনুকরণ করতে আরম্ভ করেন। ১৮৬১ সালে প্রকাশিত কালীকমল সার্বভৌমের লেখা *বগুড়া বৃত্তান্ত* ও ১৮৬৪ সালে প্রকাশিত শ্যামাধন মুখোপাধ্যায়ের লেখা *মুর্শিদাবাদের ইতিহাস* আঞ্চলিক ইতিহাস রচনার প্রথম পদক্ষেপ বলা যেতে পারে। তবে, এর আগেও বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় আঞ্চলিক ইতিহাস সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশিত হয়েছিল।

১

জাতীয়তাবাদী প্রতর্কের প্রথম ঘোষণা বিদেশি শাসকের লেখা ইতিহাস খণ্ডন করে নিজেদের ইতিহাস নিজেদেরই লিখতে হবে। *বঙ্গদর্শনে*-এ প্রকাশিত ইতিহাস বিষয়ক প্রবন্ধগুলিতে স্বরচিত ইতিহাসের অভাব নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের ক্ষোভ নিঃসন্দেহে তাঁর জাতীয়তাবাদেরই

প্রকাশ।^২ মূল আহানে উহ্য ছিল আঞ্চলিক ইতিহাস অনুসন্ধানও। আঞ্চলিক ইতিহাস অনুসন্ধান ছিল জাতীয় ইতিহাস অনুসন্ধানের একটি শাখা প্রকল্প। ১৮৮০ সালে *বঙ্গদর্শন* পত্রিকায় ‘বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা’ প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলার আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যের ঐতিহ্য উল্লেখ করে বলেছেন, “হিন্দু রাজগণের অধিকার সময় হইতে ওয়ারেন হেস্টিংসের সময় পর্যন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিন্দু রাজগণ বাংলাদেশ অধিকার করিত; যেমন বিষ্ণুপুরের রাজা, বর্ধমানের রাজা, বীরভূমের রাজা ইত্যাদি। এ বিষয়ে যতদূর অনুসন্ধান করিতে পার, কর।”^৩ বঙ্কিমচন্দ্রের অনুপ্রেরণায় বাংলার ইতিহাসচর্চা ও আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চার যাত্রা আরম্ভ হয়।

১৮৯৯ সালে বঙ্কিমচন্দ্রের অনুপ্রেরণায় *ঐতিহাসিক চিত্র* নামে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়র সম্পাদনায় প্রথম ইতিহাস বিষয়ক ত্রৈমাসিক সাময়িকপত্র প্রকাশিত হল। ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখলেন, “সমস্ত ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আশা করিতে পারি না; কিন্তু বাঙ্গালার প্রত্যেক জেলা যদি আপন স্থানীয় পুরাবৃত্ত সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করে, প্রত্যেক জমিদার যদি তাহার সহায়তা করেন, এবং বাঙ্গালার রাজবংশের পুরাতন দপ্তরে যে সকল ঐতিহাসিক তথ্য প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে, ঐতিহাসিক চিত্র তার মধ্যে প্রবেশাধিকার লাভ করিতে পারে, তবেই এই ত্রৈমাসিক পত্র সার্থকতা প্রাপ্ত হইবে।”^৪

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে এক বিপুল অভিঘাত সৃষ্টি করে। ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জন চট্টগ্রাম, ঢাকা, রাজশাহি ও মালদহকে আসামের সঙ্গে যুক্ত করায় তার বিরুদ্ধে বাংলার জনচিন্তে বিপুল ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছিল এই ক্ষোভে আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে এক বিপুল জোয়ার নিয়ে আসে। ১৮৯৪ সালে প্রতিষ্ঠিত সাহিত্য পরিষদ নবউদ্যমে বাংলার সংস্কৃতি পূর্ণরূপে ব্রতী হয়। ১৯০৭ সালে রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন বসে। ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ হলেও বাংলার আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চায় ভাঁটা পড়ে নি। ইংরেজ সরকার যে বাংলাকে পূণর্গঠন করার স্পর্ধা দেখিয়েছিল তা নস্যাৎ করে বাঙালি তার নিজের নিজের অঞ্চলের ইতিহাস উদ্ধারে ব্রতী হয়। ১৯০৫ সালে স্থাপিত হয় রংপুর সাহিত্য পরিষদ। ১৯০৫ থেকে ১৯২০ সালের মধ্যে বিভিন্ন শহরে ১৫টি শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। সাহিত্য পরিষদের এই শাখাগুলি বাংলা সাহিত্যচর্চার পাশাপাশি আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রেও মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিল। ১৯১০ সালে দীঘাপতিয়ার রাজা শরৎকুমার রায়, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় এবং রায়বাহাদুর রমাপ্রসাদ চন্দ্রের মিলিত উদ্যোগে গঠিত হয় বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি। ১৯১৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় বীরভূম অনুসন্ধান সমিতি।

কলকাতার মূল সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে এই আঞ্চলিক সারস্বত প্রতিষ্ঠানগুলির সম্পর্ক ছিল দ্বন্দ্বিক। কলকাতার সারস্বত সমাজ আঞ্চলিক গবেষণাকে সব সময় ন্যায্য গুরুত্ব দেয়নি অথবা আঞ্চলিক গবেষণাকে স্বীকৃতির তকমা পরিয়ে আত্মসাৎ করতে চেয়েছিল। অন্যদিকে আঞ্চলিক ইতিহাসকাররা কলকাতাই বিদ্বজ্জনের অনুমোদনও চেয়েছিলেন আবার বাংলার ইতিহাসে নিজ নিজ অঞ্চলের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী ছিলেন।

সমগ্র সঙ্কে অংশের যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক সে সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন প্রথম যুগের আঞ্চলিক ইতিহাসকাররা। যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের মতে : “বিক্রমপুরের ইতিহাস শুধু একটি পরগণার ইতিহাস নহে, ইহা বঙ্গেরই ইতিহাস।”^৫ সতীশচন্দ্র মিত্র একটু অন্যভাবে লিখেছেন, ‘বঙ্গের অঙ্গ হইতে ছিন্ন করিলে যশোহর খুলনার মতো স্থানের ঐতিহাসিক মূল্য অতি কম।

যাঁহারা জেলার ইতিহাস লিখিতেছেন, বাংলার ইতিহাসই তাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য।”^৬

আঞ্চলিক ইতিহাস রচনার প্রবর্তনা একদিকে বাংলার ইতিহাস রচনার কেন্দ্রীয় প্রকল্পের অঙ্গ আবার অন্যদিকে আঞ্চলিক স্বাভাবিক ঘোষণার হাতিয়ারও বটে। ১৯০৮ সালে রংপুরে অনুষ্ঠিত উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বলেছিলেন, ‘এক সময়, সমগ্র বঙ্গদেশের এই উত্তরবঙ্গের বরেন্দ্র প্রদেশই বিশেষভাবে স্পন্দিত হইয়া উঠিয়াছিল। কি হিন্দু, কি বৌদ্ধ, কি মুসলমান, এখানে আসিয়া সকলেই এক অনির্বচনীয় স্বাভাবিক লিপ্সায় অনুপ্রাণিত হইয়া বাঙালির নাম ভারত বিখ্যাত করিয়া তুলিয়াছিলেন।’^৭ সাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরীর মতে কলকাতা কেন্দ্রিকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ উত্তরবঙ্গ কেন্দ্রিক সাংস্কৃতিক সংগঠন গড়ে উঠেছিল। আবার বীরভূমের অনুসন্ধান সমিতির সভাপতি ও সহসভাপতিপদ দেওয়া হয়েছিল যথাক্রমে নগেন্দ্রনাথ বসু ও নিখিলনাথ রায়কে।^৮

প্রাক-স্বাধীনতা আঞ্চলিক ইতিহাসের একটা বড়ো অংশ নিয়েছিল জমিদার বংশের ইতিহাস। বঙ্কিমচন্দ্র থেকে রবীন্দ্রনাথ এ ব্যাপারে সচেতন ছিলেন। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় লিখছেন, “সে উপকরণের কিয়দংশ যে সকল পুরাতন রাজবংশ ও জমিদার বংশেই প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব, তাহাদের সহিত এদেশের ইতিহাসের ঘনিষ্ঠ সংশ্লিষ্ট সুতরাং প্রসঙ্গক্রমে তাঁহাদের কথাও আলোচনা করিতে হইবে।”^৯ সতীশচন্দ্র মিত্র প্রজার কাহিনি রচনার অঙ্গীকার করলেও, শেষ পর্যন্ত কয়েকটি রাজবংশের ইতিহাস রচনা করেছিলেন। বীরভূমের হেতমপুরের জমিদার মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্তী ১৯০৮-১৯০৯ সালে লেখেন *বীরভূম রাজবংশ*, ১৯১৪ সালে স্থাপন করেন বীরভূম অনুসন্ধান সমিতি। ১৯০৮ সালে জমিদার কুমুদনাথ মল্লিক লেখেন *নদীয়া কাহিনী*। দীবাপাতিয়ার রাজা শরৎকুমারের পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া বরেন্দ্র Research Society স্থাপিত হওয়া সম্ভব হ’ত না। জমিদাররা ইতিহাস গবেষণায় পোষকতা করার সঙ্গে সঙ্গে গবেষণায় অংশগ্রহণও করেছিলেন। জমিদার ছাড়াও, বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালির সাহায্য বা সমর্থন না থাকলে এই আঞ্চলিক গবেষণাগুলি কখনও সাফল্যমণ্ডিত হ’ত না।

ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী জ্ঞানতত্ত্বের বিরোধিতা করলেও আঞ্চলিক ইতিহাসকাররা আধুনিক পাশ্চাত্য ইতিহাস রচনা পদ্ধতি অনুসরণ করার স্বপ্ন দেখেছিলেন। ১৯৩৫ সালে প্রকাশিত *বৃহৎবঙ্গ* -এর প্রথম ভাগের ভূমিকায় দীনেশচন্দ্র সেন লিখেছেন, “ইংরেজরা আমাদের একটা জিনিষ দিয়াছেন, যাহা অমূল্য তাহা চোখের দৃষ্টি।”^{১০} কিন্তু কার্যত দীনেশচন্দ্র ও তাঁর পূর্বসূরীরা পদ্ধতিগত ত্রুটি থেকে মুক্ত হতে পারেননি। সতীশচন্দ্র মিত্র সম্ভাব্য স্থান ভ্রমণ করে, স্থানীয় বাসিন্দাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে তথ্য সংগ্রহের আশ্রয় চেষ্টা করলেও প্রয়োজনীয় ফললাভে সর্বদাই ব্যর্থ হয়েছেন। সব মিলিয়ে ১৯৫০ সালে নীহাররঞ্জন রায়ের *‘বাঙ্গালীর ইতিহাস’* প্রকাশিত হবার আগে পর্যন্ত বাংলার আঞ্চলিক ইতিহাস রচনা পদ্ধতির ক্ষেত্রে লোককাহিনি, কুলজি সাহিত্য, লেখমালা ব্যবহারের ক্ষেত্রে সঠিকভাবে তুলনামূলক পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়নি। ইতিহাস ছিল মূলত রাজবংশের ইতিহাস। আবেগ যতখানি ছিল, ইতিহাসের যুক্তি ততখানি ছিল না। তবে, পদ্ধতিগত দুর্বলতা, আর্থিক অভাব, অন্যান্য নানা প্রতিবন্ধকতা তুচ্ছ করে আদি পর্বের আঞ্চলিক ইতিহাসকাররা যেভাবে তাদের আঞ্চলিক ইতিহাস নির্মাণে ব্রতী হয়েছিলেন, তা প্রশংসার যোগ্য। স্বাধীনতা-উত্তর পর্ব — স্বাধীনতালাভের পর অবিভক্ত বাংলার বিস্তীর্ণ

অঞ্চল পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাওয়ায় আঞ্চলিকতার সংজ্ঞা একটা বড়ো রকমের ধাক্কা খেল। রংপুর বাদ দিয়ে উত্তরবঙ্গ সাংস্কৃতিক আন্দোলন দুর্বল হয়ে পড়ে। বাংলার সীমানা সংকুচিত হয়ে পড়ে পশ্চিমবঙ্গে।

বিংশ শতকের গোড়ায় আঞ্চলিক ইতিহাস ছিল মূলত পুরাবস্তু এবং ইতিহাসের অন্যান্য উপকরণ অনুসন্ধান অথবা গেজেটিয়ারের আদর্শ অনুসরণে স্থানীয় তথ্য সংগ্রহ। স্বাধীনতার পর বিজয় ঘোষের মতো সমাজ বিজ্ঞানী ও কলারসিকরা চেয়েছিলেন বাংলার সাংস্কৃতিক পরম্পরাকে বাঙালির সামনে তুলে ধরতে। এঁদের পদ্ধতি ছিল শহরের শিক্ষিত মানুষের পূর্বনির্ধারিত, পরিশীলিত নির্বাচন। এই চর্চা ছিল মূলত আকাদেমিক। স্থানীয় সারস্বত সমাজগুলি আঞ্চলিক ইতিহাস রচনায় ব্রতী হয় অঞ্চলের প্রতি আন্তরিক প্রীতি থেকে। বাঁকুড়ার কর্মী চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্তের রচনা থেকে জানা যায় — ১৯৫২-৫৩ সালে বিষ্ণুপুর সাহিত্য পরিষদের কর্মীরা “একদিকে যেমন গড়ে তুলেছিলেন সাহিত্য পরিষদের মতো একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান অন্যদিকে তেমনি বাঁকুড়াকে প্রকাশ করেছিলেন, দেশ বিদেশের নানা গবেষককে।”^{১১}

১৯৭১ থেকে ১৯৮৮ পর্যন্ত স্বর্গত তারাপদ সাততার সুযোগ্য সম্পাদনায় কৌশিকী পত্রিকার পাতায় আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চা এক নতুন ব্যঞ্জনা অর্জন করে। ১৯৮৮ সালে পুণমুদ্রিত কৌশিকী পত্রিকার খণ্ড দুটির লেখক ও পৃষ্ঠপোষক তালিকাটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় আই এ এস অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, গবেষক হিতেশরঞ্জন স্যাম্বালের পাশাপাশি বহু গ্রাম্য শিক্ষক, লোকশিল্পী ও বিদ্বজ্জনের লেখা সরাসরি প্রকাশিত হয়েছিল। বিষয়গতভাবে প্রাধান্য পেয়েছিল লৌকিক দেবতা ও লৌকিক শিল্প।

২

কলকাতা কেন্দ্রিক বাংলা, মফসসল বাংলার মধ্যবিস্তৃত বাঙালির আঞ্চলিক ইতিহাসের ধারণার প্রান্তে জন্ম নিয়েছিল অন্য আঞ্চলিকতা। সেই অঞ্চলের ধারণা পৃথক, তা কোনো প্রশাসনিক অঞ্চল নয়, সেই আঞ্চলিকতার দাবি পৃথক, তার বাহকও পৃথক— কোথাও আর্থ সামাজিক প্রান্তবাসী কৃষক আন্দোলনের ইতিহাস, কোথাও সাংস্কৃতিক প্রান্তবাসী উপসংস্কৃতির অঞ্চলভিত্তিক আত্মঘোষণা— প্রথমটির মাত্রা আঞ্চলিকতার গণ্ডি ছাড়িয়ে জাতীয় মাত্রায় প্রসারিত হতে চায়, দ্বিতীয়টি খণ্ডিত ক্ষেত্রে উপসংস্কৃতির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা চায়, এমন কি বাংলা থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চায়। এই আন্দোলনগুলির যৌক্তিকতা বা নৈতিকতা বিবেচনার ক্ষেত্র এটি নয়। কিন্তু আঞ্চলিকতার এই বিকল্প ধারণার ইতিহাস বাদ দিয়ে বাংলা ভাষায় আঞ্চলিক ইতিহাসের আলোচনা সম্পূর্ণ হতে পারে না।

বাংলা আকাদেমি সংকলিত ২৩৪টি আঞ্চলিক ইতিহাসের মধ্যে মাত্র পাঁচটি কৃষক আন্দোলনের ইতিহাস। যশোহর খুলনার ইতিহাসের রচয়িতা সতীশচন্দ্র নিম্নবর্গের ইতিহাস রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন — “প্রজাই দেশের প্রাণ; সে প্রাণের স্পন্দন বা অবস্থার ইতিবৃত্ত দেশের প্রকৃত ইতিহাস।” কিন্তু প্রজার শোষণ, বঞ্চনা, প্রতিবাদ ও সংগ্রামের ইতিহাস তাঁর গ্রন্থে খুবই নগণ্য স্থান দখল করেছে।

১৯৮২ সালে সাবস্টান্ট স্টাডিজ প্রথম প্রকাশিত হবার আগে পর্যন্ত ঐতিহাসিক তথ্য সংরক্ষিত হ'ত উচ্চবর্গের স্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজনে তাই নিম্নবর্গকে দেখা হত একটি একান্ত

অনুগত জীব হিসেবে। আপাত দৃষ্টিতে যে বিদ্রোহকে মনে হয়েছিল আকস্মিক, তলিয়ে দেখে বোঝা গেল এই বিদ্রোহের মূল নিহিত ছিল কৃষক চৈতন্যে। আবার শ্রেণি চৈতন্যের বিকাশ ভৌগোলিক ক্ষেত্র বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করেছিল। প্রসঙ্গাত ১৯৮৪ সালে প্রকাশিত ধনঞ্জয় রায় সম্পাদিত *উত্তরবঙ্গের আধিয়ার বিদ্রোহ ও তেভাগা আন্দোলন*, ১৯৮৫ সালে প্রকাশিত সুধীর মুখোপাধ্যায় ও নৃপেন ঘোষ লিখিত *রংপুর জেলার কৃষক আন্দোলনের ইতিহাস ও পার্টি*, ধনঞ্জয় রায় সম্পাদিত *রংপুরের আধিয়ার বিদ্রোহ ও তেভাগা আন্দোলন (১৯৮৬)*-এর উল্লেখ করা যায়। ২০০২ সালে প্রকাশিত বিপ্লব মাজী রচিত *তেভাগায় বাবা-মা বইটিতে অন্তরঙ্গ মৌখিক দলিলের ভিত্তিতে মেদিনীপুরের ভূমিব্যবস্থা, কৃষকের অবস্থার কালানুক্রমিক বিবরণ ও ১৯৪৬ সালের কন্যা ও মনসুরের পটভূমিকায় গড়ে ওঠা তেভাগা আন্দোলনের বিবরণ* বিধৃত হয়েছে। অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে সংগঠিত এই আধিয়ার কৃষি শ্রমিকের আন্দোলন বাংলার একটি বিশেষ অঞ্চলকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠলেও তার মাত্রা পরিব্যাপ্ত হয় বাংলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে। তেলেঙ্গানার কৃষক আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে এই আঞ্চলিক কৃষক আন্দোলন জাতীয় স্তরে উন্নীত হয়।

দার্জিলিং জেলার ভারত নেপাল বাংলাদেশ সীমান্ত সংলগ্ন নকশালবাড়িকে কেন্দ্র করে কৃষক বিপ্লবের স্বপ্ন নিয়ে প্রান্তিক চাষিদের নিয়ে গড়ে উঠেছিল নকশালবাড়ি আন্দোলন। এই আন্দোলন মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে একটি বিশেষ অঞ্চলের কৃষি শ্রমিকদের বঞ্চনা ও হতাশা দূর করার স্বপ্ন নিয়ে শুরু হয়েছিল। এই আন্দোলনও আঞ্চলিকতার সীমানা পেরিয়ে সর্বভারতীয় বিপ্লবী কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে এমন কি ভারতবর্ষের সীমানা পেরিয়ে পূর্ব পাকিস্তান ও চীনের কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছিল। ২০০২ সালে প্রকাশিত অমর ভট্টাচার্য সম্পাদিত *নকশালবাড়ি আন্দোলনের প্রামাণ্য তথ্য সংকলন* এই সম্পর্কিত দলিলগুলি প্রকাশ করেছে। সামগ্রিকভাবে এই আন্দোলন ব্যর্থ হলেও আঞ্চলিকতার ক্ষুদ্র গণ্ডিকে অতিক্রম করতে পেরেছিল।

বাংলা ভাষা ভিত্তিক আঞ্চলিকতার বোধের প্রতিক্রিয়ায় বা ‘অপর’ রূপে সাংস্কৃতিক দিক থেকে প্রান্তিক অঞ্চলগুলিতে গড়ে উঠেছে বিকল্প উপভাষাভিত্তিক আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য চেতনা। এরই উদাহরণ উত্তর বাংলার কামতাপুরি আন্দোলন। উত্তরবঙ্গের রংপুর (বাংলাদেশ), কোচবিহার জলপাইগুড়ি, দিনাজপুর, মালদহ ও দার্জিলিং জেলায় রাজবংশী জনগোষ্ঠীর বাস। তারা উত্তরবঙ্গের আদি অধিবাসী। কিন্তু ভারতে ব্রিটিশ শাসনকালের আদমসুমারি কমিশন কোচ ও রাজবংশীদের এক করে দেখানোয় সামাজিক বিভ্রান্তি চরম আকার ধারণ করে। বিংশ শতাব্দীর সূচনা পূর্বে শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু তাঁর *বিশ্বকোষ* রচনাকালে রাজবংশীদের ‘বর্বর’ স্লেচ্ছ বলায় চরম প্রতিবাদ দেখা যায়। রাজবংশীরা নিজেদের ক্ষত্রিয় কুল উদ্ভূত বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন। ১৯০৬ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের রংপুর শাখা গঠিত হলে ক্ষত্রিয় পত্রিকার সম্পাদক রায়সাহেব পঞ্চানন বর্মণ এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন।^{১২} ইংরেজ আমলে আঞ্চলিক ভাষার পরিবর্তে বাংলা ভাষাকে এই অঞ্চলে চালু করা হয়। স্বাধীনতার পর রাজবংশী ভাষাকে বাংলা ভাষার একটি আঞ্চলিক রূপ আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। এর প্রতিবাদে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে দার্জিলিং নর্থবেঙ্গল আকাদেমি অফ কালচার। গড়ে উঠেছে রাজবংশী সাহিত্য বাসর। এদের মুখপত্র *ডেগর*-এর ভাষা বাংলা নয়, রাজবংশী।^{১৩} রাজবংশী সম্প্রদায়ের

বুদ্ধিজীবী অংশ গৌরবময় অতীত ও কঠিন বাস্তবের সংযোগকারী ইতিহাস রচনা ও প্রচার শুরু করেন। এর মূল উদ্দেশ্য সংস্কৃত শাস্ত্রের উদ্ধৃতি, পৌরাণিক উপাখ্যানের নতুন ব্যাখ্যা ও লোকসংস্কৃতির ভিত্তিতে রাজবংশী ইতিহাসের পুনর্নির্মাণ; এমন কি উগ্রপন্থীদের দাবী পৃথক কামতাপুরী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। সাংস্কৃতিক সংস্কার ও বিচ্ছিন্ন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবি আমাদের আঞ্চলিক ইতিহাস, আঞ্চলিক স্বাভাব্য ও স্বাভাব্যবোধের ধারণাকে এক কঠিন প্রশ্নের সামনে দাঁড় করায়।

একবিংশ শতকে দাঁড়িয়ে বিশ্বায়নের যুগে আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চা এক নতুন ব্যঞ্জনা লাভ করেছে। বিশ্বায়নের চাপে যোগাযোগ বিপ্লবের প্রেক্ষাপটে সর্বত্র একই রুচি, একই সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ চারিয়ে দিয়ে এক ঐক্যবদ্ধ আন্তর্জাতিক বাজার গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চলছে। এরই বিকল্পরূপে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে আঞ্চলিক কৃষ্টি, আঞ্চলিক সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার লড়াই জোরদার হয়ে উঠেছে। আঞ্চলিক পরিবেশ রক্ষার আন্দোলনের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলছে আঞ্চলিক সাংস্কৃতিক সত্তা ও ঐতিহ্য রক্ষার আন্দোলন। এর ভঙ্গুরতার মধ্যেই এর সার্থকতা।

টীকা :

- ১ বাংলা ভাষায় ইতিহাসচর্চা গ্রন্থপঞ্জি (১৮০১-১৯৯০), পশ্চিমবঙ্গবাংলা আকাদেমি, ১৯৯৮।
- ২ পার্থ চট্টোপাধ্যায়, ইতিহাসের উত্তরাধিকার, ২০০০, পৃ. ১৩২।
- ৩ বঙ্কিম রচনাবলী, প্রবন্ধ সমগ্র, দ্বিতীয় খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, ১৩৮০ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৩৪০।
- ৪ অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় সম্পাদিত, ঐতিহাসিক চিত্র, প্রথম বর্ষ, প্রথম খণ্ড ১৮৯৯ পৃ. ৩।
- ৫ যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, বিক্রমপুরের ইতিহাস, ১৯৯৮, পৃ. ৬।
- ৬ সতীশচন্দ্র মিত্র, যশোহর খুলনার ইতিহাস প্রথম খণ্ড, ১৩২১ বঙ্গাব্দ পৃ. ১১।
- ৭ বত্সা পাল, 'উনবিংশ ও বিংশ শতকে বৌদ্ধিক সমাজে উত্তরবঙ্গ শব্দ ব্যবহার ও তার প্রতিক্রিয়া', ইতিহাস অনুসন্ধান, ১৬শ খণ্ড, ২০০২, পৃ. ৪৩২।
- ৮ মানসকুমার সাঁতরা, 'আধুনিক আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চায় বীরভূম : উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ ও বিশ শতক', ভদেব, পৃ. ৩৮৪-৩৯৪।
- ৯ অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, ঐতিহাসিক চিত্র, প্রথম বর্ষ, প্রথম খণ্ড, ১৮৯৯, পৃ. ১২।
- ১০ দিনেশচন্দ্র সেন, বৃহৎবঙ্গ, প্রথমভাগ ১৯৩৫, পৃ. ১৩।
- ১১ চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত, 'বিনয় ঘোষ ও বিষ্ণুপুরের সাহিত্য পবিষদ' কৌশিকী, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯৮৮, পৃ. ৩৭৩।
- ১২ ইছামুদ্দিন সবকার, 'সংস্কার আন্দোলন থেকে পৃথক রাজ্যের দাবি : উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজের কামতাপুরী আন্দোলন প্রসঙ্গে' শেখর ভৌমিক সম্পাদিত, সাম্প্রতিক ইতিহাসচর্চা, ২০০৫।
- ১৩ নিখিলেশ রায় সম্পাদিত ডেগর, ৩ জুন-ডিসেম্বর, ২০০৪।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : এই প্রবন্ধ রচনার জন্য আমাকে গুরুত্বপূর্ণ বই দিয়ে সাহায্য করেছেন অধ্যাপিকা কান্তা চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপিকা উত্তরা চক্রবর্তী ও সাংবাদিক রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়।

ফকির বিদ্রোহের চার নায়ক

আনন্দ ভট্টাচার্য

ফকির বিদ্রোহ নিয়ে আলোচনার শেষ নেই। দেশে-বিদেশে ঐতিহাসিকেরা তাদের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় পাওয়া তথ্যের ওপর ভিত্তি করে ফকির বিদ্রোহকে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। ইতিহাসচিন্তার জগতে ফকিরদের বিদ্রোহী মনোভাব ও তার প্রকৃতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা সাম্প্রতিক কালে প্রকাশিত এক প্রবন্ধে আলোচিত হয়েছে।

ফকির বিদ্রোহের সূত্রপাত ১৭৬৩ ও শেষ ১৮০২ সালে। ফকির বলতে এখানে মাদারি সম্প্রদায়ভূক্ত এক বিশেষ বে-শরা সুফিদের কথা বলা হয়েছে যা বিভিন্ন প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে।^১ মাদারি সিলসিলাভূক্ত ফকিররা কোন্ কোন্ নেতার নেতৃত্বে আন্দোলন চালিয়েছিল তা আলোচনাই বর্তমান প্রবন্ধের বিষয়বস্তু। মুঘল যুগে তারা যে সশস্ত্র ও সারিবদ্ধভাবে মিছিল সহকারে বের হত তা বাধাপ্রাপ্ত এবং গ্রামবাসীদের কাছ থেকে যে চাঁদা পেত তা বন্ধ হবার দরুণ প্রতিবাদ জানানো ছাড়া অন্য কোনো রাস্তা ছিল না।

ফকিরদের যারা সাংগঠনিক নেতৃত্ব দেবার জন্য এগিয়ে এসেছিল তারা হল মজনু শাহ, মুশা শাহ, করিম শাহ ও সোভান আলি শাহ। সরকারি নথিপত্রে বা জেলা গেজেটিয়ারের বিবরণে মজনু শাহকে এক জ্বলন্ত অগ্নিপিশু বা desolating blast বলে বর্ণনা করা হলেও সেই প্রথম একদিকে কোম্পানির বিবুদ্ধে আন্দোলন চালিয়েছিল অন্যদিকে নাটোরের মহারানী ভবানীর হস্তক্ষেপ চেয়েছিল। এই সংগ্রামী নায়ককে নিয়ে কোনোরকম তথ্যভিত্তিক গবেষণা হয় নি। এম. আবদুর রহমান^২ তাঁর আলোচনায় বীরভূমের রাণী লালবিবি ও রাজা আসাদউজ্জামানের সঙ্গে মজনু শাহের যে সংযোগ সাধন ঘটাবার চেষ্টা করেছেন তাও কষ্টকল্পিত।^৩

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লেখ্যাগারে রক্ষিত নথিপত্র অনুসরণ করলে দেখা যাবে যে এ সকল নেতা বা পিরের নেতৃত্বে মাদারি ফকিরেরা উত্তর ও পূর্ব বাংলা, পূর্ণিয়া, গোরক্ষপুর ও নেপালের সঙ্গে এক বিশেষ যোগসূত্র স্থাপন করেছিল। মজনু শাহ অবশ্য বেনারস, লক্ষ্মী ও অযোধ্যার রাজদরবারের সঙ্গে এক বিশেষ সম্পর্ক স্থাপন করেছিল। সুপ্রকাশ রায়ের^৪ যে বক্তব্য বাংলার পরিমন্ডলের সঙ্গে মিলেমিশে তারা কৃষক সমাজের অঙ্গ হিসেবে পরিগণিত হয়েছিল, সে বক্তব্যও ঠিক নয়।

মজনু শাহ বা তার সহযোগী যোদ্ধাদের বাল্যপরিচয় এবং তারা কোন্ সামাজিক পরিবেশে লালিত পালিত তাও অজ্ঞাত। মজনু শাহের পির কে ছিল এবং কীভাবে সে মাদারি ফকির তরিকাভূক্ত হয়েছিল সে সম্বন্ধে সরকারি নথিপত্রের পাশাপাশি ফারসি সূত্রও নীরব। মাদারি

ফকির অবিবাহিত থাকায় মজ্নু শাহ বা অন্যান্য ফকির নেতাদের পক্ষে বংশানুক্রমে তাদের পরম্পরাকে চালিয়ে যাওয়া অসম্ভব ছিল। এক্ষেত্রে তাদের কীভাবে মুরিদ বা তরিকাভুক্ত করা হোত তা ব্যাখ্যা করা প্রাসঙ্গিক। দলভুক্তি ছাড়া যে সংগঠন থাকতে পারে না এবং সংগঠন না থাকলে তাদের অস্তিত্বের সংকট দেখা দেবে তা মজ্নু বা পরবর্তী ফকির নেতারা উপলব্ধি করায় সংগঠনকে সুদৃঢ় করার ব্যাপারে নজর দেওয়ায় তাদের গ্রেপ্তার বা হত্যা করার জন্য পুরস্কারের ভিত্তিতে বিশেষ গোয়েন্দা নিযুক্ত করা হলেও কোম্পানী খুব একটা ফলপ্রসূ হয় নি।*

সাধারণত ক্রয় (Purchase), তরিকা পরিবর্তন (Change of Order) এবং পোষ্যগ্রহণ (Adoption)— এই তিনটি পদ্ধতির মাধ্যমে যারা তরিকাভুক্ত হোত তারাই কালক্রমে পিরের দায়িত্বভার গ্রহণ করত। মুরিদ থেকে মুর্শিদ বা পির হতে গেলে নানান ধরনের প্রক্রিয়া-নিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। নিজস্ব তরিকাভুক্ত কাজ ছাড়াও অন্যান্য নানাবিধি কাজের জন্য বেশ-কিছু লোককে অনিয়মিতভাবে দলভুক্তি করতো। সাধারণত এদের ক্রীতদাস হিসেবে কেনা হোত। বাংলাদেশ জাতীয় মহাফেজখানা ও রাজ্য লেখ্যাগারের* তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায় পূর্ব বাংলার হুন্নী ফকির ও করিম শাহ ইমাম বকশ নামে এক বাসিন্দাকে ক্রীতদাস হিসেবে নিযুক্ত করেছিল এছাড়া। মাদারি ফকির তরিকায় যে বিপুল পরিমাণ সদস্যের অন্তর্ভুক্তি ঘটেছিল তাদের মাধ্যমে বিদ্রোহ পরিচালনা করা অসম্ভব কারণ তারা সামরিক বিদ্যাশিক্ষায় অপটু ছিল।

অনিয়মিত ও প্রয়োজনের নিমিত্তে নিযুক্ত ফকিরদের যে সশস্ত্র যুদ্ধ বাহিনী থাকত তার পুরোভাগে থাকত উত্তর ভারত ও নেপালের কর্মচ্যুৎ রাজপুত, তেলিঙ্গা, বরকন্দাজ ও পাইক। অস্ত্রশস্ত্র ও সামরিক সাজসরঞ্জামে সুসজ্জিত এই বাহিনীকে ক্রয়ান্ত করা এবং সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রনে আনা বেশ কঠিন ব্যাপার ছিল। তবে এই বাহিনীর সামাজিক ভিত্তি আলোচনা করা দরকার যার ভিত্তিতে বোঝা যাবে যে এই মাদারি ফকিরেরা কোথাকার লোক।

বিদ্রোহী মজ্নু শাহের শৈশব, জন্মস্থান বা পিতৃ মাতৃ পরিচয়ে শোনা যায় মজ্নু শাহ এলাহাবাদে জন্মালেও গোয়ালিয়র বা বিহারে সে বড় হয়েছিল*। তবে তার জীবনের অনেকটা অংশ কানপুরের মাকওয়ানপুরে কাটে যা ছিল তার সদর দপ্তর যেখানে উর্দু ছাড়াও সে অন্যান্য ব্যাপারে যাতায়াত করত এবং সেখানে তার এক বিরাট বাহিনী মজুত থাকত। রংপুরের কালেক্টরের রিপোর্টে বলা হচ্ছে মজ্নুর "Headquarters was at Makhanpur where he usually withdrew when the rainy season stopped marauding operations" মজ্নু শাহ উত্তর ভারতের লক্ষৌ ও বেনারস অঞ্চলে আত্মগোপন করতে পারত। সরকারি প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে "Majnu retreated to the north-west of Chilmari towards Benares and Lucknow near which he resides and his route takes about six weeks hour from Benares to Goalpara"। মজ্নু এ সকল অঞ্চল থেকে বাহিনী সংগ্রহ করে দলবদ্ধি করত "Majnu gets his recruits from the districts in which he carries on his depredations।"* ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাহিনীর গুলির আঘাতে আহত মজ্নুকে সহযোগীদের সাহায্যে মাকওয়ানপুরে নিয়ে যাওয়া হয় এবং মৃত্যুর পর তাকে কবর দেওয়া হয়।* মাকওয়ানপুরের সাক্ষ্যদানশিনদের বক্তব্যে এটা স্পষ্ট যে মজ্নু শাহের দুটি কবর অর্থাৎ একটি তার দেহের ও আরেকটি চুলের যা এখনও বর্তমান। মাদারি ফকিরদের এই দুটি কবরের প্রথা ফকিরী সংস্কৃতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস মাদারি ফকিরদের প্রতি মারমুখী মনোভাব গ্রহণ করায় মজনু শাহ প্রথম থেকেই যে-বিদ্রোহী হয়ে ওঠে-তা নয় প্রথমদিকে সে আবেদন নিবেদনের মাধ্যমে নিজেদের সমস্যার কথা জানিয়ে কোনো সুফল না পেয়ে ফকির সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হিসেবে নাটোরের মহারানী ভবানীর হস্তক্ষেপ চেয়েছিল। আঞ্চলিক লোকদের কাছে মজনু শাহ একজন শান্তি প্রিয় মানুষ বলে পরিচিত যে অতীতে কখনও কোনো হিংসাত্মক কার্যকলাপে লিপ্ত হয় নি। তাই কোম্পানীর বক্তব্য ছিল "they are not to be molested or provoked"।

রানী ভবানীকে লেখা চিঠির মূল বক্তব্য হল মাদারি ফকিরেরা বছরের পর বছর ধরে বাংলার প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে দরগা ও তীর্থস্থানে ঘুরে বেড়াত যার ওপর কোনো নিয়ন্ত্রন ছিল না। কিন্তু কোম্পানির শাসন শুরুর হবার পর থেকে তাদের ওপর অত্যাচার চলছে, নির্বিচারে হত্যা করা হচ্ছে। এর প্রতিকার চাই, যার জন্য তারা মহারাণী ভবানীকে চিঠি লিখছে এবং আর্জি জানাচ্ছে শাসক হিসেবে কোম্পানির এই অত্যাচারের হাত থেকে তাদের মুক্তি দেওয়া দরকার। তারা কিন্তু মুঘল বাদশাহকে চিঠি না লিখে রাণী ভবানীকে কেন চিঠি লিখল তার কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। এর থেকে প্রতিকারের ক্ষমতা সত্যিই কী রানী ভবানীর ছিল কারণ রাণী ভবানীর নিজের অবস্থাই তখন টলমল করছিল। এই আবেদন নিবেদনের নীতি নিষ্ফল হয়ে যাওয়ায় তখন মাদারি ফকিরেরা মজনুর নেতৃত্বে অভিযান চালাতে মনস্থ হয় এবং নিজের সম্প্রদায়কে একটা শক্ত ও মজবুত ভিত্তির ওপর দাঁড় করাতে সচেষ্ট হয়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাহিনীর সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্য মাদারি ফকিরদের সশস্ত্র ও সামরিক দিক থেকে সুশিক্ষিত করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে। Seema Alavi^{১১} ও D.H.A. Kolff^{১২} দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে অর্থনৈতিক দুরবস্থার দরুণ উত্তর ভারতীয় দেশীয় রাজন্যবর্গের কর্মচ্যুত বাহিনী কীভাবে নিজেদের ভাগ্য ফেরাবার চেষ্টায় ব্যস্ত ছিল এবং তাদের কাছে লুণ্ঠপাট করা ছাড়া অন্য জীবিকা নির্বাহের কোনো রাস্তা খোলা ছিল না।

মজনু এও উপলব্ধি করেছিল তার বাহিনী এমন হওয়া দরকার যারা উট, ঘোড়া, হাতির পিঠে বসে সন্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে পারে। আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারেও তারা হবে পটু। ১৭৭০ থেকে ১৭৮৭ সালের মধ্যে মজনুর নেতৃত্বে পরিচালিত অভিযানে অস্ত্রধারী কর্মচ্যুত উত্তর ভারতীয় পাইক বরকন্দাজদের অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য। মজনু শাহ মহাস্থানগড়ে যে দুর্গ তৈরী করেছিল সেখানে এই বাহিনী মোতায়েন থাকত। তবে এদের মধ্যে কতজন ফকির সম্প্রদায়ভুক্ত এবং কতজন ভাড়া করা তার পরিসংখ্যান নির্ণয় করা বেশ কঠিন। আবার Glazier^{১৩} তাঁর আলোচনায় মজনুর এই সফলতার পেছনে ভবানী পাঠকের ভূমিকাকে তুলে ধরেছেন যার দাপটে কোম্পানি প্রশাসন রীতিমত দুশ্চিন্তায় পড়েছিল।

ময়মনসিংহের বেশ কিছু বরকন্দাজ ফকিরদের দলে যোগদান করে তাদের সামরিক শক্তিকে আরও জোরদার করেছিল। "certain burkandazes, inhabitants to pargana Cagmary in the district of Mymensing were very active in assisting the Fakirs to seize the people belonging to the cooty and to collect the tribute claimed."^{১৪} এমনকি ডারাজের রাজা কৃষ্ণনারায়ন যে সব কর্মচ্যুত বরকন্দাজ, ফকির ও সন্ন্যাসীদের নিযুক্ত করেছিল তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ফটিক বারোয়া ও

হাজারী সিং। ১৭৯৪-এর গোড়ার দিকে যে ফকিরের দল কুচবিহার অভিমুখে অগ্রসর হয়েছিল তাদের মূল নেতা হল হাজারী সিং ও ফটিক বারোয়া। বেনারস থেকে আসা সম্যাসী জঙ্গল গিরিও এতে অংশ নিয়েছিল। এছাড়া ফকির নেতা শামসের শাহের অনুচরদের ও বেশীর ভাগ ছিল লক্ষ্মীও বেনারসের বাসিন্দা^{১৪}। এছাড়া নেপালের পাহাড়ী বাসিন্দা ও গুর্খাদের ফকিররা ভাড়াটিয়া সৈন্য হিসেবে ব্যবহার করত।

মজনু শাহ এও উপলব্ধি করেছিল যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ছাড়াও অন্যান্য ধর্মীয় সম্প্রদায় যেমন দর্শনামী নাগা সম্যাসী বা বৈরাগীদের অত্যাচার থেকে রেহাই পেতে গেলে তাদের সশস্ত্র ও দলবদ্ধ হওয়া দরকার। চতুর্দিক থেকে তারা কোণঠাসা হতে থাকায় মজনু শাহ কেবলমাত্র সংঘবদ্ধ হবার প্রয়োজনীয়তাই অবলম্বন করেনি তারা তীর্থযাত্রার সময়কালে "also armed with personal arms besides four camels loaded with rockets and had levied contributions as they passed along." এমনকী তাদের সংখ্যা মজনু শাহের নেতৃত্বে এক হাজার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে আড়াই হাজারে হয়েছিল। উত্তর ও পূর্ব বাংলার বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চল ফকিরদের বিশেষ করে তাদের নেতা বা পির মজনুর নখদর্পণে থাকায় যে কোনো সময়ে নির্দিষ্ট রাস্তা পরিবর্তন করে অন্য রাস্তা ধরা তাদের পক্ষে কঠিন ব্যাপার ছিল না। বাংলার ভৌগোলিক বিবরণ সম্বন্ধে জ্ঞান থাকায় মজনুর পক্ষে পরিস্থিতি বিপদজনক হলে সে পূর্ণিয়ার মধ্য দিয়ে মাক্‌ওয়ানপুরে শাহ মাদারের দরগায় বিশ্রাম নিত, যে অঞ্চল কোম্পানির নাগালের বাইরে ছিল। মাক্‌ওয়ানপুরকেই তার নিরাপদ স্থল বলে মনে হত। প্রাকৃতিক পরিবেশে মজনু ও তার অনুচররা লালিত পালিত হওয়ায় ফকির সম্প্রদায়ের পক্ষে জঙ্গল ও পাহাড় সম্বিহিত স্থানে আশ্রয়গোপন করা ও কষ্টকর ছিল না। বগুড়ার মহাস্থানগড়ের ভৌগোলিক অবস্থানের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল "Hill and Dirga at Mustangurr [Mahasthangarh] was reported to be a place of natural strength; the hill being in most places extremely steep and skirted with thick wood which will make it tenable against a strong detachment." এছাড়া তাদের আবাসস্থলগুলি জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে হওয়ায় তারা যে কেবলমাত্র জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে থেকে নিজেদের আশ্রয়গোপন করেই রেখেছিল তা নয় তারা ১৭৭৬ সালে কোম্পানির কিছু সিপাহিকে আহত করেছিল। "The Fakirs retired to an high grass Jungle and from whence they wounded five of our sepoy, I have also received a slight wound from a ball one of my legs... Mudgenoo made his escape on horseback."

মজনু জঙ্গলে আশ্রয় নেবার ফলে কখনও কখনও কোম্পানির সিপাহিদের গোলা বারুদ নিঃশেষ হয়ে যেত। "Mudgenoo had 25 or 30 of his men shot dead and double the number or thereabout wounded fled into the Jungles; a persuit would have been imprudent as the sepays had expended their ammunition. Indeed the Jungles are so immensely thick."^{১৫} প্রশ্ন উঠতে পারে যে জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে থাকলে তাদের খাদ্য খাবার যোগাড় হতো কীভাবে, অনেকে বলবার চেষ্টা করেছেন যে এসব খাদ্য গ্রামবাসীরা যোগান দিত, কিন্তু এ বক্তব্যও ঠিক নয়।

একদিকে ক্রমাগত রাস্তা পরিবর্তন ও মাদারি ফকিরেরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়ায় বিভিন্ন দিক থেকে আক্রমণ আসতে থাকায় কোম্পানির পক্ষে একসঙ্গে চতুর্দিকে সৈন্য প্রেরণ করা অসম্ভব ছিল বলে মজনু শাহের মত ব্যক্তিত্বের পক্ষে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে ব্যতিব্যস্ত করা সহজ হয়ে পড়ে।

ফকিররা নদীপথে যাতায়াত করতে অভ্যস্ত ছিল। ১৭৮৬ সালে কালেশ্বরে (সিলাবেরী) মজনুর নেতৃত্বাধীন এক বাহিনীর সঙ্গে লেফটেন্যান্ট ব্রেনানের কাছে সম্মুখ যুদ্ধে আহত মজনু তার সহযোগীদের নৌকা করে নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছানোর দায়িত্ব সে নিজে নিয়েছিল।

মজনুর সামরিক অভিযানের সফলতার কারণ হিসেবে প্রভাসচন্দ্র সেন বলেছেন, "At that time, the people of these parts did not even see fire arms. Majnus' modus operandi was to fire some shots on entering a village which frightened the villagers so much that they all fled leaving their cash and valuables; in this way Majnu collected a large booty without resistance. He had a machine called 'Bhela' which when revolved vomitted forth fire all round."^{১০} এমনকি ময়মনসিংহের জমিদাররা মজনুর আক্রমণের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য একরাতের মধ্যে এক খাল খনন করেছিল এ উদ্দেশ্যে যাতে নগর নদীর সঙ্গে যোগসাধনের মাধ্যমে জাফরশাহী পরগনায় তাদের জমিদার কাছারীকে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

তারা নেপালের মহারাজার সহানুভূতি ও সক্রিয় সহযোগিতা থেকে যে বঞ্চিত ছিল না তা নেপাল রাজার বক্তব্য থেকে স্পষ্ট, "although the Fakir is full of faults and deserving of death, it is highly culpable to confine and put to death any Fakeers."

মজনুর মৃত্যুর আগেই তার উত্তরাধিকার ঠিক হয়ে যায় এবং মজনুর পাশাপাশি মুশা শাহ আক্রমণাত্মক ভূমিকায় অগ্রসর হয়। কোথাও কোথাও মুশা শাহকে মজনু শাহের ক্রীতদাস বলে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করলেও আসলে সে ছিল মজনুর চেলা বা শিষ্য। মুশার জন্মবৃত্তান্ত বা শৈশব আমাদের কাছে অজ্ঞাত।

মুশার বক্তব্য মজনুর থেকে আরও বেশী ঔদ্ধত্যপূর্ণ। মুশা শাহের আক্রমণে জনজীবন ওষ্ঠাগত হয়ে ওঠায় কালেক্টরের নির্দেশে হরকরাকে বলা হয়। "go to the pergunah ... seize and confine the said Fakeer." শাহ মুশা এই আদেশকে বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করে বলে, The sum I have required of you must be prepared for. I will most certainly take it."^{১১} গ্রাম বাংলার রাস্তাঘাট সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান, প্রাকৃতিক পরিবেশ ও পরিমণ্ডলে মাদারি ফকিররা লালিত পালিত হওয়ায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বারে বারে তাদের কাছে পর্যুদস্ত হয়েছে। মুশা শাহ অবশ্য রাজশাহির রানীর কিছু কর্মচ্যুৎ বরকন্দাজদের তার দলভুক্ত করেছিল।

ফকির বিদ্রোহ দীর্ঘস্থায়ী হবার পেছনে ফকির নেতাদের ভূমিকার পাশাপাশি অনেকে গ্রামবাসী বা কৃষকদের পরোক্ষ সমর্থনকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। তাদের নীরব দর্শকের ভূমিকাকেই তুলে ধরা হয়েছে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্তৃপক্ষ নিজেই স্বীকার করেছে যে

"... That the spectators from the surrounding villages peaceably looked on and offered no assistance either to join the Jemautdar of the party or intercept Moosa in his flight."^{১৮} কারণ গ্রামবাসীরা ফকিরদের চাহিদামত অনুদান দিতে না পারায় তারা যে তাদের আক্রমণের শিকার হোত তা বলা বাহুল্য। এরপর তারা যদি কোম্পানির সিপাহীদের সাহায্য করে তাহলে আক্রমণের মাত্রা যে বাড়বে সে নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। যে কারণে বলা হচ্ছে আবার "The alertness of the villagers to seize upon what did not belong to knew manifestly shows that mere timidity is not solely the cause of their flying or remaining inactive, as is their custom, upon these occasions." এই কারণেই হয়ত কোম্পানির সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছিল "that the villagers on these events became partisans of the Fakirs and restore to them in the hour of safety what they took charge of at the moment of their danger." ঠিক একই রকমভাবে ফেরাগুল শাহ অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাকে সাময়িক ভাবে কিন্নু দেওয়ানের বাড়ীতে রাখা হয় এবং সাময়িক সুস্থতার পর তাকে জঙ্গলে স্থানান্তরিত করা হয়।

মুশা শাহ ফকিরের জায়গীরের যে বর্ণনা পাওয়া যায় তা হল "Moosha saw Faquer has a Jageer in their [Goorkha] country about a mile from Cassimgunj consisting of nine Goteh of land, five of which was given to him by Secumpully and four latterly by Gunga Ram who were subas [local governors] of Nepal."^{১৯} এই মাদারি ফকিরেরা নেপালে তাদের সদর দপ্তর প্রতিষ্ঠা করলেও তবে তারা প্রায়শই মাক্‌ওয়ানপুরে তীর্থযাত্রা উপলক্ষ্যে যেত এবং সেখানে প্রার্থনা সেরে আসত। এক সরকারি প্রতিবেদন থেকে জানা যায়। "Cheraug Ally on a pilgrimage to Mokunpore."^{২০}

এস্থানগুলি ভৌগোলিক দিক থেকে এমনই এক গুরুত্বপূর্ণ অবস্থায় ছিল যেখান থেকে একদিকে ভূটান অন্যদিকে কুচবিহার ও পূর্নিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ রাখা কঠিন ব্যাপার ছিল না। নেপালের পাসুলি, হিসারগুড়ি, রঞ্জেলা ও কোয়ালিয়ার নীচু জমি গুলি এমনভাবে জঙ্গলে আবৃত ছিল যে সেখানে বন্য জীবজন্তু যেমন হাতী, গন্ডারের সন্ধান পাওয়া যায়। এমনকী বাঘ, ভান্দুকও সেখানে বসবাস করত। এই ধরনের প্রাকৃতিক পরিবেশে মাদারি ফকিররা তাদের আবাসস্থল গড়ে তুলেছিল।

নেপালে বসবাসকারী ফকিরদের এই বাহিনীতে মূল চালিকাশক্তি কারা ছিল। এখানে মনে রাখা দরকার নেপাল এমনই এক স্থান যেখানে হিন্দু সম্যাসী, বৈরাগীরা ও বসবাস করত। তারা আবার প্রয়োজনে এই ফকিরদের সামরিক সাজসরঞ্জাম ও অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সাহায্য করত। এসময়কার অন্যতম সম্যাসী গোবিন্দ গিরির জবানবন্দীতে জানা যায় "They have between them above one thonsand people, of which number there are four hundred Mussulman Fakeers and one hundred Hindoo Sonassies; four hundred Sepoys, twenty Byragies and the rest are people of different description."^{২১} ফকিররা এদের ভাড়াটিয়া সৈন্য হিসেবে ব্যবহার করত।

ফকির করিম শাহের বিদ্রোহী জীবনের সূত্রপাত ১৭৯৪ সালে। সরকারী তথ্য থেকে জানা যায় করিম শাহ তিরহুতের জমিদার মাধু সিং এর দেওয়া জায়গীরে বসবাস করত। এই জমিদারীর অন্তর্গত ধরমপুর ও রানী ইন্দ্রবতীর জমিদারীর অন্তর্গত ধাপা ও নাটপুরের প্রতিটি পরগনা থেকে মাসিক এক টাকা করে ভাতা পেত। কিন্তু আঠারো শতকের শেষের দিকে যখন রাজদরবার থেকে এই ভাতা বন্ধ হয়ে যায় তখন করিম শাহ মাধু সিংকে যে চিঠি লিখেছিল তাতে তাকে 'Raja' ও কোম্পানীর সরকারকে 'Feringhee' বলে সম্বোধন করলেও নিয়মিত চাঁদা প্রদান না করলে তার পরিণতি কী হতে পারে তা স্পষ্ট বুঝিয়ে দেয় "if the contribution was duly paid no disturbance shall happen in the country, I will build a shed in some place and remain in peace, I am not to blame, if you refuse to confirm my chunda (contribution) I must act in such a manner as will procure me a subsistence and your country will be despoiled."^{২২} অর্থাৎ এ হুঁশিয়ারী ও দিয়েছিল যদি তার দাবী দাওয়া না মেটে তাহলে সে আবার পুরোনো পথ গ্রহণ করবে।

নেপালের মহারাজাও করিম শাহকে যথেষ্ট মর্যাদা দিয়েছিল। এমনকি কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ যখন করিম শাহকে তাদের হাতে তুলে দেবার জন্য চাপ সৃষ্টি করছিল নেপালরাজ যে সেই চাপের কাছে মাথা নোয়াননি তা স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়।

"To the noble friend sree Karim Shahjee, Deo sing Oupadeah vakil sends salam. The Burra Sahib [the Collector] having sent for me the following conversation ensued, seize Karim Shah and deliver him up, strong and pointed language took place on both sides."^{২৩} করিম শাহের বাহিনী পাঠান, রাজপুত ও কর্মচ্যুত বরকন্দাজদের নিয়ে গড়ে উঠেছিল। নির্দিষ্ট মাইনের বিনিময়ে কাজ করত এবং কাজের শেষে তাদের বরখাস্ত করা হত।

ফকির বিদ্রোহের শেষ পর্বে সোভান আলি শাহের আবির্ভাব ঘটে। এই সোভান আলি শাহকে মুশা শাহের শিষ্য বা চেলা বলে মনে করা হচ্ছে। সোভান আলির নির্দিষ্ট বাসস্থান মোরাঙ ও তার সীমান্তবর্তী এলাকা পূর্ণিয়া ও দিনাজপুর। মোরাঙের অন্তর্গত রঙেলী ও কোয়ালিয়ার অন্তর্গত আবের ও বিরা নামে দুটি জঙ্গলের জায়গীর তাদের দেওয়া হয়েছিল যেখানে তারা একাধিক সশস্ত্র বাহিনী মোতায়েন করতে পারত। সোভান আলি এমনকি সেখানে একটি মাটির দুর্গ তৈরী করে বসবাস করত। তাকে গ্রেপ্তারের জন্য কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ নেপালের মহারাজাকে চাপ সৃষ্টি করলেও নেপাল রাজ স্পষ্ট জানায় "the Fakirs do live in my country but they subsist on charity, what character shall I gain by seizing them." কোম্পানির সরকার যতই বলতে থাকুক না কেন যে ফকিরদের অত্যাচারে জনজীবন বিপর্যস্ত নেপালের রাজা কিন্তু কোনোভাবেই এই ফকিরদের দেশ থেকে তাড়িয়ে বা ধরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেনি।

মজন্মুর প্রবল ও অসামান্য ব্যক্তিত্বই ফকিরদের অন্তর্কলহ থেকে বুখতে পেরেছিল। মজন্মুর মৃত্যুর পর চেরাগ আলি ও রোশন আলির মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব এতই প্রকট হয়ে ওঠে যে এর পরিণতি হিসেবে মুশা শাহ ও চেরাগ আলি মারা যায়।

উপরের আলোচনা থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে ফকির বিদ্রোহের প্রথম সারির মধ্যে মজনু শাহ এক ব্যতিক্রমী চরিত্র যার নেতৃত্বে ফকিররা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও তার মদত পুষ্ট জমিদারদের বিরুদ্ধে এই দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম পরিচালনা করেছিল। মজনুর সাংগঠনিক ক্ষমতা ও পির হিসেবে তার ব্যক্তিত্ব তাকে এমন এক পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিল যার পক্ষে ফকিররা পারস্পরিক স্বন্দে লিপ্ত থাকলেও তারা তার নির্দেশ মেনে চলত এবং এক সুসংহত জীবন চালাতে সমর্থ হয়েছিল। তার নেতৃত্বে ফকিররা অন্তর্কলহে লিপ্ত হোত না যার ফলে মজনুর নেতৃত্বে যে কটি অভিযান পরিচালিত হয়েছিল তার বেশীর ভাগই সফলতা লাভ করেছিল। মজনুর পরবর্তী পিরেরা যারা নেতৃত্বের পুরোভাগে এসেছিল তাদের সাংগঠনিক ক্ষমতা মজনুর তুলনায় অনেক নিম্নস্তর ছিল যার ফলে ফকিরদের আক্রমণের পরিমাণ যেমন একদিকে কমতে থাকে অন্যদিকে তারা পারস্পরিক কলহে লিপ্ত হয়ে পড়ে। তাদের সংগ্রামী চেতনা গনসংগ্রামের রূপ দিয়ে ছিল কিনা সে বিতর্কে প্রবেশ না করে একথা বলা প্রাসঙ্গিক যে মাদারি ফকিরদের সংগ্রাম ভারতীয় ইতিহাস চিন্তায় এক বিতর্কের সৃষ্টি করেছে।

তথ্যসূত্র :

- ১ Ananda Bhattacharya, "A critique to The Existing Hirtoriography of Sannyasi Rebellion" *Journal of History*, Department of History, Jadavpur University, 2004-2006, Vols. 22-23, Ananda Bhattacharyya, "Sannyasi and Fakir Rebellion in North Bengal" *Viswa Bharati Quarterly*, Vol. 13, Nos. 3 & 4, Vol. 14, 2006.
- ২ আনন্দ ভট্টাচার্য, মাদারি পির, *নন্দন*, জুলাই, ২০০৬, আনন্দ ভট্টাচার্য "বিদ্রোহী মাদারি সম্প্রদায়ের ইতিহাস" *অমৃতলোক*, ১০৮ সংখ্যা, ২০০৬।
- ৩ এম. আব্দুর রহমান, *বিদ্রোহী ফকীর নায়ক মজনু শাহ*, কলকাতা, ১৯৭১।
- ৪ আনন্দ ভট্টাচার্য, "গ্রামীন কবিতায় সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহের কাহিনী" *নান্দীমুখ*, ডিসেম্বর, ২০০৫; আনন্দ ভট্টাচার্য, "সাহিত্যের প্রেক্ষাপটে সন্ন্যাসী ও ফকীর বিদ্রোহ" *সৃজন*, মার্চ, ২০০৬।
- ৫ সুপ্রকাশ রায়, *ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গনতান্ত্রিক সংগ্রাম*, কলকাতা, ১৯৬৬, পৃ. ২০-৫৩
- ৬ Preparer of Reports to the Revenue Department 15 August 1782, pp. 322-26
- ৭ Sirajal Islam (ed.) *Bangladesh District Records : Dacca District*, Vol.I (1784-1787), Dacca, 1981, pp. 302-06. Deposition of Emaum Bucksh : *Judicial (criminal)* 23rd January 1795, Nos. 10-14.
- ৮ নির্মল গুপ্ত, *ঢাকার কথা*, কলকাতা, ১৩৬৬ পৃ. ৩৬-৩৭; চৌধুরী সামসুর রহমান, ঐ পৃ. ৬; Preparer of Reports to the Revenue Department, 25 June 1782, pp. 548-60, (WBSA) Controlling Council of Revenue at Murshidahad 25 Oct 1770 (WBSA).
- ৯ Revenue Department, 27 May 1783, No.7

- ১০ এ তথ্য মাক্‌ওয়ানপুরের দরগা শরীফ থেকে পাওয়া গেলেও যামিনীবাবু সরকারি নথির নিরীখে বলছেন, "His [Majnu] bones were carried to a famous burial place in the country of Mewat lying to the south ward to Dholly". (Letter from the Collector of Rungpore to the secy to the govt. 26 Jan 1788.
- ১১ Seema Alavi, *The Sepoys and the Company : Tradition and Transition in Northern India, 1770-1830*, OUP, Delhi, 1995, pp.12-23; 40-43.
- ১২ D.H.A. Kolff, "Sannyasi Trader Soldiers". *Indian Economic and Social History Review*, Vol.VIII, 1971; pp.213-218.
- ১৩ E. G. Glazier, *Notes on Rungpore*, Calcutta, 1876, Vol.II. p.5
- ১৪ Judicial (criminal) Proceedings, 21 Nov 1794, No.1; WBSA.
- ১৫ Revenue Department, 10 Dec 1776, No.53, Committee of Revenue, 23 Jan, 1783, pp.255-56
- ১৬ J. M. Ghosh, *Sannyasi and Fakir Raiders in Bengal*, Calcutta, 1938, p.107.
- ১৭ Board of Revenue Proceedings, 20 July 1787, No.4, WBSA
- ১৮ Dinajpur MSS Records, Vol.6, pp.242-43, Bangladesh National Archives Dhaka.
- ১৯ Letter from Capt. Alexander to the Collector of Rangpur, dated 25 March 1786, MSS. Rungpore Records, Vol.33 p.45.
- ২০ Judicial (criminal) Proceedings, 19 Sept 1794, No.7.
- ২১ Ghosh, *op.cit* p.112
- ২২ Letter from Karim shah to Raja Madhoo singh, Foreign (Political) Proceedings, 6 January 1795, National Archives of India, New Delhi.

[এই প্রবন্ধটি তৈরি করতে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লেখাগার, জাতীয় লেখাগার ও বাংলাদেশ জাতীয় লেখাগারের নথিপত্র ব্যবহার করা হয়েছে। Indian Council of Historical Research ও Indian Council of Social Science Research, New Delhi, আর্থিক অনুদান দেওয়ায় আমি তাদের কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ]

পরিষৎ - সংবাদ

৩১ ভাদ্র ১৪১৩ রবিবার ১৭ সেপ্টেম্বর ২০০৬ বিকাল সাড়ে পাঁচটায় পরিষৎ সভাঘরে শোভাবতী স্মারক বক্তৃতা প্রদান করেন ড. অনুরাধা রায়। তাঁর বক্তৃতার শিরোনাম 'বাংলা গণসংগীতের প্রথম যুগ'। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পরিষৎ সম্পাদক অধ্যাপক রমাকান্ত চক্রবর্তী।

১১ কার্তিক ১৪১৩ রবিবার বেলা দু-টায় পরিষৎ সভাঘরে বাংলা নাটক ও নাট্যমঞ্চের নানা দিক নিয়ে একটি আলোচনা সভা আয়োজিত হয়। প্রথম অধিবেশনে অংশ গ্রহণ করেন পরিষদের সহ-সম্পাদক শ্রী অলোক দাস ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক শ্রীশিবব্রত চট্টোপাধ্যায়। দ্বিতীয় অধিবেশনে বক্তব্য রাখেন নাট্যকার নির্দেশক শ্রীচন্দন সেন ও শ্রীদেবাশিস মজুমদার। দুটি সভায় সভাপতিত্ব করেন যথাক্রমে পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক পবিত্র সরকার ও নাট্যকার-নির্দেশক-অভিনেতা শ্রী অরুণ মুখোপাধ্যায়। স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন পরিষদের সম্পাদক অধ্যাপক রমাকান্ত চক্রবর্তী। সঞ্চালন করেন শ্রীরমেনকুমার সর।

১৭ কার্তিক ১৪১৩ শনিবার ৪ নভেম্বর ২০০৬, বিকেল সাড়ে পাঁচটায় পরিষৎ সভাঘরে কবি তরু দত্ত-র জন্মের সার্থ শতবর্ষ উপলক্ষ্যে আলোচনা সভায় বক্তা হিসেবে

উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক অলোক রায় ও অধ্যাপক পল্লব সেনগুপ্ত। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পরিষৎ সভাপতি অধ্যাপক পবিত্র সরকার।

১ পৌষ ১৪১৩ রবিবার বিকেলে সাড়ে পাঁচটায় পরিষৎ সভাঘরে মায়ারানি স্মারক বক্তৃতা দেন পরিষদের কোষাধ্যক্ষ এবং বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক অধ্যাপক অশোক রায়চৌধুরী। তাঁর বক্তৃতার বিষয় 'উনিশ শতকের রোমান্টিক কবিতা ও বাঙালির উত্তরাধিকার।' সভায় সভাপতিত্ব করেন পরিষৎ সভাপতি অধ্যাপক পবিত্র সরকার।

৭ পৌষ ১৪১৩ শনিবার ২৩ ডিসেম্বর ২০০৬ পরিষৎ সভাঘরে কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ম্যানাসক্রিপ্ট রিসোর্স সেন্টার ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের যৌথ উদ্যোগে একদিনের জাতীয় কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়, বিষয় 'ম্যানাসক্রিপ্টোলজি এণ্ড প্যালিওগ্রাফি'। বেলা দুটো থেকে বিকেল সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত এই কর্মশালায় উপস্থিত থেকে অংশ গ্রহণ করেন শ্রীসুবিনয় মিশ্র, শ্রীনীলাদ্রি মিত্র, শ্রীমতী অরুণা চট্টোপাধ্যায়, শ্রীঅজয় ঘোষ, শ্রীমতী মৃদুলা বেরা, শ্রীঅলোক দাস ও শ্রীমতী রত্না বসু। সভায় সভাপতিত্ব করেন পরিষদের সম্পাদক অধ্যাপক রমাকান্ত চক্রবর্তী।



১৪-১৫ পৌষ ১৪১৩ শনিবার/রবিবার ৩০-৩১ ডিসেম্বর ২০০৬ পরিষদ ভবনে 'বাজলির উনিশ-বিশ শতকচর্চা' বিষয়ে দু-দিনের আলোচনা সভা আয়োজিত হয়। আলোচ্য দু-দিনের সভার প্রথম দিনে 'উনিশ শতক চর্চা'র অধিবেশনে প্রথমে স্বাগত ভাষণ দেন। তারপর অংশগ্রহণ করেন শ্রীমতী অনুরাধা রায়, শ্রীহেমজিৎ চৌধুরী, শ্রীরমেন কুমার সর, শ্রীবারিদবরণ ঘোষ এবং শ্রীস্বপন বসু। সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীপবিত্র সরকার। দ্বিতীয় দিনে আলোচনার বিষয় 'বিশ শতক চর্চা', অংশ গ্রহণ করেন : শ্রীসৌমিত্র বসু, শ্রীসন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসুবিমল মিশ্র, শ্রীকল্যাণবন্ধু মিত্র, শ্রীমতী রুশ্মিতী সেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন পরিষৎ সম্পাদক শ্রীরমাকান্ত চক্রবর্তী। উভয় দিনের সম্মেলনায় দায়িত্ব পালন করেন পরিষদের সহ-সম্পাদক শ্রীঅলোক দাস।

প্রকাশন

সাহিত্য-সাধক-চরিত্রমালার ১৬৭ সংখ্যক গ্রন্থ হিসেবে অজয়কুমার নন্দী রচিত *প্রফুল্ল-চন্দ্র রায়* প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়াও যে-সব চরিত্রমালা গ্রন্থ ইতিমধ্যে নিঃশেষিত হয়েছে, সেগুলির মুদ্রণ যাতে পাঠকদের হাতে তুলে

দেওয়া যায় তার যথাযথ মুদ্রণ ব্যবস্থা খুব দ্রুত সম্পন্ন করা হবে।

অজিতকুমার চক্রবর্তীর সম্পাদনায় সপ্তদশ শতকের শ্রীহট্টের কবি ষষ্ঠীবর দত্ত বিরচিত *পদ্মাপুরাণ* বা *মনসামঙ্গল* পুথি মুদ্রণের কাজ চলছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই প্রথম সাহিত্য পরিষৎ থেকে কোনো মনসামঙ্গল পুথির মুদ্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হল।

গত ১৪১৩ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা*-র ১১৩ বর্ষ-১-২ সংখ্যা বৈশাখ-আশ্বিন ১৪১৩ প্রকাশিত হয়েছে। সংখ্যাটি শুরু হয়েছে নিতাপ্রিয় ঘোষের লেখা যুগপৎ বাংলা কবিতা আর অনুবাদ শীর্ষক প্রবন্ধ দিয়ে। আলোচ্য রচনাটি *পুষ্কলিঙ্গ* গ্রন্থের ১২৮ সংখ্যক কবিতা এবং তার ইংরেজি অনুবাদ প্রসঙ্গে লেখা। পরবর্তী ছটি নিবন্ধের বিষয়ও রবীন্দ্রনাথ, সেগুলি লিখেছেন যথাক্রমে সুতপা ভট্টাচার্য, কল্যাণ চট্টোপাধ্যায়, বীতশোক ভট্টাচার্য, অরুণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, সুমিতা চক্রবর্তী, মলয় রক্ষিত, অশোক মুখোপাধ্যায়। এই গুচ্ছে হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের নটি পত্র মুদ্রিত হয়েছে, যেগুলি তাঁর ছাত্র প্রবালকান্তি হাজরাকে লেখা। বাকি প্রবন্ধগুলি লিখেছেন সুভাষ ভট্টাচার্য, অনুরাধা রায়, প্রবাল দাশগুপ্ত, অভয়চরণ দে, মৃণাল ঘোষ, সুজিৎ ঘোষ, সুনীল সাহা, ত্রিপুরা বসু, অরুণজী সুর, এবং কেতকী কুশারী ডাইসন।

১৪১২ বঙ্গাব্দে উপহৃত পুস্তকের তালিকা

অনির্বাক্ষণ রায়চৌধুরী সাকরাইল স্টেশন রোড, হাওড়া-৭১১৩১৩।

(১) শবৎ সাহিত্যে আধুনিকতা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ — অনির্বাক্ষণ রায়চৌধুরী (২) রবীন্দ্রনাথ ও সোভিয়েত সংস্কৃতি — অনির্বাক্ষণ রায়চৌধুরী।

অনুপ মিত্র বিশেষ আধিকারিক তথ্য ও জনসংযোগবিভাগ কলকাতা পৌরসংস্থা।

কলকাতা পুরস্ৰী : ২০০৪ এপ্রিল — মার্চ ২০০৫।

অপূর্ব রায় ১৭/৫, বৈষ্ণবঘাটা রোড, কলকাতা-৪৭।

(১) বাংলা গদ্যচর্চা : বিদ্যাসাগর গোষ্ঠী — অপূর্বকুমার বায় (২) প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথের শেষের কবিতা — অপূর্বকুমার বায় (৩) কমলাকান্ত/বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — অপূর্বকুমার রায়।

অভয়চরণ দে ১৮৩, মিত্রপাড়া রোড নৈহাটি। উত্তর ২৪ পরগনা।

কথায় কথায় — অভয়চরণ দে।

অমরকৃষ্ণ চক্রবর্তী ১নং রমাপ্রসাদ রায় লেন, কলকাতা-৬।

দক্ষিণেশ্বর দক্ষিণ রায় — অমরকৃষ্ণ চক্রবর্তী।

অমলকুমার রায় ৩৫/১/ডি, হরি ঘোষ স্ট্রিট, কলকাতা-৬।

তদু দূরে তদু উ অস্তিকে — কিল্লব কৃষ্ণানন্দ

অচিন প্রকাশনী মৌলানা আজাদ রোড, হৃদয়পুর, উত্তর ২৪ পরগনা।

(১) উত্তরণ অমৃতকুণ্ডে — সুভাষচন্দ্র সেন (২) সূর্যী সাহিত্য সংস্কৃতি এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ — ব্রতীশ ঘোষ (৩) অচিন : ৪র্থ বর্ষ, বৈশাখ-চৈত্র ১৪১১।

অচিন্ত্য চক্রবর্তী ১৬/২/সি, পদ্মপুকুর রোড, পোঃ নাকতলা, কলকাতা-৪৭।

শিবদাস ভাদুড়ী এবং পঞ্চপাণ্ডবের ঘর — অচিন্ত্য চক্রবর্তী।

অজিত বসু ১৭, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলকাতা-৬।

বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র : এক কিংবদন্তি এক নস্টালজিয়া — অজিত বসু।

অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় ধান্যঝাটী, পোস্ট-বালা, ভায়া-চন্দ্রকোণা, জেলা-পঃ মেদিনীপুর।

জীবনের ছন্দে — অজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

অনিন্দিতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাগানপাড়া, শান্তিনিকেতন, বীরভূম।

(১) প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোট গল্প : মননে ও সৃজনে — অনিন্দিতা বন্দ্যোপাধ্যায় (২) ধ্রুবপথের স্মৃতি বেধা ও অন্যান্য — অনঙ্গ ব্রহ্ম, অনিন্দিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্পাদিত।

অনিন্দ্যবন্ধু গুহ পি ২১, রাজা বসন্ত রায় রোড, কলিকাতা-২৯।

(১) বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে প্রেম আর মৃত্যু — তপোব্রত ঘোষ (২) বিশ্বের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস ও ছোট গল্প, ৪র্থ খণ্ড।

৯৬ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১৩ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা

অনিরুদ্ধ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৬২, ড: এম. এন. সাহা রোড, শ্যামলা এপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট নং-৮, কলকাতা-৭৪।

বাকি রাতগুলো জ্বলতে দাও — অনিরুদ্ধ বন্দ্যোপাধ্যায়।

অমিত সেন — ৩৭, গৌরীবাড়ি লেন (৪র্থ তল), কলকাতা-৬।

(1) The Philosophers of Science : The World's great Thinkers – ed. by Saxe Commins & Robert N. Linscott (2) A Study of Indian Economics – Pramathanath Banerjee (3) Complete Works of Shakespeare (4) The Political Philosophers : The World's Great Thinkers (5) The Discovery of India – Jawaharlal Nehru (6) Lenin – V. Zevin & G. Golikov (7) The God-Seeker : A Novel by Sinclair Lewis (8) Labour Problems & Social Welfare in India – Ram Avtar (9) Selected Plays of Bernard Shaw, Vol-I (10) Selected Plays of Bernard Shaw, Vol-II (11) Selected Plays of Bernard Shaw, Vol-III (12) Brave New World – Aldous Huxley (13) Greatest Short Stories, Vol-IV – Collier (14) An Autobiography or The Story of My Experiments with routh – M. K. Gandhi (15) The City of Joy – Dominique Lapierre (16) My Early life – Winston S. Churchill (17) The Grapes of Wrath – John Steinbeck (18) The Speculative Philosophers : The world's Great Thinkers – Saxe Commins & Robert N. Linscott (19) The Complete Works of Swami Vive-kananda, Vol-I (20) The Complete Works of Swami Vive-kananda, Vol-II (21) The Complete Works of Swami Vive-kananda, Vol-III (22) The complete Works of Swami Vive-kananda, Vol-IV (23) The Complete Works of Swami Vive-kananda, Vol-V (24) The Complete Works of Swami Vive-kananda, Vol-V (25) The Complete Works of Swami Vive-kananda, Vol-VI (26) The Complete Works of Swami Vive-kananda, Vol-VII (27) Jean Christophe – Romain Rolland (28) The World's Great Thinkers (29) মার্কসের পর মার্ক্সবাদ — শমিত কর (30) জীন্স মেলা — প্রভাবতী দেবী (31) জেলখানা — কারাগার — নিকুঞ্জ সেন (32) গীত মাধুরী — ব্রজদুলাল দে (33) নাট্য গ্রন্থাবলী, পূর্ণাঙ্গ, ৪র্থ পর্ব — মন্মথ রায় (34) My First Love – Ivan Turgenev, ed. Stephen Graham (35) A Lotus for Miss Quon – James Hadley Chase (36) Trusted like the Fox – James Hadley Chase.

অমিতাভ মুখোপাধ্যায় সন্টলেক এ. সি. ৩৮/৬ কলকাতা।

২৫টি পৃথি।

অমিয়কুমার মুখোপাধ্যায় ৫৪-এ, প্রতাপাদিত্য প্লেস, কালীঘাট কলকাতা-২৬।

হিন্দুধর্মে বিজ্ঞান ও অধ্যাত্মবাদ — অমিয়কুমার মুখোপাধ্যায়।

অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, উৎকল প্রকাশনী ৪০, মহারাণী ইন্দিরা দেবী রোড, কলকাতা-৬০।

(১) এবং এই সময় : ২১ বর্ষ, ৭০ গ্রীষ্ম সংখ্যা ১৪১২ (২) এবং এই সময় : ২১ বর্ষ, ৭১ বর্ষা সংখ্যা ১৪১২। (৩) এবং এই সময় : ২১ বর্ষ, ৭৩ শীত সংখ্যা ১৪১২।

অরুণচাঁদ দত্ত ৩৯, ফিয়ার্স লেন, কলকাতা-

(১) মন্ত্রমুখ রাজপুত্র — লিওনিদ সোলোভিয়ভ (২) সৈনিকের দিনপঞ্জী — কে. রকোসোভস্কী।

অরুণা চট্টোপাধ্যায় ৩সি, শিবশঙ্কর মন্ডিক লেন, কলকাতা-৪।

(১) শব্দ শাব্দিক : ১০ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা ১৩৯২ (২) ডাকবুকে — মঞ্জিল সেন (৩) রামমোহনের গান ও বরলিপি — শিবানী রায় ও দেবাশিস রায় (৪) শারদীয়া আনন্দমেলা : ১৪১০ (৫) ইউক্রেনের লোককথা (৬) পশ্চিমবঙ্গে সাক্ষরতা অভিযান : জনশিক্ষা প্রসার বিভাগ, (৭) ভবঘুরের জার্নাল — হিমাংশু জানা (৮) আনন্দমেলা : পূজাবার্ষিকী, ১৪১২ (৯) Journal of the Asiatic Society Vol.XLVII. No-

2 (১০) Journal of the Asiatic Society Vol.XLVI. No-2 (১১) Journal of the Asiatic Society Vol.XLXII. No-1.

অর্পিতা রায়চৌধুরী প্রযত্নে : বাসন্তী রাণী দত্তচৌধুরী।

(১) কবিতার যাত্রা — অর্পিতা রায়চৌধুরী (২) কবিতায় বিশ্বভ্রমণ — অর্পিতা রায়চৌধুরী।

অলোককুমার লাহা ১, বেচু চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-

(১) লাহা পরিবারের কথা — অলোককুমার লাহা।

অশোক চট্টোপাধ্যায় সাইপালা, বসিরহাট।

সাংস্কৃতিক সমসময় : অক্টোবর ১৯৮৮ — এপ্রিল ২০০৫ (মোট ৬৭টি সংখ্যা)।

অশোক ভট্টাচার্য ১৭১, সুভাষনগর রোড, দমদম ক্যান্টনমেন্ট, কলকাতা-৬৫।

অবশেষে — অশোক ভট্টাচার্য।

অশোক ভট্টাচার্য এম-৬, বিদ্যাসাগর নিকেতন, বিধাননগর, কলকাতা-৬৪।

(১) সাম্প্রদায়িকতা — বদরুদ্দিন উমর (২) চিবছারী বন্দোবস্ত ও বাঙালি সমাজ — মুন্সতাসীর মামুন, সম্পাদিত (৩) আধুনিক কবিতা — রফিকুল ইসলাম, সম্পাদিত (৪) নীলবিদ্রোহের চরিত্র ও বাঙালী বুদ্ধিজীবী — তপোবিজয় ঘোষ (৫) রাতজাগার পালা — তপোবিজয় ঘোষ (৬) কাল চেতনার গল্প, ১ম খণ্ড — তপোবিজয় ঘোষ (৭) কালচেতনার গল্প, ২য় খণ্ড — তপোবিজয় ঘোষ (৮) নাগপাশ — সাধন চট্টোপাধ্যায় (৯) উপন্যাসের শিল্পরূপ — রণেশ দাশগুপ্ত (১০) শিল্পীর স্বাধীনতার প্রশ্নে — রণেশ দাশগুপ্ত (১১) নির্বাচিত গল্প — তপোবিজয় ঘোষ (১২) ইতিহাসের মানুষ — তপোবিজয় ঘোষ (১৩) শতবর্ষের আলোকে জলপাইগুড়ির নাট্যচর্চা — অপূর্বকুমার মুখোপাধ্যায় (১৪) বিলুপ্ত রাজধানী (১ম ও ২য় খণ্ড একত্রে) — উৎপল চক্রবর্তী (১৫) বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি — যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় (১৬) ভারতবর্ষ ও চীন — তারাক্ষর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৭) শিকড়ের খোঁজে মানুষ — তপন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮) মহাদিগন্তের কবি : জগন্নাথ চক্রবর্তী — সত্যেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (১৯) যুদ্ধ নয় শান্তি চাই — মুহম্মদ আবদুল খালেক (২০) সরস্বতী — কানাইলাল ভট্টাচার্য (২১) ঐতিহ্য, বিশ্বরণ ও শিক্ষকতার দায় — মুণালিনী দাশগুপ্ত (২২) গোপাল হালদার : কথা সাহিত্য — শৈলেন বিশ্বাস (২৩) উড়োমেঘ — সমীপকুমার গুপ্ত (২৪) নিষিদ্ধ নিম্বাস — জহরুল হক (২৫) নাট্যাচার্য শিশিরকুমার — শঙ্কর ভট্টাচার্য (২৬) মানুষ গড়ার কারিগর ডিরোজিও — মুণালিনী দাশগুপ্ত (২৭) মধুসূদন রচনাবলী — অজিতকুমার ঘোষ, সম্পাদিত (২৮) নদী মাটি অরণ্য ওষ খণ্ড — তপন বন্দ্যোপাধ্যায় (২৯) সামনে লড়াই — তপোবিজয় ঘোষ (৩০) নানাকথা — সবদার ফজলুল করিম (৩১) সামবেদীয় ছান্দোগ্যোপনিষদ — দুর্গাচরণ সাংখ্য বেদান্ততীর্থ (৩২) তলস্তয় প্রসঙ্গে তলস্তয় জন্মসার্থশতবর্ষ — প্রদ্যোৎ গুহ, তরুণ সান্যাল, অমল চট্টোপাধ্যায়, সম্পাদিত (৩৩) আত্মচরিত বোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি — মুনীন্দ্রকুমার রায় সম্পাদিত (৩৪) বঙ্কিম বচনা সংগ্রহ : উপন্যাস খণ্ড (৩৫) বঙ্কিম বচনা সংগ্রহ প্রবন্ধ খণ্ড ১ম (৩৬) বঙ্কিম রচনা সংগ্রহ প্রবন্ধ ২য় (৩৭) কোরক : জীবনানন্দ সংখ্যা (৩৮) প্রেতি ভাষাচার্য সুনীতিকুমার সংখ্যা (৩৯) Studies in Western Influence in Nineteenth Century Bengali Poetry - Harendra Mohan Dasgupta. (৪০) Indo-Bangladesh Relations - Badruddin Ummar (৪১) সারস্বত ১ম বর্ষ, আষাঢ় ১৩৭৫/শারদীয় ১৩৭৫/মা-চৈ ১৩৭৫/ (৪২) সারস্বত ২য় বর্ষ, বৈ-আ ১৩৭৬/শারদীয় ১৩৭৬/কা-পৌ ১৩৭৬/মা-চৈ ১৩৭৬ (৪৩) সাবস্বত কার্তিক-চৈ ১৩৮৫ (৪৪) সারস্বত শারদীয় ১৩৮৬ (৪৫) সারস্বত ১৪শ বর্ষ বৈ-আ ১৩৮৮/শারদীয় ১৩৮৮/কা-পৌ ১৩৮৮/মা-চৈ ১৩৮৮ (৪৬) সাবস্বত ১৪শ বর্ষ শারদীয় ১৩৯৩ (৪৭) সাবস্বত মা-চৈ ১৩৮৯ (৪৮) সাবস্বত শারদীয় ১৩৯১ (৪৯) জাগর জা-জুন ১৯৮৭।

অশোককুমার দে ২০ গ্রীন এডেনিউ, সন্তোষপুর, কলকাতা-৭৫।

সাহিত্যের সাত সতেরো — অশোককুমার দে।

৯৮ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১৩ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা

অশোককুমার রায় ১২/৫এ, বাবুবাগান লেন, কলকাতা-৩১।

(১) স্বপ্ননীল নীল আকাশ — অশোককুমার রায় (২) এক খেয়াতরী — অশোককুমার রায়।

আজকাল পাবলিকেশন ৯৬, রাজা রামমোহন সরণি, কলকাতা-৯।

(১) হলিডে হোম — পদ্মব বসুমতীক (২) উটকো সাংবাদিকের ডায়েরি — অশোক দাশগুপ্ত (৩) নেপথ্য ভাষণ, ১০ম — অশোক দাশগুপ্ত (৪) নাটক সংগ্রহ, ১ম — বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য (৫) ফিরে ফিরে চাই — অজয় বসু (৬) আরও কাছে — ইন্দ্রনীল সেন (৭) দুর্নীতির সাতকাহন — তুষার ভালুকদার (৮) সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় উপন্যাস সমগ্র ২ (৯) এক একটি দিন — আজিজুল হক (১০) ওড়িয়া গল্প সংকলন (১১) পদে পদে রামা — মীশাক্ষী দত্ত

আশাবরী পাবলিকেশন ২৪, ঠাকুর রামকৃষ্ণ লেন, হাওড়া-৭১১১০৪।

(১) The mind & work of Saral Chandra Bose – Prabhas Chandra Roy (২) কেমন সব নম্র শরীর — সুনির্মল কুণ্ডু (৩) ইতিহাসের নকশিকাথা — অনুনয় বন্দ্যোপাধ্যায় (৪) তুমি আমার পূর্ণ স্বরলিপি — বিজ্ঞানবিহারী নন্দী (৫) শয়তান — রমেন সাহিড়ী (৬) হো চি মিন — দিলীপ সেন, অনুবাদক (৭) কুরাশার বুকচিরে — শিশিরকুমার মাইতি (৮) আশাবরী : ২০০৫ জানু, আশাবরী : ২০০৫ এপ্রিল, আশাবরী : ২০০৫ জুলাই, আশাবরী : ২০০৫ অক্টোবর।

আদ্যাশক্তিপ্রসাদ রায় ফ্ল্যাট-৭, ব্লক-জেড, গভঃ হাউসিং এস্টেট, ভি. আই. পি. রোড, কলকাতা-৫৪।

মোট ৯৬ খানা পত্র-পত্রিকা দিবেছেন। (১) ২০০৫ এর ২৪ খানি (নিয়মিত সংখ্যা — দেশ) (২) ২০০৫ এর ১ খানি (পূজা সংখ্যা — দেশ) (৩) ১৪০৩ এর ১ খানি (শারদীয়া সংখ্যা — দেশ) (৪) ১৪০৬ এর ১ খানি (শারদীয়া সংখ্যা — দেশ) (৫) ১৪১১ এর ১ খানি (শারদীয়া সংখ্যা — দেশ) (৬) ২০০৬ এর ৮ খানি (জানুয়ারী-এপ্রিল — দেশ) (৭) ২০০৫ এর ১ খানি (আনন্দবাজার পত্রিকা) (৮) ১৪১০ এর মাঘ সংখ্যা — ১৪১২ পৌষ মোট ১২ খানি উদ্বোধন (৯) ১৪১১ এর মাঘ সংখ্যা ১৪১২ পৌষ ১২ খানি উদ্বোধন (১০) ২০০৪ এর জানুয়ারী-জুলাই মোট ৭ খানি জ্ঞান ও বিজ্ঞান (১১) ২০০৪ এর শারদীয়া থেকে ডিসেম্বর ৩ খানি জ্ঞান ও বিজ্ঞান (১২) ২০০৫ এর ফেব্রুয়ারি থেকে আগস্ট ৭ খানি জ্ঞান ও বিজ্ঞান (১৩) ২০০৫ এর শারদীয়া থেকে ডিসেম্বর ৩ খানি জ্ঞান ও বিজ্ঞান (১৪) ২০০৬ এর জানুয়ারি থেকে জুন ৬ খানি জ্ঞান ও বিজ্ঞান (১৫) ১৪১০ এর কার্তিক থেকে অগ্রহায়ণ ৪ খানি চরৈবেতি (১৬) ১৪১১ এর ফাল্গুন থেকে ১৪১২ অগ্রহায়ণ ৪ খানি চরৈবেতি।

আশিসকুমার দে সি/৭৬, দক্ষিণী সমবায় আবাসন, পর্যায়-২, কলকাতা-১৮।

(১) মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য : ভাষাপট ও ভাবকথা, ১ম খণ্ড — আশিসকুমার দে, (২) স্মৃতির আরোকা — আশিসকুমার দে।

আশুতোষ ভট্টাচার্য রাহা কমপ্লেক্স, ২৪ নিউ পঞ্চাননভালা রোড, ফ্ল্যাট-বি/৩, কলকাতা-৫৬।

মাস্টারমশাই শ্রীম — আশুতোষ ভট্টাচার্য।

অ্যাকাডেমিক পাবলিশার্স ১২/১এ, বক্স চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩।

সংস্কৃতির উৎস সন্ধান (প্রবন্ধ সংকলন) : বঙ্গ সম্মেলন ২০০৫।

ইন্দিরা মুখোপাধ্যায় ২৬/২এ, ডুবনমোহন ব্যানার্জী রোড, বেশঘরিয়া, কলকাতা-৫৬।

(১) প্রবন্ধ সংকলন : সংস্কৃত ও বাংলা সাহিত্যের নানাদিক — ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়।

ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী ৩৯৬, শহীদ কুদিরাম বসু সরণী, কালিদাসী পশ্চিম, কলকাতা-৩০।

(১) বঙ্গরঙ্গমঞ্চে লোকসংগীত — দেবজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় (২) মায়ী পৃথিবীর স্বরঃ কবি মৃণাল বসু চৌধুরীর কবিতা — শুভব্রত চক্রবর্তী সম্পাদিত (৩) গালিষ : নির্বাচিত কবিতা — জ্যোতিষ্ময় চাকী,

শঙ্খ ঘোষ, সম্পাদিত (৪) ধর্ম মানবিকতা নজরুল — কৃষ্ণা ভৌমিক (৫) ভারত বীণা ও অন্যান্য সনেট কবিতা — দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্পাদিত (৬) ছোটগল্পের ভাষা সময়ের ভাষা — অর্ণব সেন (৭) কালজয়ী বাংলা নাটক : পুনর্বিচার — রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (৮) শতবর্ষের আলোকে জলপাইগুড়ির নাট্যচর্চা — অপূর্বকুমার মুখোপাধ্যায় (৯) হিংসা প্রেম স্বদেশচিন্তা — অন্নান দত্ত (১০) একালের কবিতায় দূর কালের কথা — ভাবতী দত্ত (১১) লালন সাঁই-এর গান — শক্তিমান্থ বা (১২) প্রসঙ্গ দেবী রায় — স্বরাজ সেনগুপ্ত, সম্পাদিত (১৩) ভারতীয় নৃত্যে ত্রয়ী (জয়দেব, চৈতন্যদেব ও রবীন্দ্রনাথ) — মহুয়া মুখোপাধ্যায় (১৪) সিনেমার ভাষা — ধীমান দাশগুপ্ত (১৫) সমকালীন উর্দুগল্প সংকলন — মিহির ভট্টাচার্য (১৬) গ্যাচশঙ্খের খোঁজে — সুতপা ভট্টাচার্য (১৭) খেলা ও হিন্দুস্থানী সংগীতের অবক্ষয় — কুমারপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, (১৮) পাবলো নেবুদার রচনা সংগ্রহ — মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুবাদ ও সম্পাদনা।

ইভা চক্রবর্তী ৩৭-এ, সত্যম অ্যাপার্টমেন্ট, মতিঝিল অ্যাভিনিউ, কলকাতা-৭৪।

(১) হাতে খড়ি — ইভা চক্রবর্তী।

ইলা সাহা ২৬২ জি. টি. বোড উত্তরপাড়া, কলকাতা-৭১২২৫৮।

(১) কাশীর সচল বিশ্বনাথ (মহাযোগেশ্বর তৈলঙ্গস্বামী) — কালীমোহন মুখোপাধ্যায় ও ইলা সিন্হা (সাহা)।

উষা রায় ২৪৩ এন, ভুবনমোহন রায় রোড, কলকাতা-৮।

(১) আশ্রয় — উষা রায় (২) সৌন্দা মাটির ছাণ — উষা রায় (৩) যদি জ্ঞানতেম — উষা রায়।

এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স ১৪, বঙ্কিম চট্টাচার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩।

(১) ভুবনপুরের উপাখ্যান — নন্দলাল পাল (২) সাহিত্য শিল্প : নানা প্রসঙ্গ — বাঁধন সেনগুপ্ত (৩) রবীন্দ্রনাথ ও ন্যাশানালিজম — আশিস সান্যাল (৪) ফরাসী কবিতার একাল — আশিস সান্যাল ও প্রীতি সান্যাল (৫) বিনাশের পথ : মনস্বী প্রভাসচন্দ্র ও সমকালীন বঙ্গসমাজ — প্রদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়।

কবিতা পাল ১৩৪/৩, চন্দ্রশেখর মুখার্জি স্ট্রিট, কোমগর, হুগলি।

(১) রচনা সত্তায় — সুশান্তকুমার পাল

কমল চৌধুরী ২৩৩ বিবেকানন্দ সরণি, কুলুপুকুর, বারাসাত কলকাতা-১২৪।

(১) স্বপ্ন এবং অন্যান্য নীলিমা — অভিজিৎ সেন (২) জীবনানন্দ : উপন্যাসের ভিন্নস্বর — পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় (৩) ওড়াউড়িতে নয় — অরুণ মিত্র (৪) ফুলের মানুষ — ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় (৫) প্রত্নভূমিতে কুচকাণ্ডরাজ — স্বপন সেন (৬) দাবু নিরঞ্জন — রবিশংকর বল (৭) নির্বাচিত গল্প — ভগীরথ মিশ্র (৮) বিপরীত যুদ্ধের মহড়া — অনিল ঘড়াই (৯) মূর্তি — মহাশ্বেতা দেবী (১০) চরপূর্ণিমা — ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় (১১) বিবির মিথ্যা তালুক ও তালুকের বিবি — আফসার আমেদ (১২) অনু পাঁচালি — স্বপা গুপ্ত (১৩) ভগীরথ মিশ্রের ছোট গল্প (১৪) মুলারাক্স — সুরঞ্জন প্রামাণিক (১৫) কবি বন্দ্যবীণা গাঙ্গুলি জীবন ও মৃত্যু — মহাশ্বেতা দেবী (১৬) সুন্দরবন শিশু সাহিত্যের আকরভূমি — মনোরঞ্জন পুরাকাইত (১৭) হাতের মুঠোয় ডায়াবেটিস — শ্যামল চক্রবর্তী (১৮) হরিণের হাড় — স্বপ্নময় চক্রবর্তী (১৯) চলো দুবাই — স্বপ্নময় চক্রবর্তী (২০) মুখোশ যোদ্ধা — স্বপন সেন (২১) সাধুকালার্টান সমগ্র — শ্যামল চক্রবর্তী (২২) মৃগয়া — ভগীরথ মিশ্র (২৩) সবস তারাপদ রায় (২৪) জীবনধারা — সঞ্জল দাশগুপ্ত (২৫) রাধা চূড়ার বাঁশী — আশুতোষ মুখোপাধ্যায় (২৬) অরুন্ধতী তারার রাত — অমর মিত্র (২৭) সাম্প্রতিক — মহাশ্বেতা দেবী (২৮) লক্ষ্মীর সন্ধানে — শংকর (২৯) প্রত্নকন্যা — সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় (৩০) হিরো : একটি ব্লু প্রিন্ট — মহাশ্বেতা দেবী (৩১) মাটি ও শিকড় বাকড় — জয়া মিত্র (৩২) ক্ষুধা — মহাশ্বেতা দেবী (৩৩) কালপরশুর ধারাবাহিক — জয়া মিত্র (৩৪) অর্ধেক খোলা জানালা — অতনু মুখোপাধ্যায় (৩৫) গন্ধ — নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায় (৩৬) বন্দোবস্তী — মহাশ্বেতা দেবী (৩৭) সুটকেসের উপর বসে আছি —

সামসুল হক (৩৮) মহুল সুখার চিঠি — বুদ্ধদেব গৃহ (৩৯) আডকাঠি — ভগীরথ মিশ্র (৪০) গৌরী — অজিত কৌর (৪১) দোজখের ফেরেশতা — সোহাব হোসেন (৪২) আকাশ মাটির লড়াই — অনিল ঘড়াই (৪৩) যুধান কথা — সুকান্তি দত্ত (৪৪) প্রসঙ্গ পথের পাঁচালি — পাথজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় (৪৫) শ্রেণীশত্রু — গৌর মিত্র (৪৬) মহাকালের জাডক — সমীরণ দাস (৪৭) শ্রেষ্ঠ গল্প — বুদ্ধদেব গৃহ (৪৮) প্রতি ৫৪ মিনিটে — মহাশ্বেতা দেবী (৪৯) একা — অভিজিৎ সেনগুপ্ত (৫০) বর্ণ পরিচয় — অসীম ত্রিবেদী (৫১) আই. পি. সি. ৩৭৫ — মহাশ্বেতা দেবী (৫২) মানুষের ঘরবাড়ি — অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় (৫৩) ঋতুর শ্রাবণ — বুদ্ধদেব গৃহ (৫৪) ছবি বসুর রচনা সংকলন — (৫৫) বিদ্যাধরী ও বিবাদী লখিন্দর — অভিজিৎ সেন (৫৬) ম্যালরির কুঠার — কিম্বর রায় (৫৭) পরীযান ও অন্যান্য গল্প — অনিল ঘড়াই (৫৮) কালো বোরখার বিবি ও কুসুমের গল্প এবং চল্লিশজন লোক — আফসার আমেদ (৫৯) অভিজিৎ সেনগুপ্তের ছোটগল্প (৬০) কৃষ্ণা দ্বাদশী — মহাশ্বেতা দেবী (৬১) নাটকের — শীলা মজুমদার (৬২) ম্যাজিশিয়ান — কৃষ্ণেন্দু পালিত (৬৩) সঙ্গ নিঃসঙ্গ — আফসার আমেদ (৬৪) সিদ্ধকামিনী — শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় (৬৫) কর্ণেলের আরো — সৈরদ মুস্তাফা সিরাজ (৬৬) পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের কাব্য সংগ্রহ (৬৭) আলাদিন ও অ্যালাদিন — সুকান্তি দত্ত (৬৮) অমর মিত্রের ছোট গল্প (৬৯) দেবর্ষি সায়গীর ছোট গল্প (৭০) দীপঙ্কর দাশের ছোটগল্প (৭১) কোজাগর — বুদ্ধদেব গৃহ (৭২) কোয়েলের কাছে — বুদ্ধদেব গৃহ (৭৩) সাবৎ মিঞা — বুদ্ধদেব গৃহ (৭৪) অলীক আড়াল — তৃণাঙ্কন গঙ্গোপাধ্যায় (৭৫) অন্তর্মনা — জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায় (৭৬) নাটক রক্তকরবী — শঙ্কু মিত্র (৭৭) নৈষতে মেঘ — মহাশ্বেতা দেবী (৭৮) বেসুচনের সেনা — মহাশ্বেতা দেবী (৭৯) সাদা বেল কুড়ি — দীপঙ্কর দাস (৮০) সাহিত্য চিন্তায় এলোমেলো — মৃত্যুঞ্জয় সেন (৮১) শ্রেষ্ঠ গল্প — শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় (৮২) কঠে তুলে আনতে চাই — রফিক আজাদ (৮৩) ট্যাংকি সাফ — শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় (৮৪) ছায়া মানুষ — সোহাব হোসেন (৮৫) জন সমুদ্র — অমর মিত্র (৮৬) নীল ছবি — মহাশ্বেতা দেবী (৮৭) প্রথম প্রবাস — বুদ্ধদেব গৃহ (৮৮) আলো নেই — শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় (৮৯) দ্বিতীয় বিবি — আফসার আমেদ (৯০) খণ্ড বিখণ্ড — আফসার আমেদ (৯১) আত্মপরিচয় — আফসার আমেদ (৯২) অয়দিপাউস ও পুতুল বেলা — শঙ্কু মিত্র (৯৩) মহুয়াকে — বুদ্ধদেব গৃহ (৯৪) স্তনদায়িনী ও অন্যান্য গল্প — মহাশ্বেতা দেবী (৯৫) মার্ডারারের মা — মহাশ্বেতা দেবী (৯৬) শতাব্দী শেষের গল্প — মীনাঙ্কী সেন (৯৭) মানুষে অমানুষে — দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (৯৮) দীনেশচন্দ্র রচনাসংগ্রহ (৯৯) গৃহা — মতিয়ার রহমান পাটোয়ারী (১০০) মানুষের মহিমা — প্রফুল্ল বায় (১০১) কেন মেঘ আসে — সোমা দাস (১০২) চোরাবালি — সুনীল ঠাকুর।

কবুগাকান্তি ভট্টাচার্য ২৪ নন্দ ঘোষের লেন, ফটক গোড়া চন্দননগর, হুগলি।

(১) কথকতার ২টি পৃথি।

কলেজস্কোয়ার সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি ৫৩ কলেজস্কোয়ার, কলকাতা-৭৩।

(১) স্যুভেনির : ২০০৪ (২) স্যুভেনির : ২০০৫।

কল্পনা ধর বাগবাজার স্ট্রিট, কলকাতা-৩।

(১) মনের আকাশ — কল্পনা ধর।

কানাইপদ রায় বারাকপুর।

(১) মঙ্গল পাণ্ডে : একটি অবিচারের কাহিনি — কানাইপদ রায় (২) উত্তর চব্বিশ পরগনার সেকাল একাল : ৩য় খণ্ড — কানাইপদ রায়, সম্পাদিত।

কানাইলাল দত্ত

(১) গোপালচন্দ্র মজুমদার : একালের শিক্ষা ভাবনা — কানাইলাল দত্ত ও অত্র ঘোষ সম্পাদিত।

কারুকথা সোদপুৰ উত্তর চব্বিশ পরগনা, কলকাতা-১১০।

(১) আতারাঙ্গী সর্দা ও অন্যান্য গল্প — সুদর্শন সেনশর্মা (২) রাত তিনটের কবিতা — মণিহৃষণ ভট্টাচার্য

(৩) অনাদি আচার্যের কবিতা — অনাদি আচার্য (৪) মানচিত্রের লোকজন — পার্থপ্রতিম কুণ্ড (৫) রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস অথবা বিন্দুমাধব ভট্টাচার্যের লঠন — সমীর চৌধুরী (৬) দেখা সাক্ষাৎ — অরবিন্দ গুহ।

ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল করপোরেশন ৫ সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী বোড, কলকাতা-১৩।

(১) Calcutta Plan of Action for Children 1995 (২) অরবিন্দের যোগ — অরুণ শীল (৩) Death & Resurrection of a Rebin Red Breast – Rajsekhar Sahu (৪) ধন্যায়তনের এই (বাংলা ভাষা, মানব ভাষা) : ওয় শশু — অসিত চক্রবর্তী।

গণেশচন্দ্র গুহ ৬৭ ত্রিপুরা রায় লেন, ফ্ল্যাট ৪০১, সালকিয়া, হাওড়া-৭১১১০৬।

(১) নির্বাচিত বিচিত্র গল্প সংকলন — গণেশচন্দ্র গুহ (২) Poesy – Ganesh Chandra Guha (৩) রহস্যভেদী সত্য দত্ত — গণেশচন্দ্র গুহ।

গল্পগুচ্ছ, সম্পাদক ৬৪, সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট, কলকাতা-৯।

(১) গল্পগুচ্ছ : শারদ সংখ্যা ১৪১২ (২) গল্পগুচ্ছ শীত ১৪১২, বইমেলা সংখ্যা।

গোবিন্দ ভট্টাচার্য সি ৪/৫ লাবণি, সন্টলেক কলকাতা-৬৪।

(১) শোভা ভট্টাচার্য স্মরণীয়াসু (২) সত্য ভিতবে বাহিরে — গোবিন্দ ভট্টাচার্য।

গৌরী মিত্র বি জে ১২, সেক্টর-২, সন্টলেক-৯১।

(১) বীশুস্ট্রিট — গৌরী মিত্র (২) গৌতম বুদ্ধ — গৌরী মিত্র (৩) গ্যালিলেও — গৌরী মিত্র (৪) ভূমিকম্প — গৌরী মিত্র (৫) নানক — গৌরী মিত্র (৬) স্মরণকথা — রাণী পাল ও গৌরী মিত্র (৭) আগ্নেয় গিব্বি বৃপরেখা — গৌরী মিত্র (৮) কাঞ্চল হরিনাথ — গৌরী মিত্র (৯) পাখি পরিচয় — গৌরী মিত্র।

জয়ন্তী চক্রবর্তী ২৯এ, রাণী হর্ষমুখী রোড, কলকাতা-২।

(১) সীমান্ত পেরিয়ে — জয়ন্তী চক্রবর্তী।

জহর সরকার ১৭টি, ডোডার টেরেসা, কলকাতা-১৯।

(১) The Construction of the Hindu Identity in Medieval Western Bengal Or The Role of Popular Cults.

তনুজ লস্কর ৫১/৩, রাণী হর্ষমুখী রোড, পাইকপাড়া, কলকাতা-২।

(১) ববণীয় বৈজ্ঞানিক — তনুজ লস্কর (২) ববণীয় বৈজ্ঞানিক ও আবিষ্কারক — তনুজ লস্কর, (৩) প্রথম ১০০ বাঙালি — তনুজ লস্কর।

তপনকুমার রায় বি/১৫, সুকান্তপল্লি, দুর্গাপুর-১।

(১) দিনযাপনের দিনলিপি — তপনকুমার রায়।

তাপস ভৌমিক কোরক কার্যালয়, দেশবন্ধুনগর, ই এ ১/৮ বাগুইআটি, কলিকাতা-৫৯।

(১) কোরক : উপেন্দ্রকিশোর সংখ্যা, বইমেলা, ২০০৫।

তুলি কলম ১, কলেজ রো, কলকাতা-৯।

(১) পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিকার কাহিনী — অমিয়কুমার চক্রবর্তী, স. (২) গীতাঞ্জলি — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (৩) গল্পগুচ্ছ — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (৪) সঙ্ঘটিত — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (৫) গীতবিতান — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (৬) নির্বাচিত গল্পগুচ্ছ — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (৭) সেকালের শিক্ষা গুণ — হারাধন দত্ত (৮) ছোটদের সেরা সংকলন — বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (৯) ডিটেকটিভ অমনিবাস — প্রীতিপাল চৌধুরী (১০) পঞ্চাশ চোবের গল্প — শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় (১১) বুপোলি পর্দা : চলচ্চিত্রায়িত কাহিনী সমগ্র — সুবোধ ঘোষ, (১২) সবসেবা হাসির গল্প — পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় (১৩) পাশ্চাত্য কবিতার অনুবাদে রবীন্দ্রনাথ —

১০২ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১৩ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা

কালিসাধন মুখোপাধ্যায় (১৪) প্রফেসর চ্যালেঞ্জার সমগ্র — শুভপতি দত্ত, স. (১৫) সেরা গোয়েন্দা রহস্য — মহিন্দ্র, বসু স (১৬) খেলার গল্প — রূপক সাহা, স. (১৭) দুই বাংলার রূপকথা — অজয়কুমার চক্রবর্তী (১৮) পঞ্চতন্ত্রের গল্প

দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সংঘ আদ্যাপীঠ, দক্ষিণেশ্বর।

আদ্যাপীঠ মাতৃপূজা (১). ২৭ বর্ষ : সংখ্যা ১ (শারদীয়া সংখ্যা) ১৪১১ (২) ২৭ বর্ষ : চৈত্র সংখ্যা ১৪১১ (৩) ২৭ বর্ষ : শারদীয়া সংখ্যা ১৪১২ (৪) ২৭ বর্ষ : অগ্রহায়ণ সংখ্যা ১৪১২ (৫) ২৭ বর্ষ : পৌষ সংখ্যা ১৪১২ (৬) ২৭ বর্ষ : মাঘ সংখ্যা ১৪১২।

দীপায়ন ১০ নং কেশব সেন স্ট্রিট, কলকাতা-৯।

(১) বসন্তরঞ্জনের প্রবন্ধাবলি ও শতপুথির সংকলন — শান্তি সিংহ, সম্পাদিত।

দেবপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩, লক্ষ্মীনারায়ণ মুখার্জী রোড, কলকাতা-৬।

(১) চৈতন্য লাইব্রেরি, মে ১৯৮০, চৈতন্য লাইব্রেরি ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭, চৈতন্য লাইব্রেরি জুলাই ১৯৯৪
(২) বাংলা সাময়িক পত্রিকার তালিকা : চৈতন্য লাইব্রেরি, ১ম ভাগ (৩) কেদার রচনাবলী (৩য়) — কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (৪) সেকলে কথা : শতক সূচনায় মেয়েদের স্মৃতিকথা — অভিজিৎ সেন ও অভিজিৎ ভট্টাচার্য (৫) কেদার রচনাবলী (১ম) — কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

দেবব্রত মণ্ডল বি এ, ১৮০ সেন্টলেক (বিধাননগর) কলকাতা-৬৪।

(১) রূপ অপরূপ অঘোষা — দেবব্রত মণ্ডল (২) বিজ্ঞান সাধক গোপালচন্দ্র — দেবব্রত মণ্ডল (৩) নানা চোখে প্রকৃতি-বিজ্ঞানী গোপালচন্দ্র — দেবব্রত মণ্ডল (৪) পঞ্চব্যঞ্জন : নিরামিষ — শর্বাণী মণ্ডল (৫) আমিষ নিরামিষের যুগলবন্দী — শর্বাণী মণ্ডল।

দে'জ পাবলিশিং ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩।

(১) অনিন্দিতা দেবীর রচনা সংকলন (২) কারিগরি কল্পনা ও বাস্তব উদ্যোগ — সিদ্ধার্থ ঘোষ (৩) পতিসরে রবীন্দ্রনাথ — সাইফুদ্দীন চৌধুরী (৪) হাংরাস — সুভাষ মুখোপাধ্যায় (৫) শিক্ষক লেখক : অবুৎকুমার মুখোপাধ্যায় (৬) সুভাষ মুখোপাধ্যায় : কথা ও কবিতা (৭) ফাঁদ — বরেন গঙ্গোপাধ্যায় (৮) সরলাদেবী চৌধুরাণীর নির্বাচিত প্রবন্ধ সংকলন (৯) আলোহো কাপেঙ্জিয়েব-এর রচনা সংগ্রহ (১০) সাময়িক পত্রে সমাজ চিত্র : সঞ্জীবনী — কানাইলাল চট্টোপাধ্যায়, (১১) রাধাশ্যাম রায় ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ — অজিতকুমার চট্টোপাধ্যায় (১২) সাতরঙ, ১ম খণ্ড — রবি বসু (১৩) সাতরঙ, ২য় খণ্ড — রবি বসু (১৪) বাগদা — বরেন গঙ্গোপাধ্যায় (১৫) মেলা ভাঙ্গর খেলা — হীরেন্দ্রনাথ দত্ত (১৬) এই রাজ্য — অঞ্জন বসু (১৭) গৌরী আইয়ুব স্মারক গ্রন্থ : কৃতজ্ঞতার অশ্রুবিন্দু — মীরাতুন নাহার (১৮) প্রবন্ধ সংগ্রহ — দক্ষিণারঞ্জন শাক্তী (১৯) স্বাধীনতা ৫০ পেরিয়ে — কমল চৌধুরী (২০) উনিশ শতকে পূর্ব বাংলার সংবাদ সাময়িকপত্র — মুনতাসীব মামুন (২১) ইতিহাস ও সংস্কৃতি : আচার্য প্রবোধচন্দ্র সেন জন্মশতবর্ষ স্মারক গ্রন্থ (২২) গোবিন্দদাসের কড়চা — মধুসূদন কর্মকার (২৩) হৃদয়ের উচ্চারণ — অমলকুমার মুখোপাধ্যায়, সম্পাদিত (২৪) প্রতীকী শিক্ষা প্রতিবেদন, (১ম ও ২য়) (২৫) শত সানুদেশ : শঙ্খ ঘোষ-এর ৭২তম জন্মদিন।

দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ গোস্বামী ১৬০ বিরাডিঙ্গি, হাওড়া-৮।

(১) The Ranglongs of Tripura – D. N. Goswami

ননীগোপাল দাশ ২০বি ২০সি/১, দত্তাবাদ রোড সেন্টলেক, কলকাতা-৬৪।

(১) ব্রাহ্মণ্যবাদ ধ্বংস হোক — ননীগোপাল দাশ (২) প্রতিবাদী প্রবন্ধ — ননীগোপাল দাশ।

নবপত্র প্রকাশন ৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩।

(১) মনোরোগ ও মনোচিকিৎসা — সুবীর চট্টোপাধ্যায় (২) শঙ্করাচার্যের আনন্দলহরী — চৈতালী দত্ত

সম্পাদিত (৩) তুলসীদাসের দৌহাবলী — চৈতালী দত্ত (৪) শ্রীচৈতন্যের জীবন ও দর্শন — বরুণকুমার দত্ত (৫) কৃতীজনের সান্নিধ্য — প্রসূন বসু (৬) রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য প্রসঙ্গ — অনুনয় চট্টোপাধ্যায় (৭) গৃহধর্ম — শিবনাথ শাস্ত্রী।

নাড়ুগোপাল দে কাশীপুর মাইকেল মধুসূদন মহাবিদ্যালয় পঞ্চকোট রাজ্য, পুর্বুলিয়া।

(১) অপ্রকাশিত বঙ্কিম প্রবন্ধ এবং নানা প্রসঙ্গ — নাড়ুগোপাল দে। (২) বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধ : বিষয় ও আঙ্গিক — নাড়ুগোপাল দে।

নিতাই দাসী এ/৫২৪ এইচ. বি. টাউন, সোদপুর।

(১) শ্রীশ্রী হরিচাঁদ ঠাকুর ও মতুষা সম্প্রদায় — নিতাই দাসী।

নির্মলকুমার চট্টোপাধ্যায় ১১ শ্যামাপ্রসাদ রোড, কোমগব, পোঃ নবগ্রাম, জেলা-হুগলি।

(১) সাক্ষী আমি তুমি আমি — নির্মলকুমার চট্টোপাধ্যায় (২) ভেলোরের পথে — নির্মলকুমার চট্টোপাধ্যায় (৩) কোন অজানার টানে — নির্মলকুমার চট্টোপাধ্যায়।

নির্মল বুক এজেন্সি ৮৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭।

(১) আমাদের জীবজন্তু — কমল চৌধুরী (২) দিন বদলের গল্প — কমল চৌধুরী, সম্পাদিত (৩) মাসিক বসুমতী রচনা সংগ্রহ — কমল চৌধুরী (৪) আমাদের গাছপালা — কমল চৌধুরী (৫) ১৩টি কিশোর উপন্যাস — কমল চৌধুরী, সম্পাদিত (৬) তিন চালে মাত — কার্তিক মন্ডিক (৭) স্মৃতির সৌরভ — শ্রীচক্রবর্তী (৮) বাহা বাহান তাহা তিপাম — তাবাপদ রায় (৯) বিস্মৃত প্রায় বাঙালি মহিলা কবি — সুনীলময় ঘোষ (১০) বঙ্গদেশের হৃদয় হতে — সুনীলময় ঘোষ (১১) ভালবাসার ঋতু — তৃণাঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায় (১২) অচেনা অজানা বিবেকানন্দ — শংকর (১৩) সাহিত্যের আনন্দের ভোজে — তারাপদ রায় (১৪) মনোরম বনভূমি — অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৫) জীবসহস্র — মিলন মুখোপাধ্যায় (১৬) সত্যাষেযী শরদিন্দু — নিতাই বসু।

ডাঃ নীলমণি বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মশতবার্ষিকী সমিতি ২০৪-ই শঙ্কু চরণ চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কোমগর হুগলি-৭১২২৩৫।

(১) শতবর্ষের আলোকে ডাঃ নীলমণি বন্দ্যোপাধ্যায় : স্মারক গ্রন্থ (২) ডাঃ নীলমণি বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সংগ্রহ।

নীলরতন মুখোপাধ্যায় রূপসী বাংলা, প্রযত্নে : কুইন প্রেস ৩৫, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯।

(১) পশ্চিম হিমালয়ের কোলে — নীলরতন মুখোপাধ্যায়।

নীলোৎপলা বসু ৮২ জি. বি. রি. এম. বি. সরণী, ভদ্রকালী, হুগলি।

(১) শত্ৰুনাথ পণ্ডিত : প্রথম ভারতীয় বিচারপতি — চিন্ময়ী পণ্ডিত দত্ত এবং অমলেশ চন্দ্র দত্ত।

নীলাদ্রিশেখর দাস ৫৫ গ্রীণ পার্ক, নরেন্দ্রপুর, কলকাতা-১০৩।

(১) ভাষাংশ সংগ্রহ ও আধুনিক ভাষা বিজ্ঞান — নীলাদ্রিশেখর দাস।

পত্রভারতী ৩/১ কলেজ রো, কলকাতা-৯।

(১) ভয়ঙ্করের জীবনকথা — দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (২) বাংলায় গণ আন্দোলনের ছয় দশক — কমল চৌধুরী (৩) অপবিত্র রূপকথা — তপনকুমার দাস ও ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় (৪) বার্ষিক শিশুসাধী, পুনর্মুদ্রণ, ১৩৩৩ (৫) কিশোর ভারতী : সেরা সমগ্র, ১৩৭৫-১৪০৪।

পবিত্র চক্রবর্তী চাকদহ, নদীয়া।

(১) বাংলা লোকসংস্কৃতিচর্চায় মহিলা অবদান — পবিত্র চক্রবর্তী।

পবিত্র সরকার ২১ কেন্দ্রীয়া মেন রোড, সৈজুতি, কলকাতা-৮৪।

(১) কাশবনের কন্যা — শামসুদ্দীন আবুল কালাম (২) মল্লারপুর — সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় (৩) চাপরাশ — বুদ্ধদেব গুহ (৪) আনিসুজ্জামান : সংবর্ধনা-স্মারক।

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি ১/১, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা-২০।

(১) বৃশ সাহিত্যের ইতিহাস — অরুণ সোম (২) বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধ সংগ্রহ, ১ (৩) প্রবন্ধ সংগ্রহ — রেজাউল করীম (৪) কল্যাণীয়েষু প্রশান্ত — প্রশান্তকুমার পাল (৫) সীওতালি ভাষার সহজ পাঠ — ধীরেন্দ্রনাথ বাসকে, অনিমেষকান্তি পাল (৬) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর — অরুণেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (৭) Gandharva Poem-Sankha Ghosh (৮) বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান — বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য (৯) রমেশচন্দ্র সেন — তপস্যা ঘোষ (১০) মধুবাতা ঋতায়ত — অরুণেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১১) রবীন্দ্র অনুরতী — সতীশচন্দ্র রায়।

পাণ্ডুলিপি ১৬, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩।

(১) প্রসঙ্গ : চন্দ্রশেখর — দেবদ্যুতি বন্দ্যোপাধ্যায় (২) রবীন্দ্র নাট্যে কবি রবীন্দ্রনাথ — শ্রুতিনাথ চক্রবর্তী (৩) অবিজ্ঞানের কারচুপি — সজ্জলকান্তি দাশগুপ্ত (৪) সতীনাথ ভাদুড়ী : অধেষণে অনুভবে — তরুণ মুখোপাধ্যায় (৫) প্রসঙ্গ : চোখের বালি — মানবেন্দ্রনাথ দত্ত (৬) প্রসঙ্গ : একালের বাংলা কবিতা — সূর্যাস্ত দাস, সম্পাদিত (৭) প্রসঙ্গ : পথের পাঁচালী — পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়, সম্পাদিত (৮) বাস্তবের গভীরে তারাশংকর ও তিন নক্ষত্র — গোপিকানাথ রায়চৌধুরী (৯) প্রসঙ্গ : উপন্যাস ও ছোটগল্পের রূপভেদ — দেবদ্যুতি বন্দ্যোপাধ্যায় (১০) সুভাষ মুখোপাধ্যায় : পদাতিক কবি, রক্তিম কবিতা — বিজয় সিংহ।

পাত্রাজ পাবলিকেশন ২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৯।

(১) পঞ্চদশদয় — শক্তিপদ রাজগুবু (২) স্পোর্টস কুইজ (৩) শিশিরে উষ্ণ রক্ত — রিচার্ড স্টার্ক (৪) শার্লক হোমস্ রচনাবলী (৫) সীতার পতি — প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (৬) প্রতাপসিংহ — দামোদর মুখোপাধ্যায় (৭) ড্রাকুলার জিহাংসা — ব্রাম স্টেকার (৮) নগরী অরণ্যে নাগ নাগিনী — বাসুদেব বসু (৯) ঈশপের গল্প — অমূল্যচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১০) চাইনিজ রান্না অভিজ্ঞান — বেলা দে (১১) নারী রহস্যময়ী — চিত্তরঞ্জন হালদার (১২) ভালো ছেলে — সুজিতকুমার দে (১৩) বিবশ আকবর — অনিল রায় (১৪) আঁধার পেরিয়ে — প্রফুল্লরঞ্জন রায় (১৫) নিশীথ তৃষা — পৃথ্বীরাজ সেন, সম্পাদিত।

পুষ্পজিত রায় মালদহ-৭৩২১০১।

(১) জোয়ার : সাহিত্য পত্রিকা, ছড়া বিষয়ক বিশেষ সংখ্যা, ২০০৪ (২) জোয়ার : সাহিত্য পত্রিকা, বিশেষ ঘর সংখ্যা জানুয়ারি ২০০৬

প্যাপিরাস ২, গগেন্দ্র মিত্র লেন, কলকাতা-৪।

(১) মুখোমুখি দুই কবি : সুবোধ সরকার ও দেবারতি মিত্র (২) মুখোমুখি দুই কবি : বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় ও অমিতাভ দাশগুপ্ত (৩) মুখোমুখি দুই কবি : শিবশিস মুখোপাধ্যায় ও শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় (৪) মুখোমুখি দুই কবি : যশোধরা রায়চৌধুরী ও জয়দেব বসু (৫) মুখোমুখি দুই কবি : শ্রীজাত ও উৎপলকুমার বসু (৬) মুখোমুখি দুই কবি : অংশুমান কব ও তারাশংকর রায় (৭) মুখোমুখি দুই কবি : রাহুল দাশগুপ্ত ও গৌতম দত্ত (৮) মুখোমুখি দুই কবি : অতীক মজুমদার ও রণজিৎ দাশ (৯) মুখোমুখি দুই কবি : সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত ও কৃষ্ণা বসু (১০) ওড়িয়া লিপিতে বাংলা বৈষ্ণব পদাবলী — মঞ্জুলী রায় (১১) জ্বালানি কাঠ, জ্বলো — অরজিৎ কুমার (১২) শোনো, স্বপ্নভুক, শোনো — পবিত্র মুখোপাধ্যায় (১৩) গল্পের ডাক — দেবদুলাল দাস (১৪) পথপূরণ — চন্দনা ভট্টাচার্য (১৫) ভ্রমণ সঙ্গী ঈশ্বর — দেবর্ষি সারগী (১৬) ঈশ্বর কবিতার মতো — উত্তম সাহা (১৭) নাট্যাভিনয় উপক্রমণিকা — পরিতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮) মানবধর্ম ও রবীন্দ্রনাথ — সাধনা সরকার (১৯) আলেকজান্ডার ফ্রেমিং — জগন্নাথ মিত্র (২০) সোনার কেন্দ্রার সন্ধানে — ব্রজপ্রসাদ চক্রবর্তী (২১) গরিব গুর্বোদের উপকথা — দেবর্ষি সাবগী।

প্রণব সেন ১৩এ, ডেকার্স সেন, কলকাতা-৬৯।

- (১) ধরিত্রী : ১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা ১৪১০ (২) ধরিত্রী : ২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা ১৪১১ (৩) ধরিত্রী : ২য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা ১৪১১ (৪) ধরিত্রী : ২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা ১৪১১ (৫) ধরিত্রী : ২য় বর্ষ, ৫ম সংখ্যা ১৪১১ (৬) ধরিত্রী : ৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা ১৪১২।

প্রদীপ দত্ত ই. সি. টি. পি. ফেজ-২, এ-৯/১১।

- (১) চেরনোবিল — প্রদীপ দত্ত।

প্রবীর গুহঠাকুরতা এফ ডি ৪৪১, সেক্টর ৩, সন্টলেক সিটি, কলকাতা-১০৬।

- (১) রবীন্দ্রনাথের গান : গীতবিতান গীতগ্রন্থে অসংকলিত পঁয়তাল্লিশটি গীতিকবিতা — প্রবীর গুহঠাকুরতা।

প্রভাসলাল দাস ৪৯, এইচ. সি. এস. মুখার্জী স্ট্রিট, কোমলগর, হুগলি।

- (১) সীমার মাঝে অসীম — প্রভাসলাল দাস, সম্পাদিত।

প্রহরী (বিজ্ঞান ভট্টাচার্য) ই ৭০, ব্রহ্মপুর সাউথ এণ্ড, কলকাতা-৯৬।

- (১) সন্ধান — প্রহরী (২) ফিরে পাওয়া — প্রহরী (৩) উদঘাটন — প্রহরী।

প্রাণকৃষ্ণ মাজী বিবেকানন্দ বুক সেন্টার, ১২/এ বক্সিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩।

- (১) তুমি — অশোককুমার মুখোপাধ্যায় (২) তথাপি প্রেম — কমলকান্তি রায়চৌধুরী (৩) আলোর খোঁজে — রামনারায়ণ অধিকারী (৪) শিল্পবস্তু সংবক্ষণ, ১ম খণ্ড — শচীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (৫) শিল্পবস্তু সংবক্ষণ, ২য় খণ্ড — শচীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য।

বঙ্কিমভবন গবেষণা কেন্দ্র কঁটালপাড়া, নৈহাটি।

- বঙ্গদর্শন : ষাণ্মাসিক ৮ ও ৯, যুগ্ম সংখ্যা — সত্যজিৎ চৌধুরী, সম্পাদিত।

বলাকা কার্যালয় ৯, নিমচাঁদ কঁারার স্ট্রীট, পোঃ আড়িয়াদহ, কলকাতা-৫৭।

- (১) বলাকা : বর্ষ ১৪, সংখ্যা ১২, ২০০৫।

বাঁকুড়ার খেয়ালী ১৬২ কুচকুচিয়া রোড, বাঁকুড়া-৭২২১০১।

- (১) বাঁকুড়া বিষয়ক প্রবন্ধ সংকলন — গিরীন্দ্রশেখর চক্রবর্তী, সম্পাদনা।

বাদলবরণ বড়ুয়া অনোমা, সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী, ৫৪, কমার্স কলেজ রোড, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।

- (১) অনোমা : ২০০৩ (২) অনোমা : ২০০৪।

বারিদবরণ ঘোষ ৪৫, ধর্মতলা রোড, বালী, হাওড়া।

- (১) সমকালীন সাহিত্যে : বঙ্গভঙ্গ — বারিদবরণ ঘোষ, সম্পাদিত।

বিজ্ঞানবিহারী নন্দী সি-৩/৬ উন্টোডাঙ্গা এইট. এম. হাউসিং, কলকাতা-৬৭।

- (১) ভিজে বিকেল ও সাদা মেঘ — বিজ্ঞানবিহারী নন্দী (২) তুমি আমার পূর্ণ স্বরলিপি — বিজ্ঞানবিহারী নন্দী।

বিনায়ক চক্রবর্তী ঝড়দহ কৃষ্টি সংসদ প্রকাশনা।

- (১) খোঁজ (পত্রিকা) : শারদ সংখ্যা ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৪১২।

বিমল গঙ্গোপাধ্যায় কনকশালী, বোসের ঘাট, জোড়াপুকুর ধার, পোঃ চুঁচুড়া, জেলা-হুগলী।

- (১) পিঙ্করে বসিয়া নহে — বিমল গঙ্গোপাধ্যায়।

বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কলকাতা।

- (১) কৃষ্ণ চোখে রাধা — পঞ্চানন কুহু (২) হিন্দী নবী কবিতা ও কয়েকজন কবি (৩) বাঁশীওয়াল —

অধৈর্যকুমার রায় (৪) ক্ষতধীপে — অমল বন্দ্যোপাধ্যায় (৫) নিববধি বয় এক সন্ধান নদী — নন্দলাল সেনগুপ্ত (৬) অঞ্জলি — সুরেশকুমার (৭) উত্তর পুরুষ — শরণাপুরী (৮) শব্দে আনে বৃষ্টি পাট — শূভ্রা চক্রবর্তী (৯) কল্যাণকুমার দাশগুপ্তের শ্রেষ্ঠ কবিতা।

বিশ্বজ্ঞান ৯/৩, টেমার লেন, কলকাতা-৯।

(১) দেশ দেশান্তরে — শ্যামল রায়চৌধুরী (২) দর্পণ — সমরেন্দ্র দাশগুপ্ত (৩) হুড়কো — রমেন্দ্রমোহন সিংহ (৪) মামা ভাঞ্জে — প্রবীর মাস্তবক (৫) যদি কোনদিন — সুব্রত বিশ্বাস (৬) গল্প থেকে ছড়া — অহিভূষণ মহাপাত্র (৭) সুবর্ণ গোলক রহস্য — অরীণ বর্ধন (৮) প্রচ্ছদপট — ইলা মুখোপাধ্যায় (৯) রবীন্দ্রভাবনা — অনুকূলচন্দ্র দাশ (১০) নীল ধূসর — অমৃত মাইতি (১১) দিগন্তিকা — বাসুদেব মাইতি (১২) বিদ্যবী ও কবি প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় — সত্যটি সেন ও অন্যান্য, সম্পাদিত (১৩) লতা মঞ্জরী — অসি রায় (১৪) ফেলে আসা — শান্তি বিশ্বাস (১৫) তটিনী তরঙ্গ — নবু সরকার, সম্পাদিত (১৬) দুই মায়ের গল্প — মালতী সেনগুপ্ত ও দেবী চৌধুরী (১৭) সেই মহা বরষার রাঙা জল — বিভূতিভূষণ দাসগুপ্ত (১৮) মনের আয়না — দ্বৈপায়ন (১৯) কবিতা — ইলা মুখোপাধ্যায় (২০) যুগকাঠ এবং — নিশীথ রায়চৌধুরী (২১) হৃদয়ের মানচিত্র — প্রবীর দে সরকার (২২) ফিরে দেখা — জয়ন্তী গজোপাধ্যায় (২৩) রচনা সম্ভার — সুশান্তকুমার পাল (২৪) নিশিরাতের আতঙ্ক (২৫) অচলা (নাটক) — শিবিকুমার ভাদুড়ী কৃত নাট্যরূপ (২৬) ঘুমিয়ে পড়া অস্তুরা সন্ধ্যারী — শঙ্কর মজুমদার (২৭) জন্মদিনে — নিশীথ রায়চৌধুরী (২৮) এখানে প্রতিদিন — মদনমোহন ঘোষ (২৯) নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু : আমাদের জাতির মেহনত — রবীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (৩০) শেষের লাইন — সুভাষ গজোপাধ্যায় (৩১) মন্দির মসজিদ গীর্জা — নারায়ণ সেনগুপ্ত (৩২) বুদালী — মিনতি দত্ত মিশ্র (৩৩) ভোর — প্রণয় ধব (৩৪) সাত সমুদ্র — তর্দীর ঘটক (৩৫) দর্শক : ৪৪ বর্ষ, ১টি সংখ্যা (৩৬) দর্শক : ৪৫ বর্ষ, ৩টি সংখ্যা (৩৭) দর্শক : ৪৬ বর্ষ, ২টি সংখ্যা (৩৮) ডা. সাধন সেনের চিকিৎসক জীবনের পত্র।

বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ৩০৯/২, শহীদ হেমন্ত বসু সরণী, কলকাতা-৭৪।

মানবজ্ঞান মানভূম — বিশ্বনাথ চক্রবর্তী।

বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় সংস্কৃতি সংস্থা, রঘুনাথপুর খোলাপোতা, উঃ ২৪ পরগনা, পিন-৭৪৩৪২৮।

(১) শতপর্ণী — বিজয়মাধব মণ্ডল (২) বাংলা সাংস্কৃতিক মেলা : ২০০৫।

ব্যোমকেশ ভট্টাচার্য পি-১০ বি. সি. আই. টি. রোড, কলকাতা-১৪।

(১) দেব গীতি — দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার।

ভূঁইয়া ইকবাল অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।

(১) আনিসুজ্জামান সংবর্ধনা স্মারক।

মঞ্জুলা মুখোপাধ্যায় বেলঘরিয়া, কলকাতা।

(১) উনিষ শ পাঁচ (২য় সং) নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়।

মহঃ সালাউদ্দীন মেদিনীপুর কলেজ টিচার্স কোয়ার্টার মেদিনীপুর কলেজ।

(১) ইমিকা — মহঃ সালাউদ্দীন।

মানিক বটব্যাল ৯/২, বলরাম বোস ঘাট রোড, ভবানীপুর, কলকাতা-২৫।

(১) শতাব্দীর স্বপ্ন — মানিক বটব্যাল (২) কবিতা ও ভক্তিশ্রীতি — মানিক বটব্যাল।

মালেকা বেগম — ঠিকানা : ১৭/এ নিচতলা, ২৭ দ্বিতীয় তলা, আজিজ মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা, বাংলাদেশ।

(১) নির্বাচিত বেগম : অর্ধশতাব্দীর সমাজ চিত্র ১৯৪৭-২০০০, ১ম খণ্ড (২) নির্বাচিত বেগম : অর্ধশতাব্দীর

সমাজচিত্র ২য় খণ্ড (৩) নির্বাচিত বেগম : অর্ধশতাব্দীর সমাজ চিত্র ৩য় খণ্ড (৪) স্নেহলতা — মালেকা বেগম, সম্পাদিত।

মিত্র ও ঘোষ ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩।

(১) একটু দেখবেন স্যার — অল রায় (২) জল ছবির সিংহ — সমরেশ মজুমদার (৩) অকাল বোধন — অনিতা অগ্নিহোত্রী (৪) ইচ্ছাপূরণ — এ, মাম্মাফ (৫) উনিশ বিশেষ কড়চা — সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় (৬) বাবু বিবি এবং তাহারা — রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায় (৭) যারা ভালো বেসেছিল — অনিতা অগ্নিহোত্রী।

মৃত্যুঞ্জয় বাবুরী নবদ্বীপ।

(১) বৈষ্ণব সাধক ও কবি শ্রীকিশোর রায় গোস্বামী, মিহিরকুমার রায়, সম্পাদিত।

মৌসুমী প্রকাশনী ১এ, কলেজ রো, কলকাতা-৯।

(১) মহাভারত প্রেমকথা — উত্তম ঘোষ (২) দেবকুমার বসু নির্বাচিত গল্প (৩) নষ্ট নারী — দেবকুমার বসু (৪) ও হেনরীক্রাসিকস্ (৫) স্রমের রচনা সংগ্রহ (৬) গণিকা পুরাণ — প্রার্থনা মুখোপাধ্যায় (৭) নাটের গুরু — সমরেশ বসু (৮) নারী পুরুষ — দেবকুমার বসু (৯) পক্ষীরাজ ও উর্কী — দেবকুমার বসু (১০) কঠভরা বিষ — সমীর রায়চৌধুরী (১১) রাত পরীদের ব্যাকক — মিলন মুখোপাধ্যায় (১২) ভালোবাসা — তাপস গঙ্গোপাধ্যায় (১৩) ডিভোর্সি এবং — দেবকুমার বসু (১৪) সেই অনিতা — তপতী বসু (১৫) সুবোধ ঘোষ ক্লাসিকস্ (১৬) বাসনা অন্তহীন — সমীর রায়চৌধুরী।

যোগময়া প্রকাশনী ৬০, পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা-৬।

(১) শালিমার ইতিবৃত্ত — হেমেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (২) Favourite Greek Myths—Lilion Stoughton Hyde (৩) সাহিত্য সংস্কার অভিধান — বিমলেন্দু দাস (৪) Yours only Vivekananda — Shyamali Ghosh (৫) আমি তোমাদেরই আলম — শ্যামলী ঘোষ (৬) Yours only Subhas — শ্যামলী ঘোষ (৭) আমি তোমাদেরই বিদ্যাসাগর — সিতাংশুশেখর ঘোষ (৮) আমি তোমাদেরই নজরুল — সিতাংশুশেখর ঘোষ (৯) আমি তোমাদেরই রবীন্দ্রনাথ — সিতাংশুশেখর ঘোষ।

রমা দাশগুপ্তা ৫/৫, যশোর রোড, কলকাতা-২৮।

(১) এবার ঘুমাও তুমি — রমা দাশগুপ্তা।

রমাকান্ত চক্রবর্তী ব্ল্যাট ২০, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রিট কলকাতা ৭০০ ০০৬।

(১) বাংলা চরিত্র সাহিত্য — দেবীপদ ভট্টাচার্য (২) ভগিনী নিবেদিতা ও বাংলায় বিপ্লববাদ — গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী (৩) শঙ্করীপ্রসাদ : ব্যক্তি ও সৃষ্টি — সুজাতা রাহা (৪) মৌলবাদ এক নতুন সংজ্ঞা — সুরজিত দাশগুপ্ত (৫) অনিবার্ণ অগ্নিশিখা — রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য (৬) লোক সংস্কৃতি গবেষণা — ৭ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা (যাত্রা বিশেষ সংখ্যা) (৭) যষ্টি মধু — ২৬ বর্ষ ১ম সংখ্যা (রস সাহিত্য সংখ্যা) (৮) সাহিত্যপত্র — ১৩৮২ বৈশাখ (৯) Journal of The Asiatic Society – Vol. XLIV, No. 1-100 (১০) হৃদয় বিষয় অনাহার — ২০০৪ জানুয়ারি (১১) India of The Age of The Brahmanas – Jogiraj Basu (১২) Marx Engels Lenin (১৩) Missionaries Rebellion and Proto Nationalism – G. Oddie (১৪) Catalogue Since 1903 (১৫) Engels – F. Engels (১৬) মৃগয়া — ভগিরথ মিশ্র (১৭) বঙ্গীয় রেনেসাঁসে পাশ্চাত্য বিদ্যার ভূমিকা — সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (১৮) Note to the User of the Dictionary — William Gerstle (১৯) পেরিয়ে এলেম — প্রতুল-চন্দ্র রক্ষিত (২০) India Since 1526 — V. D. Mahajan (২১) ঘোষ পাড়ার সতীমা ও কর্ত্তা ভজা ধর্ম — সত্যশিব পালদেব মহান্ত। (২২) যষ্টিমধু ২২ বর্ষ, ১ম সং ১৩৮০ (২৩) Dames Galantes 2nd Vol. 1901 Faubourg (২৪) রাজেন্দ্রলাল মিত্র — বিজিতকুমার দত্ত (২৫) স্বপ্ন নিয়ে — প্রাণকুমার চট্টোপাধ্যায় (২৬) একটি বিস্মৃত রাজধানী — যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী (২৭) বিদ্যাসাগর রচনাসংগ্রহ — বিদ্যাসাগর স্মারক জাতীয় সমিতি (২৮) টাউন কলিকাতার কড়চা — বিনয় ঘোষ, (২৯) Corrupt

Politicians – Nemisharan Mital (৩০) গঙ্গার ঘাট — রাধারমণ মিত্র (৩১) পরিচয় ৬৪ বর্ষ ৮ম সংখ্যা ১৪০২ (৩২) পরিচয় — ৬৩ বর্ষ ৮ম-১১শ সংখ্যা ১৪০১। (৩৩) সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতা — বদরুদ্দীন উমর (৩৪) Lenin Selected Works (৩৫) মনোমোহন বসুর অপ্রকাশিত ডায়েরী — সুনীল দাস (৩৬) লোকসংস্কৃতি গবেষণা ১০ম বর্ষ ১ম সংখ্যা ১৪০৪। (৩৭) চেপে রাখা ইতিহাস — গোলাম আহমাদ মোর্তজা (৩৮) বিপ্লবের পদচিহ্ন — ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত (৩৯) Bauls of Bengal – Pranab Bandyopadhyay (৪০) শ্রীশ্রীনীতমালা — শ্রী রঘুনন্দন গোস্বামী (৪১) সীমান্ত পেরিয়ে — জয়শ্রী চক্রবর্তী (৪২) সৈকতে একাকী — জয়শ্রী চক্রবর্তী (৪৩) রাড় বার্তা — রাড় সংস্কৃত পরিষদ (৪৪) বৌদ্ধরমণী — বিমলাচরণ লাহা (৪৫) The Yuga Purana – John E Milchiner (৪৬) কিরণাবলী ২য় খণ্ড — গৌরীনাথ শাস্ত্রী (৪৭) শিবনাথ শাস্ত্রীর কিশোর রচনা সম্ভাব — সুবিমল মিশ্র (৪৮) বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ভাগবত ধর্ম — কল্যাণব্রত চক্রবর্তী (৪৯) কিরণাবলী ১ম — গৌরীনাথ শাস্ত্রী (৫০) কিরণাবলী ৩য় — গৌরীনাথ শাস্ত্রী (৫১) Historical Geography – Amitabha Bhattacharyya (৫২) For A Revolution – Sibnarayan Ray (৫৩) Vaisnava Vedanta – Mahanamabrata Brahmachari (৫৪) Lord Sri Chaitanya and his Misson – Bhakti Praynan (৫৫) শ্রীকৃষ্ণ — দেবেন্দ্রনাথ বসু (৫৬) দেশ সাপ্তাহিক (১৬ এপ্রিল, ১৪ মে, ১২ নভেম্বর ১৯৮৮) (১২ ডিসেম্বর ১৯৯৮) (৫৭) দেশ সাপ্তাহিক (১০ ফেব্রুয়ারি, ২৮ জুলাই ১৯৯০) (২০ মে ১৯৯৫) (৫৮) দেশ সাপ্তাহিক (২৪ জুন, ১৫ জুলাই ১৯৮৯) (৯ই অক্টোবর ১৯৯৩) (৫৯) Bengal Past and Present, July 1907 5 Copy (৬০) বুদ্ধবীণা — অমিতাভ ঘটক (৬১) সাহিত্য ও সংস্কৃতি — কার্তিক-পৌষ ১৩৮৬ (৬২) Understanding the Prophetic – Satadal Kargupta (৬৩) Mystical Buddhism – Satadal Kargupta (৬৪) Ganipati – Haridas Mitra (৬৫) Journal of the Asiatic Society – Vol. XLVII, No-2, July 2005 (৬৬) পশ্চিমবঙ্গ — রামমোহন সংখ্যা ১৪০৩ (৬৭) বঙ্গদর্শন — সত্যজিৎ চৌধুরী (৬৮) গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় — বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য (৬৯) বাংলা দেশে সাম্প্রদায়িকতার চালচিত্র — শাহরিয়ার কবির (৭০) রবীন্দ্র সাহিত্যের নরনারী — গোপীমোহন সিংহ রায় (৭১) শহীদ কানাই লাল নূতন তথ্যের আলোকে — বসন্তকুমার সামন্ত (৭২) নবাজুর — অনিতা দত্ত (৭৩) শ্রীশ্রীনিয়ানন্দ মহিমা — অনন্ত দাস বাবাজী মহারাজ (৭৪) ঘাটালের কথা — পঞ্চানন রায় কাব্যতীর্থ (৭৫) কালবেলা — সমবেশ মজুমদার (৭৬) বিশ্ব মনীষী প্রসঙ্গ — রঞ্জিত সেন। (৭৭) A Miscellany on the Raj – L. M. Bhatia (৭৮) বিভাব বিশেষ গোয়েন্দা সংখ্যা (৭৯) Men at war – Mikhail Alexeyev (৮০) Significant Themes in American History (৮১) মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক/মুসাকালিম (৮২) বর্ধমান চর্চা (৮৩) মীর মানস — মুনীর চৌধুরী (৮৪) কবি কল্লন চণ্ডী — ক্ষুদিরাম দাস (৮৫) বঙ্গদর্শন — সত্যজিৎ চৌধুরী (৮৬) রবীন্দ্রনাথের মনোদর্শন — অমিয়রতন মুখোপাধ্যায় (৮৭) যখন ছাপাখানা এল — শ্রীপাঙ্ক (৮৮) সংস্কৃতি শিল্প ইতিহাস — সুনীতি চট্টোপাধ্যায় (৮৯) শনিবারের চিঠি ব্যঙ্গ সংকলন — বঙ্কনকুমার দাস (৯০) সাংস্কৃতিকী — সুনীতি চট্টোপাধ্যায় (৯১) ধ্রুবপদ বার্ষিক সংকলন ১৯৯৭ (৯২) বর্ধমান সমগ্র ৪র্থ খণ্ড — গোপীকান্ত কোন্ডার (৯৩) নিজ প্রিয় স্থান আমার মথুরা বৃন্দাবন — তারাপদ মুখোপাধ্যায় (৯৪) নির্বাচিত কলাম — তসলিমা নাসরিন (৯৫) সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা বৈ-আষাঢ় ১৩৮১ (৯৬) লোক সংস্কৃতি গবেষণা পত্রিকা ৩ কপি (৯৭) কোরক সাহিত্য পত্রিকা (৯৮) শ্রীচৈতন্য জন্মস্থান: বিতর্ক তার ক্রটি ও সমাধান — সত্যেন্দ্রলাল মজুমদার (৯৯) নবদ্বীপ পুরাতত্ত্ব পরিষদ-পত্রিকা ১ম সংখ্যা ২০০২, ২য় ২০০৩ (১০০) চলন্ত চিরন্তন — বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় (১০১) সাহিত্য প্রকাশিকা নবপর্যায় সুকুমার সেনের রচনাপঞ্জী (১০২) The Ancient History of the Near East – H. R. Hall (১০৩) Nineteen Century Studies No-12 October 1975 (১০৪) ইমান ও নিশান — গৌতম ভদ্র (১০৫) Rabindranath Tagore and His World Windows — Bela Dutta (১০৬) কার্ল মার্কস — রঞ্জিত চক্রবর্তী (১০৭) Nuclear Explosions – J. Nehru (১০৮) ইতিহাস পত্রিকা ৮খণ্ড সং-৪ ১৩৮০: মাঘ-চৈত্র (১০৯) The Calcutta Historical Journal Vol. XIX and XX (১১০) চারনপর্ব ৩য় বর্ষ ১৯৯৮ (১১১) অভিযাত্রিক — বরুণ দে (১১২) মৌলানা

আজাদ — শ্যামাপ্রসাদ বসু (১১৩) মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর জীবন বৃত্তান্ত — বঙ্কবিহারী কর (১১৪) Password Victory Vol-I (১১৫) A Contemporary World History 1917-1945 — V. Alexandrov (১১৬) India Another Millennium — Romila Thapar (১১৭) Hinduism For Our Times — Arvind Sharma (১১৮) ত্রিপুরা রাজমালা — কালীপ্রসন্ন সেন (১১৯) ইসলাম ও রবীন্দ্রনাথ — ডক্টর ওসমান গণী (১২০) বিদ্রোহিনী রানী শিরোমণি ও মেদিনীপুরের প্রথম কৃষক গণ বিদ্রোহ — নগেন্দ্রনাথ রায় (১২১) বৈয়াকরণ সিদ্ধান্ত কৌমুদী — কল্পনাসিন্ধু দাস (১২২) বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর জীবন ও মনন — তৃপ্তি চৌধুরী (১২৩) ভারতবর্ষ এবং আমরা — অরবিন্দ পোদ্দাব (১২৪) বাংলা চবিতসাহিত্যে নিত্যানন্দ — উমা বন্দ্যোপাধ্যায় (১২৫) কথা ও কাহানী — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১২৬) History of Dharmasastra in a Nutshell — B. Kishore Swais (১২৭) Maharaja Suchmoy Roy Bahadur — Beni Madhab Chatterjee (১২৮) Whither Bengal (১২৯) পেশবাগিদের রাষ্ট্রশাষণ পদ্ধতি — সুরেন্দ্রনাথ সেন (১৩০) বাঙালী জাতি পরিচয় — সৌরীন্দ্র ঘোষ (১৩১) চরিত সুধা ১ম খণ্ড — রাধারমণ বাগ (১৩২) আধ্যাত্মিকা — প্যারীচাঁদ মিত্র (১৩৩) My India — Jim Corbett (১৩৪) সেকাল আর একাল — রাজনারায়ণ বসু (১৩৫) রবীন্দ্র সঙ্গীত প্রসঙ্গ ২য় — প্রফুল্লকুমার দাস (১৩৬) অন্যকথা (১৩৭) ঐতিহাসিক (১৩৮) Socialism in Theory and Practice — Buddhadeva Bhattacharyay (১৩৯) এ শর্ত হিষ্টি অব স্যারাসিন্স (১৪০) অশান্ত পশ্চিম এশিয়া — দেবব্রত ঘোষ (১৪১) গুলদাস্তা — এস ওয়াজেদ আলী (১৪২) এস ওয়াজেদ আলী : স্মরণ সমীক্ষণ (১৪৩) মাসুকের দববার — এস ওয়াজেদ আলী (১৪৪) হুগলি জেলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি — জগবন্ধু কুণ্ডু (১৪৫) মার্কসীয় যুক্তিবিজ্ঞান — সবেজ আচার্য (১৪৬) পাশ্চাত্য বৈদিক ইতিহাসের মাল মশালা — অনাথবন্ধু বেদজ (১৪৭) ভারতাত্মা কবি কালীদাস — প্রবোধচন্দ্র সেন (১৪৮) রবীন্দ্র সাহিত্যের নরনারী — গোপীমোহন সিংহরায় (১৪৯) বাংলার বিদ্যৎসমাজ — নিয়ম ঘোষ (১৫০) কবীর ও তার কবিতা — বঙ্কন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৫১) মেয়েলি ব্রত বিষয়ে — সনৎকুমার মিত্র (১৫২) শতবর্ষ পূর্বের বাঙালি ও বাঙালি — সতীশচন্দ্র রায়চৌধুরী (১৫৩) বর্ধমান সমগ্র — গোপীকান্ত কোজার (১৫৪) অনন্যা আভা — অবিন্দ মাইতি (১৫৫) Philosophical Essays — Anantalal Thakur (১৫৬) বাংলা সাহিত্যে অনগ্রসর শ্রেণী — পরিতোষ মুখোপাধ্যায় (১৫৭) বিশ্বকোষ — চতুর্দশ খণ্ড (১৫৮) বাক্যকথার বিকাশের ধারা — ৩য় পর্ব — প্রসাদ মাইতি (১৫৯) Devotional Poets and Mystics, Part I (১৬০) The Changing Fortunes of The Bengal Silk Industry By Sailendra Bag (১৬১) রাসপঞ্চক — প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর (১৬২) Inside Europe Today — John Gunther (১৬৩) ব্রাহ্ম সমাজের চল্লিশ বৎসর — শ্রীনাথ চন্দ্র (১৬৪) সাহিত্য : প্রাচীন ও আধুনিক — বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় (১৬৫) বৈষ্ণব সাহিত্যে চৈতন্য বিষয়ক ভাবনা — নিমাই দাস (১৬৬) গৌড়বঙ্গ সংস্কৃতি ও শ্রীচৈতন্যদেব — সনাতন গোস্বামী (১৬৭) Containment and Revolution — David Horowitz (১৬৮) হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা — সুকুমারী ভট্টাচার্য (১৬৯) এক্ষণ শারদীয়া সংখ্যা ১৩৯৯ (১৭০) গল্পমালা — নবেন্দ্রনাথ মিত্র (১৭১) গল্পমালা ২ — নরেন্দ্রনাথ মিত্র (১৭২) রামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ — (১৭৩) মহাত্মবির জাতক চার পর্বে একত্রে — প্রেমাসুন্দর আতর্ঘী (১৭৪) সেই দশক — পুলকেশ মণ্ডল (১৭৫) Introduction Astronomy — Cecilia Payne (১৭৬) পঁচিশ বছরের প্রেমের কবিতা — আবু সঈদ আইয়ুব (১৭৭) বিদেশীদের চোখে বাংলা — চণ্ডী লাহিড়ী (১৭৮) কুমকলি ইত্যাদি গল্প — পরশুরাম (১৭৯) অনুবাদে মেঘদূত সার্বশতবর্ষ — নবেশচন্দ্র জ্ঞান (১৮০) আমার জীবনযাত্রা — রাহুল সাংকৃত্যায়ন ৫ম খণ্ড (১৮১) আমার জীবনযাত্রা — রাহুল সাংকৃত্যায়ন ৪র্থ খণ্ড (১৮২) আমার জীবনযাত্রা — রাহুল সাংকৃত্যায়ন ৩য় খণ্ড (১৮৩) আমার জীবনযাত্রা — রাহুল সাংকৃত্যায়ন ২য় খণ্ড (১৮৪) আমার জীবনযাত্রা — রাহুল সাংকৃত্যায়ন ১ম খণ্ড (১৮৫) কৌশিকী — বার্ষিক সংখ্যা — ১৩৯৬ (১৮৬) পূর্ব বাংলার লোকসংস্কৃতি — দুলাল চৌধুরী (১৮৭) বিতর্কিকা ২য় বর্ষ, ১ম সং ১৪০৬ বাংলা ও বাঙালি (১৮৮) বর্ধমান : ইতিহাস ও সংস্কৃতি ৩য় খণ্ড — যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী (১৮৯) মহাট্টানের পথিক — কল্যাণ চৌধুরী (১৯০) Renaissance Nationalism and Social

Changes Modern India – K. K. Dutta (১৯১) সাধ্যসাধনতত্ত্ব বিজ্ঞান — অনন্তদাস বাবাজী মহারাজ (১৯২) শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর — পরমানন্দ বিদ্যারত্ন (১৯৩) আনন্দমঠের সিদ্ধ সাধক — সত্যানন্দ সরস্বতী (১৯৪) Decline and fall of Indira Gandhi – D. R. Mankekar (১৯৫) Israel – George H. Singh (১৯৬) সেই দ্বিজোত্তম — পণ্ডিত কালীকঠ, কাব্যার্থ (১৯৭) মন্ত্রশক্তি বা সর্বভাষা — কালীপ্রসন্ন সমাজদার (১৯৮) Devinamavilasa – Sahib Kaul (১৯৯) The Calcutta Historical Journal – Vol. XVIII, No-2 1996 (২০০) The Bauddha Dharmankur Sabha – The Bengal Buddhist Association (২০১) Politics Among Nations – Hans J. Morgenthau (২০২) পত্নী ষষ্ঠ বর্ষ শাবদ সংকলন ১৪১১ সংখ্যা ৯ (২০৩) শিক্ষক লেখক — অব্ণকুমার মুখোপাধ্যায়, পঁচাত্তর পুঁতি সংবর্ধনা (২০৪) কালের বাজা ও রবীন্দ্র নাটক — শঙ্ক ঘোষ (২০৫) রাড়ের পূর্বপুরুষ পূজা — মিহির চৌধুরী কামিল্যা (২০৬) আলোর ষোঁজে — রামনারায়ণ অধিকারী (২০৭) তুমি — অশোক মুখোপাধ্যায় (২০৮) লোকসংস্কৃতি গবেষণা — ১২ বর্ষ ২য় সং ১৪০৬ (২০৯) Essays in Contemporary History – Vladimir Alexandrov (২১০) Letters to Mamie – Dwight Eisenhower (২১১) শ্রীশ্রীকীর্তনগীতরত্নাবলী — কালীদাস নাথ (২১২) Annual Report of the National Archives of India 1972 (২১৩) বেদগ্রন্থমালা ২য় খণ্ড — পরিতোষ ঠাকুর (২১৪) মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য গবেষণা পত্রিকা ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা ১৪০৯ (২১৫) গড়ডলিকা — পরশুরাম (২১৬) বাংলার লোকগীতি ও বাউল সঙ্গীত (২১৭) কাব্যচরনিকা পরিক্রমা — শ্যামাপদ চক্রবর্তী (২১৮) পরিচয় November 98 – January 99 (২১৯) Philosophy and History – Vol-7, No-1 1974 (২২০) বাউল জীবনবৈ সমাজতত্ত্ব — বিকাশ চক্রবর্তী (২২১) জনগণের সঙ্গো — জ্যোতি বসু (২২২) বৈষ্ণব দর্শন ও সাহিত্যের রসলোক — দিলীপকুমার দত্ত (২২৩) বাংলা নাটকের প্রথম পর্ব ১৮৫২-১৮৭২ অবতীকুমার সান্যাল (২২৪) আদর জানাই — শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (২২৫) লালন শাহ — আবুল আহসান চৌধুরী (২২৬) হারকনাথ ঠাকুর — কিশোরীচাঁদ মিত্র (২২৭) পুরাতনী — নলিনীনাথ দাশগুপ্ত (২২৮) The Earth Mother – Pupal Jayakar (২২৯) সূতানুটি সমাচার — বিনয় ঘোষ (২৩০) Le Livre D'Amour de L' Orient – Le Jardin Parfumé (২৩১) Le Livre D'Amour des Anciens – Les Maîtres de L'Amour (২৩২) Sex Life in Ancient India – Candra Cakravarti (২৩৩) বাংলায় বিপ্লববাদ (২৩৪) বাংলার সংস্কৃতিতে মার্কসবাদী চেতনার ধারা — ধনঞ্জয় দাশ (২৩৫) পশ্চিমবঙ্গ — গান্ধী সংখ্যা ১৯৯৫, শিকনাথ শাস্ত্রী সংখ্যা ১৪০৪, রবীন্দ্র সংখ্যা ১৪০২, নেতাজী সংখ্যা (২৩৬) পশ্চিমবঙ্গ সাঁওতাল বিদ্রোহ সংখ্যা ১৪০২, কলকাতা বিশেষ সংখ্যা ১৯৮৯, অবনীন্দ্র সংখ্যা ১৪০২ (২৩৭) পশ্চিমবঙ্গ নদীয়া জেলা সংখ্যা ১৪০৪, West Bengal Special Number Amartya Sen (২৩৮) শাবদীয় যুব মানস ১৪০৪ (২৩৯) স্মরণিকা, নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন-৭৬তম অধিবেশন ১৪১০ (২৪০) দেশ ১১ ডিসেম্বর ১৯৯৯ (২৪১) প্রাচীন ভারত (২৪২) চরিত সুখা (২৪৩) মধ্যযুগে বাংলা — কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় (২৪৪) সেকালের লোক — মন্মথনাথ ঘোষ (২৪৫) বাংলার জমিদার — বামাচরণ মজুমদার (২৪৬) যোগেশচন্দ্র (২৪৭) কবিতাবলী সংস্কৃতি ও প্রাকৃত — রমা চৌধুরী (২৪৮) Gopal Krishna Gokhale His Life and ... John S. Hoyland (২৪৯) ইতিহাস ও সাহিত্য — অশীন দাশগুপ্ত (২৫০) শঙ্কিবাদ ভাষা গীতা — সত্যানন্দ সরস্বতী (২৫১) ধর্ম শিক্ষা — সত্যানন্দ সরস্বতী (২৫২) অশ্বঘোষের বৃদ্ধচরিত — রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর (২৫৩) শ্রী অমিয় নিমাই চরিত — শিশিরকুমার ঘোষ (২৫৪) পরিপ্রাণ — জ্যোতি ভট্টাচার্য (২৫৫) মধুপর্নী — বিশেষ কোচবিহার জেলা সংখ্যা ১৯৯৬ (২৫৬) চারণপর্ব — প্রসঙ্গ বঙ্কিমচন্দ্র অন্য দৃষ্টিতে ১ম বর্ষ ২য় সং ১৪০১ (২৫৭) সেদিনের কথা (২৫৮) পরিচয় — সুশোভন সরকার স্মরণ ১৯৮৩ (২৫৯) A Tribute to Ma Indira Devi – Mihir Kumar Roy (২৬০) কোরক শারদীয় ১৩৯৯ সাহিত্য পত্রিকা (২৬১) কোরক শারদীয় ১৪১০ সাহিত্য পত্রিকা (২৬২) কোরক শারদীয় ১৪১০ সাহিত্য পত্রিকা জন্মশতবর্ষে শিবরাম (২৬৩) কোরক সাহিত্য পত্রিকা শারদীয় ১৪০২ হীরেন মুখার্জী (২৬৪) A Forgotten Empire – Robert Sewell (২৬৫) প্যারীচাঁদ মিত্র সমাজ চিন্তা ও সাহিত্য — নরেন্দ্রনাথ

দাশগুপ্ত (২৬৬) কালিন্দী — তারানথর বন্দ্যোপাধ্যায় (২৬৭) বর্ধমান : ইতিহাস ও সংস্কৃতি ১ম খণ্ড (২৬৮) বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা — হেমচন্দ্র কানুনগো (২৬৯) মেট্রোপলিটন মন মধ্যবিস্ত বিদ্রোহ — বিনয় ঘোষ (২৭০) রাজনগর — অমিয়ভূষণ মজুমদার (২৭১) Explorations in History – Chittabrata Palit (২৭২) অর্থবৈদ্যে ভারতীয় সংস্কৃতি — নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য (২৭৩) আমার জীবনকথা — স্বামী অভয়ানন্দ (২৭৪) লোক বাংলায় হাট বিশেষ ২০০২ (২৭৫) লোক বাংলার জনপদ ২০০২ (২৭৬) ন্যায়দর্শন (২৭৭) বাংলা সাময়িক পত্র ২য় খণ্ড — ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (২৭৮) কৌশিকী বিশেষ রোমন্থন ১৯৯৭ (২৭৯) কৌশিকী বিশেষ রোমন্থন ১৯৯৫ (২৮০) বাংলা সাহিত্যে পটভূমিরূপে কয়েকটি ধর্মসাধনা — শশীভূষণ দাশগুপ্ত (২৮১) সতেরো শতকের রাঢ় বাংলার সমাজ ও সাহিত্য — অনিমা মুখোপাধ্যায় (২৮২) মেদিনীপুর ইতিহাস ও সংস্কৃতির বিবর্তন — ওয় খণ্ড প্রণব রায় (২৮৩) সংগ্রামী জাতীয়তাবাদ : মেদিনীপুর ও মানভূম — শ্যামাপ্রসাদ বসু (২৮৪) Black Tuesday and War on Terrorism – Debabrata Ghosh (২৮৫) Nationalist Thought and the Colonial World – Partha Chatterjee (২৮৬) The Early Colonial Interaction in Bengal – Debabrata Ghosh (২৮৭) Lenin (২৮৮) The King English – H. W. Fowler (২৮৯) Devotional Poets and Mystics Part-II – Surdas (২৯০) Marx Engels (২৯১) নীল বৃত্তান্ত — পুলিন দাস (২৯২) Renaissance Nationalism and Social ... K. K. Dutta (২৯৩) প্রাচীন ভারতীয় অলংকার শাস্ত্রের ভূমিকা — বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য (২৯৪) বিদ্যাসাগরের কলকাতার বাড়ী — সন্তোষকুমার অধিকারী (২৯৫) Economic and Social History of... – Henri Pirenne (২৯৬) Crime and Karma Cats and Woman Vol-I (২৯৭) দেশবন্ধু স্মৃতি — হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত (২৯৮) বাবু — অবশীকুমার সান্যাল (২৯৯) কোরক সাহিত্য পত্রিকা — প্রাকশারদ ১৪১২ (৩০০) ঐতিহাসিক বর্ষ-৫ সং-১ ১৪০২ (৩০১) মূল্যায়ন — শাবদীপ ১৩১১ (৩০২) 'Bengal Past and Present Vol-I No-I 1907 (৩০৩) The Quarterly Review of Historical Studies No-3-4 1995-96 No-I-2 1996 (৩০৪) History Vol-VI No-I 2003 (৩০৫) Kalyan Bharati Vol-V (2001) Vol-VIII (2004) (৩০৬) সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ১-৪ ১৪০৬ সুকুমার সেন জন্ম শতবর্ষ পূর্তি সংখ্যা (৩০৭) সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ১-৪ ১৪০৭ (৩০৮) সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ৩০৪ ১৪০৯ (৩০৯) সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ১-২ ১৪১০ (৩১০) সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ১ম ১৪১১ (৩১১) The Religion and Philosophy of the Atharvaveda – N. J. Shende (৩১২) The Life of the man Jefferson (৩১৩) ইতিহাসের আলোকে বৈদিক সাহিত্য (৩১৪) জিজ্ঞাসা ওয় সংখ্যা ১৩৯৮ (৩১৫) কোরক সাহিত্য পত্রিকা রাজশেখর বসু সংখ্যা বইমেলা ১৯৯৫ (৩১৬) Journal of Francis Buchanan – C.E.A.W Oldham 1410-11 (৩১৭) Journal of Francis Buchanan – V. H. Jackson 1411-12 (৩১৮) Journal of Francis Buchanan – C.E.A.W Oldham 1412-13 (৩১৯) Dames Galantes – Faubourg – Paris 1901 (৩২০) Selections from the Writings of Girish Chandra Ghose – Manmathanath Ghosh (৩২১) রাড়ের গ্রামদেবতা — মিহিরকুমার কামিল্যা (৩২২) যাত্রা : বাংলার জনপ্রিয় নাটক — নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় (৩২৩) ভাবত সংস্কৃতি — সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (৩২৪) স্বর্ণলতা — তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও আশুতোষ ভট্টাচার্য (৩২৫) Scheduled Castes and Scheduled Tribes of West Bengal – Amal K. Das (৩২৬) Lenin A Biography (৩২৭) তথাপি প্রেম — কমলকান্তি রায়চৌধুরী (৩২৮) হাসির ফোয়ারা — শিববাম চক্রবর্তী (৩২৯) বাংলার সংস্কৃতি — সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (৩৩০) উনিশ শতকের নিবিদ্ধ গ্রন্থ ও কবি গোবিন্দ দাশ — কুমুদকুমার ভট্টাচার্য (৩৩১) সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা বর্ষ ৭৪-১-৪ বর্ষ ৮১-২-৪ সং বর্ষ ৮৮-১ম সংখ্যা ১৩৭৪, ৮১, ৮ (৩৩২) বৈষ্ণব সংস্কৃতি শ্রীপটওয়ার ও শ্রীসাবঙ্গ মুরারিচরিত — ভব রায় (৩৩৩) The Philosophy of Religion – Arvind Sharma (৩৩৪) The Life of Grish Chander Ghosh – Manmathanath Ghosh 191 (৩৩৫) পূর্ববঙ্গ গীতিকার চতুর্থ খণ্ড — দীনেশ চন্দ্র সেন (৩৩৬) কলিকাতা দর্পণ — রাধারমণ মিত্র (৩৩৭) ভারতবর্ষ প্রবন্ধ সংকলন

— বারিদবরণ ঘোষ (৩৩৮) সেই সময় — সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (৩৩৯) হরপ্রসাদ গ্রন্থাবলী — হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (৩৪০) ত্রৈলোক্যানাথের গ্রন্থাবলী — ত্রৈলোক্যানাথ মুখোপাধ্যায় (৩৪১) রস গ্রন্থাবলী — রসশেখর চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় (৩৪২) Journal of The Asiatic Society Vol-XXXV No-2 1993 (৩৪৪) Journal of The Asiatic Society Vol-XIII No-1-4 1971 (৩৪৪) Journal of The Asiatic Society Vol-XXVII No-2 1985 (৩৪৫) Journal of The Asiatic Society Vol- XLVII No-3 2005 (৩৪৬) Journal of The Asiatic Society Vol-XLVI No-I 2004 (৩৪৭) বঙ্গদর্শন — নীহার রঞ্জন রায় শততম জয়ন্তী জানুয়ারী ২০০৫ (৩৪৮) কোরক সাহিত্য পত্রিকা — বিষয় চিঠিপত্র — ১৪১১ (৩৪৯) কোরক সাহিত্য পত্রিকা উপেন্দ্রকিশোর সংখ্যা ২০০৫ (৩৫০) লোকসংস্কৃতি-গবেষণা — রবীন্দ্র নাটকে শৌকিক উপাদান সংখ্যা ১৪০৭ (৩৫১) লোকসংস্কৃতি গবেষণা পঞ্জিকা ও সংস্কৃতি সংখ্যা ১৪০৫-১৪০৯ (৩৫২) লোকসংস্কৃতি গবেষণা জল ও সংস্কৃতি সংখ্যা (৩৫৩) The Calcutta Historical Journal Vol-XVIII No-I January-June 1996 (৩৫৪) পরিচয় — বাংলাদেশ সংখ্যা ১৩৭৭-৭৮ (৩৫৫) পরিচয় শারদ সংকলন — ১৪০০ (৩৫৬) ঐতিহাসিক বর্ষ ১১, বর্ষ ১২ বৈশাখ-চৈত্র ১৪০৯-১৪১০ (৩৫৭) ঐতিহাসিক বর্ষ ৬ সংখ্যা ১ ১৪০৩ (৩৫৮) ঐতিহাসিক বর্ষ ৬ সংখ্যা ১ ১৪০৩ (৩৫৯) সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা বর্ষ ৮৬-৮, সংখ্যা ১৩৮৬ (৩৬০) সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ৯৫ বর্ষ ৩-৪ সং ৯৬-১০০ বর্ষ যুগ্ম সং-১৩৯৫-১৪০ (৩৬১) বারোমাস — ২৩ বর্ষ শারদীয়া ২০০১ (৩৬২) ইতিহাস সংসদ বার্তা দশম বার্ষিক সম্মেলন সংখ্যা ১৯৯৩ (৩৬৩) চতুর্দশ বর্ষ ৩৬ বৈশাখ-আশ্বিন ১৩৮১ (৩৬৪) The Quarterly Review of Historical Studies Vol-XXXVII No-1-2-1998 (৩৬৫) সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা বর্ষ-৮৬, ৪র্থ সংখ্যা মাঘ-চৈত্র ১৩৮৬ (৩৬৬) সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা বর্ষ ৮২ ১ম-২য় সংখ্যা বৈশাখ-আশ্বিন ১৩৮২ (৩৬৭) বিদ্যাপতি (৩৬৮) সচিত্র গুলজার নগর — কেদারনাথ দত্ত (ভাঁড়) (৩৬৯) কৃষ্ণাথ রামদাস হুইলার ও সমসাময়িক মুশিদিবাদ সমাজ — দেবব্রত ধর (৩৭০) বিপ্লবভীর্ণ চন্দ্রনগর — বিমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (৩৭১) থিয়েটার ও অন্যান্য প্রসঙ্গ — মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য (৩৭২) ভারতশিল্পে মূর্তি — অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (৩৭৩) কালপেঁচার নকশা — বিনয় ঘোষ (৩৭৪) মহাকাব্য ও মৌলবাদ — জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায় (৩৭৫) কাল্পনিক সংবদল — মদনমোহন গোস্বামী (৩৭৬) নিয়তিবাদ উদ্ভব ও বিকাশ — সুকুমারী ভট্টাচার্য (৩৭৭) আনন্দসঙ্গী (৩৭৮) রসিক — সুরত মুখোপাধ্যায় (৩৭৯) ইসলামের ইতিহাস ২য় খণ্ড — সৈয়দ আব্দুল হালিম (৩৮০) India in Transition - M. N. Roy (৩৮১) সংস্কৃত সাহিত্যের সমাজতত্ত্ব অন্যান্য প্রসঙ্গ — কব্‌গাসিন্দু দাস (৩৮২) নির্বাচিত রচনা সংগ্রহ — ভবানী সেন (৩৮৩) মহান পুরুষদের সান্নিধ্যে — শিবনাথ শাস্ত্রী (৩৮৪) Samskaratattva of Raghunandana - Heramba Chatterjee Sastr (৩৮৫) Papers on the Ayurvedic Studies - Brahmananda Gupta (৩৮৬) জগদ গুরু মহা মহাপ্রভু জগদগুরু মতিছন্দ মহেশ্বর (৩৮৭) Buddhist India - T. W. Rhys Davids. (৩৮৮) চরিত. সুখা (৩৮৯) মনোরমার জীবন চিত্র (৩৯০) হিমালয় পরিভ্রমণ (৩৯১) রাজমালা — ভূপেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী (৩৯২) The Confessions - J. M. Cohen (৩৯৩) যুগ্মশ্রী শ্রীচৈতন্য — যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী (৩৯৪) শ্রীচৈতন্যদেব ও সমকালীন নবদ্বীপ — যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী (৩৯৫) নবদ্বীপের ইতিবৃত্ত — মুত্যাঞ্জয় মণ্ডল (৩৯৬) গৌড় বঙ্গ সংস্কৃতি ও শ্রীচৈতন্যদেব — সনাতন গোস্বামী (৩৯৭) পুরাণের পুনর্জন্ম ও অন্যান্য — নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (৩৯৮) Society and Change Vol-VIII No-2 (৩৯৯) Society and Change Vol-IX No-4 (৪০০) Society and Change Vol-IX No-3 (৪০১) কোরআন শরীফ — ওসমান গনী (৪০২) আপোস করি নি — অম্মি মিত্র (৪০৩) মীর মশাররফ হোসেন নাট্যসমগ্র — আবুল আহসান চৌধুরী (৪০৪) ব্যঙ্গমা ব্যঙ্গমী — পরিমল গোস্বামী (৪০৫) Indian History Congress (৪০৬) Password Victory. (৪০৭) গিয়ায়ে মুতাহখিরীন — এম আবদুল কাদের (৪০৮) বর্ধমান সমগ্র — গোপীকান্ত কোন্ডার (৪০৯) মেদিনীপুর ইতিহাস ও সংস্কৃতির বিবর্তন (২য় খণ্ড) বিনোদশঙ্কর দাশ (৪১০) শ্রী গৌরাঙ্গ — প্রফুল্লকুমার সরকার (৪১১) জামাতের আসল চেহারা — মন্তলানা আবদুল আউবাল (৪১২) চিঠির স্বর্ণপাতা — বীণাপাণি

দেবী (৪১৩) তিন শতকের কলকাতা — নকুল চট্টোপাধ্যায় (৪১৪) জলধর সেনের নির্বাচিত গল্প — সুবিমল মিশ্র (৪১৫) বাঙালির মানবধর্ম — ভবতোষ দত্ত (৪১৬) মহাভারত — বিষ্ণুপদ চন্দ্রবর্তী (৪১৭) প্রসঙ্গ নাটক — শম্ভু মিত্র (৪১৮) হে কৃষ্ণ বেদে কি তোমার স্থান নাই — ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীভক্তিশ্রদ্ধানন্দের মহারাজ (৪১৯) বাজে অনুপ বীণা — বীণাপাণী দেবী (৪২০) সরোজ আচার্য রচনাবলী ৩য় খণ্ড (৪২১) Nationalism As Poetic Discourse in Nineteenth Century Bengal – A. Roy (৪২২) সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা বর্ষ-১১১ সংখ্যা-৩-৪ (দুর্গাপি) ১৪১১ (৪২৩) সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা বর্ষ-১১০ সংখ্যা-৪ ১৪১০ (৪২৪) সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা বর্ষ-১০৪ সংখ্যা-১-৪ ১৪১৪ (৪২৫) সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা শতবর্ষ পূর্তি সংখ্যা যুগ্ম সংখ্যা ১৪০১-১৪০২ (৪২৬) শ্রী সত্তাগবতম মহাপুরাণম — মণীন্দ্রনাথ গুহ ৪র্থ খণ্ড (৪২৭) শ্রী সত্তাগবতম মহাপুরাণম — মণীন্দ্রনাথ গুহ ৬ষ্ঠ খণ্ড (৪২৮) বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা — বিনয় ঘোষ (৪২৯) বাংলা সাময়িক পত্র — ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (৪৩০) বাংলার বৈষ্ণব সমাজ, সংগীত ও সাহিত্য — বাসন্তী চৌধুরী (৪৩১) The Folk Cults of Bengal – Piyush Kanti Mahapatra (৪৩২) Studies in Dharmasastra – Bhabatosh Bhattacharyya (৪৩৩) লোকশ্রুতি (৪৩৪) সুকুমার সাহিত্য সমগ্র ১ম খণ্ড (৪৩৫) The Journal of Asiatic Society Vol-XXXVIII No-I 1996 (৪৩৬) The Journal of Asiatic Society Vol-XLVI No-3 2004 (৪৩৭) মূল্যায়ন ১ম বর্ষ ১ম সং ১৯৯৭, ২য় বর্ষ ১ম সং ২০০০ (৪৩৮) কোরক সাহিত্য পত্রিকা শারদ ১৪০৬, সুকুমার সংখ্যা ২০০৩ (৪৩৯) Castes in Bengal – S. N. Mukherjee (৪৪০) American Foreign Policy Since World War II – John Spanier (৪৪১) পাপুর বই — সুব্রত সরকার (৪৪২) B (৪৪৩) দিনগুলি মোর — প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত (৪৪৪) শিবাজী — যদুনাথ সরকার (৪৪৫) Selected Short Stories – M. Gorky (৪৪৬) কর্মবীর রাসবিহারী — বিজ্ঞানবিহারী বসু (৪৪৭) A History of Political Theories – William Archibald Dunning (৪৪৮) Young India – Lajpat Rai (৪৪৯) চরিত্র সূচী ২য় খণ্ড — রাধারমণ চরণদাস (৪৫০) দারোগার দপ্তর ৫২ সংখ্যা থেকে ৫৮ সংখ্যা (৪৫১) শ্রীমদ্ভাগবতম — শ্রীমৎ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন (৪৫২) ঠিকানা : কলকাতা — সুনীল মুন্সী (৪৫৩) পালযুগের চিত্রকলা — সরসীকুমার সরস্বতী (৪৫৪) সারাবলী — কৃষ্ণলীলা — রাধামাধব ঘোষ (৪৫৫) Dictionary of Buddhist Doctrinal and Technical Terms – B. Nath Chaudhury (৪৫৬) ইতিহাস অভিধান (ভারত) — ষোণনাথ মুখোপাধ্যায় (৪৫৭) ঐতিহাসিক — কার্তিক চৈত্র ১৪০৩। (৪৫৮) কোরক সাহিত্য পত্রিকা May August 2001 (৪৫৯) আভা শারদীয়া ১৩৯৫ (৪৬০) সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা বর্ষ ১০৯ সংখ্যা-১-২ ১৪০৯ (৪৬১) সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা বর্ষ ১০৮ সংখ্যা-১-৪ ১৪০৮ (৪৬২) সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা বর্ষ ৯১ তম সংখ্যা-২-৪ ১৩৯১ (৪৬৩) শ্রীমদ্ভাগবতম মহাপুরাণম — মণীন্দ্রনাথ গুহ শ্রীশ্রীরাসলীলা (৪৬৪) শ্রীমদ্ভাগবতম মহাপুরাণম — মণীন্দ্রনাথ গুহ শ্রীশ্রীবাল্যলীলা (৪৬৫) শ্রীমদ্ভাগবতম মহাপুরাণম — মণীন্দ্রনাথ গুহ বাল্যলীলা (৪৬৬) স্বরবিতান ২য় খণ্ড — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (৪৬৭) বাংলা প্রাচীন পুথির বিবরণ চতুর্থ খণ্ড — বিজিতকুমার দত্ত (৪৬৮) শিবনাথ শাস্ত্রী আত্মচরিত — শিবনাথ শাস্ত্রী (৪৬৯) Contribution of India in the War of Liberation of Bangladesh – Salam Azad (৪৭০) Geography of Ancient in Buddhist Literature — Debarchana Sarkar (৪৭১) লোকশ্রুতি ৮ম চৈত্র ১৩৯৭ (৪৭২) জিজ্ঞাসা বর্ষ ৩য় শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৮১ (৪৭৩) উনিশ শতক — অলোক রায় (৪৭৪) পরিচয় ৬১ বর্ষ ১০-১২ বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৯৯ (৪৭৫) পরিচয় শারদীয়া ১৪০১ (৪৭৬) পরম পুরুষ শ্রীশ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী বাবার সংক্ষিপ্ত জীবনী (৪৭৭) বিশ্বকোষ ষোড়শ খণ্ড (৪৭৮) Selected Philosophical Works – V. G. Belinsky (৪৭৯) হারামণি — মুহম্মদ মনসুব উদ্দীন (৪৮০) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বিয়ানিশের আন্দোলন কংগ্রেস ও কমিউনিষ্ট পার্টি ডঃ শ্যামাপ্রসাদ বসু (৪৮১) বাউল কবি রাধারমণ গীতি সংগ্রহ — যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত (৪৮২) নির্বাচিত গল্প — শৈবাল মিত্র (৪৮৩) বিশ্বকোষ বিষয় সৃষ্টি — বিশ্বকোষ পরিষদ (৪৮৪) Immortal Love of Rama (৪৮৫) আমাদের গৌরব — সুকর্ণবশিক সমাজ (৪৮৬) বিবাদ সিদ্ধ — মীর মশারফ হোসেন

(৪৮৭) অচেনা অজানা বিবেকানন্দ — শংকর (৪৮৮) দিবা-রাত্রি-কাব্য (গল্প সংখ্যা) আফিফ ফুয়াদ (৪৮৯) গড়ডলিকা — পরশুরাম (৪৯০) সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ১০৩ বর্ষ, ১-৪ সংখ্যা (৪৯১) Kama Kalpa or The Hindu Ritual of Love — P. Thomas (৪৯২) Kangra Paintings on Love — M. S. Randhawa (৪৯৩) নীরদ মজুমদার অঙ্কিত রামপ্রসাদী ছবি (৪৯৪) Fort William A Historical Perspective (৪৯৫) পশ্চিমবঙ্গ বর্ষ ৩০, সংখ্যা ৩২-৩৬, ১৯৯৭ (৪৯৬) যুবমানস শারদীয়া ১৪০০ (৪৯৭) যুবমানস শারদীয়া ১৪০১ (৪৯৮) যুবমানস শারদীয়া ১৪০৩ (৪৯৯) যুবমানস শাবদীয়া — ১৪০৬ (৫০০) Indian Museum Bulletin — 1990 (৫০১) পূর্ব বাংলার লোক সংগীত — দিনেন্দ্র চৌধুরী (৫০২) মানিক গ্রন্থাবলী — মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩৫৭ বসুমতী সাহিত্য মন্দির (৫০৩) শ্রীমদ্ভাগবতম্ মহাপুরাণম্ — মণীন্দ্রনাথ গুহ দশম স্কন্ধ ২য় খণ্ড (৫০৪) দেশ — স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী ৯ আগস্ট ১৯৯৭ (৫০৫) The Cultural Heritage of India Ramakrishna Centenary Vol-I (৫০৬) The Cultural Heritage of India Ramakrishna Centenary Vol-II (৫০৭) The Cultural Heritage of India Ramakrishna Centenary Vol-III.

রাজীব চৌধুরী গ্যাঙ্গায় পত্র, ২৩৯ লেক রোড, কলকাতা-২৯।

(১) বাংলাব উত্তর আধুনিক সাহিত্য চিন্তা অঞ্জন সেন, উদয়নাথায়ন সিংহ, শুভা চক্রবর্তী দাশগুপ্ত, রাজীব চৌধুরী, জয়ন্ত মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত।

রাজীবলোচন ভট্টাচার্য কৃষ্ণসীল পত্রিকার পক্ষে জে. কে. পাল লেন, বেনাচিতি, দুর্গাপুর-১৩, বর্ধমান।

(১) কৃষ্ণসীল : ২য় বর্ষ, ৮ম ও ৯ম সংখ্যা জৈষ্ঠ ১৪১২।

রামরঞ্জন রায় মনোহর পুর, গোপমহল, পশ্চিম মেদিনীপুর।

(১) প্রকৃত অঙ্গীকার সংকলন : প্রেমেন্দ্র অনুধ্যান — রামরঞ্জন রায়, সম্পাদিত।

রীশা দত্ত সি এফ ১২৩, সেন্টলেক, কলকাতা-৬৪।

(১) সাবির মানস সন্ধান — আশরাফ সিদ্দিকী, সম্পাদিত।

লোকমাতা রাণী রাসমণি ফাউন্ডেশন দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দির ও দেবোত্তর এসেট অলমবাজার, কলকাতা-৩৫।

(১) শারদীয়া মাতৃশক্তি, ১৪১২ অক্টোবর নভেম্বর।

শংকরপ্রসাদ চক্রবর্তী ৭ গড়চা প্রথম লেন, ব্লক : ই ওয়ান ফ্ল্যাট-২৪৩ (ষষ্ঠতল), কলকাতা-১৯।

(১) বাংলা উপন্যাসে স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্তিমপর্ব (১৯৪২-১৯৪৭) — শংকরপ্রসাদ চক্রবর্তী।

শঙ্করকুমার বোস বি. এফ. ৭০ সেন্টলেক সিটি, কলকাতা-৬৪।

(১) The Coinage of Coochbehar — Nicholas Rhodes & S. K. Bose (২) The Coinage of Tripura — N. G. Rohodes & S. K. Bose (৩) The Coinage of Assam — N. G. Rohodes & S. K. Bose Vol-I Pre-Ali period, Vol-II period.

শক্তিদাস রায় মুখ্য গ্রন্থাগারিক আনন্দবাজার, কলকাতা।

(১) শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা ১৪১২ (২) শারদীয় দেশ ১৪১২ (৩) দেশহিতৈষী: শারদ সংখ্যা ১৪১১ (৪) কলেজ স্ট্রীট : ১৪১১ (৫) শারদীয়া ১৪১১ (৬) গণশক্তি : শারদ সংখ্যা ১৪১১ (৭) শারদীয় কালান্তর ১৪১০ (৮) নন্দন : শারদসংখ্যা ১৪১১ (৯) শারদ সঙ্কলন : ১৪১১ (১০) সংবাদ প্রতিদিন : শারদীয় ১৪১১ (১১) The Statesman (Festival, 2004)

শক্তিপদ ঘোষ ১৯/১সি, উন্টাডাঙ্গা রোড, কলকাতা-৪।

(১) বাংলা নাটকে ভ্রমের চরিত্র — শক্তিপদ ঘোষ।

শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায় ১৩ডি, সুরসুনা মেন রোড, কলকাতা-৬১।

(১) কলকাতার আদি আচার্য : ডেভিড ড্রাম শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায় (২) ইতালীয় রেনেসাঁসের আলোকে বাংলাব বেনেসাঁস — শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়।

শরৎচন্দ্র বিশ্বাস সাকিম লিচুতলা, পোস্ট-সগুণা, থানা-কল্যাণী, জেলা-নদীয়া। পিন-৭৪১২৪৫।

(১) নমঃ শূত্র সম্প্রদায়ের আত্মকথা — শরৎচন্দ্র বিশ্বাস।

শশধর প্রকাশনী ১০/২ বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-৯।

(১) যা বাকি রইল — সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় (২) ক্ষুধা — আশুতোষ মুখোপাধ্যায় (৩) সে — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (৪) দাদু-দিদার থলে — তপতী দেবী (৫) পাবিবারিক — মহাশ্বেতা দেবী (৬) জগুগুহের পর — হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়।

শিশিরকুমার মাইতি ২৪, ঠাকুর রামকৃষ্ণ লেন, হাওড়া-৭১১১০৪।

(১) তৃণ থেকে তীর — সুনির্মল কুহু (২) সমার সেট মম-এর আপ অ্যাট দ্য ভিলা — দীপ্তি চট্টোপাধ্যায়, অনু (৩) আশাবরী : জানুয়ারি ২০০৫ (৪) আশাবরী : এপ্রিল ২০০৫ (৫) আশাবরী : জুলাই ২০০৫।

শিশুতোষ সামন্ত এলিট কো অপ হাউসিং সোসাইটি ৩/৭৩২, বিধান শিশু সরণি, কলকাতা-৫৪।

(১) বহি্ন বালক বসন্ত — শিশুতোষ সামন্ত।

শিশু সাহিত্য সংসদ ৩২ এ, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড, কলকাতা-৯।

(১) আমাব ভারতীয় বহুগণ — ফ্রীডবিস ম্যাক্স মূলার (২) সংসদ অর্থবিদ্যা অভিধান — হীরেন্দ্রনাথ রায় ও ধীবেশচন্দ্র ভট্টাচার্য (৩) Partition of Bengal : Significant Signposts, 1905-1911 – Nityaprio Ghosh & Asoke Kumar Mukherjee (৪) রবীন্দ্রনাথের আত্মীয়স্বজন — সমীর সেনগুপ্ত (৫) চিরকালের সেরা — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শেখর ভৌমিক ইতিহাস বিভাগ, মহিষাদল রাজ কলেজ, পূর্ব মেদিনীপুর।

(১) সাম্প্রতিক ইতিহাসচর্চা — শেখর ভৌমিক, সম্পাদিত (২) Journal of History – Mahishadal Raj College: Vol-I, 2005 (৩) ছাত্রপাঠ্য ইতিহাস : রূপে রূপান্তরে — সমীরকুমার পাত্র ও শেখর ভৌমিক (৪) হিজলীর বৃত্তান্ত — শেখর ভৌমিক, সঙ্কলন ও সম্পাদনা (৫) মুরশিদাবাদের ইতিহাস — শ্যামধন মুখোপাধ্যায় ও শেখর ভৌমিক, সঙ্কলন ও সম্পাদনা।

শ্যামল দাস মূর্শিদাবাদ।

(১) মূর্শিদাবাদ সন্দেশ : ৩২ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, অক্টোবর ২০০৫ — শ্যামল দাস।

শ্যামল মিত্র পূর্বাশা হাউসিং এস্টেট, ফ্ল্যাট-ই ১৫/১৬ ৬০, মানিকতলা মেন রোড, কলকাতা-৫৪।

(১) কোথায় পাই তারে — মহামিত্র।

শ্যামল সাউ দি সরস্বতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস ২, গুবুপ্রসাদ চৌধুরী লেন, কলকাতা-৬।

(১) বহুরূপী . মে ২০০৫, সংখ্যা ১০৩।

শ্রাবণী বন্দ্যোপাধ্যায় মধ্যমগ্রাম, বিরোণপল্লী উঃ ২৪ পরগনা, কলকাতা-১২৯।

(১) বাংলা কবিতায় প্রেম : প্রাগাধুনিক পর্ব — শ্রাবণী বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রীভূমি পাবলিশিং ৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা ৯

(১) অ্যাকজম্য ভালো থাকা যায় — রমেন মজুমদার (২) মনের সুখ অসুখ — শিবেন সাহা (৩) চাপ বা স্ট্রেস — অমবেন্দ্র বসু (৪) নয়ন ছেড়ে গেলে চলে — সুদীপা ভট্টাচার্য (৫) নেতাজীর জীবনের শেষ বাত্মি ১৫ আগস্ট, ১৯৪৫ — উষারঞ্জন ভট্টাচার্য।

১১৬ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১৩ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা

সংযুক্তা সিংহ কলকাতা।

(১) ভালোবাসার মানুষ — অরুণ দত্ত, সম্পাদনা।

সজ্জল চৌধুরী সারস্বত সমাঙ্গ।

(১) বেদচর্চায় বঙ্গভূমি ও সামগ্র্যমী — অমরকুমার চট্টোপাধ্যায়।

সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায় বারাসাত, উত্তর ২৪ পরগনা।

(১) স্বৈচ্ছানির্বাসন থেকে — সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সম্পাদক, অন্যাকথা ১৯৯, আমবাগান, পলতা, পোঃ বেঙ্গল এনামেল, উত্তর-চব্বিশ পরগনা।

(১) অন্যাকথা : ৫ম সংখ্যা, শরৎ ১৪০৯ (২) অন্যাকথা : ৬ষ্ঠ সংখ্যা শরৎ ১৪১০ (৩) অন্যাকথা : ৭ম সংখ্যা শরৎ ১৪১১ (৪) অন্যাকথা : ৮ম সংখ্যা শরৎ ১৪১২।

সম্পাদক, একুশশতক ৫১-এ, ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা-৯।

(১) একুশ শতক জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ২০০৫ (২) একুশ শতক মার্চ-এপ্রিল ২০০৫ (৩) একুশ শতক মে-জুন ২০০৫ (৪) একুশ শতক জুলাই-আগস্ট ২০০৫ (৫) একুশ শতক সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০০৫ (৬) একুশ শতক নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০০৫ (৭) একুশ শতক জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ২০০৬ (৮) একুশ শতক মার্চ-এপ্রিল ২০০৬ (৯) একুশ শতক মে-জুন ২০০৬ (১০) একুশ শতক জুলাই-আগস্ট ২০০৬ (১১) একুশ শতক সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০০৬ (১২) একুশ শতক নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০০৬।

সম্পাদক, কালি ও কলম ঢাকা, বাংলাদেশ।

(১) কালি ও কলম : ৩য় বর্ষ ১ম সংখ্যা ফাল্গুন ১৪১২ ফেব্রুয়ারি ২০০৬।

সম্পাদক, চিত্রভাষ ৬১ লেনিন সরণী, কলকাতা-১৩।

(১) চিত্রভাষ Vol-39 (No. 1-4) January 2004-December 2004. ঋত্বিক ঘটক ও সুবর্ণরেখা 'বিশেষ সংখ্যা'।

সমরেশ্বর বাগচী টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট রবীন্দ্রচর্চা ভবন, কালিঘাট পার্ক ৯৭ সি শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড কলকাতা-২৬।

(১) রবীন্দ্রনাথ ও মানবেন্দ্রনাথ : মতাদর্শগত তুলনামূলক মূল্যায়ন — সমরেশ্বর বাগচী।

সমীরকুমার গুপ্ত ১৮/১, ডি. আই. পি. রোড, কলকাতা-৫৪।

(১) মিলেমিশে : গান ও সাহিত্য বিষয়ক পত্রিকা ২য় বর্ষ : ২০০৫ জানুয়ারি — ২০০৬ সেপ্টেম্বর
(২) মিলেমিশে : শারদীয়-সংখ্যা, ১৪১২।

সরস্বতী মিশ্র বালী, হাওড়া।

(১) উৎসবে মেলায় ইতিহাসে — সুধীর চক্রবর্তী।

সলিল চক্রবর্তী করুণাময়ী কুটির, গ্রাম ও ডাক কালিকাপুর চম্পাহাটি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা পিন-৭৪৩৩০০।

(১) সর্গচাপা — সলিল চক্রবর্তী।

সিতেশ রায় ৪০০/এ/২বি নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু রোড কলকাতা।

(১) পথের কাহিনী : মহানগর পর্ব সিতেশ রায়।

সুদীপ্ত গোস্বামী ৪১, জ'পুর রোড, কলকাতা-৭৪।

(১) জীবনের সন্ধানে — সুদীপ্ত গোস্বামী।

সুদেব সাহা পি-২৪৪/১, সি. আই. টি. রোড, কাঁকড়াগাছি, কলকাতা-৫৪।

(১) শূদের কথা — সুদেব সাহা।

সুধীরচন্দ্র রায় বাধ্যযতীন প্রেস, কলকাতা-

(১) শিক্ষা-প্রসঙ্গে : রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র ও বিভূতিভূষণ — সুধীরচন্দ্র রায়।

সুনীতা বন্দ্যোপাধ্যায় এ২, ১৭ তলা, ফজর্ডস টাওয়ার হাইল্যান্ড পার্ক, কলকাতা-৯৪।

(১) আধুনিকতার অভিমুখে বঙ্গনারী — সুনীতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

সুনীল দাস

(১) তত্ত্বমসি : ৯ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা কার্তিক ১৪০৯ (২) তত্ত্বমসি : ৯ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা অগ্রহায়ণ ১৪০৯

(৩) তত্ত্বমসি : ৯ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা পৌষ ১৪০৯ (৪) তত্ত্বমসি : ৯ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা মাঘ ১৪০৯

(৫) তত্ত্বমসি : ৯ম বর্ষ, ১১তম সংখ্যা ফাল্গুন ১৪০৯ (৬) তত্ত্বমসি : ১০ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা বৈশাখ ১৪১০

(৭) তত্ত্বমসি : ১০ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা আষাঢ় ১৪১০ (৮) তত্ত্বমসি : ১০ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা ভাদ্র ১৪১০

(৯) তত্ত্বমসি : শারদীয় বর্ষ, ১ম সংখ্যা আশ্বিন ১৪১১ (১০) তত্ত্বমসি : ১১শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা আষাঢ় ১৪১১ (১১) উদ্বোধন : জ্যৈষ্ঠ ১৪১০।

সুবন্ধু ভট্টাচার্য ৩০এ, হরেকৃষ্ণ শেঠ লেন, কলকাতা-৫০।

(১) রবীন্দ্রনাথ রাজা : শতবর্ষোত্তর সমীক্ষা — সুবন্ধু ভট্টাচার্য।

সুবিমল মিশ্র ৭৯৭, আর. এন. টেগোর রোড, কলকাতা-৭৭।

(১) রামব্রহ্ম সান্যালের কিশোর রচনা সংগ্রহ — সুবিমল মিশ্র, সঙ্কলন ও সম্পাদনা (২) হিমালয় সমগ্র : জলধর সেন — সুবিমল মিশ্র, সঙ্কলন ও সম্পাদনা।

সুভাষচন্দ্র মৈত্র শ্রেয়সী অ্যাপার্টমেন্ট, বালিয়া রোড, গড়িয়া, কলকাতা-৮৪।

(১) শোনা বিশ্বের অমর্তের পুত্রগণ — সুভাষচন্দ্র মৈত্র।

সেবক পাবলিশার্স রামনগর রোড নং ২, আগরতলা, ত্রিপুরা।

(১) দেশবিভাগোত্তর ভারতের অঙ্গীভূত : মন্ত্রীসভা বিহীন ও প্রথম মন্ত্রীসভার রাজ্য ত্রিপুরা — অমিয় দেব রায়।

সৈয়দ আবদুল হালিম বাহির সর্বমঙ্গলা পাড়া, নজরুল পল্লী, জেলা-বর্ধমান।

(১) ইসলামের ইতিহাস (সংক্ষিপ্ত সং) ১ম — সৈয়দ আবদুল হালিম (২) ইসলামের ইতিহাস (সংক্ষিপ্ত

সং) ২য় — সৈয়দ আবদুল হালিম (৩) বাঙ্গালী মুসলমানের উৎপত্তি ও বাঙ্গালী জাতির বিকাশের ধারা, ১ম — সৈয়দ আবদুল হালিম (৪) বাঙ্গালী মুসলমানের উৎপত্তি ও বাঙ্গালী জাতির বিকাশের ধারা, ২য়

— সৈয়দ আবদুল হালিম (৫) বাঙ্গালী মুসলমানের উৎপত্তি ও বাঙ্গালী জাতির বিকাশের ধারা, ৩য় —

সৈয়দ আবদুল হালিম (৬) একেশ্বরবাদ ও ইসলাম — সৈয়দ আবদুল হালিম (৭) মুসলিম আদর্শ ও

কর্মের রূপান্তর — সৈয়দ আবদুল হালিম (৮) ইসলাম ও তার রূপায়ণ — সৈয়দ আবদুল হালিম

(৯) বাদশাহ ও মানুষ আওরঙ্গজেব — সৈয়দ আবদুল হালিম।

সোমেন ফুঁইএণ্ড নোয়াখালী সম্মিলনী শতবর্ষ উদযাপন কমিটি, ৮৪৭ লেকটাউন, কলকাতা-৮৯।

(১) স্মারকগ্রন্থ : নোয়াখালী সম্মিলনী শতবর্ষ উদযাপন।

স্কুল অব উইমেনস্ স্টাডিজ যামবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা-

(১) কামিনী রায়ের অগ্রহৃত গদ্যরচনা — অভিজিৎ সেন, অনিন্দিতা ভাদুড়ী।

স্বপন নন্দর ৪১ সি, কলুপাড়া লেন, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৩১।

- (১) সঙ্গীত সাফল্য : ১ম খণ্ড — স্বপন নন্দর (২) সঙ্গীত চ্যনিকা : ১ম খণ্ড — স্বপন-নন্দর (৩) সঙ্গীত চ্যনিকা : ২য় খণ্ড — স্বপন নন্দর (৪) সঙ্গীত প্রবেশিকা — স্বপন নন্দর।

হরকম্বরী মেমোরিয়াল ট্রাস্ট ৫, আলেকজান্ডার কোর্ট, ৬০/১ চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-২০।

- (১) বিদ্যাসাগর ও আজকের প্রাসঙ্গিকতা (২) Vidyasagar : The Ocean Main of Compassion – Rendered in English by Shyamal Banerjee.

হিরণ্ময় ভট্টাচার্য ৫, Avondale Crescent. U.K.

- (১) রসিক রবীন্দ্রনাথ — হিরণ্ময় ভট্টাচার্য।

Abirlal Mukhopadhyay Derozio Commemoration Committee, Calcutta-

- (১) Complete Works of Henry Louis Vivian Derozio – ed. by Abirlal Mukhopadhyay, Amar Dutta, Adhir Kumar & Sakti Sadhan Mukhopadhyay.

The Asiatic Society 1, Park Street, Kolkata-16.

- (১) Dattaka Tilakah – Jaydeb Ganguly Sastri, ed. (২) The Quest for Identity – Amalendu Kishore Chakravarty (৩) Bibliography of Recovery of Metals from Spent Industrial Catalysts – Submata Dutta Choudhury (৪) Studies in the Pahlavi Grammar – E. Blochet (৫) Navyanyaya : Language & Methodology (৬) Prolegomena to Prakriticaet Jainica – Satya Ranjan Banerjee ed. (৭) Aspects of Manuscriptology – Ratna Basu & Karanasindhu Basu ed. (৮) Buddha & Buddhism – Biswanath Banerjee & Sukumal Chowdhury (৯) Rabindranath Tagore & Patrick Geddes – Arunendu Banerjee (১০) Primer of Navyanyaya language & Methodology – Ujj (১১) Tantrayāwa Art in Alleum (১২) Ain-i-Akbari – Abul Fazl (১৩) The Akbarnama – Abil Fazl. Vol-I (১৪) The Akbarnama – Abul Fazl. Vol-II (১৫) The Akbarnama – Abil Fazl. Vol-III (১৬) The Origin & Development of Bhojpuri – Uday Narain Tiwari (১৭) Tipu Sultan & his age – Anuradha Ray, ed. (১৮) Seminar on Ishwar Chandra Vidyasagar : Present times (১৯) Rammohun Roy : His Role in Indian Renaissance – Saumyendranath Tagore (২০) Social & Political Ideas of M. N. Roy – Nirmal Chandra Bhattacharya (২১) Bankim Chandra Chattopadhyay : His contribution to Indian Life & Culture – Ujjal Kumar Majumdar (২২) Can technology lead to a prosperous society – APJ Abdul Kalam (২৩) From Amirkhusrou to Abul Kalam Azad – Hirendranath Mukherjee (২৪) On Interpreting India's Past – Amartya Sen (২৫) Rāmcaritam of Sandhyā Karanandis (২৬) Mughal Painting during Jahangir's time (২৭) The Asiatic Society : Bi-Centenary Souvenir 1784-1984 (২৮) Centenary Review of the Asiatic Society : 1784-1884 (২৯) The Early Annals of the English in Bengal, Vol.-I – C. R. Wilson (৩০) The Asiatic Society (as an Institution of National Importance) (৩১) Art & Aesthetics of Rabindranath Tagore – S. K. Nandi (৩২) Satyendranath Bose: A Centenary Tribute (৩৩) The Asiatic Society & Anthropological Studies in India (৩৪) Introducing India – K. N. Bagchi, W. G. Griffith (৩৫) Shah Alam II & his Court – Anto Louis Henri Polier (৩৬) Bengal Nawabs – Jadunath Sarkar (৩৭) Essays on Indo – European Linguistics – Satya Ranjan Banerjee (৩৮) Six Buddhist Nyāya tracts in Sanskrit – Haraprasād Sastri, ed. (৩৯) Sri

Kala Cakratantra Rāja – Biswanath Banerjee ed. (৪০) Tibetan translation of the Nyayabindu of Dharmakirti – Vallee Poussin ed. (৪১) Lalitavistara – Bijoya Goswami (৪২) Kiranāvali Udayanacāryya I-III (৪৩) Kiranāvali Udayanacāryya IV (৪৪) The Legend of the Topes (Thūpavamsa) (৪৫) Rasārṇava – Prafulla Chandra Roy & Harish Chandra Kaviratna (৪৬) Haricaritam of Caturbhujā – Sivaprasad Bhattacharya ed. (৪৭) Gauri-Mangala – Raja Prithvi Chandra of Pakur (৪৮) Rajen-dralala Mitra (150th Anniversary lectures) (৪৯) Dr. Bidhan Chandra Roy : A Jewel of India – Asoke Kr. Bagchi (৫০) Sri Aurobindo : A Collection of Seminar Papers (৫১) A Selection of Pioneering Research Papers of the Journal of the Asiatic Society on Geology & Physics – Sunil Sen Sarma, ed. (৫২) History & Doctrines of the Wahhabis by Abdullah (৫৩) Atmatattva Viveka (৫৪) Manutika Sangraha – Julius Jolly, ed. (৫৫) Majma-ul-Bahrain – Muhammad Dārā S. Sukh (৫৬) Kirātā-Jana-Kṛti : The Indo-Mongoloids – Suniti Kr. Chatterjee (৫৭) Future of Indology – Biswanath Banerjee, ed. (৫৮) Ganitāvali – Bibhuti Bhusan Bhattacharya comp. (৫৯) Aspects of History of Science – Naresh Chandra Dutta & Tulika Sen, ed. (৬০) Sekasubhodaya – Halayudha Miśra (৬১) Vishnu Pala's Manasa Mangala (৬২) Gaurāṅga Vijaya – Sukumar Sen (৬৩) Polarisation of Inospherically propagated Radio-waves – S. R. Khashtgir (৬৪) Jiva Gasvamin – Asoke Chatterjee Sastri (৬৫) Contributions to the Geography & History of Bengal – H. Blochmann (৬৬) Rajbadidāṅga : 1962 – Sudhir Ranjan Das (৬৭) Indian & Ethiopia – Suniti Kumar Chatterjee (৬৮) Kathakali . The Dance Theatre – Kalamandalam Gobindan Kutty (৬৯) Dictionary of Buddhist : Doctrinal & Technical terms – Binayendranath Choudhury (৭০) Nirmal Kumar Bose : Life, Works & Vision – Tulika Sen, ed. (৭১) Introduction to the early correspondence of the Asiatic Society – Amalendu De (৭২) সীমান্তরাষ্ট্র ও ঝাড়খণ্ডী বাংলার গ্রামীণ শব্দকোষ — সুধীবকুমার করণ, সংকলিত (৭৩) পৃথীরাজবিজয় মহাকাব্য — সম্বিত ভট্টাচার্য (৭৪) আশ্বলায়ন-শ্রৌতসূত্র — অমরকুমার চট্টোপাধ্যায় স° (৭৫) গোপাল হালদার : সংস্কৃতির বস রূপ স্রষ্টা — সুনীল বিহারী সেনশর্মা ও অন্যান্য সংকলিত (৭৬) বিদ্যাসাগর : একুশ শতকের চোখে — পল্লব সেনগুপ্ত ও অমিতা চক্রবর্তী, সংকলিত (৭৭) গৌড়ীয় নৃত্য — মহুয়া মুখোপাধ্যায় (৭৮) গীতগোবিন্দ ও ভারত সংস্কৃতি — ভারতের অতীত ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে — অমর্ত্য সেন (৭৯) তত্ত্বালোক — অভিনবগুপ্ত (৮০) উইলিয়াম জোনস — দিলীপ গঙ্গোপাধ্যায় (৮১) মুদ্রকটিক : বিচিত্র কালী — বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় স° (৮২) পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রবন্ধাবলী (৮৩) ন্যায়দর্শন-দ্ব্যাক্ষরতট্টিয়ণকম্ — Śrīkanthacarya (৮৪) Journal of the Asiatic Society : Vol-XLVI (৮৫) Journal of the Asiatic Society : Vol-XLVI, No-2, 2004 (৮৬) Journal of the Asiatic Society : Vol-XLVI, No-3, 2004 (৮৭) Journal of the Asiatic Society : Vol-XLVI, No-3, 2004 (৮৮) Journal of the Asiatic Society : Vol-XLVI, No-1, 2005

Sambhunath Mondal — Ananya Housing Estate, Flat No-2R-1/2 25c, Radha Madhab Dutta Garden Lane, Kolkata-10.

(১) India & Sanskrit as deciphered in the Indus Script – Sambhunath Mondal.

Shuab Ahmed Showkathy — 8. Holdenhurst Road, Bournemouth, BH8 8AD U.K.

(১) প্রলয়ঙ্কর শূয়েব আহমেদ শওকতি (২) কল্লোলিনী — শূয়েব আহমেদ শওকতি সম্পাদিত।